প্রতীক্ষা

শিল্পী—শ্রীভবানী চরণ লাহা।

"এই যে ধীরেন—দেখ দিকিনি ছবিখানা কেমন হয়েছে ?"

"শ্রীচৈতন্য কাশীদর্শন"

"একি—ছবির মধ্যে ত কালো রং ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্চি না।"

"কেন ভাল করে দেখ—চৈতন্যের মাথা দেখতে পাবে। পা-ও দেখতে পাবে।
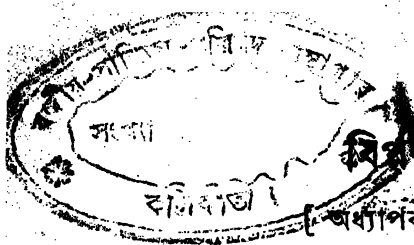
বিপ্লবকেন্দ্র আল্‌বানিয়া

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্-এ]

(১)

আল্‌বানিয়ার নাম ভারতে সুপরিচিত কি-না সন্দেহ। এমন কি ইহা যে একটা দেশের নাম তাহাই বোধ হয় অনেকের জানা নাই। যাহা হউক, আল্‌বানিয়াকে পশ্চিমের লোকেরা ইয়োরোপের অন্যতম ঝড়-কেন্দ্র বলিয়া জানে। এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারপিট, বিদ্রোহ লুটপাট লাগিয়াই আছে।

কয়েক সপ্তাহ (বিগত ডিসেম্বর মাস হইতে) ধরিয়া আল্‌বানিয়ায় গণ্ডগোল চলিতেছে। এই সকল গণ্ডগোলের উড়ো খবর কিছু কিছু কাগজে পড়া যায়। কিন্তু পাঠকের পক্ষে কাণ্ড কারখানার মাথামুণ্ডু কিছুই ঠাওরাইয়া উঠা অতি কঠিন। না জানা আছে পল্লী সহরের নাম, আর না জানা আছে লোকজনদের নাম।

কিন্তু এই হযবরল'র ভিতরেই ইয়োরোপীয়ান রাষ্ট্রপুঞ্জের খড়িবাজি চাল ঢের। আল্‌বানিয়াকে লইয়া ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় খেলোয়াড়েরা দাবাব'ড়ের চাল চালিতে ওস্তাদ। কাজেই মুল্লুকটা ছোট হইলেও বর্ত্তমান জগতের জীবন ধারায় ইহার কিম্মৎ অল্প নয়।

(২)

গ্রীস আর যুগোস্লাভিয়ার মাঝামাঝি আল্‌বানিয়ার অবস্থান। পশ্চিমে আদ্রিয়াতিক সাগর এবং ওত্রান্ত্রো প্রণালী। অপর পারে ইতালির এক ঠ্যাঙ্। এই অঞ্চলে ইতালিয়ান সমুদ্র-বন্দর ব্রিন্দিসি অবস্থিত। বুঝা যাইতেছে যে, কমসে কম্ তিনটা দেশ আল্‌বানিয়ার গণ্ডগোলে নাক গুঁজিতে বাধ্য। সেই সূত্রে আবার এই তিনের "শত্রু-মিত্রেরা" ও "কৌটিল্যনীতি" অনুসারে আল্‌বানিয়ার অগ্নিকুণ্ডে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে।

আল্‌বানিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে ১৯১২ সালে। ঘটনা তুর্কীর ক্রমপতনের এক চিহ্ন। যেন তেন প্রকারেণ তুর্কীকে ইয়োরোপ হইতে লাথি মারিয়া খেদাইবার জন্য পশ্চিমারা যত চেষ্টা করিয়াছেন তাহার ভিতর আল্‌বানিয়াকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া অন্যতম।

আল্‌বানিয়া মুল্লুকটা কিন্তু খৃষ্টিয়ান-প্রধান নয়। এদেশের নরনারী মুসলমান। জনপদটাকে ইয়োরোপের ভিতরকার এক মুসলমান দ্বীপ বিবেচনা করা চলে। আরব এবং মেসোপোটেমিয়া এশিয়ার এই দুই মুসলমান দেশকে তুর্কী হইতে স্বাধীন করিয়া দেওয়া যে রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত সেই রাষ্ট্রনীতিরই সামিল হইতেছে ইয়োরোপে মুসলমান তুর্কীর কবল হইতে মুসলমান আল্‌বানিয়ার স্বাধীনতা লাভ।

অবশ্য আল্‌বানিয়ার মুসলমানেরা নিজের গায়ের জোরে তুর্কীকে হারাইতে পারে নাই। ইয়োরোপের মাতব্বরেরা আপোষে ষড়যন্ত্র করিয়া আল্‌বানিয়াকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়াছে। কোনো যুগে বা কোনো দেশেই পরাধীন লোকেরা একমাত্র নিজ বাহুবলে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না। সে জন্য চাই বিদেশী পাকা পাকা মুরুব্বি আর আন্তর্জ্জাতিক ঘোঁটমঙ্গল।

(৩)

আল্‌বানিয়াকে খৃষ্টিয়ানরা স্বাধীন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই মুল্লুকে এখনো একটা পুরাদস্তুর রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এখানকার বে, পাশা ইত্যাদি নবাব জমিদারেরা বড় জবরদস্ত লোক। কোনো "রাজ্যশাসন" বা রাজ দপ্তরের তোয়াক্কা রাখা তাঁহাদের দস্তুর নয়। নিজ নিজ জমিদারির উপর এক্তিয়ার চালানো আর পরস্পর রোখারুখি করা তাঁহাদের স্বধর্ম্ম।

শত শত বৎসর ধরিয়া তুর্কী আল্‌বানিয়াকে শাসনের অধীনে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কোনো মতেই এই প্রদেশকে সাম্রাজ্যের এক খাঁটি প্রদেশে পরিণত

করা সম্ভবপর হয় নাই। সেনা বিভাগে বড় বড় চাকুরি দিয়া তুর্কীর বাদশারা আলবানিয়ার পাশা জমিদারদিগকে ঠাণ্ডা করিতে চেষ্টা করিতেন মাত্র।

আজ বার তের বৎসর ধরিয়া আল্‌বানিয়া পুরাপুরি স্বাধীন। কাজেই এই যুগটায় চলিতেছে পাশায় পাশায় লাঠালাঠি। পাশাদিগকে আইনের বন্ধনে ফেলিয়া একটা দেশরাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা কোথাও দেখা যাইতেছে না। বরং বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা নিজ নিজ মতলব হাঁসিল করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাশার উকিলী করিতে অভ্যস্থ। সুতরাং পাশায় পাশায় দাঙ্গা চলিতেছে অহরহ। আর "বলকান-সমস্যাও" ফুরাইতেছে না।

(৪)

যাহা হউক, স্বাধীন আল্‌বানিয়ায় কিছুকাল রাজ-তন্ত্র চলিয়াছে। কোন্ হ্বীদ্ রাজত্ব করিতেছিলেন যুদ্ধের সম-সমকালে। "গোলে হরিবোল" চালাইতে চালাইতে হ্বীদ রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। তখন অবশ্য অষ্ট্রীয়া—হাঙ্গারি, জার্ম্মাণি এবং রুশিয়া এই তিন "বাছা বাছা" সাম্রাজ্যও আল্‌বানিয়ার পাশা-তন্ত্রে হাত দেখাইবার সুযোগ পাইত। সার্ভিয়ার সারাজেবো কাণ্ড না ঘটিলেও এক আল্‌বানিয়া লইয়াই ইয়োরোপে কুরুক্ষেত্র বাধিতে পারিত।

হ্বীদ্ বেশী দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে সরাইয়া আল্‌বানিয়ানরা আধুনিক মতের "গণতন্ত্র" কায়েম করে, কিন্তু গণতন্ত্রের আমল জনগণের ধাতে সহিল না। পাশাদের একদল রাজতন্ত্র কায়েম করিয়া বসে। তাহাদের কর্ত্তা ছিল আহ্মেদ বে জোগু।

বিগত মে মাস পর্য্যন্ত জোগুর রাজত্ব চলিয়াছে। মান্ধাতার আমলের যা কিছু "রাজধর্ম্ম" সবই জোগুর শাসনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আল্‌বানিয়ায় এক মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত মস্তিষ্কজীবী শ্রেণী দেখা দিয়াছে। উকীল পণ্ডিতেরা তাহাদের নেতা।

উকীলদের সাহায্যে আল্‌বানিয়ার লোকেরা জোগুকে তাড়াইয়া দেয়। আবার গণতন্ত্র কায়েম হয়। বিপ্লবে উকীল জননায়কগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন "গ্রীক ক্যাথলিক" গির্জ্জার মোহন্ত বাবাজি। নয়া গণতন্ত্রের মন্ত্রি-প্রধান পদে বাহাল হইয়া মোহন্ত ঠাকুর জনগণের সেবা সুরু করিয়াছেন। নাম তাঁহার নোলি।

(৫)

মোহন্ত বাবাজীর রাষ্ট্রনীতি বিচিত্র। প্রথমেই নোলি দেশের জমিজমা গুলার লোকজনের ভিতর ভাগ বাটোয়ারা করিবার দিকে মন দেন। বে, পাশা ইত্যাদি "বাবু" সমাজ এই কাণ্ডে নোলির উপর মহা খাপ্পা হইয়া উঠে।

তাহার পর নোলি চাহেন দেশের জনগণকে নিরস্ত্র করিতে। তাহার ফলে জনসাধারণ ও মোহন্ত বাবাজির উপর যারপর নাই চটা। কারণ অস্ত্রহীন ভাবে চলা-ফেরা করা আলবানিয়ার সমাজে বে-ইজ্জৎ হইবার-সমান বিবেচিত হয়।

মোহন্ত ঠাকুরের রাজনীতি ত্র্যহস্পর্শ ঘটাইয়া ছাড়িয়াছে। কেন না নোলি গণতন্ত্রের মন্ত্রী হইবামাত্রই বোলশেহ্বিক রুশিয়ার সঙ্গে "দহরম মহরম" সুরু করিয়াছেন। সোহ্বিয়েট প্রতিনিধিরা আলবানিয়ায় আসিয়া হাজির পর্য্যন্ত হইয়াছিল। নোলির এই বলশেহ্বিক-প্রীতি তাঁহার পতনের শেষ কারণ। সোহ্বিয়েট প্রতিনিধিদিগকে "পত্র পাঠ বিদায়" দেওয়া হয় বটে,—কিন্তু নোলিও অল্পদিনের ভিতরেই ইতালিতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

(৬)

আহ্মেদ বে-জোগুর দল আবার মাথা তুলিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে আছে যুগোস্লাভিয়ার সাহায্য। ইতালির ইহা পছন্দ সই নয়। যুগোস্লাভিয়াকে আড্রিয়াতিক সাগরে পড়িতে দেওয়া ইতালির স্বার্থবিরুদ্ধ। অপর দিকে উত্তর আলবানিয়ার তেলের খনিতে ইংরেজ পুঁজিপতিরা টাকা ঢালিয়াছেন। কাজেই আলবানিয়ায় "বিশ্ব-সমস্যা।"

শিশু-জীবনের কতিপয় বিপদ ও তাহার প্রতিকার

[ডাক্তার শ্রীঅভয়কুমার সরকার এম-বি, ডি, পি, এইচ,]

১। শিশু-জীবনই জাতির অমূল্য সম্পদ; কিন্তু ভারতে প্রত্যেক ৩টী শিশুর মধ্যে একটী শিশু তাহার প্রথম জন্মতিথির পূর্ব্বে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। অথচ ইংলণ্ডে প্রত্যেক দশটীর মধ্যে ১টী শিশুর মৃত্যু হয়। আমরা দেশের প্রত্যেক নরনারীকে বুঝাইতে চাই যে প্রতি বৎসর ২০০০০০০ কুড়ি লক্ষের অধিক শিশু-বলি হইতেছে!

প্রশ্ন :—ইহার কারণ কি?

উত্তর :—ভারতে অধিকাংশ শিশু তাহাদের পিতামাতার ও আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞতার জন্য জীবন হারায়।

প্রশ্ন :—ভারতে প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে মায়েরা কি করিয়া থাকেন?

উত্তর :—দুর্ভাগ্য বশতঃ (১) তাঁহারা প্রসবগৃহের জন্য একটী অপরিষ্কার অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর কুড়ে ঘরের আশ্রয় লন। ফলে প্রসূতি ও নবজাত শিশু অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং উভয়ের মৃত্যুর কারণ হয়।

(২) মাতারা গুরুতর পরিশ্রম সহকারে গৃহকার্য্য করিয়া থাকেন, ফলে গর্ভস্রাব ও সন্তান বিকৃতভাবে জরায়ুর মধ্যে অবস্থান করায় প্রসব কালে উভয়ের প্রাণ নষ্ট হয়।

(৩) তাঁহারা যাহা ইচ্ছা খান; ফলে পেটের অসুখে চিররুগ্ন হন এবং পরোক্ষভাবে গর্ভস্থ শিশুর অমঙ্গল আনয়ন করেন।

(৪) তাঁহারা প্রসবের পূর্ব্বে নিজের জন্য কিম্বা শিশুর জন্য কোন জামা কাপড় বা বিছানা তৈয়ার করেন না। এ কারণ প্রসব সময়ে উপযুক্ত ধাত্রী বা চিকিৎসকের উপদেশ মত চলিতে পারেন না। যে সে বস্ত্র পরিয়া রোগ ডাকিয়া আনেন।

(৫) তাঁহারা অশিক্ষিত ধাত্রীর সাহায্য লন। ধাত্রীগণ ময়লা কাপড়ে ময়লা হাতে ও অপরিষ্কার ভাবে প্রসব দ্বারে হস্তস্পর্শ করায় নানা প্রকার উৎকট ব্যাধি উৎপাদন করে। এইরূপে ধনুষ্টঙ্কার (পেঁচোয় পাওয়া) এবং রক্তদুষ্টি হওয়ায় শিশু ও মাতার মৃত্যু হয়।

শিশুর মৃত্যুর হার।

দেশবাসী দিন দিন যেরূপ স্বাস্থ্যহীন হইতেছেন তাহা দেখিলে বড়ই নিরাশ হইতে হয়। ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়া একমাত্র বঙ্গদেশের মৃত্যুর হিসাব দেখিলেই এ বিষয় সম্যক উপলব্ধি হয়। বাঙ্গালা দেশে যত লোক জন্মায় তাহার মধ্যে কতগুলি কত বয়সে মরে তাহার বিষয় নিম্নে দেওয়া গেল :—

১০০০ একহাজার শিশু জন্মিলে এক মাসের মধ্যে মৃত্যু ৮৭টি

১ মাস হইতে ৬ মাস মধ্যে—	৪৭টী
৬ ,, ১২ ,,	৫টী
১ বৎসরে মোট—	১৮৭টী
১ হইতে ৫ বৎসর মধ্যে—	১৩০টী
৫ ,, ১০ বৎসর মধ্যে—	৮৪টী
১০ ,, ১৫ বৎসর মধ্যে—	৪৮টী
১৫ ,, ২০ বৎসর মধ্যে—	৫২টী

২০ বৎসরের মধ্যে মোট ৫১১টী।

২০ হইতে ৩০ বৎসর মধ্যে	১২২টী
৩০ ,, ৪০ বৎসর মধ্যে—	১০১টী
৪০ ,, ৫০ বৎসর মধ্যে—	৮৮টী
৫০ ,, ৬০ বৎসর মধ্যে—	৭৫টী
৬০ বৎসরের বেশী বয়সে—	১০৪টী

মোট ৭০ বৎসরের মধ্যে ১০০০টীর মৃত্যু হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে প্রতি বৎসরে পাঁচভাগের এক ভাগ লোক জন্মের সঙ্গেই মরিতেছে।

ফরিদপুর জেলায় ১০০ শিশুর ভিতর ২৩টীর ১ বৎসরের ভিতর মৃত্যু হয়। প্রতিদিন ১৮৮টী শিশু জন্মে প্রতি ঘণ্টায় ৮টী মাত্র (পূর্ব্ববঙ্গের সকল জেলা অপেক্ষা গড়ে ২ জন ক'রে কম) প্রতিদিন ৩৭টীর মৃত্যু হয়।

শিশু-মৃত্যু নিবারণের উপায়।

দেশকে ধনে জনে উন্নত করিতে হইলে স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য রাখা উচিত। দেশের কর্ম্মশক্তি বাড়াইতে

হইলে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শিশুর মৃত্যু নিবারণ করিতে হইবে। এ কার্য্যে শিক্ষিত মাতাদের উপরেই বেশী নির্ভর করে। তাঁহারা নিম্নলিখিত উপদেশগুলি নিজের ও সন্তানের মঙ্গলের জন্য পালন করিবেন।

(১) শিশুরক্ষা কল্পে স্থিরসংকল্প হউন।

(২) আপনার বাসগৃহকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করুন।

(৩) গৃহের ময়লা ধূলা আবর্জ্জনা পুড়াইয়া ফেলুন।

(৪ মশা মাছি ধ্বংস করুন।

(৫) দিবারাত্র বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করুন।

(৬) নির্দ্দিষ্ট সময় সুসিদ্ধ পুষ্টিকর আহার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

(৭) যথা প্রয়োজন সুনিদ্রার ব্যবস্থা করুন।

(৮) বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করুন।

(৯) সুতিকাগার শাস্ত্রানুযায়ী স্বাস্থ্যকর করুন। যে ঘরে দেবশিশু জন্মগ্রহণ করিরে তাহা দেব মন্দিরের মত খটখটে আলো বাতাস লাগে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এরূপ ভাবে প্রস্তুত করুন।

(১০) অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক গুরুভার বহন করিবেন না। জলের কলসী কক্ষে লইবেন না। ছবি টানাইবেন না। কারণ পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(১১) এমন খাদ্য খাইবেন না, যাহাতে পেটের অসুখ অথবা উত্তেজনা আনিতে পারে।

(১২) প্রসবের পূর্ব্বে যথানিয়মে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় ও বিছানার বন্দোবস্ত করিবেন।

(১৩) শিক্ষিত ধাই না পাইলে কাহাকেও প্রসব দ্বার স্পর্শ করিতে দিবেন না। উহাতে প্রসূতির আসন্ন বিপদ ঘটিতে পারে। শিশুরও অমঙ্গলের বিশেষ সম্ভাবনা। গ্রাম্য ধাইদের নিজেরা উপদেশ দিয়া যথাসাধ্য শিক্ষিতা করিয়া লইবেন।

(১৪) বাল্য বিবাহ নিবারণ করিতে হইবে। অধিকাংশ ভারত-রমণী অতি অল্প বয়সে সন্তানের জননী হন। কাজেই তাঁহারা প্রকৃত মাতৃত্বের কর্ত্তব্যগুলি যথারীতি শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পান না।

এই কারণ দুর্ব্বল শিশু জন্মগ্রহণ করে, এবং অপরিণীতা বয়স্কা মাতা দুরারোগ্য জরায়ুর পীড়ায় ভুগিতে থাকেন। সন্তান ও মাতা উভয়েই অল্পায়ু হন।

শিশুর জীবনের কতিপয় বিপদ।

গ্রীষ্মের সময় শিশুকে সুস্থ রাখা সম্বন্ধে মাতার প্রতি উপদেশ।

(১) **খাওয়ান** :—প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে শিশু খেলা করিতে থাকিবে, ইহাই সুস্থ শিশুর লক্ষণ। এই শিশুকে প্রথমেই স্তনদান করিতে হইবে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে স্তনদুগ্ধ বিকৃত হয় বা অভাব হয়, তাহা হইলে, যে পাত্রে উহাকে গরুর বা ছাগীর দুগ্ধ খাওয়ান হইবে, তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। যদি বোতলে দুগ্ধ খাওয়ান হয়, তবে বোতল ও রবারের নলটী বা মুখটী গরম জলে ফুটাইয়া লওয়া উচিত। অন্যথায় নানাপ্রকার রোগ বীজাণু শিশুর পেটে প্রবেশ করিয়া অনর্থ ঘটাইবে।

দুগ্ধ যেন খাঁটী টাটকা হয়। বাসিদুগ্ধে যে সকল বীজাণু জন্মে তাহা অতি ভীষণ রোগের কারণ হয়। দুগ্ধ যেন ভাল করিয়া ঢাকা থাকে। খাওয়ানের আগে খানিকটা ঠাণ্ডা ফুটান জল শিশুকে দিতে হইবে। শিশু ক্ষুধা ছাড়াও বরং জলতেষ্টায় বেশী কাঁদে। এই সকল নিয়ম পালন করিলে শিশুর পেটের অসুখ হইবে না।

(২) **পোষাক পরিচ্ছদ** :—শিশুর পোষাক ঠাণ্ডা ও সাধাসিধা হওয়া দরকার। গ্রীষ্মকালে মাত্র একটী নেংটী বা জাঙ্গীয়া সেফটীপিন দিয়া বা সুতা দিয়া বাঁধিয়া দিবেন এবং একটী পাতলা ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দিলেই চলিবে। শিশুর জামা কাপড় সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবেন। প্রস্রাব বা বাহ্যের দ্বারা অপরিষ্কৃত কাপড় গরমজলে কাচিতে হইবে।

(৩) **স্নান** :—দশদিন পর হইতেই শিশুকে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া টবে ডুবাইয়া ভাল করিয়া স্নান করাইবেন। শরীর অসুস্থ হইলে স্নান করাইবেন না। খাওয়ার আগেই স্নান করাইবেন। প্রতিদিন ঠিক সময়েই স্নান করাইবেন। গ্রীষ্মকালে ইহা ছাড়া একবার বা দুবার ভিজা গামছা দিয়া গা পুছাইয়া দেওয়া ভাল।

(৪) **নিদ্রা** :—শিশুর ঘুম বেশী হওয়া দরকার। উহাদের নিকট গোলমাল করিয়া ঘুম ভাঙ্গান উচিত নয়। খুব ছোট শিশুকে নাড়াচাড়া করা ভাল নয়। যতটা

খোলা হাওয়ায় শরীর ঢাকিয়া ঘুমাইতে দেওয়া হয় তাহাই ভাল। গায়ে যেন মশা-মাছি না বসিতে পারে। কান্না কমাইবার জন্য চুষিকাঠি চুষিতে দেওয়া অত্যন্ত অপকারী, উহাতে নানাপ্রকার বীজাণু শিশুর মুখে ঢুকিতে পারে।

(৫) **পেটের অসুখ** :—খাদ্য খারাপ হওয়ায় পেটের অসুখ হয়। এ বিষয়ে খুব সাবধানে থাকিবেন। ময়লার রং যদি সবুজ হয় তৎক্ষণাৎ ডাক্তার দেখাইবেন। প্রথমেই সব খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া কেবল গরম জল খাওয়াইবেন।

(৬) **বমি** :—অতিরিক্ত খাওয়ান,তাড়াতাড়ি খাওয়ান, কিংবা খারাপ খাবার জন্য অথবা অতিরিক্ত নাড়াচাড়া করায় বমি হইতে পারে। এ সব বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৭) **পায়খানা হওয়া** :—২৪ ঘণ্টায় একবার হইতে তিনবার হইতে পারে। বাহ্যের রং যদি হলদে হয় এবং কোন প্রকার হড়হড়ে পুঁজ অথবা দৈয়ের মত দেখিলে বুঝিবেন শিশুর খাওয়ানোর কোন প্রকার দোষ আছে। এরূপাবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

(৮) **খাবার তৈয়ারী করা** :—খুব সাবধানতা অবলম্বন করে হাত ভাল করিয়া ধৌত করিয়া শিশুর খাবার প্রস্তুত করিবেন। মশা মাছি বসিতে না পারে।

(৯) অসুখ হইলে প্রথমেই ডাক্তার ডাকা ভাল, নচেৎ রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে।

শিশুর জন্মের পূর্ব্বে মাতাপিতার কর্ত্তব্য।

(১) মাতাপিতার স্বাস্থ্য যেন কোনও কারণে অসুস্থ না হয়, তবেই সুস্থকায় সন্তান জন্মিবে। কাহারও প্রমেহ (Gonorrhoea) অথবা উপদংশ (Syphilis) রোগ থাকিলে, উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

(২) মাতার শরীর ভাল থাকিলে শিশু স্তনদুগ্ধ ভাল-রূপে পাইবে, তবেই শিশু বলবান হইবে।

(৩) শিশুর জন্মের পূর্ব্বে মায়ের শরীর অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত। ডাক্তারের ফি দিতে না পারিলে শিশু স্বাস্থ্য-সমিতির অথবা স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার-দের উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

(৪) যে ঘরে দেব শিশু জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা খটখটে আলো বাতাস লাগে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেব মন্দিরের মত যত্ন ক'রে প্রস্তুত করিতে হইবে। অস্বাস্থ্যকর স্যাতসেতে স্থান এবং বায়ু চলাচল করার অসুবিধা হইলে, শিশুর অমঙ্গল ঘটিবে।

(৫) যে ধাই প্রসবগৃহে ঢুকিবে, তাহার কাপড় ছাড়িয়া পরিষ্কার ধৌত কাপড় পরিয়া নখ কাটিয়া এবং ভাল করিয়া সাবান জল এবং বিশোধন দ্রব্যের জলে হস্ত ধৌত করিয়া প্রসূতিকে স্পর্শ করিতে দিবে। অপর কেহ যেন অপরিষ্কৃত ভাবে ছোঁয়াচে রোগের সংক্রামক করিতে না পারে তৎপ্রতি সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

৪। **শিশুর যত্ন** :—(১) শিক্ষিত ধাই না পাইলে কাহাকে প্রসবদ্বার স্পর্শ করিতে দিবেন না। উহাতে প্রসূতির আসন্ন বিপদ হইতে পারে। ধনুষ্টঙ্কার (Tetanas) এবং রক্তদুষ্টি (Sepsis) রোগে জীবন নষ্ট হইবার বিশেষ আশঙ্কা এবং শিশুরও নানাপ্রকার অমঙ্গল হতে পারে।

(২) শিক্ষিতা ধাত্রি প্রসবকালে প্রসূতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিশুর গলায় নাড়ী জড়ান থাকিলে শিশুর তখনই মৃত্যু হইতে পারে মনে করিয়া, উহা ছাড়াইয়া দিবে।

(৩) শিশু ভূমিষ্ট হইলে, উহার শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিতভাবে না চলিলে, তাহাকে নিয়মিত ক্রিয়া দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবে।

(৪) পরে কাইচী ও সূতা জলে ফুটাইয়া লইয়া সূতা দ্বারা নাড়ী বাঁধিয়া ঐ কাইচী দ্বারা নাড়ী কাটিবে, কারণ অপরিষ্কৃত সূতা ও বাশের নেইলদ্বারা নাড়ী কাটিলে ধনুষ্টঙ্কার (Tetenas) রোগে শিশুর অনতিবিলম্বে জীবন শেষ হইবে।

(৫) শিশুর জন্মের প্রথম এক বৎসর শিশু বেশীর ভাগই স্তন্য দুগ্ধ খাইবে। একথা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। মাতার নিজের দুগ্ধ খাওয়াইলে, শিশুকে মানুষ করা হয়, তাহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয় এবং সেই সন্তানই দীর্ঘায়ু হয়। যাহাতে নিজের শরীর সুস্থ থাকে তৎপ্রতি উদাসীন থাকিলে শিশুকে স্তন্য দুগ্ধ দিতে পারিবেন না এবং শিশুও অল্পায়ু হইবে। যদি ইহা অসম্ভব হয়, কতক অংশ স্তন্য দুগ্ধ এবং গো দুগ্ধ চিকিৎসকের উপদেশ মত ব্যবহার করিবেন। শিশুকে নিয়মিতভাবে খাওয়াইবেন।

"স্বাস্থ্য ও শক্তি"

ভুলের পরিণাম

[শ্রীহরিপদ গুহ]

উঃ! কী যন্ত্রণা। সমস্ত শরীর জলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেল! আর যে সহ্য হয় না। কবে এ পাপ জীবনের অবসান হবে, ওগো, তোমরা কেউ তা বলতে পার কি?

আজ আমার জীবনের পাপ-কাহিনী বলতে বসেছি। তোমরা কেউ দুঃখ করো না, বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখিও না। যদি পার ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিও, পদাঘাতে দূরে সরিয়ে দিও, তা হলে হয় তো আমার পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হবে!

মুহূর্ত্তের ভুলে, পলের লালসায় আজ আমার এ সর্ব্বনাশ;—আমি পতিতা, কুলটা, কলঙ্কিনী! পথে পথে ঘুরে বেড়াই, আস্তাকুঁড়ের ভাত কুড়িয়ে খাই, গঙ্গাযাত্রীর ঘরে পড়ে রাত কাটাই! তুষানলে যে আমার সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে!

হ্যাঁ, আমারও একদিন পরিচয় ছিল। ভাল গৃহস্থ ঘরেরই আমি বউ ছিলুম। পাপ মুখে আর শ্বশুর—স্বামীর নাম করব না! হায়! স্বামী আমায় কী ভালই না বাসতেন! আর আমি... না থাক্! আমার জন্য তিনি লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে দেশত্যাগী হয়েছেন! শুনেছি, খুব দূরদেশে তিনি এখন অজ্ঞাতবাসে আছেন!

—উঃ! কী যন্ত্রণা! সে স্বাস্থ্য গেছে, সে রূপ-যৌবন, তার মাদকতা পুড়ে ছাই হয়েছে! কিন্তু, তাঁর সে আদর, সে ভালবাসা, সে প্রেম প্রতিনিয়ত আমার মনে পড়ে আমার প্রাণ কী বিষের জ্বালায় না জ্বালিয়ে তুলছে! তিনি দেবতা, আর আমি পিশাচী! নরকেও কি আমার স্থান আছে?

কেমন করে কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, আজও তা বুঝতে পারছি না! যেন কোন্ সম্মোহিনী শক্তি আমায় সবলে পাপের পথে টেনে নামিয়ে দিলে। লুপ্তজ্ঞান যখন ফিরে এল, তখন বুঝলুম,—আমি বিশ্বের বর্জ্জিতা, অভিশাপ, হাহাকার!

একদিন স্বামী কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গেলেন। যাবার সময় আমার ও শাশুড়ীর ভার তাঁর কোন এক কপট বন্ধুর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

সে শয়তান প্রত্যহই আমাদের বাড়ী আসত। আমাকে প্রণয়-রূপ মধু বিষের কথা শোনাত, কত প্রলোভন দেখাত, ভাল ভাল জিনিষও এনে দিতে কসুর করত না। মনে হতো যে শাশুড়ীকে এসব জানাই, কিন্তু কোনদিন সাহসে কুলোয় নি!

তার কথায় কি শক্তি ছিল জানি না, আমি সাপিণী সেই মন্ত্রে একেবারে আচ্ছন্ন, মুগ্ধ হয়ে পড়লুম!

তারপর একদিন নিজেরই বিষে নিজে জর্জ্জরিত হয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলুম। কী ভীষণ সে রাত্রি। উঃ! ..

কালীমাখা মুখে যেদিন জানতে পারলুম,—আমি সন্তান-সম্ভাবিতা, সেদিন সে পাষণ্ড কুকুর আমায় ফেলে পালিয়ে গেল! আমি নিরুপায় হয়ে লজ্জা নিবারণের জন্য ভ্রূণহত্যা করতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করলুম না! ...

মনে করলুম,—পাপ বুঝি ধুয়ে মুছে গেল। কিন্তু, তা ত আমার হলো না! আমার অধঃপতনের কথা, আমার সব সাবধানতার ফাঁক দিয়ে পূর্ব্বেই প্রচার হয়ে পড়েছিল। এ কথাও গোপন রইল না।

সর্ব্বত্রই আমার সম্বন্ধে আলোচনা হতে লাগল। আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে একদিন নিশীথে গোপনে বাড়ীর বার হয়ে পড়লুম।

তারপর সকলের যা হয়, আমারও তাই হলো। আমোদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম। বহু অর্থ উপার্জ্জন করলুম। বছর কয়েক কাটলও বেশ! সুখে বলতে পারি না; কারণ, যেদিন এ পথে পা বাড়িয়েছি, সেদিন থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখের মুখ দেখি নি! অন্তরে বিষের বাতি জ্বলছে, আর মুখে দিব্য হাসছি, গান গাইছি! নিয়তির

একি নিষ্ঠুর পরিহাস! কি করব বল? এযে আমাদের ব্যবসা। এ না হলে টাকা দেবে কেন?

এ ভাবেও বেশীদিন কাটাতে পারলুম না। ক্রমে ক্রমে বিষাক্ত ক্ষত আমার সর্ব্বশরীর ছেয়ে ফেল্‌লে। ভাল ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা করায় দিনকতকের জন্ম এ ব্যাধি গোপন রইল বটে, কিন্তু কিছুদিনের পর আবার আমার সর্ব্বাঙ্গে সেই ঘৃণ্য ক্ষত দেখা দিলে। গা দিয়ে টস্‌টস্‌ করে রস গড়িয়ে পড়তে লাগল। তীব্র দুর্গন্ধে জীবনের ওপর নিজেরই ঘৃণা জন্মে গেল।

মধুপেরা আমায় ত্যাগ করে পালাল। যা কিছু সম্বল ছিল, কোথা দিয়ে যে কর্পূরের মত উড়ে গেল, তা জানতেও পারলুম না! ভাড়া বাকী পড়ায় বাড়াওয়ালী একদিন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে! হায় রে নারীর জীবন। হায় রে তার ..

সেই থেকে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াই। লোকে আমায় পাগলী বলে উপহাস করে, ছেলেরা গায়ে ধূলো দেয়। হা ঈশ্বর। তোমার দেওয়া শাস্তি যে আর সহ্য করতে পারছি না প্রভু! উঃ! বড় যন্ত্রণা। আমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে, শেষ কবে কে জানে? ভগবান! কতদিন আর! আর কতদিন আমি এ পাপের বোঝা……

শেষ

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ী।

যদুপতি নারিকেল বিক্রয় করিয়া পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাটী ফিরিয়াছে। সেবার নারিকেল বিক্রয়ে তাহার প্রভূত লাভ হইয়াছিল। হইবারই কথা;—আমাদের মহা উপদেষ্টাগণ ভ্রান্ত হইতে পারেন না; তাঁহারা সেই পূরাকালে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এখনও তাহা ভগবৎ বাক্যের ন্যায়ই সত্য। তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।'

আমরা গোলাম ভাবাপন্ন হইয়া, চাকুরী চাকুরী করিয়া, সেই মহা উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি, আবার কি কখনও চাকুরীজীবী বাঙ্গালী দৈহিক ও নৈতিক বল সঞ্চয় করিয়া, সেই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবে? আবার কি কখনও এই সোণার বাঙ্গলা দেশ, বাঙ্গালীরই বাণিজ্য স্থান হইবে? পরভোগ্য ঐশ্বর্য্যদেবী আবার কি কখনও বাঙ্গালীর প্রতি কৃপা করিয়া, তাহার প্রতি কৃপানেত্রে চাহিবেন? ভগবান! সেই পবিত্র ও সুখময় দৃশ্য দেখিবার আশায়, এই বৃদ্ধ ও অধম লেখক যেন আরও কিছুদিন জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়।

কল্যাণী স্বামীকে আবার বাটীতে সমাগত দেখিয়া, প্রভাত প্রসূনের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; শিশু পুত্রকে কোলে লইয়া স্বামীর নিকট সংবাদ শুনিতে আসিল।

প্রায় একমাস পরে সুমুখী পত্নীকে সম্মুখে পাইয়া যদুপতি একটা চুম্বনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কহিল, 'দাঁড়াও, আগে তোমার একটা চুমো খেয়ে নি। তারপর আমার ঠোঁট দু'টাকে মিষ্টি করে নিয়ে তোমার সঙ্গে মিষ্টি কথা ক'ব।'

কল্যাণী। তুমি জান না, তোমার কথা যে স্বামীর কথা; তাতে সব সময় মধু ঢালা আছে; তুমি ধমক দিলেও আমার মিষ্টি লাগবে। আর মিষ্টি করে নেবার দরকার নেই।

যদুপতি। কিন্তু তোমার চুমো না খেয়ে যে আমি থাকতে পারব না, কল্যাণ্।

কল্যাণী। কেন বল দেখি।

যদুপতি। জানি না; বোধ হয় তোমায় ভালবাসি বলে!

কল্যাণী। এখন ছেলের বাপ হ'য়েছ; এখন কি ওসব ছেলে মানুষী করতে আছে? এই ছেলে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে; এখন কি ক'রে আমার মুখে চুমো খাবে বল দেখি?

যদুপতি। তা' আমি খুব পারব। তোমার মুখে খাব, আর তোমার এই কালো ছেলের মুখেও খাব।

কল্যাণী। তুমি ওকে কেন কালো বললে? ও তোমাকে ওর মুখে চুমো খেতে দেবে কেন?

যদুপতি। তবে তুমি কি করে ওর কাল বাপের মুখে…

কল্যাণী। ছি, ছি, তুমি ওসব কি যে বল, তার কিছুই ঠিকানা নেই! তা' ছাড়া, তোমায় কে বল্লে যে তুমি কাল। আমি ত তোমায় একটুও কাল দেখিনে। কতবার মনে মনে ভেবে দেখেছি তুমি যদি আরও ফর্সা হ'তে, তোমাকে একটুও মানাত না।

এই সুমিষ্ট কথাগুলি বলিবার সময়, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বোধ হয় কল্যাণী একটু অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছিল, এবং সে এমন প্রেমপূর্ণ নয়নে স্বামীর দিকে নেত্রপাত করিয়াছিল, যে তাহারই নেত্রকিরণে তাহার কপোলদেশ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে অসতর্ক পাইয়া, এবং তাহার কপোলদেশে সেই আনন্দদায়ক আলোক দেখিয়া, ভ্রমর যেমন 'অরুণরাগ-রঞ্জিত তামরসের দিকে ধাবিত হয়, লোভী যদুপতি তেমনই পত্নীর লোভনীয় সেই কপোলের দিকে ধাবিত হইল; এবং মুগ্ধা কল্যাণী সাবধান হইবার পূর্ব্বেই, তাহাতে যে অপার্থিব মধু লুকাইত ছিল, আগ্রহভরে সে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিল। ছি, ছি, দুষ্ট যদুপতি কি নষ্ট-বুদ্ধি?

না জানি কল্যাণী নষ্ট স্বামীর এই দুষ্ট আদরে কত মনোকষ্ট পাইয়াছিল। সে রোষরক্ত (আমাদিগের সন্দেহ হয়, উহা প্রেমরঞ্জিত) কপোলে, সেই দুষ্ট স্বামীকে কহিল,—'যাও।'

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নির্ব্বুদ্ধি যদুপতি পত্নীর 'যাও' কথার অর্থ বুঝিল না। সে এই 'যাও' কথাটার অর্থ আহ্বান বুঝিল। কারণ সে চলিয়া ত গেলই না, অধিকন্তু কক্ষতলে নিজে বসিয়া, স্ত্রীকে সভ্য জগতের নিয়ম বিরুদ্ধভাবে নিকটে বসাইয়া, আবার তাহার মুখচুম্বন করিল; এবং হৃষ্টচিত্তে, পশ্চমাঞ্চলের ভ্রমণকাহিনী প্রিয়তমাকে শুনাইতে লাগল।

সেই মধুর গল্প শুনিতে শুনিতে কল্যাণী মুগ্ধনেত্রে স্বামীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, 'হ্যাগা এবার আমাদের মোট কত টাকা লাভ হ'ল?

যদুপতি বলিল, এবার আমরা বাড়ী থেকে ধার করতে পেরেছিলাম, মোট ত্রিশ হাজার; আর আজ আমি নিয়ে এসেছি পঞ্চান্ন হাজার টাকা।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহ'লে আমাদের পঁচিশহাজার টাকা লাভ হ'য়েছে।'

যদুপতি বলিল, 'কিন্তু তুমি পরের পাওনার কথা ভুলে গেছ কল্যাণ্। আমার যে নারিকেলের দাম দশহাজার টাকা বাকী আছে। এই দশহাজার টাকা দিলে, আমাদের প্রায় পনের হাজার টাকা লাভ দাঁড়াবে।

কল্যাণী। তুমি এত টাকায় কি করবে?

যদুপতি। এই টাকা থেকে দশহাজার টাকা নিয়ে, মনে করেছি, কিছু করগেট টিন কলকাতা থেকে আনিয়ে একটা পাটের গুদাম তৈরী করাব। আর মনে করেছি, বাকী টাকা দিয়ে নূতন ফসল হ'লে, পাটনা অঞ্চল থেকে কিছু ছোলা অড়হর আমদানি করবো। আর দোকানের একটু বেশী বেশী মাল রাখব;—যখন থেকে দোকানে নগদ আর একদরে বিক্রী আরম্ভ করেছি, তখন থেকে আমার খদ্দেরও অনেক বেড়ে গেছে।

কল্যাণী। আর ঘরের ত্রিশহাজার টাকায় কি করবে?

যদুপতি। আপাততঃ হাতে মজুদ রাখব। তারপর আসছে বছর আষাঢ় মাসে পাটের চাষীদের দাদন দেবো।

কল্যাণী। তাহ'লে ত টাকাটা অনেক দিন, বিনালাভে ফেলে রাখতে হ'বে।

যদুপতি। তা' আর কি করবো?

কল্যাণী। দেখ, একটা কাজ করলে হয় না? আমাদের এই সিরাজগঞ্জে একজনও গুড়ের বড় কারবারী নেই। তুমি কেন ঐ টাকাটা নিয়ে একবার গুড়ের কারবার করে দেখ না।

যদুপতি। তুমি ঠিক বলেছ কল্যাণ্। এই ক'টা মাস গুড়ের কারবার করতে পারলে টাকাটাও বসে থাকে না, আমাকেও মিছিমিছি ঘরে বসে সময় কাটাতে হয় না। আর এ ব্যবসাতে বেশ একটু মোটা রকম লাভ হইবারই সম্ভব আছে।

ইহার পর যদুপতি কয়েকদিন বাড়ীতে একটু বিশ্রাম করিয়া লইল; এবং দোকানের হিসাব পত্র দেখিল; এবং আবশ্যক বুঝিয়া আরও একজন গোমস্তা ও একজন কাওয়াল নিযুক্ত করিল।

পরে উদ্যোগী যদুপতি মহা উৎসাহে খেজুর গুড়ের ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। পাবনা, যশোহর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া, এবং কয়েকজন গুড় ব্যবসায়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া, সে বহু পরিমাণ খেজুর গুড় অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ক্রয় করিল। তাহা বাজারের দর বুঝিয়া হুগলী, নৈহাটী, চন্দননগর, কাঁকনাড়া, শ্রীরামপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে চালান দিল। ঐ ঐ স্থল 'কল' বহুল হওয়ায়, বহুতর শ্রমোপজীবী লোক ঐ সকল স্থানে বাস করে। ঐ সকল লোককে বিক্রয় করিবার জন্য, তৎতৎ স্থানের দোকানদারগণ যদুপতির গুড় উচ্চমূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিল। বলা বাহুল্য, তাহাতে তাহার প্রচুর অর্থ লাভ হইল।

কিন্তু ইহাকেও তোমরা দৈব বলিও না। ইহা পুরুষসিংহের অদম্য উদ্যোগ। তোমরাও 'দৈবম্ নিহত্য কুরু পৌরষমাত্মশক্ত্যা'—অর্থাৎ দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া, আত্মশক্তির উপর নির্ভর কর, তোমরাও পুরুষসিংহ হইতে পারিবে; লক্ষ্মী তোমাদের অঙ্কগতা হইবে! তোমাদের শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে। কেন তোমরা উদ্যোগ করিয়া পুরুষসিংহ হইতে পারিবে না। শাস্ত্র বাক্য ত মিথ্যা নয়।—

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥"

(ক্রমশঃ)

সুশীলাবালা

[৺যতীন্দ্রনাথ পাল]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৩১২ সালের প্রথমেই ষ্টার থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ নাটক মহা সমারোহে অভিনীত হয়। রাণাপ্রতাপ প্রথম যে রাত্রিতে অভিনয় হয় সেই রাত্রে কি কারণ লইয়া ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের একটু মনান্তর হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল মহেন্দ্র বাবুকে তাঁহার থিয়েটারে রাণাপ্রতাপ নাটকখানি অভিনয় করিতে অনুরোধ করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরোধে মহেন্দ্র বাবু রাণাপ্রতাপ নাটক তাঁহার থিয়েটারে অভিনয় করিতে স্বীকৃত হন ও কেবলমাত্র এক সপ্তাহের মহলায় রাণা প্রতাপ নাটকখানি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই নাটকে শ্রীমতী সুশীলাকে মেহের-উন্নিসার ভূমিকা প্রদান করা হইয়াছিল। ষ্টারে এই ভূমিকাটী বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী নরীসুন্দরী অভিনয় করিতেছিলেন কিন্তু কেবলমাত্র এক সপ্তাহের মহলায় শ্রীমতী সুশীলার অভিনয় তাহা অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। মেহের উন্নিসা ভূমিকার অভিনয় কত সুন্দর ও কত স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা যাঁন না দেখিয়াছেন তাহাকে বুঝান কঠিন, এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে—যে "বসিয়া বিজন বনে" এই প্রথম গানেই তিনি দর্শকগণকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিনয় যিনি দেখিয়াছিলেন তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছিল,—"এমন স্বাভাবিক অভিনয় বহুদিন আমরা দেখি নাই।"

ইহার পর উপর্য্যুপরি দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকখানি নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস নাটকে, রাজিয়া, মেবার পতনে মানসী, সাজাহানে পিয়ারার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সজীব অভিনয়ে চিরস্থায়ী একটা কীর্ত্তি স্থাপন করেন। এই সময় ৺অতুলকৃষ্ণ মিত্রের কয়েকখানি গীতি-নাট্য মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই সকল গীতি-নাট্যেও শ্রীমতী সুশীলা কয়েকটী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকগণকে কৌতুক অভিনয়ে মাতাইয়া তুলে। তাহার ভিতর দুইটী ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শিরি-ফরহাদ গীতি নাট্যে শ্রীমতী সুশীলা গুলালের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন,—এই ভূমিকাটী তিনি এত সুন্দর অভিনয় করিয়া গিয়াছেন যে তাহার পর এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কোন অভিনেত্রীই জমাইতে পারে নাই! ৺অতুল মিত্রের লুলিয়া নামক গীতি-নাট্যে শ্রীমতী সুশীলা লুলিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভূমিকাটীও তাঁহার দ্বারা এত সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল,—তাহাও আর অন্য কোন অভিনেত্রীর দ্বারা তেমনটী হইবার সম্ভাবনা নাই।

গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে ও ৺মহেন্দ্রকুমার মিত্রের পরিচালনায় যখন মিনার্ভা যশের শ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহন করে সেই সময় মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর নাটক তাহাদের থিয়েটারে অভিনয় করিবেন স্থির করেন। চন্দ্রশেখরে শ্রীমতী সুশীলাকে দলনীর ভূমিকা প্রদান করা হয়। এই ভূমিকাটী ষ্টার থিয়েটারে শ্রীমতী নরীসুন্দরী অভিনয় করিয়া একেবারে জাগাইয়া দিয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যখন দলনীর ভূমিকাটী সুশীলাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন,—তখন সুশীলা এই ভূমিকাটী গ্রহণ করিতে প্রথমে অস্বীকার হইয়াছিলেন কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের জেদাজেদিতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এই ভূমিকাটী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কেমন করিয়া দর্শকের প্রশংসা লাভ করিতে পারিব শ্রীমতী সুশীলার তাহাই হইয়াছিল একমাত্র চিন্তা। তিনি গ্রামফোনের রেকর্ড আনাইয়া বাড়ীতে দলনীর গানগুলি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন ও যতদূর সম্ভব সেই সুরে সেইভাবে আয়ত্ত করিবার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যেদিন চন্দ্রশেখরের প্রথম অভিনয় হয় সেদিন অনেকেই দলনীর ভূমিকা শ্রীমতী সুশীলা কিরূপ অভিনয় করেন সেইটুকুই দেখিবার জন্যই বিশেষ ভাবে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে চন্দ্রশেখরের প্রথম অভিনয় রজনী– রঙ্গালয় দর্শকে পরিপূর্ণ। শ্রীমতী সুশীলা নটনাথের নাম স্মরণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হইলেন,—চারিদিক হইতে দর্শকগণের সমবেত করতালি পড়িতে লাগিল। দর্শকগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সেদিন শ্রীমতী সুশীলা দলনীর ভূমিকা এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে দর্শকের উচ্চপ্রশংসা ধ্বনিতে সমস্ত রঙ্গালয় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী সুশীলা মিনার্ভা থিয়েটার হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া এবং বহুকাল পর্য্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারেই অভিনয় করিয়াছিলেন, — শেষ যখন অমরেন্দ্র নাথ পুরাতন ন্যাসান্যাল থিয়েটারের বাড়ী আগা-গোড়া সংস্কার করিয়া লইয়া গ্রেট্ ন্যাসান্যাল থিয়েটারের উদ্বোধন করেন সেই সময় শ্রীমতী সুশীলা মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া অমরেন্দ্র নাথের অনুরোধে গ্রেট্ ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যোগদান করেন। গ্রেট্ ন্যাসান্যাল থিয়েটারে শ্রীমতী সুশীলা অমরেন্দ্র নাথের "জীবনে মরনে" ও বাজিরাও নাটকে দুইটী ভূমিকা গ্রহণ করে। জীবনে মরণে নাটকে তিনি তাহেরের ভূমিকা লইয়া থিয়েটারের উদ্বোধন রাত্রে দর্শক মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হন ও প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে বাজিরাও নাটক এই থিয়েটারে অভিনীত হয়—এই নাটকে তিনি গৌতমার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, গ্রেট্ ন্যাসান্যাল থিয়েটার অমরেন্দ্র নাথ কেবলমাত্র নয় মাস কাল চালাইয়া ছিলেন। তাহার পর তিনি ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। শ্রীমতী সুশীলাও ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিয়া শ্রীমতী সুশীলা সৎসঙ্গ, জীবনসন্ধ্যা, জীবন সংগ্রাম, পরপারে, খাসদখল, রাজসিংহ প্রভৃতি নাটকের প্রধান প্রধান স্ত্রীচরিত্র গুলি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করেন। এই নাটকগুলির ভিতর খাসদখল নাটকে গিরিবালার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী সুশীলা এই গিরিবালার ভূমিকাটী এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে তাহার প্রশংসায় সমস্ত বঙ্গদেশ ভরিয়া গিয়াছিল।

"ওগো তোমরা বল নাকো

ভাতার কেমন মিষ্টি।"

এই গানখানি তিনি এত সুন্দর গাহিয়াছিলেন যে তাহা যে শুনিয়াছিল তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। শ্রীমতী সুশীলার পর বহু অভিনেত্রীকেই আমরা এই গিরিবালার ভূমিকাটী অভিনয় করিতে দেখিলাম। বহু অভিনেত্রীর মুখেই আমরা উপরি লিখিত গানটী শুনিয়াছি কিন্তু কাহারও তেমনটী হয় নাই।

শ্রীমতী সুশীলাবালার ষ্টার থিয়েটারের অবস্থান কালে নটগুরু গিরিশচন্দ্র পরলোকে গমন করেন। ২রা আশ্বিন বুধবার থিয়েটার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অমরেন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে ষ্টার থিয়েটারের অভিনেত্রীগণ স্বর্গীয় মহাপুরুষের স্নেহ, দয়া ও পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া কয়েকটী অভিভাষণ পাঠ করে। এই সভায় শ্রীমতী সুশীলা সর্ব্ব প্রথমেই একটী অভিভাষণ পাঠ করে। আমাদের পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য তাহার কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সভাপতির আদেশে শ্রীমতী সুশীলা প্রথমেই আরম্ভ করেন,

"সমাগত সুধিবৃন্দ ও মা জননী গৃহলক্ষ্মীগণ। আজ আমাদের এ ধৃষ্টতা কেন? পতিতা আমরা সমাজবর্জ্জিতা আমরা, আমাদের এ ধৃষ্টতা দেখিয়া মনে মনে হয় তো আপনারা কতই হাসিতেছেন; সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে একটা কৈফিয়ৎ প্রদান করা যে একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা পতিতা বটে, সমাজ বর্জ্জিতা বটে—কিন্তু আমরা মানুষ। আপনারা না মনে করিতে পারেন কিন্তু সুখ দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আপনাদের ন্যায় আমাদেরও আছে আনন্দে আপনাদের মত আমাদেরও হাসি ফুটিয়া উঠে এবং দুঃখের তীব্র কসাঘাতে আপনাদের মত আমাদেরও গণ্ড অশ্রু প্রবাহে প্লাবিত হয়। আমাদের এ সমস্ত ক্ষুদ্র মানবীয় সমধিকারে বোধ হয় আপনারা কেহই আপত্তি করিবেন না। প্রিয়জন বিরহে যদি রোদনের

অধিকার থাকে, পিতৃহারা সন্তানের বুকফাটা হাহাকারে যদি দোষ না থাকে, গুরুদেবের দেহান্তরে যদি শিষ্যের শোক স্বাভাবিক হয় - তবে আমাদের ক্রন্দন—আমাদের হাহাকার আমাদের শোক দোষনীয় হইবে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, হাক ডাক করিয়া বড়াই করিয়া লোক জড় করিয়া এত শোক প্রকাশ না করিলেও চলিত। ঘরে বসিয়া যত ইচ্ছা শোক প্রকাশ করিলেও তাহাতে কাহার কিছু বলিবার থাকিত না। সেকথা সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু বিপন্নের প্রাণ সমবেদনার জন্য ব্যাকুল হয়। শোকের অশ্রুধারা সংক্রামক হইয়া কোথায়ও এক ফোঁটা অশ্রুর দেখা পাইলে প্রথমে সহস্র ধারে উথলিয়া পরক্ষণেই নিবৃত্ত হয়। বুকফাটা হাহাকার কোমল হৃদয়ের একটী মাত্র 'আহা' লইয়াই ক্ষান্ত হয় - এই জগতের নিয়ম—এই নিয়মেই জগৎ চলিতেছে। এই নিয়মেই জগৎ প্রকৃতির সহিত জড়িত। এতদিন তো আমরা এ সাহস করি নাই,—এতদিন আমাদের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস পবন ভিন্ন অন্য কেহ শোনে নাই। এতদিন তো আমাদের আঁখিফাটা আঁখি-জল অন্য কেহ দেখে নাই তবে আজ আমাদের এ সাহস কেন? আত্মীয়ের গলা ধরিয়া লোকে যেমন শান্তি পায় আমরাও আপনাদের গায়ে চক্ষের জল ফেলিয়া তদনুরূপ শান্তিলাভে এত প্রয়াসী কেন? আপনারাই আমাদিগকে সে সাহস দিয়াছেন তাই আজ আমরা এত কৃতজ্ঞ? তাই আমরা এত বিপদেও এত আনন্দিত—তাই আমরা আপনাদের চরণে প্রণত হইয়া সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ভক্তির কুসুমাঞ্জলী প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনাদের দীর্ঘশ্বাসে হলঘর কম্পিত হইয়াছিল, আপনাদের শোকাশ্রু সাগর সৃজন করিয়াছিল, যারা (বঙ্গে শীর্ষস্থানীয় বাণী ও কমলার বরপুত্রগণ) সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের শিক্ষাদাতা পিতৃস্থানীয় গুরুদেবের উদ্দেশ্যে মস্তক নত করিয়া কুসুমাঞ্জলী প্রদান করিয়াছিলেন একি আমাদের কম ভাগ্যের কথা। আমাদের দুঃখে এইরূপ সমবেদনা প্রকাশ করিয়া আপনারা আমাদিগকে যুগপৎ উন্নত, গর্ব্বিত, কৃতজ্ঞ করিয়াছেন। সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি যে এরূপ মহতী শোকসভা এ দেশে অল্পই হইয়াছে। একি আমাদের কম আহ্লাদের কথা! কম গর্ব্বের কথা) মনে বড় সাধ হইয়াছিল যে সেইদিন টাউন হলে সমাগত সুধীবৃন্দের পদরজে গড়াগড়ি দিয়া পবিত্র ও ধন্য হই। কিন্তু বাধ্য হইয়া উদ্দাম মনবেগ দমন করিতে হইল। একে বাঙ্গালীর মেয়ে তাতে সমাজ বর্জ্জিতা। আমাদের সে সুযোগ হইবে কি প্রকারে? তাই আজ আপনাদের চরণ বন্দনা করিবার সুযোগ পাইয়া হৃদয়ে কত শান্তি অনুভব করিতেছি।

(চিরদিন মনে বড় অনুতাপ হইত যে নিরুপায় হইয়া আমাদের সাহচর্য্যে ভদ্র অভিনেতাগণ আপনাদের চক্ষে কতটা ঘৃণিত হইতেন, হায় আমাদের কপাল। কিন্তু সেদিন টাউন হলে অভিনেতার আদর—অভিনেতার যশঃ—অভিনেতার সম্মান দেখিয়া আমাদের সে অনুতাপ দূর হইয়াছে। তাই আমরা আপনাদের সম্মুখে অশ্রুধারা ঢালিতে সাহসী হইয়াছি।) আমরা গুরু গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার কথা জানি না—তাঁহার পরে জগতে আর কেহ এত পুস্তক লিখিয়াছেন কি-না জানি না—তাঁহার নাটকের দোষ গুণের বিচার করিবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি আমাদের নাই। তাঁর ধর্ম্মাধর্ম্ম দোষ কখন বিচার করি নাই বা সাধ্যও নাই।

এইটুকু জানি তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। (তিনি আমাদের গুরু, পিতা, শিক্ষাদাতা—তিনি আমাদের হৃদয়ের সামান্য একটু জ্ঞানালোক দিয়াছেন। তিনি আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রমলব্ধ অর্থ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন। তিনি বঙ্গ রঙ্গালয়ে সুধাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অভাব কখন পূর্ণ হইবে না। আর তিনি আমাদের ঘৃণা না করিয়া যথাসম্ভব আদর করিয়াছেন। তাই তাঁর বিয়োগে আমরা পিতৃহারা। তাঁর জন্যে আমাদের এত হাহাকার। তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের এ ক্রন্দন। আপনারাও অনুগ্রহ করিয়া আমাদের উত্তপ্ত অবস্থার সহিত এক ফোঁটা সমবেদনাপূর্ণ অশ্রু মিলাইয়া যান অভাগিনীদের এই একমাত্র প্রার্থনা। আপনারা তাঁর স্মৃতি আমরণ রক্ষা করুন। তাঁর স্মৃতি আমরণ আমাদের অন্তরে থাকিবে—যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য থাকিবে—বাঙ্গালায় রঙ্গালয় থাকিবে—বাঙ্গালায়

বাঙ্গালী থাকিবে ততদিন গুরু গিরিশচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতি উজ্জ্বল অক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে। কালের কুঠারাঘাতে সে স্মৃতি লুপ্ত হইবার নহে।"

আমরা সংক্ষেপে শ্রীমতী সুশীলার মধ্যে প্রাতিভা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম। বঙ্গ-নাট্যশালায় আজকাল যে সকল নাটক গীতি-নাটক ও প্রহসন অভিনয় হইতেছে, তাহার অধিকাংশ পুস্তকেই শ্রীমতী সুশীলা কোন না কোন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ও অভিনয়ে বেশ একটু নূতন ছবি দেখাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সব পুস্তকেই শ্রীমতী সুশীলা একটা না একটা ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন,—যথা সীতারামে জয়ন্তী, চন্দ্রশেখরে দলনী, মৃণালিনীতে গিরিজায়া, দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা, রাজসিংহে কাঞ্চণকুমারী, কপালকুণ্ডলায় কপালকুণ্ডলা, এবং সব ভূমিকা গুলিই যথাসম্ভব সুন্দর অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের বঙ্গ-বিজেতা, জীবন-সন্ধ্যা ও মাধবী-কঙ্কণে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটকেই এদানি সে একটী না একটী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, যথা, মণিহরণে শ্রীকৃষ্ণ, নন্দদুলালে রাধিকা, বিল্বমঙ্গলে পাগলিনী, চৈতন্যলীলায় নিতাই, পাণ্ডব-গৌরবে সুভদ্রা, বলিদানে জোবী, সিরাজোদ্দৌলায় লুৎফুন্নিসা, মীরকাশিমে বেগম, পুত্র-পতিতে পুতুল বাই, শাস্তি কি শান্তিতে হরমণি, প্রফুল্লে প্রফুল্ল, অশোকে কুণাল ও য্যায়সা-কা-ত্যায়সায় গরব। শ্রীমতী সুশীলার দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত নাটকেই একটী করিয়া ভূমিকা ছিল যথা, রাণাপ্রতাপে মেহেরউন্নিসা, দুর্গাদাসে রিজিয়া, মেবার পতনে মানসী, সাজাহানে পিয়ারা ও পরপারেতে শান্তা। ইহা ব্যতীত শ্রীমতী সুশীলা অতুল মিত্রের শিরিফরহাদে গুলাল, লুলিয়ায় লুলিয়া ও নন্দবিদায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে। অমৃত বাবুর খাস দখলে গিরিবালা, অমরেন্দ্র নাথের জীবনে-মরণে তাহের ও শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজিরাওএর সম্ভবনীর ভূমিকা অভিনয় করে।

শ্রীমতী সুশীলাবালা যে সকল নাটক নাটিকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা উপরে দিলাম। ইহা ব্যতীতও দুই এক রাত্রের জন্য অপর কোন নাটকের ভূমিকা লইয়াছিল কি-না তাহা আমরা সঠিক জানিতে পারি নাই। সুশীলা যত ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে এত ভূমিকা অভিনয় করিবার সুযোগ অনেক অভিনেত্রীর ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রীমতী সুশীলা বালার এইটুকুই ছিল বিশেষত্ব যে সে সমস্ত ভূমিকাই সমান উৎসাহে অতি স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করিত। কাজেই কোন ভূমিকা অভিনয় করিয়াই তাহার নিন্দা হয় নাই প্রশংসা লাভই ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া তাহার আর এক বড় গুণ ছিল যে তাহার জীবনটাকে কোন দিনই উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় নাই। চিরদিনই গৃহস্থের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। তাহার আড়ম্বর একেবারেই ছিল না, বিনা আড়ম্বরে সে দিনরাত নাট্যকলার সাধনা করিত।

অকালে বড় অকস্মাৎ শ্রীমতী সুশীলা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার অভাব নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ মাত্রেই আজও অনুভব করিতেছেন। শ্রীমতী সুশীলার মৃত্যুও বড় অস্বাভাবিক। যে রাত্রে শ্রীমতী সুশীলার মৃত্যু হয় সেদিন ষ্টার থিয়েটারে বলিদান নাটকের অভিনয় ছিল। সন্ধ্যার পর সে থিয়েটারে উপস্থিত হইয়া সে জোবির ভূমিকা অভিনয় করে। অভিনয় শেষে সে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসে তখন তাহার দেহে ব্যাধির চিহ্ন ছিল না, তাহার চাল চলন কথাবার্ত্তা শুনিয়া একথা একবারের জন্যও মনে হয় নাই যে এই রাত্রেই সুশীলা পৃথিবী হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবে। থিয়েটার হইতে ফিরিয়া আসিয়া অল্পক্ষণ পরেই সে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই হৃদরোগে তাহার মৃত্যু হয়। সুশীলার মৃত্যু সংবাদ যখন ষ্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইল তখন প্রথমে ওকথা কেহ বিশ্বাস করিতেই পারে নাই যে সত্যই সুশীলার মৃত্যু হইয়াছে।

পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া সুশীলার মৃতদেহ পরদিন বেলা সাড়ে সাতটা আটটার সময় নিমতলা ঘাটে নীত হয়। নিমতলা ঘাটে অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী সুশীলাকে শেষবার দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার অল্পক্ষণের ভিতরেই অগ্নিদেব লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া অভিনেত্রীর নশ্বর দেহ ভস্ম করিয়া দিলেন। সব শেষ হইয়া

গেল। বঙ্গ-নাট্যশালা অন্ধকার করিয়া সুশীলা চলিয়া গেল সে যে সাধনা করিতে আসিয়াছিল, সাধনা শেষে সিদ্ধি লাভ হইবা মাত্রই নটনাথ আপনার চরণে তাহাকে একটু স্থান দিবার জন্য যেন ডাকিয়া লইলেন। তাঁহার আহ্বান ধ্বনি আসিবা মাত্র সুশীলাও যেন সব ফেলিয়া একেবারে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

একে একে বঙ্গ নাট্যশালা শূন্য করিয়া অনেক অভিনেত্রীই চলিয়া গেল। তাহাদের স্থান যে আর কখন পূর্ণ হইবে সে আশা আর নাই বলিলেই হয়। কাজেই বলিতে হয়—বঙ্গ-নাট্যশালার সত্যই দুর্ভাগ্য।

সন্ধানী

[শ্রীসরসীবালা বসু]

জানিনে কোন্ ফাগুন দিনে,
জানিনে কোন্ বিজন বনে,
আমার আমির আধেক খানি
হারিয়ে গেল নাই তা মনে।

জানিনে কোন্ নিদাঘ প্রাতে,
জানিনে কোন্ শরৎ রাতে,
শিউলী ফুলের হাসির মায়া
জড়ালোরে সে জ্যোৎস্নাতে।—

সেইক্ষণে কোন উদাস বায়ে
ভেসে গেল আমার আমি,
কোন্ সীমাহীন পথের মাঝে
যাত্রা আমার রইলো থামি॥

বুঝি বা কোন্ শ্রাবণ প্রাতে,
বিজলী হানে বাদল মেঘে,
দাদুরী দেয় সঘন হাঁক্,
বাতাস বহে যায় যে বেগে—

হয় তো বা গো গভীর রাতে,
অসীম অন্ধকারের মাঝে
হারালো সেই আমার আমি,
কোন্ উদাসীর ব্যাকুল সাজে।

চল্‌ছে আমার খোঁজার পালা,
সেই হ'তে আর নাইকো শেষ,
আধেক খানি আমার আমি
অন্তকালই নিরুদ্দেশ॥

বন্দিনী

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

অভিনয়ের সরঞ্জাম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বন্দিনী নাটকের চতুর্থ অঙ্কে চারিটী দৃশ্য আছে; প্রথম দৃশ্য -- দুর্গস্থ কেল্লাদারের কক্ষ। সমস্ত নাটকের মধ্যে এই দৃশ্যখানিই ভাল হইয়াছিল কারণ পাথরের দেওয়ালে একটা মাত্র দুয়ার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাবেজ পূর্ব্বের পোষাক পরিয়াই দেখা দিয়াছিল কেবল কেল্লাদার ইস্‌কিবল সাজিয়া অপরেশ বাবু স্বয়ং একটা অদ্ভুত রকমের লালরঙের জামা গায়ে দিয়া আসিয়াছিলেন। এই জামাটী কোন দেশের তাহা বুঝিতে পারা গেল না, তবে ইহা স্থির যে মিশরদেশের লোকে কখনও এরকম জামা পরিত না। মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের যতটুকু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মিশরের লোকে সচরাচর ছোট জামা পরিত। আরবদের মত বড় চোগা ইতর ভদ্র কেহই ব্যবহার করিত না। দুই এক জায়গায় বড় জামার মত একটা বস্ত্রের আবরণ দেখা যায় বটে কিন্তু তাহা জামা না হইয়া গায়ে দিবার চাদর হওয়াই অধিকতর সম্ভব। অধ্যাপক Flinders Petrie সেনমুট নামক ভাস্করের মূর্ত্তির যে ছবি তাঁহার মিশর দেশের ইতিহাসের ৮৯ পৃষ্ঠায় ছাপিয়াছেন তাহা দেখিলে প্রথমে বোধ হয় যে লোকটীর গায়ে একটা বড় জামা আছে কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা জামা নহে, বড় রকমের গায়ে দিবার চাদর। ইস্‌কিবল সাজিয়া ষ্টার থিয়েটারের বর্ত্তমান অধিকারী নাট্যবিনোদ শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র যে জামাটী গায়ে দিয়া আসিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত।

এ দৃশ্যে ইস্‌কিবল খালি মাথায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মিশররাজ থুথমসিস আসিলেও মাথাটা ঢাকা আবশ্যক মনে করেন নাই। কলিকাতার থিয়েটারের কোন অধিকারীই পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক কোন নাটকেই মাথায় পাগড়ী বা টুপি পরা আবশ্যক মনে করেন না সুতরাং এ ক্ষেত্রে নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র বাঙ্গালীর পেশাদারী থিয়েটারের মামুলী আর্ট বজায় রাখিয়াছেন মাত্র।

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য --"নদীতীরস্থ খেজুরকুঞ্জ। কুঞ্জের মধ্য দিয়া আঁকা বাঁকা পথ নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। কাল—রাত্রি; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এ্যামস্ ও বন্দিনী।" দৃশ্যপটখানি অদ্ভুত। আর্ট থিয়েটার কোম্পানীর আহার্য্য সংগ্রাহকদ্বয় বন্দিনীর অভিনয়ের জন্যে যে কয়খানি নূতন চিত্রপট আঁকাইয়াছেন তাহা দেখিলে বোধ হয় যে মিশরদেশে খেজুর ভিন্ন অন্য কোন গাছ জন্মায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে এই নাট্য সম্প্রদায়ের খোক্তার বৈকালী পত্রিকায় যে Maspero নামক নির্ব্বোধ ইতিহাস কারের দোহাই দিয়াছিলেন সেই গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠা ও ৩০৭ পৃষ্ঠা দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন মিশর দেশে খেজুর ভিন্ন অপর গাছ জন্মায় কি না। নাটককার এই দৃশ্যে দেখাইলেন যে এ্যামস ও সুমেলিয়া মিশর দেশ হইতে পলায়ন করিতেছেন। তাঁহারা জলপথে নৌকায় পলায়ন করিবেন। ঘাটে যে নৌকাখানি বাঁধা ছিল তাহা একখানি ছোট পানসী। মিশর দেশ হইতে পলায়ন করিতে হইলে যে লোহিতসাগর বা ভূমধ্যসাগর পার হইতে হয় কারণ মিশরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভীষণ মরুভূমি, একথা অবশ্য নাট্যবিনোদ অপরেশ চন্দ্রের মাথায় আসে নাই। কলিকাতার গঙ্গায় যে জাতীয় পানসী দেখিতে পাওয়া যায় নাট্যবিনোদ মহাশয় চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অনেকটা সেই জাতীয় একখানি নৌকা দেখাইয়াছিলেন। প্রাচীন মিশরের লোকের যে জাহাজ ছিল এবং সে জাহাজের ছবি যে এখনও আছে সে কথা আর্ট

থিয়েটারের আহার্য্য সংগ্রাহকদ্বয় বোধ হয় ভাবিবার অবসর পান নাই। তাঁহাদের মোক্তার যে Masperoর দোহাই দিয়াছেন সেই Masperoর গ্রন্থেই এই জাহাজের ছবি আছে। নাট্যবিনোদ মহাশয় যে Masperoর গ্রন্থের পাতা উল্টাইবার অবকাশ পান নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই জাহাজের ছবিতেই পাওয়া যায়, কারণ Masperoর The Struggle of the Nations নামক গ্রন্থের ২৫১ পাতায় প্রাচীন মিশরের জাহাজের ছবি দেওয়া আছে। Breastedএর মিশর দেশের ইতিহাসের ২৭৫ পৃষ্ঠাতেও প্রাচীন মিশর দেশের বড় বড় জাহাজের ছবি ছাপা হইয়াছে। আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষ নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র বন্দিনী অভিনয়ের জন্যে যে পানসীখানি তৈয়ারী করাইয়াছিলেন তাহার সহিত প্রাচীন মিশরের জাহাজের কোনই সাদৃশ্য নাই। নাট্যবিনোদ মহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাহাদুরী মিশর রাজ থুথমসিসকে লইয়া। নাটকে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত সিরিয়া বিজয়ী থুথমসিসকে পুলিসের জমাদারের মত একজন বিদ্রোহী সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্যে ছুটাইয়াছেন আবার রঙ্গমঞ্চে সেই থুথমসিসকে মাত্র তিনজন সৈন্যের সঙ্গে বাহির করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আহার্য্য সংগ্রাহকদ্বয়ের বিদ্যা ও বুদ্ধির চরম পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। নাটককার নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র মুদ্রিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "তৃতীয় দৃশ্য—রাজসভা, সম্রাট ও পুরোহিত।" সম্রাটটী যখন থুথমসিস তখন রাজসভাটী যে মিশরের রাজসভা এ কথাটী কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত কোন থুথমসিস বাবিলন অথবা ইরাণ দেশে যান নাই। যে দৃশ্যপটখানি এই দৃশ্যে বাহির করা হইয়া থাকে সেখানি কিন্তু ইরাণ বা বাবিলন দেশের বাড়ীর ছবি। পূর্ব্বে "ইরাণের রাণী" অভিনয় কালে এই দৃশ্যপটখানি প্রাচীন ইরাণ বা পারস্য দেশের ধ্বংসাবশেষের ছবি দেখিয়া আঁকান হইয়াছিল। এখন নাট্যবিনোদ ও তাঁহার ভক্ত-বিনোদের তুড়িতে তাহা সহসা মিশররাজ থুথমসিসের রাজসভা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র যে কোন শক্তির বলে বাবিলন বা ইরাণের বাড়ী মিশর দেশের মেমফিস্ নগরে উপস্থিত করিলেন তাহা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। নাট্যবিনোদ মহাশয় যদি Masperoর পাতা উল্টাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে ২৪১ পৃষ্ঠায় অথবা ৩০৬ পৃষ্ঠায় মিশর দেশের অষ্টাদশ সংখ্যক রাজবংশের সমকালিন ঘর বাড়ী দেখিতে পাইতেন। Flinders Petrieর মিশর দেশের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগের ৯২ ও ১১১ পৃষ্ঠা খুঁজিলে প্রাচীন মিশর দেশের সিংহাসন ও টেবিলের ছবি দেখিতে পাইতেন! রাজসভায় যে সমস্ত সৈনিক ছিল তাহাদিগের সাজ পোষাকও মিশর দেশের সৈন্যের মত নয়। Flinders Petrieর গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ৮৫ পৃষ্ঠায় মিশর দেশের অষ্টাদশ সংখ্যক রাজবংশের সৈনিকদের পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্রের চিত্র ছাপা হইয়াছে। মিশর দেশের এই রাজ-বংশের রাজ্যকালে ধর্ম্মযাজকগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সত্য বটে। সেইজন্যই আমনরার পুরোহিত সভায় মিশররাজ থুথমসিসের নিকটে ইসকিবলের ও এ্যামসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা চাহিয়াছেন :—

Side by side with the soldier appeared another new and powerful influence, the ancient institution of the priesthood. As a natural consequence of the great wealth of the temples under the Empire the priesthood became a profession, no longer nearly an incidental office held by a layman as in the old and middle Kingdoms. As the priest increased in numbers they gained more and more political power; while the growing wealth of the temples demanded for its proper administration a veritable officials of temple officials of all sorts, who were unknown in the old days of simplicity. Probably one fourth of all the persons buried in the great and sacred cemetery of Abydos at this period were priests. Priestly c mumunities had thus grown up. All these priestly bodies were

now united in a new sacerdopal organization embracing the whole land. The head of the state temple at Thebes, the high Priest of Amon, was the supreme head of this greater body also, and his power was there by increased for beyond that of his older rivels at Heliopolis and Memphis. Thus priests, soldiers and officials now stood together as great social classes."

আমনরার পুরোহিতের পোষাক কিন্তু একেবারেই ঠিক হয় নাই কিন্তু অভিনয়ের সরঞ্জামের প্রবন্ধ এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে যে সেকথা আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না। চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে নাট্যবিনোদ অপরেশ চন্দ্রের Adaptation শক্তির পরকাষ্ঠা শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দৃশ্যটী সেক্সপীয়র নামক নির্ব্বোধ নাট্যকারের 'রোমিও ও জুলিয়েট' নামক অধুনা বাঙ্গালা দেশে স্মরণাতীত নাটক হইতে Adapted অর্থাৎ ভিন্ন দেশের ভাষায় না বলিয়া ঋণ স্বীকার না করিয়া হজমকৃত। কিন্তু সেক্সপীয়র ও অপরেশচন্দ্রের শক্তির তারতম্য অনুসারে উভয় নাটকের শেষ দৃশ্যে স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিবদষ্ট নরনারীর শেষ প্রেম সম্মিলন যতদূর করুণ, হৃদয়গ্রাহী ও স্বাভাবিক হইতে পারে অনশনক্লিষ্ট নরনারীর দেহে যে প্রেম সে পরিমাণে আসিতে পারে না, তৃষ্ণায় দেহ যখন দীর্ঘ দিন কাতর থাকে, আহার অভাবে নরনারীর যখন গতিশক্তি লোপ হয় তখন যে প্রেমের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে এ কথা আর্ট থিয়েটারের আর্টিষ্ট নাট্য-বিনোদ অপরেশ চন্দ্রের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে না। সেই জন্তেই বোধ হয় 'রোমিও ও জুলিয়েটের' Parody বা বিংশতি শতাব্দীর বাঙ্গালী নাট্যকারের হস্তে চরম পরিণতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ বন্দিনীর অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে হাঁটু গাড়িবার ও আছাড় খাইবার স্বতন্ত্র সরঞ্জাম দেখিতে পাওয়া যায়। দেশী ও বিলাতি অনেক নাট্য সম্প্রদায় অনেক নাটকের অভিনয় করিয়াছেন কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর নরনারীর অস্বাভাবিক প্রেমের অভিনয়ে পাশব প্রেমের মত অতি দীর্ঘ জড়াজড়ি ও কামড়া কামড়ির উপাদান স্বরূপ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর হাঁটু গাড়িবার বা আছাড় খাইবার সরঞ্জাম, গদি ও বালিস ইহার পূর্ব্বে নাট্যবিনোদ অপরেশচন্দ্র ও তাঁহার ভক্তবিনোদ ব্যতীত অপর কেহ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বাহির করিতে ভরসা করে নাই।

পথের শেষ

(গল্প)

[শ্রীপূর্ণিমা দেবী বি-এ]

কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী নামে এক পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। সে আজ ষাট বছর আগেকার কথা। তখন মোটর বা উড়ো জাহাজের সৃষ্টি হয় নি। আর রেল ষ্টীমারও দেশের সকল স্থল ও জলপথের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সগর্ব্বে গর্জ্জন করতে করতে চারদিক কাঁপিয়ে ছুটে চলত না। দূরদেশে যেতে আসতে হলে গরীব লোকের চরণযুড়ীই ছিল সম্বল। আর জমিদারেরা ঘোড়া ও রথ অথবা পাল্কী ব্যবহার করতেন। দেশ ছিল অরাজক। কোম্পানী তাঁর নিজের স্বার্থ পুরামাত্রায় বজায় রেখে অবসর মত মাঝে মাঝে রাজ্যের অধিবাসীদের হিত কামনায় সুনজর করতেন সত্যি, কিন্তু কর্ম্মচারীদের সুব্যবস্থায় তাঁর শুভ ইচ্ছা, অত্যাচারের মূর্ত্তি ধরে আবির্ভূত হয়ে আপামর জনসাধারণকে শঙ্কিত করে তুলেছিল! এই সব রাজ পুরুষেরা রাজদণ্ড হাতে পেয়ে যথেচ্ছা অন্যায় ব্যবহার করতেন, বাধা দেবার মত শক্তি সকলের ছিল না, তাই নীরবে সমস্ত সইতে হত। জমিদার বাবুরা পর্য্যন্ত তাঁদের ভয় করে চলতেন, গরীব গৃহস্থের ত কথাই নেই।

চৌধুরী মহাশয়ের কাছে সরকারের লোকেরা দু'একবার নিগ্রহ করতে এসেছিলেন, কিন্তু সুবিধা করতে পারেন নি। বরঞ্চ প্রতিফলে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনেককে জীবন্ত কবরে সমাধি পাবার যোগাড় হয়েছিল। চৌধুরী ইহাতেই ক্ষান্ত হলেন না। মনে মনে তিনি ই সব অন্যায়ের প্রতিবিধান করবার উপায় ঠিক করলেন। তিনি ভাবলেন, চৈত্র কিস্তীর শেষে সরকারে খাজনা দেবার সময় নিজে সহরে যাবেন ও কর্ত্তৃপক্ষের সামনে উপযুক্ত নজর দিয়ে তাঁদের কর্ম্মচারীদের শাসন করবার জন্য দরখাস্ত পেশ করবেন। এই সুযোগে সকলকার প্রকৃতি অধ্যয়ন করে, তাঁদের বশ করবার উপায় অবলম্বন করবেন। সহজে না হয় তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। সে বছরটা অজন্মা হয়েছিল, প্রজারা কেঁদে কেটে পড়ায়, কৃষ্ণকিশোর তাদের খাজনা মাপ করেছিলেন। সময়টাও নানাদিক থেকেই একটু মন্দা পড়েছিল। তাহলেও যোগাড়-যন্ত্র করে, হাজার পঁচিশ টাকা সঙ্গে নিয়ে, দু'দশজন শরীর রক্ষীর সমভিব্যাহারে তিনি সহরে চললেন। নৃপতি নামে তাঁর এক দেওয়ান ছিলেন। তাঁর উপর কৃষ্ণকিশোরের খুব বিশ্বাস ছিল। তিনি কবিরাজ কানাই সেন, দাবা খেলবার সঙ্গী শোভন মিশ্র, ইত্যাদি করে অনেকগুলি লোক জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করলেন। এক একদিন দশ পঁচিশ মাইল যাবার পথের ধারে তাবু পড়ত, গান বাজনা খেলা ও গল্পে বাকী সময়টা কেটে যেত। এমনি করে পনের কুড়ি দিন যাবার পর তাঁরা সহরের উপান্তে উপস্থিত হলেন। তার পরের দিন সকালে সহরে যাওয়া যাবে পরামর্শ করে, সেদিনকার মত সেইখানেই বিশ্রাম করবার আয়োজন হতে লাগল। কাছেই এক মস্ত গঞ্জ। নৃপতির ভাই বিশ্বপতির সেখানে চালের আড়ত ছিল। বিশ্বপতি নিজে তত্ত্বাবধান করে সকলকার সুখ ও স্বচ্ছন্দের প্রতি মন দিলেন। বেশ আনন্দেই সময় কাটতে লাগল। এদিকে যত্নও সহৃদয় ব্যবহারে কৃষ্ণকিশোর ও তাঁর অনুচরদের আপ্যায়িত করে বিশ্বপতি ও নৃপতি গোপনে পরামর্শ ঠিক করতে লাগলেন জমিদারকে ফাঁদে ফেলে তাঁর টাকা কড়ি হাত করা যায় কি করে। নৃপতির অন্তরের স্বরূপ জমিদার জানতেন না। স্বার্থের জন্য সে না করতে পারে এমন কাজ ছিল না। সেদিন দৈবও বুঝি তাদের সহায় ছিল। রাত নটা দশটার সময় গঞ্জে আগুন লাগল। কি করে লাগল কেউ তা জানত না। অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল। অনবরত বাঁশ ও কাঠ ফাটতে লাগল। লোকও অনেকে পুড়ে মারা গেল। ব্যবসায়ীরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এই মৃত্যুর কবলে পড়েও কিন্তু সকলে পার্থিব অর্থ বা অন্য সম্পত্তির মায়া ভুলতে পারলেন না। যতটুকু রক্ষা পায় এই ভেবে তাড়াতাড়ি তারা টাকা কড়ি যার যা ঘর

থেকে বার করে উপযুক্ত আশ্রয়ে রাখবার জন্ম ছুটে এলেন। বিশ্বপতির দোকানটীর প্রতি বিধাতার কৃপাদৃষ্টি ছিল। আশে পাশে সকলকার পুড়ছে, ভাঙছে, ছাই হয়ে ভেঙে পড়ছে, তারির মাঝে না জানি কোন মন্ত্রবলে এই একটীমাত্র দোকান খাড়া হয়ে জেগে রইল। তার গায়ে আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগল না। অন্য সব ব্যবসায়ীরা নিরাপদ ভেবে বিশ্বপতির ঘরে আপনাদের টাকার থলিগুলি গচ্ছিত রাখলেন। তখন সামান্য আশ্রয় পেলে তাঁরা বাঁচেন, সেই আশ্রয়দাতা যে তাদের বঞ্চনা করবেন সে খেয়াল হয় নি। বিশ্বপতি সুযোগ বুঝে সেই রাত্রের মধ্যে টাকাকড়ি সমস্ত বার করে নিয়ে লুকিয়ে পলায়ন করলেন। ওদিকে কৃষ্ণকিশোরের তাঁবু থেকে নৃপতিও তাঁর সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হলেন।

সমস্ত রাত্রি পোড়বার পর সকাল নাগাদ আগুন প্রশমিত হল। ব্যথিতের হাহাকারে তখন গগন ভরে গেছে। বিশ্বপতি পালিয়েছে দেখে ব্যবসায়ীরা সকলেই শোকে দুঃখে এবং ক্রোধে উন্মত্তের মত হয়ে পড়লেন। অর্দ্ধ দগ্ধ হয়ে কত লোকে যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করছে, স্বামীপুত্র হারিয়ে কত অনাথা হা-হতাশ করছে, তাদের ক্রন্দন শুনে কৃষ্ণকিশোর ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে এলেন। টাকাকড়ি অন্ন ও বস্ত্র দিয়ে যাকে যা পারলেন সাহায্য করলেন। যারা একেবারে পথে বসেছে, তাদের আবার ঘর বেঁধে বাস করবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বিশ্বপতির প্ররোচনায় সর্ব্বস্বান্ত ব্যবসায়ীদের যথাসাধ্য দুঃখ দূর করবার ব্যবস্থা করলেন। এই রকম করে তিনদিন সেখানে থেকে কৃষ্ণকিশোর আপনার সঙ্গে যা ছিল, পাই পয়সাটী পর্য্যন্ত দান করে ফেললেন! সকলকার আর্ত্তধ্বনি শুনতে শুনতে তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। নিজের যে এখনো কিস্তীর টাকা দেওয়া হয় নি, সে কথাটা একেবারেই মনে ছিল না। তা ছাড়া মাসের শেষ দিনও পেরিয়ে গেছে। এখন আর টাকা দিয়ে ফল নেই। সরকার নির্দ্ধারিত দিনে সূর্য্যাস্তের আগে টাকা না পেলে সমস্ত জমিদারী নিলামে চড়াবে। অনুচর সঙ্গীরা ব্যাপার দেখে যে যা পারে লুটে নিয়ে কৃষ্ণকিশোরকে একাকী রেখে গা ঢাকা দিল। সমস্ত যখন নজরে পড়ল কৃষ্ণকিশোর ভগবানের এই অপরূপ পরীক্ষা দেখে অতদুঃখেও হেসে ফেললেন। গঞ্জের লোকেদের বাঁচাবার জন্ম তিনি সর্ব্বস্বান্ত হলেন দেখে সেখানকার সকলেই সমবেদনা প্রকাশ করলেন। তারা কৃষ্ণকিশোরকে আপনাদের বাড়ীতে ডেকে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্ম ব্যস্ত হলেন! সরকারে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলে, তাঁদের দয়া হবে এই সান্ত্বনা দিয়ে সকলে উপস্থিত ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু সমস্তই বিফল হল। খবর পাওয়া গেল, চৌধুরীদের সম্পত্তি নৃপতি কিনে নিয়েছেন, সরকার তাঁদের বঞ্চিত করতে পারেন না। তা ছাড়া, কৃষ্ণকিশোর যে রাজদ্রোহী তার অনেক প্রমাণ পত্র নৃপতি সরকারকে দাখিল করেছেন। এর ওপর তাঁকে আর কোনও কৃপা দেখান যায় না।

বিশ্বপতি অথবা নৃপতির সয়তানী আদালতে প্রমাণ করা গেল না। গঞ্জের লোকেরা কিন্তু আদালতের প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে সুযোগ পেয়ে গোপনে বিশ্বপতিকে হত্যা করলেন। নৃপতি কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়েছিলেন। বিশ্বপতিকে খুন করবার অপরাধে সরকার অপর পাঁচ ছ'জন লোকের সঙ্গে কৃষ্ণকিশোরকেও গ্রেপ্তার করেছিলেন, কিন্তু একটী সামান্য গরীব চাষা একলা খুনের অপরাধটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে স্ত্রী-পুত্রের ভার ভগবানের হাতে ফেলে রেখে, হাসতে হাসতে ফাঁসির দণ্ড মাথা পেতে নিলে। নিজে মরবার সুযোগ হারালেন বলে কৃষ্ণকিশোর এই চাষাটীর প্রতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে থাকতে পারলেন না। বাড়ীতে ফেরবার তাঁর মুখ ছিল না। সর্ব্বস্ব হারিয়ে গরীব ভিখারীর বেশে কেমন করে তিনি ফিরবেন। গঞ্জের লোকেরা অষ্টপ্রহর কাছে থেকে তাঁকে আত্মহত্যার সুযোগ পর্য্যন্ত দিলে না। তাঁরা বলতে লাগলেন, আমাদের দুঃখ দেখে অবধি আপনি সান্ত্বনা দিতেছেন ভগবানের মার কি করব, কিন্তু আপনি নিজে যদি এরকম ব্যাকুল হয়ে পড়েন তা'হলে আমরা বাঁচব কি করে! দেবতা আপনি, আপনাকে কষ্ট দিয়ে ভগবানের কি ইচ্ছা সাধিত হচ্ছে জানি না। আমরা বলছি আপনার এ কষ্ট চিরকাল থাকবে না। আপনি আমাদের মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে আমাদের কাছে আসুন, আপনার কোনও কষ্ট থাকবে না—। আমরা আপনার সব

হুকুম নতশির হয়ে পালন করব। আমাদের মাঝখানে, আপনি রাজা হয়ে থাকবেন।”

কৃষ্ণকিশোর দেশে ফিরে গেলেন। খাজনা বাদ দিয়ে বাকী হাজার দশেক টাকা নিলামে সম্পত্তির যা দাম উঠেছিল, সে টাকাটাও কৃষ্ণকিশোর গরীবদের দান করে দিলেন। অবশেষে স্ত্রী মহামায়া ও দুইটী নাবালক পুত্রের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন। গঞ্জের লোকেরা যাঁরা সঙ্গে এসেছিলেন তাঁদের পর্য্যন্ত জানতে না দিয়ে গোপনে তাঁরা লক্ষ্যহীন পথে যাত্রা করলেন। বিশ্ব জগতে এত লোকের সংস্থান হয়, আর তাঁদের না খেয়ে মরতে হবে? ভগবানের যদি তাই ইচ্ছা থাকে, হ'ক! বুক তাঁর ভরে ছিল, গঞ্জের লোকেদের সহৃদয়তা ও সেই দরিদ্র চাষীটার মহানুভবতার কথা ভেবে। তবু আজ এই অভাবের দিনে তাঁদের কাছে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। ভগবানে বিশ্বাস আর দু'টী কর্ম্মঠ হাত মাত্র অবলম্বন করে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে কৃষ্ণকিশোর সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

বন্ধুরা তাঁর অভাবে চোখের জল ফেলতে লাগল। আর শত্রুরা তাঁর পতনে আনন্দে দিশেহারা হ'ল। কেউ বা বললে হরিশ্চন্দ্রের মত দান করবার সময় অগ্র-পশ্চাৎ ভাবলে না, এবার ঝি চাকরের বৃত্তি অবলম্বন করে অথবা চাঁড়ালের অধীনে চাকরী নিয়ে দিন কাটাও। কেউ আবার বললে, ভগবান নিষ্ঠুর, তা না হলে অমন ভাল লোকের এমনি সর্ব্বনাশ হয়!

সংসারে তাসের খেলার মত বড় রং ও সম্পত্তি কেবলি হাত বদলাচ্ছে। আজ যে রাজা কাল সে ফকির। আবার কাল যে ফকির ছিল আজ সে রাজার তক্তে বসেছে। কিছুই স্থায়ী হয় না। যেখানকার বোঝা সেখানেই পড়ে থাকে।

নৃপতি আজ এক বাজী জিতে আনন্দে আটখানা হয়েছিলেন, কিন্তু বেশীদিন তাঁকে ভোগ করতে হ'ল না। ওলাউঠা এসে গ্রামকে গ্রাম উজোড় করে দিয়ে গেল। নৃপতি এবং তার সংসারের কেউ তার হাত থেকে বাঁচলেন না। সব শ্মশান হয়ে গেল। এই যাট বছর পরেও সেখানে গেলে দেখতে পাই কৃষ্ণকিশোরের কীর্ত্তি কত সেই সব ভগ্ন-স্তূপের মাঝে মিশে রয়েছে।

কৃষ্ণকিশোর পথ দিয়ে চলতে লাগলেন, পথ আর ফুরোয় না। বাঁকা বন্ধুর পথটী কখনো গহন বনের অন্ধকারে নদীর ধার দিয়ে, কখনো বা পাহাড় পর্ব্বতের গা দিয়ে চলছে। কৃষ্ণকিশোরের চরণের ধূলা গায়ে মেখে সে আজ ধন্য। শান্তির বশে চলতে চলতে বালক শিশু দু'টী পথের মাঝে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল, মহামায়াও বেশীদিন বাঁচিলেন না। কৃষ্ণকিশোর তবু চললেন। মাঝে মাঝে ভগবানে বিশ্বাস কমে যায়, পৃথিবীর প্রতি ভালবাসতে আর ইচ্ছে হয় না, মানুষের প্রেম ও স্নেহে সন্দেহ জাগে। এ পথ কি ফুরোবে না? শ্লথ চরণ দু'টী কেবলি থেমে পড়ে। কৃষ্ণ-কিশোর চেঁচিয়ে কেঁদে বলেন, সব নাও, সব নাও প্রভু! একটী মাত্র প্রার্থনা এই সন্দেহ আর অবিশ্বাসকে জাগতে দিও না। এর পরও যেন তোমায় তেমনি ভালবাসি। জগৎ অবিচার করছে বলে তার নাম করে দীর্ঘনিঃশ্বাস না পড়ে, সকলকার প্রতি ভালবাসা অটুট রেখে আমি যেন মরতে পারি।

জগতের কাজ যেমন চলছে চলে যায়। সব অন্ধ অন্ধকারে হাতড়ে মরে। এরি মাঝে কখন একটা ক্ষীণ প্রদীপ বিধাতার আশীর্ব্বাদে জেগেছিল কখনই বা আবার সেটা বিধাতার ইচ্ছায় নিবে গেল কে তার খোঁজ রাখে? কীর্ত্তি লোককে অমর করে রাখে, সেটা মিথ্যা কথা। জগৎ অকৃতজ্ঞ, সে কিছুই রাখে না!

বিরামহীন গৃহহারা পথিকের ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর মাঝে মাঝে বাতাসে বেজে ওঠে, “আমি ভালবাসি, ভালবাসা আমার অটুট থাকুক, ভালবেসে আমি মৃত্যুর বুকে ঘুমিয়ে পড়ি।” অতি দূর থেকে বুঝি বা বিশ্বের ওপার থেকে সেই ক্ষীণ সুর জগতের কাণে ভেসে আসে—!

পথের শেষ কি তাঁর এসেছে? বিধাতার খেয়ালে সব হারিয়ে যিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁকে আশ্রয় দেবার জন্য ভগবান নিজে কি এগিয়ে আসবেন না? জগতের সুখ-দুঃখ হাসি-খেলা সমস্তই ত তাঁর মায়া! এই পরীক্ষার শেষে যাঁরা জয়ী হয়ে যেতে পারেন তাঁদের জয়মাল্য বিধাতা নিজে পরিয়ে দেবেন না?

এরণ্ড-মণ্ডলী

[শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা]

বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঘাস জঙ্গলে বোঝাই, কিন্তু হাঁটুর চেয়ে বেশী উঁচু কোন গাছ সেখানে নাই। দুই একটা বড় গাছ ছিল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তার শুষ্ক কাণ্ডের চারিপাশে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে একদল এরণ্ড।

ঘুরিতে ঘুরিতে মৌতাতের সময় বহিয়া গিয়াছিল, আমি দুইটা হাই তুলিয়া সেই শুষ্ক কাণ্ডের উপর বসিয়া কৌটা হইতে একটি বড় আফিঙের বড়ী খাইয়া নেশার আশায় টং হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সহসা শুনিতে পাইলাম গম্ভীরস্বরে কে যেন আমায় ডাকিল। চাহিয়া দেখি সেই সমগ্র এরণ্ড মণ্ডলী আমার দিকে তাদের তীব্র চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে।

আমি হঠাৎ ভয় পাইয়া গেলাম এরণ্ড অনেক দেখিয়াছি কিন্তু তার চক্ষু কখনও দেখি নাই। তাই অপদেবতা বোধে আমি রামনাম স্মরণ করিতে লাগিলাম।

এরণ্ডবর—ইনি সব চেয়ে লম্বা, গলাটাও এঁর সব চেয়ে বেশী ভারী—বলিলেন "কে হে বাপু তুমি এই এরণ্ড রাজ্যে এসে রাম রাম ক'রছ। কে সে—কোন পর্য্যায়ের! সে কি ঘাস শাক না লতা? তুমিই বা কে? তুমি কি আমাদের প্রবল প্রতাপ এরণ্ড মণ্ডলীর প্রভাব, প্রতিভা ও মাহাত্ম্য স্বীকার কর?"

আমি বলিলাম,—"কায়মনোবাক্যে করি। তবে এই এরণ্ড মণ্ডলীর বিবরণ আমি সবিশেষ অবগত নই বলিয়া কথায় ও কার্য্যে কথঞ্চিৎ বিভ্রমের সম্ভাবনা হওয়া বিচিত্র নহে।"

"অবশ্য, অবশ্য,"—বলিয়া এরণ্ডবর বলিলেন, "এই এরণ্ড মণ্ডলী, অতিশয় প্রাচীন অথচ চির নবীন। আমরা চিরকালই ছিলাম, এবং চিরদিনই থাকিব। আমাদের সমান কুলীন কেহই নাই।

"তোমরা অনেক সময় বড় বড় বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া মনে কর যে জগতের মধ্যে বুঝি তারাই শ্রেষ্ঠ! সে তোমাদের ভুল। বড় বড় গাছ চিরদিন থাকে না। মাঝে মাঝে, কালে ভদ্রে এক আধটা হয় কিন্তু কোন দিনই আমাদের সঙ্গে সংগ্রামে বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই দেখনা তুমি যেখানে বসিয়া আছ তাহা এককালে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। ও বেটা গর্ব্বে আমাদের সঙ্গে কথাই কহিত না। আজ উহার দশা দেখ। এখন আমরা নিত্য উহাকে পদাঘাত করিতেছি।"

"সুতরাং কালে ভদ্রে এক আধটা বড় গাছ আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেও, তাহা আমাদেগকে কোনও মতেই চিরদিনের জন্য কাবু করিতে পারে না। আমরা চিরদিনই সমানে চলিয়াছি আমাদের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। আমরা সত্য সনাতন ও সর্ব্বব্যাপী। এমন কোন স্থানই দেখিতে পাইবে না যেখানে আমরা বা আমাদের জ্ঞাতিবর্গ নাই।"

আমি ভাবিয়া দেখিলাম কথাটা ঠিক। আমার ঘরের কোণায় নিতান্ত অযাচিত ভাবে এরণ্ড বন জন্মিয়া উঠিয়াছে, তার স্থানে আমি একটা ফজলী আমের চারা লাগাইয়াছিলাম, ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কিছু দূরদেশে যাইতে হওয়ায় কয়েকদিন আমি গাছটার যত্ন করিতে পারি নাই। ফজলী গাছ মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু এরণ্ডের বন মনের আনন্দে বাড়িয়া চলিয়াছে। আমার দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া গেল আমি দেখিলাম জগতে এই এরণ্ডদলই একমাত্র শাশ্বত, চিরন্তন পদার্থ।

বিষ্ণুশর্ম্মা এরণ্ডকে অবহেলা করিয়া বলিয়াছিলেন, "নিরস্ত পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" কিন্তু কেন সে করিবে না। পৃথিবীর বেশীর ভাগ জুড়িয়া এরণ্ডই যে একমাত্র দ্রুম। মানব সমাজেও ঠিক তাই। বট অশ্বত্থের মত যারা, প্লেটো, আরিষ্টটল, কালিদাস, সেক্সপীয়ার প্রভৃতি

তাদের তো আঙুলের ডগায় গোণা যায় কিন্তু এরণ্ডের গোষ্ঠী—যাদের কেহ কোনও খবর রাখে না যুগ যুগান্তরের সেই এরণ্ড সদৃশ জ্ঞানীদের গোষ্ঠীর সীমা বা সংখ্যা নাই।

তাই আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "হে ব্রাত্য, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সত্য সত্যই শাশ্বত ও চিরন্তন—তুমি সনাতন। তোমার কাছে আবার বৃক্ষ! সে অর্ব্বাচীন আত্মম্ভরী সারশূন্য তোমার আমি জয়গান করি।"

সন্তুষ্ট হইয়া এরণ্ডবর তাঁর একখানা পত্র আমার মস্তকে স্পর্শ করাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর তিনি উদার-কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ বাপু, ওই যে বলিলে সারশূন্য, ও কথাটা সত্য, যদিও অন্তলোকে বলিলে কথাটা শ্লেষের মত শোনায়। বৃক্ষেরা বলিয়া থাকে যে তারাই সারবান আমরা সারশূন্য, কেন তাদের ভিতরটা ঠাসা কাঠ আর আমাদের ভিতরটা অধিকাংশই ফাঁপা। কিন্তু কাষ্ঠবাহুল্য সারবত্তার পরিচায়ক নহে। তোমাদের মনুষ্য সমাজে একটা কথা আছে না Wooden head?—যারা বোকা তাদেরকেই কাষ্ঠময় দেখা যায়। আমাদের ভিতর কাঠ নাই। আমাদের যে সার তাহা কাষ্ঠ অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যবান। আমাদের সার তৈল! তৈল যে কত বড় মহান বস্তু তা অবশ্য তুমি অবগত আছ। সমস্ত জগৎ তৈলের দ্বারা শাসিত। যদি তোমার বায়ু প্রবল হয়, মাথায় তেল দাও! উদরে বায়ুর প্রকোপ হইলে এরণ্ড তেল পান কর! সকল ব্যাধির উপশম হইবে। জগতে তেলের বশ কে নয়। তেল মাখাইতে জানিলে স্বয়ং বিশ্বনাথকে ইহাতে বশীভূত করা যায়। আর যদি কোনও স্থানে তৈলাভ্যঙ্গ ঠিক কার্য্যকর না হয় তবে সে পাপিষ্ঠকে যথেষ্ট পরিমানে অস্মদীয় ক্যাষ্টর অয়েল নামধেয় তৈল পান করাইয়া একদম জব্দ ও কাবু করিতে পার—নয় কি?"

এরণ্ড বরের কথা আমার কাছে অমৃতের তুল্য মনে হইল। এত সত্য কথা জন্মে কখনও শুনিয়াছি মনে হইল না। অথচ মনে হইল এই সত্যের ভূরি ভূরি পরিচয় জীবনে পাইয়াছি। আমাদের সমাজেও তো তারাই ধন্য যারা অনন্ত তৈলকরণ করিতে পারে, এবং তৈলের বিবিধ ব্যবহার জানে। অভ্যঙ্গে যেখানে সম্যক ক্রিয়া না হয় সেখানে বিরেচন দ্বারা কার্য্য উদ্ধার প্রায়ই হইয়া থাকে। তৈলের তুল্য শক্তি জগতে কাহারও নাই।

তাই আমি বলিলাম, "হে ব্রাত্য আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সত্যবাক্, জ্ঞানী ও ঋষিতুল্য। হে এরণ্ডবর আমি তোমাকে নমস্কার করি।"

সহসা এরণ্ড মণ্ডলীর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। সকলে আমাকে বিস্মৃত হইয়া পশ্চিম দিকে একাগ্রচিত্তে চাহিল। চাহিয়া দেখিলাম সেখানে একটা বৃক্ষ এরণ্ডের ঘাড়ের উপরে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এরণ্ড মণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এরণ্ডবর বলিলেন, "কে হে তুমি? এতদিন দিব্য ভাল মানুষটির মত আমাদের সঙ্গে মিশিয়া ছিলে, আমরা ভাবিয়াছিলাম তুমি বা বুঝি ঢ্যাঙা জাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্। আজ যে বড় সাহস করিয়া আমাদের উপর মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছ?"

সে বলিল, "আমি বট। আমি এতদিনও যেমন ছিলাম, আজও তেমনি, আপনাদেরই একজন। আপনাদিগকে আমি অভিবাদন করি।"

নাম শুনিয়া এরণ্ড বরের খাড়া খাড়া পাতাগুলি ঝপ করিয়া একসঙ্গে নুইয়া পড়িল। বট! সে যে বড় সর্ব্বনেশে। একবার শিকড় গাড়িতে পারিলে তাকে যে কিছুতেই দমন করা যায় না! হায়, হায়, এতদিন যাকে ছিপছিপে কচি শিশুটি ভাবিয়া স্নেহ দিয়া, পচা পাতার শয্যা বিছাইয়া যত্ন করিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছে সে নাকি এই সর্ব্বনেশে বট।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার পাতাগুলি নাড়া দিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "অসম্ভব, হইতে পারে না! তুমি কখনও বট নও—বট হইতে পার না; দেখি তোমার পাতা।"

সকলে সেই বৃক্ষের পত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল; পরিশেষে সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিল "এ বট নয়, ইহার পত্র অতিশয় ক্ষুদ্র; ইহা কোনও ঝোপ ঝাড়ের গাছ, এরণ্ডের সার খাইয়া খাইয়া ইহার অতি বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার খাদ্য বন্ধ কর, বিরেচক তৈল প্রদান আরম্ভ কর এবং

সর্ব্বোপরি সকলে মিলিয়া তারস্বরে ইহাকে গালি দাও। ইহার বৃদ্ধি অবিলম্বে থামিয়া যাইবে।"

তখন সকলে তৈলক্ষরণ করিতে করিতে তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি নীচ, হীন, ছোটলোক, জোচ্চোর, পাজি, ছুঁচো এবং হারামজাদা—"

বট তখন তাহাদের সবার উপর গলা চড়াইয়া বলিল, "ক্ষমা করিবেন, আমি সত্য সত্যই বট জাতীয় তবে আমি দেশী বট নই, আমি বিলাতী বট।"

আবার সকলে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সেদিকে নিক্ষেপ করিল। শেষে এরণ্ডবর বলিলেন, "বট তুমি নিশ্চয়ই নও, কিন্তু তোমার নিজের কথায় প্রমাণ হইল তুমি বিলাতী! তুমি কোন সাহসে আমাদের এরণ্ড মণ্ডলীর সনাতন চিরন্তন নিত্য মাতৃভূমির বক্ষের উপর আসিয়া শিকড় বসাইয়া তাহাকে অপবিত্র করিলে? তুমি এই মুহূর্ত্তে দূর হও।"

বট হাসিয়া উত্তর করিল "এরণ্ডবর মহাশয়, আমার যে দূর হওয়া অসম্ভব সে কথাটা ভুলিলেন কেমন করিয়া? আমার শিকড় যে আমার জননী জন্মভূমির বুকের ভিতর গাঁথা রহিয়াছে।"

এরণ্ডবর কহিলেন, "কি স্পর্দ্ধা! কোন সাহসে তুমি আমাদের মাতৃভূমিকে মাতৃভূমি বলিতে চাও! তুমি যাও, চলিতে না পার নিভিয়া যাও, মুশড়াইয়া দুমড়াইয়া এই মুহূর্ত্তে মাটির সঙ্গে মিশিয়া।"

বট আর একটু মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া তার বহুল পত্র নাড়া-চাড়া দিয়া বলিল, "বড় দুঃখিত হইলাম এরণ্ডবর মহাশয়, আপনাকে খুসী ক'রবার জন্য আমি নিজেকে বিলুপ্ত করিতে পারিতেছি না। আপনি যতই কেন অসন্তুষ্ট হ'ন না। যে ধরিত্রী আমাকে ধারণ করিয়া স্নেহরসে বর্দ্ধিত করিতেছেন তাঁর আদেশ, আমার পিতৃ-মাতৃ কুলের আদেশ আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া আমাকে ক্রমশঃই বাড়াইয়া তুলিতেছে। আপনারা রাগ করিবেন না। বিলাতীই হই যাই হই, এক মাতৃভূমিতে আমাদের শিকড় একই রসে আমরা পুষ্ট আসুন আমরা পরস্পর সৌহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ হই।"

অতি মৃদু মধুর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, "আর কেউ না হ'ক আমি হব! আর কেউ তোমাকে আলিঙ্গন না করুক আমি তোমায় আলিঙ্গন করবো প্রিয়তম।" চাহিয়া দেখিলাম এক কোণা হইতে একটা লতা সেই বটের গা জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গেই তার অঙ্গ কুসুম সম্ভারে ভরিয়া উঠিল।

এরণ্ডবর এতটা চটিয়া উঠিলেন যে তার গোটা কয়েক ফল বোমার মত ফাটিয়া উঠিল এদিকে বট ধাঁ ধাঁ করিয়া বাড়িয়া উঠিল। এরণ্ডবর গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুমি পাজী, তুমি লম্পট, তুমি বদমায়েস, তুমি হারামজাদা, তুমি মূর্খ, তুমি অজ্ঞ, তুমি অশ্লীল এবং তুমি বিদেশী। তোমার গায় আমি থুথু দেই; তুমি কিছুই না, তোমাকে আমি অস্বীকার করি, আমরা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে রেজল্যুশন করিয়া বলিতেছি যে তুমি কাঁটা নটের চেয়েও ছোট—ততোধিক, তুমি নাই এবং তুমি বিদেশী।"

এরণ্ডের দল তারস্বরে তান ধরিল, "তুমি বিদেশী, তুমি ভণ্ড, তুমি ছোট, তুমি নাই। তোমাকে আমরা গালি দিব।"

বট তখন আকাশের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে—সে হাসিয়া বলিল, "ভাই সকল, আপনার প্রাণ বাঁচাও, আমার ছায়ায় পড়িলে আর বাঁচিবে না, পার তো তফাৎ যাও।"

তখন এরণ্ডমণ্ডলী উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল বিশাল বিস্তার এক বটবৃক্ষ প্রায় তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল আর কি? তখন সকল উন্নত মস্তক নত করিয়া সব পাতা নোয়াইয়া সকল এরণ্ড তৈলক্ষরণ করিয়া বটবৃক্ষের পাদমূলে প্রদান করিয়া বলিল, "তুমি দেবাদিদেব, তুমি মহান, তোমার তুল্য আর কে আছে জগতে।"

"বলি মিন্সে এই জঙ্গলে পড়ে ঝিমুতে বসেছিস" বলিয়া প্রসন্ন গোয়ালিনী পৃষ্ঠে সম্মার্জ্জনীর এক ঘা লাগাইল। আমার চমক ভাঙ্গিল। দেখিলাম বটবৃক্ষ সত্য সত্যই নাই—আছে এরণ্ড মণ্ডলী। কিন্তু ঐ এক কোণায় একটা গাছ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন ওটা সত্যই বিলাতী বটের চারা।

মরুযাত্রী

শিল্পী—এডমাণ্ড ডুলাক
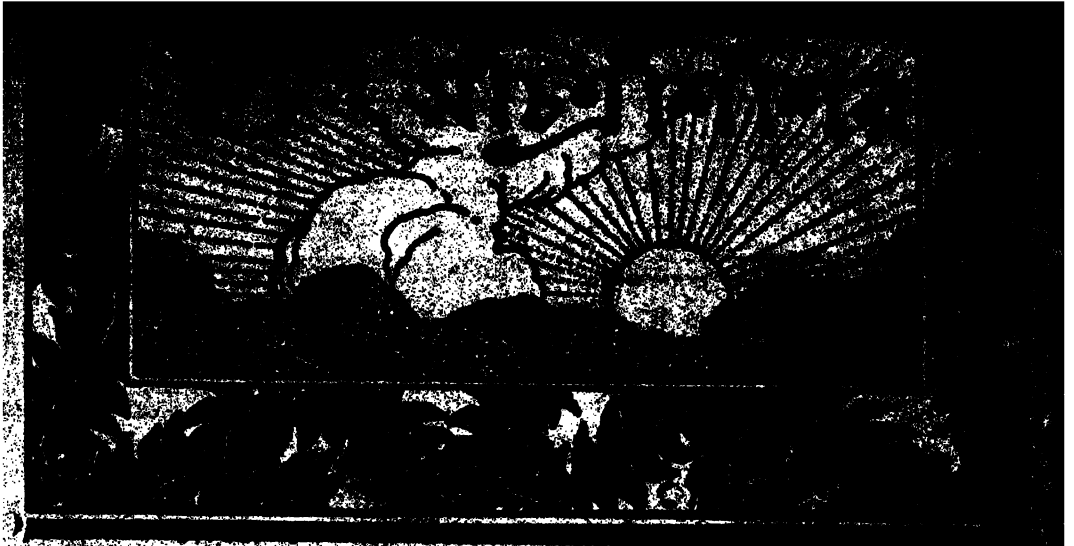
স্বামী-স্ত্রী

ওগো—হয় আলাদা হও, নয় ত আমায় এক্ষুণি বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও—এ বাড়ীতে আমি একদণ্ড টিকতে পারবো না।
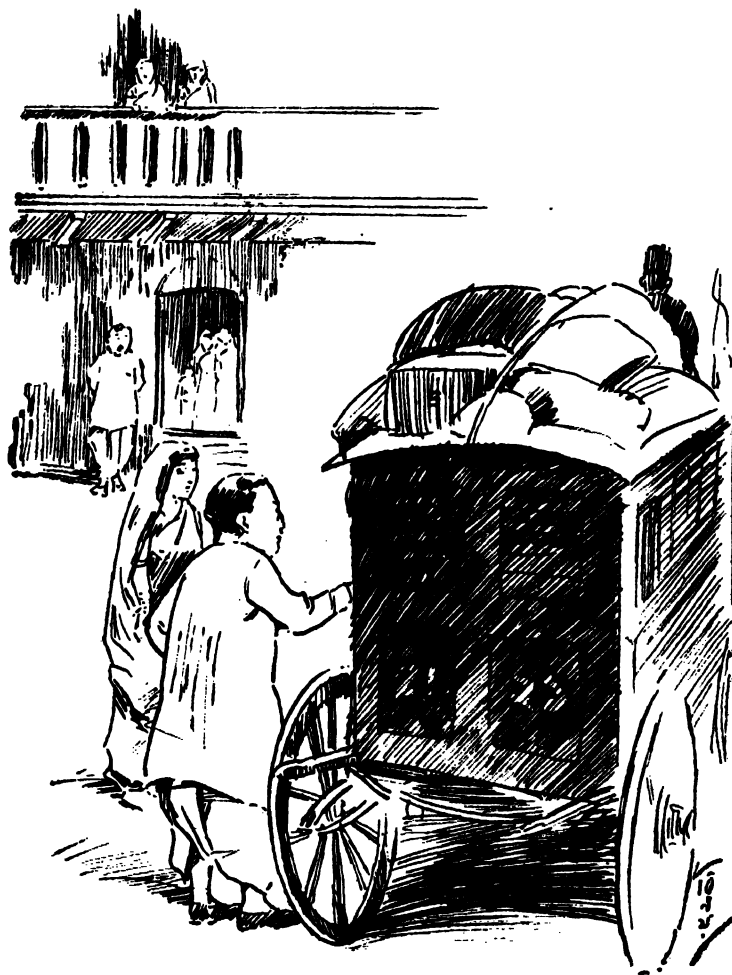
যখন বনচে না—তখন আলাদা হওয়াই সাব্যস্ত।
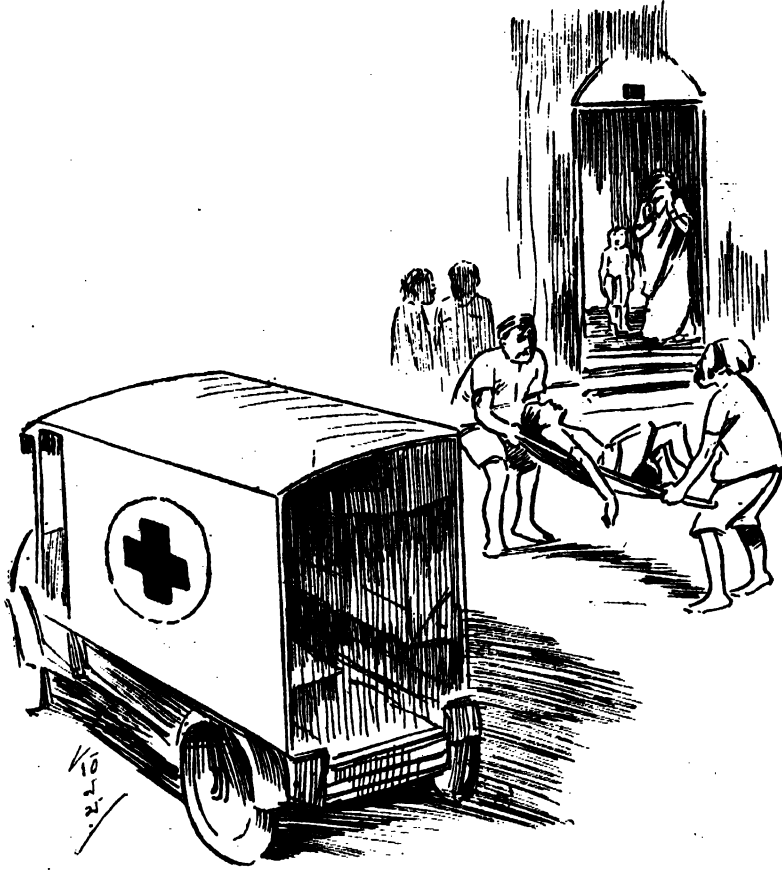
হায়! হায়! শেষে দেখবার লোকের অভাবে
হাঁসপাতালে যেতে হ'ল—কেন মা ভাইদের পর করে দিলুম।

এখন দেখবার লোকের মধ্যে পাড়া প্রতিবেশীরা—যারা কোম্পানীর কাগজগুলি ভাঙাবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

চরম দশা—দেখবার লোক—ভগবান

বাল-বিধবা
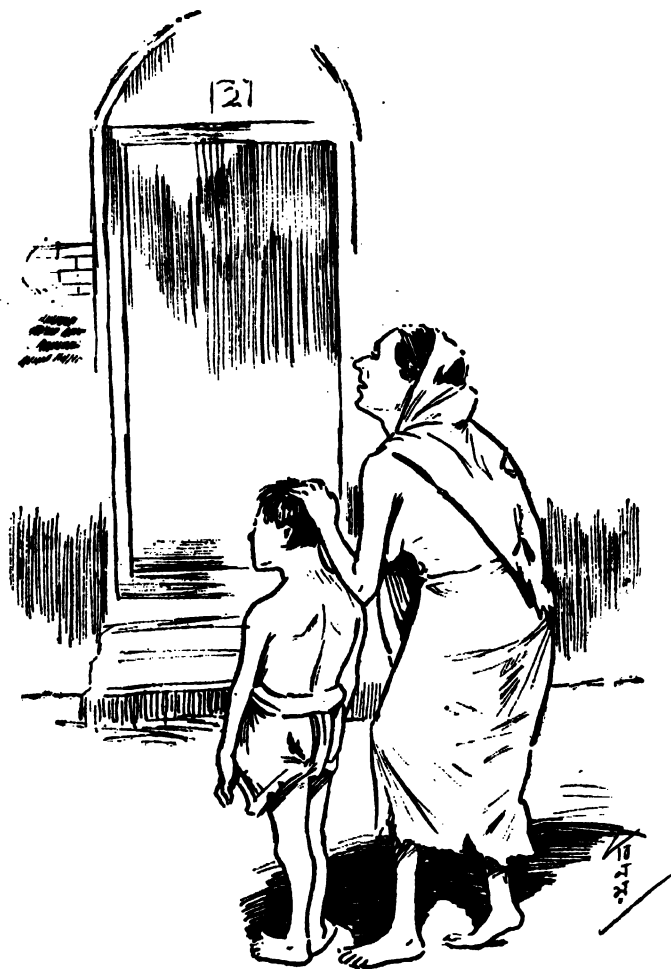
[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

আজি বিধবার নয়নের জলে
উপাধান তল ভিজিয়া ওঠে!

অনেক দিনের পুরাতন স্মৃতি
মনে এসে এসে আপনি জোটে।

মনে পড়ে, কবে এমনি নিশীথে
একেলা থাকিলে বকিত মোরে।

মনে পড়ে, কাছে ডাকিত আমারে
কি আদরে, আর কেমন ক'রে!

আমার হাসিটি, আমার কথাটি,
কি ভালো সে হায় বাসিয়াছিল!—

সুখের প্রদীপ তুলিয়া ধরিতে
নিয়তি কেন তা নিভায়ে দিল?

আজিও গগনে জমে ওঠে মেঘ
ঝর ঝর বারি ঝরিয়া পড়ে!

প্রিয়সমাগম স্মৃতিটি বহিয়া
রূপসী তরুণী একেলা ঘরে।

যদি দখিনের মাতাল পবন
মাথার কাপড় খুলিতে আসে
বাতায়ন হতে সরিতে হইবে
পাছে কেহ দেখে হাসে কি কাশে!

ঘরে ঘরে দেখি, কিশোরী যুবতী
করে বেশভূষা বিকাল বেলা।

স্বামীর বন্ধু, দেবরের সনে
কত কথা চলে, কত না খেলা!

বাঁধে সযতনে শিথিল কবরী,
সুচারু বসন ঘুরায়ে পরে।

খোলা হাত আর থান, হেরিলেই
দেহ-মন মোর কেমন করে!

কহ পণ্ডিত, সংযম তুমি
নিজে কোনদিন শিখেছ কিনা!

কিসে অধিকার হয়েছে তোমার
অসংযতারে করিতে ঘৃণা?

আমিষে নিষেধ, অথচ কুরুচি
উপন্যাসে ত নিষেধ নাহি!

বলিবেনা কিছু, বায়স্কোপে কি
থিয়েটারে যদি কখনো যাই-ই!

বিরহের গান শুনিতে আমার
বাধা কোনদিন রাখনি কিছু;

অথচ কহিছ, কামনা রবে না,
রহিলেই হবে জীবন নীচু!

ধন্য তোমার শিক্ষা প্রণালী,—
ইন্ধন থাক্ হাতেরি পরে,
ধিকি-ধিকি-ধিকি জলুক আগুন,
কহ 'ধিক্!' যদি পুড়িয়া মরে।

সে আসিত কাছে, সে বাসিত ভালো,
আজো যদি কেউ তেমনি আসে,
শুধু দুটি কথা শুনিতে আমার
দূর থেকে এসে বসে গো পাশে!—

ঝর ঝর ঝরে বরষা বাহিরে,
শিহরণ জাগে দু'খানি ঠোঁটে;
উপন্যাসের কথাটি স্মরিয়া
উপাধানতল ভিজিয়া ওঠে!

ওগো সাবধানী, সরাইয়া লহ
কামনায় ভরা কাহিনী মালা!
কর কষাঘাত, আঁখি তারকায়
যারা বিধবার বাড়ায় জ্বালা।
একদা যে মম ছিল প্রিয়তম,
তারি ছবিখানি রাখিনু বুকে;
হাতে জপমালা, গায়ে নামাবলী,
'শ্রীবিশ্বনাথ' কেবলি মুখে।

হেথা আনিয়োনা 'প্রীতি উপহার,'
প্রেম প্রণয়ের বিলাতী ছবি,
হেথা গাহিও না পরকীয়া-গীতি,
আসিও না হেথা, বিরহী কবি!
বাল-বিধবার ব্রহ্মচর্য্য
কঠোর সে হোক সকল দিকে।
তাইতেই যদি শান্তি থাকে ত' —
সার্থক করি জীবনটিকে।
ওগো জেনো জেনো, আমিও মানুষ,
ব্যর্থ হইতে দিওনা মোটে!
বড় যন্ত্রণা, বড় জ্বালা, তাই
উপাধানতল ভিজিয়া ওঠে।

সময়ের দান

—অজ্ঞ—

একটি ছোট ছেলে একটি পদ্মফুলের কুঁড়ি পাইয়াছিল। কুঁড়িটি সে প্রথমে ফুটাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। দাদার নিকট গিয়া ছেলেটি বলিল, "দাদা, ফুলটি ফুটিয়ে দাও।" বড় ভাই কুঁড়িটি লইয়া অনেক নাড়া-চাড়া করিল, কিন্তু উহা ফুটিল না। মার কাছে ছুটিয়া গিয়া ছেলেটি ব্যাকুল হইয়া বলিল, "মা, ফুলটি ফুটিয়ে দাও।" মা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বোকা ছেলে, এ যে কুঁড়ি— একি ফোটে?" ছেলেটি কাঁদ কাঁদ হইয়া পিতার নিকট গেল। তিনি নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ছেলেটি অধৈর্য্য হইয়া বারংবার তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "বাবা, ফুলটি ফুটিয়ে দাও, ও বাবা, কুঁড়িটি ফুটিয়ে দাও।" পিতা অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়াছিলেন, শেষে বিরক্ত হইয়া পুত্রের পৃষ্ঠে এক চপটাঘাত করিয়া বলিলেন, "যাঃ—দিক্ করিস্‌নে।" ছেলেটি ফুলের কুঁড়িটি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। বারে বারে আঘাত পাইয়া ও নিরাশ হইয়া ছেলেটির তখন খুব রোক্ হইয়াছে, সে যেমন করিয়া হোক্ কুঁড়িটি ফুটাইবেই। কখন মাটিতে ঘষিয়া, কখন ফুলের উপর আঘাত করিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করিল, তবুও সে ফুটিল না। শেষে ছেলেটি উহার পাপ্‌ড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কিন্তু ফুল তো নয়ন মেলিল না—অধিকন্তু কয়েকটা পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া গেল। তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অভিমান ভরে কুঁড়িটাকে নর্দ্দমায় ছুড়িয়া ফেলিল। কয়েকদিন পরে ছেলেটি হঠাৎ অবাক্ হইয়া দেখিল, যাহাকে ফুটাইবার জন্য সে এত চেষ্টা করিয়াছিল, তবুও ফুটে নাই, আর আজ নর্দ্দমায় পড়িয়া কুঁড়িটি কেমন করিয়া আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে!

উদ্বোধন

বোঝবার ভুল

[শ্রীপূর্ণিমা দেবী বি-এ]

—ক—

বোষ্টন সহরের বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকর মিঃ প্রতাপ সিং আর্, ই, র সঙ্গে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী রোয়েনার বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আত্মীয় ও বন্ধু মহলে এত বেশী রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে যে মিঃ ব্রাউন সেদিন প্রতাপের অথবা রোয়েনার ব্যক্তিগত মৌখিক সম্মতির অপেক্ষা না করে নিজেই মর্ণিং হেরাল্ডে বিবাহ প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।—প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌছেও ব্রাউন সাহেব যৌবনের প্রেম ভালবাসার চঞ্চল উন্মাদনার স্মৃতি এখনো ভোলেন নি।—তাই আজ ভ্রাতুষ্পুত্রীর নয়নকোণে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার মৃদু হাস্যরেখা কল্পনা করে স্নেহবৎসল পিতৃব্য টেবিলের সামনে এক চেয়ারে বসে আপন মনে হাসতে হাসতে প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেন।—অল্পকাল মধ্যেই রোয়েনা ও তৎপশ্চাৎ চায়ের সরঞ্জাম ইত্যাদি প্লেটে করে নিয়ে মুসলমান বেয়ারা গৃহে উপস্থিত হ'ল।—বয় চলে গেলে মিঃ ব্রাউন চামচ দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে রোয়েনার দিকে হঠাৎ কটাক্ষ করে বল্লেন—"কি বল মা! ভারতীয়কে বিবাহ করে ভারতবর্ষে চলে যাবে যখন—এ বুড়োকে মনে রাখবে ত? আমি জানি তোমরা এতে সুখী হবে—তাই তোমাদের না জিজ্ঞাসা করেই—বুঝ্‌লে—"

"কিন্তু কাকা—প্রতাপকে একবার জিজ্ঞাসা না করে—"

"আরে পাগ্‌লী!—আলাদা করে জিজ্ঞাসা করবার দরকার আছে কি কিছু!—আমি জানি সে তোকে ভালবাসে—প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে। তার চোখে মুখে স্পষ্ট ভাষায় এ কথা লেখা রয়েছে দেখেছি! সে যখন তোর সঙ্গে কথা কয় আমি লুকিয়ে সব দেখেছি—সব শুনেছি! আর তোর নিজেরই মনের কথা কি বুড়া জানে না মনে করেছিস? সেই প্রথম যেদিন তোদের দেখা হোল—আজও মনে করলে গা শিউরে ওঠে সে কি দুর্ঘটনা—! সেই দুর্য্যোগে গভীর রাত্রে থিয়েটার দেখে ফেরবার সময় দুজন মদোন্মত্ত সশস্ত্র অশ্বারোহী সেনার হাত থেকে তোকে রক্ষা করে নিষ্কলঙ্ক পবিত্র অবস্থায় আমার বুকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল—! তোর যে এ পুনর্জ্জন্ম—! আর এ জীবন শুধু তারই দেওয়া এ কথা কি আমি ভুলতে পারি—! আজও দেখছি চোখের সামনে—! কেন মা—সত্যি বল—তুই কি এতে অসন্তুষ্ট—তা'হলে—এখনও—"

"কাকা। কিন্তু তবু—তাকে একবার মুখের কথা—! তাকে পাবার আশা করা—যদিই ধৃষ্টতা হয়। আমি জানি সে চরিত্রবলে সূর্য্যের মত ভাস্বর—আমি তাকে আমার ক্ষুদ্র বুকে—"

"দূর পাগলী—আমিই কি জানি না তুই ক্ষুদ্র হয়েও শিশিরের মত স্বভাব-নম্র—আর শিশিরের ছোট বুকের ভেতর সমগ্র সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্থান পায়-"

এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে এক যুবক ছুটিয়া আসিল। মুখ তার পাংশু মলিন! হাতে মর্ণিং হেরাল্ড দৈনিক পত্র।—

ব্রাউন ও রোয়েনা সবিস্ময়ে দেখিল—সে প্রতাপ সিং।

—খ—

প্রতাপ নিজেকে সামলাতে পাচ্ছিল না।—তবু অনেক কষ্টে বলতে লাগল - "আমি লজ্জিত—বড় লজ্জিত মিঃ ব্রাউন ও মিস্ রোয়েনা! আপনারা আমাকে ভুল বুঝেছেন—আর ভুলের বশেই এরকম একটা কথা কাগজে ছেপে দিলেন যে এর জন্য দশের কাছে আমাকে ও আমার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী আপনাদের লাঞ্ছিত হতে হবে। আমি রোয়েনাকে ভালবাসতুম—বাসতুম কেন—বাসি একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছি ও করব।—কিন্তু আমি জানতুম না—ভালবাসার এই একমাত্র অর্থ আপনাদের অভিধানে লেখে। আমার এ অজ্ঞতার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি। ভারতীয় আমি - আর ভারতীয়ের মতই আমি আমার মা, বোন ও মেয়েকে যেমন ভালবাসি ও ভালবাসা কথায় প্রকাশ করি

রোয়েনাকেও আমি তেমনি সম্ভ্রমের চক্ষে, তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখেছি। রোয়েনাকে ভালবাসি তার সরল স্বভাবের জন্য আপনাকে ভালবাসি আপনার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের জন্য! কিন্তু আমি কোনোদিন বাক্যে অথবা অন্য কোনো প্রকারে প্রকাশ করিনি যে আমি তাকে প্রেমিকের চক্ষে দেখেছি। বিদেশে আমার সঙ্গী ছিল না—বন্ধু ছিল না—আপনারা আমার সে অভাব পূর্ণ করেছিলেন—তাই আমি আসতুম! আপনাদের সঙ্গে কথা কয়ে আমার চিরসন্তপ্ত জীবনে যথেষ্ট শান্তি পেতুম—তাই আমি আসতুম—! ছিঃ—ছিঃ—আপনারা আমাকে এরকম ভাবতেন জানলে—আমি কখনই—এখানে আসতুম না—!—"

"তা যদি হয় তাহ'লে বড় ভুল হয়ে গেছে ত—! আঃ সমস্ত দেশ বিদেশে খবরটা চলে গেল! সত্যিই ত—তা'হলে—! কিন্তু তুমি কি বিবাহ করতে পার না—কেন—রোয়েনা কি এতই অনুপযুক্ত—"

"তা—একেবারেই অসম্ভব—কেননা—কেননা—আমি বিবাহিত—"

সবিস্ময়ে রোয়েনা চমকিয়া মৃদুস্বরে প্রতিধ্বনি করিল—"বিবাহিত!"

মিঃ ব্রাউন বলিলেন—কিন্তু তুমি এখানে প্রায় দীর্ঘ তিন বৎসর এসে রয়েছ! একদিনও ত—

"তবে শুনবেন আমার দুঃখের কাহিনী? স্বর্গীয় পিতা বাক্যদত্ত ছিলেন—তাই আমাকে বিয়ে করতে হয়েছিল—তাঁরই এক বন্ধুর মেয়েকে। ভেবেছিলুম—একদিনে না হয় দশদিনে তার হৃদয় জয় করব—! কিন্তু দু'বছর কেটে গেল—আমি তাকে বুঝতেই পারলুম না। আমি তার কাছে নারীত্বের যে আদর্শটুকু প্রত্যাশা করতুম তা আমি পেলুম না। ভাবলুম বাধ্য-বাধকতায় পড়ে তাকে বিয়ে করতে হয়েছে বলেই হয়ত সে অসুখী—হয়ত সে আমাকে চায় না—ঘৃণা করে! তাই—তাই আমি তাকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে চলে এলুম। আমি ভালবাসা দিতে পারি নি সত্য কিন্তু তবু তাকে অমর্য্যাদা করতে পারবো না!"

"কিন্তু রোয়েনাকে কলঙ্ক থেকে মুক্ত করবার উপায় কি হবে? বিবাহ-প্রতিশ্রুতি মুদ্রিত হবার পর তুমি যদি তাকে বিয়ে না কর—! কেন তুমি ত বল্লে তোমার স্ত্রী তোমাকে ঘৃণা করেন। তিনি ত ডাইভোর্স কোর্টে—"

"কিন্তু মিঃ ব্রাউন—হিন্দু শাস্ত্রে ডাইভোর্স নেই! সেখানে হয় চির মিলন—নয় চির বিচ্ছেদ—"

"তবে উপায় নেই-?"

"একমাত্র উপায় লছমী নিজে যদি মুক্তিপত্র দেয়—অনুমতি দেয়! কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে—! পিতৃ আদেশে বিবাহ করেছি—কেমন করে আবার তাকে বলব—"

"বেশ—তাই যদি—আমরা তোমার লছমীর কাছে ভিক্ষা চাব। এতদূর এগোনার পর বিয়ে না হওয়াটা মোটেই ভাল দেখায় না—আমি আজই চিঠি লিখব—! বিয়ের পর তোমায় সম্পূর্ণ মুক্তি দেব আমরা—! তবু বিয়ে তোমাকে করতেই হবে আমার মুখ চেয়ে—আমার কন্যাসমা রোয়েনার মুখ চেয়ে—! চিঠির জবাব পেয়ে যা করবার ভাবা যাবে—! কি বলিস রোয়েনা—"

কিন্তু রোয়েনা কোথায়? সে শেষ দিককার আলোচনা একটুও না শুনে দুজনকারই অজ্ঞাতে অন্য ঘরে চলে গেছে!

— গ —

ঘুম থেকে উঠেই লছমী দেখলে—শিশু পুত্র লক্ষ্মণ তার অতি সযতনে লুকিয়ে রাখা স্বামীর ফটো চিত্রখানা বার করে বিজ্ঞের মত দেখছে—সম্ভব সে বুঝতে চাচ্ছে তার মা সে ছবিখানাকে অত যত্ন করে দেখে আর নীরবে কাঁদে কেন—! পিতা কি আর কেহ তার এ দুর্ব্বলতা যদি ধরে ফেলেন—তাই লছমী তাড়াতাড়ি ফটোখানা কেড়ে নিলে। কিন্তু ছেলে যখন তাতে অভিমান করে ঠোঁট ফুলিয়ে বসল—তখন আবার তাকে সেখানা দিতে হোল!

লছমী আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! তুচ্ছ অভিমানের বশে সে স্বামীকে ঘরছাড়া করেছিল—এর জন্য সে বড় অনুতপ্ত! কিন্তু এতদিন ভাঙা মনকে এই বলে খাড়া করে রেখেছিল যে, যে স্বামী তাকে অনুতাপ করবার শোধরাবার সময়টুকু পর্যন্ত না দিয়ে তাকে ত্যাগ করে চলে গেল—তাকে সে ক্ষমা করবে না—! আজ ত মন আর প্রবোধ মানে না। তিন বৎসরের যুদ্ধে সে আজ ক্লান্ত!—সে আজ

মুমূর্ষু! আর ত প্রতীক্ষা করবার দিনও বাকী রইল না!—জগতের সঙ্গে দেনা-পাওনা শেষ করে দেবার দিন এসেছে। কিন্তু জমার ঘর যে তার ফাঁকিই পড়ে রইল! স্বামী ত ফিরে এলেন না! স্বামী ত ক্ষমা করলেন না! আর যার গচ্ছিত ধন সে জোর করে রেখেছে—তাঁকে ফিরে দেওয়ারও ত সুযোগ ঘটল না! সে কি এত হতভাগ্য যে কালী মাঈজীর কাছে নিত্য প্রার্থনা জানালেও তিনি তা শুনলেন না!—

হতাশ হয়ে কাতর প্রাণে লছ্‌মী ডাকতে লাগল—"আরো কতদিন—তোমার প্রতীক্ষা করব! তুচ্ছ অভিমান টুকু মনে করে রেখেছ। তুমি কি ক্ষমা করবে না আমায়। আমায় না ক্ষমা কর—লক্ষ্মণ—এতটুকু ক্ষুদ্র শিশু এ তোমার চরণে কোন অপরাধে অপরাধী! আমি তাকে তোমার কাছে না ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পাচ্ছি না—তুমি এস—এস—ফিরে এস—!"

পিতা হরকিষণ ক্রোধোন্মত্তের মত এসে একখানা চিঠি ছুঁড়ে ফেলে বললেন—"দেখছিস—হতভাগা একেবারে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে, তোর কাছে মুক্তি-পত্র চায়—যাতে সে আবার বে করতে পারে—আস্পর্দ্ধা বটে! তিন বছর পরে—এই তার চিঠি এল—হতভাগাকে কাছে পেলে নখ দিয়ে চিরে মারতুম—" হরকিষণ তেমনি উন্মত্তভাবেই প্রস্থান করিলেন।

লছ্‌মী আত্মগত হয়ে বললে—"আমি ত তোমাকে মুক্তি দেবার জন্য মৃত্যুকে বরণ করেছি—কিন্তু একবার—একবার ক্ষমা করে যাও—একবার এস—"

পরক্ষণেই রোয়েনা এসে বললে—"তুমিই লছ্‌মী! কিন্তু একি মূর্ত্তি তোমার! আমি যে এসেছি—আমি যে বড় আশা করে এসেছি তোমাদের মধ্যেকার বিরুদ্ধ বাধা ভেঙে দিয়ে আবার মিলনের বাঁধন বাঁধব। তাই ত পিতৃব্যের কথা না শুনে নিজে লুকিয়ে চলে এসেছি। নিজের বিন্দুমাত্র ভাবনা না ভেবে যাতে তোমরা পিতৃব্যের চিঠি পেয়ে ভয়ঙ্কর ভুল না কর—তাই নিজে লুকিয়ে এসেছি! আমি তোমায় পালাতে দেব না! আমি জানি তুমি স্বেচ্ছায় কখনো স্বামীকে ছেড়ে দাও নি। আমি জানি নিশ্চয় কোন' তুচ্ছ কারণে মনোমালিন্য ঘটেছিল আর আমি তাই দূর করবার জন্য—সব চেয়ে শীঘ্রগতি জাহাজেও মেলে করে এসেছি। আমি তোমায় পালাতে দেব না—কিছুতেই পালাতে দেব না।"

কিন্তু বড় দেরী হয়ে গিয়েছিল। নিরন্তর প্রাণপাত করে শুশ্রূষা করেও লছ্‌মীকে ক্ষয় রোগের নিশ্চিত গ্রাস হতে বাঁচাতে পারলে না! রোয়েনাকে লছমী যাবার সময় দু'ফোঁটা অশ্রু আর পুত্র লক্ষ্মণকে উপহার দিয়ে গেল।

রোয়েনা লছ্‌মীকে বুকে জড়িয়ে নীরবে কাঁদতে লাগল।

তারপর প্রতাপও এসেছিল। কিন্তু তখন বাড়ীতে কান্নার রোল উঠে গেছে! লছ্‌মীর সঙ্গে শেষ দেখা হোল না। রোয়েনার সঙ্গে দেখা হলে রোয়েনা সরে দাঁড়াল। একটা কথা পর্য্যন্ত কইল না।

—ঘ—

বার বছর কেটে গেছে। প্রতাপের আজও কোন খবর নেই।—

ব্রাউন সাহেব রোয়েনার কাছেই এসেছিলেন। লক্ষ্মণ তাঁর বুকে পিঠে চড়ে স্নেহের আবদার—আর তিনি শুধু হাসতেন। কিন্তু সে হাসির আড়ালে একটা মর্ম্মান্তিক ব্যথার ক্রন্দন গুমরে উঠত। তারপর একদিন তিনি মারা গেলেন।—হরকিষণও আর ইহলোকে নাই।

রোয়েনা লক্ষ্মণকে বুকের আড়ালে লুকিয়ে লছমীদের ঘরটাতেই তার জীবনের দিনগুলা কাটিয়ে দিচ্ছে!

কিন্তু আজও নিশীথ রাতে রোয়েনা শুনতে পায় প্রতাপ যেন কেঁদে বলছে—"ভুল বুঝেছিলুম লছমী—কিন্তু ক্ষমা তুমি করলে না!

বঞ্চিতা

[রাজকুমারী শ্রীমতী বেদবালা দেবী]

বঞ্চিতা বঙ্গ ললনা।
কপালে তাদের কি কলমে তুমি
লিখেছ বিধাতা বলনা।

যাদের লাগিয়ে কেঁদে মরি মোরা
তারা তো ফিরিয়া চায় না,
পরের লাগিয়ে প্রাণ বলি দিয়ে
বদলে কিছুই পায় না।

কোথা গৃহ কোণে গুমরিয়া মরে
কেহ তার খোঁজ লয় না।
কিবে তার দুখ কেহ না শুধায়
কেহ ডেকে কথা কয় না।

দাসীর দশায় দিন যায় তবু
কপালের লেখা মুছে না
দশ জনে যার করুণায় বাঁচে
অবলায় সে তো পুছে না।

যদি না করিবে আদর যতন
তবে কেন মিছে বল না,
বনের পাখীরে সোণার খাঁচায়
ধরে রেখে এই ছলনা।

শুনেছি হে হরি সবে ছেড়ে যায়
তুমি শুধু ছেড়ে যাও না।
কাছে থাক যদি রমণী হৃদয়
কিছু কি দেখিতে পাও না?

অথবা কি লাগি জীবন আমার
ভাঙিছে নিঠুরাঘাতে
নূতন করিয়া গড়িবে বুঝিবা
তব মঙ্গলময় হাতে?

তবে তাই হোক্ গড়ু এ জীবন
দুঃখ তাপ করি ক্ষয়
তোমার মহিমা ভরিয়া উঠুক
সারাটি জীবনময়।

সতীত্বের সাহস

(একটী ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে)

(গল্প)

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

(১)

"বাবা!"

"কি মা!"

"তুমি তখন থেকে কি ভাবছো বল দেখি?"

রাজা কৃষ্ণরাম রায় কন্যার পৃষ্ঠে স্নেহ-হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন. "আমার কত ভাবনা মা তা তুই কি বুঝ্‌বি বল।"

আগ্রহ ভরে তারাদেবী বলিলেন, "তবু বলই না শুনি?"

"শোভাসিংহ বিদ্রোহের সূচনা ক'রেছে মা।"

"বিদ্রোহ!"

"হ্যাঁ মা বিদ্রোহ; আর তার বিদ্রোহের উপলক্ষ্য আমার সাথে বিবাদ। সৈন্য সামন্ত নিয়ে সে এই বর্দ্ধমানের দিকেই অগ্রসর হ'চ্ছে।"

"সে তো 'চেতো বরদার' একজন সামান্য তালুকদার, তার কি এতখানি সাহস হবে বাবা?"

কৃষ্ণরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হবে কিরে পাগলি? হ'য়েছে যে! আর সে-তো সামান্য নয় মা! উড়িষ্যা থেকে পাঠান দলপতি রহিম খাঁ-ও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।"

চিন্তিতা ভাবে তারাদেবী বলিলেন, "তাইতো! তা'হলে এখন কি কোরবো বাবা?"

"যুদ্ধ। তা ছাড়া আর উপায় নেই মা! ভীরু কাপুরুষের মত বিনা যুদ্ধে তো আর রাজ্যটা ছেড়ে দিতে পারিনে। কি বলিস্?"

বীর রমণীর দৃপ্ত হৃদয়ে উষ্ণ রক্তপ্রবাহ আলোড়িত হইয়া উঠিল, গর্ব্বিত সতেজ স্বরে তারাদেবী বলিলেন, "নিশ্চয়ই!"

"কিন্তু মা, এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত।"

"পরাজয়! কেন? এই বর্দ্ধমানে তোমার এতবড় রাজ্যটার ভিতর আমাদের সাহায্য কোত্তে কি কেউ নেই বাবা?"

"আছে বৈকি মা, তোর দাদা জগৎ আমায় সাহায্য কোর্ব্বে।"

"শুধু দাদা! কেন বাবা আর—আর কেউ—" তারা দেবীর পরম সুন্দর মুখখানি লজ্জার আবিরে আরক্তিম হইয়া উঠিল।

সস্নেহ হাস্যে রাজা কৃষ্ণরাম বলিলেন, "ইন্দ্রসেনের কথা ব'লছিস্ মা? হ্যাঁ—সেও আমার পক্ষে যুদ্ধ কোরবে। সেনাপতির পদ আমি তাকেই দোবো ভাবছি।"

আনত আননে তারাদেবী বলিলেন, "তবে?"

"শুধু সেনাপতি থাকলে তো যুদ্ধ হয়না মা! সৈন্য চাই! আমাদের সৈন্য নেই যে! যা আছে, তা তাদের তুলনায় অতি সামান্য। যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হবেই।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তারাদেবী বলিলেন, "তাইতো! এক কাজ কোল্লে হয়না বাবা?"

কৃষ্ণরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি মা! সন্ধির কথা বলছিস? বর্দ্ধমানের রাজা একজন সামান্য বিদ্রোহী তালুক-দারের সাথে সন্ধি কোর্ব্বে? তা হয়না মা; আমি ভেবে দেখেছি যুদ্ধ হবেই।"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া তারাদেবী বলিলেন, "বিদ্রোহীরা বর্দ্ধমানে কবে পৌঁছবে বাবা?"

"খুব সম্ভব পরশু; কিন্তু তার পূর্ব্বেই আমি তাদের আক্রমণ কোর্ব্বো। তুই একবারটী যা তো মা, আমি একটু ভেবে দেখি; আর হ্যাঁ, জগৎকে একবার পাঠিয়ে দিস্ মা।"

তারাদেবী চিন্তা ক্লিষ্ট হৃদয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। আশার শেষ রশ্মিটুকু তখনো তাহার রমণী হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিয়া যে চির আকাঙ্খিত বস্তুটী দেখাইয়া দিতেছিল—তাহা ইন্দ্রসেনের পুরুষোচিত যৌবনদৃপ্ত সুন্দর মুখচ্ছবি।

(২)

রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের ভবিষ্যৎবাণী বিফল হইল না। তাহার স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত সৈন্য প্রাণপণে তুমুল যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু অগণ্য বিদ্রোহী সৈন্যের সম্মুখে অধিকক্ষণ তিষ্টিতে পারিল না, একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই জগৎরাম গোপনে কৃষ্ণনগর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। দুঃসাহসী কৃষ্ণরাম শোভাসিংহের হস্তে নিহত হইলেন। সেনাপতি ইন্দ্রসেন সামান্য কয়েকজন অনুচরবর্গ-সহ শেষ পর্য্যন্ত অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহার মুষ্টিমেয় সৈন্যের পরাজয় কৃতনিশ্চয় জানিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন।

রাজা কৃষ্ণরামের প্রাসাদ-শিখরে বিদ্রোহীদের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইল। বিজয়ী শোভাসিংহের আদেশে রাজ পরিবারবর্গ সুরক্ষিত প্রাসাদ দুর্গের মধ্যেই বন্দী হইয়া রহিলেন; প্রতি কক্ষদ্বারের প্রহরায় একজন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত হইল। কিন্তু এইখানেই শোভাসিংহের ক্রুর আকাঙ্খার পরিসমাপ্তি হইল না, তাহার বাসনা-কলুষিত লোলুপ দৃষ্টি শীঘ্রই লোকললামভূতা রূপসী রাজকন্যা তারাদেবীর উপর আপতিত হইল। বিদ্রোহী ইন্দ্রিয়দাস রাজকন্যাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কক্ষে একাকিনী বন্দিনী করিয়া রাখিলেন।

তখন সন্ধ্যাকাল। আকাশে অসংখ্য তারকা-মালা ভয়চকিত নেত্রে লাঞ্ছিতা অপমানিতা বর্দ্ধমান নগরীর ম্লান শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। প্রকৃতি দেবী স্তম্ভিতা, চতুর্দ্দিক নীরব, নিস্পন্দ, লুণ্ঠন-ভয়-ব্যাকুল। এমন সময় ধীরে ধীরে শোভাসিংহ তারাদেবীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সন্তু-শোকাকুলা তারাদেবী তখন চিন্তাকুল হৃদয়ে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন. শোভাসিংহকে দেখিয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাড়াইয়া কহিলেন, "আপ্‌নি! এখানে কি উদ্দেশ্যে?"

শোভাসিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "উদ্দেশ্য? তা আছে বৈকি তারা! তুমি আমার বন্দিনী।"

ঘৃণাভরে তারাদেবী বলিলেন, "ওঃ তা বটে!"

"আমি ইচ্ছে কোরে তোমায় বধ কোত্তে পারি।"

"পারেন? তবে বিলম্বের প্রয়োজন কি? এখনই করুন না।"

"কিন্তু স্ত্রীহত্যা কোত্তে আমার একটুও ইচ্ছে নেই, আমি তোমাদের মুক্ত করে দেবো।"

"বন্দিনীর উপর হঠাৎ এত অনুগ্রহ কেন বলুন তো?"

"অনুগ্রহ নয় তারা, এ তোমার অধিকার; আমি তোমায় প্রাসাদে বন্দিনী না কোরে হৃদয়ে বন্দিনী কোত্তে চাই। বল তারা, তুমি আমার হবে?"

এতক্ষণ পরে শোভাসিংহের কলুষিত মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তারাদেবী সর্পদষ্ট ব্যক্তির মত চম্‌কিয়া উঠিলেন; তাহার চিন্তা-ব্যাকুলিত মুখমণ্ডল আরও মলিন হইল।

রাজকন্যাকে নীরব দেখিয়া শোভাসিংহ দুইপদ অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বল তারা, একবার বল—"

আহত ব্যাঘ্রীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া তারাদেবী সদর্পে বলিলেন, "ঐ খানেই দাঁড়ান ব'লছি, আর এক পাও অগ্রসর হবেন না; মনে রাখবেন, আপ্‌নি একজন সামান্য তালুকদার মাত্র।"

শোভাসিংহের চক্ষু দুইটী পৈশাচিক অনলে জ্বলিয়া উঠিল; মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "তা আমি নতমস্তকে স্বীকার কোচ্ছি তারা! মেদিনীপুর থেকে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যে বিশাল রাজ্য অতুল ধন-সম্পত্তি আমি জয় ক'রে এনেছি, তার একমাত্র ভবিষ্যৎ রাণী তুমিই। আমি চিরদিন তোমার তালুকদার · তোমার ক্রীতদাস হ'য়েই থাকবো। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তোমার ঐ হৃদয় রাজ্য কি আমায় দান কোর্ব্বে না তারা?"

কক্ষদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তারাদেবী বলিলেন, "যান বলছি, পিতৃহন্তার অর্থ প্রলোভনে ভোলবার মত হৃদয় ঈশ্বর আমায় দেন নি জানবেন। আপনার কুপ্রবৃত্তি কখন পূর্ণ হবে না।"

"তাহ'লে তুমি আমার হবে না তারা?"

রাজকন্যা সগর্ব্বে বলিলেন, "নিশ্চয়ই না, আপনার কথা শুনলেও ঘৃণা হয়।"

শোভাসিংহ শান্তস্বরে বলিলেন, "তাহ'লে আজ আমি যাচ্ছি তারা! কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো। একদিকে অতুল ধন-সম্পত্তি, অফুরন্ত আদর ভালবাসা, প্রভূত মান সম্মান; আর অন্যদিকে অপমান, লাঞ্ছনা এবং শেষে বোধ হয় মৃত্যু।"

(৩)

"তারা!"

রজনীর মধ্যযামে সুষুপ্তিমগ্না তারাদেবী আগন্তুকের মৃদু করস্পর্শে চমকিয়া উঠিলেন। ছিন্ন জ্যা ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিয়া রাজকন্যা বলিলেন "আবার এসেছেন আপনি? পাপিষ্ঠ!"

সবিস্ময়ে আগন্তুক বলিলেন, "তুমি কি বলছো তারা!"

"ব'লছি আপনার দুরভিসন্ধি কিছুতেই পূর্ণ হবে না জানবেন; সমস্ত ভারত সাম্রাজ্যের বিনিময়েও না।"

"তারা!"

"সাবধান! গায়ে হাত দেবেন না বলছি।"

"সেকি তারা! তুমি কাকে কি বলছো! এ সব কথার অর্থ কি তারাদেবী?"

তারাদেবীর কণ্ঠস্বর সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, বিস্ময়-পূর্ণ মৃদু-মধুর স্বরে তিনি বলিলেন, "তুমি!—তুমি!"

হ্যাঁ তারা, আমি ইন্দ্রসেন। তুমি কি ভেবেছিলে?"

"আমি ভেবেছিলুম পাপিষ্ঠ শোভাসিংহ বুঝি! তুমি এখানে কি করে এলে ইন্দ্র?"

"ওঃ সে অনেক কষ্টে, প্রহরীদের উৎকোচে বশীভূত কোরে। শোভাসিংহ তোমাদের উপর কোন অত্যাচার করেনি তো?"

তারাদেবী চিন্তিতভাবে বলিলেন, "না করেনি, তবে করবারও বোধ হয় দেরী নেই। দাদার খবর জানো?"

ইন্দ্রসেন ঘৃণাভরে বলিলেন, "কাপুরুষ স্ত্রীর অধম!"

"কেন?"

"যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে পালিয়েছে।"

"পালিয়েছে।"

"হ্যাঁ পালিয়েছে, জগৎ না পালালে বোধ হয় আমরা যুদ্ধে জয়ী হ'তে পাত্তুম।"

তারাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু তুমিও তো পালিয়েছ ইন্দ্র?"

ইন্দ্রসেন অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "হ্যা পালিয়েছি তারা। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রে যখন দেখলুম রাজা নিহত, জগৎ সসৈন্যে পলায়িত, সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে জয়াশা সুদূর পরাহত, তখন যুদ্ধের বাতুলতা ত্যাগ করে পালালুম। কিন্তু সে তোমারই জন্য তারা!"

"আমার জন্য!"

"হ্যাঁ তোমারই জন্য। প্রাণ ভয়ে আমি ভীত নই তারা, কিন্তু যুদ্ধে নিরর্থক প্রাণদান ক'রে তোমাদের শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারিনে তো! আমার পালাবার উদ্দেশ্য তোমাদের উদ্ধার করা, শোভাসিংহের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া, তোমার পিতৃহন্তার রক্তে তরবারী রঞ্জিত করা।"

তারাদেবীর নয়ন দুটী শিশির-স্নাত পদ্মের মত সজল হইয়া উঠিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "পারবে ইন্দ্র? পারবে?

"কি তারা?"

"আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে?"

"নিশ্চয়ই পারবো তারা। আমি সৈন্য-সংগ্রহ করছি; উপযুক্ত সৈন্য পেলেই বিদ্রোহীদের আক্রমণ করবো।"

"সংগ্রহ কর্ত্তে পেরেছ?"

"না পারিনি। জগৎ সাহায্য কর্ত্তে অনিচ্ছুক! তা ছাড়া গ্রামবাসীদের মধ্যে সহজে কেউ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস কচ্ছে না। তবে তোমাদের বোধ হয় দু'চার দিনের মধ্যেই উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবো আশা করি।"

"কোথায় নিয়ে যাবে?"

"সেই অরণ্যের গুপ্ত প্রাসাদে; আমরা সেইখানেই আছি তারা।"

আরও কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর তারাদেবীর হাত ধরিয়া ইন্দ্রসেন ডাকিলেন, "তারা!"

প্রণয়পূর্ণ কণ্ঠে তারাদেবী বলিলেন, "বল।"

তাহলে আজ আসি তারা? বোধ হয় আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে। চারিদিকে শত্রুর গুপ্তচর, বেশীক্ষণ থাকতে সাহস হয় না। আসি?"

ত্রস্তে চোখের জল মুছিয়া তারাদেবী বলিলেন "এসো।"

ইন্দ্রসেন দুইপদ অগ্রসর হইলে তারাদেবী বলিলেন, "হ্যা দেখ।"

"কি তারা।"

"তোমার কাছে কোন অস্ত্র আছে?"

"কেন বলতো?"

"আমাকে দিতে পার?"

"কি করবে?"

"দাও, হয় ত প্রয়োজন হতে পারে; সঙ্গে থাকা ভাল।"

ইন্দ্রসেন কটিদেশ হইতে একখানা তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া তারাদেবীর হস্তে প্রদান করিলেন; অন্ধকারেও ছুরিকাখানি জল জল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তারাদেবী একবার চকিতে চাহিয়া দেখিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ বসনাভ্যন্তরালে লুক্কায়িত করিলেন।

(৪)

শোভাসিংহের শত অনুনয় বিনয়, শত প্রলোভন এবং ভয় প্রদর্শনেও যখন দর্পিতা তারাদেবীর পবিত্র সতী হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিল না, তখন নরপশুর বাধাপ্রাপ্ত বাসনা-অনল সেই দেবী প্রতিমাকে দগ্ধ করিবার জন্য আরও দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। শোভাসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যেরূপেই হউক সেই স্বর্গের পারিজাতটীকে সে তাহার পাশবিক বৃত্তির নিকটে বলি দিবেই। কিন্তু একে একে সমস্ত অনুকূল পন্থাগুলিকে নিষ্ফল হইতে দেখিয়া অবশেষে সে বলপ্রয়োগে কৃতসংকল্প হইল।

একদিন গভীর নিশীথে স্বীয় পৈশাচিক প্রবৃত্তি পরিসাধন কল্পে শোভাসিংহ অতি সন্তর্পণে বন্দিনী রাজকন্যার কারাকক্ষে প্রবেশ করিল। পাপীর কলুষস্পর্শে সুষুপ্তা তারাদেবী চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন, অদূরে প্রজ্জলিত বর্তিকা হস্তে মূর্তিমান পাপের ন্যায় শোভাসিংহ দণ্ডায়মান! পদদলিতা ভুজঙ্গিনীর মত গর্জিয়া উঠিয়া রাজকন্যা বলিলেন, "দূর হও বলছি নরপিশাচ!"

শোভাসিংহ সভয়ে দুইপদ সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "যত পার তিরস্কার কর সুন্দরী, কিন্তু শত তিরস্কারের পরিবর্তেও তুমি আমার হও।"

"আপনার প্রশ্নের উত্তর তো অনেকদিন পেয়েছেন। তবে কেন আমায় বৃথা বার বার উত্যক্ত করেন?"

শোভাসিংহের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। ক্রোধ কম্পিতস্বরে তিনি বলিলেন, "তাহ'লে তুমি আমার হবে না?"

"না।"

"আমার সমস্ত রাজ্য ধন সম্পত্তির বিনিময়েও না?"

"পৃথিবীর বিনিময়েও নয়।"

"এই শেষ কথা?"

"নিশ্চয়ই তাই।"

কামনা-লোলুপ দৃষ্টিতে তারাদেবীর পানে চাহিয়া শোভাসিংহ বলিলেন, যদি বলপ্রয়োগ করি?"

রাজকন্যা বুঝিলেন, শোভাসিংহ আজ কিছুতেই নিরস্ত হইবে না; তবু একবার শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য বলিলেন, "আপনার কি মাতা বা ভগ্নি নেই?"

পাপিষ্ঠ শোভাসিংহ নিরুত্তরে একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাহ'লে আমার আর কোন দোষ নেই তারাদেবী, আমি তোমাকে চাই-ই।"

উন্মত্ত কুকুর দুইপদ অগ্রসর হইবামাত্র তারাদেবী সতেজে বলিলেন, "সাবধান তালুকদার! নিজের বিপদকে স্বেচ্ছায় ডেকে এনো না।"

হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া শোভাসিংহ বলিল, "ভয় দেখাচ্ছ? স্ত্রীলোককে ভয় করবার মত কাপুরুষ আমি নই তারা!"

মোহমুগ্ধ পতঙ্গের মত শোভাসিংহ উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া রূপের তুষানলে ঝাঁপ দিয়া পড়িবামাত্র মুহূর্তে বসনাভ্যন্তরাল হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া রাজকন্যা তাহার উদর মধ্যে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন; করুণস্বরে চীৎকার করিয়া শোভাসিংহ ভূপতিত হইল। রক্তাপ্লুত ছুরিকাখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাজকুমারী একবার চকিতে

চাহিয়া দেখিয়া উন্মত্তার মত হাসিয়া বলিলেন, "পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি"; পরমুহূর্ত্তেই তৃষিত ছুরিকাখানি স্বীয় কুসুম-কোমল বক্ষে প্রোথিত করিয়া দিয়া তারাদেবী কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

সহসা বহির্দ্দেশ হইতে একটা তীব্র কোলাহল উত্থিত হইল। উলঙ্গ অসি হস্তে ইন্দ্রসেন তড়িতবেগে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'তারা! তারা! আমরা প্রাসাদ অধিকার করেছি, শীঘ্র উঠে এসো, শীঘ্র চল, শীঘ্র ——"

কক্ষ তলে দৃষ্টি পড়িতেই ইন্দ্রসেন স্তম্ভিত স্তব্ধ হইয়া গেলেন! তারাদেবীর শোণিত-সিক্ত মুমূর্ষু দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সবিস্ময়ে ইন্দ্রসেন বলিলেন, "তারা! একি দেখছি! স্বপ্ন?"

ক্ষীণকণ্ঠে রাজকন্যা বলিলেন, "আমায় ক্ষমা কর ইন্দ্র!"

ইন্দ্রসেনের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল; প্রণয়িণীর মৃত্যু-মলিন মুখখানি সযত্নে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "একি করলে তারা! কেন এমন কোল্লে?"

ক্ষীণতর কণ্ঠে রাজকন্যা বলিলেন, "পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি ইন্দ্র; কিন্তু পাপীর স্পর্শে কলঙ্কিত দেহভার বহন কোত্তে পারলুম না। আসি প্রিয়তম!"

উন্মাদের মত লাফাইয়া উঠিয়া ইন্দ্রসেন বলিলেন, "তারা —নয়ন তারা! দাঁড়াও, দাঁড়াও একটু, আমিও যাচ্ছি। আমারি ছুরিকা তোমার রক্ত পান ক'রেছে প্রিয়তমে! আমার রক্তও সেই পান করুক।"

তারাদেবীর বক্ষ হইতে ছুরিকাখানা সবলে টানিয়া লইয়া ইন্দ্রসেন ক্ষিপ্তের মত স্বীয় কণ্ঠদেশে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন; মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণহীন দেহ রাজকন্যার বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল।

পন্থা

(মিরাবাই)

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

নিত্যস্নানে মিললে হরি, অনেক আছে জলের জীব;
বাছুড়, কপি পাবেই, যদি ফলমূলেতে থাকেন শিব।
দূর্ব্বা ভোজে মিল্‌লে, আছে অনেক অজ, কুরঙ্গক;
নারী ত্যাগে মিল্‌লে হরি, পাবেই তারে নপুংসক।
বালক আছে, অনেক, যদি মিল্‌বে ক'রে দুগ্ধপান;
মিরা কহে, 'মিলবে না সে বিনা প্রাণের প্রেমের টান।

বধূ

[শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী].

বৈশাখের স্তব্ধ দুপুর। সহরের জন-বিরল পথে খর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, তপ্ত বাতাস হা হা করে ঘুরে মরছে—কোন অভাগার উষ্ণশ্বাসের মত।

একটা গলির মোড়ে একজন শীর্ণা ভিখারিণী আস্তে আস্তে হাঁটছিল। ক্লান্তিতে সে আর চলতে পারছিল না, তবুও জোর করে চলছিল। এই গ্রীষ্মের অলস দুপুরে সহরের অধিকাংশ বাড়ীই বন্ধ; সকলেই নিভৃতে বিশ্রাম করছে, শুধু ওই দুর্ভাগী একমুঠো অন্নের জন্ম পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে সামনে একটা বাড়ীর দরজা খোলা পেয়ে ভিখারিণী তার ভিতর ঢুকে পড়ল। কাতরস্বরে দুটী ভিক্ষে চাইতেই ভিতর হ'তে কাংসকণ্ঠের ঝঙ্কার এল—"কে রে মাগী না বলে ক'য়ে গেরস্তর বাড়ী ঢুকেছিস্? অ ঝি দোরটা বন্ধ করে দেতো—মাগী আবার কি নিয়ে পালাবে হয় তো"—এই লাঞ্ছনায় ভিখারিণীর মুখটা ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু সে আবার বলল—"কিছু খেতে দে মা—সকাল থেকে ছেলেটা না খেয়ে পড়ে আছে মা" শেষের কথাগুলো বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে পড়ল। এবার তার সুমুখে একটী বিপুলকায়া বিধবা মহিলা আবির্ভূতা হ'য়ে সরোষে মুখ বেকিয়ে বলে উঠলেন, "আ-মর মাগী, এই ভরা দুপুরে কাঁদতে বসল যে—দূর হ—"

বাড়ীর বৌ যূথিকা তখন পান সাজছিল। সুন্দরী কিশোরী বৌটা; প্রাণটী তার যূঁই ফুলের মতই শুভ্র, কোমল। গোলমাল শুনে উঁকি মারতেই ভিখারিণীর ক্ষুধা পীড়িত বেদনা-মলিন মুখখানা তার দরদী অন্তরে একটা আঘাত করল; তার বুক মমতায় ভ'রে উঠল। শাশুড়ীকে গিয়ে বলল—"দুটী ভাত দেবো মা ওকে? আহা, বেচারীর খাওয়া হয় নি!"

শাশুড়ি পুনর্ব্বার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"অত দরদ দেখিয়ে কাজ নেই বাছা—কোথাকার কে মাগী এল, অমনি তাকে ভাতের থালা ধরে দিতে হবে—"

শাশুড়িকে সে চিরদিনই বিশেষ ভীতির চোখে দেখ্‌ত। তাই আর কোন কথা না বলে, ক্ষুব্ধ মনে সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে বাক্স খুলে চারটে পয়সা এনে দেখে ভিখারিণী চলে গেছে। সে আবার নিজের ঘরে গিয়ে তার স্বামীকে মিনতি-ভরা স্বরে বলল,—"ওগো ঐ ভিখারিণীটাকে ডেকে দাওনা গো—চারটে পয়সা দেবো।"

স্বামী খাটে শুয়ে বিদ্যুৎ-পাখার নীচে আরাম করে একখানা উপন্যাস পড়ছিলেন; আর উঠতে অনিচ্ছুক হয়ে তিনি একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন—"পাগল হয়েছ—কেন ঐ জোচ্চরগুলোকে মিছামিছি পয়সা দাও?"

এদের কাছে আবেদন জানান নিস্ফল জেনে যূথিকা নিঃশব্দে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভিখারিণী তখন অনেক দূর চলে গিয়েছিল; রুদ্র বৈশাখের অনল-বর্ষী রৌদ্রের মাঝে উত্তপ্ত পাথরের পথের উপর দিয়ে সে দুর্ব্বল পায়ে ধীরে ধীরে হাঁটছিল।

যূথিকা ভাবতে লাগল এ বাড়ীর লোকগুলি মানুষ না পাষাণ? প্রাণে কি একবিন্দু দয়া মায়া নেই? আহা, দুঃখিনী কাঙ্গালিনী—ওকে একমুঠো খেতে দিলে তাদের ভাণ্ডারে কি এতই কম পড়ে যেত? আর এই তার স্বামী! হায় রে প্রাণে একটুও সহানুভূতি, মমতা এল না? এই দুপুর বেলা একজন কাঙ্গালিনী গৃহস্থের বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে গৃহের কি কল্যাণ হবে? ভিক্ষে তো কেউ দিলে না, উল্টে সেই অভাগীকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল......

যূথিকার আয়ত আঁখির কোণে দু'ফোটা অশ্রুবিন্দু মুক্তার মত টলমল্ করে উঠল। তার ছোট ননদ এসে ডাকলে, "বৌদি তোমার ভাত দেওয়া হয়েছে—খাবে এস।" সে জবাব দিল না। সেদিন যূথিকার ভাতের থালা তেমনি অভুক্ত পড়ে রইল।

———

গঙ্গা-প্রাপ্তি

(গল্প)

[শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

(১)

আই-এ পাশ করিয়া বহু অনুসন্ধানে, বহু চেষ্টায় বড়বাবুর পকেটে পান খাইবার বাবদ কিছু অর্পন করিয়া, নরেশ যখন কলিকাতার কোনও এক সওদাগরী অফিসে চল্লিশ টাকা বেতনে একটী চাকরী পাইল তখন তাহার বৃদ্ধা বিধবা মাতা আন্নাকালী যেন হাতে আকাশ পাইলেন। 'হাতে আকাশ পাইলেন'—কেন বলিতেছি, তাহার কারণ হইল, শৈশবেই নরেশের পিতৃবিয়োগ ঘটে। সেই সময় হইতেই আন্নাকালী চরকা কাটিয়া, ধান ভানিয়া কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া নরেশকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। এখন, যখন তিনি বৃদ্ধা হইয়াছেন, শারীরিক শ্রমের আর সাধ্য নাই, তখন নরেশ চাকরী পাইয়াছে, মাস মাস টাকা আনিবে তাহা দ্বারাই তাহাদের চলিয়া যাইবে, আর পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে না সর্ব্বোপরি যে নরেশকে তাহার পিতা মাত্র পাঁচ বৎসরের রাখিয়া নিঃসহায়া, নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়া বিধবার হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়—যে নরেশকে তিনি শত কষ্ট, শ্রম, উপেক্ষা করিয়াও লেখাপড়া শিখাইতে ক্রটী করেন নাই সেই—সেই নরেশ আজ তাহাকে উপার্জ্জন করিয়া খাওয়াইবে—ইহা ভাবিতেই যেন তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। তাই বলিতেছিলাম—'হাতে আকাশ' পাইলেন।

*   *   *   *

আন্নাকালীর বহুদিনের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। একদিন জ্যৈষ্ঠের দুপুরে নরেশ যখন পাড়ার মুখুয্যেদের বাড়ীর বড় আম গাছটী হইতে তাহাদের আম পাড়িয়া দিয়া, পাঁচটী আম, যাহা সে পারিশ্রমিক বাবদ তাহাদের নিকট পাইয়াছিল, তাহার মাতার হস্তে দিল, তখন আন্নাকালী প্রথমতঃ সেই আম্র কয়টী 'গৃহ দেবতার' উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলেন এবং পরে নরেশকে কাটিয়া দিলেন। নরেশ ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "এ কি কল্লে মা?"

আন্নাকালী। "গৃহ দেবতাকে নিবেদন ক'রে দিলুম।"

নরেশ। "সে কি?"

আন্নাকালী বলিয়াছিলেন "প্রথম যখন কোনও নূতন দ্রব্য পাওয়া যায়—এবং তাহা যদি স্বোপার্জ্জিত হয় তবে তাহা সর্ব্বপ্রথম দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে দিতে হয়।"

"আচ্ছা মা! তুমি হ'লে আমার দেবতা, আমি যখন প্রথম উপার্জ্জন ক'রে টাকা আনবো তখন তোমায় উৎসর্গ ক'রে দেবো—না?" অষ্টম বর্ষীয় বালক নরেশ বাল-সুলভ সরলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

আন্নাকালী। "হাঁ নিশ্চয়ই।"

"কি ক'রে উৎসর্গ কর্ব্বো?" নরেশ ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছিল।

আন্নাকালী পুত্রের সরলতা মণ্ডিত মুখকমল সস্নেহে চুম্বন করতঃ বলিয়াছিলেন "বাবা! তুমি প্রথম রোজগার করিয়াই যদি আমাকে 'গঙ্গা-লাভ' করাইতে পার তা হ'লেই তোমার উপার্জ্জিত টাকা আমার নামে উৎসর্গীকৃত হ'ল জানবে।"

বহুদিন পূর্ব্বে যে মাতাপুত্রে একবার এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল আজ নরেশ উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছে জানিয়া হঠাৎ আন্নাকালীর সেই কথাটী মনে পড়িয়া গেল।

(২)

তিন মাস হইল নরেশ তাহার মাতাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। সুকীয়া ষ্ট্রীটে একখানি ছোট বাসা ভাড়া করিয়া মাতাপুত্রে বাস করিতেছে। আন্নাকালী আজকাল প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন, ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়া ব্যস্ত থাকেন।

তাহার এখন অন্নের চিন্তা নাই। ভাগ্যাকাশে এখন তাহার সুখ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। কিন্তু সুখৈশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অভাব ও আকাঙ্খাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আন্না-কালীর এখন একমাত্র অভাব ও আকাঙ্খা হইল সংসারে একটী লাল টুকটুকে বৌ'য়ের।

একদিন রাত্রিতে নরেশ যখন খাইতে বসিয়াছে, সম্মুখে তাহার মাতা একখানি পাখা হস্তে তাহাকে ব্যজন করিতেছেন ও আর চারিটী ভাত বেশী খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন তখন ঝি আসিয়া বলিল যে কালীঘাট যাইবে বলিয়া সে কাল আর আসিতে পারিবে না। আন্নাকালী প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু নরেশ বলিল যে কাল যখন রবিবার তখন তাহার আফিসের তাড়া নাই, সে নিজেই মাতাকে সাহায্য করিতে পারিবে।

আন্নাকালী কিন্তু ইহাতে একটুও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি একটু কৃত্রিম ক্রোধের সহিত বলিলেন "তবুও ত তুই বে করবি নি—আর তাই বা কেন কর্ব্বি—তাহ'লে যে আমার জন্য তাকে খেটে মর্ত্তে হ'বে।"

নরেশ তাহার মাতার কৃত্রিম ক্রোধটা বুঝিতে পারিলেও মাতার যে এখন একটী পদসেবার জন্য লোকের দরকার তাহা সে বেশ অনুমান করিল, এবং বলিল "আচ্ছা মা! বিয়ে ত একদিন কর্ত্তেই হ'বে কর্ব্বোও, তবে কি-না আমায় আগে একটু ভাল ক'রে দাঁড়াতে দাও। এই ত যা মাইনে পাচ্ছি এতে আমাদেরই কুলোচ্ছে না—আবার এর উপর আর একটা পেট টেনে আনতে হ'লে তার জোগাড়টা ত ক'রে নিতে হ'বে?"

আন্নাকালী কি জানি কি ভাবিয়া আর বেশী কিছু বলিলেন না।

(৩)

১৬ই এপ্রিল। নরেশ আফিস ছুটীর পর বাহির হইয়াছে, দেখিতে পাইল নোটীশ বোর্ডে লেখা রহিয়াছে।

NOTICE

All members of the staff are hereby informed that any one who will remain absent from office to morrow the 17th April with or without couse shall be dis missed without assigning any reason thereto.

নরেশের ব্যাপারখানা কি বুঝিতে কিছুমাত্রও বিলম্ব হইল না। সে বুঝিল, ১৭ই এপ্রিল "নিখিল ভারতীয় হরতাল" হইবে বলিয়া কংগ্রেস যে সংবাদ প্রচার করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের অফিসের লোক যাহাতে না যোগদান করিতে পারে সেই জন্যই বড় সাহেব এই হুকুম জারি করিয়াছেন।

সে যাহা হউক চাকুরী ভিন্ন যখন জীবিকার্জ্জনের অন্য উপায় নাই তখন যাহাতে সেই চাকরী বজায় থাকে সে সেই চেষ্টাই করিবে মনে করিয়া নরেশ বাসায় যাইবার পথে আগামী কল্যকার বাজার কিনিয়া লইল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। একে একে কলিকাতার রাজপথে আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নরেশ বাসায় আসিয়া নিত্যকার অভ্যাস মত মাতাকে ডাকিল, কিন্তু কোনও সাড়া পাইল না। ঝি আসিয়া সংবাদ দিল যে দুপুর হইতেই মা ঠাকুরুণের কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। তিনি অচৈতন্য অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছেন, নরেশ তাড়াতাড়ি হস্তস্থিত পুটুলীটী রাখিয়া মাতার নিকট গেল, 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিল। কোনও উত্তর না পাইয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরের উত্তাপে যেন তাহার নিজের হাত পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সে বিলম্ব না করিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ দিল, এবং বলিয়া গেল জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত যেন রোগিণীকে ডাকা না হয় অথবা ঔষধও না দেওয়া হয়। এবং একা ফেলিয়া রাখিতেও মানা করিয়া গেল।

ডাক্তারের শেষোক্ত কথাটীতে যেন নরেশের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেন না, সমস্ত রাত্রি না হয় সে মাতার পার্শ্বে বসিয়া রহিল, কিন্তু কাল দিনেও যদি না তাহার জ্ঞানোদয় হয় তবে সে ভিন্ন তাহার মাতার পার্শ্বে বসিবার যে আর কেহই নাই। অথচ চাকরী বজায় রাখিতে হইলে যে তাহাকে যে কোন প্রকারেই হউক কাল অফিসে যাইতেই হইবে।

* * * *

নরেশ ভাবিয়াছিল যাহা হইলও তাহাই। সমস্ত রাত্রিতে ত তাহার মাতার চৈতন্যোদয় হয় নাই-ই, তার পরদিবস বেলা দশটা অবধিও যখন তাহার জ্ঞান হইল না তখন নরেশ মহা বিপদে পড়িল। সকালে আসিয়া একবার ডাক্তার দেখিয়া গিয়াছে এবং বলিয়া গিয়াছে রোগিণীর জ্ঞানের সঞ্চার না হওয়া পর্য্যন্ত মাথায় অডিকোলন্ মাখিবার দরকার। ঝিও যথারীতি কাজকর্ম্ম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন নরেশ কি করে, যাহা হউক সে তাড়াতাড়ি অফিসে মাতার অসুখ বলিয়া একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিল।

সারাদিন ঐকান্তিক পরিচর্য্যার পর বৈকালে নরেশ দেখিল তাহার মা ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করতঃ অতি ক্ষীণ শব্দে 'জল' বলিয়াই আবার চক্ষু বুজিলেন, নরেশ তাড়াতাড়ি কোথা হইতে সিপে করিয়া একটু গঙ্গাজল তাহার মাতার মুখে সযত্নে ঢালিয়া দিল। মাতা জল পানান্তর ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। নরেশ যত্নের সহিত তাহার কপালে অডিকোলন্ মাখিয়া দিতে লাগিল। আন্নাকালী এইবারে কথা কহিলেন।

নরেশ বাধা দিয়া বলিল "এখন কোনও কথা ব'লো না, ডাক্তার কথা বলতে মানা করে গেছেন।"

আন্নাকালী একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার আবার আসিয়াছিল নাকি?"

"হাঁ, তোমার অবস্থা দেখে ত আমার ভয়ই লেগে গিছল। আচ্ছা, হঠাৎ এমন কি হ'য়েছিল মা তোমার?"

বলিয়াই নরেশ আবার বাধা দিয়া বলিল, "না থাক্, কোনও কথা বলবার দরকার নেই এখন।" তিনি যেন তাহা না শুনিয়াই বলিলেন, "কাল দুপুরে গঙ্গা থেকে এসেই যেন শরীরটা কেমন চম্ চম্ ক'রে উঠল, আমি আর দাঁড়াইয়া থাক্‌তে পারিলাম না। উত্তাপে যেন সর্ব্বশরীর আমার পুড়ে যেতে লাগল, আমি বিছানা নিলুম, তারপর কি হ'ল না হ'ল জানি না।"

সন্ধ্যায় ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেল আর কোনও ভয়ের কারণ নাই, বোধ হয় সর্দ্দিগর্ম্মীর মত একটা কিছু হইয়াছিল।

* * * *

পরদিন অফিসে আসিতেই ইড় সাহেব নরেশকে ডাকিয়া পাঠাইল, নরেশ কাছে যাইতে সাহেব হাতের কাজ ছুড়িয়া ফেলিয়া রাগতস্বরে বলিল, "what was the matter with you—yesterday Noresh ?"

নরেশ। "My mother was ill—and here is the medical certificate Sir."

সাহেব। "Damn it, I don't want to hear any reason. You saw my notice—did you ?"

নরেশ। "Yes Sir."

সাহেব। "All right. Every one did come yesterday except you. Hence I am to think that you are a Hartal man—are you not ?"

নরেশ। "No Sir—"

সাহেব। "Stop—not a single word—go out of my office—I don't want you" বলিয়াই সাহেব টেবিলস্থিত পাইপটী নিয়া রাগভরে "পপ্" "পপ্" করিয়া টানিয়া ধূম বাহির করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতে লাগিল।

নরেশের মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। পা যেন টলিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া উন্মুক্ত বাতাসে যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইল।

(৪)

ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ সারি সারি গগনস্পর্শী দেবদারু গাছের আড়াল হইতে ঊষাদেবী যখন উকি-ঝুকি মারিতেছে, শুক্ তারাটী যখন আকাশে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, এক গাছ হইতে অন্য গাছে দুই একটী কাক যখন ডাকিয়া পড়িতেছে "কশ্চিৎ দুই একটী শৃগাল ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করতঃ ঝোঁপের আড়ালে যখন লুকাইছে, তখন একখানা গরুর গাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সেই রাস্তা দিয়া 'ককরকোৎ' 'ককরকোৎ' 'কোঁৎ' 'কোঁৎ' শব্দে বাঁশতলী গ্রামাভিমুখে মন্থর গতিতে চলিয়াছে। শকটের আরোহী আর কেহই নয়, আমাদেরই নরেশ ও তাহার মা। নরেশের

চাকরী গিয়াছে, কলিকাতায় এখন আর তাহার থাকিবার সংস্থান নাই। তাই তাহার মাতাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে আসিয়াছে, উদ্দেশ্য সে আবার কলিকাতায় যাইয়া আর একটা চাকুরীর উমেদারী করিবে।

বেলা যখন প্রায় ৮টা বাজে, তখন গো-শকট খানি নরেশ ও তাহার মাতাকে লইয়া তাহাদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

দিন সাতেক বাড়ী থাকিয়া, সকল দ্রব্যাদি গোছ গাছ করিয়া দিয়া একদিন ভোরে মাতার পদধূলি গ্রহণান্তর নরেশ কলিকাতা যাত্রা করিল। যাইবার সময়, আন্নাকালী তাহার যে আর বড় বেশীদিন বাকি নাই—শীঘ্রই গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে তাহা নরেশকে বলিয়া দিল, এবং ইহাও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিল না যে "গঙ্গাপ্রাপ্তি"ই এখন তাহার একমাত্র কাম্য এবং এই বাসনা তাহার যাহাতে পূর্ণ হয়—সেই বিষয়ে যেন নরেশ কোনও প্রকার ত্রুটী না করে। নরেশ সম্মতি জ্ঞাপক মস্তক নাড়িয়া মাতার বাসনা অপূর্ণ রাখিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল এবং তাঁহার পদপ্রান্তস্থ পুঁটুলীটি হাতে তুলিয়া লইয়া ছাতি বগলে বাটীর অদূরস্থ আম্রকুঞ্জের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

(৫)

রাত্রি পোহাইতে এখনও একঘণ্টা বাকি। সন্ধ্যা রাত্রিতে যে মেঘখানা ঈশান কোণে দেখা দিয়াছিল, সেই খানাই সারা রাত্রি জমাট বাঁধিয়া এক্ষণে সমস্ত আকাশখানি ঘন-ঘোর ঘটাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে রাত্রির সেই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রবল বাত্যার সহিত বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। গাছ পালা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। গৃহের উন্মুক্ত জানালা সকল ভীষণ শব্দে ঝড়ে দেওয়ালের গায়ে আঘাত করিতে লাগিল। প্রলয়কালীন প্রায় সেই ভয়ঙ্কর শব্দে ঘুমন্ত গৃহস্থের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নরেশও সেই শব্দে জাগিয়া উঠিল, দেখিল বৃষ্টির ঝাঁপ্‌টা আসিয়া তাহার বিছানা পত্র সকলই ভিজাইয়া দিয়াছে, সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে অন্ধকারে সেই গৃহে একাকী থাকিতে যেন তাহার একটু ভয় করিতে লাগিল। সে মেসের অন্যান্য লোকদিগকে ডাকিল। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর যেন বাহিরের সেই প্রবল বাতাসে দূরে ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাহারা কেহই উত্তর দিল না। সে তাড়াতাড়ি তক্তপোষের নীচ হইতে ডিট্‌জ হ্যারিকেনটী আনিয়া জ্বালিতে যাইবে অমনি সশব্দে তাহার কক্ষের অর্গলবদ্ধ দরজাটী ভীমবেগে খুলিয়া গেল। সে ভয় চকিত নেত্রে দরজার দিকে তাকাইতেই দেখে শুভ্রবসনাবৃতা এক রমণী মূর্ত্তি, নরেশের ভয়ে সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিতেছিল—সেই রমণীমূর্ত্তিটি হইতে স্বর বাহির হইল,—বলিল "ভয় নাই—বাবা—নরেশ আমি।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে চাহিয়া দেখিল তাহার মা—তাহারই সম্মুখে দণ্ডায়মানা। নরেশ প্রকৃতিস্থ হইল, এবং আর কোনও ভয় না করিয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল "মা!—তুমি!—এখন—এখানে—কি ক'রে?"

তাহার মাতা বলিলেন "হঁ্যা বাবা, তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে এয়েছি আর এই—এই—জিনিষটী নাও—ইহা তোমার প্রতিজ্ঞা পালনে সহায়তা কর্ব্বে—" এই বলিয়া নরেশের হাতে তিনি কি একটী পদার্থ দিলেন। নরেশ একটু বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল সেইটী একটী দিয়াশালাইর বাক্স মাত্র। মাথা তুলিয়া নরেশ যেই তাহার মাতার প্রতি দৃকপাত করিবে, অমনি সে দেখিল তাহার মাতা আর সেইখানে নাই শুধু বাহিরের শীতল বাতাস আসিয়া সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেছে। নরেশের রক্ত হীম হইয়া আসিল, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইল। সে ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

* * * *

পর দিবস ভোর সাতটার সময় যখন বাল-সূর্য্য-রশ্মি নরেশের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, উন্মুক্ত জানালা দিয়া যখন বাহিরের স্নিগ্ধ সমীরণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া নরেশের মূর্চ্ছিত দেহ স্পর্শ করিয়াছে, তখন নরেশ চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তখনও তাহার মানস পটে পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা যেন সুস্পষ্টরূপ অঙ্কিত রহিয়াছে। সে ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা ত্যাগ করিল এবং চৌকির উপর নিজ বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। তখনও তাহার হাতে তাহার মাতৃদত্ত দিয়াশালাইর বাক্সটী

আবদ্ধ ছিল। সে অন্যমনস্কভাবে সেইটী খুলিল—দেখিল তাহার ভিতরে ভস্ম-মিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক টুক্‌রা অস্থির মত কি রহিয়াছে। নরেশ বাক্সটি রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া গত রাত্রির ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাবিতে লাগিল; এমন সময় গৃহে কাহার পদশব্দে তাহার চিন্তা-স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল তাহাদেরই মেসের রমণী বাবুর সঙ্গে ডাক্‌হরকরা দাঁড়াইয়া আছে। রমণীবাবু বলিলেন "ইঁহারই নাম নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।" নরেশ তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল—ডাক হরকরা বলিল "আপ্‌কো একঠো তার হ্যায়।"

নরেশ কম্পিত হস্তে সহি দিয়া টেলিগ্রামটা খুলিয়াই দেখিল—লেখা রহিয়াছে "your mother died yesterday"

* * * * *

দ্বিপ্রহরে বন্ধুবর্গের সান্ত্বনা বাক্যে নরেশের শোক একটু উপশমিত হইলে জগন্নাথ ঘাটে যাইয়া একটী পুরোহিতের যোগাড় করিয়া যথারীতি সেই দিয়াশালাইর বাক্সের মধ্যে অবস্থিত সেই অস্থি সে তখন গঙ্গা জলে মিশাইয়া দিল।

শ্রেষ্ঠ দান

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

মায়ের যত সোনার ছেলেগণ
মায়ের তরে কোর্‌ছে প্রাণপণ,
মায়ের মোটা কাপড়খানি ধ'রে
ভিক্ষে মেগে ফিরছে দোরে দোরে;
করুণ সুরে গাইছে সবে গান,
"মায়ের নামে কোরবে এস দান;
কে আছ গো মায়ের ছেলে, মেয়ে?
মায়ের পানে বারেক দেখ চেয়ে;
মায়ের মুখে অন্ন তুলে দাও,
আঁচল কোনে অশ্রু মুছে নাও,
ঘুচিয়ে দাও কাঙ্গালিনীর বেশ;
তোমায় আজি ডাক্‌ছে যে রে দেশ।"
পয়সা, টাকা, চাউল, অলঙ্কার,
কত জনে দিচ্ছে কত আর;
মায়ের কাজে কোর্‌ছে সবে দান,
সজল চোখে শুন্‌ছে এসে গান।

এমন কালে পাশের বাড়ী একা
দাঁড়িয়ে ছিল কাহার যেন খোকা,
মুখখানিতে চাঁদের আলো ভরা,
হাতে ছিল সেগুন কাঠের ঘোড়া;
পরশু করে অনেক কাঁদাকাটি
বাপের কাছে পেয়েছিল সেটী।

তাহার কাণে বাজলো বুঝি গান,
কেঁদে বুঝি উঠলো তাহার প্রাণ,
ভাবলে বুঝি লক্ষ্মী ছেলেটুক,
'গরীব ওরা ওদের বড় দুঃখ,
মা-রা ওদের পায়না বুঝি খেতে।'
কি ভেবে সে চোখের জলে তিতে?
মাকে তাহার বড়ই ভালবাসে,
মায়ের নামে তাই কি ছুটে আসে?
ধীরে ধীরে সদর দুয়ার ঠেলে,
বেরিয়ে এল একটুখানি ছেলে;
পয়সা, টাকা, অলঙ্কারে ধীরে
রাখলো তাহার সাধের ঘোড়াটীরে।
উঠলো হেসে মত্ত ছেলে দল;
বাঙলা মায়ের চোখে এল জল।

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্তের চিহ্ন।

একদিন দুইদিন করিয়া শীতকাল শেষ হইয়া গেল ; আম্র-মুকুল ও মাছি লইয়া বসন্ত দেখা দিল। তথাপি লজ্জাবশতঃ প্রমদা এতদিন তাহার প্রার্থিত অর্থের বিষয়, রুগ্ন জামাতাকে কোনও প্রশ্ন করিতে পারিলেন না ! একটি দুইটি করিয়া, বিশেষতঃ জামাতা স্থায়ীভাবে বাটীতে অবস্থিতি করায়, প্রমদার বাক্সের টাকা সকলই নিঃশেষ হইয়া গেল ; জামাতার নিকট গচ্ছিত অর্থের, তাঁহার প্রাপ্য সুদ না পাইলে, তিনি ত আর কোন ক্রমে সংসার চালাইতে পারেন না। তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন, যেমন করিয়া হউক, লজ্জা ত্যাগ করিয়া, জামাতাকে অর্থের কথা বলিতেই হইবে ; তাহা বলিতে না পারিলে, তাঁহাদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে।

কিন্তু যেদিন তিনি অর্থের কথা বলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালে শরৎকুমার জ্বর গায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাটী ফিরিয়া আসিল ; সুতরাং কথ্য কথাটি আর বলা হইল না।

পরদিন প্রভাতে ঈশানী শয়নকক্ষের বাহিরে আসিয়া তাড়াতাড়ি মাতার কাছে গেল ; এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'মা ওর জ্বর খুব বেশী হ'য়েছে ; সমস্ত রাত ছট্‌ফট্‌ করেছে আর ভুল বকেছে ; এখনও গায়ের তাপ একটুও কম পড়ে নি। একজন ভাল ডাক্তার ডাকবার কি হবে মা ?'

প্রমদা কিছু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, 'ডাক্তার আমি কোথা থেকে ডাকবো ? আমার হাতে একটিও পয়সা নেই ; আজ বাদে কাল কি খাব, তারই ঠিকানা নেই। জামাই এই ছ'সাত মাস বসে বসে খাচ্ছে ; তার উপর তোর আর তোর ছেলের খোরাকী আমাকেই যোগাতে হ'চ্ছে। জামাই যদি আমার পাওনা সুদটাও দিত, তাহলেও, কোন রকম করে, চালিয়ে নিতে পারতাম। তা'ত দেবার নামও করে না ; ভেবে দেখে না, আমি এই বিধবা মানুষ, এতগুলা কুপুষ্যিকে কি করে পুষি ?"

ঈশানী মাতার বাক্যে কাঁদিয়া ফেলিল ; কাঁদিয়া কহিল, 'মা, এতদিন যদি সহে আছ, তবে ওর এই ব্যারামের সময় আরও কিছুদিন সহে থাক। মা, তোমার পায়ে পড়ি, এ সময় তুমি ওর উপর রাগ কর না। আমি তোমাকে আমার এই গলার হার খুলে দিচ্ছি ; তুমি ওটা বিক্রী করে টাকা এনে ওকে ডাক্তার দেখাও। ও আগে ভাল হ'ক, তারপর ঢাকায় গিয়ে, তোমার টাকার একটা যাহ'ক ব্যবস্থা করবে। এখন ওকে কিছু বল না।' এই বলিয়া, অশ্রুধারা-প্লাবিতবদনা ঈশানী আপন কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া লইয়া মাতার হাতে দিল।

আদরিণী কন্যার অশ্রুপাতে প্রমদার রোষবহ্নি অগ্রেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে কন্যার হার পাইয়া, তাহা বিক্রয় করিয়া অচল সংসার আরও কিছুদিন চালাইতে পারিবেন বুঝিয়া, এবং রুগ্ন জামাতার চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি সন্তুষ্টা ও নিশ্চিন্তা হইলেন। তথাপি, কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, কন্যার বিবাহের সময় তিনি যে হার স্বহস্তে কন্যার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা বিক্রয় করিতে তিনি বিলক্ষণ কষ্ট অনুভব করিলেন। কিন্তু তাঁহার তখন যথার্থই অর্থের নিতান্ত অভাব ঘটিয়াছিল ; সেই হার বিক্রয় ব্যতীত তাহার আর কোন উপায়ই ছিল না। তিনি বিধাতাকে অবিচারের জন্য নিন্দা করিয়া, সেই হার একজন প্রতিবেশীর সাহায্যে বিক্রয় করিলেন।

প্রতিবেশী হার বিক্রয় করিয়া সন্ধ্যাকালে তাহার হাতে সার্দ্ধ চারিশত টাকা দিয়া গেল।

কিন্তু অর্থ সংগৃহীত হইলেও লোক অভাবে সেই দিন সন্ধ্যার পর আর ডাক্তার ডাকা হইল না; সেই রাত্রে ঈশানী আর ঘুমাইতে পারিল না; রুগ্ন স্বামীর সেবা করিয়া নিশা অতিবাহিত করিল। শরৎকুমারও জ্বরের ও গাত্র বেদনার কষ্টে অস্থির হইয়া রাত্র কাটাইল।

পরদিন প্রভাতে একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনা হইল। ডাক্তার রোগীকে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, 'বরিশালে এখন বসন্ত রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হ'য়েছে। এরও বোধ হয় বসন্ত হ'তে পারে। দুই একদিন না দেখে কোন রকম চিকিৎসা করা চলবে না। আপাততঃ তৃষ্ণার সময়, গরম জল ঠাণ্ডা করে একে খেতে দেবে; আর ক্ষিধে পেলে মিষ্টি ফলের রস করে, জলসাবু চিনি দিয়ে একটু একটু খেতে দেবে। ঘরটা ফিনাইলের জল দিয়ে মাঝে মাঝে মুছে ফেলবে; রোগীকে একটু অন্ধকারে রাখবে; কিন্তু ঘরে বাতাস যাতে চলাচল করতে পারে, অথচ রোগীর গায়ে যাতে সেই বাতাস না লাগে তার ব্যবস্থা করতে হ'বে; রোগীকে, আর রোগীর বিছানা, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে হ'বে।' এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া ডাক্তার বাবু সেদিন চলিয়া গেলেন।

ঈশানী কর্ণে যেন তাহার সমস্ত জীবন পূরিয়া ডাক্তার বাবুর উপদেশ গুলি শুনিয়া ছিল। তাহা যেন তাহার মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। সেই দিন এবং তাহার পরদিন সে সেই উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল।

তাহার পরদিন প্রভাতকালে ডাক্তার বাবু আবার আসিলেন। রোগীর মুখ ও হস্ত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হুঁ, বসন্তই বা'র হয়েছে। এর অন্য কোনও ওষুধ নেই। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, আর অহরহঃ সেবা যত্ন করাই এর একমাত্র চিকিৎসা; তবে যে সেবা করবে, তারও বসন্ত হওয়ার খুব সম্ভব; এজন্য তারও সাবধান থাকা দরকার। চোখে যদি বসন্ত হয় তবে বোরিকের জল দিয়ে সর্ব্বদা চোখ ধুইয়ে দেবে।'

ঈশানী আবার আগ্রহভরে ডাক্তারের উপদেশ শুনিল। তাহার পর ডাক্তার চলিয়া গেলে, আপনার জীবনের এতটুকু আশঙ্কা না রাখিয়া স্বামী সেবায় আপনাকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিল। হে আমার স্ত্রী পাঠকগণ, তোমরাও পতিপরায়ণা, তোমরাও সেবা করিতে জান, কিন্তু তোমরাও সে সেবা দেখিলে স্তম্ভিতা হইয়া যাইতে! তোমরা হয়ত কখনও একটু আলস্য করিতে, কখন অনাহারে কাতর হইয়া পড়িতে, কখনও নিদ্রার ঘোরে ঘুমাইয়া পড়িতে, কিন্তু ঈশানীর স্বামী সেবায় ক্লান্তি ছিল না, আলস্য ছিল না, ক্ষুধা ছিল না, নিদ্রা ছিল না। সে ক্ষুধায় খাইত না, রাত্রে ঘুমাইত না, এমন কি পুত্রকেও দেখিত না, কেবল অদম্য পরিশ্রমে অহরহঃ স্বামীর শুশ্রূষা করিত। স্বামীর ক্ষত পরিপূর্ণ দেহে কখন তাহার কোমল হস্ত বুলাইয়া দিত, কখনও দুর্গন্ধ ক্ষত সকল ঔষধ-নিষিক্ত বস্ত্রে মুছাইয়া দিত, কখন ব্যজন করিত, কখন কোমল করে স্বামী দেহে চন্দনানুলেপন করিয়া ক্ষতের জ্বালা ভুলাইয়া রাখিত এবং কখনও নিম্বপল্লব দ্বারা রচিত কোমল ও শীতল শয্যায় স্বামীকে কোমল হস্তে ধীরে শোয়াইয়া তাহার ক্ষত চর্ম্ম স্নিগ্ধ রাখিত। তাহার উপর অন্যের সাহায্য ব্যতীত সে সর্ব্বদা স্বহস্তে স্বামীর শয্যা পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহা রোগ প্রতিশোধক জলে ধৌত করিত এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিত; স্বামীর শয্যাকক্ষ স্বহস্তে ধৌত করিয়া, দেবগৃহের ন্যায় তাহাতে ধূপ-ধুনা জ্বালিত এবং কুসুম আহরণ করিত। কোন শাক্ত ভক্ত যেমন দেব উপাসনায় ছাগদেহ বলি দেয়, ঈশানীও তেমনই স্বামী অর্চ্চনায় আপনার সুকুমার দেহ বলি দিয়াছিল।

প্রমদার আদরিণী কন্যা কি প্রকারে এই প্রকার দৈহিক কষ্ট করিল? একদিন তাহার কষ্ট দেখিয়া প্রমদা তাহাকে একটু ঘুমাইয়া লইতে এবং সময় মত কিছু আহার করিতে বলিয়াছিলেন। ঈশানী হিন্দুকন্যা; তাহাতে সে হিন্দু-কন্যারই ন্যায় উত্তর দিয়াছিল। বলিয়াছিল, 'মা, ওকে যদি কখনও ভাল করতে পারি, তাহ'লেই আবার খাব, আবার ঘুমাব; নইলে জানবে, আমার খাওয়া আর ঘুমান শেষ হ'য়ে গেছে।'

প্রমদা কন্যার কথা শুনিয়া অশ্রুধারা সম্বরণ করিতে পারিল না। আমাদের মনে হয়, স্বামী-পরায়ণা ঈশানী

অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং তাহার এই হৃদয়বিদারক কথায় ভগবানের সিংহাসনও টলিয়া উঠিয়াছিল।—তিনি, তাহার স্বামীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং এইরূপে তাহার পাতিব্রত্যের জন্য, তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

প্রায় একমাস পরে শরৎকুমার নিরাময় হইল। কিন্তু তাহার একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন না হইয়াও বিকৃত হইয়া গেল; এবং গাত্রচর্ম্ম জন্মের মত বিবর্ণ হইয়া গেল।

তথাপি ঈশানী সেই খঞ্জ, সেই বিকৃত চক্ষু, সেই বিবর্ণ দেহ, সেই অর্থহীন, সেই অকর্ম্মণ্য স্বামীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিল; প্রাণ ঢালিয়া দিয়া ভালবাসিল, এবং কায়-মনোবাক্যে তাহার সেবা করিতে লাগিল। মনে করিল, আহা, এই অসহায়কে যদি সে একটু না দেখে, তবে তাহার কি হইবে?—তুমি ধন্যা! তুমি পতিব্রতা, প্রেমময়ী নারী! এই রোগ-শোকময় নরলোকে তুমি ভগবানের মূর্ত্তিমতী করুণা! তুমি আমার অন্তরের মহাপূজা গ্রহণ কর। ভগবানের করুণায় আমি যেন জগতে বার বার তোমার এই করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখতে পাই। এ জগত, তোমার ঐ করুণ স্পর্শে যেন দেবলোক হইয়া যায়!

(ক্রমশঃ)

প্রেমের অমরত্ব

(Shelley হইতে)

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

থেমে যায় সঙ্গীত, সুরগুলি ঘিরিয়া—
হৃদয়ের তারে তারে বাজে শুধু ফিরিয়া;
নিভে যায় কুসুমের সুষমার গৌরব,
নাসিকায় রহে তবু মনোরম সৌরভ;
গোলাপ মরিয়া গেলে রচে সেই অয়নে,
পাতাগুলি তাহাদের প্রণয়ীর শয়নে;
তুমি যবে চলে যাবে মরণেরে চুমিয়ে,
তোমার স্মৃতির মাঝে প্রেম রবে ঘুমিয়ে।

আশা-পথে

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩২। [৩০শ সপ্তাহ

ব্রিটীশরাজ ও অহিফেন

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, ভাগবৎরত্ন]

সুখের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া হতভাগ্য নরনারী নানারূপ মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া থাকে, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাহারা বুঝিতে পারে যে শান্তির পরিবর্ত্তে চিরন্তন জ্বালা, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের চিতানল তাহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। পৃথিবীতে যত প্রকার মাদক দ্রব্য আছে তন্মধ্যে অহিফেন মানবকে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া তুলে। মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই ধ্বংসকর মাদক দ্রব্যের নিবারণ চেষ্টা দেখা যাইত তবে আমরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইতে পারিতাম। কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে দেখিতে পাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী শক্তি সভ্যতাভিমানী ব্রিটিশরাজ অহিফেনের ব্যবসায় লিপ্ত থাকিয়া মানবের উৎসন্নের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা চীন ও ভারতবর্ষে প্রাচীনতম সভ্যতার উত্তরাধিকারী জন সাধারণের মধ্যে অহিফেন সেবনের সহায়তা করিয়া কি ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

অহিফেনের ব্যবহার সভ্যজগতে ইংরাজগণই প্রথম প্রচলন করেন এ কথা বলিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। সুসভ্য গ্রীক ও রোমানগণ তাঁহাদের জাতীয় জীবনের অবসাদের দিনে অহিফেন সেবন করিতেন বলিয়া জানা যায়। যখন আরব ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিল তখন উহারাও অহিফেনের গুণে মুগ্ধ হইল। তাহাদেরই প্রচেষ্টায় আনন্দের নামে প্রচলিত এই বিষ প্রাচ্য দেশের কোন কোন অংশে সাদরে গৃহীত হইতে লাগিল। দিল্লীর মোগল সম্রাটগণ অহিফেনের ব্যবসা এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণ তখন ভারতবর্ষে

বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাচ্য হইতে অহিফেন লইয়া যাইয়া যাইয়া পাশ্চাত্যে প্রবর্ত্তন করেন। প্রবাদ আছে হুমায়ুন এমন কি মহামতি আকবর পর্য্যন্ত অহিফেন সেবন করিতেন।

আজকাল চীনদেশে অহিফেনের অত্যন্ত প্রচলন দেখা যায় কিন্তু পূর্ব্বকালে চীনে কেবল মাত্র উহা ঔষধার্থ ব্যবহৃত ফেনের সহিত তাম্রকূট মিশাইয়া সেবন করার বিধি বোধ হয় জাভাতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

কিন্তু বিটীশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অহিফেনের প্রচলন যেরূপ বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন সেরূপ আর কোন জাতি কোনদিন করে নাই। যখন ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন তখন অহিফেনের ব্যবসায়ে বিশেষ কিছু লাভ হইত
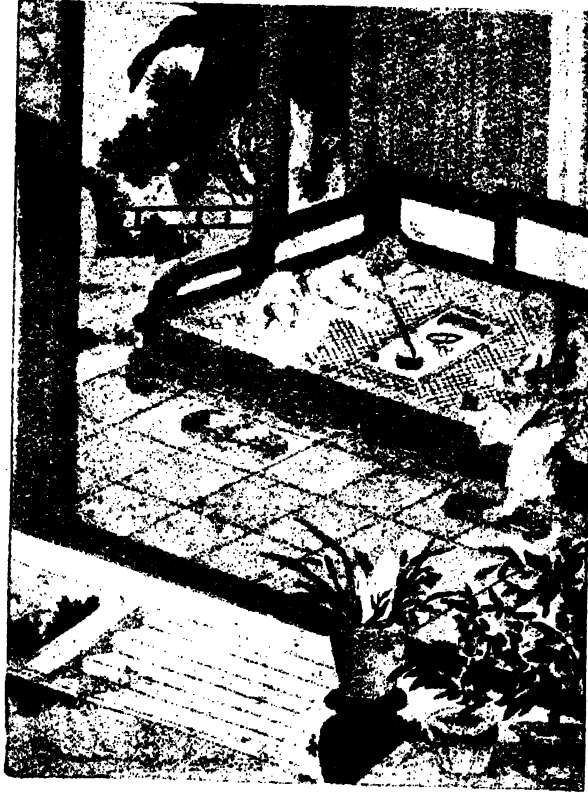
চীনদেশী একজন আফিন খাইয়া নেশায় মজগুল হইয়া বসিয়া আছেন, আর একজন নলদ্বারা সেবন-রত।

হইত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথমে সেখানে অহিফেনের ধূম্র পান করা প্রচলিত হয়। কিন্তু এ জন্য স্পেন দেশীয় লোকেরাই দায়ী কেন না তাহারা পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে অহিফেন সেবন শিক্ষা করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইহার প্রবর্ত্তন করেন; এবং তথা হইতে এই কু অভ্যাস সহজেই ফর্ম্মোসা জাভা এবং চীনে পরিব্যাপ্ত হয়। অহি-না; কিন্তু ইংরাজ ভারতের রাজশক্তি পাইয়া ইহার প্রসার বৃদ্ধি করিল। প্রথমে চীন আফিম খাইতে চাহে নাই। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে চীনের সম্রাট অহিফেনের বিরুদ্ধে এক আইন জারী করেন কিন্তু সে আইন কার্য্যকরী হয় নাই। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ আফিমের ব্যবসা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চেটিয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে আফিম জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নহে; সুতরাং ইহা যাহাতে অধিক পরিমানে ব্যবহৃত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কিন্তু "চোরা নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী।" লুব্ধ ইংরাজ বণিক সে কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া গেল, ১৭৯৬ ও ১৮০০ খৃষ্টাব্দের আইনের দ্বারা চীনের অধিবাসীরা অহিফেনের সেবনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেও ইংরাজ বণিকেরা চুরি করিয়া উহা চীনে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চেটিয়া অধিকার উঠিয়া গেল। কিন্তু ব্রিটীশ রাজেরই একজন কর্ম্মচারীর অধীনে আফিমের ব্যবসা চলিতে লাগিল। চীন সম্রাট বিদেশীদের এই ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন কিন্তু তাহার ফলে ব্রিটীশ শক্তির সহিত চীনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। ১৮৩৯ সালে লীন সি—হু ক্যান্টনের কমিশনার নিযুক্ত হন! তিনি ব্রিটীশ বালকদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "তোমরা নিজেরা আফিম খাওনা অথচ আমাদের দেশে চালানকর কেন, ইহাতে আমাদের দেশের লোক যে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে তাহা কি দেখিতেছ না। তোমাদের এইরূপ অপরাধ ভগবান কখনই মার্জ্জনা করিবেন না।" সেই সময়ে যে ইংরাজ কর্ম্মচারী ক্যান্টনে উপস্থিত ছিলেন তিনি লিনের কথা লর্ড পার্মাষ্টোনকে জানাইলেন। লিন বলিলেন, "ইংরাজের যত আফিম চীনে আছে সমস্ত লিনের হাতে সমর্পণ করা হউক।" ইংরাজেরা যখন তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না তখন লিন তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া বিশ সহস্র বাক্স অহিফেন গ্রহণ করিলেন এবং নদীতে

আফিম সেবীর অবস্থা—রুগ্ন, শীর্ণ, জরাগ্রস্থ—স্ত্রী পুত্র বিনা সবাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

ভাসাইয়া দিলেন। তৎপরে লিন ব্রিটীশ বণিক দিগকে এই সর্ত্তে আবদ্ধ করিতে চাহিলেন যে তাঁহারা চীনে আর আফিমের ব্যবসা করিবেন না। ইহাতে ব্রিটীশ-রাজ সম্মত হইতে পারিলেন না। সুতরাং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রথম চীনকে জোর করিয়া আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই প্রকার অমানুষিক কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করে নাই।

১৮৪০-৪২ সালের অহিফেন যুদ্ধের সময় চীনে ব্রিটিশ সৈনিকদের এই সব ব্যঙ্গ-চিত্র রাস্তায় জনসাধারণ বিতরণ করিত!

অহিফেন যুদ্ধ সংঘটিত হইল। তাহার ফলে চীনে আফিমের ব্যবসা চালাইবার অধিকার ব্রিটীশ শক্তির থাকিল। যদিও আফিমের ব্যবসায়ে চীনের যারপর নাই ক্ষতি হইতেছিল তথাপি পরাজিত চীন সম্রাটের ইহাতে সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আফিম লইয়া পুনরায় চীনের সহিত ব্রিটীশের যুদ্ধ হয়। এইরূপে ব্রিটীশ রাজ

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে চীনে অহিফেনের অব্যাহত গতি প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হাউস অব কমন্সে এই মন্তব্য গৃহীত হয় যে ব্রিটীশ শক্তি বিশ লক্ষ ডলার আয় অহিফেনের ব্যবসায়ে করেন, কিন্তু তাহা নিতান্তই দূষণীয়। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই।

ভারতবর্ষেও ব্রিটীশ শক্তির উৎসাহে অহিফেনের প্রচলন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যবসায় বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে তাহাদের চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তে লর্ড মর্লি প্রভৃতি কয়েকজন মহামনা ইংরাজ অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতে ও চীনে অহিফেনে প্রচার মহানুভবতা দেখান। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে চীনে আফিমের ব্যবসা ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু সম্প্রতি আবার অহিফেন ব্যবহারের মাত্রা তথায় প্রবল হইতেছে। যুদ্ধের সময় পৃথিবীর জাতী সমূহের ঔষধার্থে ব্যবহারের জন্য অহিফেনের চাষ চীন আরম্ভ করেন। ইহাতে সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হয়।

অহিফেন যুদ্ধের সময়, বন্দী ডগলাস স্মটকে ধৃত করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বিস্মিত জনমণ্ডলীকে দেখান হইতেছে।

সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা পান। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে চীনের মহারাণী আইনের দ্বারা অহিফেনের চাষ দশ বৎসরের মধ্যে বন্ধ করিতে আদেশ দেন।

ইহার পরে যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুসভেল্ট চীনে অহিফেন প্রচলন দমন করিতে সঙ্কল্প করেন। মহারাণী ঘোষিত দশ বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই চীনে অহিফেনের চাষ বন্ধ হইয়া যায়। ব্রিটীশ রাজও এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া

আন্তর্জাতিক মহাসভায় একটী প্রস্তাব হয় যে ভারতবর্ষে সেই পরিমাণে আফিমের চাষ হওয়া উচিত যাহা কেবলমাত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্রিটীশ শক্তি ইহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। আমেরিকা একজন্য বলিতেছেন যে এরূপ একটী জনহিতকর প্রস্তাবেও যখন ইংরাজের সহিত তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইল তখন রাজনৈতিক বিষয়ে উভয়ের মিল হইবে কি করিয়া। সুতরাং আমেরিকা

আর্য্যজাতির সংঘে যোগদান করে নাই। আমরা আশা করি ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের চরম অহিতকর অহিফেনের চাষ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদের শিক্ষা ও সভ্যতার পরিচয় প্রদান করিবেন।

প্রথম অহিফেন যুদ্ধের মধ্যে যখন কিছুকালের জন্য সন্ধি হইয়াছিল, তখন চীনবাসীরা ইংরাজদের বাড়ী ও ফ্যাক্টরী অস্ত্রশস্ত্রের জন্য লুটপাট করিতেছে।

বিশ্ব-শিল্প

দেবারাধনা

মিলে

জন্ম ১৮১৫, মৃত্যু ১৮৭৫

গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, কৃষকদ্বয় মাঠের কাজ ফেলিয়া অমনি নতমস্তকে যুক্ত করে দাঁড়াইয়া পড়িল। মনের মধ্যে সেই করুণাময়ের রূপজ্যোতিঃ ভাসিয়া উঠিল— আপনা হইতে মাথা নত হইয়া পড়িল।

এই ছবিখানির শিল্পীর নাম—জিন্ ফ্রাঙ্কো মিলে। এঁরই সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত ছিল যে তিনি শস্যক্ষেত্রের মধ্যকার কবিত্ব অন্তর দিয়া দেখিতে জানিতেন, চাষীদের ভাল বাসিতেন এবং যখনই তাহাদের আঁকিয়াছেন, তাঁহার অন্তর নিহিত প্রগাঢ় সহানুভূতিতে চিত্রগুলি বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই সুন্দর ছবিখানি মিলে ১০৫০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, বহু হাত ঘুরিয়া সম্প্রতি প্যারীর এক ভদ্রলোক ছবিখানি ৪৮০০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন। যাঁহার অঙ্কিত ছবির এত দাম তোমরা নিশ্চয়ই ভাবিতেছ তিনি বেশ অর্থশালী ব্যক্তিই ছিলেন। না গো, মিলের সারাজীবন দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেই কাটিয়া গিয়াছিল, শেষ জীবন ত দারিদ্র্য সাগরে আকণ্ঠ ডুবিয়াই ছিলেন। সেই যে আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন—হায় মা! যারাই কি গো তোমার ভক্ত তারাই কি মা নিঃস্ব তত! এ খেদ এ ক্ষোভ সব দেশে সব শিল্পীরই জীবনের কথা। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে সে ক্ষোভ নয়, লজ্জাও নয়। সেই মহাকবিই বলিয়াছেন—

তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য সহেছি মা সুখে তোমারই জন্য!

জীবন
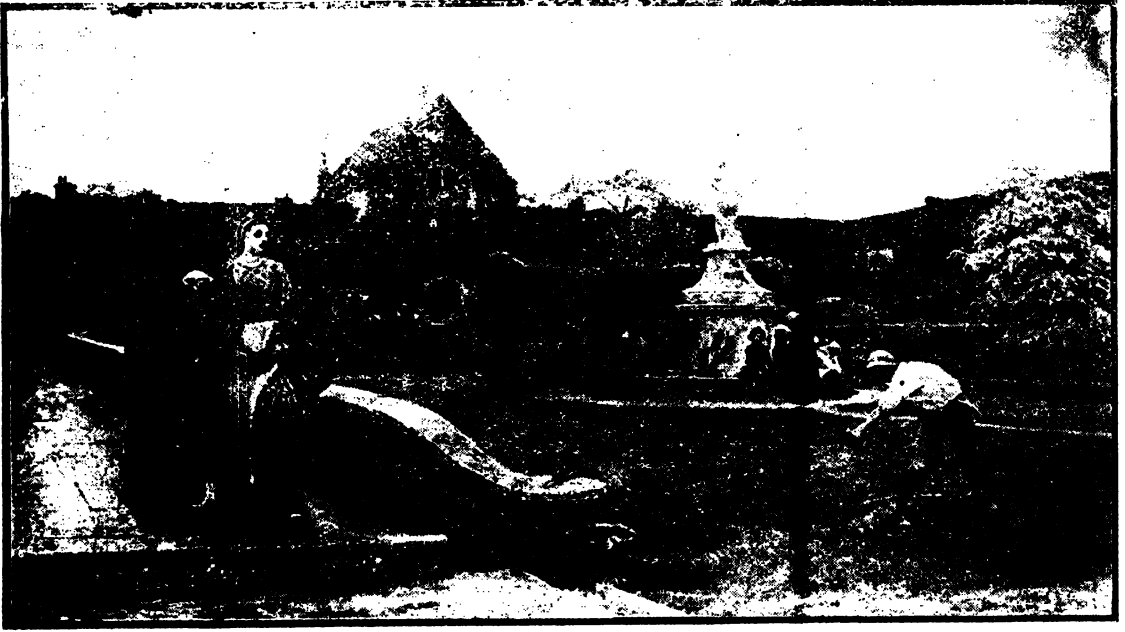
ফ্রেডরিক ওয়াকার

এই ছবিখানিতে শিল্পী অতি অল্পের মধ্যে একটি বাস্তব জগৎ ফুটাইয়া দিয়াছেন। গ্রামের লোক ঐ যে মর্ম্মর মূর্ত্তিটি একদিন যে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ ছিল এবং গ্রামের লোকেরাই বড় বলিয়া যাহার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে - জীবন সংগ্রামে বহু ঝঞ্ঝা, বহু বিপদ আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চিরশান্তি বিরাজিত লোকে গমন করিয়াছে, তাহাকেই ঘিরিয়া বসিয়া ও দাঁড়াইয়া! এদিকে একটি রূপলাবণ্যময়ী মেয়ে, তাহার হাত ধরিয়া এক অতি বৃদ্ধা কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহে চলিয়াছে! অন্যদিকে যৌবন দর্পিত এক চাষী - বিশ্বের, ভবিষ্যতের কোন ভাবনাই যাহার নাই, কেবল গায়ের জোরেই মেদিনী বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে—এই ত পৃথিবী!

ওয়াকার মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে মারা যান। সেই বয়সেই তাঁহার খ্যাতি দিগদিগন্তে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

শরৎ-সন্ধ্যা

(রূপক)

[শ্রীপূর্ণিমা দেবী বি-এ]

সারা দিনটাই মেঘ্‌লা করেছিল।...

ভাবছিলুম আত্মীয়—বান্ধবের হতাদর ও অপমানে আর অনাত্মীয় সাধারণের নীরস সমবেদনায় মন আজ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

হৃদয়-আকাশের পুঞ্জীভূত নিবীড় মেঘ-কদম্বের মাঝ থেকে রাঙা আলো কি জেগে উঠবে না? মুহূর্ত্তের জন্যও অন্ততঃ—?

এমনি সময় সন্ধ্যার সঙ্গে প্রথম দেখা।

তার কালো বড় বড় চোখ দুটার ভেতরে সুন্দর শান্ত সুনির্ম্মল সাগরের রহস্য ভরা ছিল। চির-সন্তপ্ত ব্যথিত চিত্ত উন্মুখ হয়ে—আত্মহারা হয়ে—সেই সীমাহীন প্রশস্ততার মাঝখানে আপনাকে ডুবিয়ে দেবার জন্য ছুটে এল।

পূবের আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারির মাঝে সন্ধ্যা-তারা জেগে উঠে বড় মধুর হাসতে লেগেছে।

... ...

চারদিকে আজ কেমন একটা স্নিগ্ধ চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সারা জগৎটাই চোখের সামনে যেন নব-যৌবনে সজীব মূর্ত্তি ধরেছে।

সব ব্যথা আজ দূর হয়ে গেছে—তার কোমল কর-পরশে। মন আজ পরিপূর্ণ।—

শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীর চাঁদ হাস্‌ছিল।

আধ নিমীলিত নেত্রে, আমার কোলের ওপর মাথা রেখে, ওপরের দিকে চেয়ে ছিল। আমি তার মুখখানির দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলুম—স্বর্গীয় বিমল শান্তির প্রতিচ্ছবি।

তারপর ধীরে ধীরে সে ঘুমিয়ে পড়ল! ...

পাহাড়ের ওপর থেকে অরুণ সূর্য্য উঠছিল। ঠায় বসে দেখছিলুম—সে মধুর দৃশ্য।

জল ছড়িয়ে আগে প্রভাতী গান গাইতে গাইতে চল্‌ছিল—এক যুবতী। সে উষা সন্ধ্যারই বোন।

কতক্ষণ পরে ফিরে চাইলুম—একি—! সন্ধ্যা চলে গেছে! কখন গেল? একবারও বলে গেল না! এত তন্ময় হয়েছিলুম! তবে কি রাগ করেছে—?

হয়ত বা মিথ্যা—স্বপ্ন দেখেছিলুম। স্বপ্ন? কিন্তু—না—স্বপ্ন কখনো এত স্পষ্ট হয়! এইত সে এখানে আমার কোলের ওপর মাথা রেখে আকাশের তারাগুলার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করছিল—ওরা কোন সুদূরের জগতের প্রেমময়ী জ্যোতিঃরূপা নারী? এখনো ত তার কথার মৃদু ঝঙ্কার কাণে বাজছে!—একি মিথ্যা?

না—না—স্বপ্ন নয়—! এই ত আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল—তার নিজের হাতে গাঁথা ফুলের মালা! তবে—?

পূবের দিকে চেয়ে দেখলুম—সূর্য্য তখন প্রখর হয়ে আরক্ত নেত্রে ছুটে আসছে।—উষা একদিকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে আপনার ভবিষ্যত ভেবে কাঁদছে।

তাদের দিকে পেছন করে নেবে এলুম।

স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না!

চাঁদে কলঙ্ক থাকে? পুষ্পে কীট—? বিশ্বস্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—সৌন্দর্য্যময়ী নারী—তার বুকেও এত খল? নারী—পাপের মূর্ত্তি! অবিশ্বাসী সে—! কলঙ্কের ছবি! ছিঃ—!

সেই ওদিকের আধ আব্‌ছায়া পাহাড়ের ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে রয়েছে।—আর পাশে বসে তপ্ত সূর্য্যের মত ভাস্বর উগ্রবরণ যুবক চন্দন কাঠের পাখা ব্যজন করছে।

ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে বলি—"এতদূর অধঃপাতে গিয়েছ—পাপীয়সী নারী—"

হঠাৎ চমকে উঠে বসল—! আমাকে দেখতে পেয়ে চক্ষু-

লজ্জা ? কত ঢঙই জান ! ওকি—যুবকেরও হাস্তভরা মুখ ম্লান—শুষ্ক ! আর সে দ্রুত পা ফেলে পালাতে লেগেছে—! বাঃ—!

* * * *

সন্ধ্যা ডাকছে—"শরৎ—ক্ষমা কর আমাকে—ফিরে যেও না। দাঁড়াও—আমাকে বলতে দাও। আমার সব কথা শুনে বিচার করে শাস্তি দিও—। আমাকে বিশ্বাস কর—"

বিশ্বাস ! তোমাকে ! তুমি জান না—নির্ম্মল নৈবেদ্য যখন তোমার চরণে নিবেদন করেছিলাম—সে কি প্রাণভরা বিশ্বাস নিয়ে—! তার প্রতিদানে তুমি তাই দু'পায়ে দলে—!

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

দুঃখ ? না—বিন্দুমাত্র না। একবার শুধু মনটা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। একবার শুধু—! না দুঃখ কিসের ? হাস্‌ছি শুধু দেখে—তাসের ঘর বেঁধেছিলুম—পড়ে গেছে। দুঃখ—কিসের ?

জীবনটা আমার আগাগোড়া ভুল হয়ে গেছে। আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে !—

বড় দাগা পেয়েই প্রকৃতির ও লীলাভূমির কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

সহরের বাইরে যাবার প্রধান দরজার ধারে দাঁড়িয়ে—একবার শেষ বারের জন্য ফিরে তাকালুম।

"পথ ছাড়ো"

চেয়ে দেখি এক তালপাতার সেপাই। জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন—কে তুমি—"

"আমি সন্ধ্যার দূত— রবির কাছে যাচ্ছি—চিঠি নিয়ে—"

"চিঠি দেখি"

"হুকুম নেই"

"আমি দেখবই"

বৃথা কালব্যয় না করে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে চিঠি কেড়ে নিলুম।—সন্ধ্যার চিঠি ! লিখছে রবিকে ! বড় কৌতূহল হ'ল—রবি ছেড়ে চলে গেছে বলে অনুনয় করে ফিরে ডাকছে—? কিম্বা—!

কিন্তু তা ত নয় !

লিখছে—

..."জ্ঞান হোলে চোখ খুলে যখন তোমাকে দেখলুম—আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। ছিঃ—ছিঃ—তুমি না পুরুষ--তুমি না বীর ! অসহায় অজ্ঞান অবস্থায় তুমি আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছিলে ! দুর্ব্বল নারীর প্রতি এত অত্যাচার কর্ব্বে—? কেন তুমি রোজ এসে এরকম জ্বালাতন কর ? আমি ত তোমায় বরাবরই বলে এসেছি—তোমায় ঘৃণা করি—বিন্দুমাত্র ভালবাসি না—! তবু তুমি শুনবে না—? ছিঃ—।

.. আমি জানি উষা তোমার হাতে পড়ে মরমে মরে আছে। অভাগী সে তাই তোমার মত নরাধমকে বরণ করেছিল। তার মত দেব-কন্যাকে স্ত্রীরূপে পেয়েও তোমার মন ওঠে না ! তোমার মত পাষণ্ডের তুলনা আমি জানি না—।

...তুমি যদি কথা না শুনে ফের আমায় জ্বালাতন করতে আস—আ ম বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব—..."

তবে ত ভুল বুঝেছিলুম তাকে !

* * * *

তাইত স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না !

চাঁদে কলঙ্ক থাকা সম্ভব। ফুলেও কীট থাকতে পারে। কিন্তু নারী—বিশ্বস্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি গৌরবময়ী নারী—সে অবিশ্বাসী নয়—! সে চির নির্ম্মল—চির সুন্দর !

ছুটে গিয়ে সন্ধ্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম !

পাহাড়ের ওপর ঝোপের আড়ালে একটা বাংলো আর দেখা যাচ্ছিল না।—কিন্তু তাদের বৈদ্যুতিক বাতিগুলা এক এক করে জ্বলতে লাগল। মনে হোল গাছ গুলাতে মুক্তোর ফল ধরেছে।

শরৎ-সন্ধ্যায় মঙ্গল শাঁখ বাজছিল—দশদিক মুখরিত করে।

ভদ্রলোকের এক কথা

সেদিন এক পুলিস কর্ম্মচারীর মুখে কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া আমাদের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। পুলিসের মুখে কালিদাস, আর যমের বুকে কাব্যরস—এ বড় সাধারণ কথা নহে। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ কবি গেটে প্রদত্ত সার্টিফিকেট ইহার কাছে নিষ্প্রভ।

ভদ্রলোক কহিতেছিলেন—আচ্ছা বলুন দেখি মশাই কালিদাসের কবি-প্রতিভা শকুন্তলা নাটকে কোথায় আশ্চর্য্য-রূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করেছে? উত্তরে কেহ বলিলেন—দুর্ব্বাসার অভিসাপ, কেহ বলিলেন—

"কালিদাসস্ত সর্ব্বস্বম্ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্
তত্রাপি চ চতুর্থোঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা।"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—মশাই ওসব মামুলী কথা—ও কথা কথাই নয়। "আসল কথা কি জানেন সেই জেলে আর সহর কোটালের ব্যাপারটা। বাস্তবিক মশাই সেই জায়গাটা পড়তে পড়তে আমার কবি কালিদাসকে ঋষি কালিদাস বলতে ইচ্ছা করে!

এইখানে জনৈক বন্ধু চাপা গলায় বলিলেন—আজ্ঞে সেটা সত্য বটে, এখন ত কবি মাত্রেই ঋষি হোচ্চেন দেখতে পাচ্ছি!

ভদ্রলোক সে কথা কাণে না তুলিয়াই বলিলেন—কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝতে হোলে সেই জেলের গল্পটা একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। বলিয়াই আরম্ভ করিলেন—

জানেন ত এক ব্যাটা জেলে এক রুই মাছের পেট চিরে একটা আংটী পেয়েছিল। ব্যাটা ত মহা খুসী হোয়ে আংটী বেচতে গেল। কিন্তু পড়বি ত পড় সর্ব্বদর্শী পুলিসের চোখে। স্বয়ং রাজার শালা হোচ্ছেন সহর কোটাল অর্থাৎ কি-না পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তিনি ত আংটীতে রাজার নাম খোদা দেখে দু'জন কনেষ্টবল দিয়ে জেলেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন। জেলে বল্লে হুজুর আমি চুরি করি নি আংটী মাছের পেটে পেয়েছি—কিন্তু সত্যকথা বিশ্বাস করা পুলিসের কুষ্টিতে নিষেধ জানেনই ত। রাজবাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে সহর কোটাল কনেষ্টবল দুজনকে চোরটাকে সাবধানে আটকে রাখতে হুকুম দিয়ে স্বয়ং রাজার হুকুম আনতে রাজার কাছে গেলেন। সেকালে চুরির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। কনেষ্টবল দুজনের ত কখন জেলে ব্যাটাকে শূলে চড়াবে বলে হাত সুড়্ সুড়্ করতে লাগলো! কিন্তু বিধি বাম, সহর কোটাল ফিরে এসে জেলেকে ছেড়ে দিতে বললেন। কনেষ্টবল দুজন ভারি নিরাশ হোয়ে পড়ল। সহর কোটাল বললেন রাজা বলেছেন জেলের কথা সত্যি, আর আংটীটা রাজার ভারি প্রিয়, তাই তিনি জেলেকে আংটীর উপযুক্ত মূল্য দিতে হুকুম দিয়েছেন। এই বলে জেলেকে রাজার দেওয়া টাকা পুরস্কার দিলেন। একজন কনেষ্টবল বল্লে—হুজুর তা'হলে মহারাজের খুব উপকার করলেন। অপর কনেষ্টবল বল্লে—মহারাজের উপকার করুন আর নাই করুন এই জেলে ব্যাটার উপকার করলেন বটে—বলে জেলের দিকে রাগে কট্মট্ করে তাকিয়ে রইল। জেলে গতিক দেখে নিবেদন করলে—হুজুর এই টাকার অর্দ্ধেক দয়া করে আপনারা পান খেতে নিন। কনেষ্টবলের রক্তচক্ষু হঠাৎ প্রসন্ন হোয়ে উঠল। সহর কোটাল বললেন—ভাই এখন তুমি আমাদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু হোলে; তা আমাদের প্রথম বন্ধুত্ব মদ সাক্ষী করে করতে চাই, চল শুঁড়ির দোকানে যাওয়া যাক্!

এই সামান্য বৈচিত্র্যহীন ব্যাপারটা শুনিতে শুনিতে আমাদের জনৈক বন্ধু মহা গরম হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—মশাই এই পচা পুরাণো গল্পটাতে আপনি কবি প্রতিভার গন্ধই বা কোথায় পেলেন, আর ঋষিত্বের আবিষ্কারই বা কি কোরে করলেন?

ভদ্রলোক কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন—আহা

মশাই চটেন কেন, শেষ পর্য্যন্ত শুনেই যান না! গল্পটা ত সামান্য কিন্তু এর মধ্যে তিনটী যে লক্ষ্য করবার বিষয় আছে তা অসামান্য। প্রথমতঃ,—সেকালে পুলিসের যাঁরা বড়কর্ত্তা হোতেন তাঁরা ছিলেন স্বয়ং রাজার বড় কুটুম্ব অর্থাৎ শালা—বলেই মহা উৎসাহভরে ভদ্রলোক গোঁফে তা দিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ—সেকালে পুলিসের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করতে হোলে উপযুক্ত মূল্য দিতে হোতো। তৃতীয়তঃ—সেই বন্ধুত্ব শুঁড়ির বাড়ী গিয়ে মদের বোতল সাক্ষী করে করতে হোতো। দেখুন দেখি কবি কালিদাস অদ্ভুত কবি প্রতিভা বলে যে সত্য দেড় হাজার বছর আগে প্রচার করে গেছেন, মহাকাল স্বয়ং এখনও তার গায়ে একটী আঁচড় পর্য্যন্ত দিতে সাহস করেন নি। একেই বলে মন্ত্রদ্রষ্টা, একেই বলে ঋষি! আপনাদের ধারণা পুলিসের লোক ভদ্রলোক নয় কিন্তু কবি কালিদাস যে ছবি দেড়হাজার বছর আগে এঁকে গেছেন, তা ভদ্রলোকের এক কথা'র মতন এপর্য্যন্ত নড়চড় হোয়েছে কি না আপনারাই তার বিচার করুন। কালিদাস শকুন্তলা লিখে নিজেই শুধু অমর হ'ন নি, আমাদের পর্য্যন্ত অমর করে গেছেন।

এই সময় অপর একটী বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—হোয়েছে মশাই, হোয়েছে এখন আমি শকুন্তলার ভরত বাক্যের শেষ ছুটো ছত্রের মর্ম্ম বুঝতে পারছি—কালিদাস বরাবরই পুলিসের পক্ষপাতী ছিলেন দেখা যাচ্ছে নাটকের শেষে পুলিসকে ভুলতে পারেন নি—

> "মমাপি চ ক্ষপয়তু নীল লোহিতঃ
> পুনর্ভবং পরিগত শক্তিরাত্মভূঃ।"

এই "আত্মভূ নীললোহিতঃ" আপনাদের পুলিসকে লক্ষ্য করেই যে লেখা হোয়েছে তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাঁকেই মানবের পুর্ণজন্ম নিবারণ করতে অর্থাৎ কি-না মুক্তি দিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

ভদ্রলোক বিন্দুমাত্র ইতঃস্ততঃ না করিয়াই বললেন--ঐ শেষ দু ছত্রের সঙ্গে ভরত বাক্যের প্রথম ছত্রটা যোগ করুন—

> "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতি হিতায় পার্থিবঃ"

অর্থাৎ প্রকৃতি পুঞ্জের হিত রাজা ঐ "নীললোহিত আত্মভূর" সাহায্যে প্রবর্ত্তন করতে থাকুন। আপনিই মশাই যথার্থ কালিদাস বুঝেছেন, আপনিই কালিদাসের প্রকৃত সমজদার—বলিয়া ভদ্রলোক ভাবে গদগদ হইয়া প্রবলভাবে সেই বন্ধুটীর হাতটা নাড়িয়া দিলেন।

অনুরোধ

[শ্রীমতী নলিনী দেবী]

সন্ধ্যা আসিলে, প্রিয়, আমার কুটীরে
আলোকের রেখা যদি দেখিতে না পাও,
যেও না ফিরে!
ভেবে দেখো, সারাদিন
সুখ সাধ আশা-হীন
কেমনে ভেসেছি একা
নয়ন-নীরে!

শীতল সাঁঝের বায়ে ঘুম যদি আসে,
নীরব বীণাটী রহে অবহেলা ভরে
পড়িয়া পাশে,
কাছে এসে বসো ধীরে,
নীরবে যেওনা ফিরে,—
বেদনা দিওনা তারে
যে ভালবাসে!

নির্ম্মলা

[শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট-সেনগুপ্ত]

(১)

জ্যোৎস্নার বান ডাকিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার শুভ্র চাঁদিমায় ধরা যেন শুভ্র শাড়ী পরে আনন্দে হাসছে। বসন্তের শেষ। ঝুর্‌ঝুর্ করে হাওয়া বইছিলো। নির্ম্মলা উন্মুক্ত ছাদে তার বৌদির খোকাকে কোলে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে 'খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো' গেয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা কচ্ছিলো। একরাশ জ্যোৎস্নার আলো, তার মুখে পড়ে আরো সুন্দর করে তুলেছিলো। বসন্তের ধীর-সমীর তার চুলের ফাঁকে ফাঁকে দোলা দিয়ে নিজের মনেই খেলা কচ্ছিলো।

গুন্‌গুন্ করে গেয়ে খোকাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে নির্ম্মলা নিজের মনে ভাবছিলো আকাশ-পাতাল কত কি। কবে সেই সোণার স্বপন রাতে সে যেন তার এই খেই-হারা জীবনের একটা বন্ধন পেয়েছিলো। তারপর কবে যে আবার তার কালোচুলের মাঝে লালের রেখাটী মুছে দিয়ে তার সকল সাধ দলিত করে চলে গেছে, সে তার খোঁজ রাখেনি!

হঠাৎ সামনের লালরঙের তেতোলা বাড়ীটার সামনের একটা জান্‌লা খুলে গেল! এক ঝলক্ বিজলীর আলো জ্যোৎস্নার আলো ম্লান করে নির্ম্মলার ঠিক মুখের উপর এসে পড়লো। ওপর দিকে চাইতেই নজর পড়লো—ঘরের ভিতর ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান ভাবে চশমা চোখে এক নবীন যুবার দিকে। তাড়াতাড়ি চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে নির্ম্মলা সিঁড়ি বেয়ে দুড়্‌দুড়্ করে নীচে নেমে গেল।

খোকাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, সে তার একটানা কাজের মধ্যেই আবার মনটাকে নিয়োগ করে দিল। * * * * * বাড়ীটা এতদিন খালিই ছিল—কাল কারা ভাড়াটে এসেছে। কিন্তু লোকজনের সাড়া ত কৈ বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু ঐ বাবুটী— আর ত কেউ আসেনি।

নির্ম্মলা নেয়ে এসে ছাদে কাপড় শুকুতে দিচ্ছিলো। একবার কেমন আগ্রহ হল। ও বাড়ীটার দিকে চাইতেই চোখ পড়লো সেই কালকের রাতে দেখা মানুষটী সেও যেন তারি দিকে বুভুক্ষার মত পলকহীন হয়ে চেয়ে রয়েছে। আজ কিন্তু সে তার চঞ্চল-দৃষ্টি নামিয়ে নিলে না। সে শিশুর মত সরল মুখখানি উদাস, ব্যথায় ভরা। ভোমরার মত কালো কুচকুচে চুল অযত্নে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মুখখানা যেন গভীর বিষাদে ভরা।

নির্ম্মলা কতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল—জানে না। লোকটা তার সামনে থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল। নীচে থেকে বৌদি চেঁচিয়ে বললেন—'বেলা হয়ে যাচ্ছে, জল-খাবারের ময়দাটা মেখে দেবে কখন?'

—"এই যাই"—বলে, নির্ম্মলা নীচে নেমে এল।

(২)

কাজে অকাজে নির্ম্মলা যখনই ছাদে যায়, তখনই সে দেখতে পায় সে মানুষটী ঠিক সেই ভাবেই যেন তারই একটু সাক্ষাৎ আশে দীনের মত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার সে সরল চাহনির মধ্যে ত কৈ কোন পঙ্কিলতা নেই। তবু নির্ম্মলার যেন কেমন ভাল লাগে না। আবার ভালও লাগে। একবার শুধু ওপর দিকে তাকিয়ে চারচক্ষুর দৃষ্টি বিনিময় না হতেই বুকের ভেতরটা যেন ধড়ফড় করে ওঠে। না জানি সে নিজের অজ্ঞাতে কি ভীষণ পাপ করে ফেলেছে, এমনি ভাবে সরে যায়। কিন্তু তখনি আবার মনকে প্রবোধ দেয়—এতে দোষ কি? শুধু চোখের দেখা তাতে ত বারণ নেই! …দুত্তোর যাক্‌গে! যখন তখন আর ছাদে আসবো না, ঠিক করে নির্ম্মলা মনকে প্রবোধ দিলে।

কিন্তু তার পরদিন সকাল থেকে সেই যে জানালা বন্ধ হয়ে গেছে, ক'দিন আর মোটেই খোলে নি। নির্মলা আর সেদিকে তাকিয়ে দেখে নি। কিন্তু মনটা তার সেই একটী অসহায় আর্ত্তের জন্যেই যেন কেঁদে কেঁদে ঘুরছিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ যে সেই ঘরটা থেকেই ভয়ানক কাশির স্বরে নির্মলার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কি ভয়ানক কাশি —মনে হচ্ছে যেন এখনি দম ফেটে যাবে। নির্মলা উৎকর্ণ হয়ে বিছানায় উঠে বসলো। কতক্ষণ কাশতে কাশতে লোকটা যেন হাঁপিয়ে উঠলো। তারপর তার রুদ্ধ নিঃশ্বাসের একটানা গোঙানিতে নির্মলা সে রাত্রে আর ভাল করে ঘুমুতে পাল্লে না।

তবে কি তার অসুখ করেছে? সেই জন্যেই কি একদিন জানালা বন্ধ ছিল? কিন্তু কাছে ত আর কেউ নেই। এ বিপদে কে তবে তাকে দেখছে? ভাবতে ভাবতে নির্মলা বিমনা হয়ে পড়লো। অপরিচিত অসহায়ের চিন্তায় তার করুণাভরা কোমল বুকটা মুচড়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল।

(৩)

দিন কাটছিলো। যেমন ভাবে এতদিন কেটে এসেছে, ঠিক তেমনি ভাবেই—তার একচুলও নড়চড় হয় নি। নির্মলা প্রতিজ্ঞা করেছিলো—আর ওদিকে চাইবে না।

কিন্তু সেই ভয়ানক কাশির স্বর তাকে বিমনা করে তুলতো। নিজের মনকে নিজেই সে প্রবোধ দিয়ে বলতো— তাতে আমার কি? ওতো পর। ওর সুখ-দুঃখ কষ্ট-যাতনা ভাবাও যে পাপ। কিন্তু মন তা মানতো কৈ? তাই জোর করে সে তার মনটাকে কাজের মধ্যে লিপ্ত করে রাখতো।

* * * *

কোন্ ফাঁকে ধীরে ধীরে একটা মাস সরে গেছে। বসন্ত মলিনমুখে বিদায় চাইছে। ঋতুরাজ প্রচণ্ড আকারে তাঁর অধিকার জানাতে ছুটে আসছেন। খোকার জ্বর হয়েছিল— আজ্ঞার নিয়েছে। বৌদি তাকে কোলে নিয়ে ঘরে বসে আছেন। নির্মলা আজ হেঁসেলে এসেছিল। খোকা সাবু খাবে। ভাঁড়ারে একটা টীনের কৌটায় অনেক দিনের চাট্টি সাবু একটা কাগজে মোড়া পড়েছিল। সেই ক'টী ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে নির্মলা ছাদে এসে তার ভিজে চুল মেলে দিয়ে বসে ছিলো। এমন সময় এতদিনের বন্ধ করা সেই জানালা আজ ধীরে ধীরে খুলে গেল। নির্মলা সেদিকে চাইতেই শিউরে উঠলো। সামনেই পড়লো একটা কঙ্কালসার শীর্ণ শরীর। চক্ষু কোঠরগত, নিষ্প্রভতার দৃষ্টি। দেহের সমস্ত রক্ত শুকিয়ে কালিবর্ণ হয়ে গেছে। একি! এই কি সেই মানুষ? নির্মলা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। নির্নিমেষ অপলক দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে ভাবছে—এও কি সম্ভব? এমন কি অসুখ হয়েছিল, যে একদিনেই এমন হয়ে গেছে?

লোকটার শুষ্কঠোঁটে ক্ষীণহাসির রেখা যেন অস্ফুটভাবেই মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে জানলা বন্ধ করে সে তার সম্মুখ থেকে সরে গেল। নির্মলার বুকটা নীরবে আর্ত্তকণ্ঠে যেন একবার হাহাকার করে উঠলো একি সে দেখলে? মৃত্যুর পূর্ব্বে যেন মহাকালের দারুণ উপহাস! তারই দিকে মৌন-মুখে চেয়ে কি যেন সে বলতে গিয়ে শুধু একটা ব্যর্থ ক্ষীণ হাসির রেখা দিয়ে তার হতাশ জীবনের আকুল ক্রন্দনটুকু জানিয়ে গেল।

(৪)

বৌদি বল্লেন—"লোকটা বোধ হয় আর বাঁচবেনারে নির্মলা! বোধ হয় আজ ডাক্তার এসেছিল—আজ আর বিছানা থেকে ত কৈ একবারও ওঠে নি।"

নির্মলা ভাল বুঝতে পাল্লে না। বল্লে—"কে বৌদি?"

বৌদি নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন—"এ রোগে কি কেউ বাঁচে? ক্ষয়কাশ—শিবের বাবার অসাধ্য। তবে আমার বোধ হয় লোকটা একটু সেবা-যত্ন পেলে হয়তো আর দিনকতক বাঁচতে পাত্তো।"

নির্মলা আগ্রহ আকুলকণ্ঠে বল্লে—"কেন বৌদি, আর কি কেউ ওঁর নেই?"

বৌদি ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্য করে নির্মলার দিকে বক্র-কটাক্ষ করে বল্লেন—"মরণ আর কি! ওর কে আছে না আছে তার খবরে আমাদের দরকারটা।"

নির্মলা সঙ্কুচিতা হয়ে ঘাড় হেট করে সেখান থেকে চলে

গেল। যেন সে তার পরিচয়ের একটুখানি আভাষ নিতে গিয়েও কতখানি অপরাধ করে ফেলেছে। তার এ অপল্কা-নারী জীবনে সেটুকুর মাত্রা না জানি কতই বেশী। নিজের ঘরে এসে কুরুশ পশম হাতে নিয়ে খোকার অর্দ্ধসমাপ্ত মোজাটা বুনতে বুনতে বৌদির সেই কথা ক'টাই সে নিজের মনে তোলাপাড়া কত্তে লাগলো। "সেবা-যত্ন পেলে হয়তো লোকটা আর কিছুদিন বাঁচতে পাত্তো।—কিন্তু এই এত বড় বিশ্বটায় একটা মুমূর্ষুর সেবা কর্ব্বার মত লোকের কি অভাব যে তারি বিহনে একটা আশাভরা জীবন ব্যর্থ হয়ে অসময়ে নিভে যাবে? পৃথিবীতে এমন প্রাণী কি নেই, যে এই নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ একটু সেবা-যত্ন করে তার শিখাকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারে? এমন মানুষেরও ত জগতে অভাব নেই। শুধুই বিরাম আর শুধুই অবসর নিয়ে জন্মেছে, দুনিয়ার এমন লোকের সংখ্যাও ত ঢের। তবে কেন একটা আশাভরা প্রাণ অকালে এমন ভাবে শুকিয়ে যাবে?"

নির্ম্মলা তার নিজের জীবনটার দিকে তাকিয়ে দেখলে। দেখলে—সম্মুখে তার যে উন্মুক্ত অবসর সে অবসরটা ত শুধু নিষ্কর্ম্মার অকাজের মত, শুধুই হেঁসেলের হাতাবেড়ী বা কুরুশ পশম নেড়ে কাটাবার জন্যে নয়। তারও একটা কর্ত্তব্য আছে, উপযোগিতা আছে। ঐ যে একটা অসহায়, তারি দিকে মৌন করুণ চাহনিতে কি বলে গেল—তার এ নীরব নিবেদনটা ত উপেক্ষার নয়।

(৫)

তখন অনেকখানি রাত। সারাদিনের জন-কলরব সুপ্তির ক্রোড়ে ঢলে পড়েছে। নীরব, নিস্তব্ধ প্রকৃতি নিশীথের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। নির্ম্মলা শয্যা থেকে ধীরে ধীরে উঠে সদর কপাট আস্তে আস্তে খুলে আবার ভেজিয়ে দিয়ে একেবারে রাস্তার গ্যাস-আলোকে এসে দাঁড়ালো। পথে লোক চলাচল নেই।... পাশেই ঐ গলিটা। জান্‌লার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলোক রেখা এসে পড়েছে। নির্ম্মলা তার বাড়ীটার দোরে গিয়ে ধীরে ধীরে ঘা দিলে। দোর খোলাই ছিল। ধাক্কা পেতেই খুলে গিয়ে যেন শূন্যগর্ভ রাক্ষসের মতো বিরাট হাঁ করে তাকে গ্রাস কত্তে এলো।

ভিতরে সব ক'টা বিজলী বাতি জ্বালাই ছিল। কপাটটা আবার বন্ধ করে দিয়ে নির্ম্মলা কম্পিত পদে, ধীরে ধীরে তার উপরের ঘরে এসে দাঁড়ালো।

চম্‌কে উঠে লোকটা শান্ত কণ্ঠে বল্লে—কে?

নির্ম্মলার বুকটা দুর্‌দুর্ করে উঠলো। কম্পিতকণ্ঠে সে বল্লে—আমি।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তেমনি শান্ত কণ্ঠেই লোকটা বল্লে—সত্যিই তবে তুমি এলে, কিন্তু আর কিছুদিন আগে এলেনা কেন?

অসহায়ের মতো কি করুণ উক্তি, কি ভয়ানক তার সে ম্লান দৃষ্টির অদ্ভুত চাহনি—কতখানি বেদনা তাতে মাখানো। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের রুদ্ধস্বরে সে তার শীর্ণ হাত দুটো মুঠোর মধ্যে চেপে নিয়ে বল্লে—ওগো ভুল হয়ে গেছে। তুমি সেরে ওঠ, এ মহা ভুলের সংশোধন করে দিও। এমন করে আর কাকেও উপেক্ষা কর্ব্বো না।

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখার মতো জোরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে লোকটা নির্ম্মলার হাতদুটী বুকের মধ্যে চেপে ধরে বল্লে—"আর ত সময় নেই বোন। আমার পরোয়ানা এসে গেছে। মনে পড়ছে আজ কত কথা—সর্ব্বহারা হয়ে শুধু তোমারি মত বোনটী চঞ্চলাকে নিয়ে আদরে যত্নে বড় করে তুলেছিলাম। তাকে সুখী দেখবো বলে কত আশা করে বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেত আমার সকল সাধ দলিত করে চলে গেছে। তারপর—এই ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তায় দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পড়লাম। শেষে ডাক্তারের পরামর্শে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি। এই জান্‌লাটা দিয়ে তোমায় দেখে কতদিন ভুল করে ফেলেছি—বুঝি তুমিই আমার সেই ছোট বোনটী—চঞ্চলা।

লোকটার গণ্ড বেয়ে দরদরধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তারপর খানিক থেমে, নির্ম্মলার মুখের দিকে চেয়ে সে বল্লে—"আমি জান্তুম তুমি আসবে। তোমার এই শান্ত কর দুটীর একটু সেবা পাবার জন্যেই যে আমি

রাতের পর দিন, দিনের পর রাত তোমার অপেক্ষা করে বসেছিলুম। তুমি এসেছ ছোট বোনটী আমার আজ ত তোমায় আর কিছু দিতে পার্কো না এই নাও—জীবনের উপার্জ্জিত, যা এতদিন সঞ্চিত রেখেও তাঁর কাজে লাগাতে পারি নি—তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি। আমি জানি, তুমি এর সদ্ব্যবহার কর্ব্বে।

কথা কটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা ভয়ানক হাঁপিয়ে উঠলো। তারপর সেই ভীষণ কাশি। বার কতক কাশতে কাশতে তার সর্ব্বশরীর দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো। লোকটা নির্ম্মলার কোলে মাথা রেখে অবসন্ন হয়ে পড়লো। তারপর পূবের কোণটায় ভালো করে আলো ফুটে ওঠবার আগেই তার প্রাণহীন দেহটা নির্ম্মলার কোলের ওপর এলিয়ে পড়লো।

নির্ম্মলা তার নিস্পন্দ দেহটাকে আঁকড়ে ধরে করজোড়ে একবার অস্ফুট আর্ত্তনাদে বল্লে—"একি কল্লে দয়াময়!"

* * * *

পরদিন এই ব্যাপারটী সালঙ্কারে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। আর সেই সঙ্গে আমাদের উদার সমাজ এই চঞ্চলা বালিকাকে উচিত শিক্ষা দিতে কণামাত্রও কার্পণ্য করেন নাই। কারণ সে যে সকলের অজ্ঞাতসারে নিস্তব্ধ রাত্রে বাড়ীর বাহিরে গিয়াছিল। আর্ত্তের আকুল আহ্বানে কি দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় বাহির হইয়াছিল কি-না অত ছোটখাট বিষয় আলোচনা করিবার ধৈর্য্য সমাজের নাই। কারণ সে যে মেয়েমানুষ। তারা কলঙ্কের পশরা চাপিয়ে দিতে পারে স্খলন কর্ত্তে পারে না। সেই অপরিচিত লোকটা বিশ্বের অসহায় মূর্ত্তি ধরে তারি কোলে মাথা রেখে মরে তাকে প্রেরণা দিয়ে গেছে—আর্ত্তের সেবাই ধর্ম্ম তাই আজও সে তার নাম ঠিক বজায় রেখে, এই বিশাল বিশ্বের পায়ে তার তুচ্ছ জীবনটাকে লুটিয়ে দিয়েছে। তার কাছে আজ কেউ আপন পর নয়। তার পবিত্র জীবন আজ শুভ্র-শুচি—পবিত্রময়—নির্ম্মল।

স্মৃতিচিহ্ন

[মোহাম্মদ আনজম্]

স্বরগের শরতের মরতের বন্ধে,
মুরতিটি মূরছিয়া পড়ে যা'র ছন্দে;
তটিনীর তনু-ধনু অনুপম রঙ্গে,
বিধু-সিধু-বিধূনিয়া মিশে যা'র সঙ্গে;
শুষমায় সুশোভিত শশী-তারা ভিন্ন,
অনুরূপ তনু-রূপ নহে যা'র চিহ্ন;
কবিতাটি কবি তা'র অভিসার লক্ষ্যে,—
বিরচিছে বিরলেতে নিরমল বক্ষে!

নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-চর্চ্চা

[গৌরীহর মিত্র]

(১)

"বলি তুমি আজ অত বিষণ্ণ কেন? তোমার কি হয়েছে যে আজ সারাদিন নাওয়া নাই, খাওয়া নাই—কেবল চুপ মেরে একলা ঘরে বসে আছ? আমার সঙ্গে আজ খোস-গল্পও কর নাই—কারণ কি?"

এই কথাগুলি লতিকা তাহার পরমারাধ্য দেবতা স্বামী নরেন্দ্রনাথকে বলিল। নরেন্দ্রের আজ কোন কথা নাই যে একমুহূর্ত্ত স্ত্রীকে না দেখিলে ব্যাকুল হয়, আজ সে তাহার স্ত্রীকে সম্মুখে পাইয়াও বিষণ্ণ! যেন সে কতদিনের রোগী—মুখ চোখ বসিয়া গিয়াছে। যে স্ত্রীর একটি বাক্য তাহার মনপ্রাণ শীতল করিত—কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিত তাহার আজ অত বাক্যব্যয়েও মন টলিতেছে না কেন?

যদিও নরেন্দ্রনাথের বাক্য সঞ্চার হইতেছিল না তথাপি প্রিয়তমার বহু সাধ্য-সাধনার পর, অতি কষ্টে তাহার বাক্য-স্ফুরণ হইল। যে স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপে কোনদিন কষ্ট বোধ করিত না—ঝড়ের মত অনর্গলভাবে কত গল্প, কত দেশ বিদেশের রাজা বাদসার গল্প করিয়া স্ত্রীর মনে বিমল আনন্দ প্রদান করিত, তাহার আজ সে কিছুই পারিতেছে না। মনে হয়, যেন সে তাহার সমস্ত পুঁজিপাটি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

স্ত্রী লতিকাও আজ তাহার আরাধ্য দেবতার দুঃখে দুঃখিতা। তাহারও আজ কিছুই ভাল লাগিতেছে না। যে স্বামীসুখে সোহাগিনী—স্বামী-দুঃখে দুঃখিনী তাহার তো ভাল না লাগিবারই কথা।

স্বামী আজ কিসের জন্য অত ম্রিয়মান লতিকা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

স্ত্রীর অনেক মিনতির পর হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের সে বিষণ্ণ-ভাব কোথায় কোনদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। এখন সে গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিল—'সম্পাদক ভায়ারা সব মূর্খ। কার কি রকম বিদ্যে-বুদ্ধি তা সব বুঝি। আমার অমন সুন্দর কবিতা, অমন সুন্দর প্রবন্ধ কিনা বলেন ভাল হয় নাই। একেবারেই জবাব। উঃ কি সত্যবাদী রে! লিখ্‌লেন কি-না 'কিছুই ভাল লাগল না বলে আপনার প্রবন্ধ ও কবিতা আমরা পত্রস্থ করতে পারলুম না। আশা করি ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। কি আপ্যায়িতটাই না আমায় করলেন।"

এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ সম্মুখের টেবিল হইতে সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত চিঠিখানি লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। এবং বিনা বাক্যব্যয়ে গালে হাত দিয়া ফণাহীন সর্পের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল। এইরূপ ক্রোধের সময় স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া লতিকা দূরে সরিয়া গিয়াছিল। এবং সেই স্থান হইতে একদৃষ্টে স্বামীর লম্ফ-ঝম্ফ দেখিতেছিল।

অল্পক্ষণ পরে লতিকা দূরে নিক্ষিপ্ত চিঠিখানি কুড়াইয়া লইয়া টেবিলের উপর পুনঃ স্থাপনের চেষ্টা করিলে নরেন্দ্র ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রিয়তমার হস্ত হইতে চিঠিখানি কাড়িয়া লইল এবং কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া, টেবিলের নিম্নে চুবড়ীর ভিতর ফেলিয়া দিল; বলিল—'যা সরে যা—এখানে কেন? চিঠি লিখবার কায়দা খানায় একবার দেখ না 'ভাল লাগল না'; এ কথাটা লিখতে একটুও হাতে বাধল না। মাথায় এল কি করে? আশ্চর্য্য!'

নরেন্দ্র আর বাক্যব্যয় না করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রোষে ফুলিতে লাগিল।

এখন স্ত্রী লতিকার আর কোন কথাই বুঝিতে বাকী রহিল না। স্বামী নরেন্দ্রনাথকে প্রবোধ দিবার জন্য প্রথমেই সে ভূমিকা করিয়া বলিল—"হাঁ গা! তোমার সেই সুন্দর সুন্দর কবিতাগুলি সম্পাদক মহাশয়ের পছন্দ হয় নাই! পছন্দ না হবার ত কোন কারণ দেখি না। কবিতাগুলি

আমার নিকট রবীবাবুর কবিতার চেয়েও ভাল লাগে— তবে তাঁদের নিকট ভাল লাগল না কেন! তাঁরা কি কবিতাগুলি পড়ে দেখেন নাই! পড়েছেন নিশ্চয়ই। কি জানি কেন পছন্দ হ'ল না! ও জানি 'ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি'।"

নরেন্দ্রনাথ ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—'তাঁরা যেমন পণ্ডিত। এমন ভাল কবিতা কি-না খারাপ বলে ফেরত'!

লতিকা ইতিমধ্যে স্বামীর গুরুগম্ভীর কথা শুনিয়া নীরব হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় বলিল—'আহা তুমি চিরদিন কত গল্প, কত কবিতা লিখে আসছ—বলে আসছ! কত বড় বড় খাতা এক রাত্রেই গল্প কবিতা লিখে শেষ করেছ। তোমার এখন ত বেশ পাকা হাত হয়েছে। ও লেখা পছন্দ হ'ল না তবে হবে কোন লেখা? তুমি আমায় প্রতিদিন বলতে ভবিষ্যতে আমি একজন বড় কবি ও ঔপন্যাসিক হ'ব। কিন্তু তোমার সেই কতদিনের সঞ্চারিত আশা-ভরসা প্রকাশ পাবার মুখেই বাধা। এত সাধ্য সাধনা কি তবে বৃথা যাবে'!

নরেন্দ্র বিদ্যুতের মত চট করিয়া বলিয়া উঠিল— 'মহাশয়দের জ্বালায় আমার কি কোন কিছু হবার আশা আছে? ওদের...'

স্বামীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই লতিকা নরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বলিল—'আচ্ছা তুমি অন্য কোন পত্রিকার সম্পাদকের কাছে তোমার কবিতা এবং গল্পগুলি পাঠাও না?'

নরেন্দ্র স্ত্রীর হাত ছাড়াইয়া লইল। এবং চটিয়া উঠিয়া বলিল—'সকলের কাছে পাঠিয়েছিলুম গা—বাকী কিছু রেখেছি বলতে চাও? কিন্তু সবাই পণ্ডিত কি-না! ঐ এক বুলি—'ভাল লাগল না।'

লতিকা চকিতা হরিণীর ন্যায় হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত বলিল—'সবার কাছ থেকে ফিরে এসেছে? কেউ কি পছন্দ করেন নি? একথা তো কই তুমি আমায় এতদিন জানাও নি। তাঁদের কি তোমার সেই প্রীতিপূর্ণ গল্প বা কবিতা কিছুই ভাল লাগল না? আমি জানি তোমার ঐসব গল্প বা কবিতা পড়তে আরম্ভ করলে যে শেষ না করে ছাড়া যায় না। এইরূপ ধরণেরই গল্প বা কবিতা লোকে পড়তে বেশী ভালবাসে। তবে কেন এমন হ'ল! হায় আমাদের কপাল নেহাৎই মন্দ!'

লতিকা পুনরায় স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল,—'তোমার রাগ করবার দরকার নাই। আমি বলছি তারা তোমার প্রবন্ধ খুব ছাপবেন। তুমি নিজে একদিন তাঁদের কাছে যাওনা?'

স্ত্রীর কথায় নরেন্দ্র কিছু সান্ত্বনা লাভ করিল; এবং আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'তাই ত তাদের কাছে একদিন নিজে গেলেই বেশ হয়। তুমি ঠিক বলেছ। নিশ্চয়ই যাব। কোথায় খারাপ বলে একবার জেনে আসব। প্রবন্ধগুলি পড়ে মানে বুঝিয়ে দিলে তাঁরা নিশ্চয়ই ছাপবেন— কি বল?'

লতিকা চক্ষের নিমিষে নির্ভয়ে উত্তর দিল— নিশ্চয়ই।'

(২)

ইহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ একদিন তাহার নিজের মনোনীত কতকগুলি কবিতা ও গল্প লইয়া সম্পাদক মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয় নরেন্দ্রনাথের নাম ও আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নরেন্দ্রনাথ তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিল।

সম্পাদক মহাশয় নরেন্দ্রনাথকে সম্মুখের চেয়ারে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ চেয়ারে উপবেশন করিল এবং হৃষ্টচিত্তে নিজের বাছা বাছা কতকগুলি কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। সে সম্পাদক মহাশয়কে অন্যমনস্ক হইতে দেখিয়া মাঝে মাঝে চেতনা করিয়া দিতেছিল। সম্পাদক মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিতেছিলেন—'শুনছি, ভাল লাগছে, পড়ে যান।' সম্পাদক মহাশয়ের এই কথায় নরেন্দ্রের মনে হইতে ছিল—'এবার বাবা আর ভাল না লাগে'? কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের মনের ভিতর হইতেছিল—'বাপ্ এ আপদটা এখান থেকে গেলে বাঁচা যায়! কোত্থেকে এসে জ্বালাতন আরম্ভ করলে!'

নরেন্দ্র কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'আজ্ঞে আর দু'একটা

পড়ি না? কতক্ষণ লাগবে? কেমন—শুনে আরাম পাচ্ছেন ত?'

সম্পাদক মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—'এতেই হবে মশায়, আর শুনবার আবশ্যক নাই।'

নরেন্দ্র কিছু বিষণ্ণ হইল।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন 'নরেন্দ্র বাবু! আপনার মত বড় কবি এ ভূ-ভারতে নাই। যথার্থই আপনি একটা বড় কবি। আহা কি সুন্দর আপনার ভাব ও ভাষা! কি সুন্দর ছন্দ! উহা যেন ঠিক তালে তালে যায়। আমি এতদিন ধরে সম্পাদকতার কাজ করছি সত্য কিন্তু আপনার মত লোকের রচিত উচ্চ কবিতা ও প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত আমার হাতে আসে নাই। আপনাকে উহার পুরস্কার স্বরূপ আমার একটি উপাধি দিবার বড়ই ইচ্ছা আছে'।

নরেন্দ্র উত্তর করিল—'সে আপনার দয়া'।

সম্পাদক মহাশয় নরেন্দ্রনাথকে মস্ত বড় এক উপাধি দিলেন—'বেজোড় কবি'।

নরেন্দ্রনাথ প্রথমে খুসী হইয়া পরক্ষণেই বলিল 'সম্পাদক মহাশয় এ কি রকম শুনতে লাগছে না?'

সম্পাদক মহাশয় পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরাইয়া খানিক হাসিয়া লইলেন এবং পরক্ষণেই সংযত হইয়া বলিলেন,—'এ কিছু না—খুব ভাল উপাধি হয়েছে। এরূপ উপাধি আর কারু নাই—আশা করি আর কেউ যেন এমন সুন্দর উপাধি না পায়।'

নরেন্দ্র রুমালে মুখটি ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া বলিল,—'আমার ওসব গুলি ছাপাবার ব্যবস্থা কি করছেন?'

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন,—'নরেন্দ্র বাবু, দোষ এই যে পয়সা দিলেও আমরা ঐরূপ সুন্দর সুন্দর কবিতা বা গল্প ছাপি না। ভয় হয়—পাছে আমার কাগজখানা উঠে যায়।'

নরেন্দ্রনাথ সম্পাদক মহাশয়ের তামাসা বুঝিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সম্পাদক মহাশয়ও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বাড়ী আসিয়া নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে সাহিত্য-চর্চ্চার ফল বড় উপাধি প্রাপ্তির কথা কিছুই না বলিয়াই ভাবিল,—'কি জানি যদি উপাধির কথা সর্ব্বত্র প্রচার হয়ে পড়ে,—বিশেষ ছেলে মহলে এ সংবাদ গেলে ত আর রক্ষা নাই।'

ইহার পর হইতে নরেন্দ্রনাথ তাহার সাহিত্য-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে আর কোন কাগজে তাহার ঐরূপ মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠাইবার চেষ্টা করিত না বা কোন সম্পাদকের কাছেও যাইত না।

পাশের বাড়ী

[শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী]

আমাদের গোলাপী রঙের নব-নির্ম্মিত বাড়ীটার পাশে একখানা জীর্ণ দোতালা বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—যেন তরুণ যুবার পাশে স্থবির বৃদ্ধ। তার ইটের ফাঁকে ফাঁকে অশথের চারা গজিয়ে উঠে শ্যামলতার আভাষ দেখ দিয়েছে।

কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে আমার ঘরের জান্‌লার ধারে বসে থাকি; পাশের বাড়ীর খানিকটা দেখা যায়। গৃহকর্ম্মরতা একটী তরুণী বধূকে ব্যস্তভাবে আনাগোনা করতে দেখি। শ্যাম-কান্তি বৌটী সন্ধ্যার রজনীগন্ধার মতই শুচি-সুন্দর। তাদের আত্মীয়স্বজনহীন ছোট সংসারে শুধু সে, তার স্বামী আর ফুটন্ত ফুলের মত একটী ফুট্‌ফুটে খোকা থাকে।

অলস নির্জ্জন দুপুরে ঘরের সুমুখের বারান্দায় বৌটী এক রাশ কাপড় সেলাই করতে বসে; মাঝে মাঝে দুরন্ত ফাগুন হাওয়ার মত খোকাটী ছুটে এসে তার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আমি মুগ্ধ হয়ে মাতা-পুত্রের এই অপূর্ব্ব স্নেহের লীলা দেখি।

প্রতি সন্ধ্যায় বৌটীর রক্তিম অধর-পরশে শঙ্খ বেজে ওঠে; তারপর আঙিনায় তুলসীমঞ্চের তলায় একটী মঙ্গল-প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে সে শুভ্র আঁচলটী গলায় দিয়ে একটী প্রণাম করে।

সেবার শরতের প্রথমে আমরা পশ্চিমে হাওয়া বদ্‌লাতে চলে গেলুম। মাস তিনেক পরে ফিরে এসে শুনি বৌটীর ভারী অসুখ করেছে। ঘরের কোণে অনাদৃত শঙ্খ পড়ে থাকে, তুলসীতলায় প্রদীপ আর জ্বলে না। মাঝে মাঝে একটী বিধবা প্রৌঢ়াকে দেখ্‌তুম।

ভোরের আকাশ তখন কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরীর মত রাঙা হয়ে উঠেছে, সহসা দিগন্ত কাঁপিয়ে কান্নার রোল উঠ্‌ল—"ওগো আমার ঘরের লক্ষ্মী আজ কোথায় চল্‌লে গো"—বুকের মাঝে একটা আঘাত লাগল—এরি মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল! জান্‌লার কাছে দিয়ে দেখি দড়ির খাটে একরাশ শুভ্র ফুলের মাঝে ঝরা পুষ্পমঞ্জরীর মত তার নিস্পন্দ দেহটী পড়ে আছে। পরণে চওড়া লালপেড়ে একখানা শাড়ী, সীমন্তে একরাশ সিঁদুর যেন উষার অরুণরাগের মত জ্বলছে। তুহিন শীতল ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির স্নিগ্ধ হাসি ফুটে আছে। ভাবলাম—আঃ কি ভাগ্যবতী ও! বাহকেরা হরিবোল দিয়ে পাড়াটাকে সচকিত করে নিয়ে গেল—সতীলক্ষ্মী আপন বিজয়-গৌরবে চলে গেল। তার স্বামীর চুল রুক্ষ, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে। একটা কচি কাতর কণ্ঠস্বর ভেসে আস্‌ছিল—"ও ঠাকুমা—মা কোথায়—বল না মাকে ওরা নিয়ে গেল কেন?"

আর শুন্‌তে পারলুম না, আমার চোখের কোনে অশ্রুর বন্যা উথলে উঠল……

* * * *

একদিন দেখি পাশের বাড়ীতে অনেক লোক এসেছে। মাঝে মাঝে কলহাস্য ভেসে আস্‌ছে।

তারপর এক বাসন্তী প্রভাতে সেই লোকটী একটী গৌরী কিশোরীকে রাঙা চেলীর বাঁধনে বেঁধে জীবন সঙ্গিনী করে নিয়ে এল, আনন্দ-হাসির মধ্যে দিয়ে সকলে নববধূকে বরণ করে নিল। হায় রে—এখনও যে তিনটে মাস কাটে নি। কয়েক দিনের অদর্শনে সমস্ত স্মৃতি স্বপ্নের মত ফুরিয়ে গেল? বিচ্ছেদের কষ্টি-পাথরে আসল প্রেমের পরীক্ষা আজ হোল। আজ এই উৎসবের মাঝে একখানি শ্যাম করুণ মুখ মনের দুয়ারে কেবল উঁকি মারছে।

বিকেলবেলায় একটীবার জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, গোধুলির অস্পষ্ট আলোয় দেখি খোকা বারান্দার রেলিঙের পরে দুই বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে…

মায়ের স্মৃতি আজ এমনি করে বিলুপ্ত হতে দেখে তার প্রাণে বুঝি তীক্ষ্ণতীরের মত ব্যথা বেজেছিল। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে এলুম—চোখের জল আর বারণ মান্‌লে না।

কবিচূড়ামণি কালিদাস

[পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বি-এ, এম, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)]

(১)

ভারতের কবিচূড়ামণি কালিদাসের সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কবিবরের অমৃতময়ী লেখনী হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা যে সব তথ্য অবগত হইতে পারি তৎসম্বন্ধে প্রায়শঃ কেহই বিশেষ কিছু আলোচনা করেন না। করিলেও উহার উপরে কোনও বিশেষত্ব অর্পণ করেন নাই; কেন না যেমন কবিবরের আবির্ভাব কালের স্থিরতা এখনও নির্ণীত হয় নাই, সেইরূপ তিনি কি কি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাও পরিস্ফুটরূপে অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই; আবার যে সব গ্রন্থ কালিদাসের স্বরচিত বলিয়া সুধীসমাজে পরিগৃহিত হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যেও পাঠবিভ্রাট এত অধিক যে কোন পাঠ কবির স্বরচিত উহার নির্ণয়ও নিতান্ত দুঃসাধ্য।

যাহা হউক অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে রচয়িতার নির্ণয় সম্বন্ধে গোলযোগ থাকিলেও, অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক যুগল, বিক্রমোর্ব্বশী নাটক, উনবিংশসর্গাত্মক রঘুবংশ ও সপ্তসর্গাত্মক কুমারসম্ভব মহাকাব্যদ্বয় এবং সর্গদ্বয়াত্মক মেঘদূত খণ্ডকাব্য যে কাব্য কাননের নিত্যনব-কলকণ্ঠ কালিদাসের কমকূজন বিনিসৃত তাহাতে সুধীসমাজে কাহারও মত দ্বৈধ নাই! (১) ঋতুসংহার খণ্ডকাব্য, কুমারসম্ভবের অষ্টম হইতে সপ্তদশ সর্গ, শৃঙ্গারতিলক, শ্রুতবোধ, হাস্যার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থ কালিদাসের বিরচিত কি না তৎসম্বন্ধে কাব্যানুশীলীদিগের মধ্যে বিষম মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয় বটে।

কবিগণ স্ব স্ব কাব্য মধ্যে তাঁহাদের সময়ের সামাজিক, নৈতিক, ব্যবহারিক, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্ম্ম ও লোকাচার সংক্রান্ত বিবিধ চিত্র সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে অঙ্কিত করিয়া থাকেন, যাহাদিগের দ্বারা সুদীর্ঘ পরবর্ত্তী কালের অধ্যেতৃবৃন্দও গ্রন্থকারদিগের সম্বন্ধে, আর কোনও সময়গত নিদর্শন না পাইলেও, কালনির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারেন। এই সব চিত্র কবিপ্রদত্ত দৃষ্টান্তে, অলঙ্কারে, আচার-ব্যবহার বর্ণনে ধর্ম্মসংস্কার বিবরণে, সামাজিক ভাব বিকাশে, ভৌগোলিক নামাদি করণে, নগর গ্রাম তপোবনাদি বর্ণনে সর্ব্বত্র সুবিশদ-ভাবে প্রকটিত থাকে। প্রণিধান পূর্ব্বক একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অধ্যয়ন করিলেই অধ্যেতার নেত্রপথে নিপতিত হয়। উহাদের অমোঘ প্রমাণে কবির কাল নিরূপণ কখনও ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়া পরিগণিত হইবার নহে। কবির প্রযুক্ত ভাষার বিচারেও তৎকালের অবস্থা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটক যে কবিচূড়ামণি কালিদাসের সর্ব্বস্ব এ সম্বন্ধে কাব্যবিৎদিগের মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং আমরা প্রথমে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক মধ্যে কবিও তৎকাল সম্বন্ধে কি কি অবগত হইতে পারি উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে নাট্যগ্রন্থ সংখ্যা বর্ত্তমানে সুবিরল সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বকালে রূপক সংক্রান্ত বিবিধ বিভাগের অনুশীলন যে পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল বিভিন্ন শ্রেণীর রূপক ও উপরূপক গুলিই উহার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। পাশ্চাত্য নাট্যবিদ্‌দিগের পরিগণনায় আমরা ট্রাজেডি (tragedy) কমিডি (comedy), মেলড্রামা (melodrama), অপেরা (opera) ও হরেক রকমের ফার্স (farce) পাই মাত্র। কিন্তু প্রাচ্য নাট্যপরীক্ষকগণ নাট্যশাস্ত্রকে প্রথমে রূপক ও উপরূপক এই দুই স্থূল শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, রূপকের দশ ও উপরূপকের অষ্টাদশ অন্তর্বিভাগ করিয়াছেন। প্রাচ্য মানসিক ভাবের অনুকরণে এদেশে ঠিক বিশুদ্ধ ট্রাজেডি (teagedy) মিলিতে পারে না বটে, কিন্তু পরবর্ত্তীকালের ইতালীয় সমুন্নত ট্রাজি-কমিডি (tragi-comedy) আমাদের রূপক মধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। দশবিধ রূপক মধ্যে নাটক, প্রকরণ ও প্রহসনই প্রধান। নাটক খ্যাত ঘটনা লইয়া লিখিত, প্রকরণ কবিকল্পিত ঘটনাবদ্ধ সামাজিক বিষয়ক রূপক এবং প্রহসন সামাজিক বা কোনও জাতীয় দোষগুলি হাস্য-রসে বিবৃত। অভিজ্ঞান শকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র, উত্তর-

---

(১) মালবিকাগ্নিমিত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু মত বিরোধ ছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ শঙ্কর পণ্ডিত ও বাণীবিলাস মুদ্রাযন্ত্রের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের সূক্ষ্ম সমালোচনায় চূর্ণীভূত হইয়াছে।

রামরচিত, মুদ্রারাক্ষস, চণ্ডকৌশিক প্রভৃতি নাটক; মৃচ্ছকটিক মালতীমাধব, মল্লিকামারুত প্রভৃতি প্রকরণ এবং হাস্যার্ণব, কন্দর্পকেলি, ধূর্ত্তচরিত প্রভৃতি প্রহসন। উপরূপকের অষ্টাদশ শ্রেণীর মধ্যে নাটিকা, ত্রোটক ও হল্লীশ প্রধান। নাটিকার ঘটনাটি কবিকল্পিত, কিন্তু উহার নায়ক নাটকের নায়কের ন্যায় সুবিখ্যাত হওয়া চাই! নাটিকা স্ত্রীবহুল এবং নায়ক ধীর ললিত প্রকৃতির; রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, বিদ্ধশালভঞ্জিকা প্রভৃতি নাটিকা। ত্রোটক দেবতা ও মানুষের প্রণয় অবলম্বনে লিখিত। উহার সর্ব্বত্র বিদূষকের উপস্থিত বাঞ্ছনীয়। ইহা গীতি বহুল। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীয় হল্লীশ একাঙ্কাত্মক, সাত হইতে দশটি পর্য্যন্ত স্ত্রী ইহার পাত্র, পুরুষ মাত্র একজন। নৃত্য ও গীতে ইহা পরিপূরিত। কেলিরৈবতক সংস্কৃতে প্রধান হল্লীশ। হল্লীশ অনেকটা বিলাতী অপেরার মত। সংস্কৃত প্রহসন বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র ভেদে প্রতীচ্য ফার্সের ন্যায় অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত।

কবিচূড়ামণি কালিদাসের সময়ে ভারতে নাট্যকলার কীদৃশ অভ্যুন্নতি হইয়াছিল,—তাহা তৎকৃত নাটক ও ত্রোটকে বেশ সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকৃত মালবিকাগ্নিমিত্রে কবিবর নাট্যাচার্য্য গণদাসের মুখে নাট্য সম্বন্ধে বলাইয়াছেন—

দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ কান্তং ক্রতুং চাক্ষুষং
রুদ্রেণেদমুমাকৃত ব্যতিকরে স্বাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা।
ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে
নাট্যং ভিন্নরুচের্জ্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্ ॥১॥

[ভরত প্রভৃতি দেবর্ষিগণ ইহাকে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের (পশুহিংসাদি রহিত) কান্ত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; নটনাথ শিব স্বপত্নী উমার সঙ্গে মিলিত নিজ অঙ্গে লাস্য ও তাণ্ডবরূপে উহাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; (১) এই নাট্যাভিনয়ে ত্রিগুণ সমুত্থিত বিবিধ রসময় লোকচরিত পরিদৃষ্ট হয়; এক নাট্যই ভিন্নরুচি মানবের শৃঙ্গার হাস্যাদি বিবিধ রসরূপে বহু প্রকারে তৃপ্তিপ্রদ।]

যজ্ঞাদির ফল অদৃষ্ট, কালে ফলে; কিন্তু নাট্যযজ্ঞের ফল চাক্ষুষ, তখনই ভোগ্য। ইহা নানারসে বিভিন্নরুচি লোকের তৃপ্তিপ্রদ।

নাট্য চাক্ষুষ বিদ্যা অর্থাৎ অভিনয় দ্বারা লোক প্রত্যক্ষ বিদ্যা। বিবিধ অবস্থার অনুকরণই অভিনয়। নটাদি অঙ্গাদি সঞ্চালন, বাক্য প্রয়োগ, বেশ বিন্যাস, দৃষ্টিনিচয় প্রকটন ও সাত্ত্বিক ভাবাভিব্যক্তি দ্বারা বিবিধ অবস্থায় যে অনুসরণ করে উহাই অভিনয়। অভিনয় আবার চারি প্রকার; আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক। অঙ্গ সঞ্চালনে অভিনয়কে আঙ্গিক অভিনয় বলে। উহা আবার ত্রিবিধ; শারীর, মুখজ ও চেষ্টাকৃত। শিরঃ, হস্ত, বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব, কটীদেশ ও পাদদ্বয় এই ছয়টী শরীরের অঙ্গ এবং নেত্র, ভ্রূ, নাসিকা, অধর, কপোল ও চিবুক এই ছয়টি উপাঙ্গ। এই দ্বাদশটি অঙ্গ ও উপাঙ্গের চালনায় শাখা অর্থাৎ আঙ্গিক অভিনয় নিষ্পন্ন হয়। চরিত্রানুগত রস ও ভাবের অনুরূপ অঙ্গ ও উপাঙ্গদিগের নানারূপ অবস্থান এই আঙ্গিক অভিনয়। চরিত্রানুগত রস ও ভাবের অনুরূপ ভাষার আবৃত্তি বাচিক অভিনয়। চরিত্রানুগত রস ও ভাবের অনুরূপ বেশ-ভূষা ও দৃশ্যাদির প্রদর্শন আহার্য্যাভিনয়। চরিত্রানুগত রস ও ভাবের অনুরূপ স্তম্ভন (অবসাদ) স্বেদ নির্গমন, রোমাঞ্চ সঞ্চার, গদগদ প্রভৃতি স্বর বৈষম্য, কম্পন, বর্ণ বৈরূপ্য, অশ্রুপাত, মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রদর্শন সাত্ত্বিক অভিনয়। (২) আহার্য্য অভিনয়ে আবার ত্রিবিধ বেশের দরকার। উহারা পাত্রের বিভিন্ন অবস্থার ব্যবহার্য্য। শুদ্ধ বা বিনীত বেশ ধর্ম্মকার্য্যে, সাধু সমাগমে, উদ্বাহে ব্যবহার্য্য; চিত্রবেশ মৃগয়ায়, সমরে, রাজসভায়, শোভা সজ্জায় ধারণীয়; এবং মলিন বেশ শোকে ও দৈন্য দশায় গ্রহণীয়।

---

(১) নৃত্য, গীত ও অঙ্গাভিনয় কালে পুরুষদিগের অঙ্গ বিক্ষেপের নাম তাণ্ডব ও নারীদিগের অঙ্গবিক্ষেপের নাম লাস্য।

(২) আঙ্গিকোঽঙ্গক্রিয়োচ্যতে। রাগাদ্যঙ্গি যথাক্যং নাট্যে তদ্বাচিকং স্মৃতম্। সত্ত্বক্রিয়া সাত্ত্বিকং স্যাৎ আহার্য্যো ভূষণাদিকম্॥ ইতি সঙ্গীত চূড়ামণৌ। বিভাবয়তি যস্মাচ্চ নানার্থান্ হি প্রয়োগতঃ। শাখাদেশপাঙ্গ সংযুক্ত তস্মাদ অভিনয়ঃ স্মৃত॥ ত্রিবিধস্ত্বাঙ্গিকো জ্ঞেয়ঃ শারীরো মুখজস্তথা। তথা চেষ্টাকৃতশ্চৈব শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ॥ শিরোহস্তোরঃ পার্শ্বকটীপাদতঃ ষড়ঙ্গানি। নেত্রভ্রূনাসিকাধর কপোল-চিবুক রূপানি ষড় উপাঙ্গানি। ইতি আর্য্যনা শাস্ত্রে মহর্ষি ভরতঃ।

রঙ্গমঞ্চের আকার ব্যাকৃষ্ট, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা ডিম্বাকৃতি করা হইত। উহাতে দ্বিতল থাকিত। চরিত্রের এবং উপরের তলায় দেবতা বা দেবযোনি দিগের দেশের অভিনয় হইত, নীচের তলায় মানুষের দেশের অভিনয় হইত। রঙ্গমঞ্চের আকার দুইভাগ থাকিত; সম্মুখের ভাগে রঙ্গ বা অভিনয় ক্ষেত্র হইত, পশ্চাৎ ভাগে নেপথ্য বা বেশগৃহ থাকিত। দৃশ্যপটগুলি সাধারণতঃ ক্যানভাসের উপরে তৈলচিত্র হইত, কিন্তু বর্ত্তমান কালের উইঙস্ সিনের উল্লেখ একেবারে পাওয়া যায় না তাহা নহে। তবে নিতান্ত বিরল ছিল। পেনরেমা ও দৃষ্টি বিভ্রমকারী দৃশ্য প্রদর্শনে সেকালের সূত্রধারগণ একালকার ষ্টেজ ম্যানেজার দিগের হইতে কোনও অংশে ন্যূন বা অপটু ছিলেন না। এখন যেমন প্রতি অঙ্ককে বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত করিয়া দেখাইতে হয়, তখন তাদৃশ প্রয়োজন হইত না; কেননা তখন এখনকার মত অঙ্ক মধ্যে স্থান ও কালের পরিবর্ত্তন করা হইত না। আজকাল যেমন একটি অঙ্কের এক দৃশ্য ভারতে, অপর দৃশ্যটি হয়ত ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে, আবার তৃতীয় দৃশ্যটি হয়ত বা হিমাচলের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের, তখন কিন্তু রূপক মধ্যে এরূপ হইবার যো ছিল না। মাত্র এক দিনের ও এক স্থানের বিষয়ই এক অঙ্কে অভিনীত হইত; এমন কি দিন ও রাত্রির ঘটনা দুই অঙ্কে দেখাইতে হইত।

সংস্কৃত নাট্যবেদিগণ রূপকের আখ্যান বস্তুকে স্থূলতঃ দুইটি ভাগ করিয়া লইতেন; একভাগ দৃশ্য, অপর ভাগ সূচ্য। যাহা কিছু অভিনেয় তাহা অঙ্কমধ্যে দৃশ্য হইত, আর অবান্তর বিষয় অথচ যাহাদের বিনা সূচনায় আখ্যান বস্তু পরিস্ফুট হয় না, তাহারা বিষ্কম্ভক, প্রবেশক প্রভৃতি দ্বারা সূচিত হইত।

সংস্কৃত রূপকে আবার কতগুলি বিষয় দৃশ্যে দেখাইতে নিষিদ্ধ। যুদ্ধ, বধ, ভোজন, মল-মূত্রত্যাগ, অধর পান (চুম্বন), অভিশাপ, স্নান, বিলেপন, দূরাহ্বান, রাজ্যদেশাদি বিপ্লব, বিবাহ, মৃত্যু, রতিক্রিয়া, দাঁতে বা নখে তৃণাদি বিচ্ছেদ, শয়ন, নগরাদির অবরোধ, ও অন্য নানাপ্রকার লজ্জাকর কিংবা ঘৃণিত ব্যাপার দৃশ্যে দেখাইতে নাই। আখ্যান বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য আবশ্যক হইলে নেপথ্য হইতে সূচিত করিতে হইবে।

এখন যেমন সর্ব্বশ্রেণীর লোক নট ও নটীর কার্য্য গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তখন কিন্তু সেরূপ ছিল না। নট ও নটীর এক শ্রেণী ছিল। নৃত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও বাদ্য তাহাদের জীবিকা ছিল। (১) উহাতে এই হইত যে অভিনয় বিদ্যা সখের না হইয়া বৈজ্ঞানিকভাবে অনুশীলিত হইত। তখনকার রাজারা চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম গান্ধর্ব্ব বিদ্যার পূর্ণ অনুশীলনের জন্য রীতিমত আচার্য্য ও অধ্যেতা রাখিতেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নি মিত্রের গণদাস ও হরদত্ত মহারাজ অগ্নিমিত্রের সভায় নাট্যাচার্য্য ছিলেন। অন্তঃপুরাঙ্গনাগণও রাজাদের নিজ প্রীতির জন্য নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয় শিক্ষা করিতেন। এতদ্ব্যতীত রাজাদের নাটমন্দিরে নট ও নটীর নাট্যাভিনয় বিশিষ্ট পর্ব্বোপলক্ষ্যে সম্পাদিত হইত।

---

(১) তবে কবিবর বাণভট্ট যৌবনের প্রারম্ভে বিদেশে পরিভ্রমণ কালে কিছুদিন অভিনেতার কার্য্য করিয়াছিলেন। কবিবর ভবভূতির ও অভিনেতাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এমন কি তিনি অনেক নাটকের প্রস্তাবনা লিখিয়া উহাদের অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়াও কিম্বদন্তী আছে। রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত দৃশ্য-কাব্য বিরচন অনেকটা অসম্ভব।

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিকার

আরও একটি বৎসর রক্ত ও নীল পুষ্পের ন্যায়, মানুষের সুখ-দুঃখ লইয়া সময়ের অসীম স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে, মানুষের সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না;—সবই সময়ের অসীম স্রোতে ভাসিয়া যায়। থাকে কেবল সুকৃতি; তাহাই নশ্বর মানবকে অবিনশ্বর করিয়া রাখে। ব্যাসদেব চলিয়া গিয়াছেন, মহাভারত আছে; শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, গীতা আছে; কালিদাস চলিয়া গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে; সেক্সপীয়র চলিয়া গিয়াছেন; হ্যামলেট আছে। মানুষ মরিয়া যায়, কিন্তু তাহার কার্য্য অমরতা লাভ করে। তোমরাও তোমাদের সুখ-দুঃখ সময় স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া কার্য্য কর, এবং অবিনশ্বর সুকৃতি অর্জ্জন কর। মনে রাখিও, তোমাদের এই সুকৃতির উপর তোমাদের দেশের গৌরব নির্ভর করিতেছে!

যে বৎসরটি চলিয়া গেল, সেই বৎসর কার্য্য করিয়া নারিকেল পাট ও গুড়ের ব্যবসা করিয়া, সেই একই বৎসর মধ্যে যদুপতি লক্ষপতি হইয়াছে। কিন্তু এখনও সে তাহার মোটা কাপড় ও পরিশ্রম ত্যাগ করে নাই। কেবল প্রিয়তমা কল্যাণীর অনুরোধে, দুই একদিন খাদ্য সম্বন্ধে দুই একটা বাবুগিরি করিয়া ফেলিত।

একদিন কোনও পর্ব্বোপলক্ষ্যে কল্যাণী একটু বিশেষ যত্নের সহিত রন্ধন করিতে বসিয়াছিল।

সেইদিন যদুপতি দোকানে যায় নাই; বাটীতেই অবস্থান করিতেছিল। অবকাশ পাইয়া সে রন্ধনশালার দ্বারের কাছে আসিয়া, রন্ধনরতা, চুল্লীতাপে আরক্তাননা, সুনিপুনা পত্নীকে প্রেমপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মাতার কাছে উপবিষ্ট পুষ্টদেহ, পুলকময় পুত্র পিতাকে দেখিয়া, তাহার উৎসঙ্গে উঠিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া, তাহার দিকে দুইহাত বাড়াইয়া দিল। যদুপতি পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া কল্যাণীকে কহিল, 'দেখ, এখন ত আর আমাদের অভাব নেই। এখনও তুমি নিজে হাতে রাঁধ কেন?'

কল্যাণী মৃদু হাসিতে অধরোষ্ঠ পরিস্ফুটিত করিয়া বলিল, 'আমাদের কখনও ত কোনও অভাব ছিল না; কিন্তু আমি বরাবরই রেঁধেছি। তবে এখন রাঁধব না কেন? তবে আমার এই হাত দু'টা নিয়ে কি করবো?' এই বলিয়া কল্যাণী আপন কমনীয়, যৌবনপুষ্ট ও বলিষ্ট বাহুদ্বয় স্বামীর মুগ্ধ লোচনাগ্রে ধরিল।

যে ললিত বাহু, লজ্জিত কুসুম মালার ন্যায় যদুপতি আপন কণ্ঠে বহুবার ধারণ করিয়াছে, তাহার লোভনীয় দৃশ্যে প্রলুব্ধ হইয়া সে বলিল, 'কেন, ঐ হাতদু'টা দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে থাকবে।'

কল্যাণী। তা' বুঝি একটা কাজ?

যদুপতি। নিশ্চয়ই। খুব ভাল কাজ। কিন্তু সেই ভাল কাজ কর্ত্তে তোমার যদি ইচ্ছে না হয়, তাহ'লে ত তোমার এই ছেলেকেও কোলে নিতে পার।

কল্যাণী। দেখ ছেলে হবার আগে আমি একদিন এক খানা ডাক্তারি কেতাব পড়েছিলুম। তাতে, কি করে ছেলে মানুষ কর্ত্তে হয়, সেই সব কথা ছিল। অপর অপর কথার মধ্যে এই কথা লেখা ছিল যে, ছেলের মা যতই ছেলেকে কোলে না নেবে, ছেলের পক্ষে ততই ভাল। মার কোলের তাপে ছেলে শুকিয়ে যায়, আর সময় সময় তার যকৃতের পীড়া হয়। তাই আমি আমার ছেলেকে বড় একটা কোলে নিই না; কেবল মাই দেবার সময় একবার একবার নিতাম। কিন্তু সেই কেতাবে পড়েছিলাম যে, ছেলের চৌদ্দ মাস বয়স হ'লে, পরে মাই দেওয়া বন্ধ করে দিতে হয়। খোকার এই ষেটের কোলে পনের মাস বয়স হ'ল; এখন আমি ওকে বড় একটা মাই দিই না; আর কোলে ত মোটেই নিই নে। ও কেবল আমার কাছে বসে থাকে। বসে বসে, একটা পাত নিয়ে, কি এক টুকরা তরকারী নিয়ে আপন মনে খেলা করে।

যদুপতি। আচ্ছা, ওর বক্তৃতা হবার ভয়ে যদি ওকে কোলে না নাও, যে সময়টা রাঁধ, সেই সময়টা ত এর জন্য রুকম যত্ন নিতে পার।

কল্যাণী। তুমিও ত ওর যত্ন নাও।

যদুপতি। তা ত নিই। তবু…

কল্যাণী। তুমি ওর যত্ন নাও বলে কি ব্যবসা আর দোকানদারী ছেড়ে দিয়েছ? আবার এর পরে, যখন ও একটু বড় হয়ে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করবে; তখন আমার চেয়ে বরং তোমারই যত্নে ও মানুষ হবে। তখনও কি তুমি আর তোমার ব্যবসার জন্যে পরিশ্রম করবে না? আর পরিশ্রম না করলে আমি কি এম্নি ভাবে কুড়ে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারব? মানুষ বলে পরিচয় দেবার জন্যে, স্ত্রীর শ্রদ্ধা পাবার জন্যে, তোমার যেমন পরিশ্রম করা দরকার, আমার তেমনই পরিশ্রম করা দরকার। নইলে, আমরা তোমাদের শ্রদ্ধা পাবার আশা করব কি করে? কুড়ে পরিবারকে কে ভালবাসে? আমরা কি করবো? দেবী চৌধুরাণীর মত কুস্তি করবো, না ডাকাতের রাণী হ'ব? তাও ত দেবী চৌধুরাণীর মনোমত হয় নি; তাইত বাসন মাজবার জন্যে আর রাঁধবার জন্য রাণীগিরি ছেড়ে আবার স্বামীর ঘরে ঘর করতে এসেছিলেন। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা এই করে এসেছি বলে আমাদের জন্মগত অভ্যাস বশেই হ'ক, আর আমাদের স্বাভাবিক নরম গড়নের জন্যেই হ'ক, আমরা এই ঘরের কাজ কর্ত্তেই ভাল পারি। আর ঘরের কাজের মধ্যে, স্বামী-পুত্রকে আত্মীয় স্বজনকে রেঁধে খাওয়ানো আমাদের সব চেয়ে তৃপ্তির কাজ। এমন তৃপ্তির কাজ করতে তুমি আমায় বারণ করো না। এই রান্নার কাজেই আমাদের হাত দু'টা পুলকে পুষ্ট হয়; এই রান্নার কাজেই আমাদের হাত দু'টা পবিত্র হয়।

যদুপতি। এই কাজ করেই তুমি তোমার স্বামীকে পেটুক করে তুলবে। আর তুমি যদি তোমার এই বক্তৃতা দেশের মেয়েমানুষদের শোনাতে পারতে, তাহ'লে দেশের সকল মেয়েমানুষই তোমার মত দ্রৌপদী হ'য়ে যেত; আর দেশের সকল পুরুষ মানুষই আমার মত পেটুক হ'য়ে যেত।

কল্যাণী। যাও, তোমার সকল তাতেই ঠাট্টা।

যদুপতি। আমি খাবার জন্যে তোমার ঐ রান্নাঘরের দরজায় আসি নি। আমি এইখানে বসে তোমার রান্না দেখব, খাব; তবে যা'ব।

কল্যাণী। দাড়াও আগে আমি একখানা পীড়ি পেতে দিই; তারপর ব'স।

এই বলিয়া কল্যাণী আপন বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা সেই ধূলিপূর্ণ স্থানের ধূলি অপসারিত করিয়া দিল; এবং বহু বসন ঘর্ষণে চাকচিক্যময় এক পরিষ্কৃত কাষ্ঠাসন পাতিয়া দিল যদুপতি সেই আসনে পুত্রকে কোলে লইয়া বসিল। সেই সময় একজন ঝি আসিয়া যদুপতির হস্তে কয়েক খানি পত্র প্রদান করিল; পত্রগুলি ডাকে আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে এক খানি কল্যাণীর নামে ছিল। কল্যাণীর পত্র কল্যাণীর হাতে দিয়া, যদুপতি আপন পত্রগুলি পড়িতে লাগিল। সেই অবসরে কল্যাণীও নিজের পত্রখানি পাঠ করিল; এবং মুখ খানি বিষণ্ণ করিয়া যদুপতির দিকে তাকাইল।

যদুপতির পত্রপাঠ শেষ হইয়াছিল; সেগুলি সমস্তই ব্যবসা সম্বন্ধে পত্র। তাহা পকেটে রাখিয়া পত্নীর প্রফুল্ল মুখ বিষণ্ণ দেখিল। কিছু বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি? কি হয়েছে?"

কল্যাণী বিষণ্ণ মুখেই বলিল, 'গেল আশ্বিন মাসে তুমি বরিশালে গিয়ে মার সঙ্গে দেখা করেছিলে ত?'

যদুপতি বলিল, 'সে কথা ত তুমি জান। সেই সময় শরৎ ভায়াকে আমি মোটে চিনতে পারি নি,—বসন্ত রোগে সে এম্নি বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল। চিনতে না পেরে, তার সঙ্গে কোন কথা না ক'য়ে, একবার ঈশানীর সঙ্গে কথা কয়েছিলাম বলে, ভায়া ত একেবারে আগুন; আমাকে মারতে এসেছিল।'

কল্যাণী। তা তুমি তার সুন্দরী পত্নীর সঙ্গে প্রেমালাপ কর্ত্তে যাবে, সে পুরুষ মানুষ রাগ করবে না?

যদুপতি। হাঃ, হাঃ, হাঃ! ভায়া তোমারই মত আমাকে সন্দেহ করেছিল। আমাকে মারতে না পেরে, ঈশানী বেচারীকে আমার সুমুখেই কি বিশ্রী কথা বল্লে, কি অপমানটাই করলে! কিন্তু সে কথা ত অনেক বারই তোমায় বলে'ছি। এখন তোমার দুঃখের কারণটা কি আমায় বল।

কল্যাণী। খলি। সে সময় তুমি আরও বলেছিলে, তাদের হয়ত টাকার টানাটানি হ'য়েছে।

যদুপতি। ঈশানী আর তার ছেলে দু'টীর আর তোমার ঝিরও ছেঁড়া আর ময়লা কাপড় দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল। তাই তাদের খোঁজ নেবার জন্যে তোমাকে পত্র লিখতে বলেছিলাম।

কল্যাণী। তাই আমি পত্র লিখেছিলাম; আর ছোট খোকাকে পদক গড়িয়ে দেবার নাম করে ঈশানীকে একবার একশ' টাকা পাঠিয়েছিলাম।

যদুপতি। হাঁ, তা ত তুমি আমাকে আগেই বলেছিলে। আরও বলেছিলে যে, তার জন্য ঈশানী তোমাকে কত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পত্র লিখেছিল।

কল্যাণী। কিন্তু সেই পত্রটা পেয়ে, তখনও তাহার বিশেষ অভাবের কথা বুঝতে পারি নি।

যদুপতি। ঈশানী খুব চাপা মেয়ে কি-না।—নিজের অভাবের কথা কাউকে সহজে জানতে দিতে চায় না।

কল্যাণী। কিন্তু তার কাছ থেকে আজ যে পত্র পেলাম, তাতে কি লেখা আছে, এই দেখ। এই পত্র খানায় স্পষ্ট করে কোনও অভাবের কথা জানায় নি, কেবল শেষ কালে লিখেছে, 'দিদি, জামাই বাবুকে বলে, যদি তুমি সুবিধা মত আমাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দাও, তা'হলে বড় ভাল হয়; আমার একটু দরকার আছে।'

যদুপতি। আমি বেশ বুঝতে পারছি কল্যাণু, এই টাকাটা বড় বেশী দরকার। আমি একশ' টাকা এনে দিচ্ছি, তুমি এখনি তাকে—পঞ্চাশ টাকা নয়—একশ' টাকা পাঠিয়ে দাও। সে যেরকম চাপা মেয়ে তাতে বড় অভাবে না পড়লে, কিছুতেই বিশেষতঃ তোমার কাছে, পঞ্চাশ টাকা চাইত না। তুমি জান না কল্যাণু, তার দু'টী ছেলেকে মানুষ কর্ত্তে হ'চ্ছে; তার উপর শরৎ ভায়া কোনও উপায় না করে বসে বসে খাচ্ছে। নিশ্চয় সে বড় কষ্টে পড়েছে; হয়ত, তার কোলের ছেলেটি দুধ পাচ্ছে না। এই কথা বলিতে বলিতে যদুপতির চক্ষে জল আসিল; সে আপন ক্রোড়োপবিষ্ট শিশু পুত্রের মুখচুম্বন করিল।

দৃঢ়দেহ বলিষ্ঠ স্বামীর নেত্রে, ভূধর নির্ঝরিণীর মত, পরদুঃখের অশ্রুধারা দেখিয়া কল্যাণীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। আহা! জগতে কি এই অশ্রুবিন্দুর কোন তুলনা আছে?—পরদুঃখ কাতরের অশ্রুবিন্দু যে রাজমুকুট ভূষা কোহিনুর অপেক্ষা উজ্জ্বল ও মূল্যবান; মন্দাকিনীর প্রবাহ অপেক্ষা পবিত্র; নন্দনজাত পারিজাত অপেক্ষা সুন্দর!

কিয়ৎকাল পরে যদুপতি পুত্রকোলে উঠিয়া দাঁড়াইল; কল্যাণীকে বলিল, 'দাঁড়াও, আমি টাকাটা তোমায় এনে দিই।'

কল্যাণী কহিল, 'না, ব'স। আমার কাছে যে টাকা আছে, আমি তা থেকেই একশ' টাকা পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার আরও কথা আছে।'

যদুপতি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি, কল্যাণু?'

কল্যাণী কহিল, 'প্রায় দেড় বছর আগে তুমি একটা অন্যায় কাজ করেছিলে;—বরিশালে গিয়ে ঈশানীদের বাড়ী আর বিষয় বিক্রী হ'য়ে যাওয়ার কথা, তা'কে বলে ফেলে, তার মনে ব্যথা দিয়েছিলে।'

যদুপতি বলিল, 'হাঁ কল্যাণু, সেই অন্যায় কাজটার জন্যে, তখন আমরা বলেছিলাম যে, পরে তার একটা কিছু প্রতিকার করতেই হ'বে। কিন্তু ওটা কেবল মুখের কথাই হ'য়ে আছে; এ পর্য্যন্ত ত কোনও প্রতিকার করতে পারি নি!'

কল্যাণী কহিল, 'আজ তুমি বলেছ যে, এখন তোমার টাকার অভাব নেই। এখন তুমি সেই প্রতিকার অনায়াসে করতে পার।—তুমি কেন একটী নিয়ম করে, ঈশানীকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাও না?'

যদুপতি আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল, 'তুমি ঠিক বলেছ কল্যাণু! কিন্তু টাকাটা আমার পাঠান হ'বে না; আমি পাঠালে, শরৎ ভায়া সন্দিগ্ধমনে ঈশানীর উপর একটা অত্যাচার করতে পারে। তার চেয়ে আমি তোমাকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা দেবো তুমিই সেই টাকা ঈশানীকে পাঠিয়ে দিও।'

(ক্রমশঃ)

"শীঘ্রগতি আসে ব্যাধ দেখি অজগর।
দুইখানি করিল মারিয়া তীক্ষ্ণশর॥
দুষ্ট ব্যাধ অভিসন্ধি বুঝিয়া রমণী।
ভস্ম হও বলি সাপ দিলেন অমনি॥"
(নল দময়ন্তীর উপাখ্যান)

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩২ । [৩১শ সপ্তাহ

শিল্প-কলা *

ইটালী—সে কোন দেশ ? ইটালী শিল্পীদের তীর্থক্ষেত্র, ইটালী শিল্প-কলার জন্মভূমি। সমরক্ষেত্রে যে দেশ পৃথিবী জিতিয়াছিল, চারুশিল্পে সেই দেশই উৎকর্ষার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশ বিদেশ হইতে শিল্পীরা আজও ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ইটালী পরিদর্শন করিতে যায়—ইটালিয়াম গুরুদের নিকট শেষ শিক্ষা না পাইলে তাহাদের মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে কয়েকজন শিল্পী নিজেদের মধ্যে একটী দল বাঁধিয়া ছবি আঁকিতে লাগিয়া গেলেন। ফ্লোরেন্স নগরের এই শিল্পীদের অঙ্কিত ছবিগুলির কয়েকটী বিশেষত্ব ছিল। ইঁহাদের ছবি দেখিলেই মনে হয় সেগুলি কল্পনা রাজ্যেরই ছবি, কবির মনের যত কিছু কল্পনা সবই ঐ ছবিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবি দেখিলে প্রথমেই যা মনে হয়, ভাবিয়া দেখিলে তাহার পর আরও অনেক অর্থ বাহির হয়, অথচ প্রত্যেকটি কল্পনা যুক্তি সঙ্গত—অকারণে হয় নাই। এ[illegible] কল্পনাময় হইলেও ছবিগুলির চিত্রাঙ্কণ কিন্তু নিখুঁত, মানুষে[illegible] হাত, পা, নাক, চোক, মুখ ঠিক মানুষের মতই হয়, কো[illegible] কিছু বাস্তব পদার্থ আঁকিবার সময় কল্পনার প্রভাবে সেগুলি[illegible] অবাস্তব দাঁড় করান হয় না। এই ছবিগুলির আর একটী বিশেষত্ব এ গুলির আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মভাব। ছবিগুলির মধ্যে এমন একটা উচ্চ মহান ভাব থাকে যাহাতে আমাদের মনের মধ্যে স্বতঃই এক সুন্দর, পবিত্র, ঈশ্বর ভাব জাগিয়া উঠে।

লিওনার্ডো ডি ভিন্সি, মাইকেল এঞ্জেলো, বটিসেলি প্রভৃতি

* শিল্প-কলা চিত্রে ও গল্পে হইতে উদ্ধৃত।

অনেক জগতবিখ্যাত শিল্পীই এই দলে থাকিয়া ছবি আঁকিতেন। পাশ্চাত্য মনীষিরা এই শিল্পী দলের নাম দিয়াছেন ফ্লোরেণ্টাইন স্কুল।

এই দলের উপর কিছু কারিকুরি করিয়া আর একটা শিল্পী দল গঠিত হয়। রেখাঙ্কনে পারদর্শিতা এই শিল্পী-দল তেমন দেখাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তুলির দ্বারা ইহারা চিত্রের উপর রঙ ফুটাইয়া তুলিতেন অদ্ভুত রকমের। এই দলের প্রধান উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি হইল র‍্যাফেল। এই দলের নাম রোমান স্কুল।

ফ্লোরেণ্টাইন দল হইতেই আর একটা শিল্পী দল বাহির হয়—নাম তার ভিনিসিয়ন স্কুল। টিসিয়ন, টিনটরেটো প্রভৃতি জগতবিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন এই দলের নেতা। এই দলের বিশেষত্বই হইল ইহারা বাস্তবকেই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিত, কল্পনার বড় একটা ধার ধারিত না। ফ্লোরেণ্টাইন স্কুলের আঁকা মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া মনে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে, সেই পুরাণের মাতা ভগবতীর কথা মনে হয়, কিন্তু ভিনিসিয়ন স্কুলের মাতৃমূর্ত্তিকে আমাদের সেই ঘর সংসারের স্নেহময়ী মায়ের মূর্ত্তিটীর কথা বারবার মনে করাইয়া দেয়। ভিনিসিয়ন স্কুলের দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যেও ফুটিয়া উঠে আমাদের বাস্তব জীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি। তাহার মধ্যে দেব কিম্বা আধ্যাত্মিক ভাব বড় একটা দেখা যায় না। রেখাঙ্কনে ইঁহারা ফ্লোরেণ্টাইনদের মত পারদর্শী না হইলেও রঙ ফলাইতে ইহারা অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। তেমন রঙের জৌলস আজ পর্য্যন্ত কোন শিল্পী চিত্রের উপর ফুটাইতে পারেন নাই।

কালে এই ভিনিসিয়ন স্কুল হইতে স্পেনিস ও ডাচ স্কুল নামে আর দুই শিল্পীদল জাগিয়া উঠে। ইহাদের বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহারা কল্পনার রাজ্য হইতে পুরাপুরি ছুটি লইয়া একেবারে বাস্তব রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। তাই ইঁহাদের ছবিতে ভিনিসিয়নদের মত চোখ ঝলসান রঙের জেল্লা রহিল না, রহিল যাহা তাহা একদম স্বাভাবিক। কিন্তু একটু কল্পনা, একটু কবিত্ব না থাকার জন্য ভিনিসিয়নদের ছবির নিকট এই ছবিগুলি নিতান্তই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। ভ্যান্ডাইক প্রভৃতি বিশ্ব-শিল্পী এই দলের নেতা।

এই সকল বিশ্ববিখ্যাত দল ছাড়া আরও ছোট খাট অনেক শিল্পীদল আছে, যাহারা ইহাদেরই কোনটা ছাড়িয়া, কোনটা লইয়া নিজেদের দলের একটা স্বাতন্ত্র বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু শিল্পী জগতের জগত বিখ্যাত দল গুলির নামের উল্লেখই আজ করিলাম—ইহার বেশী নাম করিলে হয়ত মনে রাখা সম্ভব হইবে না।

শিল্পীদের মোটামোটি কতকগুলি দলের কথা বলা হইল, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা অন্যায় যে ইঁহারা কোন দলের অন্ধ উপাসক—বিশ্ব-শিল্পীদের কোন একটা দলের মধ্যে আনিয়া ফেলা বড়ই শক্ত। ইঁহারা স্থান, কাল, পাত্রের বাহিরে। এই সকল বিশ্ব-শিল্পীদের প্রত্যেকেরই চিত্রাঙ্কনের একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারা আছে, যাহা তাহার দলের লোকের কথা ত দূরে থাকুক, জগতের আর কোন চিত্রকরের নিকটও অননুকরণীয়! র‍্যাফেল, টিসিয়ন্, মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্ডো ডি ভিন্সি প্রভৃতি জগতবিখ্যাত শিল্পীদের যে কোন দলের বাহিরে ও মধ্যে দুইই বলা যায়! সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাকে ঘিরিয়া রাখিতে পারে এমন কোন সংকীর্ণ গণ্ডী কিম্বা দল থাকিতেই পারে না।

র‍্যাফেল

জগতবিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেলের নাম হয় ত অনেকেই জানেন। অনেকের মতে র‍্যাফেলের মত চিত্রকর পৃথিবীতে আর জন্মান নাই।

র‍্যাফেলের পিতাও ছিলেন একজন চিত্রকর। র‍্যাফেলের বয়স যখন ১২ বৎসর তখন তিনি চিত্র বিদ্যা শিখিবার জন্য র‍্যাফেলকে এক শিক্ষকের নিকট পাঠান। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই র‍্যাফেল শিক্ষকের যাহা কিছু বিদ্যা সব শিখিয়া ফেলিল। শিক্ষকের কিন্তু ইহাতে হইল ভীষণ রাগ। কি! এতবড় আস্পর্দ্ধা! ছাত্র হইয়া গুরুকে ছাপাইয়া উঠে! এমন ছাত্রকেও মানুষ পোষে! শিক্ষক দিলেন র‍্যাফেলকে তাড়াইয়া;— ছাত্র আর কি করে, মনের দুঃখে আর এক শিক্ষকের নিকট গেল। কিন্তু র‍্যাফেলের এমনই অদৃষ্ট, সেখানেও কিছু কালের মধ্যেই সে গুরুরও সব বিদ্যা সে হজম করিয়া ফেলিল! র‍্যাফেলের অনুকরণ করিবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত রকমের, তাই সে চটাপট তাহার শিক্ষকদের যাহা কিছু বিদ্যা সব শিখিয়া ফেলিল। এমনও শুনা যায়, তাহার শিক্ষকের অনুকরণে সে সময় সে এমন সব ছবি আঁকিয়াছিল যাহা তাহার কি তাহার শিক্ষকের বুঝা সত্যই বড় কঠিন।

এই সময়ে তাহার জীবনের একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তনের পালা আসিল। তাহার বয়স তখন কুড়ি বৎসর, সেই সময়ে একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়। চিত্র প্রদর্শনীতে র‍্যাফেল যাইয়া দেখে মস্ত মস্ত সব ছবি টাঙ্গান। দেখিয়াই তার প্রাণ মন নাচিয়া উঠিল। এতদিন সে কি সব ছাই ভস্ম আঁকিয়াছে। সে কি আর ছবি? এমন না হইলে আঁকা!

সেই ছবিগুলি ছিল বিশ্ব বিখ্যাত চিত্রকর মাইকেল এঞ্জেলো ও লিওনার্ডো ডি ভিন্সির। র‍্যাফেলের নিজের জীবনের উপর ধিক্কার হইল। ওরূপ ছবি যদি সে আঁকিতে পারে তবেই জীবন সার্থক নতুবা আর সে হাতে তুলি ধরিবে না। র‍্যাফেল দেখিল তাহার শিক্ষকের এমন বিদ্যা নাই যে তাহাকে আর শিখাইতে পারে। তখন সে নিজেই সাধনা আরম্ভ করিয়া দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি র‍্যাফেলের অনুকরণ করিবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত রকমের। র‍্যাফেল সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীদের ছবি নকল করিতে আরম্ভ করিল। র‍্যাফেলের প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী, তাই অতি অল্প কালের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পীদের সমস্ত বিদ্যা সে করায়ত্ত করিয়া ফেলিল।

এই সময়ে তাহার ছবির খ্যাতি দেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শিল্পী মহলে র‍্যাফেলের তখন বেশ নাম হইয়াছে।

সে সময়ে খ্রীষ্টানদের পোপই ছিলেন একমাত্র ধর্ম্মগুরু। রাজার অপেক্ষা লোকে তখন পোপকে বেশী ভয় ও শ্রদ্ধা করিত। এই পোপদের সে সময় এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল। ইটালীতে যত সব ভাল ভাল শিল্পী জন্মিতেন, বলে, ছলে, অর্থের লোভ দেখাইয়া, যে প্রকারে হউক পোপ তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার বাড়ীর দেওয়ালের উপর ছবি আঁকাইয়া লইতেন। পোপ ছিলেন খৃষ্টানদের ধর্ম্মগুরু, কাজেই অনেকটা ধর্ম্মের ভয়ে, অনেকটা পার্থিব ভয়ে শিল্পীদের রাজি হইতে হইত। র‍্যাফেলের সুনাম শুনিয়া পোপ র‍্যাফেলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন তাহার নিজের বাড়ীর দেওয়ালে ছবি আঁকাইবার জন্য।

র‍্যাফেল এক মনে কাজ করিতে লাগিল। ইতি পূর্ব্বেই শিল্প জগতে র‍্যাফেলের নাম সবাই শুনিয়াছিল, কিন্তু কেহই আশা করিতে পারে নাই, এত সহজে এত শীঘ্র র‍্যাফেল সবাইকে ছাড়াইয়া যাইবে। তাহার অঙ্কিত ছবি দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল। চতুর্বিংশতি বৎসর বয়সে আঁকা তাহার ছবিগুলি চিত্রজগতে এখনও শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে,—সে গুলির চাইতে ভাল ছবি আজ পর্য্যন্ত কোন চিত্রকর আঁকিতে পারেন নাই।

র‍্যাফেলের অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তির কথা কে না শুনিয়াছে? সন্তান কোলে করিলে মাতার মুখে যে স্বর্গের সুষমা ফুটিয়া উঠে, মাতার মনে প্রাণে যে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয় তাহাই অনেকগুলি ছবি আঁকিয়া র‍্যাফেল ফুটাইয়া তুলিতেছিল। এমন সুন্দর ছবি আজ পর্য্যন্ত কেহ আঁকিতে পারেন নাই, আর সব ছবি বাদ দিলেও এই মাতৃ-মূর্ত্তিগুলিই র‍্যাফেলের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

এই মাতৃমূর্ত্তি আঁকিবার বিষয়ে একটী গল্প আছে। একদিন র‍্যাফেল ছোট্ট একটী গ্রামের পাশ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে একখানি ছোট কুঁড়ে ঘরের

দুয়ারে একটী যুবতী তার ছেলেটীকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। কি সুন্দর ছবি! কি সুন্দর ছেলেটি! যেন মায়ের কোলে ফুলটি ফুটিয়া আছে! র‍্যাফেলের মনে এই দৃশ্যটী বড়ই মধুর লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ কুড়ে ঘরের সামনে বসিয়া পেন্সিল দিয়া এই দৃশ্যটীর খসড়া আঁকিয়া লইলেন; এই বাস্তব দৃশ্যের আদর্শ হইতেই তাঁহার বিখ্যাত মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

এই মাতৃমূর্ত্তির অপূর্ব্ব মাধুরী সকলকেই আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। একবার কতকগুলি দুষ্টলোক ক্ষেপিয়া র‍্যাফেলের চিত্রশালায় ঢুকিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে এই অপদার্থ চিত্রকরটার ছবিগুলো ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবে, এবং তাহাকে হত্যা করিবে। কিন্তু যখন তাহারা র‍্যাফেলের চিত্রশালায় প্রবেশ করিল, তখন কোথায় বা গেল তাহাদের রাগ কোথায় বা গেল তাহাদের হিংসা! তাহারা দেখিল র‍্যাফেল কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া একমনে মাতৃমূর্ত্তিটী আঁকিতেছেন। 'মাতৃমূর্ত্তিটী' দেখিয়া তাহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত হইয় গেল, চিত্রশালার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি না করিয়া ধীরে ধীরে তাহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহাদের দলপতি অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন—"আমারা কিনা এমন পুরুষকে বধ করিতে গিয়াছিলাম। এই সত্য গল্পটি হইতেই এই ছবির প্রভাব যে কত বড় তাহা বুঝিতে পার।

মাইকেল এঞ্জেলোও সে যুগের একজন প্রধান ভাস্কর ও চিত্রকর ছিলেন। র‍্যাফেল বয়সে তার চেয়ে অনেক ছোট ছিল। র‍্যাফেল ছোকরা অল্পদিনের মধ্যেই বেশ নাম করিয়া ফেলিয়াছিল, এজন্য তিনি তাহাকে হিংসা করিতেন। কিন্তু এঞ্জেলো র‍্যাফেলের চিত্রের প্রশংসাও করিতেন। র‍্যাফেল সম্বন্ধে এঞ্জেলোর যে কত বড় উচ্চ ধারণা ছিল, এই গল্পটী হইতে তাহা বুঝিতে পারিবে। একবার একজন ধনী সওদাগর র‍্যাফেলকে দিয়া কোনও গির্জ্জা ঘরের ভিতরটা চিত্রিত করিয়াছিলেন। চিত্র অঙ্কিত হইয়া গেলে, যে পারিশ্রমিক দিবেন বলিয়া র‍্যাফেলের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা দিতে অস্বীকার করিলেন। কাজ ত হইয়াই গিয়াছে, এখন টাকা দেওয়া না দেওয়া সে ত আমার ইচ্ছা! যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাই যথেষ্ঠ!

র‍্যাফেল চিত্রের জন্য যে টাকা দাবী করিয়াছিলেন, চিত্রের তুলনায় সে টাকা অতি সামান্য, তবু এই ধনী সওদাগরের ঐরূপ অহেতুক দুর্ব্যবহারে বড়ই চটিয়া গেলেন, তিনি বণিককে বলিলেন, "মহাশয়! একজন বেশ স্বাধীনচেতা লোকের মত লউন, তিনি আমার চিত্র দেখিয়া যা ভাল মনে করেন, সেই টাকাই আমি লইব।"

একজন বলিলেন, "তা বেশ! আমরা মাইকেল এঞ্জেলোকে মধ্যস্থ মানিতেছি," এ কথার অর্থ এই যে তিনি জানিতেন এঞ্জেলোর সঙ্গে র‍্যাফেলের ভাল ভাব নাই।

তাহারা এঞ্জেলোকে লইয়া আসিলেন। এঞ্জেলো ছবিগুলি সব দেখিলেন না, একটী ছবি দেখিয়াই বলিলেন—"বলেন কি মশাই! এত সামান্য টাকায় র‍্যাফেল এমন অপূর্ব্ব ছবি আঁকিয়েছেন? তাঁর একখানা ছবির দামই যে হাজার টাকা, আর আপনি কিনা সব ছবির জন্য হাজার টাকা দিতে যাইতেছেন? কি অন্যায়! কি অন্যায়! সওদাগর অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি সেইদিনই র‍্যাফেলকে সব টাকা বুঝাইয়া দিলেন। এঞ্জেলো চিত্রকর হিসাবে শিল্পী হিসাবে যে কত বড় মহৎ হৃদয়ের লোক ছিলেন এই গল্পটীই তাহার প্রমাণ।

র‍্যাফেলের এইরূপ নাম ও যশ দেখিয়া একদল লোকের তাহার উপর খুবই হিংসা হইল। তাহারা রটাইয়া দিল যে র‍্যাফেল যে সব ছবি আঁকেন, সে সব তাঁর নিজের আঁকা নয়, শিষ্যের সাহায্যে করে, নতুবা একা কোন একটা ছবি আঁকবার মত তার ক্ষমতা নেই।"

র‍্যাফেলের প্রাণে এই মিথ্যা কলঙ্কের আঘাতটা বড় বিষম বাজিল, তিনি এখন হইতে একাই ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন কাহারও সামান্য সাহায্যও লইতেন না।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে পোপ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বাহিরের বারান্দায় তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, তখন বাহিরে বৃষ্টি ও জোরে বাতাস বহিতেছিল, তাহাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া র‍্যাফেলের বুকে ভয়ানক বেদনা হইল। র‍্যাফেল একেবারে শয্যা লইলেন! বুঝিলেন যে তাঁহার শেষ দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। বন্ধু বান্ধবদের সকলকে সংবাদ দেওয়া হইল। চিকিৎসায় ও সেবা শুশ্রূষায় তাহার জীবন রক্ষা পাইল না। তাহার জন্মোৎসব তারিখেই অর্থাৎ যে গুডফ্রাইডের দিনে জন্মিয়াছিলেন, সেই গুডফ্রাইডের দিনে ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল কেবলমাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে র‍্যাফেলের মৃত্যু হইল। র‍্যাফেলের এইরূপ অল্প তরুণ বয়সে মৃত্যু হওয়ায় শিল্পজগতে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল। সতের বৎসর বয়সে তিনি চিত্রশিল্পে মনোনিবেশ করেন, কুড়ি বৎসর মাত্র তিনি শিল্পীরূপে কাজ করিয়াছেন এ সময়ের মধ্যেই তিনি প্রায় এক হাজার ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন।

র‍্যাফেলের নাম আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অক্ষয় ও অমর হইয়া রহিয়াছে।

এই যে ছবিখানি, এখানির দিকে চাহিয়া দেখিলেই মাতৃত্ব যে কি জিনিষ তা বেশ বুঝিতে পারা যায়! মার চোখ দুটিতে কি স্নেহ, কি ভালবাসা, এবং মনে মনে কি প্রশান্ত একটা আভাস।—যেন দুনিয়াটাকে ইহারা ভুলিয়া গিয়াছে—যেন ইহারা আর কিছু চায় না, চায় কেবল ছেলেটা তার মাকে, আর মা তার ছেলেটিকে। রাখিয়াছেন। এই সামান্য একটি হাতল আঁকিয়া শিল্পী আমাদের দেখাইতে চাহিয়াছেন এই দুটি মা ও ছেলে কি করিয়া এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া একটুখানি জায়গার ভিতর আপনাদের প্রাণের স্নেহ মমতার আদান প্রদানটুকু নীরবে সম্পন্ন করিতেছে।

এইরূপ আরও কয়েকটি মাতৃমূর্ত্তি র্যাফেল আঁকিয়াছিলেন।

ম্যাডোনা

—র্যাফেল—

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবার—শিল্পী কি চমৎকার কৌশলে একটি মাত্র ছোট্ট ইঙ্গিতের ভেতর দিয়া একটা ভাবকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শিল্পী ছবির সামনেই চেয়ারের একটা হাতল দিয়া মা এবং ছেলেটিকে বেড়া দিয়া আটকাইয়া এই ছবিটী তাহাদেরই মধ্যে একখানি। ছেলে কোলে করিলে মা যে কিরূপ আত্মহারা হয়, তাহার মুখে কি যে স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়া উঠে তাহাই শিল্পী দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই যে মেয়েটী ইহার প্রাণে ভগবৎপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। মেয়েটী যেন প্রেমের পুলকে একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে—নিজের আবেগকে সে যেন আর বুকে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাই তার চোখ দুটীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—কি একটা অব্যক্ত পুলক, মনে হয় যেন একটা অসীম আবেগে কোন এক অদৃশ্য পুরুষের চরণোদ্দেশে স্বর্গের দিকে উন্মুখ হইয়া চলিয়া যাইতে চায়। পৃথিবীর সব অসার জিনিষের মোহ কাটাইয়া মেয়েটির চোখ দুটি যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া রহিয়াছে,—সে যেন আর এ পৃথিবীর মানুষ নয়। আমাদের বাংলার অমর কবি দাশরথি দুটি লাইনে এই ভাবটি ফুটাইয়া বলিয়াছেন।

"কোন স্বপনের পাছু—আঁখি পাখী ধায়।"

ভগবৎ প্রেম

—র‍্যাফেল—

সাধু পিটার শত্রুকর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া কারারুদ্ধ ছিলেন। কারাগারের লোহ গারদের অভ্যন্তরে তাঁহার স্থায় সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তি শৃঙ্খলদ্বারা হস্তপদে আবদ্ধ রহিয়াও অটল অচলভাবে ধ্যান পরায়ণ। ভক্তের এইরূপ নির্য্যাতনে, দেবতার আসন টলিল। দেবদূত তাঁহার কারামুক্তির জন্ম আবির্ভূত হইলেন। উজ্জ্বল দীপ্তিতে কারাগৃহ আলোকিত হইল, সেই উজ্জ্বল দীপ্তি কারারক্ষকগণ সহ্য করিতে পারিলেন না—তাঁহাদের দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। দেবদূত নিজ হস্তে ভক্তের শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিলেন। এই চিত্রখানি ভুবন বিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেলের অঙ্কিত। নিদ্রিত পিটারের মুখে ভক্তি ও ধৈর্য্যের মহানুভাব পরিস্ফুট! দেবদূতের উজ্জ্বল দীপ্তি প্রহরীগণের বিহ্বলভাব নিপুণ শিল্পীর হস্তে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।
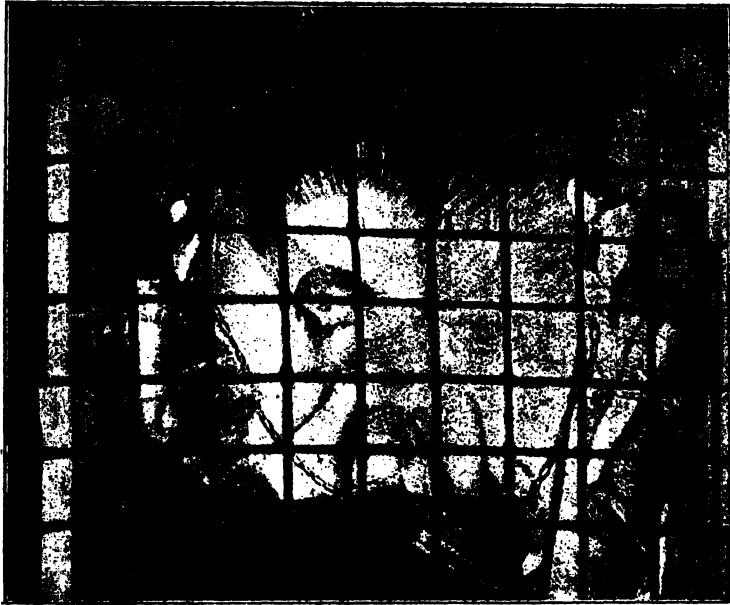
সাধু পিটারের কারামুক্তি

—র‍্যাফেল—

র‍্যাফেলের অঙ্কিত ইহাই শেষ চিত্র। যীশুখ্রীষ্ট যেদিন সমাধিগহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন—এইটি সেই পুনরুত্থানের চিত্র। চিত্রে দেখিতে পাইতেছ যে খ্রীষ্ট স্বর্গপথে উত্থিত হইয়াও শিষ্যদের ভুলিতে পারেন নাই। তিনি দুই হস্ত বিস্তারিত করিয়া শুভ অভয় আশীর্ব্বাদ প্রচার করিতেছেন। তাঁহার মুখে জ্যোতিঃ বিভাসিত।

পুনরুত্থান

—র‍্যাফেল—

এই ছবিখানি র‍্যাফেলের ১৬ বৎসর বয়সের আঁকা। ছবিখানি কলা হিসাবে খুব উচ্চশ্রেণীর না হইলেও খুব ছেলেবেলার আঁকা বলিয়াই আপনাদের নিকট ধরিতেছি।

একজন যোদ্ধা শ্রান্ত ক্লান্ত, দেহ অবসন্ন—ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন—দুটি মেয়ে যেন তাহার দুইদিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতা, আর একজন হইতেছেন কর্ত্তব্য। সুখ স্বচ্ছন্দতা একদিক হইতে লোভ দেখাইয়া বলিতেছেন, কেন মিথ্যা যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া কষ্ট পাইতেছ, তার চাইতে আমার আরাধনা কর—দুনিয়ায় বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে—দিব্যি থাকিবে, কোন দুঃখ কষ্ট তোমার গায়ে আঁচড় কাটিতে পারিবে না। ওদিক হইতে আবার কর্ত্তব্য বলিতেছে; খবরদার, ওর কথা শুনিও না—সুখ স্বচ্ছন্দতা কিছুই নয়—ও কেবল দুদিনের মোহ মাত্র। ওসব অলীক জিনিষের লোভে কর্ত্তব্যকে ভুলিও না। কর্ত্তব্যই হইতেছে জীবনের সব চেয়ে সেরা জিনিষ।

'কর্ত্তব্য' ও 'পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতা'

—র‍্যাফেল—

কবিচূড়ামণি কালিদাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বি-এ, এম, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)]

(২)

অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রারম্ভে কবিবর মঙ্গলাচরণে ভগবান্ আশুতোষের প্রত্যক্ষ অষ্টমূর্ত্তির বন্দনা করিয়াছেন। যেমন নাটকারম্ভে সেইরূপ নাটকের পরিসমাপ্তিতে ভরত-বাক্যেও কবিকৃত শিববন্দনায় এবং তাঁহার নিজের নাম 'কালীর দাস' থাকায় স্বভাবতঃ কবিবর শৈব ও বৈষ্ণবদ্বন্দ্ব যুগের একজন গোঁড়া শৈব ছিলেন বলিয়া পাঠকের মনে উদিত হইতে পারে। কিন্তু আবার যখন আমরা দেবর্ষি ভরতের আর্য্যনাট্যশাস্ত্র সমালোচনায় দেখিতে পাই 'ভগবান্ শিব নটনাথ', এবং বায়ুপুরাণ পাঠে জানিতে পারি কাব্য শরীরভূত শব্দ ও অর্থের অধিষ্ঠাতা ভগবান্ আশুতোষ এবং তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভূতা ভগবতী ভবানী (১) তখন মনে হয় কবি শৈব বলিয়া ভগবান্ শিবের বন্দনা করেন নাই; কাব্যশ্রেষ্ঠ নাটকের শরীর স্বরূপ শব্দ ও অর্থের সুপ্রয়োগ ও নাটকের নিরাপৎ পরিসমাপ্তির জন্যই কবিবর শব্দার্থের অধিষ্ঠাতা ও নাট্যকলার অধীশ্বর ভগবান্ শঙ্করের বন্দনা করিয়াছেন; এবং নাট্যকলা চাক্ষুষ অর্থাৎ দৃশ্যপ্রধান বলিয়া ভগবান্ শিবের প্রত্যক্ষ অষ্টমূর্ত্তিরই স্তুতি করিয়াছেন। বস্তুতঃ কালিদাস শৈব ও বৈষ্ণব দ্বন্দ্বযুগের লোক নহেন, তিনি উহার বহু পূর্ব্বকার লোক ছিলেন। কবিবর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত তৎকৃত কুমারসম্ভবে বিশদরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। মহাভারত ও ব্রাহ্মণের মত তিনিও বলেন সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মা, পালনে বিষ্ণু ও প্রলয়ে শিব, ভগবান্ স্বয়ম্ভুর এই তিন অবস্থা বিশেষ মাত্র। কবি তাহার কুমারসম্ভব মহাকাব্যে বলিতেছেন;—

> একৈব মূর্ত্তির্বিভিদে ত্রিধা সা
> সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
> বিষ্ণোর্হরস্য হরিঃ কদাচিদ্
> বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ ॥ ৭। ৪৪।

এতদ্ব্যতীত তিনি রঘুবংশের দশমে বিষ্ণুর এবং কুমারসম্ভবের দ্বিতীয়ে দেবতাগণের মুখে ব্রহ্মার যেরূপ স্তুতি করাইয়াছেন তাহাতে তাহাকে সঙ্কীর্ণ-শৈবপন্থী বলিয়া আদৌ গ্রহণ করা যায় না। তৎকৃত বিক্রমোর্ব্বশীয় ও মালবিকাগ্নিমিত্রের মঙ্গলাচরণে শিব স্তুতিতেই অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার শিব বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহ নহেন। (২)

প্রস্তাবনা মধ্যে কবিবর নিজের পরিচয় প্রদান স্থলে মাত্র "অদ্য খলু কালিদাস গ্রথিত বস্তুনা অভিজ্ঞান শকুন্তল নাম-ধেয়েন নবেন নাটকেনোপস্থাতব্যম্ অস্মাভিঃ (অর্থাৎ আজি কালিদাস গ্রথিত অভিজ্ঞান শকুন্তল নামধেয় অভিনব নাটকের অভিনয়ে আমাদের পারিষদ বর্গের তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে।) বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। উহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কবিবর ইতিপূর্ব্বেই স্বীয় গুণ গরিমায় এতদূর সুপরিচিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান বিড়ম্বনা মাত্র মনে করিয়া দেবর্ষি ভরতের বিধি সত্ত্বেও আত্মপরিচয় প্রদানে বিরত হইয়াছেন। যেখানে ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ পিতৃ-

(১) শব্দজাতমশেষন্তু ধত্তে শর্ব্বস্য বল্লভা।
অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ॥
বায়ুপুরাণ।

(২) একৈশ্বর্য্যে স্থিতোঽপি বহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তাসম্মিশ্র দেহোঽপ্য বিষয়ো মনসাং যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্।
অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতো নাভিমানঃ
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ॥ মাঃ মিঃ
বেদান্তেষু যমাহুরেক পুরুষং ব্যাপ্যস্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিত প্রাণাদিভি মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তি যোগসুলভো নিঃ শ্রেয়সায়াস্তু বঃ॥ বিঃ উঃ

পুরুষ মাতৃপুরুষ ও গুরু কুলের পরিচয় পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছেন সেখানে কালিদাস কেবল নিজের নামটির উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। রত্নাবলীকার মহারাজ শ্রীহর্ষও তাঁহার আত্মপরিচয় স্থলে কেবল 'শ্রীহর্ষদেবেন অপূর্ব্ব বস্তু রচনালঙ্কৃতা রত্নাবলী নাম নাটিকা কৃত্বা' (অর্থাৎ মহারাজ শ্রীহর্ষ অভিনব বস্তু রচনা দ্বারা মণ্ডিতা রত্নাবলী নাম নাটিকা বিরচিত করিয়াছেন। এই বলিয়া নিজের নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কথায় আছে 'চেনা বামুনের পৈতার দরকার কি?' বিক্রমোর্ব্বশীতেও কবি কেবল নিজের নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে কবিবর নিজের পরিচয় কিছুই দেন নাই, কিন্তু নাট্যকলা মন্দিরে তিনি যে একজন নবীন উপাসক এবং তখন সুবিখ্যাত নাট্যকার ভাস, কবিপুত্র, সৌমিল্ল প্রভৃতির যুগ চলিতেছিল ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

সূত্রধারঃ। অভিহিতোঽস্মি বিদ্বৎপরিষদা কালিদাস-গ্রথিতবস্তু মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকম্ অস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রয়োক্তব্যম্ ইতি। তদ্ আরভ্যতাং সঙ্গীতকম্।

পারিপার্শ্বিকঃ। মা তাবৎ। প্রথিতযশসাং ভাস কবিপুত্র সৌমিল্লকাদীনাং প্রবন্ধান্ অতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য ক্রিয়ায়ামিমাং দ্রষ্টুং কথং পরিষদো বহুমানঃ?

সূত্রধারঃ। অয়ে বিবেকবিশ্রান্তম্ অভিহিতম্। পশ্য—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥ ২।

[সূত্রধার। বিদ্বান্ দর্শকমণ্ডলী আমাকে বলিয়াছেন যে কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটক এই বসন্তোৎসবে অভিনয় করিতে হইবে। অতএব সঙ্গীত আরম্ভ করা হউক।

পার্শ্বচর নট। না, তা হ'বে না। যশস্বী কবিবর ভাস, কবিপুত্র, সৌমিল্ল প্রভৃতির নাটকাদি ফেলিয়া রাখিয়া বর্ত্তমান কবি কালিদাসের এই নাটকের অভিনয় পারিষদবর্গ শ্রদ্ধা সহকারে কিরূপে দেখিবেন?

সূত্রধার। ওহে, তোমার কথা বিবেক বিরহিত। দেখ, পুরাতন হইলেই সব জিনিষ ভাল হয় না। আর কাব্য নূতন বলিয়াই নিন্দনীয় নহে। বিদ্বান্ ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া ভালটি গ্রহণ করেন, মূর্খেরাই পরের কথায় চলে।]

ইহাতে আমরা স্থূলতঃ জানিতে পারিতেছি (১) মালবিকাগ্নিমিত্রই কবিবরের প্রথম নাটক, (২) শ্রব্য-কাব্যাদিতে তখন কবিবরের নাম সর্ব্বত্র সুবিদিত বলিয়াই তৎকৃত প্রথম নাটকেও তাঁহার বংশ পরিচয়ের কোনও দরকার হয় নাই। (৩) ভাস, কবিপুত্র, সৌমিল্ল প্রভৃতি সুবিখ্যাত নাট্যকারগণ গতাসু বটেন, কিন্তু তাঁহাদের নাটকাদির অভিনয়ের যুগ তখন পুরাদস্তুর চলিতেছিল, (৪) কালিদাসকে ঐ সব সুবিখ্যাত নাট্যকারদের সরাইয়া দিয়া স্বীয় নাটকাদির অভিনয়ের নূতন যুগ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। (৫) এই কার্য্যে তিনি কোনও সুপারিস চান না। মাত্র সুধীপ্রেক্ষক দিগের নিরপেক্ষ বিচার প্রার্থনা করেন। কেন না যেমন শ্রব্য কাব্যে তেমনই দৃশ্য কাব্যেও তিনি নিজের স্থান গুণানুসারে নির্দ্দেশের আকাঙ্ক্ষী। (১)

বস্তুতঃ কবিবরের এই আকাঙ্ক্ষা যে সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত নাট্যামোদী মাত্রেরই সুবিদিত। কালিদাসের রূপকের পর আর কেহ কখনও ঐ সব সুবিখ্যাত নাট্যকারদের নামও শুনিতে পান নাই। বর্ত্তমানে প্রত্ন-তত্ত্ববিৎদিগের বহু অনুসন্ধানের ফলে ভাস কবির কয়েকখানি মাত্র রূপকের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। সৌমিল্ল ও কবিপুত্রের নাম কোথায়ও শুনিতে পাওয়া যায় না। কেবল মালবিকাগ্নি-মিত্রেরই যা উল্লেখ আছে। মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি পুরাতন বহু রূপকের অস্তিত্ব সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছিল। ইহা দ্বারাও কালিদাসের আবির্ভাব কাল কত পূর্ব্বে তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে।

---

(১) তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তি হেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা ॥

রঘুবংশ। ১।১০।

আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্।

অভিজ্ঞান শকুন্তল। প্রস্তাবনা।২।

(৩)

রূপকশ্রেষ্ঠ নাটকের বৃত্ত অর্থাৎ আখ্যান বস্তু সুবিখ্যাত হওয়া চাই (নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ)। কালিদাসও তাই আর্য্য সমাজের সুবিখ্যাত ইতিহাস মহাভারত হইতে ভারতবর্ষের নামকর্ত্তা রাজর্ষি ভরতের জনক জননী পুরু-বংশাবতংস রাজর্ষি দুষ্মন্ত ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসী অপ্সরো শিরোমণি মেনকার গর্ভসম্ভূতা মহর্ষি বেদমন্ত্রদ্রষ্টা কণ্বের পালিতা কন্যা রমণী কুলমণি শকুন্তলার উপাখ্যান অবলম্বনে এই বিশ্ববিখ্যাত নাটক গ্রথিত করিয়াছেন। মহাভারতের আখ্যানের সঙ্গে কবিবর দুর্ব্বাসার অভিসাপ ও অভিজ্ঞান দর্শনে শাপের অবমান যোজনা করিয়া দিয়া মণি-কাঞ্চন সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। বস্তুতঃ অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের ইতিবৃত্ত তিনটি উপাখ্যানের অপূর্ব্ব ত্রিবেণী সঙ্গম। বিষ্ণুপুরাণোক্ত দুর্ব্বাসার অভিশাপ হইতে কবিবর তাঁহার নাটকের অভিশাপ গ্রহণ করিয়াছেন। গুণাঢ্য সংগৃহীত বৃহৎ কথার অন্তর্গত কৌশাম্বীর ভূপতি উদয়নের জননী মৃগাবতীর অভিজ্ঞান কনক কঙ্কন দর্শনে শাপাবসান আখ্যান অবলম্বন করিয়াই শকুন্তলা নাটকে অভিজ্ঞ নাঙ্গুরীয়ক দর্শনে শাপাবসান বৃত্তান্ত যোজিত হইয়াছে। কেহ কেহ আবার পদ্মপুরাণোক্ত শকুন্তলোপাখ্যানকে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের আখ্যান বস্তুর মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে প্রাপ্ত পদ্মপুরাণোক্ত শকুন্তলোপাখ্যান পূর্ব্ববর্ত্তী না কালিদাস-কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা এখনও সুধীগণের আলোচ্য।

(৪)

অচিরপ্রবৃত্ত অতএব উপভোগক্ষম গ্রীষ্ম ঋতুতে অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রারম্ভ এবং সর্ব্বভোগ্য ঋতুরাজ বসন্তে উহার পরিসমাপ্তি। সুতরাং বৎসরের প্রধান কয়টি ঋতুর বৈশিষ্ট্য এই নাটকে প্রেক্ষকগণ অভিনীত হইতে দেখিতে পাইবেন।

নাট্যাভিনয়ে সঙ্গীতের স্থান কোথায় তাহা শকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনায় নটীর একটী সঙ্গীতের ফলে সম্যক উপলব্ধি হয়। সঙ্গীতটি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় গ্রথিত, দ্বিপদীলয় সমন্বিত গুরুতালরূপী কোখ্যগ্রামরাগবদ্ধ উদ্গাথা নামক গীতি। উহার চিত্তমোহকর প্রভাব এত দূরব্যাপী যে গীত শেষ হইয়া গেলেও কেবল যে প্রেক্ষকবর্গই চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন তাহা নহে স্বয়ং অধিকারী মহাশয়ও একেবারে মসগুল হইয়া গিয়া নিজের তখনকার কার্য্য পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে প্রেক্ষকদিগের সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে প্রস্তাবনার দৃশ্যটি অদৃশ্য হইয়া অরণ্যের এক দেশের দৃশ্য সহসা প্রাদুর্ভূত হইল এবং রথোপরি মহারাজ দুষ্মন্ত ধনুর্ব্বান হস্তে শিকারীর বেশে একটি কৃষ্ণসারকে অনুসরণ করিতে করিতে প্রবিষ্ট হইলেন। বস্তুতঃ প্রস্তাবনার অন্তর্ধান ও প্রথম অঙ্কের আবির্ভাবে কবিবর এতদূর চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে উহার তুলনা সমগ্র সংস্কৃত নাট্য ভাণ্ডারে আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

সূত্রধারঃ। আর্য্যে সম্যগনুবোধিতোঽস্মি। অস্মিন্ ক্ষণে বিস্মৃতং খলু ময়া। কুতঃ—

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা॥

ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

[অধিকারী। প্রিয়ে, সব মনে পড়েছে। আমি এখন সব ভুলে গিয়েছিলেম। কেন? চিত্তমোহিনী তোমার এই গীতির রাগে আমিও একেবারে মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছি। কেমন মাতোয়ারা হয়েছি? দেখ না। এই দুষ্মন্ত রাজা যেমন ঐ অতি দ্রুতগতি কৃষ্ণসার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এই সুদূর দেশ পর্য্যন্ত অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িয়াছেন। যেমন এই কথা বলা আর অমনি প্রেক্ষকদের দৃষ্টি ষ্টেজের উপরে নিপতিত হইবা মাত্র তাঁহারা দেখিলেন গায়িকা ও বক্তা অন্তর্হিত, উহাদের স্থানে রথারূঢ় সারথি দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী মৃগয়াবেশী পৃথ্বীশ দুষ্মন্ত ও দূরে পলায়মান নেত্রমাদন কৃষ্ণসার। কি রমণীয় নাট্যারম্ভ! কি প্রীতিবিস্ময়কর দৃশ্য।]

(ক্রমশঃ)

ভুল-বোঝা

[শ্রীপ্রভাংশুকুমার গুপ্ত]

—এক—

মরণ-পথের যাত্রী আমি, শেষ সীমানায় প্রায় এসে পড়েছি—

এমন সময় মনের ভিতর মৃত্যুর যে কুটিল ছবি প্রতিফলিত হয়, তা' সুস্থ শরীরে জীবনের কলের মত কর্ম্মব্যস্ত দিন গুলোতে হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং জগতের চিরানুগতিক নিয়ম অনুসারে অটুট স্বাস্থ্যের সময় আমারও মনের মধ্যে ও-রকম ধ্বংসকারী ছবির ছাপ কোনও দিন পড়ে নি। ভেবেছিলাম জীবনটা বুঝি এক সুরেই নিরন্তর গেয়ে যাবে।

বর্ষাকাল—ভোরের বিমল বাতাস হাসপাতালের জানালার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে, রোগীর ঘরের যে একটা বিশ্রী গুমোট ভাপ থাকে, ধীরে ধীরে দূর করে দিচ্ছে। পাশের টিপয়ে তাপমান যন্ত্র, ওষুধের শিশি ও কাচের মেজার গ্লাস। মাথার শিয়রে দেওয়ালের গায়ে টেম্পারেচারের চার্ট টাঙানো রয়েছে,—বাইরে বৃষ্টির ঝির ঝির করুণ শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আর স্তব্ধ ঘরে দেওয়াল ঘড়িটা একঘেয়ে আওয়াজ করছে টিক্ টিক্ টিক্…

মনে হচ্ছে আবার তাকে ফিরে পাব, এখানে নয়; কিন্তু তাকে কি ফিরে পাবার অধিকার এখনও আমার আছে?

পরপারের ডাক এসেছে,—রোগ-জীর্ণ দেহ নিয়ে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে ভাবছি—আজ যাকে পাবার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠছে, যার কোমল তুহিন-শীতল হাতদুটো আমার এই উত্তপ্ত বক্ষপঞ্জরের ওপর চেপে ধরতে চাইছি, তাকে কি আমি এর পূর্ব্বে এ-রকম ভাবে পেতে চেয়েছিলাম? তার নিরুপম প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে কখনও কি আমার নিবিড় পরিচয় হয়েছিল? না জোর করে পাষাণের মত নিজের মনের কপাট রুদ্ধ করে রেখেছিলাম। তা যদি না করতাম, তা'হলে তো হৃদয়ের অন্তস্থলে যে পুঞ্জীভূত বেদনা সঞ্চিত হয়েছে, তা জড়ো হতে পারতো না,—তা'হলে তো স্মৃতির চিতার দীপ্ত আলোকে, যেসব ঘটনা এই কোটরগত চোখ দুটোর সামনে অবিরত দেখতে পাচ্ছি,—দেখতে হ'ত না। হৃদয়ের দুয়ার যখন খুলে দিলাম, তখন হাট ভেঙ্গে গিয়েছে। বেচা-কেনা সব শেষ হয়ে গিয়েছে; এতদিন যেন স্বপ্নের ঘোরে চলে এসেছি…স্বপ্ন টুটে গিয়ে সত্য আচম্‌কা আত্ম-প্রকাশ করেছে, কিন্তু বড় বিলম্বে, যখন আলো নিভে গেছে, গান থেমে গেছে। জগতের বিধাতা যদি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে, আবার আমাদের নব জীবন আরম্ভ করতে দেন,—যা ভুল হয়ে গেছে, তা শুধরে, যা ভেঙ্গে গেছে তা গড়ে তুলে নিতে পথ দেখিয়ে দেন, তাহ'লে তার অনুপম চন্দন-সম স্নিগ্ধ প্রেমের ছায়ায় সারা জীবনটা কাটিয়ে দি।

জীবনের মেয়াদ আর বেশী দিন নেই…শীঘ্রই এই ফলে ফুলে পরিপূর্ণ প্রকৃতির রাজ্য থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হবে; মনের গোপন-কন্দরে মৃত্যুর কালো ছায়া এসে পড়েছে। এ সন্ধিক্ষণে বিদায়-বেদনা মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে যে যাতনা দেয়,—হৃদয়টা আর্ত্তনাদে যেরকম হাহাকার করে উঠে, সে রকম উপসর্গ আমার কিছুই নেই। মৃত্যুর ব্যথা-দূতগুলো আমার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে…বরঞ্চ এ-গুলোর পরিবর্ত্তে সারা দেহে তীব্র পুলক অনুভব করছি।

ডাক্তার আশ্বাস দিচ্ছেন মরণাপন্ন আমাকে না আমার এই কঙ্কাল-সার দেহটাকে? ডাক্তার প্রতিদিন বলছেন আমি রক্ষা পাব,—মৃত্যুর কালো যবনিকা আমার উপর পড়বে না, আমি বেঁচে যাব। মুকুল চৌধুরী অতীতের ঘৃণিত হেয় জীবন ত্যাগ করে আবার নির্ম্মলভাবে—হাসি পায় তার কথা শুনে।

জীবন-পুস্তকের শেষ পাতা পর্য্যন্ত চলচ্চিত্রের মত মনে পড়ছে…নিজের খেয়ালের ভাঙা গানে এতই নিমগ্ন ছিলুম যে, তার যৌবন-স্বপ্নে উদ্বেলিত অন্তরের দিকে একবারও চেয়ে দেখি নি, কিন্তু—

কিন্তু গোড়ার কথা এখনো বলা হয় নি।

এই বলব—একেবারে গোড়া থেকেই।

*   *   *   *

বাঙ্গালী লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে শুনলে অনেকে অবিশ্বাসের ম্লান হাসি হেসে থাকেন, কিন্তু আমার বাবা হরিশ চৌধুরী সারা জীবনটা ইয়োরোপ আমেরিকায় পাট চালান দিয়ে মানুষের চির-আরাধ্য চির-আকাঙ্খিত ঐ দুর্লভ লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন ; আর তার ফলে সহরের দক্ষিণাংশে শ্বেতাঙ্গ পল্লীতে গোণা দশখানা বাড়ীর মালিক হতে পেরেছিলেন। একটা কথা চলিত আছে, ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টি হ'লে লক্ষ্মী কার্পণ্য করেন, আর লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হ'লে ষষ্ঠী কার্পণ্য করেন। আমাদের সংসারে শেষের কথাটা একেবারে হুবহু মিলে গিয়েছিল, কেননা বাবা, মা, পিসিমা ও আমি ছাড়া আমাদের সংসারে আপনার বলতে আর কেহ ছিল না।

প্রকাণ্ড শ্বেত-ধবল অট্টালিকার সামনে বন্দুক স্কন্ধে গুর্খা প্রহরী পাহারা দিত।—বারোটা বছর অবাধ আনন্দে চঞ্চল গতিতে কাটবার পর, সহসা একদিন মা'র মুখে শুনলাম আমায় স্কুলে যেতে হবে। বাড়ীতেই মাষ্টারের কাছে পড়তাম, হঠাৎ স্কুলের ব্যবস্থা যে কেন হ'ল, তা' বুঝতে পারি নি। স্কুলের নামে চমকে উঠিনি, মনে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয়নি,—ভাবলুম সে স্থান কতই না সুন্দর না জানি সেখানে কত আনন্দের উপকরণ সাজানো রয়েছে।

তিনটে বছর স্কুলের প্রকাণ্ড ঘরে চল্লিশ পঞ্চাশজন অচেনা অজানা মুখের মধ্যে কাটিয়ে স্কুল-জীবনের আস্বাদ লাভ করলুম। একদিন আমার স্বেচ্ছাচারিতার উদ্দাম গতি মাষ্টারের কাছে বাধা পেল,—আমার ঘাড়ের ভূতটা একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠল ; আর সেই বিদ্রোহীতার ফলে স্কুলের নীল খাতা থেকে চিরদিনের তরে নামটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সটান্ বাড়ী এসে বল্লুম—স্কুলে আর পড়তে ভাল লাগে না, বুঝলে মা! ভাল লাগে না। তখন দেখি নি পিছনে বাবাও আরাম কেদারায় বসে আছেন। বাবার সেই গম্ভীর মুখ আরও অধিকতর গম্ভীর হয়ে উঠল, ভ্রুকুঞ্চিত করে বল্লেন—বেশ আগেকার মত বাড়ীতেই পড় মাষ্টারের কাছে।

—দুই—

সোজা আর উল্টো এ দুটো জিনিষ ক্ষণিকের তরে মিশ্ খায় না। গৃহশিক্ষক সোজা পথই লক্ষ্য করে চলতে লাগলেন, আর আমিও পিছনে ফিরে উল্টো পথটাই পছন্দ করলাম। গৃহ শিক্ষকটিকে তাঁর সমশ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে, বিশিষ্টটা চোখের সামনে ফুটে উঠতো ; সাধারণ গৃহশিক্ষক বা মাষ্টার বাবুর গণ্ডীর ভিতর তিনি আবদ্ধ ছিলেন না,—এদের চেয়ে তাঁর স্থান অনেক উপরে ছিল।

লেখাপড়ায় আমার তাচ্ছিল্য ও অবহেলা দিনের পর দিন যত বেড়ে যেতে লাগলো, সমান মাপে তাঁর জিদ্‌ও পরিপুষ্ট হতে লাগলো। অধিকাংশ ধনী লোকের মত বাবা ছেলেকে অযথা প্রশ্রয় দিতেন না,—এ বিষয়ে তিনি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। মার অজস্র স্নেহের আবরণে থেকে, আমি অনেক ক্ষেত্রে বাবার শাসনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। বাবার আদেশ দেওয়া ছিল মাষ্টার অর্থাৎ সুকুমার বাবুর ওপর, যেন তিনি প্রয়োজন বোধে বেত কিংবা হাতের ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত না হ'ন।

আমায় শাসন করতে করতে যখন সুকুমার বাবুর কড়া হাত ক্লান্ত হয়ে গেল ও সেই অবশ হাত দিয়ে ছিপছিপে বেতখানা দু' টুকরা হয়ে ভূমিতে শুয়ে পড়লো, তখন তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বাবার শরণাপন্ন হলেন।

যথাসময়ে সুসজ্জিত বৈঠকখানায় আমার ডাক পড়লো ; চিত্র-বিচিত্র পর্দ্দা সরিয়ে দেখলুম বাবা ও সুকুমারবাবু দু'জনে দুখানা কৌচে নিস্তব্ধভাবে বসে আছেন,—বাবার মুখ শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার।

মিনিট কয়েক স্থির-হৃদয়ে দণ্ডায়মান থাকবার পর, বাবা স্বভাবসিদ্ধ স্বরটা আরও গম্ভীর করে বল্লেন— মুকুল! সুকুমার বাবুর কাছ থেকে তোমার কথা সব শুনলাম, এখন তোমার যা বলবার আছে বলতে পার।

সুকুমারবাবু বলে উঠলেন—পনের ষোল বছর বয়স হ'ল কোথায় মাট্রিকুলেশন দেবে, না এখন পড়ছ ফোর্থ

ক্লাশে, যেটা পেরিয়ে যাওয়া তোমার অনেকদিন আগেই উচিত ছিল।

আমাকে নিরুত্তর দেখে বাবা বল্লেন—তোমায় এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বল্‌তে চাই না ; স্নকুমার বাবুর কাছে এর পর থেকে যদি মন দিয়ে লেখাপড়া না কর, তাহ'লে—তাহ'লে তার ফল মোটেই ভাল হবে না, বুঝলে ? এখন তুমি যেতে পার।

অপেক্ষাকৃত মন দিয়ে পড়াশুনো করতে স্নরু করে দিলাম ; এ সময়টা জীবনের ধারাটা কিছুকালের জন্য বদ্‌লে গেল। হঠাৎ আমার এরকম পরিবর্ত্তন দেখে বাবা ও স্নকুমারবাবু খুসী হয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন ; বাবা ভেবেছিলেন তাঁর শাসনের প্যাঁচে পড়ে ছেলের মতিগতি সোজা পথেই ফিরে এল। তা' যদি হবার সম্ভাবনা থাকতো, তা'হলে বহুদিন পূর্ব্বেই এ প্রকার অবস্থা হয়ে যেত।

আমার এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের জন্য প্রকৃত পক্ষে দায়ী ছিলেন, একমাত্র স্নকুমারবাবু। যেদিন তাঁর কথা 'যেটা পেরিয়ে যাওয়া তোমার অনেকদিন আগেই উচিত ছিল' আমার মনে প্রচণ্ডভাবেই আঘাত দিয়েছিল। অনবরত বেত ইত্যাদি কড়া শাসন যেখানে অকৃতকার্য্য হ'ল, সেখানে গোটাকতক অম্লমধুর কথা অসম্ভব কাজ করলে।

স্নকুমার বাবুর হিতোপদেশে ও নিজের চেষ্টায় অবশেষে প্রবেশিকা তরণী উত্তীর্ণ হয়ে, পনের টাকা বৃত্তি লাভ করলাম। পরীক্ষার ফল অবলোকন করে, বাবা ও মা দু'জনেই ছেলের পারদর্শীতায় চমৎকৃত হয়ে গেলেন ও স্নকুমারবাবু পিঠে জোরে দুটো চাপড় মেরে সহাস্যমুখে বল্লেন—সে তো আমি আগেই বলেছিলাম। পরীক্ষার ফল যে গেজেট খানায় বেরিয়েছিল, সেখানা বাবা তাঁর ব্যাঙ্কের একাউণ্ট খাতাখানার চেয়ে আদরে, কৃপণের ধনের মত সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলেন ; এ থেকেই বুঝতে পারা যায়, বাইরে কঠিন হলেও বাবার মন পুত্রের প্রতি অতুলনীয় স্নেহে ভরা ছিল।

স্নকুমার বাবুর পরামর্শে ও নিজের ইচ্ছায় কলেজে বিজ্ঞান শ্রেণীতে প্রবেশ করলাম ; পাঠ-কক্ষের টেবিলে গ্রামার ও ইতিহাস প্রভৃতির পরিবর্ত্তে, রসায়ন ও জড়বিজ্ঞান ইত্যাদি কতকগুলি জটিল পুস্তক তাদের স্থান অধিকার করলে।

বাবা যখন জানিয়ে দিলেন, আই এস্ সি ভাল করে পাশ করতে পারলে, উচ্চশিক্ষার জন্য আমার বিলাত যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন মনটা পুলকে নেচে উঠল ; কেন না বিলাত সম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রমণ পুস্তক পাঠ করে ও দুই এক-জনের মুখে ওখাকার গল্প শুনে ওখানে যাবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেই জন্যে নিজেকে বইএর মধ্যে একেবারে ডুবিয়ে ফেল্লাম।

হায়, এরূপ ভাবেই যদি চল্‌ত, তা'হলে জীবন-পথের যাত্রাটা ধীরে ধীরে অতর্কিতে সহজ হয়ে আস্‌তো—আক্ষেপের কোনও কারণ থাকতো না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ, স্নতরাং—

—তিন—

আই এস্ সি পরীক্ষার তিনমাস পূর্ব্বে একদিন মধ্যাহ্নে, একখানা টেলিগ্রাম বর্দ্ধমান থেকে স্নকুমার বাবুর মাতার সাংঘাতিক বসন্তের সংবাদ বহন করে এসে পৌঁছালো ; তার ফলে সেইদিনই স্নকুমার বাবু গোটাকতক বেদানা কিনে নিয়ে, রাত্রের ট্রেণে নিরাশ-হৃদয়ে যাত্রা করলেন।

দিন কুড়ি বাদে আমাদের বাড়ীতে অচেনা হস্তলিখিত একখানা চিঠি এলো ; সেই চিঠিখানা পড়েই জানতে পারলুম, মা পুত্রকে ত্যাগ করে একলা যেতে পারেন নি, যাবার সময়ে ছেলেকে অর্থাৎ স্নকুমার বাবুকেও সঙ্গে করে অজানা দেশে প্রস্থান করেছেন।

স্নকুমার বাবুর অভাবটা ভাল করে অনুভব করবার পূর্ব্বেই, একটা ঘূর্ণী বায়ু এসে আমাদের সংসারটাকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল।

সুস্থ শরীরে আরাম কেদারায় উপবেশন করে, খবরের কাগজ পাঠ করতে করতে, বাবার নামে চিত্রগুপ্তের দপ্তর থেকে আচম্বিতে শমন এসে হাজির হল ; রাজার শমন উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু এ শমন ধরে রাখবার শক্তি কারও নেই। স্নতরাং বাবাও এ কাল-শমন উপেক্ষা করতে পারলেন না,—বুকের কাজটা বন্ধ হয়ে যাবার পর তখনও

তাঁর কোলের উপর ষ্টেট্‌স্‌ম্যান খানার টেলিগ্রামের অংশটা খোলা অবস্থায় পড়েছিল, আর বামহাতের মধ্যস্থিত কালো লম্বমান গড়গড়ার নল থেকে প্রচুর ধূম উদ্‌গীরণ হচ্ছিল।

বাবার মৃত্যুর পর চাকর-বেহারাগুলো হঠাৎ আমায় অতিরিক্ত খাতির করতে লেগে গেল,—তাদের সেলামের অত্যাচারে আমি রীতিমত হাঁপিয়ে উঠলুম। সম্ভ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখতে পেলে, মধু আহরণে রত মৌমাছিগুলো যেমন বেগে ছুটে আসে, ঠিক তেম্নিই আমার চতুর্দ্দিকে অন্য কোনও প্রকার মধুর সন্ধানে, জনকতক বন্ধু এসে অযাচিতভাবে আমার শোকে সান্ত্বনা দিতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ক্রমে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল দেবকুমার; পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী দেখে শোকটাকে পিষে ফেলে নীরস নির্ম্মম বইগুলোর হরফগুলো গলাধঃকরণ করতে লাগলাম।

দেবকুমারও আমাদের সঙ্গে পরীক্ষা দেবে, কিন্তু তার পাশ করা যে বিশেষ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তা' আমি বুঝতে পেরেছিলাম; কেননা সে সকাল থেকে রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌তো—আমারই ঘরে।

তাকে পড়তে বল্লে প্রচুর হেসে বলতো—সবই তৈরি হয়ে গেছে।

যে বিষয়েই তাকে আমি প্রশ্ন কর্‌তাম না কেন, সে অবিচলিত স্বরে উত্তর দিত—ঐটেই শুধু হয় নি, একবার দেখে নিলেই কেল্লা ফতে।

মা অনেকদিন থেকে আমার বিবাহের চেষ্টা কর্‌ছিলেন, একবার মেয়ে দেখে ঠিক্‌ও করেছিলেন; কেবল আমি বাধা দিয়ে তাঁকে নিরস্ত করেছিলাম। তারপর এখন কালাশৌচ হওয়াতে তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন।

সেনেটহল থেকে শেষ প্রশ্নপত্র উত্তর করে, আমি আর দেবকুমার নিশ্চিন্ত মনে গোলদীঘির একটা খালি বেঞ্চে এসে বসে পড়লাম। দেবকুমারকে ঐ প্রশ্নের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবার উপক্রম কর্‌তেই, সে আমার মনের ভাবটা উপলব্ধি করে ফেলে, জোর গলায় বলে উঠল—হ্যাং ইওর কোশ্চেন; যা হবার তা হ'য়ে গেছে, এখন আলোচনা করে মনটাকে বিষণ্ণ করবার কি দরকার?

বাবার শোকটা তখনও সামলাতে পারিনি, এতদিন শুধু নিজের সমস্ত বল সংগ্রহ করে মনের মধ্যে চেপে রেখেছিলাম; পরীক্ষার পর শোকটা নিজমূর্ত্তি ধারণ করে মন থেকে উঁকি মারতে লাগলো। মনে করলাম দেশভ্রমণে মনটা সাধারণ অবস্থায় ফিরে আস্‌তে পারে।

দেবকুমার একথা শুনে প্রচুর হেসে বল্লে—মন ভালো করবার ওষুধ কলকাতায় ঢের আছে।

তখন দেখতে পাই-নি ঐ হাসির পিছনে বিষ জমা হয়ে আছে; তখন বোধগম্য হয় নি ঐ কথাগুলোর অর্থ।

দেবকুমার আমায় সাংঘাতিক ওষুধ দেখিয়ে দিলে; আমি সেই ওষুধই পান করতে লেগে গেলাম। রঙিন ফেণিলোচ্ছল ফরাসী মদিরার কুহকে পড়ে একান্ত ভক্ত হয়ে পড়লাম; দেবকুমার আমার উপর এত আধিপত্য বিস্তার করেছিল, যে আমি তার হাতের ক্রীড়নক হয়ে গেলাম। বাইশ বছর বয়সে ফরাসী দেশে প্রস্তুত হলাহল পান করতে আরম্ভ করলাম।

পরীক্ষার ফল যথাসময়ে বেরিয়ে গেল,—এবারেও বৃত্তি পেলাম; সমস্ত গেজেটখানা তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করেও দেবকুমারের নাম দেখতে পেলাম না।

দেবকুমার এসে বল্লে—খোঁজ নিয়ে জানলাম, ইংরেজীর একখানা পেপার বোধ হয় সেকেণ্ডখানা পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ তিনখানার মধ্যে ঐটেই লিখেছিলাম ভালো—ব্যাড্‌লাক্‌ ব্যাড্‌লাক্‌।

মনে করলাম বিলেত যাওয়া যাক্‌—তারপর ভাবলাম বি এস্‌ সি-টা পাশ করে যাওয়া যাবে।

একদিন দেবকুমার এসে বল্লে—বন্ধু! বাড়ীগুলো যা ভাড়া খাটছে, সেগুলো ভালো করে তত্ত্বাবধান করবার জন্যে একজন বিশ্বস্ত লোক না রাখলে—

তাকে সরল মনেই বললাম—কেন তুমিই যখন রয়েছ তখন সেগুলোর ভার কি তুমি নিতে পার না?

মৃদু হেসে সে বল্লে - না না আমি কি করে—আচ্ছা তুমি যখন বলছ, আমি এ ভার খুসী হয়েই নিলাম।

একদিন ফরাসী সুধার সোণালী নেশায় বিভোর ছিলাম, তখনও সামনে টেবিলের উপর অর্দ্ধশূন্য ডিক্যাণ্টার ছিল।

দেবকুমার একখানা কাগজ হাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ

করলে ; ডিক্যাণ্টার স্পর্শ মাত্র না করে বল্লে—বড় বিপদে পড়া গেছে গ্রেগরী সাহেবের ভাড়া অনেক বাকি পড়ে গেছে, তাগাদার পর তাগাদা দিচ্ছি, বেটা ভাড়ার নামটি পর্য্যন্ত করে না ; এখন নালিশ ভিন্ন তো আর উপায় দেখছি না। এই কাগজটায় তোমার সই করে দাও।

এই বলে সে কাগজখানা টেবিলের উপর রেখে আমার সামনে ধরলে, নিজেই সই করবার সরঞ্জাম এনেছিল ; সে যেখানটা দেখিয়েদিলে, আমি চোখ বুঝে খস্ খস্ করে সই করে দিলাম।

এই প্রকার নালিশের ছুতো করে, সে আমার কাছ থেকে এক বছরের মধ্যে দশখানা কাগজ সই করিয়ে নিলে।

মা আমার অবস্থা দেখে বিয়ে দিয়ে ফেল্লেন সম্ভ্রান্ত জমীদারের মেয়ের সঙ্গে,—নাম সেবা।

ফুলশয্যার রাত্রে সেবার রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম ; তার রূপের মাদকতা আমার চোখের সামনে অগণিত হুরীর সৃষ্টি করে ফেলেছিল, কিন্তু সে হুরীরা একনিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার কথা শুনে।

তার কাছে যেতেই সে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বল্লে—কি বিশ্রী দুর্গন্ধ, তুমি মদ খেয়েছ, ছি ছি।

সেদিন প্রথম মিলনে তাকে এরূপভাবে সম্বোধন করতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, আরও স্তম্ভিত হলাম যখন সে তার কেশদাম-পূর্ণ মাথা আমার পায়ের মধ্যে রেখে বলে উঠল—আমার মাথার দিব্যি তুমি আর ও ছাই ভস্ম খেতে পাবে না।

সেবার কথা শুনে সর্ব্বাঙ্গ জলে উঠল,—পরিহাসব্যঞ্জক স্বরে বল্লাম—বাঃ তুমি তো বেশ এ্যাকটিং করতে পার,—বাঃ—ক্যাপিটাল।

তারপর রাত্রি জাগরণে স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হবে, এই আশঙ্কা তাকে জানিয়ে শয্যাগ্রহণ করলাম, কিন্তু সুনিদ্রা দূরের কথা, তন্দ্রার ভাবও এলো না।

সেবা মেঝেতে একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লো। সে রাত্রে কিন্তু কেউই কানের কাছে এসে বলে দিলে না—মূর্খ এ রকম অমূল্য রাত্রি জীবনে শুধু একবারই আসে।

বিবাহিত জীবনের প্রথমেই দুজনের পরিচয় হল এই প্রকারে, সুতরাং——

—চার—

দুজনের জীবনের মাঝখানে আড়াল করে একখানা কালো পর্দ্দা পড়ে গেল! আমি সেবাকে বরাবর এড়িয়ে চলে ছিলাম, তার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তা হয় নি। আমার অবহেলা দেখে সেও উপযাচক হয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলবার কোনও আগ্রহ দেখায় নি! একটা টেবিল তার ও আমার পালঙ্কের ঠিক মাঝখানে বসানো ছিল ; আমি টেবিলের দিকে চাইলেই সে মুখ ফিরিয়ে নিত, সে সেদিকে চাইলেই আমিও মুখ ফিরিয়ে নিতাম।

মাঝে মাঝে তার রূপের জলন্ত শিখা আমায় তার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইত,—কিন্তু মনের এ আকুল আহ্বান জোর করে মনের মধ্যে ধরে রাখতাম। সেই কথাগুলো আমার কাছে বড়ই তিক্ত লেগেছিল, উপদেশ বলে মনে করেছিলাম। সেই কথাগুলোর অর্থ তখন আমি বোঝবার চেষ্টা করি নি ; কেবল মনে মনে সেগুলো বাচালতা ভেবে আলোচনা করেছি, আর সেইটাই আমার অতি বড় শত্রুর মত শত্রুতা সাধন করেছে। মনে হয়েছে যখন তার জলন্ত কথাগুলো, মনটাও দৃঢ়রূপে তার বিপক্ষে বেঁকে গিয়েছে।

নানাদিকে মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো,—কলেজে যেতে আর ভালো লাগলো না ; ঠিক করলাম বিলেতে গিয়ে, পড়ে আমার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে, আর মনে হল বিলেতে পড়লে মনটা পড়ার দিকে বসতে পারে এবং মৃত পিতার ইচ্ছাটাও রাখা হবে।

ব্যাঙ্কে দেখলাম একাউণ্ট খাতায় ছ'সাত লক্ষ টাকা রয়েছে,—আরও বেশী থাকতো। বাবার গোপন দান ছিল অনেক, অনাথ আশ্রমে, চিকিৎসালয়ে প্রভৃতিতে তিনি বহু অর্থ সাহায্য করতেন। মনে করলাম এই যথেষ্ট, একটা বাঙ্গালী ছেলের বিলেতের খরচের পক্ষে।

কাউকে না জানিয়ে, এমন কি দেবকুমারের কাছে গোপন রেখে, টমাস্ কুকের সাহায্যে চুপি চুপি সব বন্দোবস্ত করে ফেল্লাম।

জাহাজে চড়বার আগের রাত্রে আহার সমাধা করে, কক্ষের আলো নির্ব্বাপিত করে, সিগারেট জালিয়ে যাত্রার কথা ভাবছি, এমন সময় দখিণ হাওয়ার একটা হিল্লোলের সঙ্গে

সেবা এসে সটান্ আমার পালঙ্কের উপর আমার ঠিক পাশেই এসে বসে পড়লো; তার নিঃশ্বাসের শব্দ কানে স্পষ্ট শুন্তে পাচ্ছিলাম, অযত্নে রক্ষিত চুলের দুই একটা গুচ্ছ বসন্ত হাওয়ায় উড়ে এসে আমার গায়ে লাগছিল। চাঁদের কিরণ উদারভাবে তার সুগৌর মুখের ওপর একরাশ যুঁইফুল ছড়িয়ে দিয়ে তাকে করেছিল আরও সুন্দর। সরে যাবার চেষ্টা করলাম,—পা অবশ হয়ে গেল ; কথা বলবার চেষ্টা করলাম, জিভ্ আড়ষ্ট হয়ে গেল। ধমনীর রক্ত দ্রুত তালে নাচতে লাগলো, মোহাবিষ্টের মত চেয়ে রইলাম সেবার জ্যোৎস্না-ধৌত মুখের দিকে; কখন অলক্ষিতে তার হাতের মধ্যে আমার হাত চলে গিয়েছিল ; কাণে শয়তান বলে উঠলো,—মুকুল চৌধুরী সাবধান হও,- আজ যদি চপলতা প্রকাশ কর, আজ যদি যৌবন-সুলভ চাপল্যে হীনতা স্বীকার কর, তা'হলে জীবনে স্ত্রীর কাছে সম্ভ্রম পাবার অধিকারী হতে পারবে না, ইচ্ছামত কাজ করতে পারবে না, এমন কি ইচ্ছামত চিন্তাও করতে পারবে না,—মনে নেই ফুলশয্যার রাতের কথা···

সেবা বেশ সপ্রতিভ ভাবেই হাসতে হাসতে বল্লে,—যেন তার সঙ্গে কতকালের নিবিড় পরিচয়—তুমি বিলেত যাচ্ছ, তা লুকোবার কি দরকার ছিল, আমি কি তোমার উঁচু ইচ্ছায় বাধা দিতাম ?

সম্মুখে পথিক সাপ দেখলে চমকে উঠে এক লাফে নিরাপদ জায়গায় চলে যায়, আমার অবস্থাও হল ঠিক তাই ; মনে হল ভগবান বুঝি একে দিব্যচক্ষু দিয়েছেন। একটা ক্ষীণ সন্দেহের ছায়া এসে পড়লো ; মনে হল সেবা বুঝি বাড়ীময় একথাটা রাষ্ট্র করে দিয়েছে।

সেবা সহজভাবেই হেসে বল্লে—আমি বাঘ না ভাল্লুক, যে আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেলে ? আমি তোমার বিলেত যাওয়ার কথা জানতে পেরেছি, টেবিলের উপর একখানা টমাস্ কুকের খোলা চিঠি দেখে ; তুমি জান বোধ হয় আমার বাবা আমায় লেখাপড়া শেখাতে পয়সা খরচ করতে কুণ্ঠিত হন-নি।

আমার খেয়াল ছিল না চিঠিটার কথা ; অযথা চিঠি পড়া ও বলবার ভঙ্গী দেখে বিরক্ত হয়ে বল্লাম—স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয় চুরি করে চিঠি পড়া, তুমি হাজার ভোলাতে চেষ্টা কর আমি ওখানে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তুমি এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বা অনুরোধ করে আমায় বিরক্ত করো না, আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আস্ছে।

সেবা ততক্ষণ নিজের বিছানায় গিয়ে বসে বল্লে,—বেশ তবে একটা অনুরোধ—

এই বলে সে তার কালো চোখের দৃষ্টি তুলে আমার দিকে চাইলে ; সে দৃষ্টি কি করুণাতে ভরা,—আমি তখনও তাকে বুঝলাম না। সেবা বল্লে—বিলেতে গিয়ে নিজের কাজ করো, আর সেখানে মদের মাত্রাটা কমিয়ে দেবার চেষ্টা করো, কেননা সেখানে তো তুমি জানো মদের বন্যা বয়ে যায় ; আর আর যে দোষ তোমাকে এখানে স্পর্শে নি, অর্থাৎ চরিত্রটা যাতে না নষ্ট হয় দেখ।

আর সহ্য হয় না,- যে জন্যে দুজনের জীবনের মাঝে পুরু কালো পর্দ্দা পড়ে গিয়েছে, আবার সেই উপদেশ, বাচালতা !

ক্রোধকম্পিত স্বরে বল্লাম—থাক্ ঢের হয়েছে, আমায় একটু ঘুমোতে দাও।

মূর্খ আমি একবারও বুঝতে চেষ্টা করিনি, ঐ কথাগুলো সত্যই উপদেশ না আর কিছু ! তখন চোখ খুলে দেখিনি, এ কথাগুলোর সাম্নে পিছনে পাশে কি স্বর্গীয় বস্তু রয়েছে, তাহলে কি······

তখন বুঝিনি সেই জ্যোৎস্না রাতের নিস্ফলতার সঙ্গে আমার জীবনের সমস্ত বসন্ত রাতগুলোকে একেবারে ব্যর্থ করে দিলুম। নব বসন্তে সে এসেছিল মালা নিয়ে, আর যৌবনের সুরায় রূপের পাত্র পূর্ণ করে,-- মূঢ় আমি গলায় সে মালা না পরে পায়ে দলে দিয়েছি, পাত্র অধরে না ছুঁইয়েই তা' ফিরিয়ে দিয়েছি।

দেখি-নি তখন দখিণ হাওয়া বিজয়ী মত এসে কুঞ্জ দুয়ারে প্রবেশ করেছে,— বসন্ত আমারই পদদলিত মালাখানা শুষ্ক হয়ে পড়ে রয়েছে, এখন পত্রহীন জীর্ণ বৃক্ষতলে বসন্তের হাওয়া চিরকালের জন্যে চলে গেছে—হা হা শীতের হাওয়ায় চারিদিক পরিপূর্ণ।

—পাঁচ—

এডেন থেকে বাড়ীতে তার করলাম—

জাহাজে পরিচয় হ'ল একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে,—বাঙ্গালী; কিন্তু তার চেহারা বেশভূষা ও চালচলন দেখে, সহজে বাঙ্গালী বলে চেনা যেত না। নিজের পরিচয় দিলেন দত্তর অপভ্রংশ করে মিঃ ডট্ বলে; কার্ডেও দেখলাম লেখা রয়েছে মিঃ সি সি ডট্। জাহাজে তাঁর সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। ডট্ হচ্ছেন কলকাতার একজন হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিষ্টারের ছেলে। দু'বছর বিলেতে থেকে, গ্রেস্‌ইনে অধ্যয়ন করছেন, সম্প্রতি পিতার অসুখের সংবাদ পেয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন; এখন বিলাতে পুনরায় যাচ্ছেন টার্ম শেষ করতে।

বিলাত সম্বন্ধে মিঃ ডটের অগাধ জ্ঞান রয়েছে দেখতে পেলাম। স্বইচ্ছায় তিনি আমাকে অচেনা দেশে সাহায্য করবেন বল্লেন। মিঃ ডটের নিকট বিলেতের গল্প শুনে মনে হ'ল শীতের দেশ হ'লেও মানুষে সেখানে চিরবসন্তের সৃষ্টি করে রেখেছে...সঙ্গে সঙ্গে মনের চোখের সামনে ভেসে উঠল সন্ধ্যার স্তিমিত অন্ধকারে পার্কে পার্কে তরুণ তরুণীর আধ-আলো আধ-ছায়ায় মিলন...

ক্যালে থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ডোভারে পৌঁছুলাম,—আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম সাহেবদের সঙ্গে মিঃ ডট্‌ও ছড়ি দুলিয়ে গাইছেন—হোম্ সুইট্ হোম্, দেয়ার ইজ্ নো প্লেস্ লাইক্ হোম্।

ডোভার থেকে লণ্ডন এক্সপ্রেসে ভিক্‌টোরিয়া ষ্টেশনে এসে পড়লাম, লণ্ডন নগর দেখে বিস্ময় বিমুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলাম।

ডট্‌এর সাহায্যে কেম্ব্রিজে প্রবেশ করলাম; সেবার চিঠি ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল, জবাব দিই নি। উত্তর না পেয়ে সেও চিঠি বন্ধ করে দিলে, মনে মনে বল্লাম—এত তেজ! চোখ কিন্তু তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, নিজের দিকে চেয়ে দেখলাম না।

গ্রীষ্মাবকাশ এসে পড়লো,—ডটের পরামর্শে লণ্ডনটা ভালো করে দেখবার আয়োজন করে ফেল্লাম; প্রথম দিন এখানে স্বর্ণ-সুধাপূর্ণ কাচের গ্লাসে চুমুক দেবার সময় একবার সেবার কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু—

লণ্ডনটা ভ্রমণ করবার সময় একদিন মধ্যাহ্নে ডট্ পরিচয় করে দিলে আমার সঙ্গে ফ্লোরো জুনের...পরিচয়টা ঘনিষ্ট হয়ে এল এক সপ্তাহের মধ্যেই,—ডট্‌কে না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে ফ্লোরার কাছ থেকে জানলাম ছুটিতে ডট্ নরওয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে।

ফ্লোরার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা নিবিড় হ'তে নিবিড়তর হ'ল এক চাঁদনী রাতে...

প্রতিদিন দুজনের মিলনের স্থান ছিল হাইড্ পার্কের এক নিভৃত কুঞ্জবনে; সেদিন ফ্লোরাকে দেখে ব্যাণ্ডের তালে তালে আমার মন নেচে উঠল,—কৈ এতদিন তো তাকে দেখেছি, এত ভালো তো লাগে নি। মনে হ'ল ফ্লোরার নীল চোখ দুটো কি স্বচ্ছ, সুন্দর! শরতের আকাশের মত সুনীল; আবেগে তার হাতখানা ধরে ফেলে বল্লাম—ফ্লোরা—ফ্লোরা

সোনার হাত ঘড়িটায় যখন তাকিয়ে দেখলাম, তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে; ফ্লোরার কাছ থেকে বিদায় চাইলে সে হেসে বল্লে—সুইট্ ড্রিম্‌স।

দুগ্ধ ধবল শয্যায় শয়ন করে, চোখ বুজে তুলনা করতে লেগে গেলাম ফ্লোরার সঙ্গে সেবার; কিসে আর কিসে! ফ্লোরাকে যতই মনে করতে লাগলাম, ততই সেবার মুখ সরে যেতে লাগলো দূরে আরও দূরে। মনে করতে লাগলুম কোথায় ফ্লোরার প্রেম-আলাপন, আর কোথায় সেবার উপদেশ, বাচালতা...

ফ্লোরা আর আমি দু'জনে, হ্যাম্পষ্টেডে একখানা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বাস করতে লেগে গেলাম; সেও বিয়ের কোন কথা তুললে না,—আমিও সে জটিল কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে চেষ্টা করলুম না। কলেজে যাওয়া ছেড়ে দিলাম, বইগুলোর ওপর ক্রমে ইঞ্চিটাক ধুলো জমে গেল...

বাবার বহু পরিশ্রমে সঞ্চিত টাকাগুলো খরচ হতে লাগলো ফ্লোরার পোষাকে ও আর্মলেট আংটী ইত্যাদিতে। প্যারিস, মণ্টিকার্লো, নাইস্ প্রভৃতিতে দু'জনে ভ্রমণ করলাম; ফ্লোরা ও জুয়ার পিছনে জলের মত টাকা খরচ হয়ে যেতে লাগলো।

মাঝে মাঝে কাফের উজ্জ্বল আলোকিত সুসজ্জিত নাচ-ঘরে, যখন ফ্লোরার শুভ্র অনাবৃত বাহু ধরে, বাজনার তালে

তালে পা ফেলে নৃত্য করতাম, তখন মনে পড়তো শত হাজার মাইল দূরের একটি মেয়ের বাচালতা—উপদেশ . মনে হ'ত তার তেজের কথা,—আমি তার চিঠির উত্তর দিলাম না, সেও চিঠি বন্ধ করলে কিসের তেজে? আমি চেয়েছিলাম আমার পায়ের তলায় তাকে লুটিয়ে পড়তে, নির্ব্বাক হয়ে আমার আনুগত্য স্বীকার করতে।

কুবেরের ঐশ্বর্য্য খরচ করলে শেষ হয়ে যায়,—আমার ছ' সাত লাখ টাকা দু' বছরেই প্রায় শেষ হয়ে এল; চমকে উঠছি এখন, ফ্লোরা কি রক্তটাই শুষেছে আমার! দেবকুমারকে টেলিগ্রাম করলাম বাড়ী বিক্রয় করে আমায় টাকা পাঠাতে, টাকা কিংবা উত্তর কিছুই এল না,—ভাবনায় পড়ে গেলাম। কুকের ব্যাঙ্কে তখন মাত্র কয়েক হাজার টাকা পড়ে রয়েছে; হঠাৎ মনের মাঝে আশার উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। নিজেই দেশে ফিরে গিয়ে বাড়ী বিক্রয় করে টাকা আনতে মনস্থ করলাম।

ফ্লোরা এ কথা শুনে, কিছুমাত্র উৎসাহ দিলে না, বল্লে—আমাদের বেবি আর ক'মাস বাদে ভূমিষ্ঠ হবে, এখন তুমি আমায় ফেলে গেলে চলবে কেন?

বল্লাম—টাকাগুলো হাতে পেলেই ফিরে আসবো... ফ্লোরার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল।

বল্লে—তোমাদের দেশের দু' একজন, এরকম অবস্থায় ফিরে আসবো বলে, আর ফেরে নি, তোমায় আমি কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।

সাউদামটনে এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছি বলে ভারতবর্ষে যাবার জাহাজে চড়লাম।

—ছয়—

বাড়ী এসে দেখলাম সব ওলট্-পালট্ হয়ে গেছে; পিসিমা অনেকদিন হ'ল গত হয়েছেন,—মার মাস দুয়েক হ'ল মৃত্যু হয়েছে। পরে জানতে পারলুম, দেবকুমারকে আমায় টেলিগ্রাম করতে বলা হয়েছিল, সে করে নি; দেবকুমার তার স্ত্রী ছেলেপুলে নিয়ে বাড়ীটায় মালিকের মত বাস করতে সুরু করে দিয়েছে। আর সেবা? সে দেবকুমারের বৌ-এর হুকুম তামিল করে, লাথি ঝাঁটা খেয়ে সেই বাড়ীর এক কোণে নিজের অস্তিত্বটুকু গোপন রেখে পড়ে রয়েছে; ভাবলুম তার বাপ জমীদার, সুতরাং সে এখানে কেন এত দুঃখ, নির্য্যাতন সহ্য করে, এ ভুমি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে? এই 'কেন'র উত্তর এখন ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। দেবকুমারকে বাড়ীর কথা বলতেই উচ্চহাস্য হেসে বল্লে—বন্ধু! সে-গুড়ে বালি পড়ে গিয়েছে, একখানা ইটের ওপরও তোমার অধিকার নেই।

বিস্মিত নেত্রে বলে উঠলাম– পাগলের মত কি বকছো তুমি?

দেবকুমার পূর্ব্বের মত হেসে বল্লে—বাড়ী ভাড়ার নালিশের বদলে আমার নামে বাড়ীগুলো সই করে দিয়েছে, হাঃ হাঃ—তোমার বৌকে এতদিন দয়া করে থাকতে দিয়েছি, -

চীৎকার করে বলে উঠলাম—তবে রে রাস্কেল—

দেবকুমার গম্ভীরকণ্ঠে বল্লে—দরোয়ান।—

সেবা আমার সে রাত্রে আপনিই এলো; চেয়ে দেখলুম, একি সেই অনিন্দ্য রূপসী সেবা না তার জীর্ণ কঙ্কাল!

এতদিন বাদে দু'জনের সাক্ষাৎ।

অবিচলিতস্বরে সে বল্লে—তুমি আমার চিঠির উত্তর না দিলেও তোমার সমস্ত খবর পেয়েছি, অনুরোধ আমার রক্ষা করতে পার নি। সমস্ত আশা আমার চূর্ণ হয়ে গেছে অনেকদিন; তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর কাছ থেকে কিছু পাবার আশা করি না। তবুও তুমি আমার স্বামী,—সেই অধিকারে তুমি যতদিন এখানে থাকবে, ততদিন দিনান্তে একবার দেখা দিও, এর বেশী আমি কিছু চাই না।

সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল তার যাবার সময় হয়ে এসেছে···আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন সেবার শরীর আরও ভেঙ্গে পড়লো, কাছে গিয়ে ডাকলুম– সেবা—

আরক্ত দু' চক্ষু তুলে সে আমার দিকে চাইলে, মৃদু হাসি হেসে বল্লে—আর আমার দুঃখ নেই, তোমায় দেখবার জন্যে প্রাণটা এতদিন ছিল, আজ সে আশা মিটে গেছে। বেঁচে থাকতে তোমায় যে অনুরোধ করেছিলাম, মরে গেলে সেটা রাখতে চেষ্টা করো···

আবেগে বলে উঠলাম—তোমায় আমি ভুল বুঝেছিলাম

সেবা,—সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। তুমি আবার সেরে ওঠো, আর তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না।...সেবা—সেবা—

জ্বরতপ্ত ক্ষীণ বাহুদুটী দিয়ে সে আমায় জড়িয়ে ধরলে,—তারপর—তারপর,—সে চলে গেল বড় অভিমানে।—

দগ্ধ-মনের জ্বালা জুড়োতে বেরিয়ে পড়লাম দেশ ভ্রমণে; কাশ্মীর, দিল্লী, আগ্রা, কত জায়গায় বেড়ালাম,—কৈ সে অহর্নিশি জ্বালা তো জুড়োলো না...কৈ সে পাণ্ডুর মুখ তো ভুলতে পারলুম না...

জ্যোৎস্না-ধৌত আগ্রার তাজমহলে বসে বসে যমুনার চঞ্চল ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতুম সেবার কথা... প্রেম-অশ্রু-নির্ম্মিত বিরাট মর্ম্মর-সৌধে বসে থাকলে, প্রাণটা হাহাকারে ভরে উঠতো।

ভুল যদি বা ভাঙলো,—আর কিছুদিন আগে সে ভুল ভেঙ্গে গেল না কেন? তাহ'লে দরকার ছিল না অর্থ, প্রাসাদে, দুটো জীবন আনন্দে কেটে যেত একখানা কুঁড়ে ঘরে...

হায় অভিমানিনী সেবারাণী! তুমি যে পশরা মাথায় করে আমার কাছে এসেছিলে, তার মূল্য কত যে কত, তা' একেবারেই বুঝি নি স্বামীর চরণে সর্ব্বস্ব দিয়ে, তার ভালবাসার দ্বারা স্বামীকে রক্ষা করতে এসেছিলে, মূঢ় অর্ব্বাচীন আমি তা'তো কিছুই জানি নি!

দিল্লীতে হঠাৎ পেটের ডান দিকে একটা ব্যথা অনুভব করলুম,—বুঝলুম ফরাসী সুধার ফল...লিভার বিকল হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছে, ডাক্তার দেখাবার কথা মনে হয়েছিল, ভাবলুম আর কেন? হাতে যা সামান্য অর্থ ছিল ভ্রমণ ইত্যাদিতে খরচ হয়ে গিয়েছিল—হঠাৎ দুর্ব্বল শরীরে রাস্তায় একদিন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম,—জ্ঞান হ'লে দেখতে পেলুম, আমি হাসপাতালে; ডাক্তারের হাতের মধ্যে আমার হাত...

*　　*　　*　　*

ডাক্তার প্রতিদিন আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি আমার লিভার পচে যাবার উপক্রম হয়েছে; হরিশ চৌধুরীর পুত্র আমি—দাতব্য চিকিৎসালয়ে শেষ নিঃশ্বাসটী ত্যাগ করতে হবে—দুঃখ হচ্ছে না—আনন্দ হচ্ছে পরপারে সেবার সঙ্গে মিলিত হবার আশায়,—কিন্তু...কিন্তু সে অধিকার তো আমি নিজের হাতেই হারিয়েছিলাম, পরপারে তার সঙ্গে মিলিত হবার অধিকার কি এখনও আমার আছে?

পাগলী

(গল্প)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

সে এসে যেদিন দরজায় দাঁড়াল তখন তাকে দূর করে দেওয়ারই চেষ্টা করেছিলুম, অনর্থক ভার বইতে রাজি হই নি। সে যখন তার জলভরা চোখ দুটি আমার মুখের পানে তুলে ধরে করুণস্বরে জানালে—আজ দুদিন খেতে পাই নি বাবা,—তখন আমি হঠাৎ তীব্রস্বরেই চেঁচিয়ে উঠলুম—যা যা, এখানে কিছু হবে না।

তার চোখ ছাপিয়ে জল ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল, সে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফিরল! একটা আর্ত্তস্বর আমার কাণে ভেসে এল—"হা ভগবান।"

বই হ'তে মুখ তুলে তার পানে তাকালুম, কি করুণ তার মুখখানা, সে যেন বিষাদেরই প্রতিমূর্ত্তি।

"আহা, এমন করেও তাড়িয়ে দিচ্ছো [illegible] খেতে দিলে কি তোমার সব ফুরিয়ে যেত? ওগো বাছা, এসো গো আমার কাছে, আমি তোমায় খেতে দিচ্ছি।"

সে ফিরল, তার চোখের জলধারা নিমিষে শুকিয়ে উঠল,

তার মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল। আমার স্ত্রী সযত্নে তাকে নিয়ে গিয়ে বারাণ্ডায় বসালেন। বামুন ঠাকুরাণী তখন বোধ হয় ঘুমুচ্ছিলেন কারণ দিবানিদ্রা তাঁর প্রাত্যহিক কাজ ছিল, স্ত্রী তাকে ডেকে আর বিরক্ত করলেন না, নিজের হাতে ভাত বেড়ে এনে বুভুক্ষুর সামনে ধরে দিলেন, সে খেতে আরম্ভ করে দিলে, তিনি পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সামনে বসে দেখতে লাগলেন।

দেখলুম নারীকে সুপ্ত করে অন্তঃপুরে রাখলেও তার দয়া তাকে বাইরে টেনে বার করে। আজ করুণারূপিণী নারী-মূর্ত্তি দেখে আমার অন্তর যেন তৃপ্ত হয়ে গেল. আমি বড় শান্তি পেলুম।

এর পরেই খানিক বাদেই আমার মন হতে সে দৃশ্য বিলীন হয়ে গেল। আমার আর মনেই রইল না কে এসেছিল—কে ভাত খেলে।

দু'তিন দিন বাদে হঠাৎ একদিন তাকিয়ে দেখলুম সেই মেয়েটী আমার পান নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখছে। আমি অবাক হয়ে তার পানে তাকিয়ে রইলুম, কবে কখন গৃহিণীর অনুগ্রহ তার সমস্ত হৃদয়খানাকে আমার সংসারের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছিল। দেখতে পেলুম তার অন্তরের বুভুক্ষুতা আজ আর তার মুখে ফুটে ওঠে নি, তার মুখে শান্ত ভাব বিরাজ করছে। এই দু'তিন দিনের মধ্যে তার আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।

এর পর আমি তার পানে একটু লক্ষ্য রাখলুম। ধীরে ধীরে সে আমাদের সংসারটা নিজের হাতে নিয়ে নিলে, দেখলুম গৃহিণী তার হাতে সব ভার ফেলে দিয়ে ভারি নিশ্চিন্ত হয়েছেন আর সেও অকুণ্ঠিতচিত্তে সমস্ত ভার নিয়েছে। সমস্ত দিকে তার চোখ রয়েছে, যে কাজে সে হাত না দেবে সে কাজ যেন কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না। তার হাত দুখানিতে যেন লক্ষ্মীর মঙ্গলময় স্পর্শ, সেই স্পর্শ যাতে লাগে তাই মধুর—সুন্দর হয়ে ওঠে!

এক মুহূর্ত্ত তার বিশ্রাম নেই। গৃহিণীকে পর্য্যন্ত তার ভয়ে শশব্যস্ত থাকতে হয়, ছেলেপুলের তো কথাই নেই, তারা সুশীদির ভয়ে অস্থির। আগে দেখতুম—আমার ছেলে মেয়েগুলি এক একটী অবতার ছিল, কোথাও একটী জিনিস রেখে শান্তি পাওয়ার যো ছিল না। এখানকার জিনিসটী সেখানে গিয়ে রয়েছে, সেখানকার জিনিসটী এখানে পড়ে রয়েছে। আমার মূল্যবান জুতা জোড়াটীকে একদিন ড্রেণের মধ্যে কাদামাখা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল সমস্তদিন খুঁজে না পাওয়ায় যখন ঝি চাকরদের ওপর তর্জ্জন গর্জ্জন করছিলুম তখন শুনতে পেলুম বড় খুকি জুতো জোড়াটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে কাদার মধ্যে দিয়ে খানিক টেনে নিয়ে বেড়িয়ে শেষে ড্রেণে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে। অত্যন্ত রাগ করে গৃহিণীকে বললে তিনি মুখ ভার করে বললেন, "তা আমি কি করব, ছেলেপুলেদের সব বিষয়ে দেখতে গেলে চলে না।"

আর একদিন কোর্ট হতে ফিরে এসে দেখলুম গৃহিণীর সোণার কাঁটা, ফিতা মেজোখোকা কোথায় দূর করে দিয়ে এসেছে, গৃহিণী নিজে মারতে না পেরে আমায় বললেন—"মার না।"

আমি মুখ গম্ভীর করে বললুম, "ছেলেপুলেদের সব বিষয় লক্ষ্য করতে গেলে ওরা বাঁচবে কি করে?"

এমনি ভাবেই চলছিলো। গৃহিণী ও আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম বলে ছেলেপুলেগুলি অত্যন্ত বদ হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এমনি সময়ে ভগবানের আশীষধারার মতই সুশী এসে আমার দরজায় দাঁড়াল।

ছেলেপুলেরা এখন বড় শান্ত—নম্রস্বভাব তাদের অর্থাৎ তারা ভয় করতে শিখেছে, শাসনের মর্য্যাদা যে আছে তা বুঝতে শিখেছে। এখন যেখানকার জিনিস সেখানেই পড়ে থাকে, ঘর বাড়ী বেশ পরিষ্কার থাকে, পথের ধূলা আর ঘাস লতাপাতায় ঘর বাড়ী নোংরা হয়ে থাকে না। তারা নিত্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বিকেলে সুশীর সঙ্গে হাওয়া খেতে যায়। অবাক হয়ে ভাবি—সেদিন যে ভিখারিণীর বেশে দরজায় দাঁড়িয়েছিল তার মধ্যে এতটা ক্ষমতা ছিল। এ ক্ষমতার বিকাশ করেছেন আমার গৃহিণী, আমি নই।

(২)

ক্রমে ক্রমে দেখতে পেলুম গৃহিণীকে সে কতটা আয়ত্বে আনতে পেরেছে। কয়দিন জ্বরভোগের পর তিনি তো ভাল হলেন, আহারে বিতৃষ্ণা ধরেছিল, খোকটা ছেলেপুলের

মত বেশী। সেদিন সুশীর ভয়ে কাঁচা আম নিয়ে এসে আমার ঘরে সবে মাত্র বসেছেন। আমি যে এত নিষেধ করলুম, আমার কথায় কাণই দিলেন না। যে মুহূর্ত্তে সুশীর কণ্ঠস্বর কাণে আসা—সেই মুহূর্ত্তে সবটা টান দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া।

সুশী আর একবার তাঁর রোগের পথ্য ঠিক করেছিল মাছের ঝোল ভাত; আমার কাছে নাকে কাঁদলেও সুশীর কাছে একটা কথা বলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না; বাধ্য হয়ে তাই-ই খেতে হতো। যথার্থ কথা বলতে কি—আমি তাঁর এই দুর্দ্দশা দেখে ভারি খুসি হয়ে উঠেছিলুম। বরাবর আমি যা বারণ করতুম—নারীশক্তির প্রভাব দেখাতে ঠিক তাই তাঁর করা চাই। আগে অবশ্য এতটা ছিল না, ইদানিং কাগজে পত্রে আমরা পুরুষ জাতিরা নারীকে যে সব রকমে নির্য্যাতন করি এই কথা ভেবে বড় ক্ষুব্ধা হয়েছিলেন, সেই জন্যে প্রাণপণে আমার বিরুদ্ধাচারন করতেন। তাঁকে বুঝাবার সব চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়ে যেত, কেননা যা তিনি সত্য বলে জেনেছেন তা আর কিছুতেই মিথ্যে হতে পারে না বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

সুশী মেয়েটী একদিকে যেমন কোমল স্নেহ পরায়ণা, অন্য দিকে তেমনি শক্ত, কঠোর। বয়েস তার বেশী ছিল না, বড় জোর সতের আঠার হবে। সে বিধবার বেশে থাকত, স্বপাকে নিরামিশ খেত। সে কে, কোথায় তার বাড়ী, এ সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে তার মুখের হাসি মিলিয়ে যেত, তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠত। সে উত্তর দিতে চায় না দেখে আর তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হতো না। জাতির কথা জিজ্ঞাসা করতে সে বলেছিল যে কায়স্থ—তার সেই কথাতেই তাকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল।

সেদিনকার ষ্টেটস্‌ম্যানখানা পড়তে পড়তে একটা বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি পড়ল। দেখলুম যশোর জেলার এক শিক্ষিত জমীদার লিখছেন তাঁর একটীমাত্র মেয়ে—বয়েস বছর আঠার হবে, মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল - সে হঠাৎ কোথায় চলে গেছে। যে তাকে এনে দিতে পারবে অথবা তার সন্ধান বলে দিতে পারবে সে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাবে।

এ রকম বিজ্ঞাপন প্রায়ই থাকলেও আমি কাগজখানা হাতে নিয়ে ভাবছিলুম, আমার মনে ঠিক সুশীর কথাই জেগে উঠেছিল। ভদ্রলোক যে রকম বর্ণনা করেছেন তাতে চেহারায় সুশীর সঙ্গে ঠিক মিললেও প্রকৃতিতে মেলে না, যেহেতু সুশীর মাথার বিকৃতি নেই।

চিন্তাটা মন হতে শীঘ্রই মিলিয়ে গেল, নিজের কথা ভেবে নিজেই হাসলুম।

কি কাজে আমায় একটু বার হতে হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে দেখতে পেলুম সুশী টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে একমনে কাগজখানা দেখছে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। সে কি লেখাপড়া—বিশেষ করে ইংরাজি জানে? কই—তার আচার ব্যবহারে কোনদিন লেখাপড়া জানা মেয়ের মত তো তাকে বোঝা যায় নি। যদিও তার কাজকর্ম্মে শিক্ষিতার অভিজ্ঞতা আপনিই ফুটে বার হতো তবু সে লেখাপড়ার প্রসঙ্গে একেবারে উদাসীনা হয়ে থাকত।

আমার সাড়া পেয়েই সে আচমকা জেগে উঠে বিবর্ণ হয়ে গেল, হাতের কাগজখানা ফেলে রেখে ছুটে চলে গেল, আর তাকে দেখতে পেলুম না।

এরপর আর একবার মাত্র সে আমার সামনে পড়েছিল পান দিতে এসে, তার মুখখানা যেন বড় আঘাতে মলিন হয়ে গেছে, সে যেন কি ভাবছে এমনি অন্যমনস্ক তার ভাব।

গৃহিণী রাত্রে বলিলেন, "আজ সুশীর কি হয়েছে, সে মোটে কিছু খায় নি, কেমন যেন অন্যমনস্ক, কি যেন সে ভাবছে। আজ কোন দিকেই তার যেন কোন বাঁধন নেই, এমনি আলগা ছাড়া ছাড়া ভাব।"

আমার মনে চট করে সেই কথাটা উদয় হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, সুশী কি লেখাপড়া জানে, ইংরেজি জানে জানো তুমি?"

তিনি উপহাসের হাসি হেসে বললেন, পোড়াকপাল, সামান্য প্রথমভাগ খানা উল্টে ধরে, খুকি ওকে অ আ শেখাতে যায়, ও নাকি লেখাপড়া জানে, কি যে বল তুমি, ঠিক নেই।"

আমি সন্দিগ্ধভাবে বললুম, "না, সে আজ এই ষ্টেটসম্যানের বিজ্ঞাপন পড়ছিল, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। সেইটা পড়ার পর হতে তার যে এই ভাবান্তর হয়েছে এ আমি ঠিক

বলতে পারি। আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে এ নিশ্চয়ই অমর বোসের মেয়ে আনন্দিতা বোস না হয়ে যায় না। অমর বোস লিখেছেন তাঁর মেয়ে বেশ শিক্ষিতা, বিয়ে দেওয়ার ভয়ে পালিয়েছে। তার একটা বিশেষ পাগলামী আছে সে মনে করে বিধবা হয়েছে। এ নিশ্চয়ই সুশী বই আর কেউ নয়। কাল সকালেই—দেখো তাকে যখন ধরব তখন সব কথাই তাকে স্বীকার করতে হবে। তার প্রকৃত পরিচয়টা জেনে অমর বোসকে একখানা তার করে দেওয়া যাবে।

গৃহিণী বোধ হয় বিশ্বাস করেন নি তাই একটু হাসলেন।

(৩

আশ্চর্য্য পরদিন সকালে উঠে সুশীকে দেখতে পেলুম না। রাতারাতি সে যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে গুলো আবার তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিলে। একমাস যে সুশৃঙ্খলা আমার বাড়ীতে সুশী স্থাপন করেছিল, সে পেছন ফিরতে না ফিরতে তা দূর হয়ে গেল। গৃহিণী ভারি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন, তিনি আমাকেই বিশেষ করে চেপে ধরলেন—আমি নিশ্চয়ই সুশীকে কিছু বলেছি, তাই সে পালিয়েছে।

হায় রে অবুঝ নারী, এদের বুঝানো যে কি শক্ত তা আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলুম বলেই দ্বিরুক্তি করে কথা বাড়ালুম না।

বড় খুকি দৌড়ে এসে আমার হাতে একখানা পত্র দিলে, বললে—সুশীদির বিছানায় এটা পড়ে ছিল।

তাড়াতাড়ি খুলে ফেললুম, সত্যিই সে একখানা পত্রে নিজের পরিচয় জানিয়ে বিদায় নিয়েছে।

সে লিখেছে—

কাল ষ্টেটসম্যানে যে বিজ্ঞাপন বার হয়েছিল, আপনি তার পাশে লাল কালির দাগ দিয়ে রেখেছেন দেখে বুঝতে পেরেছি আমায় আপনি সন্দেহের চোখে দেখেছেন। সেই জন্য—পাছে আপনি আমার বাপকে খবর দিয়ে আনান তাই আমি পালাচ্ছি।

সবাই বলে আমার মাথা খারাপ হয়েছে কিন্তু আমি তো তা বুঝতে পারি নে। একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম—সে সেইদিন—যেদিন টেলিগ্রাফ এলো—আমার প্রিয়তম রবীন যুদ্ধে হত হয়েছে। তাকে আমি কত ভালবাসতুম আর সে আমায় কত ভালবাসত তা কেউ জানে না। সে বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিল, সেখান হতে যুদ্ধে গিয়েছিল। তার সেদিন ফিরে আসার কথা ছিল, আমরা বাড়ীখানাকে সাজিয়েছিলুম, আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সে উৎসবের রাণী ছিলুম আমি—কারণ আমারই প্রিয়তম সেদিন বিদেশ হতে ফিরছে! সেই সময় টেলিগ্রাফ এলো সে নেই, সে মারা গেছে। উঃ সে কি যন্ত্রণা, আমি সইতে পারলুম না, অজ্ঞান হ'য়ে পড়লুম।

পরে শুনতে পেলুম একটা মাস আমি বিছানায় পড়ে ছিলুম। এরপরে ডাক্তার বললেন—আমি পাগল, বাড়ীর সবাই বললে আমি পাগল। বেশ বুঝতে পারতুম আমি কি সব বলে যাচ্ছি, তার মাথা নেই, মুণ্ডু নেই। অনেক চিকিৎসার পর একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছিলুম।

এই সময়ে শুনতে পেলুম ব্যারিষ্টার আর সি দত্ত আমায় বিয়ে করতে চান, আমার বাপ মাও তাতে মত দিয়েছেন।

ছিঃ ভালবাসা কি পণ্য দ্রব্য? যাকে দিয়েছিলুম সে আজ নেই বলে আর একজনকে দেব? ভাবতে ভাবতে আবার আমার মাথা গরম হয়ে উঠল, আমি এবার বাড়ী ছেড়ে পালালুম।

আশ্রয় পেলুম আপনার এখানে। ভগবান আমায় যোগ্য আশ্রয় মিলিয়ে দিয়েছিলেন, আপনাদের কাছেই বরাবর থাকব ভেবেছিলুম কিন্তু অদৃষ্ট বাদী হ'ল। বাবাকে খবর দিলেই তিনি আমায় নিয়ে যাবেন, জোর করে হয় তো বিয়ে দেবেন তাই আমি পালালুম। দেখি—এবার কোথায় যাই, কার আশ্রয় নিতে হয়? যদি আশ্রয় না পাই, আত্মহত্যা করব, বাপ মায়ের কাছে আর যাব না এই আমার প্রতিজ্ঞা।

আসি তবে, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে।

"আনন্দিতা বোস।"

স্তব্ধ হয়ে গৃহিণী আমার পানে তাকিয়ে রইলেন, আমি তাঁর পানে তাকিয়ে রইলুম।

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রমদার দুঃখ।

জামাতাকে কিছুদিন বাটীতে রাখিয়া প্রমদা বুঝিলেন যে, বিধাতার এই পৃথিবীতে আমরা কোনও সামগ্রী পছন্দ করিয়া লইতে পারি না। মানুষ যতদিন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে, যতদিন বর্ত্তমান দেখিয়া পরে কি হইবে, নির্ণয় করিতে না পারিবে, ততদিন মানুষের পছন্দ কখনও ঠিক হইবে না।—প্রমদা পছন্দ করিয়া, ঈশানীর জন্য বর মনোনয়ন করিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, এই মনোনয়নে তিনি, কত না, বুদ্ধি ব্যয় করিলেন; ভাবিয়াছিলেন যে জমীদার ডেপুটীর পুত্র, চিরকালই তেমনই ধনবান থাকিবে; ভাবিয়াছিলেন, যে ছেলে এক্ষণে বি-এ পড়িতেছে, ভবিষ্যতে সে এম-এ ও বি-এল পাশ করিয়া আরও বিদ্বান হইবে, এবং ওকালতি করিয়া পিতার অর্থরাশির উপর, ভাগীরথী-প্রবাহে যমুনার ধারার ন্যায়, অর্থ-রাশি ঢালিয়া দিবে; ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার চন্দ্রের মত রূপবান জামাতা বয়োবৃদ্ধি সহকারে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হইয়া রূপের জ্যোতিঃতে সমস্ত ধরণীকে আলোকিত করিবে। তাহার সেই ভবিষ্যৎ আশা কোথায় গেল? মাত্র কয়েকটি বৎসর পরে বিধাতা ভবিষ্যৎ বিধানে ধনবানের ধন বাজীকরের গোলকের ন্যায় অদৃশ্য হইল, বিদ্বান মূর্খ হইল, রূপবান পৃথিবীকে রূপে আলোকিত না করিয়া তাঁহার বাটী অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিল। বুদ্ধিমতী প্রমদা বুঝিতে পারিলেন না তাঁহার এতবুদ্ধি কিরূপে, নির্ব্বুদ্ধি বিধাতা একটি ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন?

কিন্তু প্রমদা তাঁহার নির্ব্বাচিত জামাতাকে কেবল ধনহীন, মূর্খ ও কদাকার দেখেন নাই, আপন বাটীতে বসাইয়া, ক্রমে তাহার আরও বহু গুণের কথা অবগত হইতে পারিলেন। তোমাদের অবগতির জন্য, আমরা জামাতার সেই সকল গুণাবলীর কথা কীর্ত্তন করিব।

রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবার পর বুদ্ধিমতী প্রমদা যখন জামাতাকে আবার জামাতা বলিয়া চিনিতে পারিলেন, তখন একদিন তিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক মুখে কিঞ্চিৎ হাস্যরস মাখিয়া যথাসম্ভব মধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাদের ঢাকার অপূর্ব্ব বাটী এবং স্বর্ণপ্রসূ বিস্তীর্ণ জমিদারী সম্বন্ধে দুষ্ট ও কুচক্রী ব্যক্তিগণ যে কথা রটনা করিয়াছে তাহা কি সত্য?

শ্বশ্রূর এই মধুর প্রশ্নে শরৎকুমার কিছু গর্ব্ব সহকারে—কেন না, যেমন অন্ধ হইলেও পদ্মলোচনের নাম পদ্মলোচনই থাকিয়া যায়, তেমনই জমিদারী যাইলেও জমীদারের পুত্রের গর্ব্ব থাকে—জিজ্ঞাসা করিল "রটনাটা কি?"

প্রমদা। যে তোমাদের সব সম্পত্তি তুমি বিক্রী করে ফেলেছ।

শরৎ। তা'তে লোকের কোনও কথা ক'বার ত কোনও অধিকার নেই।

জামাতার রুষ্টভাব দেখিয়া প্রমদা আর কোনও কথা কহিলেন না; এবং বুঝিলেন, কথা কহিলেও তাহার নিকট কোনও সরল উত্তর পাইবার প্রত্যাশা নাই। কিন্তু আপন গচ্ছিত অর্থ সম্বন্ধে তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। কয়েকদিন পরে তিনি জামাতাকে আবার প্রশ্ন করিলেন।

শুনিয়া শ্রীমান শরৎকুমার কর্কশ স্বরে এবং অভদ্র ভাষায় উত্তর করিল, "আমি ত কোন লোকের চুরি করা জিনিষ বিক্রী করিনি, আমি আমার নিজের পৈত্রিক সম্পত্তিই বিক্রি করেছি, তাতে আপনার কি?"

প্রমদা নম্রস্বরে কহিলেন, "তাতে আমার কিছু বলবার নেই বাছা। আমার গচ্ছিত টাকাটা ঠিক থাকলেই হ'ল।

শরৎকুমার ক্রোধের সহিত কিঞ্চিৎ বিস্ময় মিশ্রিত করিয়া এক নূতন রসের সৃষ্টি করিয়া বলিল, "কি বলছেন আপনি? আপনার গচ্ছিত টাকা কোথায়?"

প্রমদা অত্যন্ত শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, "কেন, তুমি যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্যে গেল বছর আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলে, আমি সেই টাকারই কথা বলছি। তোমার কাছে কি আমার সে টাকা নেই।"

শরৎকুমার অম্লান মুখে বলিল, "আপনার কোনও টাকা আমি নিয়ে যাইনি; আপনার কোনও টাকা আমার কাছে নেই।"

প্রমদা কাঁদিলেন, শরৎকুমার তাহাতে দুঃখিত হইল না। অধর্ম্মের ভয় দেখাইলেন; কিন্তু শরৎকুমার বাল্যকাল হইতে অনেক অধর্ম্ম নির্ভীকচিত্তে করিয়াছে, এখনও ভয় পাইল না। অবশেষে তিনি প্রতিকারের জন্য পাড়ার পাঁচ ভদ্রব্যক্তিকে জানাইলেন।

তাঁহারা আসিয়া শরৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শরৎকুমার তাহাদের সমক্ষেও বলিল, 'আমি কাহারও টাকা গচ্ছিত রাখিনি। আমার শাশুড়ীর টাকা থাকিলে ত তিনি তাহা গচ্ছিত রাখবেন? তাঁর কোন টাকাই ছিল না; আমার শ্বশুর মশায়, আমার শাশুড়ীকে, কিছুই দিয়া যান নি। উনি বাপের বাড়ী থেকেও কিছু আনেন নি। আমার শ্বশুর তার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিই তাঁর ছোট মেয়েকে দান করেছিলেন। আপনারা এই দানপত্র দেখুন।"

প্রমদাও সেই দানপত্র চিনিলেন। সেই দানপত্র; কল্যাণীকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা করিবার জন্য তিনি বুদ্ধি করিয়া, তাঁহার আদরিণী কন্যার নামে, মুমূর্ষু স্বামী দ্বারা লিখাইয়া লইয়াছিলেন। এখন তাহার সেই বুদ্ধির রজ্জু ফাঁসীর আকারে তাঁহার আপন গলাতেই পড়িল। হা অদৃষ্ট! বুদ্ধিমতী হইয়াও প্রমদা কেন আগে তোমার স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। হায়! বুদ্ধিমতী পত্নীর পরামর্শ অনুযায়ী মুন্সেফ্ বাবু যে দানপত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন; তাহা ত এখন লঙ্ঘন করিবার কোনও উপায়ই নাই! প্রমদা আপন বুদ্ধির জালে জড়িতা হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

সেই দানপত্র মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া আহূত প্রাতিবেশীগণ কহিলেন এই দানপত্র অনুযায়ী মুন্সেফ্ বাবুর সমুদয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী তাঁহার কন্যা ঈশানী। এ বাড়ীতে একটী টুক্‌নী ঘটীতেও আপনার অধিকার নাই! যদি তিনি কিছু টাকা রাখিয়া থাকেন, তাহাও আপনার কন্যা পাইবে।

প্রমদা অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বিচার শুনিলেন। তাঁহারা প্রস্থিত হইলে অপর কোনও প্রতিকারের প্রত্যাশায় কন্যাকে অনুরোধ করিলেন।

তিনি জানিতেন না যে, সেই কন্যা এক্ষণে আর তাঁহার কেহ নহে। স্বামী এখন অর্থহীন চরিত্রহীন এবং বিকৃতদেহ হইলেও সে এখনও তাহারই; স্বামী অত্যাচারী অপহারী হইলেও সে এখনও সেই স্বামীরই। সে বলিল, "কি করবো মা? তোমরা আমাকে যাঁর হাতে সঁপে দিয়েছ, সেই আমার সব; বাবা আমাকে যা কিছু দিয়ে গিয়েছেন, আমার যা কিছু আছে সবই যে তাঁর।'

কন্যার বাক্যে প্রমদা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না;— হায়, এই পরগত প্রাণা কন্যাকেই তিনি তাঁহার বুকে করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ইহাকেই আদর করিয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়াছিলেন? এখন ঐ কাণা, খোঁড়া, কদাকার, লম্পটটাই তাহার সব হইল?— দুঃখে ও ক্রোধে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এই ঘটনায় প্রমদা তাঁহার মনোনীত জামাতার আধুনিক গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু এখনও তিনি সকল বিষয় জানিতে পারেন নাই;

(ক্রমশঃ)

CRDas

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৬ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩২। [৩২শ সপ্তাহ

ভারত-নয়ন-অঞ্জন নিত্যজীবী চিত্তরঞ্জন

[শ্রীঅমৃতলাল বসু]

গরবে গৌরবে,
ভৈরব আরাবে,
বিজয়-বিষাণ বাজে।
কৈলাসে উল্লাসে,
যশস্বি-আবাসে,
ঈশান-নিশান সাজে॥
দশমীর রাত্রি,
বিজয়ার যাত্রী,
জগদ্ধাত্রী পদতলে।
পশুরাজ অঙ্গে,
হেলাইয়া রঙ্গে,
বসে শুদ্ধ পদ্মদলে॥

দেখ চেয়ে চক্ষে,
ওই ঊর্দ্ধ লক্ষ্যে,
অক্ষ-মালা শোভে বক্ষ।
দেহ লীলা রঙ্গে,
কর্ম্ম-যোগ ভঙ্গে,
শিব-শিবা সঙ্গে সখ্য॥
হিমগিরি-শিরে,
লয়ে যেতে বীরে,
যবে এলো মহাকাল।
সমাধি-মন্দিরে,
দেখিল নন্দীরে,
দেখে ঘন জটাজাল॥

সর্ব্ব শুভঙ্কর,
সম্মুখে শঙ্কর,
যম ভয়ঙ্করে—লজ্জা।
মৃত্যু যেন ভৃত্য,
পালে নিজ কৃত্য,
পাতি ফুলদল-শয্যা॥
ঈশানী সঙ্গিনী,
যোগিনী রঙ্গিণী,
তাণ্ডব-তরঙ্গে নাচে।
নৃত্য থিয়া থিয়া,
তাথিয়া তাথিয়া,
মুক্ত ভূত-পক্ষ পাছে॥
মরণের জাঁক,
দেখিয়া অবাক্,
মেদিনী মোদিনী তাই।
পুত্র-পুণ্যে সতী,
ভাবে ভাগ্যবতী,—
'আরতি আমারি পায়'॥
ও কি! ও মা বঙ্গ,
কেন কাঁপে অঙ্গ,
অশ্রুর তরঙ্গ চোখে।
যম জয় করে,
ছেলে চলে ঘরে,
কাঁদিলে হাসাবে লোকে॥
কেঁদ না কেঁদ না,
সহিতে বেদনা,
শেখ, দেখে বলিদান।
বিনা রক্তপাত,
অরির নিপাত,
করি, পুত্র দেছে প্রাণ॥

এই রণজয়,
পশু-সাধ্য নয়,
অমর-সমর এই।
প্রেমের কামান,
সম্মোহন বাণ,
কুসুম সমান সেই॥
এ ভারতবর্ষে,
সহযোগে হর্ষে,
ক'রে গেছে আকর্ষণ।
সে কি যে—সে ছেলে,
ছেড়ে চ'লে গেলে,
চিতা তিতায়ে বর্ষণ॥
ওঠো বাঁধ কটি,
পর খাদ্রো ধটী,
মাটি কাটি খোঁজ ভক্ষ্য।
পায়স অশন,
চিকন বসন,
নহে, মা—মা এক লক্ষ্য॥
ছিল মহাভোগী,
হোলো কর্ম্মযোগী,
দেখাতে ত্যাগের পথ।
চক্র চিহ্ন ধর,
হও অগ্রসর,
ঐ যায়—ঐ যায় রথ॥
আমাদের চিত্ত,
হয়ে যেন নিত্য,
বঙ্গের রঞ্জন রহে।
জুড়ে অন্তস্থল,
মৃত্যু দিক্ বল,
চক্ষে জল কেন বহে॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ, ভাগবৎরত্ন]

বাঙ্গলার গরিমা সূর্য্য সহসা মহাকালের ফুৎকারে মধ্যাহ্ন আকাশে নিভিয়া গেল। বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশে এক মহা অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। যে দেদীপ্যমান আলোকের উপর নির্ভর করিয়া সমস্যাসঙ্কুল বিঘ্ন-জটিল কণ্টাকাকীর্ণ স্বাধীনতার দুর্গম পথের যাত্রী হইয়া বাঙ্গালী বড় আশা করিয়াছিল এবার সে লক্ষ্যে পৌছিবেই, ভাগ্যের পরিহাস তাহার সেই আলোকবর্ত্তিকা মৃত্যুর ঘন কৃষ্ণ যবনিকায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাই নৈরাশ্যক্ষুব্ধ জাতি শোক সম্মোহিত হইয়া আজ পথের প্রান্তে বসিয়া পড়িয়াছে—কে তাহাকে পথ দেখাইবে?

চিত্তরঞ্জনের মত প্রবল ব্যক্তিত্বশালী, দুর্দ্ধর্ষ, দুঃসাহসী, রাজনৈতিক নেতা মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রত্যহ জন্মগ্রহণ করেন না। যুগ প্রয়োজনে সঙ্কটের দিনে ইঁহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির মধ্যে সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক নিয়মেই সহসা আবির্ভূত হয়েন। ইঁহাদের জীবনের কার্য্যাবলীর সাফল্য ব্যর্থতার ফুটের ফিতা দিয়া পরিমাপ হয় না। ইঁহাদের কার্য্য ও দায়িত্ব জন্ম মৃত্যুর সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নহে। যে উদ্দেশ্যে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, যে উদ্দেশ্য সাধারণের জন্য ইঁহারা তিলে তিলে হৃদয়ের রুধির মোক্ষণ করিতে করিতে অবশেষে পূর্ণ আত্মোৎসর্গের বেদীর উপর মানব মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাহার প্রভাব কেবল বর্ত্তমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। তাই মনে হয় আজ চিত্তরঞ্জন চলিয়া গেলেও তাঁহার জীবনের প্রশান্ত পরিণতি ভাবঘন আদর্শরূপে বাঙ্গালী জাতিকে তাহার রাষ্ট্রীয় সাধনার সিদ্ধির দিন পর্য্যন্ত প্রেরণা জোগাইবে। কাজেই তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্যক্ আলোচনা করিবার সময় এখনও না হইলেও যতটুকু পারা যায়, তাহার আলোচনা—অনুধাবনা—জাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান।

বংশ পরিচয়

চিত্তরঞ্জন যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে নিতান্ত অজ্ঞাত অখ্যাত নহে। রঘুবংশে যেমন দিলীপ দশরথ প্রভৃতির সাধনার ফলে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল, তেমনি পূর্ব্ববঙ্গে যত্নন্দন বৈদ্যবংশের বহু যুগের সঞ্চিত পুণ্যরাশির ফলে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় কুলোজ্জ্বল পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতামহ কাশীশ্বর বিক্রমপুর অঞ্চলে স্বীয় চরিত্র ও প্রতিভা বলে জনসাধারণের শ্রদ্ধার্ঘ্য পাইতেন। তাঁহার তিন পুত্র—দুর্গামোহন, কালীমোহন ও ভুবনমোহন বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ মণীষা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। তিন ভ্রাতাই ব্যবহারজীবি রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের পিতৃদেব ভুবনমোহন এটর্ণী ছিলেন, আর তাঁহার দুই পিতৃব্য ওকালতী ব্যবসা করিতেন। ইঁহারা অর্থ যেমন উপার্জ্জন করিতে জানিতেন, তেমনি মুক্তহস্তে দান করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিতেও জানিতেন। ব্যবহার শাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা ও দরিদ্রের—অসহায়ের দুঃখে বিগলিত হইয়া মুক্তহস্তে দান—এই দুই সদগুণ চিত্তরঞ্জন উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার মহান্ চরিত্রের অপর এক অংশের বিকাশও আমরা তাঁহার পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত বলিতে পারি—সেটী হইতেছে তাঁহার কাব্যানুভূতি ও সাহিত্য সাধনা। তাঁহার পিতৃদেব কৃতিত্বের সহিত প্রথমে "ব্রাহ্ম পাবলিক্ অপিনিয়ন" ও পরে "বেঙ্গল পাবলিক্ অপিনিয়ন" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া ছিলেন। তিনি নিজে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তদানীন্তন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ হইয়াছিলেন।

জন্ম ও ছাত্র জীবন

চিত্তরঞ্জন ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২০শে কার্ত্তিক তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার পিতা কলিকাতাতে বাস করিতেন। চিত্তরঞ্জনের জন্মের কয়েক বৎসর পরে তিনি ভবানীপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী কলেজিয়েট স্কুলে বালক চিত্তরঞ্জন বিদ্যালাভ করিতেন। তথা হইতেই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তৎপরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। অন্যান্য অনেক কবি ও নেতা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই, চিত্তরঞ্জনও সেইরূপ পারেন নাই। তথাপি সেই সময়ে তাঁহার সাহিত্যে অসাধারণ দখল দেখিয়া বন্ধুবান্ধব মুগ্ধ হইতেন। কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে কোন তর্কে তাঁহার সতীর্থগণ চিত্তরঞ্জনের মতামত সাগ্রহে শ্রবণ করিত। এই ছাত্র জীবনেই তাঁহার বাগ্মীতা অনেককে মুগ্ধ করিয়াছিল। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গমন করেন।

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। তিনি চিত্তরঞ্জনকে পাকা বুরোক্র্যাট, কমিশনর বা লাট হইবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই—তিনি তাঁহাকে মহত্তর, বিরাটতর করিবার জন্য অলক্ষ্যে গোপন খেলা খেলিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন যখন বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্টের মেম্বর হইবার জন্য বিলাতে আন্দোলন করিতেছিলেন। একজন ভারতবাসীর এই উচ্চাকাঙ্খায় মুগ্ধ হইয়া স্বদেশের কল্যাণ কামনায় চিত্তরঞ্জন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নানাস্থানে বক্তৃতা করেন। তরুণ বক্তার বাক্‌পটুতায় তখন অনেকেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে পার্লামেণ্টের অন্যতম সদস্য মিঃ জন ম্যাকনীল ভারতীয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই গ্লানিকর ভাষায় অবমানিত করিয়া এক বক্তৃতা করেন। দেশপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের বুকে প্রবাসে এই জাতিনিন্দা শেলের মতন বিঁধিল। তিনি প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগকে সমবেত করিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় ম্যাকনীলের সেই বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তাহার ফলে মিঃ ম্যাকনীলকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল; এমন কি সদস্য পদ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হইলেন। ইহার পর আর একটি সভায় চিত্তরঞ্জন ভারতীয়গণের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতায় ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন, যে তাঁহার নিজের ঐহিক উন্নতির উহা পরিপন্থী হইয়া পড়ে। মিষ্টার গ্লাডষ্টোন ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। প্রবাদ যে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় এমন দুর্দ্দমনীয় সিংহ শাবককে চাকুরীর খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা যাইবে না এই আশঙ্কায় সরকার বাহাদুর তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে গ্রহণ করেন নাই। চিত্তরঞ্জন প্রায়ই হাসিতে হাসিতে বলিতেন যে সিভিল সার্ভিসে অকৃতকার্য্য ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি ইনার টেম্পলে ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন মধ্যেই তথাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

কর্ম্মজীবন

ব্যারিষ্টারী ব্যবসা আরম্ভ করিয়া তিনি প্রথমে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিলেও ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং সেই ঋণ পরিশোধ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু একে তিনি নূতন ব্যারিষ্টার, তাহাতে আবার তাঁহার বহু পরিবার। এ অবস্থায় ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হইল না। বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতা ও পুত্রে দেউলিয়া আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চনা করিবার সংকল্প তাঁহার মনে কখনই উদিত হয় নাই। যেদিনই তিনি উপযুক্তরূপ অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন, সেইদিনই পিতার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। এ সময়ে কিন্তু উত্তমর্ণগণের আইনতঃ কোন দাবী দাওয়া ছিল না। তথাপি পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করেন—তাঁহার শরীরের মধ্যে—'কার্পণ্য দোষ হতঃস্বভাবঃ' বিন্দুমাত্রও ছিল না। বিচারপতি ফ্লেচার

সাহেব ইহাতে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইয়া কেহ আবার পূর্ব্বঋণ পরিশোধ করে, এমন দৃষ্টান্ত আমি কখনও দেখি নাই—ইহাই প্রথম।"

চিত্তরঞ্জনকে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়া প্রথমে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে—সংসারেও বহু দুঃখ, কষ্ট, হতাশা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে তিনি এক-দিনের তরেও হতাশ হয়েন নাই। সাহসে বুক বাঁধিয়া নিজের জোরে ব্যবসা ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেন ইহাই ছিল তাঁহার অটল সংকল্প! তিনি এই সময়ে অসাধারণ অধ্যাবসায়ের সহিত আইন গ্রন্থ পাঠ করিতেন। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অনেক সময় মফঃস্বল কোর্টেও গমন করিতেন।

এরূপ নির্ভীক বীরের গলায় জয়মাল্য পরাইবার জন্য ভাগ্যদেবী সর্ব্বদাই আগ্রহন্বিতা। তাই চিত্তরঞ্জনের উন্নতির সুযোগ আসিতে বিলম্ব হইল না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৩২৮ বঙ্গাব্দে লিখিয়াছেন—"কোন আইন ব্যবসায়ীর ব্যবসায় জীবন জাতির ইতিহাসরূপে যদি পরিগণিত হয়, তবে তাহা চিত্তরঞ্জনেই সম্ভব হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন ব্রিটিশযুগে ইংরাজের বিচারালয়ে একজন অসাধারণ প্রতিভা-শালী ব্যবহারজীবি। বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ রাজবিদ্রোহের মামলা লইয়া ভারতবাসী ও ইংরাজ আদালত বিব্রত হইয়াছে, যে বিচার এবং বিচার ফল সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, এমন কি ইংলণ্ডের তটভূমিকে আঘাত করিয়াছে, সেই সমস্ত স্মরণীয় ঐতিহাসিক রাজবিদ্রোহের মামলায় ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থনের জন্য যদি কেবল একজন ব্যবহার জীবির নাম করিতে হয়, তবে চিত্তরঞ্জনের নামই উল্লেখ করিতে হইবে। কেবল ব্যবসায়ের অনুরোধে, কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য চিত্তরঞ্জন গত দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্মরণীয় রাজবিদ্রোহের মামলায় ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থনের জন্য নিজ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর অনেক মামলায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুতরাং একথা বলিলে মিথ্যাকথা বলা হইবে যে কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য রাজদ্রোহমূলক সমস্ত মামলায় তিনি ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের প্রসিদ্ধ বোমার মামলায় আমরা চিত্তরঞ্জনকে প্রথম প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর দীপ্তিতে দেদীপ্যমান দেখি। যেদিন অরবিন্দ প্রমুখ বহু নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের মুণ্ড লইয়া রাজদ্বার ও শ্মশানের বায়ু অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেছিল, সেদিন এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই মামলার ভার গ্রহণ করিয়া রাজদ্বার ও শ্মশান এই উভয় স্থানের ভীতি হইতে নির্দ্দোষীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন—ইহা চিত্তরঞ্জনের জীবনের এক অতি গৌরবময় ঘটনা। সেই সঙ্গে ইহা জাতির ইতিহাসের একটা অধ্যায়। রাজদ্বার ও শ্মশানের ভয় হইতে যিনি রক্ষা করেন, শাস্ত্র তাঁহাকে বান্ধব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বদেশী যুগের পর হইতে রাজদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত অথবা নির্দ্দোষী স্বদেশ-প্রেমিকদিগকে রাজদ্বার হইতে রক্ষা করা কেবল কয়েকটী ব্যক্তি বিশেষের উপকার করা নহে, পরন্তু ইহা এক জঘন্য গুরুতর কলঙ্ক হইতে দেশবাসীর সুনাম রক্ষা করা। বিচক্ষণ মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন অতি দক্ষতার সহিত, অতি গৌরবের সহিত ইংরাজের বিচারালয়ে মিথ্যা রাজদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত বহু মোকর্দ্দমায় পৃথিবীর সম্মুখে ভারতবাসীর সুনাম কৃতিত্বের সহিত রক্ষা করিয়াছেন। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই চিত্তরঞ্জন দেশের নিকট 'দেশবন্ধু' আখ্যা পাইবার অধিকারী।"

কেবলমাত্র রাজনৈতিক মোকর্দ্দমাতেই যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নহে। তিনি আইনঘটিত অন্যান্য জটিল মোকর্দ্দমাতেও কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতন অজস্র অর্থ উপার্জ্জন এযুগে আর কেহ আইন ব্যবসায়ে করিতে পারেন নাই।

এই অসাধারণ মানুষটী অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আত্মভোলা শিশুর মত তাহা দুই হাতে বিলাইয়া দিতেন। নিজের অহঙ্কারের ভূমিতে দাঁড়াইয়া নহে—কৃপায় নহে—কিন্তু নিজের সহৃদয়তায় বিরাট সহানুভূতির টানে তিনি করুণায় গলিয়া যাইয়া পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে দুঃখীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি প্রকৃতিতে ছিলেন ত্যাগী। তাই তাঁহার

পক্ষে অমন অনায়াসে সমস্ত বিলাসের বন্ধনকে পদাঘাতে ছিন্ন করিয়া সাধকরূপে বাহির হইয়া আসা সম্ভবপর হইয়াছিল।

ধর্ম্মজীবন

চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইলেও তাঁহার হিন্দুত্বের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। পিতা ব্রাহ্ম হইলেও, তিনি হিন্দুমতে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নিজের কন্যাদের বিবাহও শালগ্রাম শিলার সম্মুখে হোমাগ্নি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হিন্দুত্ব কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত ছিল না। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। মনে প্রাণে স্বভাবে ভক্তিতে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অকৃত্রিম ভক্ত ছিলেন। বাঙ্গলার প্রাণ-পুরুষকে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। তিনি বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন—সেগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে তিনি সমর্পণ করিয়াছেন। পদাবলী কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত। বৈষ্ণবকে তিনি সর্ব্বাগ্রে সম্মান করিতেন। নবদ্বীপে যাইয়া বহুসহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে তিনি বৃদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত কীর্ত্তনসম্রাট শ্রীযুক্ত অদ্বৈত দাস পণ্ডিতবাবাজী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন দেখিয়াছি। বৈষ্ণবীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে পদাবলী ও বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনার এক নূতন পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন।

কবি চিত্তরঞ্জন

কবি চিত্তরঞ্জন সমস্ত অন্তর দিয়া বাঙ্গলার রূপকে ধ্যানের মধ্যে পাইয়াছিলেন। কাব্যে ও গানে, ছন্দে ও তালে তিনি তাহাই বাঙ্গালীকে সাধনার ধন বলিয়া উপহার দিয়াছেন। এই বাঙ্গলার রূপ কি তাহা তিনি "বাঙ্গলার কথায়" বুঝাইয়া বলিয়াছেন—"বাঙ্গলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতে আমরা মজিলাম! বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এদেশে আসিল, বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই—

> "তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
> তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
> ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
> বাহুতে তুমি মা শক্তি
> হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
> তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—

সেই মাকে দেখিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল"। বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম কেশবচন্দ্র সেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবাকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্টরূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্ত লীলাধারের রূপবৈচিত্র্য বাঙ্গালী একটি বিশিষ্টরূপ লইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেই রূপের মূর্ত্তি আমার বাঙ্গলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন দেখিলাম, মা আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন—সেরূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সেরূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত! তোমরা করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর- আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।"

চিত্তরঞ্জন ছিলেন একজন মরমী কবি। তিনি বাঙ্গলার গীতিকবিতার মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাবকে নূতন আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্ অনুভূতির সহিত চিত্তরঞ্জনের অনুভূতির পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বৈষ্ণবীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও, উহা ব্রাহ্মভাব—পুষ্ট, আর চিত্তরঞ্জনের কবিতা একেবারে বৈষ্ণবের সাধনা ও ভক্তিতে গলা। তবে চিত্তরঞ্জন একদিনেই যে বৈষ্ণবীয় পদাবলীর প্রেমের উচ্চগ্রামে পৌঁছাইতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। বহু সংশয় ও অন্ধকার ভেদ করিয়া তিনি "মধুর সুন্দর এক অপূর্ব্ব নন্দন" আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই সংশয়ের যুগে "মালঞ্চের" দুই চারিটী কবিতা লিখিত হইয়াছিল, কবি বলিতেছেন

"আকুল অন্তরে কত শুধায়েছে দাস—
করনি উত্তর দান! মর্ম্মাহত প্রাণে!
সুপ্তোত্থিত শিশু সম, সেই যে কাহিনী
আবার উঠিছে কাঁদি কাঁপিয়া কাঁপিয়া!
জীবনের সিন্ধু মম, আজি এ আঁধার
কোন্ মোহভরে, কোন পাপ পুণ্যবলে
কি জানি কিসের লাগি করেছে মন্থন!
ওগো উঠে নাই তাহে সুধা একবিন্দু!
দুরন্ত অনলভরা বিদ্রোহ অসীম
স্কন্ধে লয়ে ধরণীর রহস্যের ভার,
কালকূট রূপে আজ উঠেছে ভাসিয়া
আমার হৃদয় মাঝে! তারি বিষে মোর
জর্জ্জরিত হিয়া! হে প্রভু, দয়ার নিধি
লুণ্ঠিত চরণে তব দীনের বেদনা,
দয়া কর আজ!"

কিন্তু এরূপভাবে সংশয়দোলায়িতচিত্তে ভাবের ঘূর্ণীপাকে তাঁহাকে বহুদিন ঘুরিতে হয় নাই। তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনার বলে অন্তর্য্যামীর রূপ তাঁহার অন্তরে অন্তরে ফুটিয়া উঠিল। তাই তিনি "অন্তর্য্যামী"তে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া আনন্দবিহ্বল চিত্তে গাহিলেন—

"বাজা রে বাজা রে তবে! বাজা জয়ডঙ্কা,
নাহি লাজ নাহি ভয়, নাহি কোন শঙ্কা!
পরাণখানি কাঁপছে কত জয়মাল্য গলে,
ফুলের মত কি জানি গো ফুটছে হৃদিতলে!
সুখের মত দুঃখ আজ, দুঃখের মত সুখ!
কোন্ গানের গরবে গো ভরিয়াছে বুক?
প্রাণের মাঝে একি শুনি? কি নীরব ভাষা!
বুকের মাঝে কোন পাখী গো বাঁধিয়াছে বাসা!
পায়ের তলে রাজে পথ! প্রাণ আজিকে রাজা!
বাজা রে বাজা রে তবে, জয়ডঙ্কা বাজা!"

তাঁহার "কিশোর কিশোরী" "মালা" "মালঞ্চ" ও "সাগর সঙ্গীত" আজও কাব্যজগতে উপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না—তবে বাঙ্গালী যেদিন সত্যই আত্মস্থ হইবে—বাঙ্গালার রূপকে প্রাণের ধ্যানের মধ্যে পাইবে সেই দিন আশা করা যায় ঐ সকল গীতি বাঙ্গালীর কণ্ঠে বৈদুর্য্য-মণির ন্যায় শোভা পাইবে।

চিত্তরঞ্জন "নারায়ণ" পত্রিকা স্থাপন করিয়া বাঙ্গলায় এক নূতন ধরণের মাসিকা পত্রিকা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে বা পরে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাগুলির মলাট ছিঁড়িয়া লইলে বলা কঠিন কোনটা কোন পত্রিকা। কিন্তু "নারায়ণের" এমনই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, যে আজ মুদীর দোকানের বেসাতী বাঁধা "নারায়ণের" একখানা ছেঁড়া পাতা দেখিলেও তাহা "নারায়ণের"ই পাতা বলিয়া চেনা যায়। একমাত্র "সবুজপত্র" ছাড়া আর কোন পত্রিকার এরূপ ভাববৈশিষ্ট্য ছিল বা আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। প্রবন্ধ সম্পদেও "নারায়ণ" ছিল অতুলনীয়। বহু স্ফুটোনোন্মুখ প্রতিভাকে চিত্তরঞ্জন "নারায়ণের" কিরণ ফেলিয়া ফোটাইয়াছেন।

চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য সাধনা পরবর্ত্তী যুগে রাজনৈতিক সমস্যার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া আসিতেছিল। তিনি জীবনকে কখনই খণ্ড বিচ্ছিন্নরূপে দেখিতেন না, তাই ধর্ম্ম সাহিত্য ও রাজনীতি তাঁহার মধ্যে অপূর্ব্ব সমাবেশ লাভ করিয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পর কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত তাঁহার বাহিরের যোগ ছিল না বটে, কিন্তু সেই সময়ে তিনি মৌনসাধনার মধ্যে সমস্ত সমস্যা ধ্যান

করিতেছিলেন। তাই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সহসা তাঁহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভাপতির অভিভাষণে আমরা তাঁহার সাহিত্য সাধনার রাজনৈতিক সংশ্রব খুঁজিয়া পাইলাম। তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাঙ্গলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গলার যে মূর্ত্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস মন্দিরে সেই মোহিনীমূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই যে আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম জ্বলন্ত প্রদীপের মত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে!" "প্রথমেই হয় তো অনেকের মনে হইবে যে এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাঙ্গলার কথার আবশ্যক? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সাধনার স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি, এবং এই ধার করা জিনিষ ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিষটাকে আমরা রাজনীতি বা Politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা সর্ব্বাঙ্গীন সম্বন্ধ নাই! কেহ কি আমায় বলিয়া দিতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজ-নীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্ম্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, এইসব মনগড়া জীবন খণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীর বেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন খণ্ড, ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আবদ্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?"

একজন চিন্তাশীল লেখক চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যিক জীবনের সহিত রাজনৈতিক জীবনের যোগসূত্র বাহির করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় একটি ভাবকে সর্ব্বদা প্রতিবাদ করিয়াছেন। সাহিত্য ও ধর্ম্মে বাঙ্গালী রাজা রামমোহন রায় হইতেই ফেরঙ্গের ভাব-দাসত্বে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে। এই জন্য ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও সমাজে চিত্তরঞ্জন এই ফেরঙ্গ দাসত্বের এমন প্রখর ও প্রচণ্ড প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছিলেন যে ভাবদাসত্বের প্রতিবাদ মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের পূর্ব্বে তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির সম্মুখে প্রচার করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়ের পরে তিনি যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফেরাঙ্গদাসত্বের প্রতিবাদ করিতে গিয়া গান্ধীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান, ইহাতে তাঁহার স্বভাব-ধর্ম্মের এক অতি ব্যাপক পরিণতি আমরা দেখিতে পাই। সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হওয়ার মধ্যে মানসিক বিকাশের ইতিহাসের পথ দিয়া দেখিতে গেলে আকস্মিক বা অসঙ্গত কিছুই দৃষ্ট হইবে না। ফেরাঙ্গ-ভাব দাসত্বের প্রতিবাদ করাই যাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য তিনি সাহিত্য বা রাজনীতি যে কোন ক্ষেত্রেই দণ্ডায়মান হউন, সেই একইভাবে পরিচালিত হইবেন। সহিত্য হইতে রাজনীতিতে প্রস্থানের পথে বাহিরের দিক হইতে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেলেও, অন্তরের দিক হইতে দেখিতে গেলে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে না। তিনি ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে চলিয়া যাইবার পথে জীবনের উদ্দাম ও প্রচণ্ড গতিমুখে একই মহাভাবের অনুসরণ করিয়াছেন—একই অনুরাগে পাগল হইয়া ছুটিয়াছেন। সাহিত্য ও রাজনীতির চিত্তরঞ্জন, অন্তরের দিক দিয়া দেখিতে গেলে—দুই নহে এক, অবিচ্ছিন্ন, সোপানের পর সোপান মাত্র।"

বাঙ্গলার সাহিত্যিক সমাজ চিত্তরঞ্জনকে তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে আমরা তাঁহাকে তিনবার মূল সভাপতি বা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে পাইয়াছি—ভাগলপুরে, ঢাকায় ও মুন্সীগঞ্জে। তবে শরীর নিতান্ত অসুস্থ থাকায় তিনি এ বৎসরের মুন্সীগঞ্জের

সাহিত্য সম্মিলনীতে স্বশরীরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

তিনি বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণের বন্ধু ও উপদেশক ছিলেন। বহু সাহিত্যিককে ও সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানকে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়া ও পরিচালনা করিয়া তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন

রাজনৈতিক চিত্তরঞ্জন

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই চিত্তরঞ্জন রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তি জাতির পরাধীনতার দুঃখ দৈন্যে বিচলিত না হইয়াই পারেন না। তিনি আশৈশব বাঙ্গলাকে কেমন ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহার লেখা হইতেই দেখাইয়াছি। সুতরাং তিনি যে সহসা রাজনৈতিক গগনে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ কথা নিতান্ত ভিত্তিহীন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে বয়কটের যে প্রস্তাব হয়, তাহাতে পরাজিত হইয়া তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন। এই বয়কট প্রস্তাব হইতেই তাঁহার তদানীন্তন স্বাদেশিকতার রূপ স্পষ্ট বুঝা যায়। তাহার পর কংগ্রেস নরমপন্থীদের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল—সেখান হইতে আবেদন নিবেদনের পসরা মাথায় করিয়া অনেকে বিকি কিনি করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন নিম্নস্তরের রাজনীতি হইতে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখিতেন। এ জন্য তাঁহাকে দোষ না দিয়া বরং প্রশংসাই করা কর্ত্তব্য। তিনি ঐ সময়ে কিরূপ ভাবে সাহিত্য সাধনার দ্বারা জীবনকে গঠন করিয়া তুলিতেছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

১৯১৫খৃষ্টাব্দ ভারতের ইতিহাসে এক স্মরনীয় যুগ। ঐ সময়েই লোকমান্য তিলক কারামুক্ত হইয়া আবার নব উদ্দীপনায় কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন এবং ঐ সময়েই মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ অফ্রিকা হইতে সত্যাগ্রহের নবমন্ত্র লইয়া দেশে ফিরিলেন। বাঙ্গলার চিত্তরঞ্জন জীবন গঠন করিয়া কেবল মাত্র প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। যখনই মহাত্মা গান্ধী আসিয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিলেন, তখনই চিত্তরঞ্জন অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাতে যোগ দিলেন। সত্যাগ্রহের দিনকে তিনি "আজ মহাত্মা করম চাঁদ গান্ধীর দিন" বলিয়া ঘোষণা করিলেন, ও সঙ্গে সঙ্গে বীরের ন্যায় মহাত্মার শিষ্যত্ব অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন—বিন্দু মাত্র সঙ্কোচ বা ঈর্ষ্যা তাঁহার মনে জাগে নাই। সেই সত্যাগ্রহের দিন তিনি বলিয়াছিলেন—"আজি এই জাতির বিপদের দিনে এই জাতির যে আত্মা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিব।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"

কিন্তু এই বল কিসের বল? পাশব বলে আত্মাকে পাইব না। এই বল প্রেমের বল। যদি কেহ স্বদেশকে ভালবাস, স্বজাতিকে ভালবাস, তবেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবে—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"

ইহাই মহাত্মা গান্ধীর বাণী, আর ইহাই ভারতবর্ষের বাণী। এই বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সকল স্বার্থপরতাকে সকল হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন করি? আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে রাউলাট আইন চলিলে আমাদের এই নবজাগ্রত জাতিটাকে তাহার নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া তুলিতে বাধা প্রাপ্ত হইব। সেই বাধা অতিক্রম করিতে হইলে, সকল হিংসা দ্বেষ বর্জ্জন করিয়া দেশ-প্রেমকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে! তাই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, শত্রুকে ঘৃণা করিবেনা, হিংসা করিবে না, কারণ প্রেমের জয় অনিবার্য্য।

আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে এই যে আন্দোলন, ইংরাজীতে যাহাকে রাজনীতি বলে, ইহা তাহার আন্দোলন নহে। ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্ম্মের আন্দোলন, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্ম-নিবেদন। সকল শাস্তি সকল আপদ বিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণের অনুরাগে আত্ম-নিবেদন।

আজি আমরা মন্দিরের সোপানে দাঁড়াইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার চাই। ঐকান্তিক আত্মনিবেদন না করিতে পারিলে সে অধিকার ত জন্মে না। তোমরা কি পারিবে? আমি কি পারিব? ভগবানের কৃপা ছাড়া কেহই পারিবে না।

আজ তাই এই দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগে আমাদের নিজ নিজ অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে ও অবনত মস্তকে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। আজ তাই আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি! তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ। আজ সারাদিনের উপবাসে, শুদ্ধ মনে, সংযতচিত্তে বিধাতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রাণের প্রাণ সেই আত্মাকে ডাকিবার জন্ম আসিয়াছি। এস আমরা সেই প্রেমের বলে বলী হই। কারণ "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" এস আমরা আজ প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লক্ষ-কণ্ঠে বলি—

"উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত, প্রাপ্যবরান নিবোধত"

"নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"

আবার বলি উঠ, ডাক, জাগ—আপনাকে জাগাও। সম্মুখে প্রেমের পথ সুবিস্তৃত, সেই পথের পথিক হইয়া জাতির কল্যাণকে জাগাও। তবেই "নর নারায়ণের" প্রকাশ হইবে। মনে করিও না শুধু তোমার মধ্যে ও আমার মধ্যে নারায়ণের বিকাশ—সে অহঙ্কার একেবারে ছাড়িয়া দাও। যাহারা দেশের সারবস্তু যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, মাটী কর্ষণ করিয়া, আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে,—যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে দেশের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে—যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও দেশের ধর্ম্মকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—যাহারা আজিও শুদ্ধচিত্তে সরলপ্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে দেশের মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থণা করে—যাহারা জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া রাখিয়াছে—যাহারা বাস্তবিকই এদেশের একাধারে রক্ত মাংস ও প্রাণ—'উঠ, ডাক, জাগ'—তাঁহাদেরই মধ্যে "নর নারায়ণ" জাগ্রত হউক। এস নারায়ণ, এস নর-নারায়ণ—আমাদের হৃদয় প্রস্তুত কর।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জানিতেন কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা কোন জাতিকে গঠন করিয়া তোলা যায় না। তাই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে নেতারূপে নামিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের কৃষি ও বাণিজ্যের কি করিয়া উন্নতি সাধন করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তার ফল আজ আবার আমাদিগকে অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের লুপ্ত ব্যবসা বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে আমাদের—

(১) ইতিহাসের বাণী মনে রাখিতে হইবে।

(২) ইউরোপীয় Industrialismকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) বড় বড় সহরগুলা যে অজগর সর্পের মত পল্লীগ্রাম হইতে টানিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) পল্লীগ্রামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে, তাহার অস্বাস্থ্য দূর করিতে হইবে, কৃষক যাহাতে সুস্থ শরীরে বারমাস পরিশ্রম করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

(৫) কৃষক তাহার কৃষিকার্য্য ছাড়া যাহাতে নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৬) তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়াও কৃষকের ঘরে ঘরে কি কি শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাও দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৭) আমাদের দেশে যে সব শিল্পপণ্য প্রস্তুত হইত, তাহার অনুসন্ধান করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৮) এই সব শিল্পপণ্য লইয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কারবার দেশের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

(৯) যে সব পণ্য দ্রব্য আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহা রাখিয়া ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের অন্য সমুদয় পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে।

(১০) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে সহজে প্রস্তুত হয়, সেই সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা সহজ উপায়ে দিতে হইবে।

(১১) এইসব ছোট ছোট ব্যবসাগুলিকে ফলপ্রদ করিতে হইলে, তাহাদের টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, এবং সেইজন্য জেলায় জেলায় জেলাবাসীদের সাহায্যে ও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।"

আমাদের বড় দুর্ভাগ্য যে আজ যখন চিত্তরঞ্জন স্বয়ং পল্লী সংগঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছিলেন, যখন উল্লিখিত কার্য্য প্রণালীকে যথার্থভাবে সফল করিবার প্রয়াস তিনি পাইতেছিলেন, তখন আমরা তাঁহাকে হারাইলাম। তাঁহার আধুনিকতম রাজনৈতিক মতবাদের সহিত সকলের মিল না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার পল্লী সংগঠন কার্য্য যে দেশের মহৎ উপকার সাধন করিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশা করি তাঁহার প্রেরণায় আমরা তাঁহার আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিব—আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি কেবলমাত্র তাঁহার মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেই পর্য্যবসিত হইবে না। তাঁহার প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হইবে তখন, যখন আমরা তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধনে মনপ্রাণ উৎসর্গ করিব।

জালিয়ানবাগ ও খেলাফতের যে ব্যবস্থা সরকার বাহাদুর করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ কল্পে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। নাগপুর কংগ্রেস হইতে সত্যবদ্ধ হইয়া আসিয়া আমাদের চিত্তরঞ্জন দধীচির ন্যায় নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া দেশের হিতসাধনে ব্রতী হয়েন। তিনি তৎপরে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়া যখন পূর্ণ মাত্রায় অসহযোগ আন্দোলন চালাইতেছিলেন, তখন সরকার স্বেচ্ছাসেবকের গঠন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি এই ঘোষণাকে আইনের অন্যায্য ব্যবহার বলিয়া তীব্র প্রতিবাদ করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে দাশ মহাশয়কে আমেদাবাদের কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচন করা হয়। কিন্তু তিনি ১০ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার হওয়ায়, সভাপতিত্ব করিতে পারিলেন না। চিত্তরঞ্জন কারাগার হইতে মুক্ত হইবার পর দেশের মুকুটহীন সম্রাটরূপ অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে মহাত্মাজীর কার্য্য-পদ্ধতির সহিত তাঁহার কিছু মতবিরোধ হইল। তিনি কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া তাহা যে অচল তাহা প্রমাণ করিতে চাহিলেন। গান্ধীর সহিত মতানৈক্য লইয়া অনেকে তাঁহার উপর ঠাট্টা বিদ্রূপের বর্ষণ করিল। কিন্তু গুরুর সহিত শিষ্যের এই যে মতভেদ ইহা শিষ্যের কত বড় অসাধারণ প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন শক্তিশালী দল গঠন করিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ প্রবল দল গঠন করার চেষ্টা আর কেহ করেন নাই। তখন অনেকেই তাঁহাকে দুঃসাহসিক বলিয়াছিলেন। কিন্তু সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া চিত্তরঞ্জন কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্বরাজ্যদলকে গঠন করিবার জন্য তাঁহাকে কেবলমাত্র বাঙ্গলা দেশেই আন্দোলন করিতে হয় নাই। তখন সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি এমনভাবে ভ্রমণ করিয়া দল গঠন করিতে লাগিলেন যে আমাদের মনে হইল যে ভগবান যেরূপ রাসলীলায় কায় ব্যূহ রচনা করিয়া একই কালে ষোড়শ সহস্র গোপীর সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, তেমনি চিত্তরঞ্জন একাই এক কালে বিশাল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া নব প্রেরণা সঞ্চার করিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহার ব্যক্তিত্ব শক্তির প্রভাবের দ্বারা কংগ্রেসকে কাউন্সিলে প্রবেশের স্বপক্ষে আনিয়া নিজের অদ্ভুত কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া তিনি কি ভাবে দ্বৈত শাসনকে সংহার করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিয়াছেন তাহা সকলেরই স্মরণ আছে। বাঙ্গলা দেশে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী নেতা আর কখনও হয় নাই। কাউন্সিল ধ্বংসের পর তাঁহার সহিত কর্ত্তৃপক্ষের যে মিলনের প্রস্তাব চলিতেছিল, তাহাতে অনেকেই আশঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেকেন্দার শাহের ন্যায় উন্নত মস্তকে বিজয়ী বীরের ন্যায় জয়মাল্য পরিয়াই মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

সামাজিক জীবনে চিত্তরঞ্জন

মতামতের অপেক্ষা ব্যক্তিত্বের মূল্য অনেক বেশী। চিত্তরঞ্জন সত্যই সকলের চিত্তরঞ্জন ছিলেন। মনোহরণ করিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা তাঁহার ছিল বলিয়াই তিনি অত বড় নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। কোন কৌশলের দ্বারা নহে, ষড় যন্ত্রের দ্বারা নহে—কেবল মাত্র নিজস্ব ভাবের দ্বারা লোককে সম্মোহিত করিবার শক্তি তাঁহার ভিতরে ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যাঁহারা একমতাবলম্বী হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে

তাহাকে ব্যক্তিগত ভাবে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। শত্রু মিত্র সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিবার যাদুকরী শক্তি তাঁহার ছিল বলিয়াই আজ সমগ্র দেশের উপর তাঁহার মৃত্যুতে শোকের ঘন যবনিকা পড়িয়াছে। সরল স্বভাব সুন্দর চিত্তরঞ্জনের জন্য আক্ষেপ করিতেছে না, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে না, আজ সারা দেশ খুঁজিলেও এমন একটি লোক পাওয়া দুষ্কর হইবে।

মৃত্যু

"কর্ত্তব্য সাধন কিংবা শরীর পতন" ইহাই ছিল দেশবন্ধুর জীবনের মূলমন্ত্র। তাই তিনি স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেছিলেন—ক্লান্তি ও অবসাদে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বিশ্রাম করিতে পারেন নাই। তাহাতেই তিনি আজ বীরের মতন অস্ত্রবর্ম্মে সুসজ্জিত হইয়া রণ ক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

"অন্তর্য্যামীর" কবি চিত্তরঞ্জন কর্ম্মক্লান্ত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এস আমার আঁধার ঘেরা! এস ভয়হারী!
এস এস হৃদ্ মাঝারে হৃদয় বিহারী!
এস আমার আঁধার বুকে, এসো আলো করে!
এস আমার দুখের মাঝে সকল দুঃখ হরে!
এস আমার সকল প্রাণে ওগো প্রাণহরা!
এস আমার সকল অঙ্গে ওগো সোহাগ ভরা!
এস আমার প্রাণের মালা! এস মালাকর!
এস এই ঝড়ের মাঝে! এস বুকের পর!
এস আমার পরশ কালে এস হাসি হাসি!
আন তোমার মরণ হরা সব ভুলানো বাঁশী!

শ্রীভগবান তাঁহার এ প্রার্থণা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে আনন্দের মাধুর্য্যের অমৃতলোকে লইয়া গিয়াছেন।

দেশবন্ধু

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহিত দেশবন্ধুর কারামুক্তি কালীন অভিনন্দনাবলী এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। দেশবন্ধুর জীবনী ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক বক্তৃতাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে সচিত্র শিশিরে অমরবাবু আগামী সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে বাহির করিবেন।

স্থানাভাব বশতঃ দেশবন্ধু সম্বন্ধে অন্যান্য আরও অনেক প্রবন্ধ এবার প্রকাশ করা হইল না—আগামী সপ্তাহ হইতে সেগুলি প্রকাশ করা যাইবে।

স—সঃ শিশির

ষ্টেশন দৃশ্য

আলোক শিল্পী—শ্রীযুক্ত টি, পি, সেন।

অভিনন্দন

[ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন যখন জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন, তখন দেশবাসী তাঁহাকে যেভাবে ও যে ভাষায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, তাহা পুরাতন হইলেও পাঠক সাধারণের এখন মিষ্ট লাগিবে মনে করিয়া এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা

দেশবন্ধু যে কেন আজ আমাদের সকলের হৃদয় রাজ্য অধিকার করে আছেন—তাহা বোধ হয় আপনাদের কাছে বলিবার দরকার নেই। যখন পাঞ্জাবে বীভৎস, নৃশংস, হত্যাকাণ্ড অভিনীত হইলে পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি তাহার প্রকৃত তথ্য সাধারণের পক্ষ হইতে তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন তখন তাঁহারা সকলে সতৃষ্ণ নয়নে বাঙ্গালার দিকে চেয়েছিলেন তখন আমাদের দেশবন্ধু আর সুস্থির থাকতে পারেন নি; ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে তিনি পাঞ্জাবে গিয়ে হত্যা নিয়ে পড়লেন।

তারপর যখন রাজশক্তি অন্যায় করে ন্যায় নীতি ও আইন পদদলিত করে প্রজাশক্তিকে নিষ্পেষিত করিতেছিল; তখন আমরা ভাবিলাম—বাংলা কি সত্য সত্যই আজ জাহান্নামে গিয়েছে বাংলায় কি আজ একজনও নেতা পাওয়া যাবে না—তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 'মাভৈঃ' ধ্বনিতে আমাদের সকলকে অভয় প্রদান করিলেন। তখন যদি দেশবন্ধুকে আমাদের মধ্যে না পাওয়া যেতো, তা হলে বাংলার যে কি হতো তা বলা যায় না। দেশবন্ধুর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার শত শত যুবক আজ তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছে।

বন্ধু চিত্তরঞ্জন, তুমি আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি আজীবন ভোগ বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছো, দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করেছো, বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছ কিন্তু মায়ের আহ্বানে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল স্বার্থ ত্যাগ করে সর্ব্বস্ব মাতৃযজ্ঞে আহুতি দিয়েছ। তুমি আমাদের প্রিয় ধন—জগতে অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে—বিধাতা তখন তাই তোমাকে বললেন—তুমি আজ এস—তুমি এসে আমাদের মধ্যে দাঁড়ালে তাই বাঙ্গালী ও সমগ্র ভারতবাসী আজ পৃথিবীর কাছে উন্নতশির হয়ে রয়েছে।

ধন্য চিত্তরঞ্জন

তুমি আমাদের বড় আদরের তোমাকে আজ তোমার দেশবাসী এই অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতেছে। সাধারণের অনুমতিক্রমে আজ সকলের সম্মুখে আমি এই অভিনন্দন পত্র পাঠ করিতেছি।

(১)

শ্রদ্ধাস্পদ

দেশবন্ধু
চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের
শ্রীকরকমলে—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন!

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তি-পথ-যাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে সবিনয়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মা আমাদের আজ অবমানিতা, শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খল-ভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু, যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজও সে তেম্‌নি গোপনে শুধু তোমাদের জন্তই থাক্। কিন্তু, আর একদিন এই বাঙলা দেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাঙলার নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর বাণীটি নিরন্তর কাণ পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়ত, তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয়ত, কাহারও রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে তাহার মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তারপরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। যেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে সর্ব্বস্ব পণে তোমাকে পথের বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্য বিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্ব্ব-লোক-চক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্ত বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকে সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইয়া দিতে হইল—নান্তঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই ত তোমার ব্যথা! এই ত তোমার দান!

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না,—তাই, বাঙলা তোমাকে যখন 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় কোথাও লেশ মাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ, তাই ত আজ তোমার করতলে। তাই ত, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টি, গুজরাটী, যে যেখানে আছে সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানব-জাতির জন্ত অক্ষয় হইয়া রহিল। এম্‌নি করিয়াই মানব-জীবনের দেনা পাওনার পরিশোধ হয়, এম্‌নি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তি অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে, কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন, অবমানিত, উপদ্রুত, মানব-জাতি সর্ব্ব-দেশে, সর্ব্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া রহিবে। এবং কোন মতে কেবল মাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া এ সত্য কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবন-তত্ত্বের এই অমোঘ বাণী স্বদেশে-বিদেশে, দিকে-দিকে, উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেক দিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্ব্বের বড় গর্ব্ব বাঙালী তুমি; তাইত, সমস্ত বাঙলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছি,—আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ,—তুমি চিরজীবি হও! তুমি জয়যুক্ত হও!

তোমার গুণ-মুগ্ধ
স্বদেশবাসীগণ।

কলিকাতা,—৩রা ভাদ্র—১৩২৯ বঙ্গাব্দ।
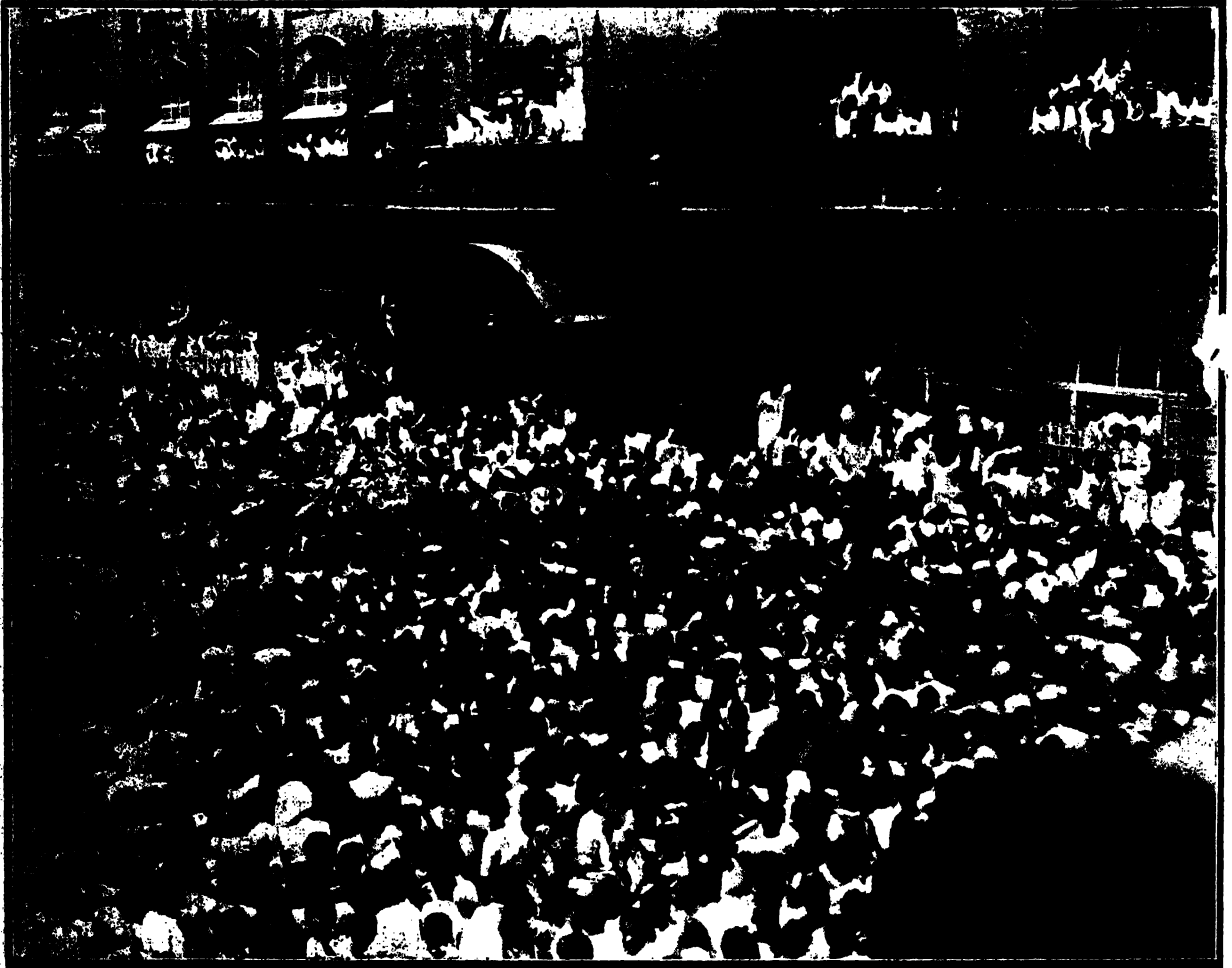
শ্মশান পথে

আলোক শিল্পী—শ্রীযুক্ত টি, পি, সেন।

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় করকমলে—

হে দেশের বন্ধু !

জাতীয় জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে যখন "পথ কোথায়" "পন্থা কোথায়" এই কাতর করুণ আকাঙ্ক্ষা দেশের প্রাণে জাগিয়া উঠিল তখন বিশ্বনিয়ন্তা তোমার সকল বন্ধন মোচন করিয়া মুক্তির দীপশিখা তোমারই হস্তে সঁপিয়া দিলেন। ত্যাগ সেবা ও প্রেমের মধ্য দিয়া চিরপুরাতন সত্য নূতন করিয়া দেশের চক্ষে ফুটাইয়া অস্পষ্ট অতীতের আদর্শে ভবিষ্যতের পথ উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার ভার আজ তোমার উপর পড়িয়াছে।

অনেক ঝঞ্ঝা বাত্যা ও পরীক্ষা অবহেলায় অতিক্রম করিয়া তুমি নবজীবনের পথে চলিয়াছ—চিরদিন এমনি করিয়াই চলিতে থাক, ইহাই অন্তরের প্রার্থনা।

আজ তুমি দেশের কাজে ফকির বেশে বাহির হইয়াছ—তাই তোমার নিরন্ন কাঙাল দেশবাসী তোমাকে তাহাদের ভাই বলিয়া তোমার ব্যথার ব্যথী হইয়াচ—তাই আজ আমরা তোমায় অভিনন্দিত করিতেছি।

আমরা ব্যবসায়ী। রাজনীতি বুঝি না—বুঝি শুধু দেশ ও দেশের ব্যথা—তাই আজ এই ব্যথার ব্যথী তোমায় পাইয়া হৃদয়ের চিরসঞ্চিত এই ব্যথার কথা নিবেদন করিলাম। মনে রাখিও আজ তোমার চিরকাঙাল ভাই বোন তোমার মুখ চাহিয়া আছে—এ দুর্দ্দিনে পথ দেখাও। ইতি—

মঙ্গলবার, ৫ই ভাদ্র ১৩২৯ সাল। } পোস্তা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

পরমশ্রদ্ধাভাজন

ভারত-জীবন দেশ-বন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস

মহাশয়ের শ্রীকরকমলেষু—

কলিকাতার ছাত্রবৃন্দের সবিনয় নিবেদন এই,

আপনি ছয়মাস কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া মুক্তি পাইয়াছেন তাই আজ আমরা আপনাকে শ্রদ্ধাভক্তির কুসুমাঞ্জলি দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

আমরা বালক, ছাত্র—আমরা সজীব আদর্শেই মুগ্ধ ও পরিচালিত হইয়া থাকি। আপনার জীবন নানাবিধ আদর্শের মুক্তাহার স্বরূপ; আপনি কর্ম্মজীবনে প্রবেশের পূর্ব্বেই পিতৃস্মৃতিকে অঋণী ও নিরাবিল করিয়া পুত্রত্বের পবিত্র আদর্শ ফুটাইয়াছিলেন। পিতার পুত্র হইতে না জানিলে, পুত্রের পিতাও ঠিকমত হওয়া যায় না। আপনি পিতার পুত্র হইয়াছেন, পিতৃঋণের ভার অনেকটা লাঘব করিয়াছেন, তাই আমরা আপনাকে শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ দিয়া অভিবাদন করিতেছি।

আপনি বিপন্নের সহায়, দরিদ্রের সম্বল, নির্ধনের ভরসা। যে দিন হইতে বিধাতা আপনাকে কর্ম্মসাফল্যের বৈজয়ন্তী পরাইয়া সংসার ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন, যে দিন হইতে আপনি উপার্জ্জনশীল গৃহস্থ হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই আপনি দরিদ্রের সহায়। কত ছাত্র যে আপনার সাহায্যে পরীক্ষার দক্ষিণা দিয়া পাশ করিতে পারিয়াছে, কত ছাত্র যে আপনার আনুকূল্যে অন্ন, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি পাইয়া বিদ্যা আরাধনা করিয়াছে তাহা এখন গনিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু আমরা ত তাহা ভুলিব না—ভুলিতে পারিও না। তাহার উপর দায়গ্রস্থ কত গৃহস্থ আপনার অনুকম্পায় দায়মুক্ত হইয়াছে—তাহাদের সংখ্যাও গনিয়া নির্ণয় করা চলে না। সে জন্যও আমরা আজ হেঁটমুণ্ডে আপনার সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

দেশভক্তি বলিলে কেবল যে দেশের মাটির প্রতি ভক্তি তাহাত বুঝায় না! দেশের নরনারী, গোষ্ঠী ব্যষ্টি, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন,—আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রতি একটা প্রগাঢ় দুশ্ছেদ্য মমত্ববোধই দেশ ভক্তির নামান্তর। ভাল হউক, মন্দ হউক, সুন্দর হউক, কুৎসিৎ হউক, প্রশংসার হউক বা নিন্দার হউক, আমার দেশের নরনারী আমার, আমার পরমাত্মীয় এই বোধে, নিজের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যিনি দেশ সেবা করিতে পারেন তিনিই মাতৃভক্ত, সুসন্তান। আপনি সে সুসন্তানের কাজ করিয়াছেন। অতি পরিশ্রমে উপার্জ্জিত আপনার সর্ব্বস্বই দেশের নরনারীর সেবায় প্রয়োগ করিয়াছেন। এত বড় আদর্শ—দেশ সেবার ও দেশ মাতৃকার অহেতুকী সেবার এমন বিমল আদর্শ, আমরা পূর্ব্বে আর দেখি নাই বা শুনি নাই, আজ পত্র পুষ্প তোয় লইয়া হৃদয়
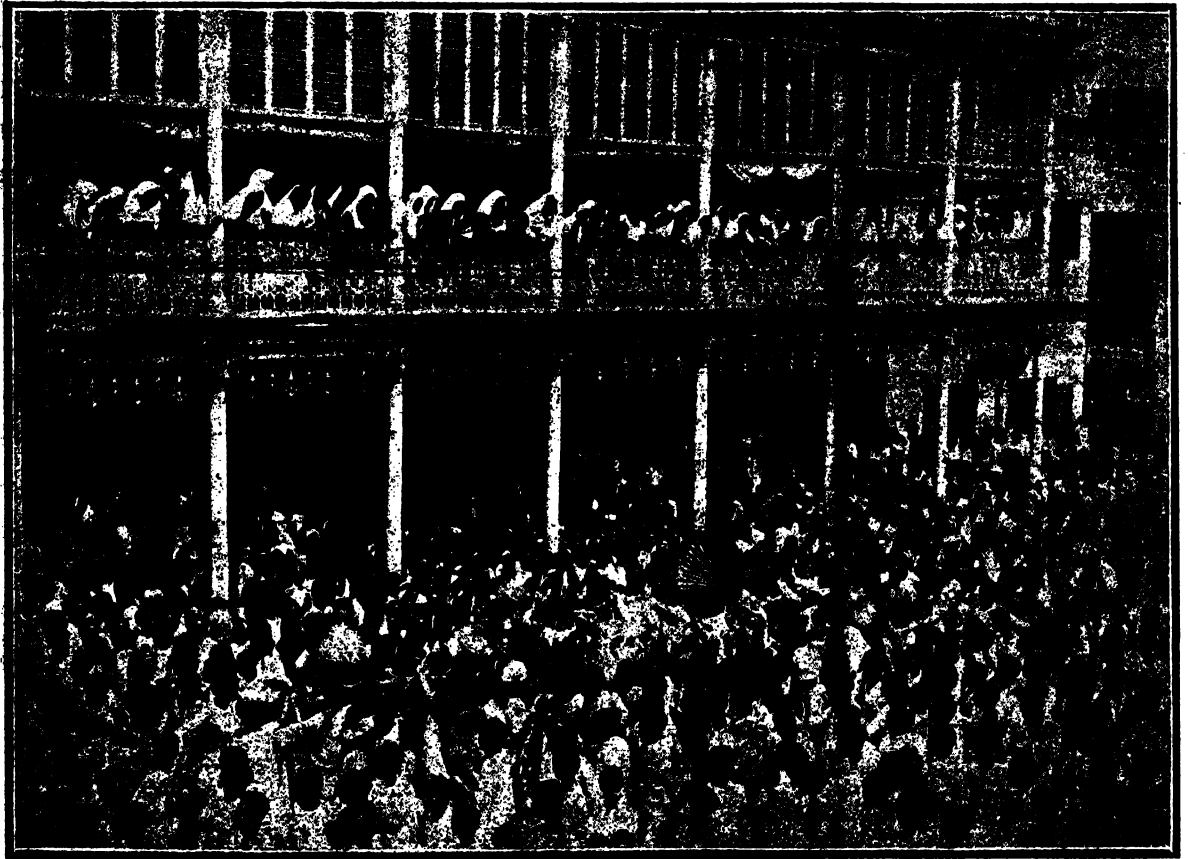
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্রের বাটির সম্মুখে

ভরা ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি লইয়া আপনার পূজা করিতে আমরা সমুপস্থিত! আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন কি? আমরা যাহা চাই, যাহা দেখিতে চাই, আপনি তাহাই। তাই আপনাকে আজ শ্রদ্ধার ডালি দিবার জন্য আপনার সম্মুখে আমরা সমুপস্থিত! আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন আপনার তুল্য হইতে পারি। আপনার পিতৃভক্তির, দেশ ভক্তির, দেশের নরনারীর প্রতি প্রগাঢ় মমত্বের আদর্শকে হৃদয়ে সজীব রাখিয়া আমরা যেন আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ এই বরই আপনার নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

বিনয়াবনত গুণমুগ্ধ
কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ।

দেশবন্ধুর সম্বর্দ্ধনায়

[শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল]

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ কর্ত্তারা যখন আমাকে ইহার সঙ্গে যোগ দিতে ডাকিলেন, তখন "না" বলিতে পারিলাম না। "না" বলিবার হেতুটা এই ছিল যে, কিছুকাল ধরিয়া আমি বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হইতে তফাৎ হইয়া আছি। নেতৃবর্গের সকল কর্ম্মের সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেছি না। কোনও কোনও দিক দিয়া তাঁহারা যে পথে যাইতেছেন, সে পথে ইষ্টলাভ হইবে, মনে করিতেছি না। এ জন্য তাঁহাদের নীতির ও কর্ম্মের, পলিসির ও প্রোগ্রামের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু এ সত্ত্বেও "না" বলিতে পারিলাম না, "না" বলা সঙ্গত বোধ হইল না। প্রথম কারণ—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় নিজে; দ্বিতীয় কারণ দেশের আসন্ন রাষ্ট্রীয় অবস্থা।

চিত্তরঞ্জনকে আজ চল্লিশ বৎসর জানি। এই চল্লিশ বৎসর তাঁহার পিতৃ-পিতৃব্যের সঙ্গে আমার বন্ধুতা। এই চল্লিশ বৎসর তাঁহাকে স্নেহ করিয়া আসিয়াছি, ভালবাসিয়া আসিয়াছি।

কুড়ি বৎসর কাল চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যথাসাধ্য দেশের সেবা করিয়া আসিয়াছি। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যেদিন "New India'র" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, সেদিন হইতে চিত্তরঞ্জন তাহার সঙ্গে অতি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। তার পর সতের বৎসর পূর্ব্বে "বন্দেমাতরমের" জন্ম হইলে, চিত্তরঞ্জন তাহার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এই কুড়ি বৎসর কাল কি ব্রাহ্মসমাজের কাজে, কি স্বদেশীর কাজে, কি সাহিত্য-চর্চ্চায় সকল কাজেই চিত্তরঞ্জনের সাহচর্য্য লাভ করিয়া আসিয়াছি। আমি যাহা পারিতাম না, চিত্তরঞ্জন তাহা করিয়া দিতেন। তিনি যাহা করিতেন না, করিবার অবসর পাইতেন না, আমি তাহা করিয়া দিতাম! এইরূপে বিশ বৎসরকাল দু'জনে দেশ-চর্য্যার এবং সত্য ও কল্যাণসাধনার একটা যৌথ কারবার গড়িয়া তুলিয়াছিলাম! এই দীর্ঘকালের স্নেহের, প্রীতির সহকর্ম্মিতার বন্ধন মতবাদের পার্থক্যে ছিড়িয়া যায় না।

আর আধুনিক মতবাদ বা কর্ম্মপদ্ধতির সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে একটা ভেদ জাগিয়াছে বা বিরোধ বাধিয়াছে বলিয়া, তাঁহার ত্যাগের মর্য্যাদাবোধ নষ্ট হয় নাই। সাধারণে সে ত্যাগের নিগূঢ় মর্ম্ম জানেন না ও বোঝেন না। তাহার সত্য মাপকাটি তাঁহাদের হাতে নাই। এ কেবল টাকার ত্যাগ নহে। চিত্তরঞ্জন টাকাটাকে কোনও দিন প্রাণ দিয়া ভাল-বাসেন নাই। তাঁর কাছে টাকার দাম টাকাতে ছিল না। অর্থের দ্বারা তিনি তাঁর হৃদয়ের পরার্থমুখী বৃত্তিগুলির যে তৃপ্তিসাধন করিতে পারিতেন, চিত্তরঞ্জনের নিকটে ইহাই অর্থের সত্য মূল্য ও মর্য্যাদা ছিল। টাকা জমাইয়া তিনি কোনও দিন ধনকুবের হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। অথবা ঐশ্বর্য্য বিস্তারের দ্বারা বিধাতা তাঁহাকে যে প্রচুর

অর্থ উপার্জ্জনের শক্তি ও সুযোগ দিয়াছিলেন তাহার অমর্য্যাদা করিতে চাহেন নাই। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের অভাব মোচন দরিদ্রের সংসারভার লঘু এবং দেশহিতকর ও জনহিতকর কর্ম্মে শক্তিসমাধান করিবার জন্যই নিজের উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া কৃতার্থ হইতেন। তাঁহার ত্যাগ টাকার মায়া ছাড়া নহে। উপার্জ্জনের পথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তরঞ্জন তাঁহার উদার হৃদয়-বৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তির পথ বন্ধ করিলেন। এ ত্যাগের মূল্য টাকা আনা পাই দিয়া কষিতে পারা যায় না। হৃদয়ের এবং আত্মার পরার্থমুখীন ভাগবতী বৃত্তি সকলের কষ্টিপাথরেই ইহার মূল্য কষিতে হয়। এ ত্যাগ বড় ত্যাগ। মতভেদ ও মতবিরোধে এ ত্যাগের মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। আজিকার এই অনুষ্ঠান সেই মহিমাই ঘোষণা করিতেছে।

"তারপর চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে মত লইয়া বা পথ লইয়া যাহাই ভেদবিরোধ হউক না কেন, এ কথা অস্বীকার করিতে পারিনা যে, চিত্তরঞ্জন আমাদের মধ্যে একজন সরল ও নিষ্ঠাবান স্বরাজ-সাধক। স্বরাজই চিত্তরঞ্জনের স্থিরলক্ষ্য হইয়া আছে। এই স্বরাজের লোভেই তিনি এত বড় ত্যাগ করিয়াছেন। সত্বর এই স্বরাজ লাভের আশাতেই তিনি এক নূতন পথ ধরিয়াছেন; অথবা নূতন পথই বা বলিব কেন? এ পথ ত চিত্তরঞ্জনের নিকটে কিম্বা বাঙ্গালার নিকটে নূতন পথ নহে। ইহা আমাদের সেই পরিচিত পুরাতন পথেরই একটু ঘোরফের মাত্র। আমরা একদিন বর্ত্তমান বিদেশী আমলাতন্ত্রকে পঙ্গু করিবার জন্য নিরস্ত্র প্রতিরোধের বা Passive Resistance'র পথ ধরিয়াছিলাম বর্ত্তমানের নিরুপদ্রব অসহযোগ নীতিও সেই উদ্দেশ্যে সেই পথই ধরিয়াছে। আমাদের পথে যাত্রী ছিল মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী, মারাঠী ও মান্দ্রাজী। আজিকার পথ বহু-যাত্রীতে লোকাকীর্ণ। স্বরাজকে লক্ষ্য করিয়াই চিত্তরঞ্জন এই যাত্রীর বহরের মাঝখানে পড়িয়া তাহাদিগকে লক্ষ্যমুখে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বরাজ তাঁহার উপলক্ষ্য নহে। আর যতদিন এই স্বরাজ তাঁর মুখ্য লক্ষ্য থাকিবে, ততদিন শত মতভেদ সত্ত্বেও দেশের সকল স্বরাজপন্থীকেই চিত্তরঞ্জনের সাধনার সমর্থন করিতে হইবে।

জীবের চরম সাধ্য যে মুক্তি, তার পথ বা সাধন যেমন এক নহে বহু, অসংখ্য, সেইরূপ কোনও জাতির রাষ্ট্রীয় মুক্তির সাধন-পথও কখনও এক হইতে পারে না,—সে পথের বহু শাখা, বহু আকার প্রকার আছে। কোনও পথ সোজা, কোনটা বা বাঁকা, কোনও পথে বাধাবিঘ্ন অল্প, কোনও পথে বা বেশী। আর প্রকৃতিভেদে, শিক্ষাভেদে, নানালোকে ঐসকল নানাপথ ধরিবেই ধরিবে। এ সকল ভেদ-বৈষম্য অনিবার্য্য। কিন্তু লক্ষ্য যতক্ষণ ঠিক থাকে, ততক্ষণ পথের কথা লইয়া যতই বাদ্‌বিচার করি না কেন, কেহ কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারি না। লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, চিত্ত যদি নির্ম্মল হয়, ভক্তি যদি অনাবিল থাকে, ত্যাগ যদি সত্য হয়, আর সেই ত্যাগের প্রভাবে দেশে যদি অপরাজেয়া শক্তি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মতের ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও প্রত্যেক সাধকেই অপর স্বরাজ সাধকের মর্য্যাদা করিতে হইবে। এ মর্য্যাদাবোধ যেখানে নাই, সেখানে সাধ্যের সত্য স্বরূপ কখনও প্রকট হয় নাই, সাধনা এখনও শুদ্ধ হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। চিত্তরঞ্জন সরল নিষ্ঠাবান স্বরাজ সাধক বলিয়াই তাঁর এই সম্বর্দ্ধনার সামিল থাকিবার ডাক যখন আসিল তখন "না" বলিতে পারিলাম না।

আর শেষ কথা—"না" বলিতে পারিলাম না দেশের আসন্ন অবস্থা দেখিয়া। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন এই দুই বৎসরকাল যে পথে চলিয়াছে তাহা আমার নিকটে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই। এইজন্য ইহার সঙ্গে যোগ-রক্ষা সম্ভব হয় নাই। এ পদ্ধতির পরিবর্ত্তন নিতান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখনও এই পদ্ধতিকে সমীচীন বলিয়া বুঝি না ও স্বীকার করি না। কিন্তু এই আন্দোলন সহসা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া স্বরাজ-সাধনার পথে চারিদিকে যে নূতন বিভীষিকা জাগিয়া উঠিতেছে, ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই দুই বৎসরকাল ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের প্রকোপে ও প্রতাপে তটস্থ হইয়া পড়িতে-ছিলেন। দেশের নবজাগ্রত শক্তি স্পন্দন দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এই বিপ্লব-তরঙ্গে রোধিবে কে, এই ভাবনায় তাঁহারা কতকটা আত্মস্থ হইবার

চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু আজ সে আশঙ্কা আপাততঃ নিরস্ত হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহারা পুনরায় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। যুদ্ধের মাঝখানে ভারতের যে সঙ্গীন্ অবস্থা দেখিয়া আত্মস্বার্থের প্রেরণায় ব্রিটীশ মন্ত্রিসমাজ ও ব্রিটীশ পার্ল্লামেণ্ট ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে নূতন নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলন ফাঁসিয়া গেল ভাবিয়া এখন তাহার প্রত্যাহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যে অবস্থা দেখিয়া সম্রাট স্বয়ং স্বরাজকে ভারতে ব্রিটীশনীতির লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থার হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আজ ভারত যে কখনও স্বাধীনতা বা স্বরাজ পাইতে পারে এ কথাটা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা এই দেড় বৎসরকাল নিরুপদ্রব অসহযোগের উদ্যত-দণ্ড দেখিয়া মাথা নোয়াইয়াছিলেন, আজ সে দণ্ডের ভয় তাঁহাদের আর নাই; সুতরাং আবার তাঁহারা মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছেন। রাজার শাসন ভয়ে যেমন প্রজা সংযত থাকে, প্রজার তীব্র অসন্তোষের ভয়ে সেইরূপ রাজার নীতিও সুপথে পরিচালিত হয়। এই ভয় আজ কাটিয়াছে, ব্রিটীশ ভারতের শাসন-নীতি আবার উগ্র ও উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। এই ত আজিকার অবস্থা।

এই অবস্থায় স্বরাজ-সাধনে শিথিল হইলে চলিবে না। এ অবস্থায় স্বরাজপন্থীদের আত্মকলহে দুর্ব্বল বা ছত্রভঙ্গ হইলে চলিবে না। এ অবস্থায় এমন নীতি অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার মধ্যে সকল দলের স্বরাজপন্থীদিগের পথভেদের ও মত বিরোধের একটা সমীচীন সমন্বয় হইয়া সকলকে একসূত্রে বাঁধিতে পারিবে। এ অবস্থায় স্বরাজপন্থীরা যদি দুর্ব্বল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে আমরা যে বিপ্লবকে ঠেকাইয়া শান্তিতে স্বরাজ করিতে চাই, সে আশা বিফল হইবে এবং সেই শোণিত লোলুপ বিপ্লবকেই ডাকিয়া আনা হইবে। স্বরাজকে ঠেকাইয়া রাখা অসাধ্য। স্বরাজ আমরা পাইবই পাইব—আজ না হয় কাল! কিন্তু গুরুতর কথা—এই স্বরাজ নিরুপদ্রবে বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে মাঝখানে দেশব্যাপী অরাজকতা না আনিয়া পাইব—না দুনিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র যে শোণিত-প্লাবনের ভিতর দিয়া পরাধীনজাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, আমাদিগকেও সেই শোণিত-সাগরই মন্থন করিতে হইবে? আমরা ইহা চাই না বলিয়াই ত এযাবৎকাল ধরিয়া এত কান্নাকাটি করিয়াছি। কান্নাকাটিতে স্বরাজলাভ অসম্ভব দেখিয়া নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথ ধরিয়াছি! এই উপদ্রবের হাত হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্যই এই দেড় বৎসর কাল নিরুপদ্রব অসহযোগ-নীতি অবলম্বিত হইয়াছে—এখনও ভারতের স্বরাজ-পন্থীকে শোণিতাক্ত বিপ্লবের পথ পরিহার করিয়াই চলিতে হইবে। কারণ এ পথে সহজে ও সত্বর স্বরাজ কিছুতেই মিলিবে না। আমরা বলিয়াছি, নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথেই হউক, সেই পথে—যে পথে আশু স্বরাজ মিলিবে; যে পথের মাঝখানে অরাজকতার বিভীষিকা নাই; আর এক শৃঙ্খল মোচন করিয়া অন্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবারও [illegible] নাই। আমরা চাই, শান্তির পথে সিদ্ধিলাভ করিতে। শান্তির প্রতিষ্ঠা হয় শক্তিতে—দুর্ব্বলতার উপর নহে। শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় সংহতিতে, বিচ্ছিন্নতার উপর নহে। এখন যে আসন্ন অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে আমরা স্বরাজ সাধিলে কোনও মন্ত্র কোনও তন্ত্র কোনও পথই একেবারে বর্জ্জন বা বন্ধ করিতে পারি না। স্বরাজের সংগ্রামে কোনও অস্ত্রই পরিত্যাগ করিতে পারি না। স্বরাজের ভিন্ন ভিন্ন সাধকদলকে নিজ নিজ সাধনপথে চলিয়াও এখন পরস্পরের সঙ্গে ব্যূহবদ্ধ হইতে হইবে। কেহ বা সহযোগের পথেই আমলাতন্ত্রের শক্তি হরণ করিবে, কেহ বা অসহযোগের পথে তাহাদের শক্তি রোধ করিবে। কেহ বা সন্ধির পথে যাইয়া বিপক্ষের সঙ্গে রফার চেষ্টা করিবে, কেহ বা অশান্তির বিভীষিকা যাগাইয়াই বিপক্ষের মতিকে আক্ষেপের দিকে সবেগে ঠেলিয়া দিবে। কেবল সকলকেই ইহা দেখিতে হইবে, তাঁহাদের কর্ম্ম যেন সমাজের শান্তি নষ্ট না করে, অপরের স্বাধীনতা হরণ না করে এবং কোনও প্রকারে এমন উপদ্রব না ঘটায় যাহার অছিলায় প্রবল পরাক্রান্ত আমলাতন্ত্র আমাদের এই নবজাগরণ ও নবজীবনকে একেবারে পিষিয়া মারিতে পারে। এক কথায় যে যে পথেই চলুক না কেন, তাহাকে নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা নিরুপদ্রব অসহযোগের গণ্ডীর ভিতরে থাকিতেই হইবে।

চিত্তরঞ্জন এই দেড় বৎসর যে পথে চলিয়াছেন তাহা আমার পথ নহে। কিন্তু লক্ষ্য যতদিন তাঁর স্বরাজ থাকিবে,

ততদিন তাঁহার পথের অনুবর্ত্তন না করিতে পারিলেও তিনি সিদ্ধিলাভ করুন, বিধাতার নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিব। সে সিদ্ধিতে কেবল তিনি নিজেই মুক্ত হইবেন এমন নহে। তাঁর সাধনার সিদ্ধিতে দেশ স্বাধীন হইবে। আমার পথে আমি চলি, প্রার্থনা করিও লক্ষ্যটা যেন স্থির থাকে। তোমার পথে চলিবার সামর্থ্য বিধাতা তোমাকে দিন। তাঁহার কৃপায় হৃদয়ে নির্ম্মল ভক্তি, অন্তরে জলন্ত উৎসাহ, মনে স্বচ্ছ দৃষ্টি, শরীরে বীর্য্য লাভ করা। আমার পথে—এখানে যে ক'দিন বাকী আছে স্থিরপদে চলিবার শক্তি বিধাতা আমাকে দিন। পথ যখন ফুরাইবে তখন সকলে স্বাধীনতার সূর্য্যকিরণ মণ্ডিত মায়ের মন্দিরে মিলিয়া নিজেদের সাধনের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করিব।

ভবানীপুর, রবিবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩২৯।

শ্মশানে

চোর

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(১)

রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। কলিকাতা মহানগরীর কর্ম্মকোলাহল-মুখর পল্লীগুলি এখন নিস্তব্ধ। যে সকল রাজ-পথে বাজার দোকান থিয়েটার বায়োস্কোপ ইত্যাদি আছে কেবল তথায়ই যেন এখনও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় নাই। তেমনি আলো জ্বলিতেছে, লোকজন চলিতেছে, পথের ধারে সাজিয়া গুজিয়া পানওয়ালীরা পান বিক্রয় করিতেছে, বেলফুল ওয়ালা-হাঁকিতেছে, গাড়ী, ঘোড়া, মটর এবং রিক্সর ভিড় লাগিয়া আছে। দুই একটা কদর্য্য পল্লীতে কোথাও মাতালেরা প্রলাপ, কোথাও নৃত্য গীত, কোথাও বা নারীকণ্ঠে সপ্তম স্বরে অশ্রাব্য ভাষায় কলহের ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে।

দুর্গাদাস সোনাগাছির ভিতর দিয়া একাকী টলিতে টলিতে চলিতেছিলেন। চুল রুক্ষ, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবীর খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই কশ বাহিয়া পানের লাল ঝরিতেছে, কোঁচান ধুতিখানা কোন প্রকারে কোমরে জড়ানো আছে - দেখিলে লোকটা যে বদ্ধ মাতাল, সারা দিন মদ গিলিয়া এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। রাস্তার মাঝ খানে দুইটা পাহারাওয়ালা একসঙ্গে দাঁড়াইয়া খৈনি খাইতেছিল, গল্প করিতেছিল কচিৎ বা গুন গুন করিয়া রামভজন গাহিতেছিল এবং মাঝে মাঝে লাওয়ারেশ গাড়োয়ান ও রিক্সওয়ালা গুলোকে অকারণে প্রাণ ভরিয়া গালি পাড়িতেছিল। দুর্গাদাসকে আসিতে দেখিয়া তাহারা পরস্পরে একটু টিপা-টিপি করিল, তারপর শিকার জুটিয়াছে ভাবিয়া পরম উৎফুল্ল ভাবে তাহাকে ধরিবার জন্য গজেন্দ্র গমনে অগ্রসর হইয়া গেল। দুর্গাদাস কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, জামার বোতাম গুলি খোলাই ছিল তাহারা সম্মুখে আসিলে অনবধানে জামার বুকটা একটু উলটাইয়া ধরিলেন, তাহারা যেন হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে সহসা একটা কেউটে সাপ দেখিয়াছে এমনি ভাব করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। দুর্গাদাস আরও একটু অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন এমন সময় তাহার সম্মুখের সরু গলিটা হইতে একটা লোক বাহির হইয়া আসিল। গলির মোড়ের গ্যাসের আলোটা দুর্গাদাসের উপর পূর্ণ মাত্রায় পড়িয়াছিল আর আগন্তুক লোকটা গ্যাসের ঠিক নীচে যেখানটায় একটু অন্ধকার সেইখানে আসিয় পৌঁছিয়াছিল। লোকটা দুর্গাদাসের চেহারা, চলন, তাঁহার হীরার আংটি সোণার বোতাম, এবং সোণার রিষ্টওয়াচ এক নজরে দেখিয়া লইল। দুর্গাদাস সহসা টাল খাইয়া পড়িতে পড়িতে কোন প্রকারে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং চারিদিকে চাহিয়া রাস্তাটা মনে মনে ঠিক করিয়া লইলেন। তখন আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মাথায় কি খেয়াল গেল, তিনি গ্যাসের নীচ হইতে লোকটাকে ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে টানিতে আলোর মাঝখানে আনিয়া দাঁড় করাইলেন। লোকটা এ রকম একটা ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিল না, একটু যেন হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া রহিল। ঠিক এই সময়টুকুর মধ্যে দুর্গাদাস ও তাহার মুখখানা এমন ভাবে দেখিয়া লইলেন যেন ওরূপ একটা আশ্চর্য্য জিনিষ তিনি ইতঃপূর্ব্বে কোথাও দেখেন নাই।

আগন্তুকের আকার প্রকার দেখিলে সকলেরই প্রাণে দয়ার উদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা। মুখখানি পর্য্যাপ্ত আহার অভাবে শুকাইয়া গিয়াছে, কাপড় চোপড়ের অবস্থা শোচনীয়, জুতা জোড়াটা ততোধিক। বোধ হয় আট দশদিন দাড়ি কামান হয় নাই। ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় সে ভদ্রবংশ-সম্ভূত এবং এককালে সুশ্রী ছিল।

দুর্গাদাস সোহাগে গলিয়া গিয়া লোকটার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি কে ভাই? এ রকম লক্ষ্মীছাড়ার মত একলা ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? আমার মতন তোমার বন্ধুরাও কি টাকা পয়সাগুলো সব 'Thank you' করে সরে পড়েছে?"

আগন্তুক সংযত কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পার্চ্ছি না। পথ ছাড়ুন—আমায় যেতে দিন।"

দুর্গাদাস। আচ্ছা বুঝতে হবে না। আপাততঃ একটা সিগারেট খাবে? এই নাও। বলিয়া পকেট হইতে সোণার সিগারেট কেস্‌টা বাহির করিয়া আগন্তুকের সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন।

আগন্তুক একটু ইতস্ততঃ করিয়া একটা সিগারেট তুলিয়া লইল, পার্শ্বের দেয়ালে ঝুলান পানওয়ালার জ্বলন্ত দড়িটা হইতে উহা ধরাইয়া গোটাদুই টান দিয়া একটু কাশিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"মহাশয় একটা কথা বলিব কিছু মনে করিবেন না তো?"

দুর্গাদাস। কিছু না; কিঞ্চিন্মাত্রও না। কি বলিবে বল।

আগন্তুক। এই বিশেষ কিছু না। তবে বলছিলেম কি, আপনি যেরূপ মাতাল হয়েছেন আপনার উচিত অবিলম্বে একখানি গাড়ী করিয়া কাহারও সহিত বাড়ী ফিরে যাওয়া! একাকী এ রকম রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন না - বিশেষ এ রাস্তায়। তাতে বিপদের বিশেষ সম্ভাবনা। এই ধরুন আমিই যদি আপনার সোণার সিগারেট কেসটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে পালাতুম তাহলে আপনি কি করতেন?

দুর্গাদাস। কি আর করতুম, ওটা তোমায় দিয়ে দিতুম আর কি।

আগন্তুক অবাক হইয়া দুর্গাদাসের মুখপানে চাহিল।

দুর্গাদাস। আর সঙ্গে করে কেই বা বাড়ী পৌঁছে দেবে? যাদের সঙ্গে এ পাড়ায় এসেছিলাম সেই সব বন্ধুদের লাথি মেরে দূর করে দিয়েছি। আপাততঃ আর কেউ নাই, শুধু তুমি আছ। তোমার সঙ্গে নূতন চেনা, নূতন বন্ধুত্ব, নূতন ভাব। তুমি কি আর অতটা কষ্ট করবে আমার জন্যে?

আগন্তুক পূর্ণ একমিনিট কাল চিন্তা করিল, তারপর দুর্গাদাসের মুখের উপর তাহার কোটরগত চক্ষু দুটির পূর্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এতটা বিশ্বাস করিবারই বা আপনার কি কারণ আছে? আপনি ত দেখছি নিতান্ত অসহায়। আমিই যদি আপনার আংটি, ঘড়ি বোতাম টোতাম গুলো খুলে নিয়ে পালাই তাহলে আপনি কি করতে পারেন?

দুর্গাদাস। আমি তোমাকে বিশ্বাস করব, আমার খুসী। তুমি যাবে কি না বল?

আগন্তুক। বেশ চলুন যাচ্ছি। একখানা ট্যাক্সি ডাকব কি?

দুর্গাদাস। কিছু দরকার নাই। এই গলি দিয়ে বড় রাস্তায় বেরুলেই আমার বাসা। আমি কলিকাতার লোক নই। মাঝে মাঝে দুচার দিনের জন্য আসি মাত্র। আমার বাসায় মেয়েছেলে কেউ নাই। নীচে চাকর বাকর দরোয়ানরা থাকে—উপরে আমি একাই থাকি। তুমি নিঃসঙ্কোচে চল। চাই কি, তুমি ইচ্ছা করলে আজ রাত্রিটা আমার ওখানে কাটিয়েও যেতে পার।

দুই জনে গলির পথে অগ্রসর হইয়া গেল।

(২)

বিডন ষ্ট্রীটের উপর একখানি অনতি বৃহৎ দ্বিতল বাটী। বাটীতে দুইটি মহল, অন্দর ও সদর। উভয় মহলের ভিতর যাতায়াতের পথ আছে, উহা বন্ধ থাকে। রাস্তা হইতে সদর ও অন্দর মহলে প্রবেশ করিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন দুইটি মহল পৃথক পৃথক ভাবে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। এইটী দুর্গাদাসের বাটী।

দুর্গাদাস ও আগন্তুক বাহির মহলের প্রবেশ দ্বারে কড়া নাড়িতেই একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ভিতরে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলিতেছিল। প্রবেশ-পথের সম্মুখেই উপরে উঠিবার সিঁড়ি। উভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেল, ভৃত্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া আলোর সুইচ্ টিপিয়া দিল। উপরে সারি সারি তিন খানি ঘর, সম্মুখে বারাণ্ডা, তারপরে খোলা ছাদ। ঘরের মেঝে ও বারাণ্ডা মারবেল বাঁধান। ছাদে টবে গোটাকত ফুলের গাছ ছিল, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছিল, বাতাসে গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। ভৃত্য এক পার্শ্বের কক্ষের দ্বার খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, উভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। আগন্তুক দেখিল ঘরখানি উত্তম রূপে সাজান, আসবাবপত্র মূল্যবান, দেওয়ালে কয়েক

খানি মূল্যবান ছবি। কক্ষের এক পার্শ্বে টিপয়ের উপর একটি অনতি বৃহৎ বিলাতী ঘড়ি যাহার মূল্য অন্যূন তিন চারিশত টাকা। এক কোণে আর একখানি টিপয়ের উপর একটি টেলিফোন যন্ত্র। একপার্শ্বে একটি শয্যা। অপর পার্শ্বে একখানি লিখিবার টেবিল, তাহার উপর দোয়াতদান, তাহাতে দুইটি সোণা বাঁধান ফাউন্টেন পেন। দোয়াত-দানের পার্শ্বেই একটি মখমলের কেসে একটি মূল্যবান সোণার ঘড়ি, তাহাতে মোটা একছড়া চেন লাগান আছে। গৃহমধ্যে কয়েকখানি গদিমোড়া চেয়ার ও একখানি ইজি চেয়ার। দুর্গাদাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই এক টান মারিয়া গায়ের আদ্ধির পাঞ্জাবিটা ছিঁড়িয়া খুলিয়া ফেলিলেন, তারপর উহা তাল পাকাইয়া ভৃত্যের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিলেন। পুরাতন ভৃত্য আকার ইঙ্গিতে প্রভুর মনোভাব বুঝিতে পারিল। সে জামা হইতে সোণার বোতামগুলি খুলিয়া টেবলের উপর রাখিল। জামাটা নিজের কাঁধের উপর ফেলিয়া রাখিল।

দুর্গাদাস স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভৃত্য বলিল "গোসলখানায় সব ঠিক আছে আলো জ্বেলে দিচ্ছি।"

দুর্গাদাস আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নান করিবে ভাই ?" আগন্তুক মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

দুর্গাদাস। তুমি তাহ'লে বোস ভাই, আমি স্নানটা সেরে আসি। দেখো, না বলে চলে যেওনা যেন।

আগন্তুক মাথা নাড়িয়া জানাইল সে যাইবে না।

দুর্গাদাস স্নান সারিয়া আসিলে আগন্তুক বলিল "আমি তাহলে আসি ?"

দুর্গাদাস। খেয়ে যাও না। খাবার আমার একার জন্যই আছে বটে কিন্তু তাতে দু'জনার বেশ হবে।

আগন্তুক কোন উত্তর দিল না, মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দুর্গাদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল ?" আগন্তুক মুখ তুলিয়া বলিল, "না আমি যাই।"

দুর্গাদাস। না তা হবে না। তোমায় না খাইয়ে আমি ছেড়ে দেব না।

ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে খাবার দু'ভাগ করে নিয়ে আসিস, বাবুটি এখানে খাবেন।"

আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে দুর্গাদাস বলিলেন, "কি জানি কেন বলতে পারি না ভাই, তোমায় আমার বড্ড ভাল লেগেছে। তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিত হ'য়েও আজ আমার যথেষ্ট উপকার করেছ। আমার বিশেষ ইচ্ছা আমিও তোমার কিছু প্রত্যুপকার করি। আমাদ্বারা যদি তোমার কোন কাজ হয় নিঃসঙ্কোচে বল, আমি সানন্দে তা করব।

বলা বাহুল্য দুর্গাদাসের মুখ হইতে তখনও একটু একটু মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। কথাগুলিও জড়াইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান টন্‌টনে ছিল।

আগন্তুক উঠিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল। যেন এখান হইতে বাহির হইতে পারিলেই সে বাঁচে। সে বলিল, "আমার উপকার!" তাহার ঠোঁটের কোণে একটু কুটিল হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তারপর দৃঢ়ভাবে বলিল, "না আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। আমি তাহ'লে এখন আসি" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দুর্গাদাস। আহা ব'স না। রাত্রি অনেক হয়েছে। আজ আর কোথায় যাবে ? আজ এইখানেই ঘুমোও, কাল সকালেই চলে যেও। তাতে বিশেষ অসুবিধে হবে কি ?

আগন্তুক। অসুবিধে আর এমন কি ? তবে—

দুর্গাদাস। ওর আর তবে নেই। আজ রাত্রে আর যায় না।

আগন্তুক পুনরায় উপবেশন করিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল "দেখুন আপনাকে একটা কথা বলছি। আপনি যদিও মদ খেয়েছেন কিন্তু আপনার মাথা ঠিক আছে। আমার কথা বুঝতে বোধ হয় আপনার কষ্ট হবে না। আপনি আমায় এখানে থাকতে বলছেন কিন্তু আমার তা সাহস হচ্ছে না।"

দুর্গাদাস। কেন ?

আগন্তুক। যেহেতু আপনার এখানে ঘড়ি, আংটি, বোতাম প্রভৃতি এত মূল্যবান জিনিষ চারিধারে ছড়ান রয়েছে। দেরাজটা যদিও বন্ধ ছিল, আপনি গোছা শুদ্ধ চাবি তাতে লাগিয়ে রেখেছেন। অনুমান করি আপনার Safeএর চাবিও ওর সঙ্গে আছে। আমি গরীব, নিতান্ত গরীব,—যদি কিছু খোয়া যায়, আমি চুরির দায়ে ধরা পড়ব।

দুর্গাদাস। খোয়া যাবে কেন ?

আগন্তুক। কেন ? তবে শুনুন। আমি আজ রাত্রিতে কেন বেরিয়েছিলাম জানেন ?

দুর্গাদাস। বলই না শুনি।

আগন্তুক। চুরি করতে।

দুর্গাদাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপর আগন্তুকের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন হে ? এরূপ পুণ্য কার্য্যে তোমার মতি হ'ল কেন ?

আগন্তুক। পেটের জ্বালায়। পেটের ক্ষিদে যে কি ভয়ানক জিনিষ তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তার উপর আমি একা নই, ঘরে স্ত্রী এবং দুইটি শিশু সন্তান আছে। আপনি কি অনুমান করতে পারেন যে কাল সকালে বেলা দশটার সময় আমরা চারিটি প্রাণী, ভগবানের জীব, নামমাত্র এক এক মুঠো উদরস্থ করেছিলাম, তারপর আজ সারাদিন আর কিছু জোটে নাই। আমি আপনার দয়ায় উপাদেয় খাদ্য আহার করেছি। কিন্তু তারা এখনও অভুক্ত আছে। ক্ষুধায় বোধ হয় মানুষকে পশুরও অধম করে ফেলে, তাই আমি খেতে পেরেছি নইলে পারতাম না।

দুর্গাদাস। চাকরি বাকরি করনা কেন ? তুমি ভদ্র সন্তান, লেখাপড়াও কিঞ্চিৎ জান বলে বোধ হচ্ছে।

আগন্তুক। বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন ফল হয় নাই। আজ দেড় বছর চাকুরি গিয়েছে এর মধ্যে যে কত লোকের খোসামোদ করেছি, হাতে পায়ে ধরেছি, তা গুণে বলতে পারি না। যার মুরুব্বি নাই, বড়বাবুকে পান খেতে দেবার মত যৎকিঞ্চিৎ দেবার যার সঙ্গতি নাই, এমন কি জামা কাপড়ে বড়মানুষি দেখাবার ক্ষমতাও যার নাই তাকে কে চাকুরী দেবে ? কেন দেবে ? কি ভরসায়ই বা দেবে ? তার উপর আমি আবার জেল ফেরৎ।

দুর্গাদাস ইজি চেয়ারের উপর অর্দ্ধশায়িত ভাবে পড়িয়াছিলেন, উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেলে গিয়াছিলে কেন ?"

আগন্তুক। সপরিবারে দুইদিন উপবাসের পর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট হইতে নিমন্ত্রণে যাইবার নাম করিয়া তাঁহার ঘড়িটি চাহিয়া আনিয়া বাঁধা দিয়াছিলাম।

দুর্গাদাস। বল কি হে এমন বন্ধু! এমন অবস্থায় সাহায্য না ক'রে উল্টে জেলে পাঠিয়ে দিলে!

আগন্তুক। ছয়মাস সশ্রম।

দুর্গাদাস। জেল থেকে কতদিন বেরিয়েছ ?

আগন্তুক। প্রায় ছয় মাস হবে।

দুর্গাদাস। যাক্ গে। সে যা হবার তা হয়ে গেছে। আপাততঃ তুমি যদি চাকুরী করিতে চাও, আমি তোমাকে একটি চাকুরি দিতে পারি। আমার এক বন্ধু মফঃস্বলের জমীদার, আমার কাছে একটী লোক চেয়েছেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী হবার জন্য। বেতন আপাততঃ পঁচাত্তর টাকা। তিনি বাসা দেবেন, বাড়ী ভাড়া লাগবে না। তুমি পারবে ?

আগন্তুক। অবশ্যই পারব। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে এইসব জেনে শুনেও আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন।

দুর্গাদাস। আমি তো গোড়াতেই বললুম তোমাকে আমার বড্ড ভাল লেগেছে। যাক্ তাহ'লে আজ রাত্রির মত এইখানে নিদ্রা যাও। কাল সকালে আমি তোমায় চিঠি দেব, সেই চিঠি নিয়ে তুমি আমার বন্ধুর সহিত দেখা করবে। অবশ্য তোমার বাড়ীর জন্য কিছু খরচও আমি দেব, তুমি তা বাড়ীতে দিয়ে যেও। ভাল তোমার নামটা কি ?

আগন্তুক। আমার নাম হরিদাস বসু কিন্তু সবাই আমায় ডাকে ভবানী।

দুর্গাদাস। ভবানী - ভবানী—মন্দ কি, বেশ নাম। তাহ'লে ভবানী, রাত্রি অনেক হ'ল। আজকের মত বিশ্রাম কর গে। কাল আবার সকালে উঠতে হবে।

চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে মাঝের কামরাটা খুলে দে।" চাকর বাহির হইতে উত্তর দিল—"খোলাই আছে হুজুর,—আলো জ্বেলে দিয়েছি।"

আগন্তুক পার্শ্বের কক্ষে শয়ন করিতে গেল, দুর্গাদাসও দরজা ভেজাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন। ভৃত্য বারাণ্ডার আলো নিভাইয়া দিয়া নীচে চলিয়া গেল।

(৩)

ভবানীও আলো নিভাইয়া শুইল বটে কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। সে চক্ষু বুঁজিয়া বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল আর তাহার মনের ভিতর বিশ্বের যত চিন্তা সারি বাঁধিয়া একটি একটি করিয়া দেখা দিতে লাগিল। ক্রমে আড়াইটা, তিনটা, সাড়ে তিনটা বাজিল, তাহার চক্ষে ঘুম নাই, মনের ভিতর শুধু চিন্তা আর চিন্তা। সহসা পার্শ্বের কক্ষে 'খুট' করিয়া একটি শব্দ হইল। ভবানী চমকিয়া উঠিল, মুহূর্ত্ত পরে আর একটি শব্দ, ঠিক ঐরূপ, আরও আস্তে। ভবানী শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, বেশ করিয়া মনে করিয়া দেখিল দুর্গাদাস শয্যাত্যাগ করেন নাই, করিলে শব্দ অন্যরূপ হইত, সে জানিতে পারিত। একটু পরে আবার একটা শব্দ হইল। এবার ভবানী উঠিয়া অন্ধকারে নিঃশব্দে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ধীরে ধীরে দুর্গাদাসের কক্ষের দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইল। একমুহূর্ত্ত উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিল। তারপর ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। বলা বাহুল্য ঘরের দরজা ভেজান ছিল।

ভিতরের খুটখাট শব্দ সহসা বন্ধ হইয়া গেল। ভবানী খুব আস্তে অথচ দৃঢ়স্বরে ডাকিল "রামটহল!"

তাহার পার্শ্ব হইতে কে উত্তর দিল--"কে, ভবানী! তুমি! আমি ভেবেছিলাম বুঝি পুলিস।"

ভবানী। তুমি এখান থেকে এক পয়সার জিনিসও নিয়ে যেতে পারবে না! যদি ভাল চাও, যা যা নিয়েছ সব রেখে চলে যাও।

রামটহল। সে কি হে! তোমার সহসা একি ধর্ম্মজ্ঞানের উদয় হল? মাথা খারাপ হয় নি তো? আজ সন্ধ্যে থেকে তোমার সঙ্গে কি কথা ছিল? তুমি যে কান্নাকাটি কর্চ্ছিলে খেতে পাওনি—আরও কত কি।

ভবানী। হ্যা কর্চ্ছিলেম। তখন আমি ক্ষিদের জ্বালায় জ্ঞান হারিয়েছিলেম। আমি মনস্থির করেছি, আর আমি তোমার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখব না। সৎপথে থেকে যদি আমায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে উপবাস করে মর্ত্তে হয় সেও ভাল, তবু আমি চুরি কখনো করব না। তুমি বোধ হয় শুনে সুখী হবে, আমি এতদিন বাদে একটা ভাল চাকরী পেয়েছি। কাল আমি আমার নূতন মনিবের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যাব।

রামটহল। বেশ কথা, চমৎকার কথা। এখন চুপকর দেখি, তোমার বক্তৃতার ঠেলায় বাবুটী জেগে উঠলে এখুনি কেলেঙ্কারী হবে।

ভবানী এতক্ষণ দেওয়ালের গায়ে আলোর সুইচ খুঁজিতেছিল, এতক্ষণে উহা খুঁজিয়া পাইয়া টিপিয়া দিল। কক্ষ আলোকিত হইল।

দুর্গাদাস অঘোরে ঘুমাইতে ছিলেন। কক্ষের এককোণে ডালা খোলা লোহার সিন্দুকটার সম্মুখ হইতে রামটহল উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার থলিটা উত্তমরূপে বোঝাই হইয়াছিল। সে উহা কাঁধের উপর ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"মন্দই বা কি, নগদ হাজার টাকার নোট তাছাড়া ঘড়ি চেন আংটী বোতাম ইত্যাদি ইত্যাদি। আশীর্ব্বাদ করি সৎপথে তোমার উন্নতি হোক—তুমি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সৎপথে জীবন যাপন কর।

ভবানী দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল--"তুমি এখান থেকে কিছুই নিয়ে যেতে পাবে না। যা নিয়েছ সব রেখে যাও নইলে আমি এখুনি তোমায় ধরিয়ে দেব।"

রামটহল। রেখে যাব! কেন? তোমার জন্তে নাকি? তুমি নিজে চোর, তুমি আমায় ধরিয়ে দিতে গেলে যে নিজেও ধরা পড়বে—তা আর কি তুমি জাননা? আমি সব বুঝি। ওসব সাধুতার বুকনী টুকনী আমার কাছে ঝেড়ো না। সব একলা হাতাবার মৎলব, না?

ভবানী। না না না! আমি আজ এ গৃহে অতিথি।

রামটহল। বটে? ভাল ভাল। আমিও তোমাদের পেছু পেছু এসেছি। তবে তুমি অতিথি, আমি তা নই। এখন পথ ছাড়তো বন্ধু, আমি যাই। আপাততঃ আমার সময় একটু কম। তোমায় আদর করে মাছের মুড়ো খাওয়াবে, আমায় দেখতে পেলে বোধ হয় ঠিক তা করবে না। পথ ছাড়।

ভবানী। না, ছাড়ব না।

রামটহল। প্রাণের মায়া রাখ?

সহসা সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা

বাহির করিয়া ভবানীর বক্ষের উপর ধরিল। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উহা ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল,ভবানী সভয়ে দুইহাত বাড়াইয়া দাঁড়াইল। রামটহল একলম্ফে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভবানীরও চমক ভাঙ্গিল, সেও এক লম্ফে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

তাহারা বাহিরে আসিবামাত্র সহসা বারাণ্ডার আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং একসঙ্গে চারিজন লোক পিস্তল হাতে বাহির করিয়া যেন মাটী ফুঁড়িয়া উঠিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত পরে দুই জোড়া হাতকড়ি দুইজনার হাতে দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া গেল।

ভবানীর মুখখানা কাগজের মত সাদা হইয়া গেল সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার চারিধারে ঘুরিতে লাগিল। তাহার পা টলিতেছিল সে একটু সরিয়া গিয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইল। সহসা একজন পিস্তলধারী বলিয়া উঠিল—"এই যে স্যার উঠেছেন। আমরা এদের দু'জনকেই ধরেছি। আপনার টেলিফোনের সংবাদ পাওয়া মাত্র আমরা এসে বারাণ্ডায় লুকিয়েছিলাম।

ভবানী চাহিয়া দেখিল দুর্গাদাস দরজায় দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্য করিতেছেন।

দুর্গাদাস। একটা ভুল করেছ রমেশ! চোর একজন— এই রামটহল, যাকে তোমরা মাসখানেক থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। আর এই ভবানী আমার অতিথি। এর কোন দোষ নাই।

রমেশ। সে কি স্যার! এও যে রামটহলের সঙ্গী, একসঙ্গে ধরা পড়েছে।

দুর্গাদাস। ভবানী জানতো না যে তোমরা টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে প্রস্তুত হয়ে বাইরে বসে আছ। সে নিজেই রামটহলকে ধর্ত্তে যাচ্ছিল তাই তোমরা দুজনকে একসঙ্গে পেয়েছ। রামটহলকে তোমরা নিয়ে যাও আর ভবানীর হাতকড়ি খুলে দাও। ভবানী আজ রাত্রে আমার কাছেই থাক, কাল আমি নিজে তাকে সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলব।

তাহারা রামটহলকে লইয়া চলিয়া গেল, ভবানী দুর্গাদাসের মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দুর্গাদাস। আশ্চর্য্য হচ্ছ ভবানী? আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। আমি মোটেই ঘুমাইনি। রামটহলের সঙ্গে তোমার যা যা কথা হয়েছে আমি সব শুনেছি। আমি তোমাকে কাল দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। রামটহলকেও আমি তোমার পেছনে দেয়ালের ছায়ায় দেখতে পেয়েছিলাম। আমি কাল একটুও মাতাল ছিলাম না, মাতালের অভিনয় কর্চ্ছিলাম মাত্র। আমি তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা জানি। গতবারে যখন তোমার সাজা হয়, তখন আমি কোর্টে উপস্থিত ছিলাম। আমিই দুর্গাদাস রায়—ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি কমিশনার।

ভবানী কাঁদিয়া ফেলিল। দুর্গাদাসের দুটী পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমায় দয়া করুন, আমায় রক্ষা করুন, আমায় জেল থেকে বাঁচালেন, কিন্তু আমি সপরিবারে না খেতে পেয়ে মারা যাব। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে আপনার কাছে আশা পেয়ে আমি সাহসে বুক বেঁধেছিলেম, আর এখন আমি সব অন্ধকার দেখছি।

দুর্গাদাস। ভয় কি ভবানী? যে সৎপথে থাকতে চায় ভগবান তার সহায়। তোমার চাকরী ঠিক আছে। রাত্রিতে তুমি শুতে যাবার পর তোমার বাড়ীতে আমি খাবার পাঠিয়ে দিয়েছি। যদি তুমি সৎপথে থাক তবে তোমার পরিবারের ভরণ-পোষনের জন্য কখনো তোমার উপার্জ্জনের অভাব হবে না—সে জন্য দায়ী আমি।

সপরিবারে চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১৩ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩২। [৩৩শ সপ্তাহ

মাইকেল এঞ্জেলো

র‍্যাফেলের সমসাময়িক আর একজন তেমনই শ্রেষ্ঠ শিল্পী—নাম তার মাইকেল এঞ্জেলো। মাইকেলের পিতার শিল্প বিদ্যার উপর কেমন একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, মাইকেলের আবার তেমনি শিল্পকলার উপর ঝোঁক। ফলে পুত্রেরই জয় হইল, পিতা তাহাকে শিল্প বিদ্যা শিখিবার জন্ত এক শিক্ষকের নিকট পাঠাইলেন।

মাইকেল তখন নিতান্ত বালক, কিন্তু সেই বয়সেই তাহার প্রতিভা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। একদিন মাইকেল কোন এক বিখ্যাত শিল্পী কর্ত্তৃক খোদিত এক ফন দেখিয়া সেইরূপ আর একটি ফন পাথরে খোদাই করিতেছিল। ফন হইল একটি কাল্পনিক জন্তু বিশেষ—অতি কদাকার। সেই ফনটিও ছিল খুবই বিশ্রী—তাতে আবার সেই বিশ্রী চেহারার উপর সে হাসিতেছিল, কাজেই ফনটা এক বীভৎস রসের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই ফনের মালিক উপহাস করিয়া মাইকেলকে বলিল, "গুরূপভাবে দেখি[illegible] নকল ত সবাই করিতে পারে, ফনটি যা আছে তার উ[illegible] কিছু কারিকুরি করিতে পার ত বুঝি।" মাইকেল কো[illegible] কথা না বলিয়া ফনের সামনের দুইটি দাঁতের উপর স[illegible] হাতুড়ীর এক বাড়ি—! দেখিতে দেখিতে ফনের সা[illegible] দাঁত দুইটা খসিয়া পড়িল। গৃহকর্ত্তা, "কর কি—কর [illegible] বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মাইকেল তাহাকে থা[illegible] স্থির ধীর স্বরে বলিল, "ফোগলা দাঁতের হাসি আরও বী[illegible] দেখাইতেছে—দেখুন।"

আর একটি ঘটনা বলি। কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে[illegible] মাইকেল তখন যুবক, ভাস্কর বলিয়া তাহার নামও [illegible] হইয়াছে—সেই সময়কার কথা। ফ্লোরেন্সের মিউনিসিপালিটির [illegible] একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই অনেক দিন ধরিয়া পড়িয়াছি[illegible] সেই পাথরটা যে কি কাজে আসিবে তাহা কেহই [illegible]

করিতে পারিতেছিল না। ঐ পাথরটার উপর মাইকেলের লোভ কিন্তু প্রথম হইতেই পড়িয়াছিল। যাহার সঙ্গে দেখা হইত তাহাকেই সে বলিত, "এই পাথরটার মধ্যে একটা মূর্ত্তি লুকাইয়া আছে—খুদিয়া সেটাকে বাহির করিতে পারিলেই হয়।" মাইকেলের এই কথা শুনিয়া তাহার বন্ধুরা গম্ভীর ভাবে রায় দিত—"পাগল!"

সেই প্রকাণ্ড পাথরের চাঁইটা মিউনিসিপালিটীর নিকট হইতে খুব অল্প মূল্যেই মাইকেল এঞ্জেলো কিনিয়া লইল। তাহার পর সেই পাথরের চারি পাশে এক মাচা বাঁধিয়া চারিদিক ঘিরিয়া টুক টাক করিয়া সে পাথর কাটিতে লাগিয়া গেল। যেদিন সে চারিদিকের আবরণ খুলিয়া ফেলিল সেদিন সকলে অবাক হইয়া দেখিল—সেই পাথরটার পরিবর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড ডেভিডের মূর্ত্তি সেখানে রহিয়াছে। তাহাও যেমন তেমন খোদাই নহে। ডেভিডের সেই প্রতিমূর্ত্তিতে, অত অল্প বয়সেও, মাইকেল এঞ্জেলো তাহার সব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। ডেভিডের সেই প্রতিমূর্ত্তিটি এমনই জীবন্ত হইয়াছিল যে অনেক সময় তাহাকে রক্ত মাংসের মানুষ বলিয়াই ভ্রম হয়। সমস্ত মূর্ত্তিটি নিখুঁত ভাবে আঁকা। শিরা উপশিরাগুলি পর্য্যন্ত যেটির যেমন ফুলিয়া উচু হইবার কথা সেটী ঠিক তেমনি ফুলিয়া উচু হইয়া আছে। মূর্ত্তিটার দিকে চাহিলে মনে হয় তাহার বক্ষের স্পন্দনও বুঝি দেখা যাইতেছে।

এই একটী প্রস্তর মূর্ত্তি কাটিয়াই মাইকেল নিরস্ত হয় নাই, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরও কয়েকটি মূর্ত্তি কাটিয়া ভাস্কর বিদ্যায় সে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল। তাহার এতগুলি মূর্ত্তির মধ্যেও একটি মূর্ত্তির নাম না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না—সেটি হইল "মাতৃ ক্রোড়ে যীশুখৃষ্ট।"

ভাস্কর বিদ্যার মাইকেল এঞ্জেলোর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পোপ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পোপের মাথায় মতলব গেল—তাহার যেখানে কবর হইবে তাহার উপর মাইকেল এঞ্জেলোকে দিয়া এমন একটা মন্দির করাইতে হইবে যাহা তাহার নাম চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। মাইকেল এঞ্জেলো রাজী হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কাজ আরম্ভ না হইতেই পোপের মৃত্যু হইল। পরে যিনি পোপ হইলেন তিনি আর সে কাজে হাত দিতে রাজি হইলেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার মতলবের কিছু অপ্রাচুর্য্য ছিল না। নূতন পোপ বলিলেন, "বেশ, আমার এই গির্জ্জা ঘরটার ভিতরে মাইকেল ছবি আঁকুক!"

মাইকেল প্রস্তরমূর্ত্তি আঁকিতেই খুব পটু ছিলেন, এখন ছবি আঁকিতে হইবে শুনিয়া একটু ক্ষুন্ন হইলেন, কিন্তু কোন কাজে পিছপাও হইবার ছেলে মাইকেল এঞ্জেলো নয়। মাইকেল কাজ করিতে সম্মত হইল। কিন্তু আর এক গোল বাঁধিল। মাইকেল বলিল, "আমি আমার নিজের মতে যেমন ইচ্ছা কাজ করিব! পোপের কোন কথা সে সম্বন্ধে খাটিবে না।" পোপ তাহাতেই রাজি হইলেন। মাইকেল এঞ্জেলো আবার বলিল, "আর এক সর্ত্ত আছে, আমি যতদিন কাজ করিব, আমি কি করিতেছি না করিতেছি কেহই দেখিতে পাইবে না—পোপ নিজেও না।" পোপ আর কি করেন, সে সর্ত্তেও তাঁহাকে রাজী হইতে হইল।

কাজ চলিতে লাগিল। মাইকেলের হিংসা না করে এমন লোক সে যুগে খুব কমই ছিল। সেই হিংসুকের দল যাইয়া পোপকে বলিল, "মাইকেল আবার কি ছবি আঁকিবে! সে ত পাথর কাটিত—ছবি আঁকতে শিখিল কবে? ছাই ভস্ম কি আঁকে কেউকে দেখায় না—মনে হয় গীর্জ্জাঘর সবটাই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।" পোপ অধীর হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি ধীরে ধীরে মাইকেল যেখানে কাজ করিতেছিল সেখানে যাইয়া উপস্থিত। মাইকেল কোন কথা না বলিয়া উপর হইতে হাতুড়িটা পোপের মাথা লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়া দিল। ভাগ্যিস, সে হাতুড়ী পোপের মাথায় লাগে নাই, লাগিলে ত পোপ সেইখানেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতেন। পোপের কিছু বলিবারও ছিল না, তিনি নিজেই চোরের মত আসিয়াছিলেন। হাতুড়ী মারুক, আর যাই করুক, মাইকেল এঞ্জেলোর ছবি দেখিয়া পোপ সব ভুলিয়া গেলেন, একদিকে র‍্যাফেলের, আর একদিকে মাইকেল এঞ্জেলোর ছবি, পোপ ভাবিয়া পাইলেন না কোনটা ফেলিয়া কোনটা দেখিবেন।

তাহার পর মাইকেল এঞ্জেলো সেন্ট পিটার্স কেথিড্রেল তৈরীর ভার লইতে স্বীকার করেন। কিন্তু এক সর্ত্তে,—সে

এই কার্য্য ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্য বলিয়াই করিবে, অর্থের জন্ত নয়। সুতরাং সে কার্য্যের জন্ত পোপের নিকট হইতে সে কোন টাকা লইবে না। পোপ রাজি হইলেন। মাইকেল কিছু কাজ করিতেই তাহার কাজ দেখিয়া পোপ এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে মাইকেলকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিবার লোভ তিনি কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মাইকেল এঞ্জেলো এক কথার মানুষ। কথার খেলাপ দেখিয়া সে ভীষণ চটিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া প্রস্থান করিল। পোপ দেখেন বিপদ তখন অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া, তারপর তাকে ফিরাইয়া আনেন।

মাইকেল এঞ্জেলো একাধারে কবি, ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পী ছিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁহার মত সেনাপতি, কিম্বা ইঞ্জিনিয়ার খুব কমই দেখা যাইত। এই সব কার্য্যে তাহার হুনিয়ারী বুদ্ধি স্মরণ করিয়া নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত বিস্ময়ে অবাক হইয়াছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলো কবি। মাইকেল এঞ্জেলো শিল্পী—ভাস্কর্য্যে মাইকেল এঞ্জেলো অদ্বিতীয়। তাহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী।

মাইকেল এঞ্জেলো কি করিয়া রোম নগরে গেল, সে সম্বন্ধে বেশ একটা মজার গল্প আছে। সে একটি পাথরের মূর্ত্তি গড়িল—মূর্ত্তিটি হুবহু প্রাচীন গ্রীক শিল্পের আদর্শে গঠিত হইল। প্রাচীন গ্রীক মূর্ত্তির সহিত এঞ্জেলোর তৈরী মূর্ত্তির এতটুকু পার্থক্য রহিল না। মাইকেল এক চালাকী করিল, সে মূর্ত্তিটিকে মাটির নীচে পুতিয়া রাখিল এবং কিছুদিন পরে মাটি খুঁড়িয়া মূর্ত্তিটি বাহির করিয়া প্রচার করিল—যে মাটির নীচে একটি প্রাচীন গ্রীকমূর্ত্তি সে পাইয়াছে। রোম নগরের একজন ধনী এই সংবাদ পাইয়া অনেক টাকা দিয়া মূর্ত্তিটি কিনিয়া লইলেন।

কিছুদিন পরে তাহার এই ছলনার কথা প্রকাশ পাইল। যে ভদ্রলোক মূর্ত্তিটি কিনিয়াছিলেন, তিনি ভয়ানক চটিয়া গেলেন। কিন্তু মূর্ত্তিটির অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তরুণ শিল্পীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিল্পীকে দেখিয়া এবং তাহার সহিত আলাপ করিয়া ভদ্রলোক আনন্দিত হইলেন এবং দুই একটা শিল্প কার্য্যের ভার দিলেন। এইভাবে রোম নগরীতে তাহার খ্যাতি বিস্তার লাভ করিল।

দ্বিতীয় জুলিয়াস্ যখন রোমের পোপ তখন তাঁহার সহিত এঞ্জেলোর একটা বিষয় লইয়া বিরোধ বাঁধিয়াছিল। তোমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাইবে, কবি, চিত্রকর প্রভৃতি শিল্পীরা চিরদিনই একটু স্বাধীনতা প্রিয় এবং একটু খামখেয়ালী হইয়া থাকেন। পোপ জুলিয়াস্ এঞ্জেলোর উপর তাহার নিজের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণের ভার দিলেন। তিনি এঞ্জেলোকে বলিলেন—মন্দিরের গায়ে নানা প্রকার যুদ্ধের চিত্র—বীরমূর্ত্তি—অঙ্কিত করিতে। মাইকেল রাজি হইল। কিন্তু মর্ম্মর প্রস্তর কেনার দাম লইয়া পোপের সহিত গোল বাঁধিল। পোপ অত বেশী টাকা ব্যয় করিতে রাজি হইলেন না, এঞ্জেলো পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সব কথা বলিতে চাহিল, কিন্তু দেখা পাইল না! এঞ্জেলো বলিল, আমি এমন লোকের কাজ করিব না। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি ফ্লোরেন্স তাহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিল। পোপ রাগিয়া গেলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে এঞ্জেলো যদি ভালয় ভালয় আসিয়া কাজ করে, বেশ, নতুবা তিনি ফ্লোরেন্স নগর ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিবেন। মাইকেল পণ করিল, অত কি ভয়! একেবারে তুর্কীদের এলাকাধীন কনষ্টান্টিনোপল সহরে চলিয়া যাইবে। পোপ কথাটা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং এঞ্জেলোকে ডাকিয়া সমাধি-মন্দির গড়িবার পরিবর্ত্তে অন্য কাজের ভার দিলেন। শিল্পীর গৌরব ও অভিমানের মর্য্যাদা এমনি ভাবে রহিয়া গেল।

মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনের প্রধান কীর্ত্তি—সেণ্টপিটার্স মন্দিরের কাজ। এই কাজ করিতে করিতে তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন আশী বৎসর তখনও তিনি কি ভাবে কেমন করিয়া ছবি আঁকিবেন, কোথায় কোন মূর্ত্তিটি রাখিলে ভাল মানাইবে, সে ভাবনাই ভাবিতেন। তাহারই নক্সা করিতেন, তাহাই কল্পনার চোখে দিবারাত্রি ফুটিয়া উঠিত। এঞ্জেলোর স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না—তবু তিনি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। ঝড় হউক—বৃষ্টি হউক কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া অদম্য উৎসাহে কাজ করিয়া যাইতেন।

এঞ্জেলো মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল, দয়া ও মায়া মমতার খণি। তিনি তাঁহার অমূল্য সময়

নষ্ট করিয়াও কত সময় কত দীন দরিদ্রের সেবা করিতেন। একবার—সেণ্টপিটার্সের একটী ছবির নক্সা করিতেছেন এমন সময় পাশের ঘরে তাঁহার পীড়িত ভৃত্যের কাতর বাণী শুনিতে পাইলেন, তখন কোথায় গেল তাহার নক্সা করা—ছবি আঁকা! তিনি সব ফেলিয়া সেই ব্যাধিগ্রস্ত সেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

১৫৬৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উননব্বুই বৎসর বয়সে এঞ্জেলোর মৃত্যু হইল। এখন তাহার শবদেহ কোথায় কোন্ নগরে সমাহিত হইবে, তাহা লইয়া তর্ক বাধিল। রোমবাসী কহিল—রোম নগরে এই বিখ্যাত শিল্পীর দেহ সমাধি দিতে, কিন্তু স্বদেশ ভক্ত এঞ্জেলো মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেও বলিয়া গিয়াছিলেন—"তোমরা দয়া করিয়া আমার জন্মভূমিতে আমাকে কবর দিও।"

চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি

—মাইকেল এঞ্জেলো—

এই ছবিটি আঁকিয়া শিল্পী আমাদের চোখের সামনে এক বিরাট ব্যাপারের অবতারণা করিতে চাহিয়াছেন। ভগবান চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে সৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যে নামিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন—ইহাই হইতেছে ছবিখানির বিষয় বস্তু। একটা ছবি দেখিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হয় যে, যে রসটাকে শিল্পী ফুটাইতে চাহিয়াছেন, ছবিটার দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই সমস্ত জড়াইয়া সেই রসটা দর্শকের মনে জাগিয়া উঠে কি না। ছবিখানি দেখিয়া প্রথমেই আমাদের মনে আসে একটা ঝড়ের ভাব। চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি মহা তেজস্কর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহগুলি যেদিন প্রথম প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়া চারিদিকে উল্কার মত ছুটিয়া যাইতে আরম্ভ করিল সেদিনকার সেই মুহূর্ত্তটা যে কি ভয়ঙ্কর একটি প্রলয়ঙ্করী আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল—সেই বিরাট এবং ভয়ঙ্কর গতিটাকে শিল্পী সমস্ত ছবিটার ভিতর দিয়া আমাদের সামনে ধরিয়াছেন। সমস্ত ছবিখানায় তার প্রত্যেকটা মূর্ত্তি এবং আবহাওয়ার ভিতর এমন একটা রস ফুটিয়া উঠিয়াছে যে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ জ্যোতিষ্কের মতই ভয়ানক এবং গতিশীল—সমস্ত ছবিটাই যেন একটা বিরাট এবং প্রকাণ্ড কিছুর সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করিতেছে।

যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের কিছু পূর্ব্বে গুটিকতক ভবিষ্যদ্দর্শী মহাপুরুষ তাঁর আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়াছিলেন। এই যে বৃদ্ধ লোকটি ইঁহার নাম হইতেছে ইজাকেল—ইনি সেই সব মহাপুরুষদের মধ্যে একজন। ছবিখানির ভিতর দিয়া শিল্পী দেখাইতে চাহিয়াছেন এই মহাপুরুষটি যীশুখৃষ্টের অবতীর্ণ হইবার দৃশ্য চোখের সামনে দেখিতে পাইয়া, আনন্দ-বিস্ময়ে কি ভয়ানক অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। বৃদ্ধ যেন নিজের মনের আবেগকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না।

ভবিষ্যদ্বক্তা ইজাকেল

—মাইকেল এঞ্জেলো—

জগদ্বিখ্যাত মাইকেল এঞ্জেলোর কথা তোমরা বেশ জান। তাঁহার নির্ম্মিত মুসার বিরাট মূর্ত্তিটি অদ্বিতীয়। অত বড় মূর্ত্তি পৃথিবীর মধ্যেই বড় কম দেখা যায়। চিত্রে দেখ—মাইকেল এঞ্জেলো আদর্শ প্রতিমার দিকে কেমন নিবিষ্ট মনে চাহিয়া গঠনের পরিকল্পনা করিতেছেন। তাঁহার এক হাতে হাতুড়ী—অপর হাতে বাটুলি—আর চোখের ভিতর অপলক দৃষ্টি।

মূর্ত্তিনির্ম্মাণরত—মাইকেল এঞ্জেলো

—মাইকেল এঞ্জেলো—

ফ্লোরেন্স নগরীর এক স্থানে একটি প্রকাণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর পড়িয়াছিল—ঐ মর্ম্মর প্রস্তর খুদিয়া মূর্ত্তি গড়িবার জন্ম কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু পারেন নাই। মাইকেল এঞ্জেলো দানরূপে এই প্রস্তরটি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করিয়া ডেভিডের বিশ্বমোহনকারী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। আজও এই বিচিত্র মূর্ত্তির তুলনা মেলা ভার। ফ্লোরেন্সের একটি পর্ব্বতোপরি মূর্ত্তিটি বহুদিন পর্য্যন্ত প্রতিস্থাপিত ছিল।
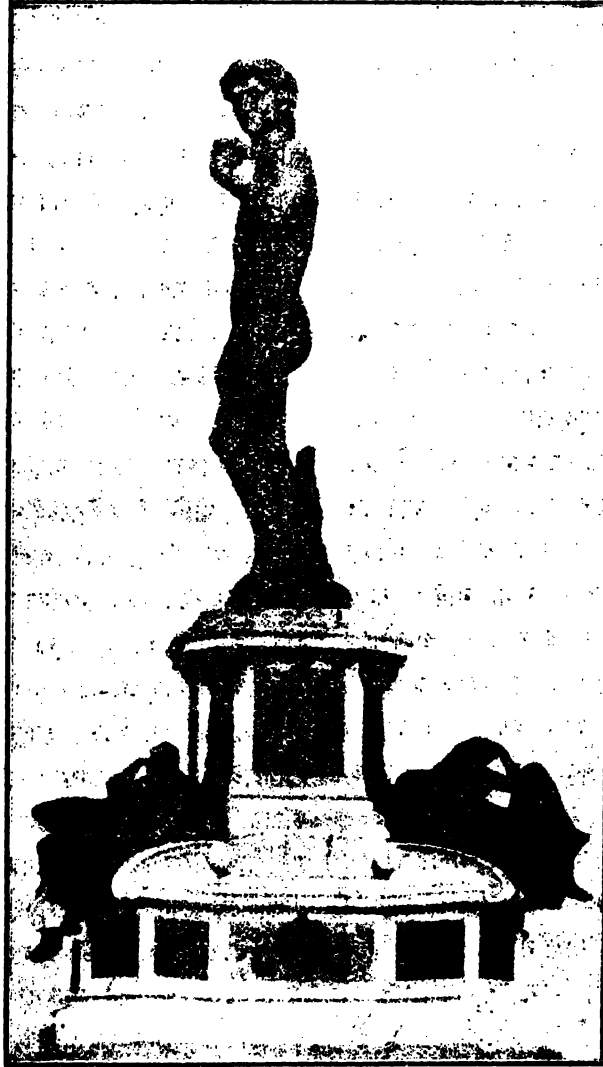
মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিড মূর্ত্তি

—মাইকেল এঞ্জেলো—

"ডালিম"

[দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস]

তখন আমার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমোদ প্রমোদ ছাড়ি নাই। ছাড়িও নাই, ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোন কালেই মানুষ বড় ভাল ছিলাম না। সংসারের আমোদ আহ্লাদের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণের যোগ ছিল; আমার মনে হইত কখনও সেই যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা এক-রজনীর উৎসবের মত কাটাইয়া দিয়াছি। কখন আরম্ভ হইল কখন শেষ হইল বুঝিতেও পারিলাম না। কোনও সুখ হইতে আপনাকে কখনও বঞ্চিত করি নাই, আর তার জন্য কোনও আপশোষও হয় নাই। প্রাণের মাঝে যে একটা মুক্ত আকাশ, একটা গভীর পাতাল- আছে তাহা তখন বুঝিতাম না। জীবনটা সর্ব্বদাই এক বিশাল সমতল ভূমির মত মনে হইত, জীবনের রাজপথে ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে আর হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইতাম। কখনও পায় কাঁটার আঁচড় লাগে নাই। কখনও প্রাণে দাগ বসে নাই। সমস্ত আমোদ প্রমোদের মধ্যে বিনা চেষ্টায় সহজেই প্রাণটাকে আস্ত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ প্রায় বুড়া হইতে চলিলাম, আজ তার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন অন্ধকার হইয়াছে। সে কতদিনকার কথা। তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। কত খুঁজিয়াছি— কোথাও পাইলাম না। সে যে অদৃশ্যভাবে আমার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—ধরা দেয় না। তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই, তাহাকে দেখিতে পাই না। চোখ বুজিলে তাহাকে বুকের ভিতর পাই, চোখ মেলিলে কোথায় মিলাইয়া যায়। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুঝি খুঁজিতে খুঁজিতেই কাটিয়া যাইবে। তাহাকে পাইব না? আমি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

তাহার নাম জানি না, সকলে তাহাকে "ডালিম" বলিয়া ডাকিত। সে দেখিতে সুন্দর কি কুৎসিত আমি এখনও বলিতে পারি না। কিন্তু তার মুখখানি এখন পর্য্যন্ত আমার প্রাণে প্রদীপের মত জ্বলিতেছে! মাথায় অন্ধকারের মত এক রাশ চুল, মুখে একটা গভীর পাগল-করা ভাব, আর তার চোখ দুটী?—চাহিবামাত্র আমার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছিল আজ পর্য্যন্ত অনেক রমণীর সঙ্গে মিশিয়াছি, আমোদ প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু এমন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, চোখে এমন গদ্‌গদ্ করুণভাব আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয় আর কখনও দেখিবও না।

সেদিন সন্ধ্যাকালে কয়জন বন্ধু লইয়া বাগানে আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্ণ বাবুর বাগান চাহিলেই পাওয়া যাইত, আমরা চাহিয়া লইয়াছিলাম। বাগানটী খুব বড়, ফটক হইতে সরু একটা রাস্তা ধরিয়া অনেক দূর গেলে বাড়ীটা পাওয়া যায়। বাড়ীর সামনেই একটা ঘাট-বাঁধান পুকুর। ঘাটের ঠিক উপরেই সান-বাঁধান লতামণ্ডপ। সেই সরু রাস্তা ধরিয়া, সেই লতামণ্ডপের ভিতর দিয়া, বাড়ীর ভিতরে যাইতে হয়। সেদিন বন্দোবস্তের কোন অভাব ছিল না। নানা রকমের প্রচুর সুরা, নানা রকমের খাবার, আলোয় আলোয় প্রমোদ-মন্দির দিনের মত জ্বলিতেছিল।

আমার পৌঁছিতে একটু দেরী হইয়াছিল। ফটকে নামিয়াই সেই সরু রাস্তা। চাঁদের আলো খুব ক্ষীণ হইয়া ছায়ার মত সব ঢাকিয়াছিল। নানা ফুলের গন্ধে, সেই ম্লানছায়ালোকে, লতাপল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে সেই সরু রাস্তাটীকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে কি হইতেছিল আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক পদধ্বনিতে কে যেন আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল। সে রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি, সেই বাগানে অনেক প্রমোদ-রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদাই হাল্‌কা মনে স্ফুর্ত্তি করিতে গিয়াছি। সেদিন আমার প্রাণে কোথা হইতে একটা ভার চাপিয়াছিল। সে যে কেমন ভার আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে সেই বাড়ীতে ঢুকিলাম। সিঁড়ি

দিয়া উঠিতে উঠিতে, গান হইতেছে, শুনিলাম। পরিচিতা গায়িকা গাইতেছে—"চমকি চমকি যাও।" ঘুঙুরের শব্দ শুনিলাম। নৃত্যগীতে আমার মন নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সেদিন কি জানি কিসের ভারে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তখনও নাচ হইতেছে। সেই গায়িকা হাত ঘুরাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে "চমকি চমকি যাও"! আমাকে দেখিয়াই আমার বন্ধুরা সব চেঁচাইয়া উঠিল—"কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ, দাদা আগিয়া"। একজন বলিল, "দাদা এই লাও একপাত্র চড়াও, আনন্দ কর"। আর একজন গান ধরিল "এত গুণের বঁধু হে"। আমার এক বন্ধু উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল—"কাঁটা বনে তুলতে গিয়ে কলঙ্কেরি ফুল! ওগো সই কলঙ্কেরি ফুল!" আর একজন উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিল "দেখ্‌লে তারে আপন হারা হই"। আমার আর একজন বন্ধু একটা গেলাসে মদ ঢালিয়া আমার হাতে দিয়া গাহিলেন "দাদা হেসে নাও দুদিন বইত নয়, কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়!" সবার হাতে মদের গেলাস, মদের গন্ধ, ফুলের সৌরভ, সিগারেটের ধুঁয়া, গানের ধ্বনি. শারঙ্গের স্বর, ঘুঙুরের শব্দ, তব্‌লার চাঁটি। কিন্তু আমি যেন একটা অপরিচিত লোকে আসিয়া পৌঁছিলাম। অনেক বার এই প্রমোদে মন ভাসাইয়া আনন্দ করিয়াছি। সেদিন কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল এ সবই আমার নূতন, অপরিচিত। আমাকে জোর করিয়া এই নূতন অপরিচিত লোকে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল—বিডন ষ্ট্রীটের সুশীলা, হাতি বাগানের সুরী, পুঁতুল কিরণ, বেড়াল হরি, এই রকম অনেক;—কিন্তু সে দিন যেন হঠাৎ মনে হইতে লাগিল ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না।

ইহাদের একটু তফাতে, এক কোণে বসিয়াছিল, "ডালিম"। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও মেয়েটাকে আগে কখনও দেখি নাই। সে বলিল "বাস্ ওকে জান না? ও যে ডালিম, সহর মাত্ করেছে, অনেক কাপ্তেন ভাসিয়েছে"। আমি বলিলাম "কাপ্তেন ভাসানর মত চেহারাত ওর নয়। ও যে এককোণে সরে বসে আছে।" বন্ধু বলিল "ওই ত ওর ঢং, অমনি করে' লোক ধরে"। আমার মন তাহা মানিতে চাহিল না। আমি কিছু না বলিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সেও আমায় দেখিতেছিল। বহুবার চোখে চোখে মিলিয়া গেল। আমি কি দেখিলাম—তাহার চাহনিতে কি ছিল—আমি কেমন করিয়া বলিব আমি যে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে হইল সেই আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ নাই। তার চোখ দুটী যেন আর কিসের খোঁজ করিতেছে। আমার প্রাণে কি হইতেছিল, তাহাও বুঝাইয়া বলিতে পারি না। আমার ভিতর থেকে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল উহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লই।

এমন সময় কে বলিল "ডালিম, একটা গাও"। আর একজন বলিল "ডালিম ভাল গাইতে পারে না"। আমি তাহার দিকে চাহিলাম: সে বুঝিল, বলিল—"আমি ভাল গাইতে পারি না"। আমি বলিলাম—"গাও না"? সে একটু সরিয়া আমার সাম্‌নে আসিয়া গান ধরিল। আমি সে রকম গান কখনও শুনি নাই। সেখানে সুরের কেরামতি ছিল না, তালের বাহাদুরী ছিল না; কিন্তু সেখানে যাহা ছিল, তাহা আর কখনও কোন গানে পাই নাই। মনে হইল ওই গানের জন্যই আমার সমস্ত মনটা অপেক্ষা করিয়াছিল। চোখের জলে ভেজা ভেজা সেই সুর, সুরের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন নয়নপল্লবে অশ্রুবিন্দুর মত জ্বলিতেছিল। সেই সুরের প্রত্যেক স্বর, সেই গানের প্রত্যেক কথা আজও আমার প্রাণপল্লবে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মতই জ্বলিতেছে। ডালিম গাহিতেছিল:—

"কেমন করে মনের কথা কইব কাণে কাণে।
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে।
আজি আমি ঝরা ফুল, পড়ি তোমার পায়,
গন্ধটুকু রেখে বঁধু হিয়ার হিয়ায়!
প্রাণের পাতে ফুলের মত
রাখব তোমায় অবিরত
তফাত্ থেকে দেখ্‌ব শুধু রাখ্‌ব প্রাণে প্রাণে;
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কখনও গান শিখেছিলে ? সে বলিল "না. ওস্তাদের কাছে কখনও শিখি নাই।" আমি বলিলাম—আমি এমন গান কখনও শুনি নাই। তুমি কোথায় থাক ? সে কোন কথা বলিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম - এই গানটী আমাকে একলা একদিন শুনাইবে ? সে কোন উত্তর দিল না। আমি বলিলাম - এসব তোমার ভাল লাগে ? তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, কোন কথা বলিল না।

আমার বন্ধুদের তখন প্রায় সকলেরই মত্ত অবস্থা। একজন উঠিয়া টলিতে টলিতে ইলেকট্রিক্ বাতিগুলি সব নিবাইয়া দিল।

আমি সেই অন্ধকারে ডালিমকে বুকে টানিয়া লইলাম। সে কিছু বলিল না। তারপর,—তার হাত ধরিয়া উঠাইলাম। আমিও দাঁড়াইলাম। তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম—আমার সঙ্গে চল। সে আমার হাত ধরিল, আমার সঙ্গে চলিল।

কোথায় যাইব মনে মনে কিছুই ঠিক করি নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিলাম। তারপর একটা ঘরের ভিতর দিয়া সেই লতামণ্ডপে গেলাম। তখন চাঁদের আলো আরো ম্লান মনে হইতেছিল। পুকুরের উপর একটু উজ্জ্বল ছায়া মাত্র পড়িয়াছে। বাতাস বন্ধ। ফুলের গন্ধ থামিয়া গিয়াছে। মনে হইল আকাশে যেন একটু মেঘ উঠিয়াছে সেই উজ্জ্বল অন্ধকারে একখানা বেঞ্চির উপর তাহাকে বসাইলাম। আমার সর্ব্ব শরীর তখন অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের ভিতর ধপ্ ধপ্ করিতেছিল। আমিও তাহার পাশে বসিলাম। আমি তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলিলাম—ডালিম, আমার তোমাকে বড় ভাল লাগে। আমার ত এমন কখনও হয় নাই। সে বলিল—"ও কথা ত সবাই বলে, মনে করিয়া-ছিলাম তুমি ওকথা বলিবে না।" আমি বলিলাম—তুমি ত আমাকে চেন না। তাহার একখানি হাত আমার বুকের উপর দিলাম। সে বলিল,—"তোমার কি হইয়াছে ?" আমি বলিলাম—"জানি না। ইচ্ছা হয় তোমাকে লইয়া কোথাও পালাইয়া যাই। এতদিনের জীবনযাপন সবই মিথ্যা মনে হইতেছে। সে আরও একটু আমার কাছে সরিয়া আসিল। আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমারও চোখে জল আসিয়াছিল, কোন কথা বলিতে পারি নাই। সে যতই কাঁদিতে লাগিল, ততই তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিলাম। মনে হইল ইহাকে কোথায় রাখি, কেমন করিয়া শান্ত করি। এক নিমেষে আমার সংসারের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। নিশীথের স্বপ্ন যেমন প্রভাতে এক নিমেষে মিলাইয়া যায়, আমার জীবনের সকল স্মৃতি, সংসারের সকল বন্ধন, সকল ঘটনা এক মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল ! এ কি সেই আমি ? আমার মনে হইতে লাগিল আমি যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি, এই মাত্র এক নূতন জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে অবস্থা সুখের কি দুঃখের আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কেবল বুকে চাপিতে লাগিলাম। কথা বলিবার শক্তি ছিল না। মনে মনে বলিতে লাগিলাম — হে আমার ব্যথিত, পীড়িত ! এস তোমার চোখের জল মুছাইয়া দি, তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দি, তুমি আর বাহিরে থাকিও না—আমার বুকের ভিতর ফুটিয়া উঠ। আমিও তোমাকে বুকে করিয়া জীবন সার্থক করি ! কতক্ষণ পরে সে একটু শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে আসিব না। কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বলিল যাও, তাই আমি আসিলাম। তুমি আমার কথা শুনিতে চাও ? আমি মনে করিয়াছিলাম বলিব না, কিন্তু কে যেন আমার প্রাণের ভিতর হইতে বলাইতেছে। শুনিবে ?" আমি বলিলাম—শুনিব , শুনিবার জন্যই তোমাকে এখানে আড়াল করিয়া আনিয়াছি। সে তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই কণ্ঠস্বর আজও আমার প্রাণে জাগিয়া আছে। তাহার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে ব্যথার মত বাজিতে লাগিল,—আজও বাজিতেছে !

সে বলিল :—আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃ হীন। কুলীন, ব্রাহ্মণের মেয়ে, মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত। মামা নেশা করিতেন। দিবানিশি সুরা মত্ত, তাহার কাছে থেকে কখনও ভাল ব্যবহার পাই নাই। মামী আমাকে একটা বোঝা মনে করিত, তার মুখে কটুক্তি ছাড়া মিষ্টি কথা কখনও শুনি নাই।

আমার মামাত ভাই আমাকে ভাল বাসিতেন। তাঁহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যখন বার বৎসর বয়স তখন তিনি মারা যান। তারপর চারি বৎসর পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাহা তোমার না শুনাই ভাল। আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তারপর চা'র বৎসর শ্বশুর বাড়ীতে ছিলাম এই চা'র বৎসরের মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে বোধ হয় ছয় সাত দিনের বেশী দেখা হয় নাই। তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। কখনও কখনও দুই এক দিনের জন্য বাড়ী আসিতেন। বাড়ীতে আসিলেও বাহির বাড়ীতেই থাকিতেন। আমার সঙ্গে দুই একবার দেখা হইয়াছিল, কখনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। তাঁহার আগে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে ছিল। আমার শাশুড়ী তাঁহার বিমাতা। আমার কথা কহিবার কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শাশুড়ীর কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখনও কখনও মারও খাইয়াছি। বাড়ীতে ঝি ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া—রাঁধাবাড়া, ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়ার পর বাসনগুলি—বাড়ীর কাছে নদী, সেই নদীতে মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে এই চা'র বৎসরের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাঙ্গালা বই ছিল, মাঝে মাঝে রাত্রে সবাই ঘুমাইলে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতাম! আমার শাশুড়ীর তাহা সহিল না। একদিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমারও আর সহ্য হইল না। সেইদিনই মনে স্থির করিলাম এ বাড়ীতে আর থাকিব না। পাড়ার একটী ছেলে—আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম, আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম, চাঁদের আলো ছিল, বাতী লইয়া যাই নাই। দেখিলাম সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই নদীতে বাসনগুলি ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম—আমাকে মামার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পার? সে বলিল—কতদূর? আমি গ্রামের নাম বলিলাম। সে বলিল নৌকায় যাইতে তিন চার ঘণ্টা লাগিবে। আমি বলিলাম—যতক্ষণই লাগে আমাকে লইয়া যাও। এই বলিয়া তাহার পায় আছড়াইয়া পড়িলাম। সে বলিল—আচ্ছা তুমি এইখানে ব'স, আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসি। সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় উঠিলাম। ভাবিলাম এইবার যমের বাড়ী ছাড়িয়া মামার বাড়ী যাইতেছি। যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম, সে ঠিক সেই রকম করিয়া আমার দিকে চাহিয়াছিল, কোন কথা বলে নাই; শুধু চাহিয়াছিল আমার মনে হইতেছিল তাহার চোখ দুটী যেন আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়াছিলাম।

যখন মামার বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম তখন বেশ রাত্রি, মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলেই শুইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর মামী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম আমি পালাইয়া আসিয়াছি, আমি সেখানে আর যাব না। "আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে রক্ষা কর, তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও"। মামী কর্কশস্বরে বলিলেন "পালিয়ে এসেছিস্—কার সঙ্গে?" আমি সে কথার অর্থ তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটীকে দেখাইয়া বলিলাম "এর সঙ্গে"। মামী বলিলেন—"এ কে?" আমি বলিলাম—"জানি না"। মামী বলিলেন, "আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হ'বে না"। আমি কোথায় যাব! মামী বলিলেন 'গোল্লায়', বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পাগলের মত সেই দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিল না। তখন সে আমার পিছনেই দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া ফিরাইয়া লইয়া চলিল।

আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কোথা যাব? কোথা যাব? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল।

কিন্তু এই প্রশ্নের কোন উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মত সে যেদিকে লইয়া গেল সেদিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা যাইবে? সে বলিল 'কল্‌কাতায়,'। তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যুতের মত আমার মনে চম্‌কাইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া তাহার পায় পড়িলাম। কাঁদিয়া বলিলাম—আমাকে রক্ষা কর; আবার আমাকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া চল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল "আচ্ছা"। কিন্তু ফের সেই চাহনি, আমি ভয়ে, অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলাম।

ভোর হইতে না হইতে নৌকা ঘাটে লাগিল। আমি দৌড়িয়া শ্বশুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। সে বাধা দিল না, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল, আমি কিছু না বলিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। আমার শাশুড়ী উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি চীৎকার করিয়া 'মা, মা' বলিয়া ডাকিলাম, আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না।

তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামীর কথা মনে পড়িল—"গোল্লায় যাও"। আমি ফিরিলাম, দেখিলাম সে দাঁড়াইয়া আছে, আর ঠিক তেম্‌নি করিয়া চাহিয়া আছে। আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম—"আমি গোল্লায় যাব, যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাও"।

তখন নিশ্চয়ই সূর্য্য উঠিয়াছে, কিন্তু আমার চোখে ঘোর অন্ধকার। মনে হইল যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোন অদৃশ্য বলিদান-মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তারপর?

তারপর কলিকাতায় আসিলাম। শুনিলাম সে কোন জমিদারের ছেলে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া দু'জনে থাকিলাম। সাত দিন সে আমার গায় গায় লাগিয়াছিল। তাহার সেই চাহনির অর্থ সেই কয়দিনে বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম। আট দিনের দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তারপর?

এখন আমি কল্‌কাতার ডালিম। আমার সুখের শেষ নাই। সহরের বড় বড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। আমার বাড়ীতে সাজ সজ্জার অভাব নাই, সোনার খাট, হীরার গহনা। বাড়ীতে ইলেকট্রিক বাতি, ইলেকট্রিক পাখা, দাস-দাসীর অন্ত নাই, আলমারী ভরা কাপড়, বাক্স ভরা টাকা।

"আমি কল্‌কাতার ডালিম, কিন্তু"—কিন্তু বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। দু'হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল। তখন জ্যোৎস্নার লেশ মাত্র নাই। সেই লতা-মণ্ডপ গাঢ় অন্ধকার ভরা। তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল আমি সেই অন্ধকারে তার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। আর আমার অন্তরে এক অসীম বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল "কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছি, বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়?

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয় কাঁদিতেছিল। তার পর বলিল "তোমার আমাকে ভাল লাগিয়াছে? তোমার মত আর কারও সঙ্গে আমার এ জীবনে কখনও দেখা হয় নাই। কেন তোমাকে আগে দেখিলাম না? আমি যখন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে? এখন—এখন তোমাকে ত কিছু দিবার নাই"।

এই বলিয়া সে আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল, শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল, আমি বলিলাম—আমি আর কিছুই চাই না, আমি তোমাকেই চাই। এই বলিয়া দুই জনেই কাঁদিতে লাগিলাম। সেই অন্ধকারে তাহাকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাগলের মত জ্ঞানহারা হইয়া কাঁদিতেছিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না। আমি কি জাগিয়াছিলাম? মনে হইতেছিল আমি ডালিমকে লইয়া এই সংসারের বাহিরে এক অপূর্ব্ব নন্দন-কাননে বাস করিতেছি। আমি আর ডালিম,—সে জগতে আর কেহ নাই! চিরদিন তাহাকেই বুকে করিয়া রাখিয়াছি। প্রতি প্রভাতে তাহাকে নব নব ফুলে সাজাইয়াছি, প্রতি নিশাশেষে

তাহাকে নব নব চুম্বনে জাগাইয়া দিয়াছি। প্রাণের যে একটা মুক্ত আকাশ আছে, আর একটা গভীর পাতাল আছে, সে দিন প্রথম অনুভব করিলাম। আমার হৃদয়ের সেই স্বর্গ ও সেই পাতাল পূর্ণ করিয়াছিল ডালিম—ডালিম!

এমন সময় উপরে কোলাহল শুনিলাম, চমকিয়া দেখিলাম ডালিম আমার কাছে নাই! আমি অস্থির হইয়া গেলাম, পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। দৌড়িয়া উপরে গেলাম, দেখিলাম সেখানে ডালিম নাই। আমাকে দেখিয়া একজন বলিল "কি বাবা, একেবারে উধাও"। আমি তাহাকে গালি দিলাম। আবার ছুটিয়া নীচে আসিলাম। সেই বাগানে সকল স্থানে খুঁজিলাম। ডালিম ডালিম বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। ফটকে গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম "কোই বিবি চলা গিয়া"। একজন গাড়োয়ান বলিল "হাঁ বাবু, এক বিবি আভি চলা গিয়া"। আবার দৌড়িয়া উপরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "ডালিম কোথায় থাকে?" এবার আর কেহ রসিকতা করিল না। ঠিকানা জানিয়া লইয়া আবার ফটকে দৌড়িয়া আসিলাম। একখানা মোটরকার করিয়া তাহার বাড়ী গেলাম। শুনিলাম, ডালিম আসে নাই। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানি না, ডালিমের দেখা পাইলাম না। আবার বাগানে গেলাম, আবার খুঁজিলাম, কিন্তু তাহাকে আর পাইলাম না।

সে রাত্রে ঘুমাই নাই। পাগলের মত ছুটাছুটী করিলাম। পর দিন প্রভাতে আবার ডালিমের বাড়ী গেলাম। ঝী বলিল, সে শেষরাত্রে এসেছিল, আবার ভোর না হইতেই চলে গেছে। একখানা চিঠি রেখে গেছে, তাহাকে বলে গেছে— সকালে একজন বাবু খোঁজ করতে আসবে, তাঁকে এই চিঠিখানা দিস্।

আমি সেই চিঠিখানা লইলাম। খুলিতে খুলিতে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল, চিঠিখানি পড়িলাম :—

তুমি আমাকে খুঁজিতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। মনে করিও আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই— মরিতে পারিব না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহারি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসারে যাকে সুখ বলে তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কাল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি, তাহা কখনও পাই নাই। তাহারি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি তাহা আর হারাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না। প্রাণ সর্ব্বস্ব! আমি বড় দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বাড়াইও না। এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই।

ডালিম।

(নারায়ণ)

পরলোকে চিত্তরঞ্জন

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

ওঠো ওঠো মা আমার
কি হবে কাঁদিয়া আর।
কাঁদিলে তো ফিরিবে না
মোছ মা নয়ন ধার ॥
গেছে যে পুত্র মহা আহ্বানে,
দেশের চরণে প্রাণ বলিদানে,
করুণ ক্রন্দন— সাজে না এখন—
বাঁধো বাঁধো বুক বাঁধো মা আবার
এখনও তপন কিরণ ছড়ায়—
এখনও গঙ্গা হের বয়ে যায়—
পূর্ব্ব কাহিনী — স্মর মা জননী—
ভারতের মাটী নহেতো ক্ষার
নিখুত নহত এখনও তুমি মা
এতই কি ভারী তোমার ভার ?
মহাত্মা গান্ধী স্বদেশানুরাগে,
দ্বারে দ্বারে গিয়ে হের ভিক্ষা মাগে,
"চিত্ত" হারা আজ— ভিখারীর সাজ—
তবু তব ধূলি করেছে সার -
পূর্ণ কোরো মা সে দীন প্রয়াস—
চূর্ণ কোরো মা গরব তার।

———

হার-জিত

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ বি-এল]

(১)

সুরপতি মাষ্টারকে ভয় করত না, এমন ছেলে ইস্কুলে বড় কেউ ছিল না। তাঁর চেহারাটা ছিল কতকটা পশুরাজ ধরণের, মাথার চুল দীর্ঘ, আর তার সঙ্গে প্রকাণ্ড এক জোড়া গোঁফ আর লম্বা দাড়ি মিলিয়ে ঠিক যেন কেশরের আকার ধারণ করেছিল। মোটা ঈষৎ রঙিন কাচের চসমায় সর্ব্বদা ঢাকা থাকত বলে চোখের দৃষ্টি কোমল কি কঠোর বোঝা যেত না, কিন্তু তাঁর ভীত ছাত্রের দল সেই চোখে যে ভয়াবহ দৃষ্টির কল্পনা করত তা বোধ করি বাঘের দৃষ্টির চেয়ে কম নিষ্ঠুর নয়। ছেলেদের শাসন করবার জন্যে তাঁর যে-সব পাশুপত অস্ত্র ছিল, সে-গুলোকে ছেলেরা তাঁর এই চেহারার সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে নিত। বড় বড় বেতের ছড়ি একদিনের বেশী তাঁর হাতে টিকত না, তা ছাড়া শুদ্ধ—মাত্র হাতের কসরতে তিনি যে সকল শাসনের উপায় অবলম্বন করতেন, যেমন চড়, চাপড়, গাঁট্টা, রাম-চিমটি তার মধ্যে কোনটাই অবহেলার যোগ্য ছিল না।

সুরপতির অধিনায়কত্বে ইস্কুলের এই তৃতীয় শ্রেণীর নাম ছিল রৌরব নরক, দীর্ঘনিঃশ্বাসের সেতু, আরও কত কি, এবং এ-কথা সবাই জানত যে, যে অক্ষত দেহে এই তৃতীয় শ্রেণী পার হ'য়ে গেল, তার অগ্নি পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেছে।

বিপিন ছেলেটি সবে-মাত্র ইস্কুলের এই দীর্ঘনিঃশ্বাসের ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছে। তার বাবা অন্য দেশ থেকে সম্প্রতি বদলী হ'য়ে এসেছিলেন। সুন্দর চেহারা, চোখ দুটো উজ্জ্বল, কমনীয়, কিন্তু পড়াশুনায় যে বেশ আগ্রহ এমন ভাবটা সহজে উপলব্ধি হয় না। ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে সে বসত, কারণ তাতে সুবিধা এই ছিল, যে প্রাত্যহিক মার-খোর ঝড়-ঝাপটা উত্তীর্ণ হ'য়ে পড়া দেবার পালা সে পর্য্যন্ত পৌঁছবার আগেই ঘণ্টা বেজে যেত।

সেদিনটা ছিল ভয়ানক গরম, অতিশয় উৎসাহ সত্ত্বেও সুরপতি মাষ্টারের চোখ মাঝে মাঝে নিদ্রায় বুজে আসছিল। এতে শাসন কি-রকম শ্লথ হ'য়ে যেতে পারে এই ভেবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, দাঁড়াতেই দৃষ্টি পড়ল, শেষ বেঞ্চে বিপিনের ওপর, সে একটা কাগজে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কি লিখ্‌ছিল।

চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে ফস্ করে কাগজটা টেনে নিয়ে সুরপতির চক্ষু স্থির।

অঙ্কিত চিত্রটি অঙ্কন বিদ্যা হিসাবে চমৎকার, একেবারে ভুল নেই। মুখটা ঠিক সুরপতি মাষ্টারের, মাথার চুলের বক্র-রেখাটুকু, হাওয়ায় দাড়ির তির্য্যকগতি পর্য্যন্ত একেবারে হুবহু! দেহটা বোধ করি সিংহের, এবং লেজটায় বাঁধা একটা প্রকাণ্ড বেতের ছড়ি। এই অদ্ভুত জানোয়ারটিকে বসান হ'য়েছে একটি টুলের ওপর, এবং তাকে যে খাদ্য ভোজন-ব্যাপারে ব্যাপৃত দেখান হ'য়েছে, সেটি একটি শিশুর মাথা। তলায় লেখা 'পশুপতি।'

সুরপতি গর্জ্জন করে উঠলেন What is this?

সঙ্গে সঙ্গে বিপিন বল্লে King of Beasts Sir!

ভ্রূভঙ্গী ক'রে বল্লেন, King of Beasts! রাস্কেল ছেলে কোথাকার, বার ক'রে দিচ্ছি তোমার কিং অফ বিষ্টস্। ব'লে তাঁর দীর্ঘ বেতটা নিয়ে রুদ্রমূর্ত্তিতে তার প্রয়োগে উদ্যত হ'লেন।

বিপিন বেতটা ধ'রে ফেলে বল্লে, মারবেন না স্যার, মার আমি বরদাস্ত করতে পারি নে।

সুরপতি সহসা বেতটা ছাড়াতে পারলেন না, কারণ যে কব্জি দুটো তাকে ধরেছিল, সে দুটো তরুণ-বাহু হ'লেও সুরপতি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে তাতে অনেক ডম্বেল একসারসাইজের পরিচয় জড়িত আছে। মুখ খিঁচিয়ে সুরপতি বল্লেন, মারবো না ত কি সুড়সুড়ি দেবো, রাস্কেল! মার

বরদাস্ত করতে পারো না ত হিমসাগর তেল মাখিয়ে দোবো না কি !

বেতটা ফস্ করে অতর্কিত মুহূর্ত্তে কেড়ে নিয়ে বিপিন তাকে দু' টুকরো করে জানলা গলিয়ে ফেলে দিতে দিতে বল্লে, মার আজকাল ডিরেক্টার মানা ক'রে দিয়েছেন যে। আপনি যদি আমাকে মারেন ত' আমি বাবাকে ব'লে দোবো, তিনি ডিরেক্টারকে লিখবেন।

এতে খানিকটা ভয়ের কথা যে ছিল না, তা নয়। সুরপতি জানতেন যে বিপিনের বাপ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি চেষ্টা করলে তাঁর মত গরীব সরকারী ইস্কুলের মাষ্টার কিছু গোলযোগে পড়তেও পারে। সুতরাং তিনি নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। কিন্তু এই একটা অপোগণ্ড ছোকরার এই দুর্দ্দান্ত অবাধ্যতায় তাঁর সমস্ত দেহটা রাগে ফুলছিল, অত্যন্ত তীব্রকণ্ঠে তিনি আদেশ করলেন Stood up on the Bench.

রাগে সুরপতির মুখ দিয়ে ইংরাজি খৈ-এর মত ফুটত, কিন্তু সব সময়ে সে ব্যাকরণ মেনে চলত না।

বিপিন নিজের জায়গায় নিশ্চিন্তে ব'সে রইল। সুরপতি গর্জ্জন ক'রে উঠলেন, দাঁড়ালে না ?

বিপিন বল্লে, ওটা পাষ্ট টেন্স ব্যবহার করেছেন, সুতরাং আমার বসা হ'য়ে গেছে !

তাঁর মত এত বড় একজন গুরুজনের এই ভুলটা সকলের সামনে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার মধ্যে যতটা লজ্জা ছিল, ঠিক ততখানি লজ্জা ছিল, তার অজুহাতে তাঁর এই কঠিন আদেশ অমান্য করার ভেতর, এবং এই সবটা মিলে তাঁকে যেন একেবারে মাটির চেয়ে নীচু ক'রে দিলে ! তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, আজকের এই ব্যাপারে তাঁর ভেড়ার দলের মত বাধ্য অপর ছাত্রদের মুখেও হাসির ছটা জেগে উঠেছে। একেবারে পরাস্ত হওয়াও লজ্জার কথা, সুতরাং তিনি হেঁকে বললেন I fine you one Rupee

বিপিন বল্লে কাল দেবো।

তার পরদিন সুরপতি মাষ্টারের ক্লাস সুরু হ'তেই বিপিন টেবলের ওপর তাঁর সামনে একরাশ কড়ি এনে রেখে দিলে।

বিস্মিত সুরপতি বল্লে What's that ?

বিপিন বল্লে Fine sir one Rupee বিশ গণ্ডায় এক পোণ। হিসেব করে দেখুন স্যার।

এই দামাল ছেলেটার হাতে অপমানের একশেষ ! সুরপতি কড়িগুলো সজোরে ঠেলে দিয়ে বল্লেন, নিয়ে যাও !

বিপিন হেসে জিজ্ঞাসা করলে Excused Sir ?

সেইদিন থেকে সুরপতি মাষ্টার বিপিনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন। তার এই সৌভাগ্য-গর্ব্বে অপর ছেলেরা বোধ করি তার ওপর কতকটা হিংসা কল্লেও তারা এ-কথা স্বীকার ক'রে নিলে যে এ সৌভাগ্যের সে সর্ব্বাংশে যোগ্য, এবং সেইদিন থেকে মুগ্ধ ছেলেরা মনে মনে তাকে দলপতির সিংহাসন দান করলে ! সুরপতি সকলকে বারংবার মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টভাষায় সাবধান ক'রে দিতে লাগলেন যে এই ব'কে যাওয়া ছেলেটির সঙ্গে যদি মুহূর্ত্তের জন্যও তারা থাকে তা হ'লে তাদেরও পরকাল নামক বস্তুটি একেবারে জীর্ণ হ'য়ে যাবে।

(২)

অথচ পরীক্ষার যখন ফল বেরোলো, তখন তৃতীয় নয়, দ্বিতীয় নয়, বিপিন হ'য়েছে একেবারে প্রথম ; আর সুরপতির যে প্রিয় ছাত্রটি দ্বিতীয় হ'য়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী নম্বর পেয়ে !

প্রমোশনের লিষ্ট তৈরী হ'চ্ছিল, সুরপতি হেডমাষ্টারের কাছে গিয়ে বললেন, এ কখনই হ'তে পারে না, এই বিপিন ছেলেটা একেবারে Worthless, ও ফার্ষ্ট ত' হতেই পারে না। প্রমোশনও পেতে পারে না। ও নিশ্চয়ই কপি করেছে। ওকে প্রমোশন দেওয়া চলতে পারে না, আমি ওকে খুব ভাল রকম জানি।

হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যে বলছেন কপি করেছে, তার প্রমাণ কিছু পেয়েছেন ?

সুরপতি বললেন, না চোখে কিছু দেখিনি বটে, কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে তার রেজল্ট ! পাঁচবার এক ক্লাসে থাকলেও যে ছেলে পাশ নম্বর পাবে না, সে হোল ফার্ষ্ট !

হেডমাষ্টার ক্লাশ মাষ্টারের এ কথা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, বিপিনকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে জিজ্ঞাসা করলেন, বিপিন তুমি কি পরীক্ষায় কপি করেছিলে ?

বিপিন বল্লে আজ্ঞে না।

হেডমাষ্টার বল্লেন কিন্তু তোমার ক্লাস মাষ্টারের সন্দেহ যে সেই রকম।

বিপিন হেসে বল্লে, ওঁর মতামতের জন্ম দায়ী আমাকে করেন কেন?

সুরপতি বল্লেন, তা হ'লে এক কাজ করা যাক্। ও আবার পরীক্ষা দিক। অন্ততঃ একটা বিষয়ে; তা হ'লেও কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

হেড-মাষ্টার বল্লেন, সে কথা মন্দ নয়, তাতে রাজী আছ?

বিপিন ঘাড় নেড়ে বল্লে আজ্ঞে না।

হেড-মাষ্টার বিস্মিত হ'য়ে বল্লেন, কেন রাজী নয় কেন? এ ত' মন্দ প্রস্তাব নয়।

বিপিন বল্লে,—আমার ওই পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ভেতর আমার সম্বন্ধে যে ঘৃণিত একটা সন্দেহ রয়েছে তারই জন্যে আমি পরীক্ষা দেবো না। আপনাদের সন্দেহের কোন কারণ নেই, কেবল একজনের বিশ্বাস। এর জন্যে আমাকে সকলের সামনে অপমান করার প্রস্তাবে আমি রাজী নই।

হেড-মাষ্টারও একটু রুষ্ট হ'লেন। তিনি বল্লেন যে তা হ'লে ত' আজ তোমার প্রমোশন হয় না। আমরা এ-সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে দেখব। তারপর যেমন উচিত মনে হয় করবো।

বিপিন চুপ করে রইল।

সেদিন প্রমোশন হবার আগেই বিপিন বাড়ী চলে গেল। তারপর সাত আট দিন সে আর এলো না। সাত আট দিন পরেও সে এলো না বটে, কিন্তু ইনস্পেক্টারের কাছ থেকে একটা ক্রুদ্ধ চিঠি এলো হেডমাষ্টারের নামে যে কি জন্যে ক্লাসের মধ্যে ফাষ্ট হওয়া এই ছেলেটিকে প্রমোশন দেওয়া হয় নি, এবং কি প্রমাণের ওপর নির্ভর ক'রে তিনি এই কাজ ক'রেছেন, তার কৈফিয়ৎ অবিলম্বে দিতে। কোথায় কোন কল-কাঠি নড়ে উঠে যে এই চিঠিটির জন্ম হোল, তা অনুমান করতে কারুর বাকী রইল না, এবং তার ফল এই দাঁড়ালো যে হেডমাষ্টার স্বয়ং এই ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে তাকে উঁচু ক্লাশে বসিয়ে দিয়ে এলো।

সুরপতি মাষ্টার ভেবেছিলেন যে এই প্রমোশন ব্যাপার নিয়ে এই দামাল ছেলেটাকে জব্দ করে ছাড়বেন। তাঁর সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গেই এসেছিল, কিন্তু সে একেবারে চূর্ণ হ'য়ে গেল সেইদিন, যেদিন পাঁচশত টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী করে বিপিনের তরফ থেকে উকীলের চিঠি তাঁর কাছে এলো। তারপর অনেক হাঁটাহাঁটি, আর বিপিনের বাবার কাছে অনেক ক্ষমা চাওয়া-চাওয়ির পর ব্যাপারটার যবনিকা পড়ল বটে, কিন্তু এই দামাল ছেলেটার কাছে এই দুর্দান্ত মাষ্টারের নিঃশেষে পরাজয়ের দুরপনেয় ক্ষত-চিহ্ন রয়ে গেল।

(৩)

বারো কি তেরো বৎসরের পরের কথা।

মেডিকাল কলেজ থেকে পাশ করে, বছর দু'তিন প্র্যাকটিস করেই যে সহরটিতে বিপিন নিজের পশার প্রায় জমিয়ে তুলেছিল, সেইখানেই বদলী হ'য়ে এলেন মাষ্টার সুরপতি।

তাঁর জীবন-নদীতে তখন স্পষ্ট ভাটার টান পড়েছিল। শরীরটা হয়েছিল ছ্যাকড়া গাড়ীর মত—আর চলতে চায় না, কিন্তু না চালালেও ত' উপায় নেই। পেন্সন নিতে তখনও বছর চারেক দেরী, অথচ ভবিষ্যতের কোন উজ্জ্বল আশা নেই, ছেলেটির বয়স নয়, মেয়ের বয়স ষোল। ভবিষ্যতের আশা ত নেই-ই তার, বর্ত্তমানের দুশ্চিন্তা মেয়ের বিয়ে দেওয়া। ব্রাহ্মণের ঘরে যে বিয়ের সময় উত্তীর্ণই হ'য়ে গিয়েছে, সুতরাং তার কোনও উপায় না করতে পেরে দুশ্চিন্তার গুরু-ভার জমেই চলেছে। অথচ এই দুঃখে সান্ত্বনা দেবার যিনি একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন—তাঁকেও আজ বছর চারেক হারিয়ে সুরপতির নিকট অতল সংসার-সমুদ্র অতলতর হ'য়ে উঠেছিল।

এই জন্য ছেলে দুটীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি অনেক সময়েই আকুল হয়ে উঠতেন। সংসার সমুদ্রে পাড়ি দেবার সময় ভীষণ মকর-কুম্ভীরকে এড়িয়ে চলবার উপদেশ তিনি বারম্বার দিতেন, এবং এই জাতীয় একজন ছেলে যে একদা তাঁর ছাত্র শ্রেণীতে ছিল, সেই বিপিনের কথাও তিনি কতবার তাদের বলেছেন! তার দুষ্টামীর কথা শুনে ছেলে সুধীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত, কিন্তু মেয়ে লীলার মনে এই দুরন্ত-

ছেলেটির দৌরাত্ম্যের প্রতি কেমন যেন একটা সহানুভূতিও জাগত! বোধ করি তার বয়স হয়েছিল বলে, বোধ করি কতকটা রহস্য প্রিয় নারী-প্রকৃতি বলেও।

গোবর্দ্ধন বলে একটি সৎ-ব্রাহ্মণের ছেলে এই স্কুলে মাষ্টারী করত। তার বয়স এমন বেশী কিছু নয়, ত্রিশের কোটায়। সে বছর দুই হোল তার স্ত্রীকে হারিয়েছে, এবং বছর নয়েকের একটি মেয়ে ছাড়া সংসারে তার আর কেউ নেই। মাইনে বয়সেরই অনুরূপ, অর্থাৎ ত্রিশের কোটায়। সুরপতি এই পাত্রটির পরিচয় পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন; তাকে অনেক অনুনয় ক'রে অনেক ভজিয়ে অবশেষে লীলার পাণিগ্রহণ করতে রাজী করলেন।

মনটা যদিও বা একটু সুস্থির হলো একদিক থেকে, কিন্তু অপরদিক থেকে সে তারও চেয়ে গুরুতর আঘাত পেলে। লীলা বল্লে আমি বিয়ে করব না,—এ কথা বল্লে না যে গোবর্দ্ধনের মত পাত্রে পাত্রস্থ হ'তে সে রাজী নয়, সে শুধু এই কথা বল্লে বাবা, আপনার এ বয়সে আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না।

সুরপতি বল্লেন, আমার বয়স ত' বাড়বে বই কমবে না। হিন্দুর ঘরের মেয়ে এমন কথা বললে লোকে যে নিন্দে করবে!

লীলা বললে, করুক গে; কারই বা নিন্দা সুখ্যাতের অপেক্ষা ক'রে আমরা বসে আছি!

অথচ সত্য কথাটা সুরপতির কাছে গোপন ছিল না তাঁর এই অনেক কষ্টে শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েটি যে শুধু গোবর্দ্ধনের ভয়েই কুমারীত্ব স্বীকার করে নিতে চাচ্ছে একথা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে, দুশ্চিন্তার গুরুভার আরও বাড়িয়ে দিলে! কেমন করেই বা এই দরিদ্র পিতা, তাঁর কন্যার পছন্দ মত পাত্রের সন্ধান পান, সেও প্রকাণ্ড-সমস্যা, এবং এই কথা মনে করেই তাঁর অন্তরের জমাট বেদনা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের রূপ ধরে বেরোতো, যে লীলা সেদিকটা একবারও দেখলে না! একদিকে এই, অপরদিকে গোবর্দ্ধন বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলবার জন্যে তাগিদ সুরু ক'রে দিলে!

মাঝে থেকে ফল হল এই যে তাঁর জীর্ণ মস্তিষ্ক নামক বস্তুটি জবাব দেবার মত করলে! একবার বসে ভাবতে সুরু করলে সে ভাবনার আর শেষ হয় না। এমনি চুপটি করে ভাবতে ভাবতে একদিন স্কুলের বেলা হয়ে গেল, অথচ তাঁর নড়বার কোনও লক্ষণ নেই। লীলা এসে বললে, বাবা স্কুলের যে বেলা হ'ল, নান খান। শুনে সুরপতি বললেন, আজ যে রবিবার, আজ স্কুল নেই।

লীলা বললে, আজ ত রবিবার নয়। রবিবার যে পরশু হ'য়ে গেছে!

সুরপতি রাগ করে বললেন, তোদের সব তাতেই অবাধ্যতা, তোরা কি জানিস!

সেদিন ছিল দ্বিতীয়া অথচ একাদশী ব'লে সুরপতি কিছুতেই অন্ন-গ্রহণ করলেন না, এবং লীলা অনুভব ক'রে দেখলে যে গাও খুব গরম হয়েছে।

(৪)

ডাক্তার বিপিন সেই মাত্র 'কল' থেকে ফিরে এসে একটু বিশ্রাম করছিল। এমন সময় বেহারা একখানা চিঠি এনে দিলে। চিঠিটা এই রকম, –

ডাক্তার বাবু,

বাবার অসুখ হয়েছে—একবার দেখতে আসবেন কি? আমার বাবা শ্রীযুক্ত সুরপতি চট্টোপাধ্যায়, একদিন আপনার শিক্ষক ছিলেন শুনেছি, সেই ভরসাতেই আপনাকে লিখলাম। আমাদের বাড়ী কালীবাজারে ৪ নং। দয়া করে শীঘ্র আসবেন। ইতি—

শ্রীমতী লীলা।

মেয়েলি অক্ষর, কিন্তু সুন্দর মুক্তার মত হরফ। একবারের বেশী পড়তে ইচ্ছে করে।

মা নিজের হাতে তৈরী করা একগ্লাস সরবৎ এনে বিপিনকে দিতে দিতে বাংলা চিঠিটা চ'খে পড়ল। বললেন, কার চিঠি বিপিন?

বিপিন হেসে বল্লে, সেই সুরপতি মাষ্টারকে মনে আছে মা, যে আমাকে প্রমোশন দিতে চায় নি। তার মেয়ের লেখা, মাষ্টার মশাইএর অসুখ। তিনি যে আবার এখানে তা জানতাম না!

মা চিঠিটা নিয়ে পড়ে বল্লেন, আহা একবার যেয়ে দেখে

দেখে আয় গিয়ে বাবা। তোর কি সুরপতি মাষ্টারের ওপর এখনও রাগ যায় নি বিপিন ?

বিপিন বল্লে, না মা রাগ আমার নেই। কিন্তু জেদ যে মানুষকে মাঝে মাঝে কত বড় অন্যায় করায় তার একটা মস্ত বড় দৃষ্টান্ত বলেই আমার তাঁকে মনে আছে।

মা হেসে বল্লেন, জেদ জিনিষটাই যে খারাপ তা নয়, যদি সে অন্যায়ের পথে না যায়। তুই কি আমার কম জেদী ছেলে বাবা, বলে পুত্রের পানে এমনি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাইলেন যে বিপিন তাড়াতাড়ি বল্লে না মা আমি নিশ্চয়ই যাব।

* * * *

৪নং কালী বাজারের বাড়ীতে বেলা তিনটে আন্দাজ বিপিন উপস্থিত হোল। একটা অপ্রশস্ত ছোট ঘর, সেইটেই বাইরের ঘর, একটা জীর্ণ টেবিল, গোটা দুয়েক হাত-ভাঙ্গা চেয়ার আর, গোটা-কতক ছেঁড়া বই, এই তার প্রধান আসবাব। সুরপতি মাষ্টারটিকে জানা আছে, এবং তাঁর যে একটি মেয়ে আছে তাও জানা গেল। কিন্তু পরিবারের বাকী ইতিহাস অজ্ঞাত। সুরপতি মাষ্টারের নিজের অসুখ, তাঁকে ডাকা চলে না, মেয়েকেও ডাকা নীতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং বিপিন "বেয়ারা" "বেয়ারা" ক'রে ডাকলে।

উত্তরে যে মেয়েটি এসে ঘরে ঢুকল, সে যেন তার রূপের আলোয় ঘরটাকে মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল ক'রে তুললে। গৌরবর্ণ মুখের ওপর কোঁকড়ান অলক-গুচ্ছ বিস্রস্ত, তার ওপর মোটা পরিষ্কার শাড়ীর চওড়া কালাপাড়টি এমনি সুকুমারভাবে বেঁকে পড়েছিল, যে মুহূর্ত্তে যেন মনে হ'ল যে এমন রূপ সহসা দেখা যায় না।

বিপিন বল্লে, আমি ডাক্তার বিপিনচন্দ্র বাঁড়ুয্যে। আপনিই চিঠি লিখেছিলেন ?

লীলা বল্লে, হ্যাঁ—।

বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, মাষ্টার মশায়ের কি অসুখ ?

মাষ্টার মশাই এবং তাঁর এই ছাত্রের মধ্যে কি সম্বন্ধ যে ছিল, লীলা তার আভাষ জানত, কিন্তু তথাপি অধুনা এই কৃতী ছাত্রটি যে তাদের সেই পুরাণো সম্বন্ধ স্বীকার ক'রে নিলে, অনায়াসে অতীতের সেই তুচ্ছতাকে অতিক্রম ক'রে গেল, এই জিনিষটাই লীলার বুকের মধ্যে এমনি একটি আরাম দিলে যে হঠাৎ মনে হ'ল যেন তার দু'চোখ ঝাপসা হ'য়ে উঠছে!

তারপর বল্লে, কেমন যেন মাথা খারাপ ব'লে বোধ হয়। আজ জ্বরও হয়েছে। আপনি দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।

বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, আপনার মা ?

লীলা সজল চক্ষে বললে, মা আমার আজ চার বছর ছেড়ে গেছেন।

বিপিন বল্লে, আর কে আছেন ?

লীলা বল্লে, এক ছোট ভাই সে ইস্কুলে গেছে।

বিপিন বল্লে, চলুন দেখে আসি।

বিপিন সুরপতির কাছে গিয়ে বসল। তখন তাঁর চোখ বোজা। লীলা বললে, বাবা, বিপিন বাবু ডাক্তার এসেছেন।

হঠাৎ চোখ খুলে সুরপতি যেন চমকে উঠলেন। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বল্লেন তুমিই বিপিন ?

বিপিন বল্লে আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুরপতি বল্লেন, প্রমোশন পেয়েছ ?

বিপিন বল্লে, হ্যাঁ, আপনিই ত' দিয়েছিলেন।

সুরপতি ভাবতে লাগলেন, না কই আমি ত' নয়।

বিপিন হেসে বল্লে, আপনিই ত'! ভুলে গেছেন!

সুরপতি আবার ভাবতে লাগলেন, বললেন, হবে, তাই হবে।

বিপিন বললে, আপনার জ্বর হ'য়েছে, চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন। সেরে যাবে।

হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ল, সুরপতি বললেন, বিপিন আজ রবিবার নয় ?

বিপিন বললে, হ্যাঁ রবিবারই ত'।

সুরপতির মুখে হাসি দেখা দিল। লীলাকে দেখিয়ে বল্লেন, লীলা বলছিল রবিবার নয়।

বিপিন বললে, ওর ভুল।

সুরপতি হেসে বললেন, লীলা এই বিপিন আমার ছাত্তর। বড় ভাল ছেলে। নইলে ডাক্তার হয় ? গোবর্দ্ধনের চেয়ে ঢের ভাল।

বিপিন হঠাৎ লীলার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে যেন পাথরের মূর্ত্তি!

তখন সে আস্তে আস্তে সুরপতিকে শুইয়ে দিয়ে বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না। দুনিয়ায় ভাল মন্দ সবই আছে। কিন্তু আপনাকে চুপ করে থাকতে হবে।

সুরপতি বললেন, তাই ভালো।

বিপিন বেরিয়ে পড়ে বললে, দুঃখে, ভাবনায়, মাথা খারাপ হ'য়েছে বলেই বোধ হয়। কিন্তু কি কারণ ঠিক জানা গেল না। আমার বিশ্বাস খুব নিকট কারণ একটা আছে। কাল আবার আসব।

তারপর লীলার উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চেয়ে বললে, ভাবনা কি? সেরে যাবেন।

লীলা বললে, কাল নিশ্চয়ই আসবেন। কখন আসবেন?

বিপিন বললে তা ঠিক বলতে পারিনে। তবে সকাল সকাল আসবার চেষ্টাই করব।

লীলা তার হাত বাড়িয়ে সঙ্কুচিত হয়ে বললে, আপনার ফি!

বিপিন হাসতে লাগলো, বললে, ফি আমি কেমন ক'রে নিই! আমি যে আপনার বাবার ছাত্র। তবে যদি আপনার হাতের পান এক-আধটা দেন ত নিতে পারি।

'আপনার হাতের পান'! বুকের ভিতরটা এ কি করে! লীলা বললে 'আনচি।'

পান নিয়ে বিপিন যাবার জন্যে উঠল লীলা বললে; কাল নিশ্চয়ই আসবেন।

বিপিন বললে, নিশ্চয়ই!

(৫)

তার পরদিন বিপিন যখন এলো, তখন প্রায় সন্ধ্যা। তাকে দেখে স্পষ্টই যেন লীলার মুখের উৎকণ্ঠার ভাব অন্তর্দ্ধান করলে।

লীলা আজ তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। সেখানে সযত্নে সাজা পান এনে দিলে—বললে চলুন, বাবাকে দেখে আসবেন।

বিপিন হাসতে লাগলো।, বললে আজ পানের আয়োজনটা বিরাট দেখছি। বাজারের পান নয় ত; ও পান আমি খাইনে।

লীলা লজ্জিত হ'য়ে বললে, 'না আমার সাজা।'

দুটো পান মুখে দিয়ে বিপিন বললে, একটু পরে আপনার বাবাকে দেখবো। তার আগে গোটাকতক কথা জানতে হবে।

লীলা বললে ফি আপনি নিলেন না, আমাদের নিকট মনে ক'রে। অথচ আমাকে 'আপনি' বলছেন। আমাকে 'তুমি' বলবেন।

বিপিন হেসে বললে, তাই বলব। কিন্তু একটা কথা জানতে চাই। সেইটে প্রয়োজনীয় বলে বোধ হচ্ছে। এই গোবর্দ্ধনটি কে? যার কথা তোমার বাবা কাল বলছিলেন?

হঠাৎ লজ্জায় লীলার সমস্ত মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল। সে মাটির দিকে মুখ ক'রে বললে, তিনি ওঁদের স্কুলের মাষ্টার।

বিপিন বললে, তারপর? তিনি ইস্কুলের মাষ্টারও হ'তে পারেন, জেলার জজও হ'তে পারেন। সে খবর আমি চাচ্চিনে। আমি চাচ্চি সেই বিশেষ খবরটা যার জন্যে তাঁর কথা তোমার বাবার এই অবস্থাতেও মনে পড়ে গিয়েছে।

লীলা মাটির দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রৈল তারপর বিপিনের দিকে চেয়ে বললে, সেটা না শুনলে কি চলবে না?

বিপিন বললে, এই অসুখের ইতিহাস জানতে গেলে বোধ করি সে কথা না শুনলে চলবে না; অন্ততঃ এটার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ তা শোনবার আগে ত বোঝা যাবে না। অথচ অসুখের মধ্যেও যখন উনি গোবর্দ্ধন বাবুর কথাটা মনে করেচেন, তখন আমার মনে হচ্ছে, ওর সঙ্গে হয়ত এ অসুখের একটা সম্বন্ধ আছে। বল, লজ্জা করলে চলবে না।

লীলা বললে, না বলতে পারলে আমার পক্ষে ভালই হোত; কিন্তু যখন দরকার তখন আর উপায় কি? গোবর্দ্ধন বাবু ওঁর ইস্কুলের একজন নীচের ক্লাসের মাষ্টার, বছর দুয়েক হ'ল তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, একটি ন বছরের মেয়ে আছে। তাঁর সঙ্গে বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ করছিলেন। বলে লীলা চুপ করল।

বিপিন বললে, 'তারপর'।

লীলা মাটির দিকে চেয়ে বললে, আমি তাতে বলেছিলাম যে বাবার শরীর ভাল নয়, আমি বিয়ে করব না।

লীলার আনত রক্তিম মুখের দিকে চেয়ে বিপিনের কাছে

কোন কথাই আর গোপন রহিল না। একদিকে বাপের অভাব আর হৃদয়-হীনতা, অপরদিকে এই শিক্ষিতা মেয়েটির স্পষ্ট অনিচ্ছা প্রকাশের ছল্প উপায়, এ দুই ই বিপিনের কাছে পরিষ্কার হ'য়ে উঠল। হিন্দুগৃহে বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়ে যে কতবড় ভার বিপিনের কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না, এবং যে কোন প্রকারে সামাজিক এই দায় থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়া যে সুরপতিকে কতখানি আঘাত ক'রেছে তাও বুঝতে বাকী রইল না, বিশেষ যখন সেই আঘাতটা এলো স্বয়ং লীলার কাছ থেকে। পিতার স্নেহ বোধ করি পাত্র হিসাবে গোবর্দ্ধনকে পছন্দ করেনি, কিন্তু পিতার দায় জ্ঞান সুরপতিকে অন্যপথে চালিত করছিল। সেই জন্যেই গোবর্দ্ধনের চেয়ে বিপিন যে ভাল, এই কথাটা সুরপতির অজ্ঞাতে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল!

বিপিনের মনে হোল ব্যাপারটা বোধ করি তার কাছে অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। সে হেসে বললে, "কিন্তু বোধ করি চিরকুমারী থাকবার তোমার কোন বিশেষ দৃঢ় পণ নেই; ও পনটা গোবর্দ্ধনকে আশ্রয় করেই হয়েছিল।"

লীলা চুপ ক'রে রইল। বিপিন সুরপতিকে দেখতে গেল।

(৬)

তার পরদিন বিপিন সুরপতিকে দেখতে এসে লীলার হাতে একখানি চৌকোনা খাম দিয়ে বললে, জবাবটা দরকার।

লীলা কম্পিত হস্তে খামখানা খুলে পড়লে;—

"লীলা,

তোমাকে মস্ত একটা বড় কথা লিখতে যাচ্ছে—যার উত্তরের ওপর আমাদের জীবনের অনেকটা নির্ভর করছে। গোবর্দ্ধনকে পছন্দ হয় না, আমাকে হয়? যদি হয় তা হ'লে অবিলম্বে আমাদের মিলিত জীবন-যাত্রা করা যাক্। লিখো, আর যদি না হয় তাও লিখতে সঙ্কোচ ক'রোনা, কেন না এতবড় একটা জীবন-মরণের ব্যাপারে সঙ্কোচের স্থান নেই।

বিপিন।"

সেদিন সুরপতির অবস্থা যেন অনেকটা ভাল বোধ হ'ল, বোধ করি চিকিৎসার গুণে, অথবা অন্য কোন কারণে। সুরপতি বল্লেন, বিপিন সেই তের বছর আগেকার কথা আজি এখনো ভুলতে পারিনি, আমার মনে হয়েছিল, বুঝি বা তুমি কখনও আমাকে ক্ষমা করবে না।

বিপিন হেসে বললে, আমি সেকথা ভুলতে পারিনি এই হিসেবে যে সে আমার মস্ত একটা শিক্ষা হয়েছিল। আমার মনে মনে এই সকলই জেগে উঠেছিল যে যেমন করেই হোক, শেষকালে আমাকে জিততেই হবে। সেই জয়টা যে একটা কতবড় জিনিষ হবে, এই আমোদের নেশাই যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল। মোটের ওপর এইটুকু বলতে পারি যে ওর জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই, বরং বোধ করি কতকটা কৃতজ্ঞতার ভাবই আছে। অপমানিত না হলে বোধ হয় সম্মান লাভ করবার জিদ্‌ও হ'ত না। কিন্তু ও সব কথা থাক।

বিছানার ওপর বসে সুরপতি বিপিনের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'ও, মস্ত বড় মন।

বিপিন বললে, আপনি অনেকটা ভাল হয়েছেন, আরও নেই ৫।৭ দিনেই সেরে যাবে বোধ হয়।

সহসা সুরপতি বললেন, গোবর্দ্ধনকে চেন বিপিন?

বিপিন বল্লে, না।

সুরপতি একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেন, দেখ আমারই ভুল তুমি কেমন করে চিনবে? আমাদের ইস্কুলের লোয়ার ক্লাসের মাষ্টার। লীলার সঙ্গে তার বিয়ে দেবার ঠিক করেছিলাম—মার পছন্দ নয়; কলিকাল বাবা; বড় মুস্কিলেই পড়েছি - তাই নিয়ে মনটা এমন চঞ্চল হোল।

বিপিন চুপ করে রইলো।

হঠাৎ বিপিনের ডান হাতটা নিজের হাতের ভেতর ধরে সুরপতি বললেন, বাবা এর একটা উপায় করতে হয়। তোমার জানাশুনো ভাল ছেলে নিশ্চয়ই আছে—তুমি যদি একটু চেষ্টা করো বাবা। গরীবের বড় উপকার করা হয়। বিপিন খানিকটা চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে 'দেখবো।'

ফিরে আসবার পথে লীলার সঙ্গে দেখা হোল। তার মুখখানি যেন শিশিরে ধোয়া ফুলের মত সুন্দর দেখাচ্ছিল, চোখের কোণে হাসিও অশ্রুর মিলন, মেঘ ও রৌদ্রের মত

আপনার। ছোট্ট একখানি চিঠি দিয়ে সে ক্রতপদে আপনার ঘরে ফিরে গেল।

বাইরে ল্যাম্প-পোষ্টের কাছে চিঠিখানি খুলে বিপিন পড়লে, শুধু একলাইন লেখা,

"শ্রীচরণের চিরদাসী লীলা"

চিঠিখানা বুকের মধ্যে সযত্নে রেখে বিপিন চলে গেল।

(৭)

এমনি করে দুটি ছোট নির্ভীক চিঠির দৌত্যে যখন তাদের পরস্পরের মনের কথা জানা হ'য়ে গেল, তখন বাকী রইল শুদ্ধ বাইরের কথাবার্ত্তা। মা শুনে বড় আনন্দ লাভ করলেন, কারণ লীলা আর বিপিনের মধ্যে যে গোপন পরিচয় চলছিল, তা তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল না, আর তাকে তিনি পরম স্নেহের চক্ষেই দেখছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত বিবাহে অনিচ্ছুক তাঁর কৃতী ছেলেটি যখন নিজেই পাত্রী পছন্দ করে নিলে, তখন তাদের মনপ্রাণে আশীর্ব্বাদ করা ছাড়া মা আর কি করতে পারেন?

তখন তিনি বিপিনের জ্যেঠতুতো ভাই সুশীলকে ডেকে বললেন, সুশীল, তুমি গিয়ে সুরপতি বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করে এসো। এই মাসের ২০শে যেন বিয়ে হয়।

সুশীল নিজের পরিচয় দিয়ে সুরপতিকে বললে, আপনার সঙ্গে আমার একটা দরকারী কথা আছে।

সুরপতি সাগ্রহে বললেন কি?

সুশীল বললে, বিপিনের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিবাহ প্রস্তাব করতে এসেছি।

সুরপতি দুই হাতে নিজের মাথা টিপ্‌তে লাগলেন, চোখ-দুটো যেন প্রত্যক্ষ বস্তু ছাড়িয়ে কোন সুদূরে চলে গেল, বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগলো। নিজেকে প্রকৃতিস্থ ক'রে বললেন,

সত্যি, সত্যি বাবা?

সুশীল হেসে বললে, সত্যি বই কি। খুড়িমা আমাকে এই জন্যে আপনার কাছে পাঠালেন। আপনার যদি মত হয়, ত তাঁর ইচ্ছে এই মাসের ২০শে শুভ-কার্য্য হয়।

সুরপতি বিড়বিড় ক'রে বকতে লাগলেন, আজ হোল ৮ই, ২০শে হ'লে মাঝে বার দিন, ২০শে বোশেখ।

তারপর সুশীলের দিকে চেয়ে বললেন, "বাবা, ২০শে কেন, তাঁকে বলো আমি ৯ইও দিতে পারি, আজ হোল ৮ই, তার মানে কালও দিতে পারি, তাঁর দয়া দয়া" বলে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠলেন, বললেন, "বাবা দয়াময়ীকে ব'লো যে তিনি আমাকে যেচে আকাশের চাঁদ দিয়েছেন— কিন্তু আমি বড় গরীব, বড় অপদার্থ" বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

খানিকটা কেঁদে বললেন;—মাথাটা পরিষ্কার হ'ল। সমস্ত ময়লা বেরিয়ে গেল। হাঁ বাবা, তাঁকে বলো যেদিন ইচ্ছে তিনি লীলাকে নিয়ে যাবেন। এ আমার মস্ত সৌভাগ্য।

এমন সময় বিপিন এসে বললে, আজ আপনি কেমন আছেন?

বিছানা থেকে নেবে পড়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে সুরপতি বললেন,—Cured perfectly Cured একেবারে আরাম হ'য়ে গিয়েছি বাবা। ব্যারামের আর চিহ্ন মাত্র নেই! God bless you বিপিন!

তারপর বিপিনকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আজ তোমার ষোল-আনা জিত বাবা! কি হারই হারিয়েছ আমাকে। এই পরাজয়ের গৌরব-চিহ্ন আমার সারা-জীবনেও মুছবে না, বাবা!

* * * *

বাহিরে যাবার পথে, পাশের ঘর থেকে বিপিন কার মৃদু-কণ্ঠের ডাক শুনতে পেলে,—একবার শোনো।

বিপিন গিয়ে দেখলে লীলা পরিষ্কার একখানি শাড়ী পরে তারই অপেক্ষায় যেন রয়েছে। বিপিন বললে—কি?

লীলা গলায় কাপড় দিয়ে গড় হ'য়ে তাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে যখন দাঁড়াল, তখন মনে হোল যেন উষার সমস্ত অনবদ্য সৌন্দর্য্য তার লজ্জারক্তিম মুখ-খানিকে আশ্রয় ক'রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে।

বিপিন হেসে বললে, লীলা, আজই আমার সত্যিকার কি পাওয়া হোল!

বিজয়ী চিত্ত

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

আষাঢ়ের মেঘ আপনভোলা প্রেমিক বিরহী চিত্তরঞ্জনকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। প্রিয় সন্দর্শন আশায় আদর্শ প্রেমিক পুরুষ শৈল-শিখরে সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। আকাঙ্ক্ষীতের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায়—প্রতীক্ষা করিতে করিতে চিত্তরঞ্জনের জীবন অসহ্যবোধ হইতেছিল, তাই জীবনের দুর্ব্বহ ভার নড়াইয়া বিরহী আজ অতীতের কোলে গিয়া জুড়াইলেন।

দেশের লোকে ইহাতে দুঃখ করিতেছে—কোটি নরনারীর চোখের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে—সম্মুখের আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে। ইন্দ্রপাত হইল—এ কথাটার অর্থ আমরা যেন চিত্তরঞ্জনের বিয়োগে কতকটা বুঝিতে পারিতেছি। নিখিল ভারতরাষ্ট্রের হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন শোকোচ্ছ্বাস আর বুঝি দেখা যায় নাই। কোন ভাগ্যবান দেশের হৃদয়ের সঙ্গে এমন যোগাযোগ করিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহাও জানি না।

ভারতের বাহিরে সাত সমুদ্রের পরপারে এ সম্বাদ বিদ্যুৎ-বেগে ছড়াইয়া পড়িয়াছে - দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত এড়াইয়া এ দুঃখ সম্বাদ ধ্বনিত হইয়াছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা বিরাট কম্পন অনুভূত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন নাই—অনেকেই তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই—তবু সকলেই যেন জানে চিত্তরঞ্জন তাহার বড় আপনার, বড় অন্তরঙ্গ। এ আপন জানে দেশ কাল পাত্রের ভেদাভেদ নাই, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহা অনুভব করিতেছে।

চিত্তরঞ্জন যাহা বলিয়াছেন, যাহা করিয়াছেন—যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছে—দেশ বিদেশে তাঁহার প্রাণের আশার বাণী ঝঙ্কৃত হইয়াছে—মানব সমাজ মুগ্ধচিত্তে তাহা শুনিয়াছে। আশার আলো হস্তে চিত্তরঞ্জন মানবসমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন—আশা জাগাইয়া দিয়া আশা-মুগ্ধ মানবের কর্ম্ম প্রচেষ্টা,—হৃদয়ের ধারা পরিবর্ত্তন তিনি অমরার নন্দনে বসিয়া সুমধুর স্নিগ্ধ হাস্যের সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

চিত্তরঞ্জন বিরাট ত্যাগী, আদর্শবাদী নির্লিপ্ত পুরুষ ছিলেন। অসাধারণ ভাবপ্রবল হৃদয় ছিল তাঁহার, মস্তিষ্ক ছিল অপূর্ব্ব ক্ষমতাশালী। হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—মস্তিষ্ক কর্ম্মে জয়ের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এমন দীপ্ত হৃদয় ও মস্তিষ্কের খেলা বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

চিত্তরঞ্জন ভাবিয়া চিন্তিয়া, ফলাফল খতাইয়া কর্ম্ম করেন নাই—হৃদয় তাঁহাকে যাহাতে প্রবৃত্ত করাইয়াছে চিত্তরঞ্জন তাহাতে একনিষ্ঠ হইয়া লাগিয়াছেন। হৃদয়ভাবকে এ মর্য্যাদা দান করিয়া চিত্তরঞ্জনকে কোনদিন অনুশোচনা করিতে হয় নাই। কর্ম্মে আশাতীত ফল তিনি আজীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জনের অসামান্য ত্যাগ, একনিষ্ঠা তাঁহার জীবনের আরম্ভেই দেখা গিয়াছে। ব্যবসায় জীবনে হৃদয়ের প্রেরণাই তাঁহাকে স্বদেশী মামলায় নিয়োজিত করাইয়াছিল—সে মামলায় ফল লাভের বিচার করিয়া কর্ম্ম করিতে গেলে চিত্তরঞ্জনের পক্ষে তাহাতে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হইত না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ভাবপ্রবণ হৃদয়-প্রেরণাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিল তাঁহার বিরাট ক্ষমতাশালী মস্তিষ্ক।

ফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন নাই—কিন্তু ফল আপনা হইতেই আসিল। এত আসিল যে সে আশাতীত। ব্যবসায় ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ প্রতিষ্ঠার কীর্ত্তি সুদৃঢ় হইল। অর্থ অজস্রধারে আসিতে লাগিল।

চিত্তরঞ্জন কখনো বিরাটকর্ম্মী, কখনো ব্যবসাসক্ত বিলাসী, কখনো দাতা, কখনো কাব্যরসোন্মাদ—হইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। জীবন মিথ্যা নহে—স্বপন নহে—সত্য এ জীবন, জীবনকে উপভোগ করিতে হইবে, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে

হইবে—পর পর নানা কর্ম্মে জীবনের অতৃপ্ত বাসনা চিত্তরঞ্জন নানাভাবে মিটাইয়াছেন।

কিন্তু তবু আরো চাই—আরো চাই বলিয়া তাঁহার অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয় এক একবার কাঁদিয়া উঠিয়াছে—চিত্তরঞ্জন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। বন্ধন নাই—বন্ধন জানি না—স্বাধীন আমার হৃদয় তবু তবু কেন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠে!

কি যেন নাই—কি যেন পাই নাই—কিসের যেন একান্ত অভাব রহিয়াছে, এ অভাবের ব্যথা চিত্তরঞ্জনের বড় বাজিতে লাগিল। তিনি উদভ্রান্ত হইলেন।

আইনজ্ঞ চিত্তরঞ্জন ধর্ম্ম, প্রেম, সাহিত্য, নানা জিনিসেরই চর্চ্চা করিলেন—কিন্তু কিছুতেই প্রাণের সত্য অভাব যেন মেটে না। অভাব দিনের দিন বাড়িয়াই চলিল।

এমনি অবস্থায় মানব স্বাধীনতার নূতনবাণী লইয়া মহাত্মা গান্ধী আসিলেন।

এই তো আলো—এইতো প্রার্থিত—চিত্তরঞ্জ বুঝিলেন। বুঝিয়াও কিন্তু সাধনার ধন,. চিরকাম্যকে তখনি আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। বুঝি বা শঙ্কা আসিল একদিকে সর্ব্বস্ব, আজীবনের শিক্ষা, সংস্কার, মোহ—অন্যদিকে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত—চিরকামনার ধন। কিন্তু হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিতকে পাইতে হইলে সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে—বন্ধন মুক্ত হইতে হইবে!

চিত্তরঞ্জন বাধা দিলেন মস্তিষ্ক বুঝি তাঁহার হৃদয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল—কিন্তু জয়ী হইতে পারিল না। হৃদয়ের কাছে মস্তক নত হইল—চিত্তরঞ্জন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া হৃদয়-ধনকে বরণ করিলেন।

এই সর্ব্বস্ব ত্যাগে দেশ মুগ্ধ হইল—বিস্মিত হইল!

দেশপ্রেমে অধীর চিত্তরঞ্জন দেশের মুক্তির জন্য আকুল হইয়া চিন্তা ও কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তিনি বলিতেন—স্বরাজ আমার ধ্যান জ্ঞান সব—আমি অন্য কিছু ভাবিতে পারি না, করিতে পারি না!

মানুষে মানুষে ভেদ নাই—মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতাকে দাবাইয়া রাখিয়া অপরের তাহাদের উপর দণ্ড চালনের অধিকার নাই—কোন মানুষেরও নিজ সভ্যতা শিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া অপরের দাস হইয়া থাকা ধর্ম্ম নহে—চিত্তরঞ্জন মানব সমাজে ইহাই প্রচার করিতে লাগিলেন।

ধনী দরিদ্র সাজিলেন, পরম বিলাসী ফকিরী অবলম্বন করিলেন।

অ-স্বাধীন, পরবশ মানুষ অন্য সহস্র বিষয়ে পরম সুখী হইলেও তাহার চিত্তসুখী হইতে পারে না—অন্তর তাহার কি যেন কি পাইবার জন্য সদাই হাহাকার করিতে থাকে। জীবন তাহার কাছে দুর্ব্বহ অসহ্য মনে হয়। চিত্তর সুখের জীবন স্বাধীনতার জন্য তেমনি অশান্ত অধীর হইয়া উঠিল।

অন্তর যখন এমনি অধীর—মস্তিষ্কও তখন দেশের জন্য নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ণের জন্য ব্যাকুল হইল। দেশ-বিদেশ খ্যাত আইনজ্ঞ চিত্তরঞ্জনের পর-রচিত আইনের ব্যাখ্যান দিবার আগ্রহ ও উৎসাহ রহিল না। নিজ দেশে—নিজ রচিত দেশকাল পাত্র উপযোগী আইন গঠন করিবার জন্য দেশের ধারায় তিনি আপনাকে মজ্জিত করিয়া ফেলিলেন।

দেশ-প্রেমিক চিত্ত—স্বাধীনতা-বিরহী চিত্ত প্রেম পথের বাধা বুঝিলেন বিরহ দূর করিবার অন্তরায় কত তাহা দেখিলেন।

যে হৃদয় ও মস্তিষ্ক এতকাল তাহাকে জয়যুক্ত করিয়া আসিয়াছে—যাহা কখনো নিরাশায় ম্লান হয় নাই ফলাফলের চিন্তায় কর্ম্মের পক্ষের বাধা হয়নাই—আজ তাহাও যেন কেমন বিভ্রান্ত হইল।

কিন্তু চিরকালের জীবন যুদ্ধে বিজয়ী বীর—অসাধ্য সাধন কিম্বা দেহের পতন এই নীতি অনুসরণ করিয়া তাহার চির-পিপাসিত অন্তর ও .মস্তিষ্কের ক্ষুধা মিটাইবার পথে অদম্য উৎসাহে চলিতে লাগিলেন।

জয়ের পর জয় তাঁহার আয়ত্ব হইতে লাগিল—কিন্তু আশা তো তাহার সীমাবদ্ধ নহে—অনন্ত এ আশা, তাই চিত্তরঞ্জন শেষ পাইবার আশায় নিজেকে আহুতি দিলেন।

কাম্যকে পাইবার জন্য এমন আত্মাহুতির উদাহরণ জগতের মানব ইতিহাসে বড় বেশী মেলে না। যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়া কাম্যকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছেন তাঁহারা বিরহী হিসাবে যেমন প্রেমিক হিসাবেও তেমনি উজ্জ্বল হইয়াছেন। বিজয়ী বীর হিসাবেও তাঁহারা তেমনি

ভাস্বর হইয়া বিশ্ব-ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন জীবনে জয় ছাড়া পরাজয় জানেন নাই—পরাজয় তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারে নাই—জয়ের পর জয়ের মধ্য দিয়াই তিনি মহাপ্রয়াণ করিতে পারিয়াছেন।

জীবন ও মরণের খেলা বিশ্বের চিরন্তন সত্য। এ সত্যকে এড়াইবার সামর্থ্য কাহারও নাই। জীবনের সাধনায় জয়ী হইয়া মরণকে যিনি বরণ করিতে পারেন তাঁহারই চিত্ত শান্তি পায়—মরণ তাঁহাকে আঁধারে ডুবাইয়া ফেলিতে পারে না—আলোর রাজ্যেই লইয়া যায়—অমৃত তাঁহারই প্রাপ্য হয়।

চির তৃষাতুর বিরহী প্রেমিক, সংসার যুদ্ধে বিজয়ী বীর মরণের পরে আরও ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছেন। মরণ তাঁহাকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

মানুষ বিজয়ী চিত্তের মরণের আগে বোধ হয় ভাবিতেও পারে নাই যে মরণ মানুষকে এমনও উজ্জ্বল করিতে পারে।

মানবতা চিত্তকে উজ্জ্বল করিয়াছে—দেশপ্রেম চিত্তকে বরণীয় করিয়াছে—স্বাধীনতার বিরহ চিত্ত যুগে যুগে মানবের হৃদয় রাজ্যের অধিশ্বর রহিবেন।

সংসারের বিজয়বীর—নির্লিপ্ত পরম-কামনা-পিয়াসী চিত্ত আজ চির আনন্দ রাজ্যের অধিবাসী, চিত্তের সকল বিরহ জ্বালা আজ তিনি প্রেমময়ের সঙ্গে মিলাইয়া শান্তি পাইয়াছেন।

পরম গৌরবময়, চির আপনার চির জাগ্রত চিত্ত দেশবাসীর চিত্ত-রাজ্য চির-বিজয়ী সখারূপে বিরাজ করিবেন। দেশে মানুষের পর মানুষ আসিবে ইতিহাস তাহাদের বিজয়ী চিত্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। চিত্তের কথায় মানুষের সারা চিত্ত সাড়া দিয়া উঠিবে।

দেশবন্ধু স্মরণে

[শ্রীপ্রসাদকুমার রায় বি এ]

(১)

দেশবন্ধু, দীন-বন্ধু, হে চিত্ত-রঞ্জন !
এত ত্বরা কর্ম্ম তব হ'ল সমাপন !
যে মহান দেশ-হিত-ব্রতে
ভোগ ছাড়ি' বৈরাগ্যের পথে
আসিয়া দাঁড়ালে দৃপ্ত বীরের মতন,
সেই ব্রত আজি কি হে হ'ল উদ্‌যাপন !

(২)

মৃত্যু কি আনিবে ধ্বংস সে মহা কর্ম্মের !
কোথা মৃত্যু ? মৃত্যুঞ্জয় তুমি যে মর্ত্তের !
মৃত্যু ? মৃত্যু এরে কবে কেবা ?
এ যে মার গরীয়সী সেবা—
এ যে নব প্রাণ দান মৃত স্বদেশের !
মৃত্যু নহে—সূচনা এ নব জীবনের !

(৩)

জন্মে জন্মে আসি 'এই মাতৃ-অঙ্ক' পরে
হে বীর-সাধক-শ্রেষ্ঠ একাগ্র অন্তরে
মত্ত হবে নব প্রতিভায়
তব পূত সাধনা লীলায়।
মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জন্ম জন্মান্তরে
উঠে নর সাধনার উচ্চতর স্তরে !

"দেশবন্ধু" তিরোধানে

[কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়]

তোমার প্রারব্ধ কর্ম্ম হ'ল নাক শেষ,
কোথা গেলে দেশবন্ধু ! কাঁদিতেছে দেশ !
বাঙালার দুরদৃষ্ট গেল আশুতোষ -
তুমিও যাইলে !—একি দেবতার রোষ !
খেটেছিলে বড়, দেশ মাতৃতার তরে,
ঘুমায়ে পড়েছ বুঝি তাই অকাতরে !
মহানিদ্রা তোমারে করিল অধিকার,—
বাঙালীর মোহনিদ্রা টুটিবে কে আর ?
তবু যে চৈতন্য দেব নির্জ্জীব পরাণে
দিয়ে গেলে—একদিন বিধির বিধানে
হয়ত করিবে কাজ, হে নর দেবতা,
বুঝেছিলে মর্ম্মে মর্ম্মে বাঙালীর ব্যথা !
ছিলে তুমি শাপভ্রষ্ট দেবতা নিশ্চয়,
একাধারে এত গুণ মানবে কি রয় ?
লোকাতীত যেই তেজ ত্যাগের গৌরব
রেখে গেলে—রবে তাহা শাশ্বত বৈভব
বাঙালার—ভারতের—জগতের আর
জন্মে জন্মে বাঙালায় আসিও আবার !

স্বরাজ সাধনা

[৺চিত্তরঞ্জন দাস]

স্বরাজ মানে কি ? আর অসহযোগ মানেই বা কি ? স্বরাজ মানে আর কিছু নয়,—স্বরাজের এমন অর্থ হয় না যে পার্লামেন্ট থেকে একখানা এক্ট তৈয়ারী করে আমাদের উপহার দেবে। স্বরাজ সে জিনিষ নয়। কেন নয় ? স্বরাজ মানে কি ? স্বরাজ মানে তোমার অন্তরে অন্তরে যে প্রকৃতি আছে সে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা। সবার উন্নতি এক রকমে হয় না, সব জাতির উন্নতি এক রকমে হয় না। যেমন প্রত্যেক মানুষের একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতি, এক মহা প্রকৃতির অধীন হলেও প্রত্যেক মানুষের একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, তেমনি প্রত্যেক জাতির একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতির অনুসরণ করে সে জাতির মধ্যে সন্ধান করতে হবে সেই প্রকৃতি যে প্রকৃতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি না—যে প্রকৃতি কেহ হারাতে পারে না। আমাদের অনেক দিনের পরাধীনতার চাপে বিলাসমোহে আমাদের যা স্বরূপ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে লুকিয়ে আছে, তার সাধনা, তার সন্ধানই, স্বরাজ। সে জিনিষটা কেউ দিতে পারে না। ইংরেজ একটা শাসন প্রণালী দিতে পারে ইংরেজ বলতে পারে গোলমালে কাজ কি ? তোমরা স্বায়ত্বশাসন নাও। সেটা ত স্বরাজ নয়। সেটা তোমার উপার্জ্জন নয়, সাধনার ফল নয়। কেউ কি স্বরাজ দিতে পারে ? তোমাকে অর্জ্জন করতে হবে, তোমাকে নিজের সাধনায় যা বাস্তবিক সত্য প্রকৃতি সে সত্য প্রকৃতির সন্ধান ক'রে, তাকে বাহিরে উপস্থিত ক'রে জগতের সমক্ষে দাঁড় করাতে হবে, এই স্বরাজের অর্থ। আমি সেদিন একটা কাগজে লিখেছিলাম যে এই স্বরাজ-সাধনা আমাদের অধিকারে। তিলক মহারাজ বলেছেন স্বরাজ আমাদের জন্ম-অধিকার। আমাদের অধিকার কেন ? আমাদের অধিকার কারণ আমাদের যেটা প্রকৃতি তা অধিকার করা। যেমন আমার কোন ঐশ্বর্য্য থাকে, আমি বলব এ ঐশ্বর্য্যে আমার অধিকার। স্বরাজ আমাদের অন্তরে স্বরাজ আমাদের প্রকৃতি, আমাদের সত্য প্রকৃতি, সেইজন্য স্বরাজে আমাদের জন্ম-অধিকার। বিধাতা সে অধিকার আমাদের দিয়েছেন। আমাদের যা প্রকৃতি তা বিধাতার দান, বিধাতার লীলা। সমস্ত জগতের ইতিহাস বিধাতার যে অন্তরঙ্গ লীলা, তারই বহিঃপ্রকাশ। সমস্ত ইতিহাস তাই, ভারতের ইতিহাস তাই। লীলাময়ের গুণ কি, লীলাময়ের স্বরূপ কি ? তিনি চান বৈশিষ্ট্য। আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলে তিনি নিজেকে বহু ক'রে নিজে সে বহুত্ব উপভোগ করেন। মহাপ্রভু এই কথা বলে গিয়েছেন। নিজেকে বহু করে সেই বহুকে তিনি আস্বাদন করেন সে আস্বাদন করার যে ফল সে ফল অন্তরঙ্গ লীলা নয়, সে ফল জগতের ইতিহাস। তিনি যুগে যুগে নিজেকে বহু করেন, সুতরাং এই যে মনুষ্য জাতি একে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ক'রে—এর বৈশিষ্ট রক্ষা করেন স্বয়ং ভগবান। এই বিশিষ্ট প্রকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং ভগবান, রক্ষা করেন তিনি। সেই জন্য স্বরাজে আমাদের জন্ম-সিদ্ধ অধিকার। এর কর্ত্তব্য কি এ কথা হিন্দু-মুসলমানকে বুঝাতে হবে না। ইংরাজের রাজনীতি মানি না, তার ভিতর খুব কোন সত্য কথা থাকতে পারে না, আমার এই ধারণা। আমি অনেক পড়েছি, এখনও মনে হয়—তার অধিকাংশ কথা ভুল। এই স্বরাজে আমাদের অধিকার কেন বলছি। মানুষের ধর্ম্ম বলতে কি বুঝি। যুগ-শঙ্খ বেজে উঠছে, আর যুগ ধর্ম্ম এলে তা পালন করতে হয়। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ? এই ভারতে নূতন জাতি গড়ে উঠছে ভগবানের লীলায়। আমাদের অধিকার তাঁর লীলায় যোগ দেওয়া। কারণ প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্য ভগবানের লীলার সহচর হওয়া আমাদের সহচর হতে হবে অন্য উপায় নেই। আজ কি কাল কি দু'দিন পরে সহজ পথে কি কুটীল পথে ভগবানের লীলায় সহচর হতে হবে। এই যে বলেছি সহজপথে কি কুটীল

[illegible] লীলার মধ্যে তিনি ডাকেন, কেমন করে তিনিই [illegible], কোন পথে তিনিই জানেন। এই যুগধ্বনিই পথের [illegible]।

[illegible] স্বরাজ-সাধনা আমাদের কর্ত্তব্য, তার কারণ ভগবানের লীলায় তাঁর সহচর আমাদের হতেই হবে। বাস্তবিক জ্ঞানে কি অজ্ঞানে জানি না কেহ এ কথা জানেন, কেহ জানেন না। যিনি ভাল করে জানেন, তিনি অনেক উপরে উঠে গেছেন কিন্তু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে আমরা ভগবানের লীলার সহচর, সেই জন্ত স্বরাজ আমাদের কর্ত্তব্য। স্বরাজ তোমাকে চাইতে হবেই; তোমার প্রকৃতির সন্ধান তুমি করবে না, তোমার প্রকৃতির সাধনা করবে কি ইংরেজ? [illegible] লজ্জার কথা। এমন শিক্ষা হয়েছে আমাদের দেশের [illegible] সাধনা, বাঙ্গালা দেশের যা চরম সাধনা, মহাপ্রভু যে [illegible] করে গিয়েছেন আজ সে কথা শিক্ষিত লোকের কাছে বলতে হয়, তারা বুঝতে পারেন না এমন আমাদের পতন হয়েছে। তুমি কেন স্বরাজ চাও, আমি কেন স্বরাজ চাই সে কথা কেমন করে বোঝাব। দাসত্বের কি জ্বালা কেমন করে বোঝাব? যে ক্ষুধিত সে কি বোঝাতে পারে কেন সে অন্ন চায়, আহার চায়। সে কি যুক্তির দ্বারা বোঝাতে পারে সে কি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারে কেন স্বরাজ চায়। আমার বুকে জ্বালা ধরে না বলে আমি স্বরাজ চাই। এই যে দাসত্বের জ্বালায় জ্বলে মরছি তাই স্বরাজ চাই, আমি এই দাসত্ব দূর করতে চাই। নিজের প্রকৃতির অনুসন্ধান করতে গেলে যা মিথ্যা যা মিথ্যাকে আশ্রয় করে আছে সে সব মিথ্যাগুলি একেবারে তাড়াতে না পারলে নিজের প্রকৃতির সাধনা হয় না। তার জন্য স্বরাজ চাই। আজ আমাদের কি আশ্রয় আছে? আমাদের জীবনের প্রত্যেক কক্ষ—আমাদের ধর্মের আচরণ—আমাদের শিক্ষা দীক্ষা—আমাদের বাদ-বিসম্বাদের ভার—তা মিটানর ভার—আমাদের ধর্ম্মকথা—আমাদের কর্ত্তব্য—আজ যা কিছু সব পরের হাতে তুলে দিয়ে বসে আছি। যে পর যার সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির কোন সাম্য নেই, সে পরকে দু'হাতে আলিঙ্গন করে আঁকড়ে ধরে আছি, মনে করছি বড় আশ্রয় পেয়েছি। ওরে মূর্খ, সে আশ্রয় কি? সে যে মিথ্যা আশ্রয়, সে যে প্রলোভন, সে যে মোহ, সে যে দুঃস্বপ্ন। সেই হ'ল সত্য আশ্রয় যা নিজের প্রকৃতি নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে যা তোমার অন্তরে ফোটে। যেটা তোমার কর্ত্তব্য তাকে বাইরে প্রকাশ কর, তাকে তুমি ভোল কেন? একেবারে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়েছ কিসের উপর—যা তোমার মিথ্যা আশ্রয়। এ কথা বাঙ্গালীকে আজ শিখাতে হবে, শিক্ষিত সমাজকে আজ বোঝাতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল কক্ষ শিক্ষা দীক্ষা পর্য্যন্ত পরের হাতে দিয়ে বসেছি, তা পরের হাত থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আদায় করে নিতে হবে, সেই হ'ল আমাদের স্বরাজের প্রতিষ্ঠা। যে শিক্ষা দীক্ষা এতকাল একটা মায়ার বশে বিদেশীর হাতে যা দিয়েছি, যেটা ধর্ম্মের উপায় তাকে অর্থের উপায় করেছি, নিজকে ছলনা করেছি, নিজকে প্রতারিত করেছি, ভগবানের অপমান করেছি, সে মোহ থেকে নিজেকে উদ্ধার কর, সাধনায় নিয়ে এস, টেনে নিয়ে এস।

(বাঙ্গালার কথা)

সারলা

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২০শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩২। [৩৪শ সপ্তাহ

টিসিয়ন

সম্রাট পঞ্চম চার্লসের মত অহঙ্কারী লোক সে সময় খুব কমই ছিল! সম্রাট সেদিন সভাসদ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। রাজ্যের যাঁহারা প্রধান সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিল। সকলেই সম্রাটের গুণগান করিত। সম্রাট যদি বারেকের তরেও কাহারও দিকে কৃপাদৃষ্টি করিতেন তখনই সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইত—এমনি তাহাদের মনের অবস্থা।

ধীরে ধীরে সেই সভায় আসিলেন, একজন চিত্রকর। না ছিল তাঁহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, না ছিল তাঁহার নিজের যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা, চিরকালটাই তিনি তুলি ও রং লইয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। হোমরা চোমরা বিজ্ঞলোকেরা তাঁহার দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি লইয়া চাহিল। কোথাকার কে একজন চিত্রকর আসিয়াছে—এত বড় রাজসভায়!

চিত্রকর কাহারও দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না—সম্রাট যেখানে উচ্চ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন বরাবর সেইখানে যাইয়া হাজির। সম্রাট সসম্ভ্রমে সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিলেন, পাত্র, মিত্র, সভাসদগণ সকলকে উপেক্ষা করিয়া সেই সামান্য চিত্রকরকে রাজরাজেশ্বর সম্রাট যে সম্মান—যেরূপ খাতির করিলেন তাহাতে ঈর্ষায় পারিষদগণের মুখ চোখ যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

সম্রাটের সহিত কথা কহিতে কহিতে চিত্রকরের পেন্সিলটি মাটিতে পড়িয়া গেল। সভাসদেরা কিন্তু সেদিকে ভ্রূকপাতও করিল না। কেনই বা করিবে? একজন সামান্য চিত্রকর বইত নয়। কিন্তু সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল যখন রাজরাজেশ্বর সম্রাট স্বয়ং সেই পেন্সিলটি তুলিয়া চিত্রকরের হাতে দিলেন। সভাস্থ লোক অবাক হইয়া সম্রাটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সম্রাট তাঁহার পারিষদগণের এই ঈর্ষা ও দ্বেষের ভাব যে লক্ষ্য না করিয়াছিলেন তাহা নহে। একদিন তিনি সভাস্থ লোককে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখুন, আমার সভায় সম্রান্ত লোকের কিছুমাত্র অভাব নাই, কিন্তু টিসিয়ন আমার সভায় মাত্র একজনই আছেন।"

ইনিই জগৎবিখ্যাত চিত্রকর টিসিয়ন।

সেদিন স্পেনের রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। কত অগণিত মণি, মাণিক্য, ধন, দৌলত সে প্রাসাদে ছিল—সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কিন্তু রাজার মন তাহাতে এতটুকু বিচলিত হইল না। তিনি সব চিন্তা ছাড়িয়া আগে বলিয়া উঠিলেন, "টিসিয়নের ভেনাস চিত্রখানিও কি গিয়াছে?" যখন জানিলেন সেই চিত্রখানি কোনও প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছে তখন রাজা আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে আর আমার কোন দুঃখ নাই।"

বিদ্যার এমনই গৌরব।

টিসিয়ান

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর কে? কেহ বলেন র‍্যাফেল, কেহ বলেন টিসিয়ন। উভয়েই অতুলনীয়, উভয়েই শ্রেষ্ঠ। তবে ছবিতে রঙ ফলাইতে টিসিয়ন অদ্বিতীয় ছিলেন এমনটি আর কেহ পারিত না। ছোট বড় কত চিত্রকর ছবিতে রঙ ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের রঙ ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। টিসিয়ানের ছবির বিশেষত্বই এই—যত দিন যায় তাঁহার ছবির রঙের জৌলস যেন তত ফুটিয়া উঠে। রঙের একটি আঁচড়ও তিনি খেয়ালের বশে দিতেন না।—প্রত্যেকটিরই যুক্তি ও অর্থ অতি সাধারণ লোকের নিকটও স্পষ্ট হইয়া উঠে! এই জন্যই লোকে বলে টিসিয়ানের মত রঙ ফলাইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ পারেন নাই। তিনি একজন জগতে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর।

র‍্যাফেল যেমন মার মূর্ত্তি আঁকিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, টিসিয়নও তেমনি ভাল কয়েকখানি মাতৃমূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। ছেলে কোলে করিলে মার সারা অঙ্গে, চোখে, মুখে কি সুন্দর স্বর্গীয় মহান্ ভাব ফুটিয়া উঠে শিল্পী ছবিখানিতে তাহাই দেখাইয়াছেন।

এই ছবিখানিতে যিশু এবং যিশুমাতা-মেরীর চেহারা দেওয়া হইয়াছে। দেখ, চিত্রকর কি চমৎকার মেরীর মুখখানি আঁকিয়াছেন। ছেলেকে বুকের কাছে ধরিতে যিশুমাতার চোখ দুটিতে কেমন পবিত্র ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে;—মা যেন সন্তান স্নেহে বিভোর হইয়া গিয়াছেন।

মাতৃমূর্ত্তি

—টিসিয়ন—

জন-দি ব্যাপটিষ্ট একজন সাধু প্রকৃতির লোক—তখনকার দিনে জেরুজেলাম নগরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। জেরুজেলামের রাজা ছিলেন তখন হেরড। এই হেরডের সভায় একদিন একটা বিরাট ভোজ উপলক্ষ্যে হেরড স্যালম নাম্নী এক নর্ত্তকীকে তার সভায় নাচিবার জন্য আদেশ দিলেন। স্যালম সেদিন এমনি চমৎকার নাচিল যে সভাশুদ্ধ লোক ত একেবারে অবাক। রাজা মহাখুসী, তিনি স্যালমকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি যা চাইবে তাই দেবো—তোমার নাচে আমি ভারী খুসী হইয়াছি।" স্যালম তার মাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাইবো মা ?" এই স্যালমের মা ছিলেন জনের একজন প্রধান শত্রু। তাই মা বলিলেন, "জনের ছিন্নমুণ্ড চাই।"

রাজা যা একবার বলিয়াছেন তার ত আর নড়চড় হইবার উপায় নেই। কাজেই জন বেচারার মুণ্ডটি শুধু শুধু নিছক কাটা গেল। এই যে ছবিখানি এ হইতেছে সেই সময়কার, যখন জনের মুণ্ড আনিয়া স্যালমের হাতে দেওয়া হইয়াছে। দেখ চিত্রকর কি চমৎকার করিয়া স্যালমের মনের ভাবটি মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সে জনের মুণ্ড চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু যখন সেই মুণ্ড আসিয়া তার হাতে পড়িল তখন

স্যালমে ও জনের ছিন্নমুণ্ড

—টিসিয়ন—

সে ভাল করিয়া তার দিকে তাকাইতেই পারিল না—হাজার হোক্ পাপ কাজের জন্যে যে ভীরুতা স্বভাবতঃ মানুষের মনে আসে তা হইতে রেহাই কি কেউ পাইতে পারে ?—সে যে আসিবেই।

এই মেয়েটি মনে মনে জানিত জন কত বড় ধার্ম্মিক মহাপুরুষ। তাই পশুভাব যাইয়া ক্ষণেকের তরে তাহার মন শ্রদ্ধায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। স্যালমের মুখ চোখে ঠিক সেই ভাবটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে জনের ছিন্নমুণ্ড লইয়া আসিয়াছিল সে ত এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্।

লেডি ম্যাগডেলিন ছিলেন যিশুখৃষ্টের একজন সেরা ভক্ত। খৃষ্টের মহাপ্রস্থানের পর লেডি ম্যাকডেলিন একদিন গুরুদেবের গোরের কাছে আসিয়া দেখেন গুরুদেবের গোর খালি পড়িয়া রহিয়াছে, শবের কোন চিহ্ন নাই। ম্যাকডেলিন ভাবিলেন, নিশ্চয়ই শত্রু পক্ষের কোন লোক এই কাজ করিয়াছে। শোকে, দুঃখে, নিরাশায় একেবারে অভিভূত হইয়া ম্যাকডেলিন গোরস্থানের বাগান হইতে যখন ফিরিতেছেন সেই সময় হঠাৎ এক স্বর্গীয় মূর্ত্তি আসিয়া তাঁর সামনে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "ম্যাকডেলিন, কেঁদো না, দেখছ না এই যে আমি তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।" ম্যাগডেলিন আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই মূর্ত্তির পা জড়াইয়া ধরিবার জন্য আকুল হইয়া হাত বাড়াইতে ছিলেন,—মূর্ত্তি অমৃতময় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ছুঁয়ো না আমাকে ম্যাগডেলিন! আজও আমি আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হ'তে পারিনি। তুমি যাও ম্যাগডেলিন, ভায়েদের এই কথা বল-গে যে আমি তোমার আমার পিতার কাছে যাচ্ছি। আমার ঈশ্বরের, তোমার ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছি!' এই ছবিখানিতে ঠিক সেই সময়কার ঘটনাটি ফোটান হইয়াছে।

ম্যাগডেলিন

—টিসিয়ন—

কি নিদারুণ শোকের ছবি এখানি একবার দেখ। যিশুকে কবরস্থ করিবার সময়কার নীরব এবং করুণ সুরটি কি চমৎকার করিয়াই ফোটান হইয়াছে। কোন চাঞ্চল্য নাই -চেঁচামেচি নেই—সবই যেন গম্ভীর, সংযত! মহাপুরুষের মৃত্যু শোক আনে বটে কিন্তু সে শোকে চাঞ্চল্য থাকে না—চেঁচামেচি থাকে না—হা হুতাস থাকে না। যাহারা কবর দিতে আসিয়াছে তাহাদের মুখের ভাব—কি প্রশান্ত, কি করুণ, পবিত্র।

কবরের দৃশ্য

—টিসিয়ন—

আঁধার পথের যাত্রী

(গল্প)

[কুমারী স্নেহময়ী মিত্র]

(১)

বসন্ত কালের সন্ধ্যা আকাশে একাদশীর চাঁদ হাসছে। অরুণ তার ঘরে খাটের উপর শুয়েছিল, ঘরটী আঁধার বলে বিনা বাধায় ফুটন্ত বেল ফুলের মত একরাশি জ্যোৎস্না এসে অরুণের মুখে চোখে গায়ে ও বিছানার উপর লুটিয়ে পড়েছে— জানালার ধারের হাস্নাহানা গাছ হতে মৃদু বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে এমন সময় হিমানী গান গাইতে গাইতে এসে ঘরে ঢুকলো।

'আজ শুক্লা একাদশী
হের নিদ্রা হারা শশী
ঐ স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি -'

আলোর সুইচটা টিপে দিতেই সারা ঘর খানি আলোকিত হয়ে উঠলো—অরুণ একহাতে চোখ আড়াল করে বল্লে নেবাও নেবাও কি ভীষণ।......

মৃদু হেসে সেটাকে নিভিয়ে দিয়ে খাটের পাশে এসে হিমানী বল্লে তোমার মাথা ধরেছে অরুণদা? শুয়ে আছ যে? অরুণ একটু নড়ে চড়ে কপালটা টিপিয়া ধরে বল্লে 'হুঁ'। হিমানী ঝুঁকে পড়ে অরুণের কপালে একখানা হাত দিয়া বল্লে, আজকাল এত ঘন ঘন মাথা ধরছে কেন?

আমি কি করে জানব, মাথাটাকে জিজ্ঞেসা কর, বলে অরুণ হাসল। হিমানী খাটের উপর বসে অরুণের একখানা হাত হাতের ভিতর নিয়ে বল্লে ক্লাবে আজ না গিয়ে তুমি ঠকেছ কিন্তু কি সুন্দর গান হল!

অনুৎসুক ভাবে অরুণ বল্লে কার?

সুধীর বাবুর কি সুন্দর সেই গানটা 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না' সে আপন মনে গুণ গুণ করে গেয়ে উঠল

'কে জানিত
আসবে তুমি গো
অনাহুতের মত।'

অরুণ হিমানীর হাত হতে হাতটাকে টেনে নিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে রহিল, স্পষ্টই তার মুখে ব্যথা ফুটে উঠল, তার সে ভাব লক্ষ্য না করেই হিমানী বল্লে, সুধীর বাবু লোকটি বেশ না? অরুণের দিক হতে কোন উত্তর না পেয়ে সে আপনার মনে বল্লে, আমার ত খুব ভাল লাগে, বেশ অমায়িক লোকটি। এবারও অরুণ নীরব। হিমানী বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গেল। অরুণও আস্তে উঠে টানা খুলে বাঁশীটা নিয়ে বাইরের বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে বাগানে নেমে এল, তার পর যেখানে গোটা কতক গাছ মিলে আঁধার করেছে সেইখানে বসে বাঁসী বাজাতে লাগলো—

'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখী জাগো জাগো।'

গ্রীন্ হাউসের পাশের বকুল গাছটায় পাতার অন্তরালে আত্মগোপন করে একটা কোকিল মিহি সুরে ডাকছিল কুউ-উ কুউ-উ! অরুণের বাঁশী তখন গাইছে—

'জাগো নবীন গৌরবে
নব বকুল সৌরভে
মৃদু মলয় বীজনে
জাগো নিভৃতে নির্জ্জনে।'

অনেক রাত পর্য্যন্ত বাঁশী বাজিয়ে অরুণ থামলো। বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে, হিমানীর ঘরে তখন লাইট জলছে, ফ্যান ঘুরছে, অরুণ দেখলো হিমানী একবার জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো তারপর ঘুরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁটা খুলে খোঁপাটা এলিয়ে দিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলো, অতি আস্তে আস্তে একটা নিঃশ্বাস ফেলে অরুণ উঠলো।

(২)

অরুণ অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃ হীন। আত্মীয় স্বজন বড় একটা তার কেউ নেই। দরিদ্র নিঃসহায় অবস্থায় সে

হিমানীর বাবা অতুল বাবুর কাছে এসেছিল, তিনি তাকে স্নেহ করে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই অবধি সে তাদের বাড়ীই আছে। লেখাপড়া শিখছে। অতুল বাবুর ছেলে নেই—হিমানীই একমাত্র মেয়ে। লোকে বলিত তিনি মেয়ের সঙ্গে অরুণের বিয়ে দেবেন তাই তাকে গড়ে তুলছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর দিক হ'তে কোনই সাড়া পাওয়া যায় নি। আজ দু' বছর হ'ল তিনি মারা গেছেন, হিমানীর মাও এ বিষয়ে কিছুই বলেন না, কিন্তু অরুণ মনে মনে হিমানীকে ভালবেসে ফেলেছে! হিমানী সুন্দরী—বড়লোকের মেয়ে আর সে তার বাপের পালিত সেজন্য হিমানী তাকে ঘৃণা না করে হয়ত একটু কৃপার চোখেই দেখে থাকে। অরুণ তাই নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করে বেড়ায় পাছে হিমানীর কাছে কোনদিন ধরা পড়ে যায়। হিমানী হয়ত তার স্পর্দ্ধা দেখে হাসবে। সে অসহ্য···

হিমানী ছিল প্রজাপতির মতই মনোরম, চঞ্চল, লঘু-চিত্তের, সে অরুণকে ভালবাসত, তবে তাকে স্বামীপদে বরণ করে নিতে রাজী কি না তা আমরা জানি না, হয়ত সে এ কথা কোনদিন ভাবে নি। অনেক তরুণ যুবক তার সঙ্গে আলাপ করে নিজেকে ধন্য মনে করত, কেন না সে অপরূপ সুন্দরী। অরুণ বড় একটা কারুর সঙ্গেই মিশত না কিন্তু কোন যুবকের সঙ্গে হিমানীকে মিশতে দেখলেই তার মন জ্বলে উঠতো, সে হয়ত চাইত সমস্ত অন্তরখানি দিয়েই হিমানীকে আড়াল করে রাখে, কিন্তু সে ত হয় না······

সুধীর বলে যুবকটি খুবই বড়লোকের ছেলে, হিমানীদের বাড়ী সে আজকাল খুব বেশী রকমই যাওয়া আসা করছে। সেদিন বিকেলে ড্রয়িংরুমে হিমানী, হিমানীর কয়েকটী বন্ধু এবং সুধীর বসেছিল এমন সময় অরুণ এসে ঢুকলো, হিমানী বল্লে, এস অরুণদা, সুধীর বাবু তোমার বাঁশী শুনতে চাইছেন একটু শোনাবে ?

অরুণ তার দিকে চেয়ে বল্লে, এখন যে বাইরে যাচ্ছি ! ·

বাইরে মানে গোটা কতক রাস্তা ঘুরে আসা ত ? বন্ধু বান্ধবের পাট ত নেই, একটু খানি শুনিয়েই যাও না বাপু ?

থাক না আর একদিন শোনাবখ'ন।······

কেন আজ শোনালে –

অরুণ লজ্জারক্ত মুখে বাঁশী আনতে যাচ্ছিল কিন্তু হিমানীর কঠিন স্বরে ফিরে দাঁড়ালো—থাক্ দরকার নেই—এনো না বাঁশী আজ থাক······

সুধীর আর মেয়েরা বিস্মিত ভাবে তার দিকে চাইল, হিমানী কিন্তু কোন দিকে না চেয়ে উঠে অর্গান খুলে বাজাতে লাগলো। অরুণ ক্ষণিক বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে নত মস্তকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে একখানা বেঞ্চিতে বসল, একটু পরেই হিমানীর সুন্দর গলার গান শুনতে পেল।

তারপর কখন গান থেমে গেছে, কখন সকলে চলে গেছে অরুণ টেরও পায় নি। সে নীরবে সামনে চেয়ে বসেছিল, কৃষ্ণ পক্ষের রাত, আঁধার আকাশে তারাগুলো যেন জ্বালা ভরা চোখে চেয়ে ছিল! অরুণ আস্তে উঠে চোরের মত বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে তার ঘরে এসে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে লাইট জেলে টেবিলের টানা খুলে ডায়েরী বার করে লিখতে বসলো—

২৬শে মার্চ্চ

লোকে বলে মানুষের জীবনটা সাধারণ, আমি কিন্তু দেখছি ভীষণ রোমান্স। জীবনের প্রতি পাকে কত রহস্যই যে নিত্য জড়িত হয়ে যাচ্ছে কে তা স্মরণ করে রাখছে! হাসি পায়। মানুষের গতি যেন একটা ঘুরতি চাকা বন্ বন্ করে ঘুরতে ঘুরতে পাঁকের ভিতর দিয়ে, ধূলার ভিতর দিয়ে কত রাস্তা দিয়েই সে চলেছে, শেষে কোথায় থামবে কে জানে! আজকের এই ছোট্ট ঘটনাটা যে ঘটে গেল হিমানীর ব্যবহারে ত আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হই নি! আমি যে তাদের আশ্রিত এ কথাটা ভুললে চলবে কেন ?······

হিমানীর পাশে আমি! ওঃ কি রহস্য, সে কোথায় আর আমি কোথায়! আমি যে আঁধারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি! না থাক্ ও স্থান সুধীরের, সুধীরকেই মানায়, আমাকে নয়। আমার স্থান এইটুকুই—এর বেশী চাইলেই সব যাবে।··· ··

(৩)

আজ হিমানী একটা পার্টি দিয়েছিল, সন্ধ্যেবেলা উজ্জ্বল লাইটের আলোয় ড্রয়িং রুমটি সুসজ্জিত নরনারীতে পূর্ণ। মৃদু গুঞ্জনে আলাপ চলছে, কখন তরুণ তরুণীদের মিষ্টি গলার

সুর অর্গ্যানে বাজছে। হিমানী আজ ঘোর সবুজ শাড়ী ব্লাউস পরেছে, কাণে সবুজ পান্নার দুল, গলায় পান্নার নেকলেস, হাতে তারির চুড়ি! মনে হচ্ছিল সবুজ পাতার মধ্যিখানে একটী ফুটন্ত গোলাপ যেন চলে বেড়াচ্ছে! হাসি-মুখে সে সকলের সঙ্গেই আলাপ করছে, অরুণ এক কোণে অপরিচিতের মতই বসেছিল, যখন সকলে হিমানীর গান শুনতে মগ্ন তখন সে সবার অলক্ষ্যে আস্তে উঠে বাগানে অন্ধকারে এসে সেই বেঞ্চিতে বসল। ঘরে অত লোকের মাঝে তার যেন হাঁপ ধরছিল, সে যেন একটা কোমল কুসুম—নিজেকে পাতার অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে পারলেই যেন সে বাঁচে। গান, গল্প, হাসি এতে যেন তার কিছু-মাত্র অধিকার নেই, মৌন অন্ধকারে আত্মগোপন করাই যেন তাকে সবচেয়ে মানায়।

অরুণ নীরবে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিল—কি একটা ব্যথায় তার বুকটা টন টন করে উঠেছিল। অনেকক্ষণ কেটে গেছে, অন্ধকারটাও গাছের শাখায় শাখায় নিবিড় হয়ে জড়িয়ে গেছে, এমন সময় কে ডাকলো অরুণদা!

অরুণ চমকে চেয়ে দেখলো সামনে হিমানী!

এমন করে লুকিয়ে পালিয়ে এলে কেন অরুণদা?

অরুণ কি উত্তর দেবে? হিমানী কঠিন স্বরে বল্লে, তোমার কাছে এ রকম ব্যবহার আমরা কোনদিনই আশা করি নি, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ানো—এর অর্থ কি অরুণদা? বাবা নেই সকলে জানে তুমিই আমাদের অভিভাবক, অথচ তুমি যেন কেউ নও এমনি ভাবে বেড়াও এর মানে কি?

অরুণ অন্ধকারে হিমানীকে ঠাহর করে আস্তে বল্লে, আমার দোষ হয়েছে ক্ষমা কর।

নিশ্চয়, আমি ক্ষমা করবার কে? এই যে আজ এতগুলি ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁরা কি মনে করলেন বলত? লজ্জায় আমরা যে মাটির সঙ্গে মিশে গেছি—ছিঃ!......

থাক হিমানী আর বল না।......

তার গলার স্বর শুনে হিমানী চমকে গেল, অন্ধকারে তার মুখ দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে একখানা হাত ধরে বল্লে, আজকাল তোমার কি হয়েছে অরুণদা, এমন পর হয়ে যাচ্ছ কেন?..

হাসতে গিয়ে অরুণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, নিজেকে সামলাবার জন্য সে বল্লে, পর আর হ'ব কি সে ত—

কি একটা বলতে গিয়ে অরুণ থেমে গেল, হিমানী কিন্তু বুঝতে পেরেছিল, অরুণের হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বল্লে—তাই তাই তুমি ভাব, বেশ, তবে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।......

না—সম্বন্ধ ত নেই হিমানী,আমি ত সম্পূর্ণ পর তোমাদের, সে তোমরাও জান, আমিও বেশ জানি ...

হিমানী দু'চোখ ভরা বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল, সহসা সে কঠিন স্বরে বল্লে—তাই যদি তুমি মনে করে থাক বেশ, কিন্তু অরুণদা তুমি যে এতটা হীন তা জানতাম না। বলেই সে দ্রুতপদে চলে গেল।

অরুণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল, একটু পরে চেতনা পেল। উঃ উঃ কি লজ্জা কি লজ্জা! সে কি মানুষ না পাগল, নইলে এতবড় মিথ্যা কথাটা কি করে তার মুখ দিয়ে অমন সহজ সুরে বেরিয়ে গেল? আর সেই কথাটাই সত্য ভেবে ওই যে তরুণী তাকে হীন আখ্যা দিয়ে গেল—উঃ অরুণ হিমানীকে কেমন করে বোঝাবে সে হিমানীকে পর ভাবে না ভাবে না, কত আপনার কত আপনার ভাবে! হিমানী, ফিরে এস ফিরে এস একবার—সত্য কথাটাই শুনে যাও! কত বেদনায় কত বড় আঘাত পেয়ে তার মুখ দিয়ে এমন নির্ম্মম মিথ্যে কথা বেরিয়েছে। অরুণ মানুষ নয় পশু পশু ছিঃ ছিঃ হিমানী ত ঠিকই বলেছে "এতটা হীন জানতাম না" সত্যই জানতে না অরুণ এতটা হীন, জানতে না-আজ জানলে এরপর অরুণ কেমন করে তাকে মুখ দেখাবে, একবার যখন নিজের মুখে পর বলেছে, আবার কোন লজ্জায় আপনার বলে গিয়ে কাছে দাঁড়াবে, অস্থির অরুণ দু'হাতে মুখ ঢেকে বেঞ্চির উপর উপুড় হয়ে পড়লো।......

(৪)

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে অরুণ ট্রাঙ্কের ভিতর তার কাপড় জামা গুছিয়ে তুলছিল এমন সময় "অরুণদা" বলে দু'হাতে দরজা ঠেলে হিমানী ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল, একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে সে বল্লে, সত্যি তা হ'লে পালিয়ে

যাচ্ছ অরুণদা, সত্যি আমাদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ তুলে দিচ্ছ তা হলে ?

বিস্ময়ে একবার তার দিকে চোখ তুলে চেয়ে অরুণ নত হয়ে আবার ট্রাঙ্কে মন দিল।

হাঁটু গেড়ে বসে হিমানী তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বল্লে, শুনছ অরুণদা শুনতে পাচ্ছ ?······

পাচ্ছি—অরুণ মৃদুস্বরে বল্লে।

পাচ্ছ ? তবে উত্তর দাও যাচ্ছ কেন ?

সেদিনকার সেই ঘটনার পর আর যে এখানে থাকা অসম্ভব এ কথা অরুণ কেমন করে বলবে, আস্তে বল্লে, চাকরিটা পেলাম তাই—

তাই? কখন না, তিনশ টাকার জন্য তুমি বিদেশে যাচ্ছ এ কথা আর সকলে বিশ্বাস করলেও আমি করি না, বল বল কেন যাচ্ছ ?

অরুণ নত মুখে রুমালের গোছাটা নাড়তে লাগল।

বুঝিছি—সেদিনের সেই কথাটা ভুলতে পারনি তাই আমায় শাস্তি দেবার জন্য পালাচ্ছ কিন্তু অরুণদা আজ তোমার যাওয়া হবে না কিছুতেই নয়। আমার বিয়েটা তোমার দেখে যেতেই হবে।······

সেই জন্যই যে আরো যাচ্ছি হিমানী।...

নিজের অজ্ঞাতেই কখন অরুণ বলে ফেল্ল। হিমানী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল, উদ্‌ভ্রান্তের মত অরুণের একখানা হাত ধরে টানতে টানতে বল্লে, সেই জন্য আরো যাচ্ছ কেন আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না অরুণদা, আরো একটু বুঝিয়ে বল আমায়।......

বোঝাবার কিছু নেই হিমানী। আস্তে অরুণ হাত খানা হিমানীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল।

বোঝাবার কিছু নেই ? আচ্ছা ওঃ বুঝেছি কেন এ কথা আগে বলনি, বল বল কেন বলনি অরুণদা ব—লনা—

ব্যথায় হিমানীর কান্না ভরা স্বর শুদ্ধ হয়ে এল। অরুণ স্থির নেত্রে তার দিকে চেয়ে বল্লে—বল্লে কি হত হিমানী? থাক—এখন বুঝেছ কেন যাচ্ছি, আমার দূরে যাওয়া মঙ্গল, বল এখনো কি বারণ করবে ?

না না তুমি যাও—যেখানে ইচ্ছে যাও, কেন আমি বারণ করব তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ, আমি—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই ঝড়ের মত হিমানী বেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ তার গতির দিকে চেয়ে থেকে অতি আস্তে একটা নিশ্বাস ফেলে অরুণ নিজের কাজে মন দিল।

বাড়ী যখন ফটক পার হয় অরুণ দেখলো দোতালার জানালায় হিমানী দাঁড়িয়ে, তার দিকে একবার চেয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অরুণ মনে মনে বল্লে "সুধীরকে বিয়ে করে সুখী হও হিমানী, শুধু তোমার আজকার এই মূর্ত্তি বুকে নিয়ে আমারও সুদূর পথের যাত্রা যেন শেষ করতে পারি।"......

পরিত্যক্তা

[আশুতোষ সান্ন্যাল]

শ্রাবণ মাস। আকাশের বিরাম নেই—নববধুর চোখের মত সময় নেই অসময় নেই, কেবলই ঝরছে। সারাদিন ঘরের ভেতর আপনাকে বন্দী করে রেখে প্রাণটা হাঁপিয়ে পড়েছিল, কেতাব খবরের কাগজ আর ভাল লাগছিল না। সন্ধ্যার সময় বরুণদেব একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে দিন শনিবার, খবরের কাগজে দেখলাম থিয়েটারে নতুন নাটকের অভিনয় হচ্ছে। কোথায় আর যাই—অনেকদিন থিয়েটার দেখিনি; থিয়েটার দেখতে যাওয়াই স্থির করে, বৌদিদির রান্না গরম গরম খিচুড়ীর ধ্বংশ করে, ছাতি ঘাড়ে রওনা হলাম। থিয়েটারের সুমুখে এসে দেখলাম—অত বৃষ্টিতেও দর্শকের অভাব হয় নি, আমার মত -- অনেকগুলি বেকার সেখানে জড় হয়েছেন। টিকিট কিনে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। পালা যখন সাঙ্গ হল, তখন রাত একটা বাজে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অনেকটা পথ যেতে হবে, একখানা গাড়ীর চেষ্টায় রাস্তায় এসে অনুসন্ধান করে বুঝলাম, পাগাড়ী ভিন্ন—অন্য গতি নেই। সারারাত্রি থিয়েটার দেখায় যা খরচ—গাড়ী করে বাড়ী ফিরতে তার চতুর্গুণ আবশ্যক! দুৎ-তেরি-বলে একটা চুরুটে আগুণ ধরিয়ে পা গাড়ীতেই রওনা হলাম। মাথার ওপর বৃষ্টি, আর পায়ের নিচের নন্দোৎসবের উৎসব। সট্-কাট্ করতে--গোটা দুইচার সরু মোটা গলি পার হয়ে শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে পড়লাম। হাত ঘড়িতে দেখলাম - রাত প্রায় দুটো!

নানা চিন্তায় বিভোর হয়ে চলেছিলাম, হঠাৎ রাস্তার পাশ থেকে রমণী-কণ্ঠে—কে বলে উঠল—"মশাই -- দেশলাইটা একবার দেন না দয়া করে---বিড়িটা ধরিয়ে নিই।"

হঠাৎ আহ্বানে চমকে উঠে—ফিরে দেখলাম, এক হতভাগিনী তখনও রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে—অন্ন সমস্যার সমাধান করতে। বেদনার ওপর আঘাত লাগলে যেমন সেটা নতুন করে টন্ টন্ করে ওঠে, রমণীকে দেখে মনের ভেতর তেমনি ব্যথিত হয়ে উঠল। মনের অজ্ঞাতসারেই পকেটে হাত দিয়ে দেশলাইটা ধরে ভাবছিলাম—দেব' কি দেব না! আমাকে নীরব দেখে রমণী পুনরায় বলল, "দিন না মশাই, একটা কাঠি খরচ করব বই ত' নয়।" "তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে তার হাতে দিলাম! উড়ো মেঘের খানিকটা জল আমাদের মাথার ওপর একটু জোর করেই ছড়িয়ে দিয়ে গেল, বিনা আহ্বানেই রমণী আমার ছাতির তলায় এসে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরাতে লাগল! তার অঙ্গস্পর্শে আমার সারা অঙ্গ ঘৃণায় ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই—আচমকা বেত্রাঘাতের মত আমার মনের ওপর সপাৎ করে পড়ল—একমাস আগেকার আমারই লেখা প্রবন্ধটা --"পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা কোরনা।"

সংসারের কত অত্যাচার, অবিচার হয়ত একে পবিত্রতার মন্দির থেকে অনাচারের আস্তাকুড়ে টেনে এনেছে—এর দোষ কি?

সমাজের নিয়ম এমনই পক্ষপাতিত্বে পূর্ণ- যে সেই অত্যাচারের শাস্তি ভোগ করতে হয়--হতভাগ্য অত্যাচার পীড়িতকে; যে অত্যাচারী— সে যেমন সংসারের বুকে বুক ফুলিয়ে বিচরণ করছিল, তেমনই বেড়াচ্ছে—কেউ তার কিছু করতে পারে না। কৌতুহল দূর করতে—রমণীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, এ পথে এসে তুমি সুখে আছ?"

"সুখ?—"

বৃষ্টিতে ভেজা গ্যাসের আলোর অস্পষ্টতার মধ্যে দেখলাম, রমণীর মুখে খানিকটা ম্লান হাসির ঝলক উড়ো মেঘের মত এসে চলে গেল। রমণী সেই ম্লান হাসির অন্তরালে বোধ হয় মনের বেদনা লুকিয়ে বলল, "কি বলছিলেন—সুখে আছি কি না? - হাঁ—নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল! সুখে না থাকলেও স্বোয়াস্তিতে আছি। চুরী-ডাকাতি ক'রে ভিক্ষা

ক'রে কুকুর শেয়ালের মত সংসারের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে জীবন ধারণ করার চেয়ে এ পথ মন্দের ভাল !"

রমণীর কথা শুনে মনে হল, তার জীবনের ওপর দিয়ে ঘটনার একটা প্রবল বন্যা বয়ে গিয়েছে। তার কাহিনী শোনবার ইচ্ছা আমার মনে প্রবল হয়ে উঠল। একটু ইতস্তত করে বললাম, "কিন্তু—এ পথে এসে কেবল সংসারে পাপের ভার বাড়ান বইত' নয় !"

পাপ ! ভগবানের রাজত্বে কি পাপ পুণ্য আছে ! নইলে সংসারে যারা সাধুতার নিশান উড়িয়ে, ব্যাভিচারে দেশ ছেয়ে ফেলছে তারা-ত' বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করছে। যে সমাজের অত্যাচারে, অনাচারে আমাদের মত শত শত হতভাগিনীর সৃষ্টি হচ্ছে—সেখানে পাপের ভার বাড়াবে এই তুচ্ছ জীবনহীন, সহায়হীন জনকতক মেয়ে মানুষ !" উত্তেজিত কণ্ঠে কথা কটা বলে রমণী যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। আপনাকে সামলে নিয়ে সে বলল, "যাক্—ও সব কথায় কোন লাভ নেই—যার যা বরাতের লেখা ! খোলার ঘরের বেশ্যার মুখে পাপ পুণ্যের কথা সাজে না। একটা দেশলায়ের কাঠির জন্য আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম—যান বাবু—আপনি—"

রমণীর জীবনবৃত্তান্ত শুনতে আমি বড়ই উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম, বললাম "না—না—বল না ? কেন খোলার ঘরের বেশ্যা কি মানুষ নয় ? আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে না—বল না, যদি আপত্তি না থাকে তোমার জীবনের কথা বলতে—"

"না আপত্তি কিছু নেই—তবে এত রাত্রে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে ধরবে। আমার কাহিনী এমন কিছুই নয়—আর পাঁচজনের মত আমিও একজন।" রমণী কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় কি মনে করে বলল "যদি একান্তই শোনবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে এখানে নয় - আমার ঘরে চলুন।"

"তোমার ঘরে ?"—আবার সেই সঙ্কোচের বাধা এসে আমাকে চঞ্চল করে তুলল। এতক্ষণ অন্যমনস্কে রমণীর সঙ্গে এক জায়গায় এক ছাতির নিচেয় দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু—তার ঘরে যাবার কথায়,—আবার মনে সেই আজন্মের সংস্কার মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। রমণী আমার মনের অবস্থা অনুমান করে বলল, "তবে থাক্—যদি আসতে আপত্তি থাকে, তবে কাজ নেই। আপনিই বলছিলেন বেশ্যাও মানুষ, তাই ভরসা করে, ঘরে যেতে বলেছিলাম। থাক্ - অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, আপনি বাড়ী যান।" দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে কথা কটা বলে রমণী মুহূর্ত্তে ছাতির নিচে থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির ভেতর গিয়ে দাঁড়াল। লজ্জার মোচড়ে কে যেন আমার প্রাণটাকে মুচড়ে ধরল। তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়ে বললাম, "না না আপত্তি কিছু নেই— চল তোমার ঘরেই চল।"

রমণী একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ধীরস্বরে বলল—"আসুন।"

একটা নোংরা সরু গলির ভেতর দিয়ে রমণী আমাকে একখানা খোলার বাড়ীর সম্মুখে এনে দাঁড় করাল। অন্ধকারে বাড়ীর বেড়াটা ভাল করে দেখতে না পেলেও চারিদিকে পচা নর্দ্দামার দুর্গন্ধে— সে স্থানের অবস্থা সম্যক অনুভব করিতে বাকি রইল না !

ঘরের চাবি খুলে রমণী ঘরের ভেতরের স্তিমিতপ্রায় দেওয়ালগিরিটা বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে—একখানা অর্দ্ধভগ্ন চেয়ারের উপর বসতে বলল। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে—দেখলাম, প্রতি অঙ্গে তার দুষ্ট ক্ষতের মত দারিদ্র্যের কঠোর চিহ্ন বিদ্যমান।

বাহির থেকে হাত পা ধুয়ে এসে রমণী আমার সম্মুখে একখানা জল চৌকি টেনে এনে বসে বলল,—"তামাক খান ?"

"না"।

"পান সেজে দেব ?"

"না—আমি পান খাই না।"

রমণী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, "সুখের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন না ?—ঘর বাড়ীর অবস্থা দেখে বোধ হয় বুঝতে পারছেন কি সুখে আছি—তবু এর আসল চেহারা রাত্রের অন্ধকারে ভাল করে দেখতে পান নি, তা হলে ঠিক বুঝতে পারতেন, আমাদের সঠিক অবস্থা।" রমণীর কথার উত্তরে আমি না বলে থাকতে পারলাম না—

বললাম "যদি এ পথের এই অবস্থা তবে এ পথে পা দিয়েছিলে কেন ?"

"কেন ?—সে কথার উত্তর সমাজকে জিজ্ঞাসা করবেন—জানতে পারবেন। সমাজের উপরকার আবরণটা সরিয়ে তার আসল চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করবেন। তা হলে বুঝতে পারবেন—কেন! যাক্ সংসারের দোষ দিয়ে কোন ফল নেই—দোষ মানুষের অদৃষ্টের—দোষ পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির!

রমণীর কথার উত্তর খুঁজে পেলাম না—চুপ করে বসে রইলাম। রমণী—কিছুক্ষণ নীরবে থেকে—তার জীবনের কথা বলতে লাগল, "মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মে খুবই যে একটা ভুল করেছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে জন্ম মৃত্যু ত কারুর হাত ধরা নয়।—কাজেই ভুলের সংশোধন করবারও উপায় নেই। মানুষকে তার কর্ম্মভোগ ভুগতেই হবে, তা যতই তার প্রতিকূল হোক না কেন!

—জন্মেছিলাম পল্লীগ্রামের এক কুঁড়ে ঘরে। আমি যখন মায়ের পেটে তখনই বাবা মারা গিয়েছিলেন। বাবা রেখে যাওয়ার মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন মাকে—সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় এবং মহাজনের ঋণ। সেই ঋণের দায়ে যাওবা দু এক বিঘে জমি ছিল—যা থাকলে হয়ত মাকে কষ্ট পেয়ে মরতে হত না—তাও মহাজন দখল করে নিল। সত্যিইত' ঘরের কড়ি দিয়ে উদারতা করতে গেলে মহাজনেরই বা চলবে কিসে ?—আর সংসারের তা কজনাই বা করে থাকে? জমি জমা টুকু যাওয়ায় মা বড়ই বিপদে পড়লেন, গ্রামের লোকেরা দয়াপরবশ হয়ে, বলে কয়ে মহাজনের ঋণজাল হতে কুঁড়েখানা মুক্ত করে দিয়েছিল। সেই আধ-ভাঙ্গা ঘরখানা আর তারই চারপাশের হাত কয়েক জমি নিয়ে, শত দুঃখের মধ্যেও মা বুক বেঁধে বেঁচে রহিলেন—আমার জন্মাবার অপেক্ষায়। কষ্ট খুবই হত, কিন্তু উপায় ছিল না। গ্রামের পুরোহিত বাড়ী দাসীপনা করে মায়ের দিন কোন রকমে কেটে যেত।

তারপর একদিন রাত্রে—সেদিন আকাশে ঘনঘটা করে পৃথিবীর বুকের ওপর প্রলয়ের বিধান বেজে উঠেছিল। সেই ঝঞ্ঝার ঘায়ে ভাঙ্গা কুড়েখানা যখন ব্যতিব্যস্ত তখন আসন্ন বিপদের মাঝে—ভগবানের উপর নির্ভর করে পতোন্মুখ ঘরের ভেতর যন্ত্রনায় ছট্ ফট্ করতে করতে—মা আমাকে পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছিলেন।

ভূমিষ্ঠ হবার আগে মায়ের বড় আশা ছিল পুত্র হবে। পুত্র বড় হবে, কর্ম্মঠ হবে—মায়ের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করবে। কিন্তু হতভাগিণী আমি, পৃথিবীর কোথাও স্থান না পেয়ে—মায়ের সকল আশায় ছাই দিতে উদয় হলাম। দুঃখ দূর করা দূরের কথা, দুঃখের বোঝার উপর আর একটা গুরুভার বোঝা চাপিয়ে দিলাম।—দুঃখের পেষণে মা আগেই মুচকে ছিলেন, এবার একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। আমার বয়স বছর খানেক না পুরতেই, মা তার দূর সম্পর্কীয় পিসীর হাতে আমাকে তুলে দিয়ে দুঃখের হাত এড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুঁজলেন।

—বলিহারি বিধাতা আর তাঁর বিধি ব্যবস্থা। পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কৃত—জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে ভুলিয়ে দিয়ে—রাখলেন শুধু তার ফলভোগ! মানুষ অপরাধ করেছি বলে যে মনকে একটু সান্ত্বনা দেবে সে উপায় নেই। পূর্ব্বজন্মে যে দেহ পাপ করেছিল, মৃত্যুর সঙ্গে সে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভাগ্য বিধাতা অলক্ষ্যে বসে তার হিসাবের খাতার পাতা ঠিক ভরিয়ে রেখেছেন—এজন্মে তা কড়ায় গণ্ডায় উশুল করতে। মানুষ সেই দেনা শোধ করতে এ জন্মে সংসারের ঘৃণা উপেক্ষার ঘায়ে জর্জ্জরিত হয়ে পরজন্মের খাতাও শুধু পাপের অঙ্কে ভরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। এর জন্য—দায়ী কে ?—পাপী না সংসার! জলমগ্ন ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাতে যখন আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে ওঠবার চেষ্টা করে, তখন তাকে আবার ঠেলে ফেলে দিলে তার ডোবা ছাড়া আর উপায় কি ? লোকে বলে সাধু সঙ্গ, সৎ-সঙ্গে থাকলে মানুষ—আসল রাস্তার সন্ধান পায়। কিন্তু—সাধুর সন্ধান দেয় কে ? কত সাধু দেখলাম, কত লোক সজ্জনের খোলস পরে দুনিয়ার বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলাম।—আসল মানুষের সন্ধান কৈ পেলাম! সব আপনাপন নিয়ে ব্যস্ত। পরের জন্য মাথা ঘামাবার অবসর মানুষের নেই।

—হাঁ যা বলেছিলাম। মায়ের পিসী—আমার দিদিমার অবস্থা ভালই ছিল। দাদামশাই ছিলেন গ্রামের জমিদারের

গোমস্তা, দুপয়সা রোজগার ছিল গ্রামে প্রতিপত্তিও ছিল। কাজেই আপনার দিদিমা না হলেও—আমাকে নেহাৎ জলে পড়তে হল না। সময় হাওয়ার আগে ছোটে। দিদিমার সংসারে সাচ্ছন্দের স্পর্শে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলাম। দেখতে শুনতে ভালই ছিলাম। ভাল ঘর বর দেখে দাদামশাই আমার বিয়ে দিলেন। আমার তখন বয়স বার বছর।

বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী গেলাম। কত আদর যত্ন। শাশুড়ীর সবে ধন নিলমণির বৌ—কাজেই আমার অভাব অভিযোগ কিছুই ছিল না। স্বামী খুব ভাল ছিলেন—আমাকে খুব ভাল বাসতেন।

বছর দুই সুখের নেশাতেই কেটে গেল। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল। স্বামীর অসুখ হ'ল! চিকিৎসা যত্নের ক্রটী হ'ল না কিন্তু, সব ব্যর্থ! হতভাগিনী আমি, জীবনের প্রারম্ভেই আশা আকাঙ্খার বিসর্জ্জন হয়ে গেল। যে শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা এতদিন ঘরের লক্ষ্মী বলে সংসারের শ্রেষ্ঠ পদে বসিয়েছিলেন, তারাই আবার স্বামী-খেকো ডাইনী বলে আমাকে পথের ধূলায় নিক্ষেপ করল। বয়স বেশী না হলেও, স্বামীকে চেনবার মত জ্ঞান আমার হয়েছিল। স্বামী-হারা হয়েও বেঁচেছিলাম এই মনে করে, যে স্বামীর ভিটেয় স্বামীর স্মৃতিটুকু বুকে ক'রে যে কদিন বাঁচি কাটিয়ে দেব, কিন্তু মন্দ ভাগ্যে তাও সইল না। শ্বশুর বাড়ী ঠাঁই হ'ল না, অলক্ষ্মীকে তাঁরা ঘরে ঠাঁই দিতে সাহস করল না। পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন যা কিছু আপনার বলতে—এক দিদিমা! তাঁর স্নেহময় কোলে ফিরে গেলাম বটে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পেলাম না। নারীর যিনি ইষ্টদেবতা—তাঁর মৃত্যুর কারণ আমি—এই অপবাদটাই আমাকে অহরহঃ দগ্ধ করত! উপায় ছিল না—বুকের ভেতর আগুনের পাজা জ্বালিয়েও বেঁচে থাকতে হ'ল।

স্বামীর শোক সামলে উঠ্‌তেই বছর কেটে গেল, কিন্তু—যে অকুল সমুদ্রে পড়ে আছে, সে কত ধাক্কা সামলাবে? একটা ঢেউ সামলে উঠ্‌লে নিস্তার কৈ? রাশী রাশী—ঢেউ ক্রুদ্ধ শীর তুলে একটার পর একটা ছুটে আসতে লাগল—আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ-করতে। দাদামশায়ের বয়স হয়েছিল, তিনি চিরবিদায় নিলেন। স্বাধ্বী সতী দিদিমা স্বামীবিচ্ছেদ সইতে পারলেন না - পেছন পেছন তিনিও চলে গেলেন।

দাদামশাই ও দিদিমার চোক বোঁজবার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সব ওলট পালট হয়ে গেল। মামারা যে যার অংশ হিসাব নিকাস করে আপনাপন স্ত্রীপুত্র নিয়ে আলাদা হলেন—আমি হলাম ভাগের মা। সংসারের উপেক্ষা অবহেলা নিষ্ঠুর বেগে আমার উপর পড়তে লাগল। স্বামী-পুত্রহীনা বিধবা, একবেলা একমুঠা ভাত যার প্রয়োজন, সে হয়ে উঠ্‌ল সংসারের একটা মস্ত বোঝা। এতখানি সহ্য করেও—দিন কাটাচ্ছিলাম, কিন্তু—সব চেয়ে দুঃসহ হয়ে উঠল—হৃদয়হীন পুরুষদের অত্যাচার। পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে ইহকালের সকল সুখেই বঞ্চিত হয়েছিলাম—তার ওপর প্রাণহীন তারা পঙ্গপালের-মত আমার পরকালও নষ্ট করতে ধেয়ে আসতে লাগল। প্রথম প্রথম অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর পরিহাসে লজ্জায়, ধিক্কারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়তাম, কিন্তু যখন দেখলাম লজ্জা করলে আত্মরক্ষা অসম্ভব তখন নারীর তেজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালাম, তখন কি জানতাম সেই মাথা আমার বিধাতা এমনি করেই নত করে দেবেন।

মনের জোরে এক এক করে সবাই পরাজিত হল, পারলাম না কেবল জমিদারের ছেলেকে। গ্রামবাসীর মান সম্ভ্রমের রক্ষকের পুত্র—ভাবী জমিদার—তার অত্যাচারে আড়ষ্ট হয়ে উঠলাম। তার ব্যাভিচারের দূত নানাভাবে আমার সুমুখে আকাশ-কুসুমের ছবি ধরতে লাগল। ঘৃণায় ক্রোধে অধৈর্য্য হয়ে দৃঢ়স্বরেই জবাব দিতাম—"মেয়ে মানুষ এত অপদার্থ নয়—যে সামান্য ঐশ্বর্য্যের লোভে ইজ্জত খোয়াবে।"

কঠিন ভাবে মন বাঁধলাম। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কথা রোজ পড়তে লাগলাম, কিন্তু—একা মেয়ে মানুষ কতদিন পিশাচের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে! বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে জমিদারের ছেলে, ছলে, বলে, কৌশলে আমার সর্ব্বনাশ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে উঠল, প্রত্যহ তার নিদর্শন পেতে লাগলাম। মনে ভয় হল, মুখ ফুটে কাউকে বলতে না পারলেও আভাষে ইঙ্গিতে মামীদের কাণে কথাটা তুললাম। মামারাও যে না শুনেছিল— তা নয়, কিন্তু—একে দূর সম্পর্কীয়

মামা, তার উপর জমিদারের ছেলের বিপক্ষে লড়াই—মামারা কথা শুনেত কাণে তুললেন না।

এই সময় একদিন সংসারের কাজ কর্ম্ম সেরে সন্ধ্যাবেলা পুকুর ঘাট থেকে কাপড় কেচে আসছিলাম, আম বাগানে ঘেরা রাস্তাটা সন্ধ্যার আঁধারে ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরছি, হঠাৎ রাস্তার পাশ থেকে জঙ্গল ঠেলে বেরিয়ে আমার পথ আগলে দাড়াল—জমিদারের চতুর চর মুকুন্দ বিশ্বাস। মানুষের রূপধরে এই লোকটা সংসারের বুকের উপর সয়তানের প্রাণ নিয়ে ঘুরে বেড়াত। হঠাৎ পুরুষ মানুষ—বিশেষ মুকুন্দকে দেখে আমার বুক কেঁপে উঠল। শঙ্কিত চিত্তে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়ালাম। মুকুন্দ আমার দিকে দু' পা এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলল, "কেন বল্ দিকি এই ভূতের ব্যাগার ঘেটে মরছিস্। রাজার ঐশ্বর্য্য—তোর পায়ে মাথা খুঁড়ছে—আর তুই কি না তাই—অবহেলা করছিস্। একটা মুখের কথা · খোকাবাবু তোর জন্যে—মাইরি বলছি—পাগল।"

মুকুন্দর কথাগুলো গরম জলের মত আমার সারা-অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। অধৈর্য্য হয়ে—তার দিকে বাঁ পা খানা তুলে বললাম, "তোমার খোকাবাবু আর তোমার মুখে এই বাঁ পায়ের লাথী।" বলে পাশ কাটিয়ে বাড়ীর দিকে এগুতেই—মুকুন্দ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খপ করে আমার হাত চেপে ধরল। তার আস্পর্দ্ধা দেখে আমি আর আপনাকে সামলাতে পারলাম না। কিল, চড়, লাথি মেরে নিজেকে মুক্ত করে বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—গ্রামের গেজেট—যশোদা ঠাকরুণের কণ্ঠস্বর আমার কাণে বাজের মত বেজে উঠ্‌ল—"কে গা সন্ধ্যেবেলা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত কাড়াকাড়ি করছ! বলি তোমাদের কি ঠাঁই অঠাঁই নেই—" মুকুন্দ এ সুযোগ ছাড়ল না। আমাকে লক্ষ্য করে যশোদা ঠাকরুণকে শুনিয়ে বলল, "তা হলে কথা ঠিক থাকল—আমি চল্লাম।" লম্বা লম্বা পা ফেলে সে যশোদা ঠাকরুণের পাশ দিয়েই চলে গেল। লজ্জায়, ঘৃণায়, রাগে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছিল, প্রতিবাদ করতে দু' একবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। বজ্রাহতের ন্যায় খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—তারপর বাড়ী চলে গেলাম।

বয়স কালে যশোদা ঠাকরুণের চরিত্র সম্বন্ধে নানা বদনাম ছিল, সেই বদনামের সাফাই গাইতে গ্রামের ঝি, বৌয়ের খুঁত ধরা ছিল যশোদা ঠাকরুণের ব্যবসা! মেয়ে মানুষ হ'য়ে এতবড় মিথ্যা কলঙ্কের কথা যে মেয়েমানুষের কত বড় আঘাত—তা তিনি বুঝলেন না। এক কথা সাত খানা করে এক রাত্রের মধ্যেই তিনি গাঁ মাথায় করে তুললেন। বলতে পারি না এর ভেতর জমিদারের ছেলের কতখানি হাত ছিল। কিন্তু এই কলঙ্কের মেঘ এমনই ঘনঘটা করে এল, যে আমার মাথায় বাজ পড়তে—বেশী দেরী হ'ল না।

যশোদা ঠাকরুণের অতিরঞ্জিত কথায় বিশ্বাস করে, গ্রামের মধ্যে হৈ—চৈ পড়ে গেল। সমাজপতিরা শকুনির মত দল বেঁধে দাঁড়ালেন আমার কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেতে। মামাদের ওপর হুকুম জারি হ'ল—আমাকে পরিত্যাগ না করলে, তাঁদের একঘরে হতে হবে।

একে দূর সম্পর্কের আত্মীয়—তায় পাঁচটা ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করতে হয়—কাজেই আমাকে ঘরে রেখে সমাজের সঙ্গে লড়াই করাটা মামারা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন না—আমাকে নিজের পথ দেখতে বললেন।

মানুষের হৃদয়হীনতায় অনেকদিন থেকেই—আমার প্রাণ বিষিয়ে উঠেছিল, এই মিথ্যা ঘটনার পরে জীবনের ওপর একটা ধিকার হ'ল! যে সমাজ নারীদের আত্মরক্ষার উপায় না শিখিয়ে পথ দেখতে বলে, তাদের ওপর আবার মায়া কিসের! নিজের দুরদৃষ্টের জালে আর কাউকে জড়াতে প্রবৃত্তি হল না। মামারা সেদিন রাত্রের মত বাড়ীতে থাকতে দিয়াছিলেন, প্রত্যুষে—চলে যেতে হবে।

কোথায় যাব?—যেখানে উদয় হচ্ছি, সেইখানেই ধূমকেতুর মত—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছি। জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই—স্থির করে, প্রত্যুষের অপেক্ষা না করে সেই রাত্রেই—একাকিনী বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ডুবে মরা ভিন্ন হাতের কাছে—মৃত্যুর অন্য কোন অস্ত্র খুঁজে

পেলাম না। নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম। মা, বাবা কাউকে দেখি নি—চিরদিন মামাদের সংসারেই মানুষ হয়েছিলাম। তাঁরা কুকুর বেড়ালের মত বাড়ী থেকে দূর করে দিলেন। যাঁর স্মৃতি বুকে করে এতদিন এত দুঃখেও জীবন ধরেছিলাম সেই স্বামীকে স্মরণ করে বললাম—"স্বামী—আমি অসতী নই—আমি অবিশ্বাসিনী নই।" চোখের তপ্ত অশ্রু নদীর শীতল জলে টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগল। স্বামীকে উদ্দেশ্য করে দু' হাত তুলে প্রণাম করে জলে গিয়ে নামলাম—তারপর—কি হয়েছিল মনে নাই। জ্ঞান হলে বুঝলাম, সয়তানের জালে আবার জড়িয়ে পড়েছি—জমিদারের বাগান বাড়ীর একটা ঘরে আমি বন্দিনী! সেখানে কি করে এলাম, কে আনল কিছুই মনে করতে পারলাম না। তখনও—আমার শরীর দুর্ব্বল, বেশী চিন্তা করবার ক্ষমতা ছিল না।

সুস্থ হয়ে উঠ্লাম। সঙ্গে সঙ্গে—আবার সেই—প্রেতমূর্ত্তি—মুকুন্দ—আবার সেই—সয়তান জমিদার পুত্র—তাদের পশু প্রবৃত্তি নিয়ে আমার সম্মুখীন হ'ল। প্রাণের কোমল তন্ত্রীগুলো তাদের নিষ্ঠুর আঘাতে—আর্ত্তনাদ করে উঠ্ল। তাদের বিষ নিঃশ্বাসে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। আমাকে সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যেতে সয়তান এতদিন মনের আনাচে কানাচে ঘুরছিল, সুদৃঢ় দুর্গে ঢুকতে সাহস করে নি। সে অসহায় অবস্থায় পেয়ে আমাকে পবিত্রতার মণিময় সিংহাসন থেকে টেনে এনে পাপের পঙ্কিল আবর্ত্তে নিমজ্জিত করল, নারীত্বের গৌরব হারিয়ে প্রতিহিংসার তীব্র উদ্দীপনায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হলাম। যে রূপ যৌবনকে হিংস্র মানুষের লেলিহান গ্রাস হতে রক্ষা করতে—এতদিন শঙ্কিত হয়ে দিন কাটাতে হয়েছিল, সেই রূপ যৌবনের ফাঁদ পেতে, মাকড়সার মত মায়াজাল বিস্তার করে বসলাম—স্বার্থপর নীচ সংসারের গলা টিপে মারতে।

তারপর সেই প্রতিহিংসার দুর্দ্দান্ত স্রোতে কত জমিদার পুত্র ভেসে গেল, কত কুসুম কোমল নির্ম্মল চরিত্র কদর্য্যতায় পূর্ণ হয়ে উঠল। কত—পথভ্রান্ত ধনীর সন্তান, কত দিশে-হারা পথিক এই কাল ভুজঙ্গিনীর—বিষ ছোবলে জন্ম ব্যর্থ করল। তখন তাতেই আনন্দ ছিল—তাতেই—আমার তৃপ্তি ছিল। কিন্তু—আজ কিছু নেই—প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে গুটিপোকার মত নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ! সংসার যেমন চলছিল তেমনই চলছে। মাঝখান থেকে আমিই—শুধু ইহকাল পরকাল হারিয়ে বসে আছি। মানুষের বুকে আঘাত করে, নিজের বুকের ব্যথা কমাতে গিয়ে- বুকের ভেতর একটা বেদনার পাহাড় সৃজন করে ফেলেছি—সে বেদনা বড় মর্ম্মন্তুদ—বড় অসহ্য! আজ বুঝেছি- মানুষ মানুষের দণ্ড বিধাতা নয়—দণ্ডদাতা আর একজন আছে!—সংসার আমাদের পরিত্যাগ করেছে, দু' বেলা দু' মুঠো অন্ন জোটে না, পরণের একখানা আস্ত কাপড় জোটে না, তবু আমরা মানুষের চক্ষে পাপী—ঘৃণ্য—ভয়ঙ্কর! কিন্তু বাবু, যাদের বুকের ভেতর এক একটা দুঃখের পাহাড় লুকিয়ে রেখে, চোখের ভেতর অশ্রুর উৎস চেপে রেখে তুচ্ছ রূপ যৌবনের ব্যবসা করে জীবন ধারণ করতে হয়—তারা সংসারের কতটুকু অনিষ্ট করতে পারে!

আমাদের মত শত শত নিরীহ অসহায় অবলার সর্ব্বনাশ করে যারা সংসারের বুকের ওপর চিতার আগুন জ্বালাচ্ছে—তারা নির্দ্দোষ!! সংসার যদি—তাদের শাস্তির বিধান করে, এই দুর্ব্বল পতিতাদের এতটুকু করুণাও—দান করে, তা হলে জানবেন, ঘৃণিত হলেও—এই পতিতারাই সংসারের হিত সাধনে জীবন উৎসর্গ করবে সকলের আগে! তারাও মানুষ, তাদেরও প্রাণ আছে, বিবেক, বুদ্ধি, বিবেচনা সবই তাদের আছে, নেই শুধু সংসারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ! সমাজ নিজের দুষ্টক্ষত আবর্জ্জনার রাশী দিয়ে ঢেকে রেখেছে!"

রমণীর কম্পিত-কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, অশ্রুজলে দুই চক্ষু ভরে উঠল। কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে বসে থেকে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বলল, "চলুন আপনাকে রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে আসি। রাত শেষ হয়ে গিয়েছে।"

রমণীর কথায় চমকে উঠে—খোলা জানালার ভেতর দিয়ে দেখলাম ভোরের আলো দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে। প্রভাতের শান্ত আলোক-ছটা রমণীর ম্লান মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ে তাকে এত বিষাদময় করে তুলেছিল যে তার মুখের দিকে

চেয়ে সহানুভূতীর আলোড়নে আমার সারা হৃদয় তোলপাড় করে দিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—"আমাদের বাড়ী যাবে ?"

ম্লান হাসি হেসে রমণী বলল—"এ যে রাবণের চিতা - চিতার আগুন না হলে এ আগুন নিভবে না। যেটুকু স্নেহ আজ আপনার কাছে পেলাম সেইটুকুই আমার অক্ষয় হয়ে থাকুক। আপনার বাড়ী যাবার অধিকার দেবার মত উদারতা সমাজের এখনও হয় নি।"

রমণীর এই কথার উত্তর মনের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। পকেটে হাত দিয়ে যা কিছু টাকা পয়সা ছিল, সব তার সুমুখে রেখে বললাম, "আমাকে ক্ষমা কর, সমস্ত রাত তোমাকে জাগিয়ে বসিয়ে রেখেছি- "

টাকা পয়সাগুলো আমার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে রমণী আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "টাকা পয়সার চেয়ে ঢের দামী জিনিষ আপনি আমাকে দিয়েছেন, অর্থের আবরণে তাকে কদর্য্য করে তুলবেন না। আর রাত জাগা—রাতজাগাই যে আমাদের ব্যবসা।"

কোন কথাই আমার মুখ দিয়ে বেরুল না. একটা তীব্র বেদনার আঘাতে সমস্ত বুকখানা টন্ টন্ করে উঠল। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বের করে, নিজের নাম ও ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বললাম—"যদি কখন দরকার হয়—এই ঠিকানায় আমার খোঁজ কোরো !"

রমণীর দুইগণ্ড বয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল। গলায় কাপড় দিয়ে সে আমার পায়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চলুন রাস্তায় পৌছে দিয়ে আসি।"

চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

নটের আবেদন

[স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত]

বক্তা ও অভিনেতা যেরূপ আদর পান, এরূপ আদর আর কেহই পান না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু আবার অভিনেতা যেরূপ নিন্দার ভাজন হ'ন, সেরূপও আবার কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। আদর ও অনাদর সমভাবেই চলে। রাজার সহিত একত্রে ভোজন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত সমভাবে ভ্রমণ,—একদিকে এত আদর, আবার অপর দিকে অভিনেতার শবদেহের সৎকার স্থান পাওয়া কষ্টকর হয়। নাট্যালয় সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ব্যক্তি যাঁহারা—যতদিন জগতে অক্ষর চলিবে, ততদিন মানুষের মধ্যে শীর্ষস্থান পাইবেন। জীবিত অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে—শুনিলে হৃদয় বিগলিত হয়। জগদ্বিখ্যাত "মলেয়ার" নাট্যকার ছিলেন এবং নিজ নাটকের অভিনেতা ছিলেন। পাদ্রীর বিদ্বেষে তাঁহার শবদেহের কবরের স্থান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অদ্যাবধি শিক্ষিত ইউরোপে সুশিক্ষিত নাট্যকার প্রায়ই তাঁহাকে অবলম্বন করেন। পূর্ব্বে যেমন এদেশে প্রধান প্রধান যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, পাঁচালি ওয়ালা দেবতার স্থানে পালা গাহিয়া পরে রোজগারে যাইতেন, সেইরূপ অদ্যাবধি প্যারিসে আসিয়া নিজ গুণের পরিচয় না দিলে, অভিনয় কার্য্যে বা অন্য উচ্চ শিল্প কার্য্যে কেহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। যে স্থানে এতদূর গুণের আদর, সেই স্থানে আবার ততোধিক জীবিত গুণীর প্রতি বিদ্বেষ। শোনা যায়, একদিন একজন সঙ্গীতজ্ঞ সুর-স্রষ্টা মহাশয় পথে যাইতে যাইতে আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে "হায়! উচ্চ অট্টালিকায় আমারই রচিত গীত হইতেছে, কিন্তু আমার এই দারুণ শীতে বস্ত্র নাই,—ক্ষুধা নিবারণের একখানি রুটি নাই।" সমস্ত সভ্য প্রদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত পাওয়া যায়। আবার আদরের দৃষ্টান্তও এইরূপ শত শত। এ আদর বঙ্গীয় অভিনেতাও পাইয়াছেন। স্বর্গীয় ৺নাটোরের রাজা কোনও অভিনেতাকে নিজ রাজ-সজ্জার দ্বারা স্বহস্তে ভীমসিংহ সাজাইয়া দিয়াছিলেন, অভিনেতাবর্গ লইয়া আহার করিতেন, তাহাদের সহিত রহস্য করিতেন ও রহস্যালাপে উত্তর প্রত্যুত্তরে বিরক্ত না হইয়া হাস্য করিতেন। কেবল তিনি কেন, অনেক মহারাজাধিরাজ বঙ্গীয় অভিনেতাকে বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—অভিনেতার যেরূপ আদর সেইরূপ অনাদর। বঙ্গেও তাই। যে সকল অভিনেতার ভাগ্যে রাজকরে সুসজ্জিত হওয়া ঘটিয়াছিল,—তাহাদের নামে অনেকে এক্ষণে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করেন।

সকল দেশেই ধর্ম্ম যাজকের চক্ষে অভিনেতা ঘৃণিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম যাজকেরাই অভিনয় করিয়াছেন। কঠোর রোমান ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের (জেসুট) মধ্যেও অভিনয় প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থ গ্রহণ করিয়া টিকিট দিতেন, কিন্তু তাঁহারাই আবার অভিনেতাকে ঘৃণা করিতেন। রঙ্গভূমির সুর লইয়া গীত রচনা পূর্ব্বক দেবমন্দিরে গান করেন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গীতাচার্য্যকে ঘৃণা করেন। কেন সে সকল সুর গ্রহণ করেন—জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—কেবল সয়তানই কেন সুন্দর সুর ব্যবহার করিবে?

ঘোরতর ধর্ম্মবিদ্বেষ সত্ত্বেও জগতের রঙ্গভূমি বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম যাজকের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া দর্শকবৃন্দ রঙ্গভূমিকে প্রশ্রয় দেন, মহা মহা কবিকল্পিত চরিত্র দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ হৃদয়কে উন্নত করিয়া যান, কুৎসিত আচার ব্যবহারের প্রতি মহাকবির তীব্র শর প্রক্ষেপ দর্শনে আহ্লাদিত হন,—রঙ্গভূমে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পান,—এই নিমিত্ত ধর্ম্ম যাজকের বাক্য উপেক্ষা করেন। রঙ্গভূমে যখন এরূপ কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাহার উন্নতিতে সাহায্য দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য কার্য্য নিশ্চয়। কিন্তু অনেকেই বাঙ্গালার

রঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—কই সেরূপ উচ্চ রঙ্গমঞ্চ কই ?" আধুনিক রঙ্গমঞ্চ বহুদিন সৃষ্ট হয় নাই, তথাপি শুনিতে পাই, কোনও বৃদ্ধ মৃত্যুকালে তাঁহার সন্তানকে অনুরোধ করিয়া একজন অভিনেত্রীকে আনিয়া রঙ্গমঞ্চের হরিনাম গান শুনিয়াছিলেন। অনেক মহাত্মাকে রঙ্গভূমে ভাব ও দশা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু যদি এরূপ না হইত, তথাপি রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধনে যত্ন করা অবৈধ নহে। যদিচ আজও রঙ্গভূমি হইতে উচ্চ কার্য্য প্রদর্শিত হয় নাই, উৎসাহ প্রদানে যে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ বলা যায় না। কারণ আধুনিক বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের যে দশা, পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চেরও সেই দশা ছিল। প্রথমে রূপকের অভিনয়,—কাম ক্রোধ-লোভ মোহকে, মনুষ্যাকারে সাজাইয়া দৃশ্যকাব্য গঠিত হইত। এখানেও তাহা ঘটিয়াছে। প্রবোধ চন্দ্রোদয় প্রভৃতি নাটক তাহার প্রমাণ। তাহার পরে Passion play অর্থাৎ অবতার বিশেষ ব্যক্তি চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক—তাহাও বাঙ্গলায় হইতেছে। যদি কেহ একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক কিরূপ হীন লজ্জায় অভিনীত হইয়াছিল, এবং এখনকার রঙ্গভূমির সজ্জার সহিত তুলনা করেন,—তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, উৎসাহ প্রদানে রঙ্গমঞ্চের আরও উন্নতি সাধন হইতে পারে।

সকল দেশেই বালক লইয়া প্রথমে স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় আরম্ভ হয়। কিন্তু সে অভিনয় সাধারণের তৃপ্তিকর না হওয়ায়, স্ত্রীলোকের ভূমিকা (Part) স্ত্রীলোকে করিতে থাকে। যাঁহাদের স্মরণ আছে, তাঁহারা বলিবেন যে—ন্যাসান্যাল থিয়েটারে বালক লইয়া অভিনয় হইত। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রীলোক অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে আর আদৌ লোক হইত না। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় বালক লইয়া অভিনয় করিতে গিয়া বহু আয়াস সঞ্চিত সম্পত্তি বিনাশ করিয়াছিলেন। বালকের অভিনয় কার্য্যে যে কেবল সুন্দর রূপ অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তাহা নয়, বালকেরও সর্ব্বনাশ হয়। কোমল বয়সে স্ত্রীলোকের হাবভাব অনুকরণ করিতে গিয়া এক রকম মেয়েলি ঢং আজীবন রহিয়া যায়। বালকের অভিনয়ে অন্যান্য প্রচুর দোষও উপস্থিত হয়। কাজেই নাট্যাধ্যক্ষেরা রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক আনিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সমাজে অভিনেত্রীরূপে কুলস্ত্রী কোথায় পাইবেন? প্রথমে কোন দেশে কে পাইয়াছে! অদ্যাপি নটী নামের সহিত উচ্চ নীতির সংযোগ কেহই করেন না। ইউরোপে আপাততঃ অনেক নির্ম্মল স্ত্রী অভিনয় কার্য্যে আছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ তাহা নয়। ব্যালেট্ ড্যানসার নর্ত্তকীর সহিত সামান্য গণিকার বড় কেহ প্রভেদ করেন না। কিন্তু তথাপি থিয়েটারের কথা বলিতে হইলে, অনেক সুবিবেচক ব্যক্তিও সামান্য গণিকা লক্ষ্য করিয়া রঙ্গভূমিকে ঘৃণা করেন। কীর্ত্তনী ও নর্ত্তকীর প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ বিদ্বেষ নাই। কীর্ত্তনী গাহিতেছে, সে সভায় সকলেই বসেন। নাচের নিমন্ত্রণে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ যাওয়ায় কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজক আপত্তি করেন না। কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রতি—তাঁহাদের যে উদারতা প্রকাশ নাই। কীর্ত্তনে নর্ত্তনে গুণ দেখেন—বেশ্যা দেখেন না। কিন্তু সমস্ত রঙ্গালয় বেশ্যার ঘ্রাণে পরিপূর্ণ। এরূপ বিদ্বেষের কারণ বোঝা ভার। বলিয়া থাকেন,—রঙ্গালয় ভাল, যদি ভাল করিয়া চালান যায়। কিন্তু কিরূপে ভাল করিয়া চলিবে—তাহা বলেন না। সাধারণ স্ত্রীলোক না লইয়া আমরা কাহাকে ডাকিব? কিরূপে উন্নতি সাধন করিব? অর্থব্যয়ে আমরা প্রস্তুত, সুন্দর রঙ্গালয়, দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ, তাহার প্রমাণ। বড় কেরানীর মাহিনা অভিনেত্রীকে দিয়া থাকি। অভিনয়ে শিক্ষিতা করিতে গেলে ভাল কথা ও ভাল ভাব বুঝাইয়া দিতে আমরা বাধ্য, নতুবা আমাদের কার্য্য চলিবে না। কিন্তু আর আমরা কি করিব? যাঁহারা নিন্দা করেন—তাঁহারাই আমাদিগকে বলুন, রঙ্গালয় ত্যাগ করিব? বারনারী লইয়া অভিনয়ে দেশের যাহা ক্ষতি হইতেছে, তদপেক্ষা উচ্চ শিল্পের পতন কি দেশের শোচনীয় শিল্পের অবস্থা প্রমাণ করিবে না? শত শত ব্যক্তি নাটক লিখিতে চেষ্টা করিতেছে। যে সকল যুবক দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই, তাহারা শিক্ষিত হইতেছে, পরিবার প্রতিপালন করিতেছে। চিত্রকর স্বভাব অনুকরণে বিশেষ চেষ্টিত, যন্ত্রী মুদ্রাকরী যন্ত্রের চর্চ্চা করিতেছে। এ সকল স্থগিত থাকিলে দেশের কি বিশেষ মঙ্গল? আমাদের

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা—কিরূপে সাধারণের আদরভাজন হইব, কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া, নাটকের উন্নতি সাধিব, কিরূপে রুচি মার্জ্জিত করিব তাহা আমাদের সহৃদয় ব্যক্তিগণ শিখাইয়া দেন। ঘৃণা না করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। তিরস্কার মস্তক পাতিয়া লইব। রোগের ঔষধ দেন,– রোগ রোগ করিয়া চীৎকার করিবেন না।

তাহার পর নাটকের উন্নতি। ভাল নাটক নাই—সকলেই বলিয়া থাকেন। যাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তি, সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক দেখাইয়া বাঙ্গলা নাটকের ঘৃণা করেন। তাঁহারের বিবেচনায় প্রায় যেন সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব স্থানে সেক্‌স্‌পিয়ার ছড়া ছড়ি যায়। তাহার পর যদি বাঙ্গালায় সেক্‌স্‌পিয়ার জন্মাল, তাঁহাকেও সেক্‌স্‌পিয়ারের মত বহু দিন অযশস্বী থাকিতে হইবে। যতদিন কীন্, কেম্বেল্, সিরাণ প্রভৃতি বাঙ্গলায় জন্মগ্রহণ না করিবেন, ততদিন সেক্‌স্‌পিয়ার জন্মিয়াই একেবারে সেক্‌স্‌পিয়ার হইতে পারিবেন না। কীন্ কেম্বেল অভিনয়ের বিকাশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বিকাশ একেবারে কোনও স্থানে হইতে পারে না। আমেরিকা সভ্যতার সোপানে অতি শীঘ্র আরোহণ করিয়াছেন। তথাপি আমেরিকার নাটক ও নাটক-অভিনেতা, পুরাতন ইংলণ্ডের নাটক ও নাটক অভিনেতার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় একেবারে এত প্রত্যাশা করিলে সে প্রত্যাশা বিফল হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হয় নাই, হইবে না, তাহা কিরূপে হইবে ? প্রহসন অভিনয় করিয়া এদেশের অভিনেতারা প্রথম দীক্ষিত। উচ্চৈঃস্বরে অভিনয় করিতে বহুদিনের শিক্ষায় অভিনেতা সক্ষম হইয়াছে। বহুদিনের শিক্ষায় রঙ্গমঞ্চের একপার্শ্বে না দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইতে শিখিতেছে। ভাবভঙ্গি কতক কতক আনিতেও শিখিতেছে এবং কেহ কেহ অভিনেতা নামে যুগ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রদেশে অনেক দর্শকের মতামত যাহা নাট্যাধ্যক্ষেরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে অভিনয়ের বিস্তর প্রশংসা দেখিতে পাইবেন। ম্যাক্‌ব্যাথ্ অভিনয় দৃষ্টে Englishman ও Daily Newsএর Editor উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। লেডি ডফ্‌রিণের পুস্তকে বঙ্গ নাট্যশালার উচ্চ প্রশংসা বাক্যের উল্লেখ আছে। Light of Asia রচয়িতা এডুইন আরনল্ড তাঁহার ভ্রমণ বিবরণে বঙ্গ নাট্যালয়কে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞান সম্ভুত উচ্চভাব সম্পন্ন নাটকের সুচারু অভিনয়, তিনি বঙ্গ নাট্যালয়ে দেখিয়াছেন এবং সেই সকল উচ্চভাব দর্শকবৃন্দেরও বিশেষ আদরনীয়,—যাহা পাশ্চাত্য প্রদেশে বিরল। অবশ্য দৃশ্যপট ভাল বলেন নাই। কিন্তু সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য পাইলে অতি সুন্দর দৃশ্যপট প্রস্তুত করা বাঙ্গালী নাট্যাধ্যক্ষের অসাধ্য নয়। পাশ্চাত্য অভিনেতার যে অর্থাগম একরাত্রে হয় নাট্যাধ্যক্ষের এক সপ্তাহের আয় তাহা অপেক্ষা ন্যূন। ইহাতে যে বিপুল ব্যয় করিতে নাট্যাধ্যক্ষেরা অসমর্থ হ'ন, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই যে মার্জ্জনা করেন—তাহার সন্দেহ নাই।

আমাদের বাঙ্গলায় নিম্নশ্রেণীর টিকিটের মূল্য আট আনা। কলিকাতার ইংরাজি থিয়েটারে সেই স্থানে বসিতে হইলে এক টাকা দিতে হয়। কলিকাতার ইংরাজি নাট্যালয়ে উচ্চ স্থানের দর্শক ধরে না,—বাঙ্গলার ষ্টেজে উচ্চস্থান প্রায়ই খালি থাকে। অর্থাগমের প্রভেদে যে দৃশ্য পটের প্রভেদ হয় তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু ১৮৫৭সালে "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক" আর এই ১৯১০সাল,—এই সময়ের মধ্যে যে রঙ্গভূমির অনেক উন্নতি হইয়াছে তাহা বিশ্ব নিন্দুককেও স্বীকার করিতে হইবে।

আর একটী দোষের কথা এই যে রঙ্গালয়ে গীতিনাট্য প্রবল হইয়াছে। এবার নিন্দুক কাহার সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিন্দা করিবেন ? ইউরোপের অভিনয়ের সহিত কি ? দুর্ভাগ্যবশতঃ ইউরোপেও গীতিনাট্য প্রবল। মহাত্মা "আরভিন্"এর সেক্সপীয়ারের Play করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনও প্রতিভাশালী অভিনেতা কলিকাতায় আসিয়া সেক্সপীয়ারের নাটক Play করিতে গিয়া ইংরাজ টোলায় পাঁচ টাকা মাত্র টিকিট বিক্রয় করিয়াছিলেন। সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনেতা, কলিকাতা আসিতে সাহস করেন না। Band man ও Brough সেক্সপীয়ার ছাড়িয়া গীতিনাট্য ও রং তামাসা লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। Belle of New York নামক গীতি-নাট্য

ইউরোপ ও আমেরিকায় পরম আদরের সামগ্রী। যে কোনও সম্প্রদায় কলিকাতায় আসিতেছেন, তাঁহারাও Belle of New York করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন। যদি গীতি-নাট্যের পাশ্চাত্য প্রদেশে এরূপ আদর এবং পাশ্চাত্য রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা যদি গীতি-নাট্য অবলম্বন করিয়া দোষী না হন, তবে আমরা কিসে বিদ্বেষভাজন ? আমরা পুনঃপুনঃ সকাতরে মিনতি করিতেছি, আমাদের দোষ সংশোধন করুন, ঘৃণা প্রদর্শনে শিল্পির পথের কণ্টক হইবেন না। উপদেশ দানে প্রথমে পুরস্কৃত করুন। যদি উপদেশ পালন না করি, তিরস্কার করিবেন। মাথা পাতিয়া লইব -- পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিতেছি।

রঙ্গালয় যেরূপ ধর্ম্মযাজক দ্বারা নিপীড়িত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে রাজার উৎসাহ, সম্ভ্রান্ত ধনীব্যক্তির উৎসাহ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তির উৎসাহ ব্যতীত বাল্যাবস্থায় রঙ্গভূমির অকাল মৃত্যু হইত। কিন্তু জগতের সৌভাগ্যে, কবি চিত্রকর ও অভিনেতার সৌভাগ্যে, নাট্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ হৃদয়ের উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মযাজকের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সকল সভ্যদেশেই রাজার নিজ নাট্য-সম্প্রদায় ছিল, সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। পণ্ডিতেরা প্রতিভার প্রশংসা করিতেন; রঙ্গালয়ও সে নিমিত্ত স্থায়ী হইয়াছে।

রাজমন্ত্রী নাটক লিখিয়া অভিনয়ের উন্নতি সাধনে চেষ্টিত ছিলেন। কোন কোন উচ্চহৃদয় ধর্ম্মযাজকও নাটকের উৎসাহ দাতা। ধর্ম্মযাজক রাজমন্ত্রী রিস্‌লু, জগদ্বিখ্যাত কর্ণেলিকে (যাঁহার কল্পনা-প্রসূত নাটক সকল মানব মাত্রেরই আদরের বস্তু) প্রশংসাবাদ ও উৎসাহ প্রদানে সাধারণের নিকট পরিচিত করেন। রাজ সাহায্য ব্যতীত, সেক্সপীয়ার, রেচিনী, কর্ণেলী, মলেয়ার প্রভৃতি জগতের নাট্যকারেরা কাহারও পরিচিত হইতেন না। উৎসাহ ব্যতীত আমাদের অকাল মৃত্যু ঘটিবে। সেই নিমিত্ত করজোড়ে প্রার্থনা,—মহোদয় ব্যক্তি মাত্রেই আমাদের উৎসাহ প্রদান করুন।

(নাট্যমন্দির)

কবিচূড়ামণি কালিদাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বি-এ, এম, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)]

প্রথম অঙ্ক

(১)

রথারূঢ় ধনুর্দ্ধারী মৃগয়াবেশী মহারাজ দুষ্যন্ত, তাঁহার সম্মুখে দূরে পলায়মান হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ নেত্রাভিরাম কৃষ্ণসার। সারথির কথায় কবিবর দর্শকের নেত্রপথে এই দৃশ্যের মহিমা সম্পূর্ণ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

সূতঃ। (রাজানং মৃগঞ্চাবলোক্য) আয়ুষ্মন্,

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্ম্মুকে।

মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্॥

রাজা। সূত, দূরমমুনা সারঙ্গেণ বয়মাকৃষ্টাঃ। অয়ং পুনরিদানীমপি—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ

পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।

দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা

পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি॥

(সবিস্ময়ম্) তৎ কথমনুপতত এব মে প্রযত্ন প্রেক্ষনীয়ঃ সংবৃত্তোঽয়ং মৃগঃ!

সারথি। (রাজা ও কৃষ্ণসারের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া) মহারাজ, ঐ কৃষ্ণসার ও ধনুর্দ্ধারী আপনার প্রতি চাহিবামাত্র মৃগরূপযজ্ঞানুসারী পিনাকধারী ভগবান্ শিবকে যেন সাক্ষাৎ দেখিতেছি।

রাজা। সারথে! ঐ মৃগ আমাদের অনেক দূর আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছে। দেখ, দেখ, এখনও উহার অনুগামী আমার রথের পানে বারবার দৃষ্টিপাত করিতেছে। অহো, তখন উহার গ্রীবাভঙ্গ কি সুন্দর দেখাইতেছে। আমার নিক্ষিপ্ত শরের পতন ভয়ে উহার দেহের পশ্চাৎভাগ পূর্ব্বভাগেই প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধাবনের শ্রমে উহার উন্মুক্ত বদন হইতে অর্দ্ধচর্ব্বিত কুশগুলি পতিত হইয়া পথ ছাইয়া যাইতেছে। দেখ, দেখ, পথের অধিকাংশই উল্লম্ফন হেতু শূন্যমার্গে ধাবিত হইতেছে, অল্পই ভূমার্গে যাইতেছে। (বিস্ময়ের সহিত) তাই ত! কিরূপে এই মৃগ আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিলেও এক্ষণে আমার প্রযত্ন দৃশ্য (অর্থাৎ দূরবর্ত্তী) হইয়া গেল!

কি রমণীয় মহিমময় দৃশ্য! সারথির উপমায়ই রাজার সৌন্দর্য্য ও মহিমা পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। রাজার কথায় মৃগের নৈসর্গিক সৌন্দার্য্য ও আতঙ্কে পলায়নে এক অদ্ভুত অভিনব সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে! সামান্য একটি উৎপ্রেক্ষা ও একটি স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগে কবিবর দর্শকের মানস-মন্দিরে দৃশ্যের মহিমা ও সৌন্দর্য্যকে অপূর্ব্বভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন! সত্যই কালিদাস অলঙ্কার প্রয়োগে অতুলনীয়। ঐ প্রদেশের বন্ধুরত্ব ও ভৌগোলিক অবস্থানও উহাতে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

এখানে প্রথম শ্লোকটির মধ্যে ভগবান্ মহাদেবের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, উহা প্রত্নতত্ত্বান্বেষি মাত্রেরই সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। কবিবর দক্ষযজ্ঞভঙ্গ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রচলিত পুরাণের অনুমোদিত নহে। শিবপুরাণাদি মতে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শিব গমন করেন নাই। এস্থলে কবিবর মূল মহাভারত অনুসরণ করিয়াছেন। সৌপ্তিক পর্ব্বে আছে—

ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিনা।

অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগো ভূত্বা স পাবকঃ॥

১৮ অধ্যায়,

শান্তিপর্ব্বে আরও পরিস্ফুট আছে—

ততঃ স যজ্ঞো নৃপতে বধ্যমানঃ সমন্ততঃ।

আস্থায় মৃগরূপং বৈ খমেবাভ্যগমৎ তদা॥

তং তু যজ্ঞং তথারূপং গচ্ছন্তমে উপলভ্য সঃ।
ধনুরাদায় বাণেন তদান্বসরত প্রভুঃ॥

২৮৩ অধ্যায়। (১)

রামায়ণ বালকাণ্ডেও দেবদেব স্বয়ং যে ধনুর্দ্ধারা দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছিলেন উহা জনক রাজার পূর্ব্বপুরুষ দেবরাজের নিকটে ন্যাসরূপে গচ্ছিত ছিল। এই সব বৃত্তান্ত পৌরাণিক যুগে নানারূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্বান্বেষীদিগের অনেকেরই অভিমত যে পুরাণগুলি প্রথমে সাধারণ জনগণের অবগতি ও আকর্ষণের জন্য প্রকৃত ভাষায় গ্রথিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃতের পুনরভ্যুদয়ের সঙ্গে উহারা সংস্কৃতে গ্রথিত হয়। সুতরাং মহর্ষি বাল্মীকি কৃত রামায়ণ ও কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণে যেরূপ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, মহাভারত ও পুরাণের বৃত্তান্তে তাদৃশ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হওয়ায় আমাদের বিস্ময়ের কিছুই নাই। কাশীদাস কৃত মহাভারতও ঐরূপ ব্যাসকৃত মহাভারত হইতে অনেক বিষয় বর্ণনে সম্পূর্ণ পৃথক্। কালিদাসের কাব্যাদিতে আমরা পৌরাণিক বিকৃত বৃত্তান্ত আদৌ পাই না। এমন কি রতি-রসের প্রধান কবি কালিদাসের কোনও গ্রন্থে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদি বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ ব্যাপারের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে একবারও উল্লেখ নাই। (২) পুরাণ মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ সমধিক পূর্ব্বকালবর্ত্তী, তদ্ব্যতীত উহাদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশও তাদৃশ নাই। কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি মতে উল্লিখিত দুই পুরাণ বর্ণিত অনেক বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে উষাপুরাণ যুগের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এবং পুরাণেরও শৈব বৈষ্ণব দ্বন্দ্বযুগের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে কালিদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রঘুবংশ হইতে নিম্নে আর একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিতেছি, উহা দ্বারাও কালিদাসের প্রাচীনত্ব আরও স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে। রঘুর ত্রয়োদশে কবিবর রামচন্দ্রের মুখে বলিতেছেন—

গুরোর্যিযক্ষোঃ কপিলেন মেধ্যে
রসাতলং সংক্রমিতে তুরঙ্গে।
তদর্থমুর্ব্বীমাদারয়দ্ভিঃ
পূর্ব্বৈঃ কিলায়ং পরিবর্দ্ধিতো নঃ॥১৩।৩। (১)

কবিবরের কথায় জানা যাইতেছে যে কপিল মুনির আদেশে (নিজস্ব প্রয়োগে উহাই উপলব্ধি হয়) সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্ব রসাতলে (তদীয় ধ্যানের ক্ষেত্রে) সংক্রামিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাপ্ত রামায়ণের আদি কাণ্ডে আমরা দেখিতে পাই যে দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসের ছদ্মবেশে সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়া কপিল মুনির তপোবনে রাখিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন।

তস্য পার্ব্বণি তং যজ্ঞং যজমানস্য বাসবঃ।
রাক্ষসীং তনুমাস্থায় যজ্ঞীয়াশ্বমপাহরত্॥

*　*　*　*

তে তু সর্ব্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্॥
হরঞ্চ তস্য দেবস্য চরন্তমবিদূরতঃ।
প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে তে সগরাত্মজাঃ॥
তে তং যজ্ঞহনং জ্ঞাত্বা ক্রোধ পর্য্যাকুলে ক্ষণাঃ।
খনিত্রলাঙ্গলধরা নানাবৃক্ষ শিলাধরাঃ

---

(১) কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের একাদশ সর্গেও শিব যে নিজেই যজ্ঞস্থলে গিয়া যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছেন।

তৎপ্রসুপ্ত ভুজগেন্দ্র ভীষণং বীক্ষ্য দাশরথিরাদদে ধনুঃ।
বিদ্রুতক্রতু মৃগানুসারিণং যেন বাণ মসৃজদ্ বৃষধ্বজঃ॥৪৪।

(২) মেঘদূতে "গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ" এই মাত্র এ কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু রাধা, জটিলা, কুটিলা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতির নাম-গন্ধও কোথাও নাই।

(১) রঘুবংশের তৃতীয় সর্গেও কবিবর দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে ঐ বৃত্তান্তই বলাইয়াছেন—

অতোঽয়মশ্বঃ কপিলানুসারিণা পিতুস্ত্বদীয়স্য ময়াপহারিতঃ।
অলং প্রযত্নেন তবাত্রমানিধাঃ পদং পদব্যাং সগরস্য সন্ততেঃ॥৫০।

এখানেও বেশ বুঝা যাইতেছে যে দেবরাজ রঘুকে বলিতেছেন মহর্ষি কপিলের অনুসরণে তিনি রঘুর পিতার যজ্ঞীয় তুরঙ্গ অপহরণ করাইয়াছেন। বল্লভ, হেমাদ্রি, চারিত্রবর্দ্ধন, ধর্ম্মমের প্রভৃতি টীকাকারগণ এখানে স্বেচ্ছাকৃত নানাবিধ পুরাণানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মল্লিনাথ এখানে আর কিছু না পাইয়া 'অপহারিতঃ মানে অপহৃতঃ' করিয়া স্বার্থে নিচ্ করিয়াছেন।

অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধা তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্ ॥
অস্মাকং ত্বং হি তুরগং যজ্ঞিয়ং হৃতবানসি।
দুর্মেধস্ত্বং হি সংপ্রাপ্তাম্ বিজিনঃ সগরাত্মজান্ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন।
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুঙ্কারমকরোত্তদা ॥
ততস্তেনা প্রমেয়েন কাপিলেন মহাত্মনা।
ভস্মরাশী কৃতাঃ সর্ব্বে কাকুৎস্থ সগরাত্মজাঃ ॥

বালকাণ্ডে ৩৯ সর্গ।

রামায়ণের উপরিউক্ত বিবরণটি পরস্পর সঙ্গতি শূন্য। দেবরাজ ইন্দ্র নিজে অশ্ব চুরি করিয়া উহা আবার রসাতলে কপিল মুনির তপোবনে রাখিয়া আসিলেন কেন? বিষ্ণুর অবতার মহর্ষি কপিলও হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া হুঙ্কার বলে সগর পুত্রদের ভস্মসাৎ করিলেন কেমন করিয়া? বর্ত্তমানে প্রাপ্ত রামায়ণের আদিকাণ্ডের অনেক স্থলই এরূপ পরস্পর সঙ্গতি হীন বিবরণে পরিপূর্ণ। তাই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ রামায়ণের আদিকাণ্ডের অধিকাংশ স্থলই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উপরিউক্ত বিবরণটি বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহা উহা অপেক্ষা অনেকাংশে সঙ্গত। বিষ্ণুপুরাণে আছে (১) দেবতারা সগরপুত্রদিগের দারুণ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রসাতলে তপোনিরত মহর্ষি কপিলের নিকটে গমন করিয়া ত্রাণ কামনা করিলেন; ভগবানও তাঁহাদের অভয় প্রদান করিয়া অল্প দিনেই দুরাচারগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে বলিলেন। এই সময়ে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া অশ্বরক্ষার ভার তাঁহার ষাট হাজার পুত্রদের উপরে অর্পণ করেন। এক ব্যক্তি যজ্ঞীয় অশ্বটি অপহরণ করিয়া রসাতলে মহর্ষির তপোবনে প্রবেশ করিল। সগর পুত্রগণ অন্বেষণ করিতে করিতে আশ্রমে মহর্ষির সমীপে ঘোড়াটি দেখিতে পাইয়া তাহাকেই ঘোড়া চোর স্থির করিয়া হত্যা করিতে গিয়া মহর্ষির তপোবহ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

রামায়ণের বিবরণের চাইতে বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ অনেকটা সঙ্গত বটে, কিন্তু উহাও ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কেন না কে কাহার আদেশে যজ্ঞীয় অশ্বটি লইয়া গিয়া রসাতলে কপিলের আশ্রমে রাখিয়া আসিল। উহা বিষ্ণু-পুরাণেও নাই। কিন্তু কবিবর কালিদাস যাহা হইতে এই ঘটনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই অবিকল ও ঠিক। দেবতারা মহর্ষি কপিলের নিকট অত্যাচারের প্রতীকার চাহিলেন, সুতরাং ঋষিবরই নিশ্চয় কাহারও দ্বারা অশ্বটি আনাইয়া আশ্রমে রাখিলেন ইহাই সঙ্গত। বর্ত্তমানে প্রাপ্ত রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণ উভয়েই মূলের বিকৃত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই। কবিবর কালিদাস যে রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ বা গ্রন্থান্তর হইতে এই বিবরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই অনুসন্ধেয়। ইলিয়ড ও ওডিসীর প্রকৃত পাঠ উদ্ধারের ন্যায় আমাদের রামায়ণ, মহাভারত ও মূল প্রকৃত পুরাণ গুলির ঠিক পাঠোদ্ধার হইলে এই সব বিসদৃশ আর থাকিবে না।

(২) মৃগয়ার উপযোগ্য হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল সমাকুল নিবিড় অরণ্যানী এবং শমপ্রধান পূতসামগাননিনাদিত তপোবনের নিকটবর্ত্তী উন্নতানত ভূভাগের সন্ধিস্থলে মহারাজ দুষ্যন্তের বৈখানসদিগের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার অদ্ভুত নাট্য-সৌন্দর্য্যময়। প্রথমে দৃষ্টি বিভ্রমকারী পেলরেখা দৃশ্য-বলে দর্শকবৃন্দ দেখিতেছেন রাজর্ষি দুষ্যন্ত দ্রুতগামী কৃষ্ণসারের অনুসরণ করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে প্রবিষ্ট হইতেছেন; তাঁহার রথের অশ্বগুলি গতিতে দেবরাজ ইন্দ্রের হরিযুগলকে, এমন কি তপন দেবের সপ্ত সপ্তিকেও অতিক্রম

---

(১) ততশ্চ * * * সাগরৈরপধ্বস্ত যজ্ঞাদি সন্মার্গে জগতি দেবাঃ সকল বিদ্যাময়ম্ অসংস্পৃষ্টম্ অশেষ দোষৈঃ কপিলর্ষিং প্রণম্য তদর্থমূচুঃ। ভগবন্, এভিঃ সগর তনয়ৈঃসমঙ্কুসশ্চরিতম্ অনুগম্যতে। কথমেবম্ এভিরসুসরস্তির্জগদ্ ভবিষ্যতীত্যার্ত্তজগত পরিত্রাণায় চ ভগবতোঽত্র শরীর গ্রহণম্। ইত্যাকর্ণ্য ভগবান্ অল্পেয়ের দিনৈরেতে বিলঙ্ক্যন্তি ইত্যুক্তবান। অত্রান্তরেচ সগরো হয়মেধম্ আরেভে। তত্র চ তৎপুত্রৈরধিকিতম্ অস্যাশং সোঽপ্যপহৃত্য ভুবো বিবরং প্রবিবেশ। ততশ্চাশ্বান্বেষণায় তনয়ান্ যুযোজ। পাতালে চাশ্বং পরিভ্রমন্তম্ অবনীপতি নন্দনাস্তে দদৃশুঃ। নাতিদূরং স্থিতং চ ভগবন্তং * * * কপিলম্ অপশ্যন্। ততশ্চোদ্যতাস্ত্রা দুরাত্মায়ং * * হয় হন্ত হন্তত্যং হন্যতাম্ ইত্যাধাবন্। ততশ্চ তেনাপি ভগবতা সিক্লিকীষত্ পরিবর্ত্তিত লোচনেন বিলোকিতাঃ স্বশরীর সমুত্থেনাগ্নিনা দহমানা বিনেশুঃ।

বিষ্ণুপুরাণ। ৪র্থ অংশ। চতুর্থাধ্যায়।

৬

করিতেছে, অধিক কি রাজার রথের বেগ বর্ত্তমান কালের রেলগাড়ীর বেগের চাইতেও অধিক। হঠাৎ পার্ব্বত্য অরণ্য ও সমভূমিস্থ আশ্রমের সন্ধিস্থলে আসিয়া কৃষ্ণসার দাঁড়াইল, কেন না সে শ্রান্ত ও ক্লান্ত এবং সম্মুখে তাহার রক্ষক তাপসগণ আসিতেছেন। রাজা শরাসনে বান যোজনা করিয়াছেন, অন্য কোনও দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই, বান ছাড়িলেন প্রায়; এমন সময়ে নেপথ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে বাক্য উত্থিত হইল—"রাজন্, আশ্রম মৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ" (মহারাজ, এটি আশ্রমের মৃগ, এ হত্যার যোগ্য নয়, হত্যার যোগ্য নহে)। লক্ষ্যৈকলক্ষ্য নৃপতির কাণে উহা পৌছিল না; কিন্তু সারথি মহাশয় শুনিলেন ও চাহিয়া তাপসদের মধ্যবর্ত্তী রাজার লক্ষ্য মৃগকে দেখিয়া বলিলেন—'বৎস, তোমার বানপথবর্ত্তী কৃষ্ণসারের মধ্যে তাপসগণ দণ্ডায়মান'। রাজা শুনিলেন, অমনি রথ থামাইতে বলিয়া তুনীরে বান পুনরায় রাখিয়া দিলেন এবং হিংসা পরিশূন্য আশ্রমের সন্নিকটে আশ্রমেরই মৃগ বধ করিতে যাইতেছেন জানিয়া লজ্জিত হইলেন। প্যালোরেখা দৃশ্য, দৃষ্টি বিলোভন যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণিত বিষয় গুলির প্রত্যক্ষকরণ, সহসা তাপসদিগের উপস্থিতিতে হন্যমান আশ্রম মৃগের জীবন রক্ষা, রাজার কার্য্যতৎপরতা একযোগে দর্শকবৃন্দকে একেবারে তন্ময় করিয়া রাখে। এখানেই আমরা দেখিতে পাই কবিবর কিরূপ নাট্যশিল্পী ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে রঙ্গমঞ্চ দৃশ্য প্রদর্শন বিষয়ে কতদূর উন্নত হইয়াছিল।

(৩) নাটকের বীজোপস্থাপন স্থলে কবিবর বৈখালসের মুখে আশ্রম কুলপতি মহর্ষি কণ্বের তৎকালে আশ্রমে অনুপস্থিতির কারণ নির্দ্দেশে বলাইয়াছেন,—'সম্প্রতিই দুহিতা শকুন্তলাকে অতিথি সৎকাকের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়া তাহার প্রতিকূল দৈব প্রশমনের জন্য সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন। (১)

পাঠক এইখানেই তিনি উপাখ্যানের মূল সন্ধিগ্রন্থি লক্ষ্য করিবেন। নায়িকার গ্রহবৈগুণ্য লইয়াই নাটকের আরম্ভ। মাত্র একটী বাক্যে বিশ্বদর্শী কবিবর কত কথা বলিয়া গেলেন ঃ—(১) শকুন্তলায় গ্রহবৈগুণ্য (২) বেদমন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষি কণ্ব স্বয়ং উহার শান্তি কর্ম্মে নিয়োজিত, (৩) যে কোন সাধারণ শান্তিস্বস্ত্যয়নে উহা উপশান্ত হইবার নহে, তীর্থশ্রেষ্ঠ সোমতীর্থে গিয়া শান্তিকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, (৪) আশ্রমে শত শত লোক থাকা সত্ত্বেও শকুন্তলা দ্বারা অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা, (৫) মহর্ষির আশ্রমে অনুপস্থিতিতেও শকুন্তলা কর্ত্তৃক অতিথি পরিচর্য্যার ভার গ্রহণে নাটকের সহজ পরিপুষ্টি (৬) আশ্রমে রাজান্তঃপুরের ন্যায় অবোরধ প্রথার অভাব, (৭) মহর্ষির হৃদয়স্থ উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত অবান্তর উদ্দেশ্য আরও অনেক আছে।

(৪) নাটকে কবিকে দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে গমনকালে প্রেক্ষকবৃন্দকে বিস্ময় হইতে অধিকতর বিস্ময়ে নিমজ্জিত করিতে হইবে। মহারাজ দুষ্মন্ত হর্ষ ও বিস্ময়ে আশ্রমের পবিত্র হিংসা পরিশূন্য দৃশ্যগুলি দেখিতে দেখিতে আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন ও স্বীয় শিকারীর পরিচ্ছদ সারথি মহাশয়কে প্রদান করত শুদ্ধ বিনীত বেশে আশ্রমের দ্বার দেশে উপনীত হইলেন। এ দিকে সারথিও রথ লইয়া অশ্ব দিগের স্নান ও বিশ্রামের জন্য মালিনী তীরে চলিয়া গেলেন। মহারাজ আশ্রমের দ্বার অতিক্রান্ত হইয়াছেন, আর অমনি কি আশ্চর্য্য, তাঁহার দক্ষিণ বাহু পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল। একি অপূর্ব্ব বিধিলিপি! অদ্ভুত রহস্তে বলে "বামেতর ভুজস্পন্দো দিব্যস্ত্রী লাভ সূচকঃ" (অর্থাৎ দক্ষিন বাহুর স্পন্দনে দিব্য স্ত্রীলাভ সূচিত করে) পুণ্য আশ্রমে মহর্ষির অনুপস্থিতিতে তাঁহার দুহিতার (তনুজা নহে) নিকটে মহর্ষির জন্য সভক্তি প্রণতি রাখিয়া যাইবার জন্যই রাজা তথায় যাইতেছেন। হঠাৎ একি হইল! এখানে পত্নী লাভ কি সম্ভব হইবে? ধর্ম্মপ্রাণ নরমণি অবাক! পুণঃ পুণঃ তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন,—

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহু কুত ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র॥ ১।১৬।

(ক্রমশঃ)

বৈখালসঃ। ইদানীমো দুহিতরং শকুন্তলাম্ অতিথি সৎকারায় নিযুজ্য দৈবম্ অস্যাঃ প্রতিকূলং শমযিতুং সোমতীর্থং গতঃ। প্রথম অঙ্ক।

কল্যাণী ও ঈশানী

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়]

এই ঘটনার একমাস পরে, একদিন গভীর নিশিথে জাগরিত হইয়া প্রমদা একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন। শব্দ ঈশানীর কক্ষ হইতে আসিতেছিল। শব্দ শুনিয়া তিনি অনুমান করিলেন, কে যেন কাহাকে প্রহার করিতেছে। তিনি অত্যন্ত শঙ্কিতা হইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া ঈশানীর কক্ষের দ্বারের নিকট আসিলেন। ততক্ষণ প্রহারের শব্দ বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু জামাতার সুরাবিকৃত কণ্ঠের ক্রুদ্ধধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি কক্ষ দ্বারে করাঘাত করিলেন ও ঈশানীকে বার বার আহ্বান করিলেন।

ঈশানী প্রথমে কোনও উত্তর দিতে পারিল না; কিন্তু পরে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দীপালোকে কন্যার আলুথালু কেশপাশ, নয়নকোণে অশ্রু চিহ্ন এবং মুখমণ্ডলে আঘাতের রক্তাক্ত চিহ্ন দেখিয়া প্রমদা আতঙ্কে রোষে এবং ক্ষোভে বিহ্বল হইয়া কহিলেন, "জামাই বুঝি আজ আবার মদ খেয়ে এসেছিল? আজ বুঝি আবার তোকে মার ধর করেছে? কোন দিন দেখছি, তোকে খুন করে ফেলবে। এ বালাই নিয়ে কি করে এ বাড়ীতে বাস করা যায়। কালই যেন ও এ বাড়ী ছেড়ে যায়, নইলে পাড়ার লোক ডেকে, গলা টিপে ওকে বার করে দেব। আয়, তুই আমার ঘরে আয়, রক্তগুলা ধুয়ে দিই গে।"

শরৎকুমার কক্ষের মধ্য হইতে শ্বশ্রূকে কদর্য্য ভাষায় গালি দিল; এবং শাসাইয়া বলিল, "কে কাকে বাড়ী থেকে বার করে দেয় দেখা যাবে? এ বাড়ী কার?"

ঈশানী অশ্রুপূর্ণ নয়নে ধীরে ধীরে কহিল, "মা, তুমি মিছামিছি ওর উপর রাগ করছ! ও ত আমাকে মারে নি; আমি ঘুমের ঘোরে বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। আর তুমি এ বাড়ী থেকেও ওকে তাড়িয়ে দিতে পার না। এ যে এখন ওরই বাড়ী। বাবা আমাকেই এ বাড়ী দান করে গেছেন; তা'ত তুমি জান। আর আমিও আমার সব ওকে দিয়েছি।"

প্রমদা কহিলেন, "আমি নিজে পেটের মেয়ের দুরবস্থা এ রকম চোরের খোয়াব কেমন করে দেখি? যখন নিতান্ত থাকতে পারিনে তখন কাজে কাজেই বলতে হয়।"

ঈশানী বলিল, "আমার জন্যে তুমি ওকে কিছু ব'ল না মা। আমার কোনও কষ্ট কোনও দুঃখ নেই। আর ওর হাতে কষ্ট পেলেও সেই আমার স্বর্গ;—ও যে আমার স্বামী, আমার দেবতা।"

শরৎকুমার আপন শয্যা হইতে সুরাবিকৃত কণ্ঠে কহিল, "এই ঈশানী, শোন্। মাগীকে বলে রাখ, কাল সকালে যেন এই বাড়ীতে দেখ্‌তে না পাই। দেখ্‌লে জুতিয়ে বার করে দেব;"

ঈশানী বলিল, "ছি! অমন কথা মুখে এনো না। একটু চুপ ক'রে ঘুমাও দেখি।"

প্রমদা কোনও কথা কহিলেন না। ক্রোধে ঘৃণায় অপমানে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আপন কক্ষে যাইয়া শয্যায় শয়ন; কিন্তু সে কণ্টক শয্যায় নিদ্রালাভ করিতে পারিলেন না। শুইয়া শুইয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কেন এমন হয়? মানুষ যাহা ভাবে, বিধাতা কেন তাহার উল্টা করিয়া দেন? তাহার এমন পছন্দকরা মনোমত জামাতা কেন এমন দরিদ্র, এমন কুৎসিৎ, এমন অসভ্য হইল? এ যে কল্যাণীর দোকানদার বরের চেয়ে অনেক ছোটলোক। কল্যাণীকে বঞ্চনা করিবার জন্য, তিনি যে বাটী বুদ্ধিপূর্ব্বক আপন কন্যাকে মরণোন্মুখ স্বামীর দ্বারা, দান করাইয়াছিলেন কেন,

কোন সাহসে তাহার আপন মনোনীত জামাতা অতি অভদ্রের ন্যায়, কদর্য্য ভাষায়, সেই বাটী হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহিল? কল্যাণীর যে কৃষ্ণকায় স্বামীকে, দরিদ্র বলিয়া তিনি অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, হায়, হায়, তাহারই দয়ার মাসহারায় আজ কেন তাঁর ন্যায় মুন্সেফ-পত্নীর এবং জমিদারের পুত্র ও পুত্রবধূর হীন জীবন ধারণ করিতে হইল? হায়, হায়, সেই কৃষ্ণকায় কর্কশমূর্ত্তি, ব্যবসাদারটাও আজ তাঁহার বিকৃতকর্ণ, ক্ষতচিহ্নচিত্রিত বিকৃতপদ, বিকৃতচক্ষু, নিঃস্ব এবং মদ্যপ জামাতা অপেক্ষা কেন শতগুণে শ্রেষ্ঠ হইল? তাঁহার অশেষ ঘৃণার পাত্রী সপত্নীপুত্রী কি গুণে, তাহার গর্ভজ কন্যা অপেক্ষা শতগুণে সুখিনী হইল? বুদ্ধিহীন এক চক্ষু বিধাতা চক্ষের মাথা খাইয়া একি অবিচার করিলেন? একি নির্ব্বুদ্ধিতা? বুদ্ধিমতী প্রমদা বিধাতার এই কারণহীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কোন কারণ শত চিন্তা করিয়াও নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

আবার ঈশানী যখন প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই তাঁহাকে বলিল,—"মা, ও বড় রাগী মানুষ; কি জানি রাগের মাথায় কখন কি করে বসবে? তোমার এ বাড়ী থেকে চলে যাওয়াই ভাল।"

—তখন বিধাতার আচরণ অপেক্ষা কন্যার মাতৃভক্তির অল্পতা দেখিয়া প্রমদা আরও মর্ম্মাহত হইলেন। বলিলেন, "বাছা, এ বাড়ী যখন তোমাকে দান করেছিলাম, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে তুমিই আমাকে এ বাড়ী থেকে চলে যেতে বলবে।"

ঈশানী বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "মা, তুমি দুঃখ কর না। আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি।"

প্রমদা বলিলেন, "আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাব?"

ঈশানী বিষণ্ণ মুখে বলিল, "আমি বলি, আজই এই সকালের ষ্টীমারে, তুমি পাড়ার কাউকে সঙ্গে করে সিরাজগঞ্জে চলে যাও। সেখানে দিদির বাড়ীতে থাকলে দিদি তোমায় মাথায় করে রাখবেন।"

প্রমদা বিরক্তির সহিত বলিলেন, "কি? কি বলিস তুই? আমি সেই কালপেঁচীর ঘরে গিয়ে, তার হাত তোলা খাব?"

ঈশানী পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণমুখেই বলিল, 'যা' ভাল বোঝ, কর। আমি কিন্তু বলি, এখানে পড়ে পড়ে জামায়ের অপমান খাওয়ার চেয়ে, সতীনের কালমেয়ের হাত তোলা খাওয়া ভাল। আর এখানেও ত আমরা তারই অন্ন খাচ্ছি;— দিদি মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে না দিলে, আমরা এতদিন উপোস করে মরে যেতাম। মা, তুমি যেমন মনে কর, তা নয়; দিদি আর জামাই বাবু মোটেই খারাপ লোক ন'ন। আমার কথা শোন; তুমি সেইখানে যাও; সুখে থাকবে।"

অগত্যা হৃত-সর্ব্বস্বা প্রমদাকে সপত্নী-পুত্রীর আশ্রয়ে যাইয়া বাস করিতে হইল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কল্যাণী ও ঈশানীর শাস্তি।

যদুপতিদের দ্বিতল বাটী ছিল না; তাহার মাতাপিতার জীবদ্দশা হইতেই তাহারা একতল গৃহে বাস করিত। প্রমদা এইরূপ একতল গৃহে বাস করার অভ্যাস না থাকায় তাঁহার অসুবিধা হইতে লাগিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া কল্যাণী স্বামীকে পরামর্শ দিল। আদরিণী পত্নীর সেই পরামর্শ অনুযায়ী যদুপতি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর জন্য, একতল গৃহের ছাদের উপর দুইটী সুন্দর দ্বিতল কক্ষ, দুই মাস সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করাইয়া দিল! প্রমদা তাহাতে আপন গৃহাপেক্ষা স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। কল্যাণী তাঁহা অপেক্ষা পারদর্শিনী রাঁধুনী; সেই পারদর্শিনী পাককুশলা, প্রত্যহ তাঁহাকে স্বহস্তে রাঁধিয়া উপদেয় খাদ্য সকল খাওয়াইতে লাগিল। তাহা খাইয়া প্রমদার বরদেহ আবার পূর্ব্বের ন্যায় পরিপুষ্ট হইল। কল্যাণীর নধর কলেবরা পয়স্বিনী গাভী সকল তাঁহাকে ক্ষীরোপম দুগ্ধ দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতে লাগিল।

কিন্তু যে অর্থ প্রমদার হৃদয়াপেক্ষা আদরের ধন ছিল; কন্যার বিবাহ কালে কন্যাদায়গ্রস্থ স্বামীকে মহা অপমানের দায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে অর্থ তিনি ব্যয় করিতে পারেন নাই, স্বামীর মৃত্যুকালে স্বামীর ভালরূপ চিকিৎসার জন্য, যে অর্থ ব্যয় করা তিনি অপব্যয় মনে করিয়াছিলেন, সেই কষ্টসঞ্চিত প্রাণাধিক অর্থ শঠধর্ম্মী জামাতা আত্মসাৎ

কিন্তু তাহার হৃদয় মধ্যে যে দুষ্ট ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা কখনই, কিছুতেই প্রশমিত হইল না ; কিম্বা বিধাতার অসহ্য আচরণের জন্য তিনি যে হিংসার বহ্নি হৃদয়মধ্যে জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল তাহাও কিছুতে নির্ব্বাপিত হইল না ; বরং তাহা উত্তরোত্তর তাঁহার প্রতি কল্যাণীর যত্ন ও আদরের সামর্থ্যের সহিত—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল ; সেই অগ্নি তাহার সমস্ত হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত করিল। তিনি বুদ্ধিমতী হইয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে একটা পাশ না করা মূর্খ কোনপ্রকার ইজ্জতের চাকুরী না করিয়া, কেবলমাত্র দোকানদারী করিয়া এত লোকজন রাখিয়া, এত গরু বাছুর পুষিয়া, এত ধূমধামের সহিত কিরূপে থাকিতে পারে ; আর কিরূপেই বা এত দান-ধ্যান করিতে পারে ? তিনি বুঝিতে পারিলেন না, তাহার গর্ভজা কন্যা অত্যন্ত সুরূপা হইলেও স্বামীপ্রেমে বঞ্চিত, অধিকন্তু স্বামী কর্ত্তৃক অসম্ভবরূপ লাঞ্ছিতা হইল কেন এবং তাঁহার সপত্নী কন্যা কৃষ্ণা ও কুরূপা হইয়াও স্বামীর এমন সোহাগিনী হইল কেন ; এবং সেই বা এমন অসহ্য কর্ম্ম করিয়া, এবং পুরস্কার স্বরূপ একখানিও অলঙ্কার না পাইয়া, এবং পুরাকালের সেই কুগঠন ও ক্ষয়মান কঙ্কাল মাত্র ধারণ করিয়া, অমন কৃষ্ণকায় দোকানদার স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হইয়া এরূপ সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিতে পারিল ? প্রমদা বুদ্ধিমতী হইয়াও বিধাতার এই অযথা বিধির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না।

আমার পাঠকপাঠিকাগণ, তোমরা বোধ হয় বুঝিয়াছ ; যে পরিশ্রমই আমাদের চিত্ত পরিতুষ্টির একমাত্র উপায় :—বহ্নিতাপে স্বর্ণ যেমন বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়, শ্রমের তাপে আমাদের চিত্ত তেমনই নির্ম্মল ও আনন্দদায়ক হয়। আর বুঝিয়াছ যে আমরা আমাদের নয়নে যখন প্রেমের অঞ্জন মাখি, তখনই আমরা পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য্য খুজিয়া পাই। তখন কাল ও কুৎসিতেও রূপের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বুঝিয়াছ যে, চাকুরী নহে, বাণিজ্যই অর্থ লাভ করিবার একমাত্র উপায়। যদি ধনী হইতে চাও, যদি আপনার স্বদেশকে উন্নত করিতে চাও তাহ হইলে, আমি মিনতি করি, তোমরাও ঐ গৌরবের পথ অবলম্বন কর।

যদুপতি বাণিজ্য দ্বারাই আপনার ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্না করিয়াছিল।

কল্যাণী নিরাভরণা হইয়াও পরিশ্রম দ্বারা স্বামীর সংসারে অনন্ত তৃপ্তি ও শান্তি আনিয়াছিল ; সোহাগিনী স্বামী সোহাগেই কেবল স্বামীকে সুন্দর দেখে নাই, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীকেই, নন্দনের ন্যায়, আনন্দদায়ক দেখিয়াছিল। তুমি সোহাগময়ী বঙ্গললনা, তুমিও প্রেম ও পরিশ্রমের সাধনা করিও, তোমারও জীবন, কল্যানীর জীবনের ন্যায়, সার্থক ও শান্তিময় হইবে।

ঈশানীও ক্রমে অক্লান্তভাবে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া, তাহার স্বামীপ্রেম সার্থক করিয়াছিল। এবং ভগবান, তাহার এই মহা পুণ্যেরই জন্য, তাহাকেও পুরস্কৃতা করিয়াছিলেন ;—তাহার মনে যে অক্ষয়া ক্ষমার বীজরোপণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ক্ষমা ও সেবাই উত্তরকালে তাহার মদ্যপ ও উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে বশীভূত করিয়াছিল। শরৎকুমার মদ খাইয়া, তাহাকে আর প্রহার করিত না ; এবং অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়াও স্ত্রীর কার্য্যে সময় সময় সহায়তা করিয়া তাহার মনে পরমসুখ আনিয়া দিত।

সমাপ্ত

মুকুরে

শিল্পী—আর্য্য চৌধুরী।
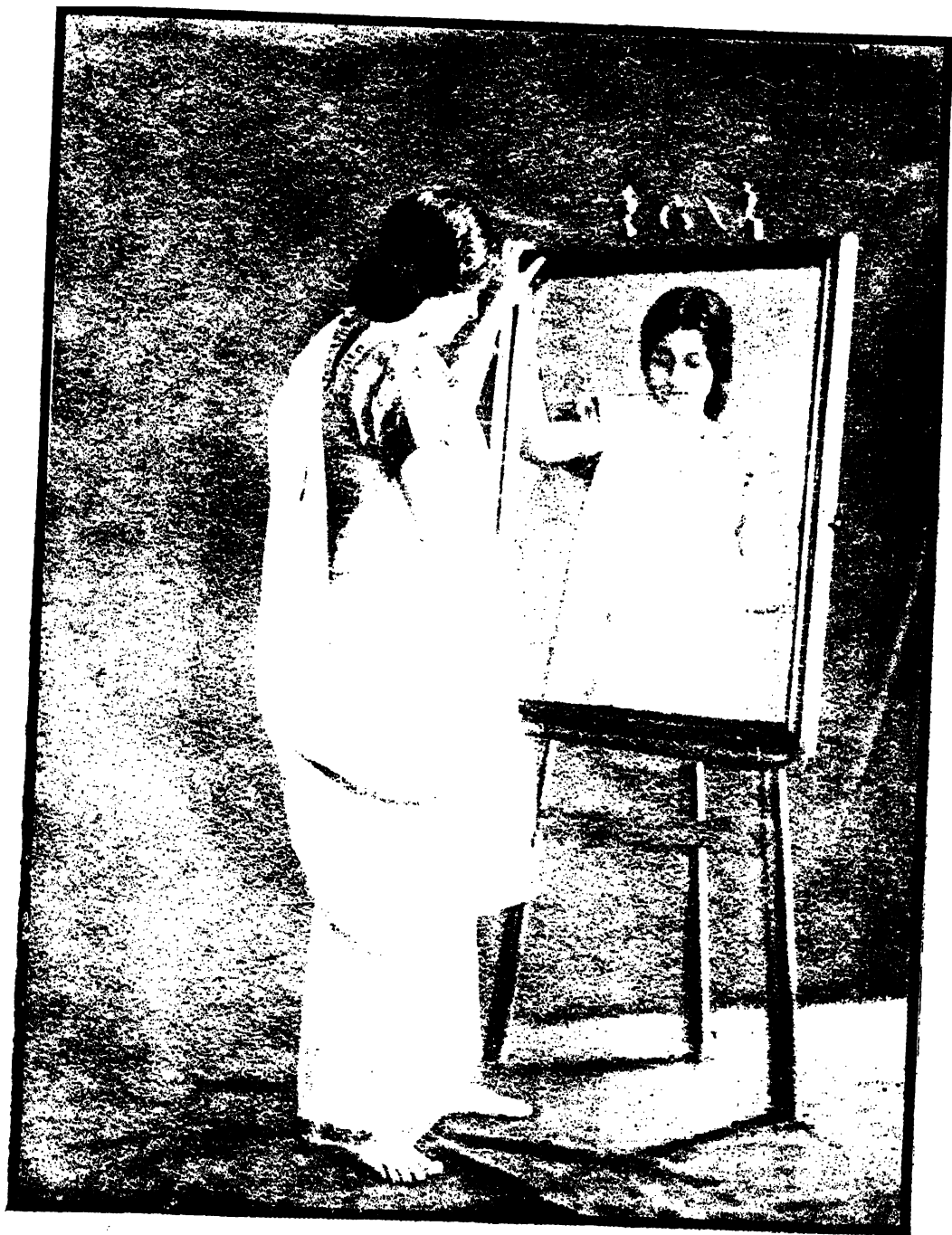
দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৭শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩২ । [৩৫শে সপ্তাহ

দেশবন্ধুর স্মৃতিপূজা
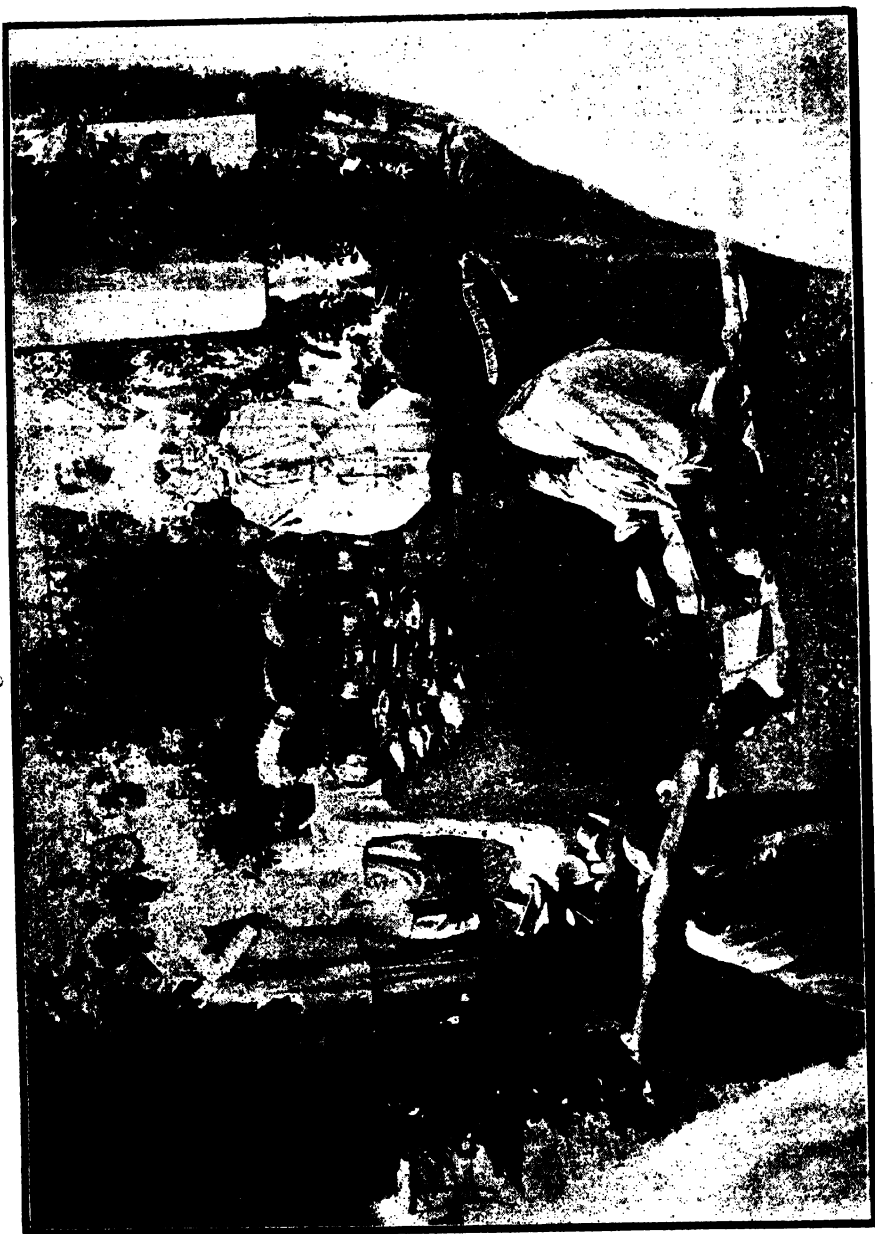
দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধবাসরে

দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধদিবসে স্মৃতিপূজার জন্য সমবেত বিরাট জনমণ্ডলী

জনমণ্ডলী আকুল আগ্রহে বক্তৃতা শুনিতেছেন

দেশবন্ধুর স্মৃতিদিবসে বক্তৃতামঞ্চে আবুল কালাম আজাদ মহাত্মা গান্ধীকে পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন

বক্‌রঈদের দৃশ্য

বকরঈদ

নামাজ

গুপ্তধন।

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(১)

নিবিড় বন। গাঢ় শ্যামল লতাগুল্ম কণ্টক বনে ভূমিতল সমাচ্ছন্ন, পথহীন; ইতস্ততঃ নানা জাতীয় তরু সমূহ যেন আকাশ স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধায় উর্দ্ধশীর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের শ্যামল পত্ররাজী আতপত্রের ন্যায় সৌরকর প্রতিরোধ করিয়া নিম্নে তামসী ছায়া বিস্তার করিতেছে। মাঝে মাঝে রন্ধ্রপথে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ লাভ করিয়া ভূমিতলে চিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। চারিদিকে বিহগ-কূজন, ডালে ডালে বানর দলের পরস্পর আলাপ, কদাচিত অদূর গ্রাম হইতে বায়ু সমানীত গাভীর হাম্বারব ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শ্রুত হয় না। বনের আধ আলো আধ ছায়ায় বেলা ঠিক বুঝা যায় না। এমন সময় এমন স্থানে আসিলে স্বতঃই প্রাণে একটা উদাস ভাবের সঞ্চার হয়।

রঘুনন্দন ও শিব প্রসাদ পথহীন বনের ভিতর দিয়া কোন-প্রকারে পথ করিয়া সন্তর্পণে চলিতেছিল, চলিতে চলিতে ইতস্ততঃ সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছিল কেহ কোথাও আছে কি না, কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কি না।

রঘুনন্দন ঈষৎ দীর্ঘাকার, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় মাংসপেশী-বহুল, মুখমণ্ডল সুশ্রী, বর্ণ গৌর। তাহাকে সুপুরুষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার মুখ দেখিলেই সে যে ভদ্রবংশসম্ভূত সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে না। শিবপ্রসাদ খর্ব্ব, স্থূলকায়, বলিষ্ঠ, ক্ষুদ্র-চক্ষু, তাহার মুখমণ্ডলে দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা যেন স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে,—দেখিলেই হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে।

দুইজনে চলিতে চলিতে একটা পরিষ্কৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানটার চারিধারে নানাবিধ ফুল ফলের গাছ, মানব হস্ত রোপিত কিনা ঠিক বুঝা যায় না। অদূরে এক সুবৃহৎ পুরাতন বাটীর ধ্বংসাবশেষ। উভয়ে এক বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রম দূর করিতে লাগিল। রঘুনন্দন পকেট হইতে সিগারেট ও দিয়াশালাই বাহির করিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল, শিবপ্রসাদ এক অনতিবৃহৎ কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে গঞ্জিকা ও ছিলিম নিষ্কাষণ পূর্ব্বক সাজিতে বসিল। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব, শুধু ধোঁয়ার পর ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃজন করিয়া আকাশে বাতাসে ভাসাইয়া দিতে লাগিল। সহসা রঘুনন্দন কহিল—"এ কাজ আমার আর ভাল লাগে না। দিনরাত শুধু ভয় আর ভাবনা কখন কি হয় কখন কি হয়, একটু জিরুবার ফুরসুৎ নাই, ঘুমাবার অবসর নাই,—এরকম করে কি বেঁচে থাকা যায়? যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় হয়েছে, আর কেন? কলির জীবন, তিনপো কেটে গেছে, এস এইবার ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বাকী বয়সটা ভোগে কাটিয়ে দিই।"

শিবপ্রসাদ। সে গুড়ে বালি। ভোগ করতে হলেই ত লোকালয়ে যেতে হবে। ক'দিন নিশ্চিন্ত হয়ে কাটাতে পারবে? পুলিশ তো পেছু নিয়েই আছে। এখন এখানে সেখানে ঝোপে জঙ্গলে আছি তাই খুঁজে পাচ্ছে না, গ্রামে কিম্বা সহরে গেলে ঝড়াকসে পাত্তা লাগিয়ে ফেলবে। গোলাপ ফুলের গন্ধ কি চাপা থাকে, না মৃগনাভীর অস্তিত্ব গোপন করা যায়? আর তুমি আমি কাজ ছেড়ে দিলেই যে আর সবাইও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবে তা নয়। কোন শালা কোন দিন ধরা পড়ে একরার করে বসবে তারপর একেবারে গয়া-গঙ্গা-বারানসী। তার চেয়ে এ তবু একরকম বেশ আছি। কোনদিন স্ফূর্ত্তি করতে ইচ্ছে যায়, সহরে গিয়ে এক'শ দু'শ খরচ করলেই হ'ল।"

রঘুনন্দন। যাক, সে এরপর ভেবে ঠিক করা যাবে। আপাততঃ রামলাল আর জগন্নাথের খবর কি? তাদের যে কলকাতার গদীতে পাঠান হ'ল, তারা তো আজও ফিরল না। আজ পাঁচদিন কেটে গেল আমার কিন্তু ভারি আশঙ্কা হচ্ছে।

শিবপ্রসাদ। তাকে বেশ করে বুঝিয়ে বলে দিয়েছিলে তো যে এইখানে এলেই তোমার দেখা পাবে? জায়গা ভুল করে, আর কোথাও খুঁজে বেড়াচ্ছে না তো?

রঘুনন্দন। আরে দূর, জায়গা ভুল করবে কি? আমি তাকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে বলেছি। আর এ জায়গা সে বিলক্ষণ চেনে।

শিবপ্রসাদ। কেন যে তুমি আহাম্মুক রামলালটাকে এত বিশ্বাস কর আমার তো মাথায়ই আসে না। আমি ব্যাটাকে মোটে দেখতে পারি না। আমি তোমাকে আগেও অনেকবার বলেছি, আজও বলছি। যদি কখনো কারো জন্যে তুমি ধরা পড় সে ওর জন্য।

রঘুনন্দন। হুঁ। আচ্ছা আজকের রাত্রিটাও দেখা যাক, আজ রাত্রির মধ্যে যদি সে না ফেরে তবে কাল কাউকে সন্ধান নিতে পাঠাব।

শিবপ্রসাদ হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিল—"এখানে বসে বসে আর কি হবে? এসো ভিতরে যাই।" রঘুনন্দন বলিল—"চল যাই।" উভয়ে উঠিয়া ভাঙ্গা বাড়ীর দিকে কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় একটা লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলেই বোধ হয় সে অনেক দূর হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। রঘুনন্দন সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে জগন্নাথ, একা যে? রামলাল কোথায়?

জগন্নাথ। ধরা পড়েছে।

শিবপ্রসাদ। কেমন মিলিয়ে পেলে তো?

রঘুনন্দন। কোথায় কেমন করে ধরা পড়লো?

জগন্নাথ। হাওড়া ষ্টেশনে। আমরা টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিলাম।

রঘুনন্দন। হুঁ। তারপর?

জগন্নাথ। তারপর আমি গদীতে গিয়ে বাবু সাহেবকে খবর দিলাম। তিনি উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেছেন। যা কিছু করবার সবই করছেন।

রঘুনন্দন। আচ্ছা বাড়ীর ভিতর এসো সব শুনছি।

শিবপ্রসাদ। আর শুনবে ঘোড়ার ডিম। ভাল চাও তো পালাও।

রঘুনন্দন। শিবপ্রসাদ! শেষটা তুমিও কি আমার অবাধ্য হবে?

শিবপ্রসাদ। না, চল যাচ্ছি।

তিনজনে ভাঙ্গা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বলা বাহুল্য ইহারা ডাকাতের দল। কলিকাতার গদী এবং বাবু সাহেব অর্থে কলিকাতার একজন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ইহাদের মুরুব্বি, যাঁহার হাত দিয়া চোরাই মাল পাচার হয়।

(২)

দুই বৎসর পরের কথা।

রঘুনন্দন বহু চেষ্টা করিয়াও নিজেকে বাঁচাইতে পারে নাই, শেষটা ধরা পড়িয়া তাহার সাত বৎসর সশ্রম কারা দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এখনো পাঁচ বৎসর বাকী।

ছোট সহরটীর বহির্ভাগে জেলখানা। জেলখানার বাহিরে চারিধারে অনেকটা উচ্চ নীচ অসমতল ভূমি, তাহাতে জেল সংলগ্ন শাক শব্জির বাগান। তাহার পর মাঠের প্রান্তে খানিকটা উচ্চ ভূমিতে সাধারণ কবর-স্থান। কবর-স্থানের পরই নিম্নভূমিতে ধানের ক্ষেত। রঘুনন্দন অল্পদিন হইল এই জেলে আনীত হইয়াছে।

সেবার বর্ষা ঠিক সময়ের কিছু পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং প্রারম্ভে বর্ষণ হইয়াছিল অত্যধিক মাত্রায়। ক্ষুদ্র সহরটীর চারিধারে জল জমিয়া গিয়া উহাকে পদ্মাবক্ষস্থ দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। জেলখানা উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত, তথায় যদিও জল দাঁড়ায় নাই কিন্তু তাহার চারিধারে জল দাঁড়াইয়াছিল। দুইদিন পরে যখন জল নামিয়া গেল তখন জেল কর্ত্তৃপক্ষ দেখিলেন তাঁহাদের শব্জিবাগ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জেলের দারোগা বাবু, ডাক্তার বাবু, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণের বড় সাধে ছাই পড়িল, অতঃপর বৎসরের বাকী দিন গুলির জন্য তাঁহাদিগকে বাজারের তরি তরকারীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু উপায় নাই। পূর্ব্বেও দুই একবার এমন হইয়াছে, প্রতিকার কিছুই হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শজি বাগের জমীটা ছিল উচ্চ নীচ অসমতল। নিম্ন স্থানগুলিতে তখনও জল জমিয়াছিল—যেহেতু ঈশ্বরের নিয়মে পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চভূমি লঙ্ঘন করিয়া তাহার বিদায় লইবার উপায় ছিল না।

জেলকর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিলেন জমিটা সমতল করিয়া দিয়া তাহার চারিধারে আইল বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং জমির মধ্য দিয়া জল নিকাশের জন্য একটা নালা কাটিয়া বরাবর কবর স্থানের পার্শ্ব দিয়া ধানের ক্ষেত পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর এরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

জেলে খাটিবার লোকের অভাব নাই। অপেক্ষা যাহা কিছু হুকুমের। হুকুম হইবামাত্র কতকগুলি কয়েদী একজন ওয়ার্ডারের অধীনে কাজে লাগিয়া গেল। রঘুনন্দন তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

দ্বিতীয় দিনে রঘুনন্দনের পার্শ্বে একজন বৃদ্ধ কয়েদী কাজ করিতেছিল। সে অত্যধিক ক্লান্ত হওয়ায় আর পারিয়া উঠিতেছিল না। ওয়ার্ডারের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য কোদালি দ্বারা ধীরে ধীরে ভূমির উপর আঘাত করিতেছিল মাত্র। খানিক পরে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—"আল্লাহ্ রহিম! আর যে পারি না। কবে আমার এ মেহনতের শেষ হবে? ওই তো সম্মুখে গোর-স্থানে কবরের মধ্যে কতলোক ঘুমিয়ে বেঁচেছে। আমি কবে ঘুমুব!"

কথাটা রঘুনন্দনের কর্ণে প্রবেশ করিয়া একেবারে মর্ম্মে গিয়া বিদ্ধ হইল। ইচ্ছা হইল বৃদ্ধকে সে দুই একটা সান্ত্বনার কথা বলে। কিন্তু কয়েদীরা ইচ্ছা করিলেই কার্য্যকালে পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে পারে না। চাহিয়া দেখিল ওয়ার্ডার একটু দূরে অপর কয়েকজনের কার্য্য পরিদর্শন করিতেছে। সে আস্তে আস্তে কহিল—"মিঞাসাহেব! আপশোষ করে আর কি হবে? যতদিন ভোগ আছে ভুগিতেই হইবে। তোমার আর কতদিন বাকী আছে?

বৃদ্ধ। আরো পাঁচ বৎসর।

রঘু। মোট কতদিন হুকুম হইয়াছিল?

বৃদ্ধ। সাত বৎসর।

রঘু। বাঃ আমার সঙ্গে তোমার চমৎকার মিলে যাচ্ছে তো! আমারও সাত বৎসর হয়েছিল এখনো তার পাঁচ বৎসর বাকী। তা তুমি এত ঘাবাড়াচ্ছ কেন? পাঁচটা বছর বইতো নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে যে যার জায়গায় চলে যাব।

বৃদ্ধ। তোমাতে আমাতে সমান? তুমি জোয়ান ছোকরা। আমি বুড়ো মানুষ।

রঘুনন্দনেরও বোধ হয় একটু গল্প করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। সে বৃদ্ধকে তাহার অবস্থা ভুলাইবার জন্য এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিয়া বসিল।

রঘুনন্দন। ওঃ! ওই কবরগুলো দেখছ? ওগুলো দেখলেই আমার একটা আশ্চর্য্য ঘটনার কথা মনে পড়ে। এক বছর আগে যখন আমি— সহরের জেলে ছিলাম তখন সেই ঘটনা ঘটেছিল।

বৃদ্ধ বোধ হয় ভাবিয়াছিল রঘুনন্দন কোন ভৌতিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছে, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"কি! কি?"

রঘুনন্দন। আমরা এমনি একটা নালা কাটছিলাম। তার পাশে একটা পুরোণো কবরস্থান ছিল। আমরা মাটী কাটতে কাটতে কবরস্থানের কাছে গেছি হঠাৎ আমার কোদাল ঠক্ করে কিসে ঠেকলো। মনে হল কোন ধাতু পাত্র। আমি তখন কিছু বুঝতে পারি নি। খানিক পরে খুঁড়তে খুঁড়তে বেরুল একটা বড় তামার ঘড়া। ওয়ার্ডার তখন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। কাজেই লুকাবার উপায় ছিল না। কি আর করি, তার হুকুমে ঘড়াটা উপুড় কল্লুম—ওঃ সে কি বলব তোমায়! মোহর মোহর, এক ঘড়া ভর্ত্তি পুরোণো মোহর!

বৃদ্ধ। বটে বটে? ভারি আশ্চর্য্য তো! তারপর সেগুলো কি হল?

রঘুনন্দন। কি আর হবে, কতক জেলার বাবু আর বাকী সেই ওয়ার্ডার শালা হজম করে ফেল্লে। তাই মনে হচ্ছিল। এবার যদি ভাগ্যক্রমে তেমন সুযোগ ঘটে তবে আর আহাম্মুকী করে হারাব না।

বৃদ্ধ। না হারিয়েই বা কি করবে! ওয়ার্ডারের চোখ

যদিও বা কোন রকমে এড়াতে পার, জেলের ভিতর মোহর নিয়ে রাখবে কোথায়? তবে যদি মোহরও পাও, পালাতেও পার তবে এক রকম হয় বটে।

পেছন হইতে ওয়ার্ডার বলিল—"ওহে এটা শ্বশুরবাড়ী নয় যে মনের আনন্দে বসে খোস গল্প করবে। ওঃ বুড় মিঞা কি মাটীই কাটছে! দেখো অত জোরে কোপ মেরো না, হাতে ফোস্কা পড়বে। তারপর কিসের গল্প হচ্ছিল শুনি? পালাবার মতলব আঁটা হচ্ছিল বোধ হয়?

বলিয়া বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া দাঁতগুলি ঈষৎ বাহির করিয়া দক্ষিণ হস্তের বেত্রদ্বারা নিজ বামহস্তে মৃদু মৃদু প্রহার করিতে লাগিল! ওয়ার্ডার যে কখন আসিয়া তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছে তাহা কেহই জানিতে পারে নাই।

এই ওয়ার্ডারটীর নিষ্ঠুরতা এবং প্রহার পটুতা বিশয়ে বিলক্ষণ "হাতযশ" ছিল। বোধ হয় সকল ওয়ার্ডারেরই এইরূপ হাতযশ থাকে, না থাকিলে সে ওয়ার্ডার হইতে পারে না। তাহার অধীনস্থ কয়েদিমাত্রেই জানিত যে সে যখন দক্ষিণহস্তে বেত্র লইয়া নিজ বামহস্তে মৃদু মৃদু প্রহার করে তাহার পরক্ষণেই ঐ বেত্র প্রচণ্ডভাবে কাহারও পৃষ্ঠে পতিত হয়। পূর্ব্বঘটনা পরবর্ত্তী ঘটনার সূচনা মাত্র। বলা বাহুল্য বৃদ্ধও একথা জানিত।

ভয়ে বৃদ্ধের মুখখানি ফ্যাকাসে হইয়া গেল, সে আমতা আমতা করিয়া কহিল—"না এ বলছিল যে এরকম কবরস্থানে প্রায়ই মোহরের ঘোড়া লুকান থাকে, মাটী কাটতে কাটতে তা অনেক সময় পাওয়া যায়। এখানেও তা পাওয়া যাবার সম্ভাবনা।"

সহসা ওয়ার্ডারের মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার চোখে অসম্ভব রকম দীপ্তি প্রকাশ পাইল, ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল,—সে ঢোক গিলিতে গিলিতে কহিল—"আচ্ছা, এ সব বাজে গল্প করিয়া আর সময় নষ্ট করিতে হইবে না। কাজ কর।"—বলিয়া একটু দূরে যাইয়া রঘুনন্দনকে চোখ টিপিল। রঘুনন্দন লোকটার মুখ দেখিয়া তাহার মনোভাব কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল—ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তারপর ওয়ার্ডার সুযোগ বুঝিয়া এক সময় তাহাকে চুপি চুপি বলিল, "আমিও শুনেছি এ রকম জায়গায় যখের ধন পাওয়া যায়। খবরদার তুমি এ সব বিষয় কারু সঙ্গে গল্প করো না। যদি কিছু পাওয়া যায় তোমার অর্দ্ধেক আর আমার অর্দ্ধেক। আর কেউ যাতে কাছে আসতে না পারে সে ব্যবস্থা আমি করব।—তুমি কিছু ভেবো না। তোমায় আমি ঠকাব না। তুমি যার নাম করবে, তোমার ভাগ আমি তার কাছে পৌছে দেব।"

রঘুনন্দন একান্ত বাধ্য ভৃত্যের মত বলিল—"যো হুকুম।"

বৃদ্ধ কয়েদী অত শত বুঝিল না। সে জানিত রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া সঙ্গীদের সহিত চুপি চুপি একটু আধটু গল্পগুজব করিলে দোষ হয় না। কাজেই এই গুপ্তধনের আজগুবি গল্পটী তাহার কক্ষে অন্য যে যে কয়েদ ছিল সকলেরই কর্ণগোচর হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রঘুনন্দন উচ্চবংশ সম্ভূত। লেখাপড়া সে কিঞ্চিৎ জানিত, বুদ্ধিও তাহার বিলক্ষণ তীক্ষ্ণ ছিল। সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া তাহার ঘুম আসিতেছিল না, কাজেই সে চিৎ হইয়া পড়িয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মাথায় একটা মৎলব আসিল। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া একটা লুকান জায়গা হইতে সিগারেটের তামাক কাগজ দিয়াশালাই, একটা ছোট মোমবাতি ও পেনসিল বাহির করিয়া পুনরায় শয্যার উপর আসিয়া বসিল। একটা সিগারেট পাকাইয়া ধূমপান করিতে করিতে আরও কয়েক মিনিট ভাবিল তারপর মোমবাতিটা জালিয়া একখানি সিগারেটের কাগজে ছোট ছোট হরপে পেনসিল দিয়া কি লিখিল। তারপর পুনরায় শুইয়া পড়িল।

একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে এই ঘোর কলিযুগে পয়সার অসীম ক্ষমতা। পয়সা খরচ করিতে পারিলে জেলখানায়ও কোন অভাব কিম্বা অসুবিধা থাকে না। রঘুনন্দনের সঙ্গে যদিও একটী কানাকড়িও ছিল না তথাপি পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে,তাহার পেছনে সেই কলিকাতার গদীর মালিক পয়সাওয়ালা বাবু সাহেব ছিলেন। সুতরাং রঘুনন্দনের কোন বিষয়েই কোন কষ্ট কিম্বা অভাব ছিল না। তাহার কক্ষের প্রহরী এবং উপরওয়ালা ওয়ার্ডার নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিত। ফলতঃ রঘুনন্দনের লিখিত সেই

সিগারেটের কাগজটুকু পরদিন প্রাতে কোন প্রকারে জেলের বাহিরে কিছুদূরে একটা বাগান বাড়ীতে যাইয়া পৌছিল।

এই বাগান বাড়ীর মালিক রঘুনন্দনের সেই বাবুসাহেব। কিছুদিন হইতে তিনি শরীর সারাইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার লোকজন চাকর দরোয়ান মোটরকার প্রভৃতি যাহা যাহা দরকার সবই আসিয়াছিল। রঘুনন্দনের এই জেলে বদলী হওয়ার সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল কিনা বলা কঠিন।

(৩)

আরও দুই দিন কাটিয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে নালায় যে সব কয়েদি কাজ করিত তাহাদের মধ্যে সেই গুপ্তধনের আজগুবি গল্পটা রূপান্তরিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যে আকারে গল্পটা শুনিয়াছিল তাহার সারমর্ম এই যে ঐ কবরস্থানে গুপ্তধন আছে ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারা গিয়াছে। কেহ কেহ নাকি মাটী কাটিতে কাটিতে এর মধ্যেই দু একটা মোহরও কুড়াইয়া পাইয়াছে। সকলেরই ইচ্ছা সেই স্বপ্নাতীত ধনরাশি গ্রাস করে। যদিও বা এমন একটা ব্যাপার সম্ভব হয়, ধন পাওয়া যায়, তথাপি জেলের কয়েদীর পক্ষে তাহা গ্রাস করা যে কিরূপে সম্ভব, গ্রাস করিলেই তাহা হজম হইবে কি না তাহা কেহই ভাবিতেছিল না। সুবর্ণের কাল্পনিক দীপ্তি তাহাদিগকে এমনি অন্ধ করিয়াছিল!

সকলেই প্রাণপণে কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, উন্মত্ত আগ্রহে মাটী কাটিয়া যাইতেছিল। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে তাহারা কয়েদী, যেন ঐখানে পৌছানর উপর তাহাদের জীবন-মরণ নির্ভর করে। ওয়ার্ডার বিকারগ্রস্থ রোগীর মত ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তাহার মুখের বর্ণ-বৈচিত্র্য যে কোন চিত্রকরের পক্ষে তুলীর মুখে ফুটাইয়া তোলা শক্ত হইত।

সকলের আগ্রহ যখন চরম সীমায় পৌছিয়াছে তখন সহসা একজনের কোদাল ঠক্ করিয়া কিসে আঘাত করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্যান্য সকলে ছুটিয়া সেখানে গেল। একমিনিট। এক প্রকাণ্ড পিতলের ঘড়া বাহির হইল। তাহার মুখে একখানি পিতলের সরা ঝালাই করা রহিয়াছে।

সকলে উহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে গিয়া দেখিল উহা বিলক্ষণ ভারি। তখন কোদালীর চাড় দিয়া সরাখানা খুলিয়া ফেলা হইল! ঘড়াটা কাত করিতে তাহার মধ্য হইতে গড়্ গড়্ করিয়া মোহর পড়িতে লাগিল। আর যায় কোথা! অমনি লোকগুলি যেন সহসা উন্মাদ হইয়া গেল, স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান হারাইল, পরস্পরের সহিত ধাক্কা-ধাক্কি করিতে করিতে যে যাহা পাইল সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ওয়ার্ডার প্রথমটা অন্যান্য সকলকে সরাইয়া দিয়া নিজে ঘড়াটা শুদ্ধ সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল—অকৃত-কার্য্য হইয়া, বাকী লোকগুলাকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—ফলে একটুদূরে ছিটকাইয়া নালায় পড়িয়া আঘাত পাইল।

কয়েক মিনিট পরে যখন ওয়ার্ডার বুঝিতে পারিল যে ব্যাপারটা বড় সুবিধাজনক নহে। তখন সে অতিকষ্টে লোকগুলাকে সংযত করিল। তাহারা যে যত মোহর সংগ্রহ করিয়াছিল সব এক জায়গায় একত্রিত করা হইল। তখন ওয়ার্ডারের চৈতন্য হইল। সে সাশ্চর্য্যে বলিল—এ কি! এ পিতলের ঘড়াটা যে নূতন!

সহসা একজন বলিল—"রঘুনন্দন কোথায়?"—ওয়ার্ডারের মুখখানি আর একরকম হইয়া গেল, তাহাতে নূতন বর্ণ-বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিল। তৃষ্ণায় তাহার গলাটা শুষ্ক হইয়া গেল, সে আপনাপনি বলিতে লাগিল—"এরই মধ্যে কোথায় যাবে? নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছে।" ফলতঃ তাহাকে কিন্তু খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ওয়ার্ডারের কথা নেহাৎ মিথ্যা নহে। রঘুনন্দন নিকটেই লুকাইয়াছিল। জেলের সম্মুখে সরকারী রাস্তায় "বাবু সাহেবের" মোটর খানি দাঁড়াইয়াছিল। তিনি সম্প্রতি প্রত্যহ অপরাহ্নে এদিকে বায়ুসেবন করিতে আসিতেন। এইখানে মোটর ছাড়িয়া খানিকক্ষণ পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অদ্যও আসিয়াছিলেন। রঘুনন্দন তাঁহার গাড়ীর আসনের তলায় লুকাইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে কলিকাতায় "বাবু সাহেবের" অবিষ্যার গৃহে বসিয়া মদ্যপান করিতে করিতে রঘুনন্দন বলিতেছিল—"আমি ভাবি, লোকগুলো যখন দেখবে যে মোহরগুলো সবই মেকী তখন তাহাদের মনের অবস্থাটা কিরূপ হইবে!

পাপ ও ফল

[শ্রীসুবোধচন্দ্র সিংহ বি, এস, সি]

(১)

দশ বৎসর আগের ঘটনা।

তখন আমার বয়স পনের। যৌবনের পথে পা বাড়াইয়াছি। তখন আমার ছিল সব—রূপ ও যৌবনের গর্ব্বে গর্ব্বিতা ছিলাম। আমার আপন বলিতে ছিল বিধবা মা আর এক ঊনিশ বৎসরের ভাই। আমার জন্মগ্রহণের একমাস পরে বাবা কলেরায় মারা যান। প্রতিবেশী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই বলিত মেয়েটার রূপ থাকলে হবে কি একটি আস্ত রাক্ষসী। আমার বয়স বাড়লেও মাঝে মাঝে রাক্ষসী, ডাইনী এই সকল আখ্যাগুলিতেও অভিহিত হইতে হ'ত। কিন্তু সকলের নিকট হইতে এতবড় বদনাম পাইলেও আমার মা এবং ভাই-এর নিকট কোনও দিন কোনও কটু কথা আমার জীবিত অবস্থায় শুনি নাই। বরং অপরে যখন ওই সকল আখ্যা দিত তখন স্নেহময়ী মাতা এবং এবং স্নেহময় ভ্রাতার বুকের মাঝে লুকাইবার মতন স্থান পাইতাম।

কিন্তু আমরা ছিলাম অত্যন্ত গরীব। দাদা বেলেঘাটার গেঞ্জির কলে কাজ করিতেন। মাসে ২৫৷৩০ টাকা উপায় করিতেন। যে মাসে ৩০টি টাকা উপার্জ্জন হইত সে মাসে তবুও আমরা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতাম। আমরা থাকিতাম কলিকাতার প্রান্তবর্ত্তী একটী টিনের চাল দেওয়া মাটির বাড়ীতে দুইখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর একটি ছোট দাওয়া, রাঁধিবার জন্য উঠানের একধারে চাঁচ দিয়া ঘেরা খানিকটা জায়গা। মাসে সাতটি টাকা বাড়ীটির ভাড়া দিতে হইত।

অভাবে পড়িয়া দাদা লেখাপড়া অধিক শিখিতে পারেন নাই। অথচ দাদার চেষ্টায় গৃহে বসিয়া বসিয়া আমি লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলাম।

আমার মা চিররুগ্না—আমাকেই রাঁধিতে হইত- তবে একবেলা! দাদা সন্ধ্যার পর কাজ হইতে ফিরিতেন। হাত মুখ ধুইয়া সকালের রান্না ভাত খাইয়া দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া গান গাহিতেন। আমি উচ্ছিষ্ট পাত্রে বাকী অন্ন খাইয়া দাদার পার্শ্বে পা দুলাইয়া বসিতাম; তাহার পর দুইটি ভাই বোনে কত গল্পই করিতাম—কত গানই গাহিতাম। ওঃ সে সকল দিন কতই না সুখে কাটিয়াছে! দারিদ্রতার নির্ম্মম যাতনায় অস্থির হইয়াও আমাদের সন্ধ্যাগুলি আনন্দে কাটিয়াছে।

যে স্নেহময়ী মাতা এবং ভ্রাতার স্নেহ যত্নে আমি আমার জীবনকে ধন্য ভাবিতাম তাহাদের স্নেহের আমি কি প্রতিদান দিয়াছি তাহাই বলিবার জন্য আজ আমি তোমাদের দুয়ারে আসিয়াছি।

আমার বারো বৎসর বয়স থেকে আমার বিবাহের চেষ্টা করা হয়—আমার সৌন্দর্য্য ছিল—পছন্দও অনেকের হইল কিন্তু যখন শুনিল যে এক পয়সাও আমরা দিতে পারিব না—তখন সকলেই মুখ ফিরাইল।

কেহ কেহ আবার জন্ম সম্বন্ধে ইঙ্গিতও করিল। উঃ কি নিদারুণ অপমান। কিন্তু সেই অপমান অপেক্ষা কত বড় কত ভীষণ অপমান এবং কলঙ্ক আমি আমার মা ও ভাইয়ের মস্তকে ঢেলে দিয়েছিলাম তাহার বর্ণনাই এইবার আমি করিব।

আমাদের পাশের বাড়ীতে ভাড়াটে আসিল। দেখিতাম প্রায় সর্ব্বদাই জানালার ধারে একটি যুবক বসিয়া বসিয়া তাহার নিলর্জ্জ দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করিত। প্রথম প্রথম অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া উঠিতাম। কিন্তু তখন অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের হিল্লোল বহিয়া বহিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। কি এক লালসায় প্রাণ আনমনা হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে যুবকটীর পানে ফিরিয়াও চাহিতাম। কখনও বা অন্যমনস্কভাবে নিলর্জ্জ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া থাকিতাম। এই অন্যমনস্কতা এই লজ্জাহীনতাই কাল হইল। সেদিন গলির ধারের দরজার নিকট—ঝাঁট দিতেছিলাম—

যুবক কোথা হইতে আসিয়া আমার হাতে একখানি চিঠি গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ঘৃণায় চিঠিখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—মনের মধ্যে কত সৎ অসতের দ্বন্দ্ব হইয়া গেল। কিসের তাড়নায়—চিঠিখানি তুলিয়া লইলাম গৃহমধ্যে আসিয়া পড়িলাম "আমি তোমায় ভালবাসি।"

আমি নারী—যুবতী। আমায় ভালবাসে—কথাটিতে বিমনা হইয়া গেলাম। প্রাণের ভিতর পুলকের সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু তখনও জ্ঞান হারাই নাই। বুঝিলাম এ ভালবাসা ত' পবিত্র নয়।

আরও দু'দিন পরে আমার সামনে অপ্রশস্ত উঠানের উপর আর একখানি চিঠি আসিয়া পায়ের নিকট লুটাইল। প্রথমে ভাবিলাম—দরকার নাই।

মুখ তুলতেই দেখিলাম যুবক দাঁড়াইয়া—তাহার চোখে কি সম্মোহন ছিল জানি না—বাণবিদ্ধার ন্যায় পত্রখানি কুড়াইয়া লইলাম—নিভৃতে পড়িলাম। কত প্রণয়ের গীতি কত মধুময় কথা তাহাতে ছিল—ভালবাসি ভালবাসি এই কথাটি বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া আমায় পাগল করিয়া তুলিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া শুধু বিষাদ মলিন হাসি হাসিয়াছিলাম। কোনও উত্তর দিই নাই।

তাহার পরদিন সকালবেলা দাদা কাজে বাহির হয়ে গেলেন। মার শরীর ইদানীং সুস্থ ছিল - কি একটা পার্ব্বণ ছিল। সেদিন মা গঙ্গা নাইতে গেলেন। আমি দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া দাদার ছিন্ন বস্ত্রটি সেলাই করিতেছিলাম। ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিলাম যুবক জানালার ধারে বসিয়া সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমার পরিধেয় বস্ত্র কিছু অসংযত ছিল—আমি তাহা সংযত করিবার জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে দেখি যুবক একেবারে আমাদের জীর্ণ দ্বার ঠেলিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আমি ফিরিয়া চাহিলাম—আশ্চর্য্য মোটেই হই নাই, বসন সংযত করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। যুবক প্রথমেই কথা কহিল—"সরলু আর কতদিন আশায় আশায় থাকব।" আমার প্রাণের মধ্য দিয়া কি এক বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। যুবক কত প্রণয়ের বিষমধুর কথা বলিয়া গেল। বলিতে পারিলাম না যে পাপিষ্ঠ দূরহ' এখান থেকে। তাহার চোখে কি গুণ ছিল। তাহার উপর যৌবন আমার দুয়ারে আসিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে আমি কম্পিতকণ্ঠে বলিয়াছিলাম—"এক্ষুনি মা এসে পড়বেন—কেউ দেখলে কেলেঙ্কারীতে মুখ দেখানো যাবে না—আপনি চলে যান।"

তাহার দুঃসাহস কতদূর সে আমার হাত ধরিয়া বলিল—"আমাদের বাড়ীতে এখন কেউ নেই সব দেশে গেছে—কাল যাবে দুপুর বেলায়।" বলিয়া আমার মুখের পানে সে চাহিল। আমি হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বসিলাম। যুবক "তাহলে কাল এসো" বলিয়া ফিরিল। দরজার নিকট যাইয়া আমার উদ্দেশ্যে চুম্বন নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাসিয়া অন্তর্হিত হইল।

(২)

পরদিবস যখন মা দিবানিদ্রায় অচেতন হইলেন তখন কম্পিতবক্ষে অপরাধীর ন্যায় ধীরে ধীরে পাশের বাড়ীটায় প্রবেশ করিলাম। কোথা হইতে যুবকটি আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল—"এসো।"

শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না। সর্ব্বনাশের নেশায় তখন বিভোর হইয়া গেলাম।

তাহার পর যৌবনের মদিরা পানে মত্ততা আসিয়া গিয়াছিল—প্রতিনিশিতে মা ও ভাইকে সিদ্ধির নেশায় অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া অপবিত্র প্রেমের লীলায় মাতিয়া উঠিলাম। যে ভুল দূর হইতেও কখনও দেখি নাই তাহা কাণে উঠিল।

একদিন যুবক নিশিবাবু বলিল—"এ রকম ভাল লাগে না চল সরে পড়ি। বিশেষ তোমার সন্তান-সম্ভবনাও ত' হতে পারে। এত গহনা দিলাম মনের সুখে ত' সব সময় পরতে পাচ্ছ না।

তাহার কুহকজালে আমি পড়িয়াছিলাম—পাখী একদিন সকল স্নেহবন্ধন কাটাইয়া দিয়া উড়িলাম। কাশী গিয়া

উপস্থিত হইলাম। যুবকের পয়সার অভাব ছিল না—ভাবিলাম কত সুখ। কিন্তু হায় মূর্খা নারী।

তাহার পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কত পাপকার্য্যই না করিয়াছি মদ খাইতে শিখিয়াছি—কত ধনীকে নির্ধন করিয়াছি তাহার উপর মা হইয়া পেটের সন্তানকে জন্মাইবার পূর্ব্বেই হত্যা করিয়াছি।

নিশিবাবু মরিয়া পড়িয়াছিল। তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল।

তাহার পর একটি দিন আসিল যেদিন হইতে অনুশোচনা আরম্ভ হইল।

সেদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলাম। স্নানের পর রূপের হিল্লোল ছড়াইয়া চারিদিকে কটাক্ষপাত করিতে করিতে ভিজা কাপড়ে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছিলাম—এমন সময় আমার সম্মুখে পড়িল একবৃদ্ধা—মুখ ফিরাইয়া লইতেছিলাম—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চিনিতে পারিলাম বৃদ্ধা আমাদের কলিকাতার এক দরিদ্রা প্রতিবেশী। চমকিয়া উঠিলাম।

বৃদ্ধা আমার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া আমাকে চিনিতে পারিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"তুই মরি না—যা সরে যা ছুঁস্‌নি—হতভাগী নিজে ত পাপপথে বেরোলি—তার উপর আবার অমন মা আর ভাইকে খেলি।"

জ্ঞানহারা হইয়া বলিলাম—"এ্যাঁ এ্যাঁ"—বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল—"যা আর ন্যাকামী করতে হবে না—যেন জানে না কিছুই, কেন যেদিন তুই বেরিয়ে এলি তার পরদিন তোর মা বেটি হার্টফেল হয়ে মরে গেল আর তোর অমন ভাই কলঙ্কের বোঝা বইতে না পেরে গলায় দড়ি দিলে।"

আর শুনিতে পারিলাম না। কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলাম—তাহার পর ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলাম।

*　　*　　*　　*

যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম নিজের ঘরের শয্যায় শুইয়া আছি। কেহ কোথাও নাই—শুধু তোষামোদকারীদের কলহাস্য পাশের ঘর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল।

অন্তরের ভিতর প্রচণ্ড ঝড় আরম্ভ হইল। দাবানলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

আজও আমি কালামুখী বাঁচিয়া আছি—আমার রূপ-যৌবন সকলই গিয়াছে। আমার সাথী এখন নির্ম্মম স্মৃতি—আমার পরিধেয়ের অঙ্গ একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা। আজও আমি বাঁচিয়া আছি—শুধু প্রতিশোধ-এর তরে। আমি আমার সকলেরই হত্যাকারী। হত্যাকারীর বীভৎস মূর্ত্তি লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যে আমাকে এই পাপপঙ্কে ডুবাইল—তাহার সন্ধান আমায় এই জীবনে পাইতেই হইবে। তাহার শোণিত তৃষা মিটাইয়া—জাহ্নবীর জলে নিজেকে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইব। ইহাই আমার পণ। যে পাপ করিয়াছি তাহার উপযুক্ত ফল আমি ভোগ করিতেছি। আমার জন্য কেহ দুঃখ প্রকাশ করিও না—কারণ দুঃখ করিবার মত কাজ আমি করি নাই। আমি আমার যৌবনের তৃপ্তির জন্যই পাপ পথে আসিয়াছি। বাঙ্গালীর সমাজ! যখন আমি একটি নির্ম্মল প্রস্ফুটিত শুভ্র পুষ্পের ন্যায় ফুটিয়াছিলাম—তখন সে আমায় ফেলিয়া দিয়াছিল। আমি কি আজ এই রকম হইতাম—যদি কোন সহৃদয় যুবক পণ না লইয়া আমায় বিবাহ করিত। আজ তাহা হইলে আমি কি সতীর আসনে বসিতে পাইতাম না!

———

কবিচূড়ামণি কালিদাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বি-এ, এম, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)]

[এই আশ্রমস্থান শান্তিময়, কিন্তু (আমার দক্ষিণ) বাহু স্পন্দিত হইতেছে। (এখানে) ইহার ফল (সম্ভব) কি রূপে? (কিন্তু তিনি একজন হিন্দু রাজর্ষি, সুতরাং দৈব শক্তিতে তাঁহার নিতান্ত বিশ্বাস, তাই আবার বলিতেছেন) অথবা (আমার বিচারের অপেক্ষা নাই অর্থাৎ আমি স্থূল দৃষ্টি মানুষ মাত্র, বিশ্বরহস্যের আমি কি জানি?) দৈবের দ্বার (উপায়) সর্ব্বত্র অপ্রতিহত (অর্থাৎ দৈবশক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। এখানেই আমার মহিষী মিলিবে।) কি আশ্চর্য্য, অমনি নেপথ্য হইতে সুমধুর দৈববাণীর ন্যায় বাণী শ্রুত হইল—"ইদ ইদ সহীও"। এই বাক্যটি সৌরসেনী ভাষায় গ্রথিত। শকুন্তলা আশ্রমের বৃক্ষ বাটিকার চারা গাছ গুলিতে জল সেক করিতে করিতে তাহার সখীদ্বয়কে (অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা) ডাকিতেছেন—'সখিরা এদিকে এদিকে'। কিন্তু রাজার কাণে লাগিল যেন বনদেবতাই তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত বীণা নিকুণে তাঁহাকে বলিতেছেন—'সখে, এদিকে, এদিকে'। (একবার তাকাও তোমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দনের ফল হাতে হাতে অনুভব করিবে।) রাজাত অবাক, প্রেক্ষকবৃন্দ ততোধিক। তখন কোথায় গেল ভক্তিপুর্ণ-প্রণামাভিলাষ, কোথায় গেল আশ্রম পরিদর্শন! তরুণ রাজা দৈবপরিচালনায় চারুসর্ব্বাঙ্গী তরুণীর দর্শনে মদনের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি চাহিলেন, তারপর যাহা দেখিলেন তাহাতে আর চোক ফিরাইতে পারিলেন না—এ অবাঙ্‌মনসোগোচর। আজ আশ্রম তরুণীতে তিনি যে সৌন্দর্য্য দেখিলেন উহার কণা মাত্রও তিনি তাঁহার অন্তঃপুরে সুন্দরীর হাটে কখনও দেখেন নাই।

পাঠক উপরি উক্ত কবিতাটির প্রতিপদের মধ্যে বক্তার মনোগত ভাবগুলি লক্ষ্য করিবেন। যেমন ছন্দটী, তেমনি ছোট ছোট কথা গুলি, প্রতিপদেই বক্তার মনোগত বিরুদ্ধ ভাব গুলি পরিব্যক্ত করিতেছে। পাঠক মানে না বুঝিলেও আবৃত্তিতেই বুঝিতেছেন যে বক্তা মহাসমস্যা মধ্যে পড়িয়াছেন। শেষের চরণ দুটির আবৃত্তিতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে একটা সমাধান হইল। ভাবের অনুরূপ ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগে সংস্কৃত নাট্যকারদিগের মধ্যে কালিদাস ও মৃচ্ছকটিককার অদ্বিতীয়। কবিবর সমন্ধে এখানে আমরা কতগুলি তথ্য সংগ্রহে সমর্থ। প্রথমতঃ কালিদাসের সময়ে সংস্কৃত শিক্ষিত দিগের কথিত ভাষা ছিল, তাহা না হইলে এরূপ সরল অথচ মনোভাব জ্ঞাপনানুরূপ ভাষার প্রয়োগ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ সামুদ্রিক শাস্ত্রে ও দৈব শক্তিতে কবির ঐকান্তিক বিশ্বাস। তৃতীয়তঃ এই বাহু স্পন্দন ব্যাপার দ্বারা ঘটনাবলীর এক অভিনব আবর্ত্তন। রাজা বনে আসিয়াছিলেন গ্রীষ্মে শিকার করিয়া সুখে কাল হরণ জন্য, দৈবাৎ মৃগানুসরণে অতর্কিত ভাবে আশ্রম সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িলেন, আবার তথায় তাপস দিগের নিমন্ত্রণে আশ্রমে প্রবেশ পথে বাহু স্পন্দনে মহিষী লাভ সূচনা। আজ সকাল হইতেই রাজার কেবল বিস্ময়ের পর বিস্ময় ঘটিয়া যাইতেছে। ইহাই প্রবীণ নাট্যকারের মুন্সীয়ানা কাদম্বরীকারও এইরূপ যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে গন্ধর্ব্বরাজ কুমারী কাদম্বরীর সাক্ষাৎকার ঘটাইতে কালিদাসের অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। নাট্যপরীক্ষকগণ কবিবরের এই অদ্বিতীয় কলাকৌশলকে 'পতাকাস্থান' আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

(৫) গৃহসূত্র ও সংহিতাগ্রন্থে অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল, কেননা পুরাণ ও নিবন্ধকারগণ অসবর্ণ বিবাহ ও সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস কিন্তু ইহাদের কোনটিই নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

তাঁহার শকুন্তলা নাটকের নায়ক দুষ্মন্ত বলিতেছেন—"অপি নাম কুলপতেরিয়ম্ অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ" অর্থাৎ এমন কি সম্ভব যে এই সুন্দরী কুলপতি কণ্বের অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূতা (তাহা হইলে আমি ইহাকে ধর্ম্মমতে বিবাহ করিতে পারি ?) গৃহ্যসূত্রকারগণ ও মনু প্রভৃতি সংহিতাকারগণ বরের পক্ষে তাহার সবর্ণা ও নিম্নবর্ণা কন্যাকে ভার্য্যারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীও তন্নিম্নবর্ণাদের বিবাহ করিতে পারেন। শকুন্তলা যদি মহর্ষির কোনও ক্ষত্রিয়া ভার্য্যার গর্ভজাতা কন্যা হ'ন তাহা হইলে রাজা তাহাকে ধর্ম্মমতে গ্রহণ করিতে পারেন, কেননা অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা কন্যা মাতার বর্ণ অর্থাৎ জাতি প্রাপ্ত হয়। এরূপ অসবর্ণ বিবাহের পুত্রের কথা কবিকৃত মালবিকাগ্নিমিত্রেও আছে। সমুদ্রযাত্রার কথা শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কে আছে। (১) সেখানে আছে 'সমুদ্র ব্যবহারী সার্থবাহো ধনমিত্রো নাম নৌব্যসনে বিপন্নঃ' অর্থাৎ ধনমিত্র শেঠ নামে এক সমুদ্র বনিক্ নৌকাডুবিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং কালিদাসের সময়ে অসবর্ণ বিবাহ কিংবা সমুদ্র যাত্রা অধর্ম্ম ছিল না বুঝিতে হইবে। কিন্তু আদিত্যপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতিতে অসবর্ণ বিবাহ ও সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতি কলিতে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ইহাদ্বারা কালিদাস কত পূর্ব্বকালের লোক ছিলেন তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

(৬) ক্রমে ক্রমে সখীদের মুখে শকুন্তলার পূর্ণ পরিচয় রাজা পাইলেন তিনি জানিলেন দেবযোনি অপ্সরোমণি মেনকার সঙ্গে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের গান্ধর্ব্ব বিবাহের ফলে সুন্দরীরত্ন শকুন্তলার উৎপত্তি। পুরাণ ও নিবন্ধকারদের মতে শকুন্তলার উৎপত্তিই সমাজ নিয়মের বহির্ভূত, সুতরাং শকুন্তলা আদৌ মহারাজ দুষ্মন্তের পরিণেয় নহেন। কিন্তু কালিদাস সেকথার একবারও উল্লেখ করিলেন না, তিনি শকুন্তলাকে রাজর্ষির মহিষী করিয়া দিলেন। তা ছাড়া কালিদাসের শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্য মধ্যে সর্ব্বত্রই গান্ধর্ব্ব বিবাহেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলা যখন পিতার বিনা অনুমতিতে রাজার পত্নী হইতে অস্বীকার করিলেন, কেননা তিনি আশ্রমের ধর্ম্মানুযায়ী জানিতেন যে পিতা ব্যতীত তাঁহার আত্ম-সম্প্রদানে অধিকার নাই, তখনই লোকাচারজ্ঞ ভূপতি তাঁহার ভ্রমসংশোধন করিয়াছিলেন—

শকুন্তলা। পোরব, রক্খ অবিণঅং। ম অণ সংতত্তাবি ণ হু অত্তণো পহবামি। পৌরব, রক্ষ অবিনয়ম্। মদনসন্তপ্তাপি ন খল্বাত্মনঃ প্রভবামি)

রাজা। ভীরু, অলং গুরুজন ভয়েন। দৃষ্ট্বা তে বিদিতধর্ম্মা তত্র ভবান্ ন তত্র দোষং গ্রহীষ্যতি কুলপতিঃ। অপি চ—

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যকাঃ।

শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ॥ ৩।২৪।

[শকুন্তলা। মহারাজ, আপনি আদর্শ ভূপতি পুরুষ বংশ তিলক, আপনি শিষ্টাচারের বাহিরে যাইবেন না। মদনসন্তপ্তা হইলেও আমি আত্মদানে সমর্থা নহি। (অর্থাৎ পিতার অনুমতি ব্যতীত আমার ইচ্ছা সত্বেও আপনাকে আত্মদান করিতে অর্থাৎ আপনার পত্নী হইতে আমি অক্ষম।)

রাজা। ভীরু, গুরুজনের (অর্থাৎ পিতার) ভয় করিও না (অর্থাৎ আমি কিছু অধর্ম্ম আচরণ করিতে যাইতেছি না যাহাতে তুমি গুরুজনের ভয় করিতে পার)। কুলপতি মহর্ষি কাশ্যপ ধর্ম্মজ্ঞ। তিনি তোমার ঈপ্সিত বরে আত্মদানে দোষ গ্রহণ করিবেন না। আবার, অনেক অনেক রাজর্ষি কন্যারা (পিতামাতার অনুমতি না লইয়াই) গান্ধর্ব্ব মতে অভীপ্সিত বর গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পিতা মাতারাও সেই বিবাহ পরম আহ্লাদ সহকারে অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া ইতিহাসাদিতে শুনিতে পাই। [অর্থাৎ অভীপ্সিত বরে আত্মদানই গান্ধর্ব্ব বিবাহ, ইহা ধর্ম্ম সম্মত। ইহাতে তোমার জ্ঞানী পিতা দোষ না ধরিয়া যার পর নাই সুখী হইবেন।] কালিদাসের কুমার সম্ভবের গৌরী, পুরাণোক্তা অষ্টবর্ষা গৌরী নহেন, তিনি পূর্ণ যৌবনা। বস্তুতঃ কালিদাসের নায়িকারা সকলেই যুবতী এবং সর্ব্বত্রই তাঁহারা

(১) রঘুবংশের সপ্তদশ সর্গেও আছে—"যাদোনাথঃ শিবজলপথঃ কর্ম্মণে নৌচরাণাম্।

৮১। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যে বাণিজ্য চলিত উহার ইঙ্গিত কবিবর রঘুর বষ্ঠেও করিয়া গিয়াছেন—

"দ্বীপান্তরানীতলবঙ্গপুষ্পৈরাপাদৃতস্বেদলব মরুদ্ভিঃ। ৫৭।

অভীপ্সিত বরে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহিতা। ভৃগুও স্বীয় সংহিতায় ক্ষত্রিয়দের পক্ষে গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহের প্রশংসা করিয়াছেন :—

গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ।৩।২৬।

মহাভারতেও আছে, দুষ্মন্ত রাজা শকুন্তলাকে বলিতেছেন—

সুব্যক্তং রাজপুত্রী ত্বং যথা কল্যাণি ভাষ মে।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি ব্রূহি কিং করবাণিতে॥
গান্ধর্ব্বেণ চ মাং ভীরু বিবাহেনৈহি সুন্দরি।
বিবাহানাং হি রম্ভোরু! গান্ধর্ব্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥
আদিপর্ব্ব। ৭৩ তম অধ্যায়। ১,৪

কবিবর কালিদাসের কাব্যাদি হইতে বিবাহাচার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায় তাহা দ্বারা ইহাই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় যে কবি পুরাণ দ্বন্দ্বযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী, কেননা পুরাণ দ্বন্দ্বযুগের ও তৎপরবর্ত্তী নিবন্ধকারদের ব্যবস্থা কোথায়ও তিনি গ্রহণ করেন নাই।

(৭) মহাকবি কালিদাস ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে ব্রাহ্মণ ও মহাভারত ইত্যাদির ন্যায় ঐতিহাসিক ষড়ৈশ্বর্য্য মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্যাদি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় দেবগণ ও দেবযোনিগণ মানুষের চাইতে বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও শক্তিতে অনেক উচ্চে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সুদীর্ঘ যৌবনরহস্য, বিবিধ বিজ্ঞানতত্ত্ব, অসাধারণ যুদ্ধবিদ্যা ও অনন্ত শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ভগবানের সমুদায় সৃষ্টবস্তুদের উপরে একাধিপত্য বিস্তার করিতেন। আদ্য বৈয়াকরণ দেবরাজ ইন্দ্র, আদ্য রাজনীতিজ্ঞ দেবগুরু বৃহস্পতি, আদ্য বেদস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মা, আদি তন্ত্রকর্ত্তা দেবদেব আশুতোষ, আদি নাট্যোপদেষ্টা পিতামহ শিষ্য দেবর্ষি ভরত, আদি যোগী পিতামহ ব্রহ্মা! এইরূপে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পূর্ণচর্চ্চা সর্ব্বাগ্রে দেবতারা করিয়া বিধাতার সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছিলেন। মানবদিগের আদর্শ দেবতারাই ছিলেন। মানবগণ ভারতীয় সমগ্র বিদ্যানুশীলন করিয়া সুযোগমত দেবলোকে গমন করিয়া বিবিধ বিদ্যার্জ্জন করিতেন। ব্রাহ্মণ ও মহাভারতাদি পাঠে জানা যায় দেবতারা মানবী শ্রেষ্ঠাকে বিবাহ করিতেন এবং মানবশ্রেষ্ঠগণও দেবকন্যাদের বিবাহ করিতেন। দেবতারা ব্যোমযানে বিচরণ করিতেন, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বলে অপূর্ব্ব বিভূতি প্রদর্শন করিতেন, আয়ু-রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন যে লোকে তাহাদিগকে অমর বলিয়াই জানিত। মানব লোকাচার ও দেবতাদের লোকাচার অনেক বিষয়ে বিভিন্ন ছিল। তাই স্বর্গীয়দিগের আচরণ আমাদের নিকট অনেক সময়ে নিতান্ত বিসদৃশ ঠেকে। বিশেষতঃ যৌন-সম্বন্ধ বিষয়ে দেবতা ও দেবযোনির আচরণ মানব সমাজে আদৌ গ্রহণীয় ছিল না। কিন্তু তাহা বলিয়া মানুষ ও দেবতার যৌনসম্বন্ধে কাহারও আপত্তি ছিল না, এবং মানুষগণ উহা শ্লাঘ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতেন। দেবতা ও দেবযোনির প্রণিধান, তিরস্করণী, শূন্যযান প্রভৃতি বিদ্যা অনুগৃহীত মানুষগণও শিখিত। বিশুদ্ধ দেবতা তেত্রিশটী। উঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, এই একত্রিশ জন চির কুলীন বাকি দুইটির স্থান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিদ্বারাই পরিপূরিত হইত! দক্ষযজ্ঞ বিবরণটি মহাশক্তি শিবের দেবতাশ্রেণীভুক্ত হইবার প্রবল দ্বন্দ্ব নয় কি? মরুদ্গণ দেবতাদের নিত্য সহচর কিন্তু ঠিক দেবতা ন'ন। দেবযোনিগণ দেবতাদের ন্যায় বিদ্বান বা ক্ষমতাবান্ নহেন। তবে তাঁহারা এক এক শ্রেণী এক এক বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। আবার সময় সময় দেবযোনিদিগের মধ্য হইতে কেহ কেহ বিদ্যা ও শক্তিতে প্রাধান্য লাভ করিয়া দেবতার প্রভুত্ব ও গর্ব্ব করিতেন। যক্ষ, ভূত, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরস্, বিদ্যাধর, পিশাচ, গুহ্যক ও সিদ্ধ এই দশটি দেবযোনির শ্রেণী। (১)

(১) বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষরক্ষোগন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ।
পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥
অমরকোষ। ১১

(ক্রমশঃ)

নীহার

[শ্রীরবীন্দ্রকুমার রুদ্র]

.. আমার পরিচয় দেবার আগে এটুকু আমায় সকলের কাছেই স্বীকার করে নিতে হবে যে, পরিচয় দেবার মত উঁচু মাথা নিয়ে আমি আসি-নি। লোকে যাকে পথের ঘেয়ো কুকুরের চেয়েও ঘৃণা করে, যার ছায়া মাড়ালে লোককে আবার স্নান করতে হয়, সমাজের বাইরে—লোক চক্ষুর ঘৃণ্য উপেক্ষিত আমি আজ—বেশ্যা! কবে কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে এই ধরণীর মাটীতে আমার প্রথম স্পর্শ অনুভূত হয়েছিল, কোন্ নারীর অমৃতময় বক্ষের সুধা ধারা আকণ্ঠ পান করে এই শরীর বর্দ্ধিত করেছিলুম অতীতের এই দুর্দ্দিনে আজ তা আমার মনে নেই, তবে স্বপ্নালোকের কোন্ এক অস্পষ্ট ছায়ার মত এটুকু আমার আজও বেশ মনে পড়ছে যে একজন ছিল যাকে মা বলতুম, যিনি দুঃখে সান্ত্বনা দিতেন, রোগে সেবার পুণ্য-পরশ দিয়ে শরীর থেকে রোগ তাড়িয়ে দিতেন—আর মনে পড়ে দাদাকে! কি সে দিন, কি সে সুখের মুহূর্ত্ত গুলি ছায়ার মত আজ সরে গেছে!—আজ এই কলঙ্কিত ঘৃণ্য জীবনের যে ইতিহাস তোমাদের কাছে বলবো তার প্রত্যেকটী বর্ণ জীবন মৃত্যুর মত সত্য, আলোর মত উজ্জ্বল—ভুল তা'তে নেই। শুধু এইটুকু প্রার্থনা করি শুনে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলো আর বিধাতার কাছে বর চেয়ে নিও যেন এ পৃথিবীতে আমার মত নারী না জন্মায়—যত ধ্বংস হয় ততই ভাল, শুধু এইটুকু—ব্যস্, আর কিছু নয়।...

জন্মেছিলুম ঢাকায়। নারী জীবনে যেটা সবচেয়ে বড় কাম্য, তা পেয়েছিলুম, কাচ পেয়ে কাপড়ে গেরো দিই নি, যা পেয়েছিলুম আসল সোণা,—অমন সুন্দর ভালবাসা, অমন কোমল স্নেহ আর কোন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে কি-না জানি না, শুনলেও হয়তো বিশ্বাস হবে না,—এমনি প্রত্যক্ষ, এমনি গভীর সে ভালবাসা। কিন্তু অত সুখ বুঝি মানুষের কপালে সয় না, সইলো ও না, বিধবা হলুম। সে ভালবাসার প্রতিদান-ও নাকি দিতে গিয়েছিলুম বিষের বাটী নিয়ে—বাধা পেলুম। শাশুড়ী রুষ্ট হলেন, বললেন অন্ততঃ পেটে যেটা আছে সেটার মুখ চেয়েও আমায় বাঁচতে হবে। তাই তো ছিঃ, মা হয়ে—মনে করতেও গা শিউরে ওঠে, পারলুম না, খোকার মুখ চেয়ে আমায় সে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে থাকতে হোল।—তখন আমি মা, আর কিছু নয় মা! নারী জীবনে যা চায়, তার জন্ম জন্মান্তরের ফল, তার নারীত্বের প্রথম কামনা সব পেলুম যেদিন দুর্ব্বল ক্ষীণ দেহটা কোনরকমে পাশ ফিরে দেখলুম—একটী ছোট্ট ছেলে, কচি কচি হাত পা—মুখ চোখ সব যেন তাঁরই, কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি। বুকে তুলে নিলুম। হায় রে, সেই একটু পরশেই যেন সব দুঃখ ভুলে গেলুম। বুক ঠেলে শুধু একটী কথাই ফুটে উঠলো—মা, মা, মা! আজ আমি মা। কি সে আকাঙ্খা, মাতৃত্বের কি সে গর্ব্ব আমার চোখের জলে মিশে গেল।......

একটী বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন আমার ভাগ্যাকাশে কতকগুলো জমাট মেঘ ছড়িয়ে গেল। ভাবলুম হয় তো জল হ'য়ে কেটে যাবে; কিন্তু তা হোল না, দিনের পর দিন সেগুলো আরো জমাট বেঁধে চেপে বসলো। আমাদের পাশের বাড়ীর একটী ছেলে শত প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে চিরদিনের মত পথে টেনে আনলে!—পুরুষ? এইখানেই তার পুরুষত্বের পরিচয় পেলুম। সেদিন জানলুম পুরুষ ভালবাসতে জানে না, ভালবাসা পুরুষের কাজ নয়। তারা চায় মৌমাছির মত ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতে। যার মধুরতা চলে যায় তাকে দু'পায়ে দলে চলে যাওয়া,—এইখানেই তার কৃতীত্ব, এইখানেই তার পুরুষত্বের পরিচয়! যে পুরুষের মুখের দিকে চেয়ে মাত্র দেড় বছরের একটী শিশু নিয়ে সর্ব্বনাশের পথে ঝাঁপ দিলুম, মাস তিনেক পরেই তার সখ মিটে গেল, তার পরেই একদিন নতুন বাজারের পথে আমার পিসীর সঙ্গে দেখা। কুলের মুখে কালী ঢেলে তিনি

আগেই পথ চিনে নিয়েছিলেন। আজ এ দুর্দ্দিনে আমাকে পেয়ে তাঁর ভাগ্যের পথ আরও প্রশস্ত হোল। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গেলুম। বাড়ী বললে হয়তো তার গৌরব বৃদ্ধি করা হয়—কিন্তু সেটা ছিল খোলার ঘর। একটী মাত্র ঘর বেশ সাজানো; বড় পালঙ্কের ওপর একটা বড় বিছানা, তার একপাশে একটা আধ-ভাঙ্গা হারমোনিয়ম, একটা থালায় কতকগুলো বিড়ি আর একটা দিয়াশালাই। একটা বিড়ী ধরিয়ে পিসী বললেন—তা এসেছিস যখন একটা ঘর তো দেখে নিতে হবে। পাশের ঘরটা নি, কি বলিস? বিছানা পত্তর সব ...

বললুম—মা পিসী সে সব কিছুই নেই।—

পিসী একটু হাসলেন, বললেন সে সব তিনিই দিতে পারবেন।

সন্ধ্যার সময় বিছানা পেতে একলা চুপ করে শুয়ে ভাবছি, হঠাৎ বাইরে কার গলা পেলুম—এই ঘরে না-কি গো, দেখি কেমন 'মালতীকে' জোগালে!—

যে ঢুকলো তাকে দেখে ঘৃণায় আমার সর্ব্বশরীর জলে উঠলো। ঘাড়ের চার পাশ কামানো, আলবার্ট তেড়ী, মুখে মদের গন্ধ,—আর চোখে, সে কি দৃষ্টি, কি ভীষণ!

পিসী বললেন—যত্ন আত্তি কর্ বাছা, প্রথম বাবু,—চাই কি মনে ধরলে—

বললুম—না পিসী ওকে যেতে বল—আমি পারবো না!

প্রথম খরিদ্দার পরিত্যাগ করা না-কি এ ধর্ম্মের বাইরে, তবু যে কেন করলুম তার কৈফিয়ৎ শত প্রশ্নেও কেউ পেলে না!

আমার এ ঘৃণিত জীবনের কাহিনী শুনে হয় তো ঘৃণায় লজ্জায় তোমাদের মুখ লাল হয়ে উঠবে, হয়তো ভাববে নিজের পাপ ব্যক্ত করতে লজ্জায় আমার মাথা নুইয়ে পড়ে না কেন,—আমি বলি তা ঠিক। কিন্তু সমুদ্রে যে ডুবেছে তার তলা দেখা ভিন্ন আর উপায় নেই, সোণার সংসারে গরল ছড়িয়ে যে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, তার আবার লজ্জা কি, তার আবার ঘৃণা কি?...

হোলও তাই, মাসখানেক পরে ভুলে গেলুম লজ্জা কাকে বলে, ভুলে গেলুম লোকে যাকে বলে ঘৃণা সেটা কি,—পাপের যে পথটা স্তরে স্তরে নেমে একেবারে নরকের দ্বারে—গিয়ে মিশেছিল, তালে তালে পা ফেলে সেই পথেই চল্লুম। তখন আমার সবচেয়ে বড় কাজ হোল লোককে সন্তুষ্ট করা। তারা টাকার থলি নিয়ে পশুর মত ছুটে আসতো, আমিও মুখে জোর করে টেনে আনা হাসি নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করতুম। পশুর আদর পশুর ভালবাসা দিয়েই বিদায় করতুম! তারা দিত টাকা, লালসার আগুন আর আমি দিতাম আমার এই দেহ, আমার এই রূপ, আমার এই হাসি। অন্ধ তারা—তাই পেয়েই সন্তুষ্ট হোত। সন্ধ্যার মুখে সেজে গুজে রঙ মেখে বারান্দায় দাঁড়ানোটাই তখন হয়েছিল আমার সব, আমার প্রধান কাজ। লোকে—শুধু লোকে কেন সেই বাড়ীর সকলেও এক বাক্যে স্বীকার করত আমি না কি খুব সুন্দরী! হা রে, এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য, সে কার জন্যে? ওই যারা টাকার থলি নিয়ে...

হঠাৎ একদিন পিসীমা বললেন,—তাই তো নীহার, রামপুরের জমিদার বাবু যে তোকে পাবার জন্যে একশ টাকা আগাম দিয়েছে...

বললুম—ফিরিয়ে দাও, দরকার নেই,—

পিসীমা দুই চোখ বিস্ফারিত করে শশব্যস্তে বলে উঠলেন—ষাট, ষাট, ও কথা মুখেও আনতে আছে? এই বয়সে যদি দরকার না হবে, কখন হবে রে? তা ছাড়া তাঁরা হলেন জমিদার—"

বললুম -জমিদারী দেখতে বল, আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

তারই দু'দিন পরে পিসীমা ঝগড়া করে ঢাকায় চলে গেলেন; আমিও স্ফূর্ত্তির স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিলুম। আজ বাগান, কাল নাচের পার্টি, ইত্যাদি করে দিনগুলো বেশ কাটতে লাগলো। রঙীন আমোদ আর বিলাসীতার সঙ্গে সঙ্গে আমার আসল পরিচয়টা কখন যে বিস্মৃতির পরদাতে ঢাকা পড়ে গেল বুঝতে পারলুম না।...

কালোর বুকেও আলোর প্রকাশ হয়,—পাঁকের মাঝখান থেকেও মাঝে মাঝে রত্ন খুঁজে পাওয়া যায় আর সেই জন্যেই বোধ করি আমার এ উপেক্ষিত জীবনের ধারাটা একদিন বেঁকে গেল। কেন বুঝলুম না কার কি উদ্দেশ্যের

পরিণামকে আজীবন গড়ে তোলবার জন্তে এ মহা পরিবর্ত্তন, কে জানে!

বাসা নিয়েছিলুম রামবাগানের ভেতর একটা গলীতে, সাড়া পাড়াটা সমস্ত দিন ঘুমিয়ে থেকে সন্ধ্যার সময় জেগে উঠতো। লোকজনের অন্ত নেই, মোটর জুড়ীতে গলি ভর্ত্তি - বেলফুল থেকে চানাচুর সবারই পায়ের ধ্'লা পড়তো। রাত্রি চারটে পর্য্যন্ত জেগে থেকে পাড়াটা আবার ঘুমিয়ে পড়তো—এমনি জায়গা ছিল সেটা! এইখানেই একটা লোককে পেয়েছিলুম আমি। সে বলতো—ভালবাসি তোমায়। আমি হাসতুম, মনে মনে বলতুম, সে তোমাদের পুরুষমানুষের কাজ নয়, পারবেও না। মাসখানেক বেশ আদর করলে, যত্ন করলে, তারপর একদিন - ব্যস পাখী উড়ে গেল, তার লালসা মিটে গেল—কিন্তু তার সঙ্গে আর একজন আসতো তাকে ভুলতে পারলুম না, এখনও পারি নি। কি সুন্দর চোখ তার কি সুন্দর মুখ মুখের ভাষা অতি মিষ্টি, গোপনে নীরবে তাকে পূজা করতে লাগলুম। এতদিনে সুযোগও পেলুম। সে চলে যাবার পর একেই ধরলুম—বললুম তুমি আমার হও। একটু হাসলে, বললে—একথা শুধু আমাকেই বলছো, না আরও অনেককে বলেছ? হায় রে আজ বিশ্বাসও কেউ করে না, নারীত্বের সঙ্গে সেটাও হারিয়েছি!...

সে আমার হোল, নতুন ঘর হোল, বিছানা হোল, সবই নতুন, যেন নতুন সংসার মনে হোল এতদিনে বুঝি আসল ভালবাসা যা তাই পেলুম, কিন্তু বড় অভিমানী, আসতে একটু দেরী হলে বা অন্ত কারুর সঙ্গে কথা কইলে অভিমানে চোখ দুটী তার ছল ছল করে উঠতো, কত রাত তা'র বুকে বুকে মাথা দিয়ে এমনি জেগে জেগেই কেটে গেছে, সে কত কথা, তার নিজের জীবনের, আমার জীবনের আর খোকাকে সে কি ভালবাসাটাই না দিলে, আপনার ছেলেকেও বোধ হয় লোকে তত দেয় না, তার উপহারের ভারে ঘর আমার ভরে উঠলো, তা'র ভালবাসায় বুক আমার ভর্ত্তি হয়ে গেল, কোনদিন মুখ ফুটে কিছু আমায় চাইতে হয় নি। আশে পাশের মেয়েরা বললে- নীহারের কপাল খুলেছে ওকে আর পায় কে?...হারে সে ভালবাসার—সে অগাধ প্রেমের যে প্রতিদান তাকে দিয়েছিলুম, মনে হলে......

সেদিন দুপুরে বসে একখানা বই পড়ছিলুম, হঠাৎ সঙ্গি-ঝী এসে বললে—মা, যদি কিছু না মনে করেন তো একটা কথা বলি।...

একটু হেসে বললুম—কি রে, বল্‌না কি হয়েছে?

বল্‌লে—আজিমগঞ্জ থেকে একটা বাবু এসেছে, একটা গান শুনে যাবে, খুব বড়লোক হাওয়াগাড়ী চেপে এসেছে!

শুনলুম একটা ঘণ্টা থাক্‌বে, ভাবলুম একটা ঘণ্টা বইতো নয়, কেউ জানতেও পারবে না, বললুম—আচ্ছা নিয়ে এসো কিন্তু একঘণ্টার বেশী বসাতে পারবো না, এটা জানিয়ে দিও, বুঝলে?—ঘাড় নেড়ে সঙ্গী চলে গেল, আয়নার সুমুখে গিয়ে চুলটা একটু ফিরিয়ে নিলুম।

বাবু ঘরে ঢুকলেন। বিরাট দেহ, হাতে লিকলিকে ছড়ি আমাকে দেখেই বললেন—বেশ বেশ...উঠে আর দাঁড়াতে হবে না বসো।...

বসলুম। তার রূপোর সিগার-কেশ্ খুলে আমার সুমুখে ধরলেন, হাত কেঁপে উঠ্‌লো একটা নিলুম, একটু হেসে বললে—কতদিন?...

লজ্জায় মাথা আমার নুয়ে পড়লো বললুম বছর দুই হবে এসেছি তারপরেই গান সুরু হোল, ধীরে ধীরে আমাকে তিনি বুকে টেনে নিলেন কি বলতে গেলুম—হঠাৎ দরজা খুলে গেল, মাথা আমার ঘুরে উঠ্‌লো, উঃ কি সে ভীষণ দৃষ্টি, কি ভয়ানক সে বোধ হয় জীবনে তা ভুলবো না,—হারমোনিয়ম ছেড়ে বাইরে এলুম, যে আমায় প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতো আজ তার মুখেই ঘৃণার রেখা ফুটে উঠ্‌ল বললে—ছিঃ নীহার, তুমি এ-ই! ...এই তোমার ভালবাসা, বেশ থাকো আমি চল্লুম।...

সিঁড়ির দিকে তিনি পা দিলেন, হাঁটু গেড়ে বসে তার পা চেপে ধরলুম বললুম এক্ষুণি উঠিয়ে দিচ্ছি তুমি যেয়ো না—বিশ্বাস করো—বজ্রের মত স্বরে সে বলে উঠ্‌লো—তোমায়? জীবনে নয়।...

পা জোর করে টেনে নিয়ে সে চলে গেল, উঃ কে জানতো সেই তার শেষ যাওয়া। কাণের মধ্যে এখনও যেন দিনরাত্রি ডেকে বলে—ওরে অভাগিণী, ওরে অবিশ্বাসিনী নিজের দোষে যে ভালবাসা হারিয়েছিস আর তা ফিরে পাবি নি! যে

প্রবঞ্চনা করছিস্ তার অনুতাপ তোকে আজীবন চোখের জলে ভাসাবে।

তারপর আরও একটা বছর কেটে গেল কত লোক আসে কত লোক যায় কিন্তু কৈ সে তো আর আসে না! কত দিন নীরব রাতে তার কথা মনে আসে বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ী মারে। কে যেন ভেতর থেকে কেঁদে বলে—ওগো এস আর একবার—শুধু একটি বার দেখা দিয়ে যাও!

...কিন্তু বৃথা সে আহ্বান, কেউ শোনে না। সারাদিন বুক জ্বলে যায় ঘরের চার পাশেই তার স্মৃতি। ওই ছবি, ওই আয়না, ওই বিছানা, সব-ই তো তার! এখনও সেজে গুজে রাস্তায় দাঁড়াতে হয় উপায় কি? আমি যে বেশ্যা। লোকে টাকা দেবে, আমি দোব রূপ দেহ আমার সব। যদি কোন দিন তার দেখা পাই সেই দিন ক্ষমা চাইব পায়ে ধরে আজ নয়, সে কবে, কবে গো?...

বায়স

[স্বর্গীয়া গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী]

তোমারই স্বরে জাগিয়া উঠিরে
প্রভাতের মুখ দেখি,
তুমি কর গান আন ভানুমান
একচক্র রথে লখি!
শুনে ওই গীত আঁখি মুকুলিত
—ফুটে ওঠে; আসে উষা;
উঁকি দিয়া দ্বারে জাগায় সবারে
দেব বালা অকলুষা,
জাগ্রত জগত জাগে মনোরথ
জাগে জীব কোলাহল

ছুটে আসে ধন্যা চেতনের বন্যা
কূল প্লাবী কল কল
আসে জাগরণ সজীব ভুবন
তোমার কাকলী রোলে
কিন্তু, সবে তোরে দেখিতে না পারে
অলক্ষণা পাখী বলে।
জুড়ি যুগ্ম কর নমি বিশেশ্বর
তব ডাকে জেগে উঠি;
স্বপ্ন সহচরী সাথে বিভাবরী
যায় চলে গুটি গুটি।

ময়না

[শ্রীমঞ্জরী দেবী]

দুপুর থেকেই নিবিড় মেঘে সমারোহ ক'রে বৃষ্টি নেমেছে। সন্ধ্যার মুখে বর্ষণের বেগ অনেকটা কমে গেলেও, তখনও টিপ টিপ করে পড়ছিল।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে ফুটপাথের ধারে একটা বছর দশেকের মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার দীপ্তিহীন পাণ্ডুর মুখখানি শ্রান্তিতে ঝরা মুকুলটীর মত শুকিয়ে উঠেছে; এক একবার ঠাণ্ডা বাদলার হাওয়া তার বুকের ভেতরটা অবধি কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল; আপনার ছিন্ন মলিন আঁচলের প্রান্ত দিয়ে সে তার জীর্ণ দেহটা যথাসাধ্য ঢাকতে চেষ্টা করছিল।

পথ দিয়ে এক সুবেশী ভদ্রলোক কাদা থেকে সন্তর্পণে আপনার কোঁচা আর পম্পসু বাঁচিয়ে চলছিলেন। মেয়েটার নজর সেই দিকে পড়তেই সে তাড়াতাড়ি তাঁর পিছনে বলতে বলতে চলল—"একটা পয়সা দাও বাবু—সারাদিন কিছু খাই নি—তোমার পায়ে পড়ি বাবু—"

ভদ্রলোক প্রথমে তার কথায় কর্ণপাত করেন নি; কিন্তু মেয়েটা তবুও তাঁর সঙ্গে বলতে বলতে চলল—"একটা পয়সা বাবু—"

অনেকটা দূর এগিয়ে যাবার পর ভদ্রলোকটী সহসা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন—"ভাগ্ বদমাস ছুঁড়ী—" হতাশায় মেয়েটার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। এতদূর ছুটে সে ক্লান্ত হয়ে হাঁফিয়ে পড়েছিল। আস্তে আস্তে সে আবার আগেকার জায়গায় ফিরে চলল।

কচি ছেলে কোলে করে আর একজন রোগা হতশ্রী মেয়ে এসে তাকে ডাকলে—"আয় ময়না—ঘরকে যাবি চল্—" ময়না ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বলল—"তুই যা'—আমি এখন যাব না।"

"কিছু পাস নি বুঝি আজকে?"

ময়না জবাব দিলে না। বড় মেয়েটী ছেলে নিয়ে চলে গেল।

সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে, কাদায় ঘুরেও ময়নার অদৃষ্টে একটীও পয়সা জোটে নি। অসহ্য ক্ষুধায় তার পেটের ভেতর যেন আগুন জ্বলছিল, সারাদিনের পরিশ্রমে দুর্ব্বল দেহটা ভেঙ্গে পড়ছিল, পা দুটো অবশ হয়ে আসছিল,—তবুও অন্ততঃ একটা পয়সার আশায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ময়না ভাবছিল—ঘরে তার রুগ্না মা পড়ে আছে, আজ একটীও পয়সা না পেলে তাকে কি খেতে দেবে? ময়নার বড় বড় চোখ দুটো ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ল।

এমনি সময় একখানা ট্রাম এসে মোড়ে থামতেই ময়না সেই দিকে ছুটল। ট্রামের পাশে হাত পেতে দাঁড়িয়ে সে মিনতি কাতর স্বরে বলতে লাগল—"পায়ে পড়ি বাবু—একটা পয়সা দাও বাবু—রাজা হবে বাবু—" একজন আরোহী তীব্র স্বরে বললেন—"না না—কিছু হবে না বাপু যা—" কিন্তু ময়না তবু চলন্ত ট্রামের সঙ্গে ছুটতে লাগল। পূর্ব্বের আরোহিটী এবার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—"আ মর্—ন্যাকামো করবার আর জায়গা পেলে না বেটী!"

হঠাৎ কাদায় পা পিছলে ময়না সজোরে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় একটা অস্ফুট কাতরোক্তি তার মুখ দিয়ে বেরুল—"উঃ—মাগো...'

কাদায় মাখামাখি হয়ে যখন সে উঠে দাঁড়াল, তার হাঁটু আর রগের খানিকটা কেটে গিয়ে তখন রক্ত ঝরছে। মাথাটা ঘুরছিল, ময়না আর চলতে পারল না, একটা রকের ওপর বসে পড়ল।

আজ আর কিছু পাবার সম্বন্ধে সে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। খানিকক্ষণ পরে ভিজে আঁচলটা নিংড়ে সে বাড়ীর পথে চলতে আরম্ভ করল।

* * * *

দুর্গন্ধময়, অপরিচ্ছন্ন একটা বস্তির মধ্যে একটা খোলার ঘরের দরজা ঠেলে ময়না ভেতরে ঢুকল। ঘরের এক কোণে

একটা কেরোসিনের ল্যাম্প স্তিমিত ভাবে জ্বলছিল ; জীর্ণ চালের ফুটো দিয়ে বর্ষার ধারা এসে মেজেটা কাদায় একেবারে স্যাঁতসেতে করে দিয়েছে।

একধারে একটা ছিন্ন মাদুরের উপরে একটী শীর্ণা কঙ্কাল-সার রমণী শুয়েছিল। তার বিবর্ণ, যন্ত্রণা-কাতর মুখে আসন্ন মৃত্যুর নিবিড় কালিমা ঘনিয়ে এসেছে। সে একবার ক্ষীণ স্বরে জিগ্যেস করল—"কে ময়না এলি ?"

ময়না আস্তে আস্তে তার মার শিয়রে বসল। তার মা বল্‌ল—এত দেরী হ'ল কেন রে—কোথায় জল কাদায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলি ?—কিছু পেয়েছিস্‌ আজকে ?"

মুহূর্ত্তে ময়নার মুখখানা মলিন হয়ে গেল, সে বল্‌ল—"না একটীও পয়সা কেউ দিলে না মা।"

"কিছু পাস নি ? তুই খাস নি তাহ'লে ?"

নিজের ক্ষুধার জ্বালা গোপন করে মৃদুস্বরে বল্‌লে—"খেয়েচি ; কিন্তু তার মা যে আজ অনাহারে কাটাবে—এই কথাটা তার প্রাণে বারবার তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধছিল। ব্যাকুল আগ্রহে সে জিগ্যের করল—"তুই আজ কি খাবি মা ? ক্যান্ত পিসীর কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে আনব ?"

একটু ম্লান হেসে তার মা বল্‌লে—"না রে না—আমার এখন ক্ষিধে নেই—তুই ঘুমো দিকি—"

সেই বিগত দিনের ছবিগুলো আজ তার মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল। অতীতের সেই স্মৃতিটুকু তার কাছে ফুলের সৌরভের মত মধুর লাগ্‌ল।—শান্তিস্নিগ্ধ সংসার, অম্লান জ্যোৎস্নার মত স্বামীর প্রেম—সবই তার একদিন ছিল, অন্তরেও তার যৌবন-বসন্তের রঙিন পরশ লেগেছিল। তারপর একদিন অস্ফুট পুষ্প কোরকের মত ময়না তার কোলে এল।

কিন্তু আজ ? তাদের সেই নিভৃত নীড় নির্ম্মম বিধাতার অভিশাপে চুরমার হয়ে গেছে। আজ সে পথের আবর্জ্জনা—রিক্তা, ভিখারিণী—একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে বেরিয়ে এল।

...সে তো আজ মরণ পথের যাত্রী—কিন্তু সে মরলে তার নিঃসহায় দুর্ভাগী ময়নার কি দুর্দ্দশা হবে ? ভাবতে ভাবতে তার শীর্ণ গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ল।

মাঝ রাতে ময়নার জাগরণ-ক্লিষ্ট চোখের পাতা দুটো তন্দ্রার পরশে বুজে এসেছিল, সহসা প্রবল কাশির শব্দে চমকে উঠে দেখে তার মার পাশে এক ঝলক টাটকা রক্ত পড়ে আছে। কি একটা বলবার ব্যর্থ চেষ্টায় খানিকক্ষণ ছটফট করে তার মার চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গেল—মরণাহত অধর একটা অব্যক্ত বেদনায় বিকৃত হয়ে গেল...

নিশীথ রাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা রাত-চরা পাখী তীব্র কর্কশ স্বরে ডেকে উড়ে গেল, ময়নার বুক শঙ্কায় কেঁপে উঠল।

মার নিস্পন্দ বুকটা জড়িয়ে ধরে, মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ময়না ডাকতে লাগল—"মা মাগো—কথা কচ্ছিস্‌ না কেন ?..."

বাঙ্‌লা-মায়ের কথা

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

আজি আষাঢ়ের সতেরো তারিখ,
পহেলা জুলাই!—হায় রে হায়,
সে নাই, সে নাই,— এ কথা স্মরিতে
কেবলি অশ্রু ঝরিয়া যায়!
হাজার হাজার নয়নে বরষা,
দুঃখ কাতর হাজার বুক;
সে ছিল যে রাজা হাজার হৃদয়ে,
সে দিল আনিয়া নূতন যুগ!—
সে যাবে কি ব'লে এমন সহসা,
এমন সময়, এমন দিন?—
ভাবিতে ভাবিতে আমারো আমারো,
সজল নয়ন বিরাম হীন!

সে নাহি?—মিথ্যা, মিথ্যা সে কথা!
সে আছে, সে আছে,—হায় রে হায়!—
লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত কণ্ঠ
সত্য কথাই কাঁদিয়া যায়!
হয়েছে স্মরণ, দেখেছি পাশ্ব
ফুলে ফুলে ঢাকা শয্যা কার।
বিপুল মানব প্রবাহ সেদিন
নিয়ে গেল, কিছু জানি না আর।
সেই কি সে? হায়, মুখখানি তার
দেখিতে পাই নি, কেবলি ফুল—
কেবলি ফুলের মাল্যগুচ্ছ;
হয়ত স্বপন, হয়ত ভুল!

হায় রে অভাগী, সেও চলে গেল,
নির্ভর তোর যে ছিল শেষ?
ঘুঁটেকুড়ুনিরে বলেছিল সেই
এনে দেবে তার রাণীর বেশ!
বলেছিল হায়, স্বর্ণ প্রাসাদে
সেই করে দেবে আমার ঠাঁই!
জগৎ সভায় মায়েরে বসায়ে
পুত্র আমার জগতে নাই?
জগতে নাই সে?— কে তবে আমার
রাখিবে লজ্জা, রাখিবে মান?
ওকি কলরোল কুটিরে কুটিরে?—
—লক্ষ লোকের শোকের গান!

আমারি ঘরে সে জন্ম লভিয়া
লভিল সুনাম ধরণীময়।
ত্রিভুবন জয়ী বৎস আমার,
আমারো কপালে এমন হয়!
সব্যসাচী সে পার্থ আমার,
রণ কুশলতা অতুল তার।
হরিশ্চন্দ্র, বুদ্ধ আমার—
আহা সে কি ত্যাগ চমৎকার!
আমারি শিবাজী, গ্যারিবাল্ড সে
প্রতাপ, তিলক, নেপোলিয়ন!
মা-জননী ঐ ভারত আমার—
দুঃখ আজিকে তাঁরো কি কম?
অভাগী বাঙ্‌লা, তোর মুখে চেয়ে
গুর্জ্জর-বীর কি করে আশ?
সব ধূলিসাৎ! সব ধূলিসাৎ!!
তুই ধূলি সনে মিশিয়া যাস্!

সে যদি থাকিত, তাহারি বদলে
লক্ষ তনয় হারাত মোর—
এমন করিয়া কুটিরে আমার
আসিত না নেমে আঁধার ঘোর!

এমন সমূলে কল্পনা মোর
উড়িয়া পুড়িয়া হ'ত না ছাই !
আর কে উঠাবে ? আর কে ছুটাবে ?
আবার, আবার ঘুমাতে যাই ।

ডেকোনা···ডেকোনা··· বৃথা, সব বৃথা—
চিনেছি সবারে, চিনেছি খুব !—
ভণ্ড তোমরা !— ভণ্ড নও ত,
খদ্দর কই ?···অম্‌নি চুপ !
এখনো পরণে অন্য বস্ত্র,
চলেনা চরকা, চলেনা তাঁত ;
এখনো হিংসা, এখনো স্বার্থ ?—
হায়রে আমার বাঙ্গালী জাত্‌ !
রোগে শোকে ভীরু, ক্ষুদ্র কলহে
শুভদিন তোরা করিস্‌ ক্ষয়—
এমনি করে কি চিত্ত আমার
চিত্ত তোদের করেছে জয় ?

তোরা কি যাবি রে তারি পথ চেয়ে
পবিত্র ক'রে হৃদয় মন ?—
ওরে আট কোটি ছেলেরা, মেয়েরা !!
তারি ভাই, তোরা তারি ত বোন্‌ ?
হোক্‌ বা না হোক্‌, প্রাণপণ করে
চেষ্টা না হয় করেই দেখ !—
আট কোটি যদি ব্যর্থ হয় ত'
সফল কি তবু হবে না এক ?

কেন বা হবে না ? হবেই হবে রে !—
না হয় না হ'ল, তবুও চল্‌ !
তোরা 'ক্রীতদাস,' তোরা 'অতিহীন,'—
আর কতদিন শুনিব বল্‌ ?

আজো যদি তোরা বিলাতী পরিস্‌,
বাঙালী হিন্দু মুসলমান !
তবে ভুলে যারে পহেলা জুলাই—
তবে ভুলে যারে শোকের গান !
ঐ দেখ সেই সৌম্য মুরতি
ধরেছে গগনে উজল দীপ ;
ঐ যে তোদেরি দেশের বন্ধু !—
চির-সুন্দর সত্য শিব !
আঁখি মুদে দেখ— সেথাও রয়েছে,
ঝলসি উঠেছে মানসপট !
চিতারেণু তার তীর্থ করেছে
ক্যাওড়াতলার তটিনীতট ।
আমার মনের গভীর বেদনা
কোন্‌ ছেলে মোর ভুলাতে চায় ?—
মনের কালিমা, দেহের বিলাস,
বিলায়ে দিক্‌ সে আমারি পায় ।
ওরে কবি দেখ,— কুটির দুয়ারে
হাজার ছেলে কি করেছে ভিড় ?
হয়ত রে তারা এসেছে, এসেছে—
মুছাতে মায়ের নয়ন-নীর !

—— ——

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]   ২রা শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩২।   [৩৬শ সপ্তাহ

লিওনার্ডা ডি ভিন্সি

পৃথিবীতে এমন এক একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন যাঁহাদের শক্তি ও ক্ষমতা, যাঁহাদের দৃষ্টি, আশা ও আকাঙ্খা শুধু এক দিকেই বদ্ধ থাকে না, সমস্ত জগত জুড়িয়া যাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র, জ্ঞান ভাণ্ডারের সকল বিভাগে যাঁহাদের অপ্রতিহত আধিপত্য ; এমনই একজন ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহের কথা তোমাদের আজ বলিতেছি। কম বেশী চারিশত বৎসর হইল লিওনার্ডা ডি ভিন্সী ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন, ইত্যবসরে দুর্জ্জয় কালের গহ্বরে তাঁহার কৃত যাহা কিছু কার্য্য সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কার্য্য না থাকিলেও তাঁহার স্মৃতি আছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার, দার্শনিক, কবি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও কার্য্য দেখিয়া জগত স্তম্ভিত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, গৌরব করিবার মত তাহার কোন বস্তুই আজ আমাদের নাই—সকলই কালের গহ্বরে লুপ্ত হইয়াছে। নাই থাকুক, তথাপি তাঁহার স্মৃতি আছে, সেই অসামান্য প্রতিভাবান পুরুষের কার্য্যাবলির যে ইতিহাস তাহা ত লোপ পাইবার নহে, তাঁহার শক্তির—তাঁহার মেধার পরিচয় এক কথায় দিতে হইলে বলিতে হয়—"অদ্ভুত!"

চিত্র প্রেমিক রাসকিন (Ruskin) দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, কলকারখানা লইয়াই লিওনার্ডা জীবনটাকে কাটাইয়াছেন, তাই তার রচিত ছবি একখানাও আজ আমাদের নাই। ইঞ্জিনিয়াররা দুঃখ করেন, এত বড় প্রতিভা কিনা শুধু ছবি আঁকিয়া সময় নষ্ট করিয়াছে, ততক্ষণ যন্ত্রপাতি কলকারখানার কত উন্নতিই না তিনি করিতে পারিতেন। ভাস্কর যিনি, তিনি দুঃখ করেন, লিওনার্ডা কেন পাথর ও পিতলের উপর খোদাই করিয়াই না সমস্ত জীবনটা কাটাইলেন। বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীত বিশারদ সবারই হিংসা হয় লিওনার্ডা কেন একা তাঁহাদেরই রহিলেন না। এমনিই ছিল তাঁহার অসামান্য সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা! চারুশিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ—অদ্ভুত—অপূর্ব্ব, এমনটি আর পৃথিবীতে বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

১৪৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে নাকি নবযুগ আরম্ভ হয়—

ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন। মধ্যযুগের আচার, পদ্ধতি, রীতি, নীতির পরিবর্ত্তন, কলকারখানা প্রভৃতি নানারূপ আবিষ্কারের প্রবর্ত্তন এই সময় হইতেই হয়। এই সন্ধিক্ষণেই লিওনার্ডোর জন্ম হইয়াছিল। লিওনার্ডো হইয়াছিলেন নব যুগের অগ্রদূত।

অতি শৈশবেই তাহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠশালায় তাঁহার অন্যান্য সহপাঠীরা ত তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্। যখন তাহারা খেলাধূলায় ব্যস্ত, তখন সেই অবসরে, তিনি গণিত ও সঙ্গীত বিদ্যাটা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে এণ্ড্রিয়ে ভেরোসিয়োর (Andrea Verrocchio) চিত্র-শিল্পাগারে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এখানে কিছুদিনেই মধ্যেই শিষ্য গুরুকে ছাপাইয়া উঠিলেন। ভেরোসিয়োরও বুঝিতে বাকি রহিল না, কতবড় প্রতিভাবান ব্যক্তিকেই না তিনি শিষ্যরূপে পাইয়াছেন। অতঃপর আর গুরুশিষ্যে ভেদ ছিল না, গুরুশিষ্য উভয়ে মিলিয়া একই ছবি আঁকিতেন! এমনই একখানি ছবি আজও আছে। লিওনার্ডের আঁকার এমনি বিশেষত্ব যে বিশেষজ্ঞরা সে ছবি দেখিলেই বলিয়া দিতে পারেন কোন অংশ লিওনার্ডোর আঁকা, কোন অংশই বা তাঁহার গুরুর আঁকা।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে কুড়ি বৎসর বয়সেই লিওনার্ডো গুরুর ধরা বাঁধা শিক্ষার হাত এড়াইয়া ফ্লোরেন্স নগরের একজন স্বাধীন শিল্পীরূপে পরিচিত হইলেন। এ বয়সে তাঁহার আঁকা ছবি, মূর্ত্তি, পরিকল্পনা বড় বড় শিল্পীদিগকেও অবাক্ করিয়া দিয়াছিল। নিপুণ ভাস্কর, প্রতিভাশালী চিত্রকররূপে তখনই সর্ব্বত্র তাঁহার আদর হইয়াছিল।

লিওনার্ডো কেবল যে শিল্পী ছিলেন তাহা নহে। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। বিজ্ঞানের নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়াও তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। বাস্তু শিল্পে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। বাঁশী বাজাইতে, গান গাহিতে ও রচনা করিতেও তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। একদিকে কবিতা ও কল্পনাচিত্র ও ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত ও বাদ্য—আবার অন্যদিকে দেখ—যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, লড়াই ও দুর্গ রক্ষার নিপুণতায়ও লিওনার্ডের তুলনা মিলে না!

চিত্রকরদের মধ্যে—কেহই লিওনার্ডের পূর্ব্বে, মানুষের মানসিক প্রবৃত্তিগুলির অভিব্যক্তি চিত্রে ফুটাইতে পারেন নাই। পাপ ও পুণ্যের চিত্র,—পাপী ও সাধু ব্যক্তির মানস চিত্র মুখে ফুটাইয়া তুলিবার শক্তি ছিল তাঁহার অসাধারণ। তাঁহার চিত্র ও মূর্ত্তিগুলির ইহাই একটা বিশেষত্ব। এজন্য তিনি—স্বভাবের ভিতর হইতেই আদর্শ খুঁজিয়া লইতেন।

একবার একটা মঠের একজন পুরোহিত তাঁহাকে মঠের কাজ করিবার ভার দেন। মঠের গায়ে চিত্র আঁকিবার ও মূর্ত্তি গড়িবার ভার পড়িল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—কাজ শেষ হয় না। পুরোহিত মহাশয় ত রাগিয়া অস্থির। তিনি একদিন লিওনার্ডাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি এভাবে কতকালে আমার কাজ শেষ করিবে?"

"কেন মহাশয়! আমি ত রোজ দু'ঘণ্টা করিয়া কাজ করি।"

"তবেই হইয়াছে আর কি, একশো বছরেও কাজ শেষ হইবে না দেখিতেছি।"

লিওনার্ডো হাসিয়া বলিলেন—"কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে, কেবল দু'টো মূর্ত্তির মাথা আঁকিতে বাকী রহিয়াছে।"

"বটে! মাথা আঁকিতে এতদিন লাগে?"

"জুদা আর ইস্কারিওতের মাথাটা হয় নি, দেখুন আমি আজ ক'মাস ধরিয়া ক্রমাগত দুষ্ট, চোর, বদমায়েসদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াও মনের মত আদর্শ পাইতেছি না। কিন্তু আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমার মনে হয় আপনার মুখের আদর্শে যদি মূর্ত্তি দু'টোর মুখ শেষ করিয়া ফেলি, তাহা হইলেই ঠিক্ হইবে।" পুরোহিত মহাশয়ের ত চক্ষু স্থির। তিনি আর একটী কথাও বলিলেন না!

লিওনার্ডো কথায় ও কাজে এক ছিলেন। তিনি ঐ মঠের পুরোহিতের মুখের আদর্শেই মূর্ত্তি দু'টির মুখ আঁকিয়া ফেলিলেন। চিত্রের সমজ্দার বড় বড় শিল্পীগণ বলেন যে লিওনার্ডের আঁকা ছবির মধ্যে এ দু'টির তুলনা মেলা ভার।

মাইকেল এঞ্জেলো—লিওনার্ডের অপেক্ষা বয়সে বিশ বৎসরের ছোট ছিলেন। লিওনার্ডের এঞ্জেলোর প্রতি একটা

বিদ্বেষ ছিল। অনেকবার ছু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলিয়াছে। মাইকেল এঞ্জেলোর খোদিত ডেভিডের মূর্ত্তি জগদ্বিখ্যাত। যে পাথরে এই বিরাট মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে, সে বিরাট মর্ম্মর প্রস্তর খণ্ড বহুকাল অমনি পড়িয়াছিল। অনেক ভাস্কর পাথর খানাকে খুঁদিয়া মূর্ত্তি গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই সফলকাম হ'ন নাই। ঐ পাথর খানা অযত্নে একশো বছর পড়িয়াছিল। দেশের শাসন কর্ত্তা লিওনার্ডো ও এঞ্জেলো এই ছু'জনকেই পাথরখানার দ্বারা একটী মূর্ত্তি গড়িতে অনুরোধ করিলেন। লিওনার্ডো বলিলেন—"এ পাথর দিয়া কাজ চলিবে না, পাথরখানাকে নানাভাবে খোদাই করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে—এ পাথর কোন কাজে লাগিবে না।"

তরুণ শিল্পী এঞ্জেলো পরম উৎসাহের সহিত কাজের ভার লইয়া ডেভিডের অমর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ফেলিলেন। এখানে এঞ্জেলোর কাছে লিওনার্ডোকে হার মানিতে হইল।

লিওনার্ডো এই তরুণ শিল্পীর উপর ভয়ানক চটিয়া গেলেন। আর একটী প্রতিযোগিতার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। ফ্লোরেন্সের ম্যাজিষ্ট্রেট সহরের সভা গৃহটি চিত্র ও মূর্ত্তিদ্বারা শোভন সজ্জায় সজ্জিত করিবার জন্য—এঞ্জেলো এবং লিওনার্ডো ছু'জনকেই আহ্বান করিলেন। পিসার যুদ্ধ—আঁকিবার বিষয় স্থির হইল। কক্ষটির অর্দ্ধেক আঁকিবার ভার পাইলেন লিওনার্ডো আর বাকী অর্দ্ধেকের ভার পড়িল এঞ্জেলোর উপর। লিওনার্ডো বুঝিলেন—এঞ্জেলো ডেভিডের মূর্ত্তি খোদিত করিয়া তাঁহাকে হারাইয়া দিয়াছে বটে, এইবার সে পরাজয়ের শোধ লইতে হইবে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিলেও বুঝি ছুই পক্ষ এমন সতর্ক হইয়া লড়াই করেন না। লিওনার্ডোর চিন্তা হইল—যেমন করিয়া পারি এঞ্জেলোকে হারাইতে হইবে। এঞ্জেলো ভাবিলেন, বুড়োকে এবারও হারাইয়া দিব।"

ছুইজনে ছুইটী বিষয় লইয়া আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। এঞ্জেলো মানুষের দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে আঁকিবার জন্য—জলের মধ্যে সৈন্যগণের উলঙ্গমূর্ত্তি আঁকিলেন। লিওনার্ডো—আঁকিলেন—ফ্লোরেন্সের সৈনিকেরা অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসৈন্য হটাইয়া দিতেছে। লিওনার্ডোর অঙ্কিত সৈনিকের মুখে যে সাহস, দৃঢ়তা ও নির্ভীকভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা অতুলনীয়। ছুই বৎসরকাল লিওনার্ডো বেশ পরিশ্রমের সহিত ছবি আঁকিলেন কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন তিনি এক মহা ভুল করিয়া বসিয়াছেন, তিনি যে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকা চলিতে পারে না, কাজেই তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইল—এঞ্জেলো তাঁহার কাজ শেষ করিলেন।

লিওনার্ডোর অঙ্কিত চিত্র মধ্যে জগদ্বিখ্যাত চিত্র হইতেছে 'মোনা লিসা।' ফ্লোরেন্সের—'ফ্রেন্সেসকো গিওকোন্ডোর তৃতীয় স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি। এ চিত্র পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব চিত্র—সর্ব্বজন প্রশংসিত ও সর্ব্বজন সমাদৃত। এই ছবি দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি শত শত বর্ষকাল ক্রমাগত ফরাসীর রাজধানী প্যারি নগরে আসিয়াছিলেন। চিত্রকর মোনালিসার এ ছবিখানা আঁকিতে চারি বৎসরকাল অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। যে হাসিটুকু চিত্রিত ছবির মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ফুটাইবার জন্য—ছবি আঁকিবার সময় মোনালিসার মনে যাহাতে কোনরূপ অপ্রফুল্লভাব না আসে সে জন্য একজন লোক ঐ সময়ে অনবরত বাঁশী বাজাইতেন কিংবা গান করিতেন। এইরূপ ধৈর্য্য ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত লিওনার্ডো এই ছবি আঁকিয়াছিলেন। চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত এই ছবিখানা পৃথিবীর সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যুগে যুগে বংশপরাম্পরাগতভাবে এই ছবি দেখিয়া জগৎবাসী শিল্পীর অপূর্ব্ব নিপুণতার বিজয় সঙ্গীত গাহিতেছে।

ফরাসী দেশের রাজার নিমন্ত্রণে লিওনার্ডো সেখানে একটী অট্টালিকার চিত্র আঁকিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইল না—১৫১৯ খৃঃ অঃ ২রা মে তারিখে সেখানেই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর মৃত্যু হইল।

লিওনার্ডো একাধারে সব ছিলেন; কবি, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ, বাস্তুকলাবিদ্, কারিগর এবং সাহিত্য রসিক। শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ লইয়া এখনও গ্রন্থ রচিত হইতেছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিত্রের আদর্শের মূলে যে তাঁহার অমর প্রতিভা এখনও নদীর স্রোতধারার ন্যায় চারি শতাব্দীর মধ্যে সমভাবে প্রবহমানা—তাহা কাহারও সাধ্য নাই যে অস্বীকার করিতে পারে!
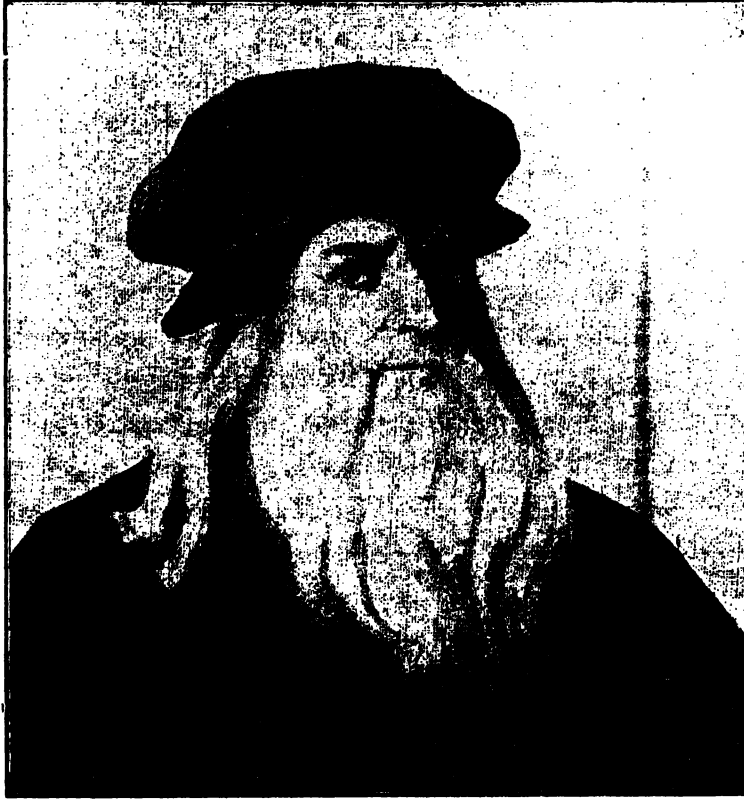
লিওনার্ডো

—লিওনার্ডো—

লিওনার্ডো ডি ভিন্সি ছিলেন একজন বিখ্যাত শিল্পী। ছবি আঁকিতে, মূর্ত্তি গড়িতে সব বিষয়েই ছিল তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য। লিওনার্ডোর চেহারার ভিতর হইতে একটা প্রতিভার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার চোখে কেমন দীপ্তি, উন্নতনাসা, ও ললাটের কুঞ্চিত রেখার ভিতর—দৃঢ়তার ও ধৈর্য্যের ছবি কেমন প্রস্ফুট রহিয়াছে। একদিকে যেমন—কলা-লক্ষ্মীর দিকে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ও অনুরাগের চিহ্ন তাহার প্রতিমূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমনি আবার একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—তাঁহার চরিত্রের ভিতর চঞ্চলতাও বিদ্যমান ছিল।

মোনালিসা

—লিওনার্ডা—

লিওনার্ডোর আঁকা চিত্রগুলির মধ্যে—মোনালিসার চিত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মোনালিসা—একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতিমূর্ত্তি। চারি বৎসর অসাধারণ পরিশ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে তিনি এই ছবিটি আঁকিয়াছিলেন। শত শত বৎসর পর্য্যন্ত চিত্রিত মুখের ঐ ভুবন ভুলান হাসিটুক দেখিবার জন্ত দেশ বিদেশের লোকেরা তীর্থযাত্রীর ন্যায় আসিত। কত কবি, চিত্রকর, ও নাট্যকার তাহাদের রচিত কবিতায়, চিত্রে ও নাটকে ইহার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই চিত্রখানি চারবার অপহৃত হইয়াছিল—চিত্রিত মুখের নয়নের অই শান্ত দৃষ্টি, অই মধুর ভুবন ভুলান হাসিটুকু—কতজনকে কারাগারের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়াও অপহরণ করিবার জন্ত প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

যীশুর মূর্ত্তি

—লিওনার্ডো—

লিওনার্ডোর অঙ্কিত যীশুর এই প্রতিমূর্ত্তিখানি অতুলনীয়। পাঁচ শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে তবু যীশুর এই প্রতিমূর্ত্তিখানি বিশ্ববাসীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভক্তি ও সেবার ভাব জাগাইয়া দিতেছে। ইতালীর অন্তঃর্গত মিলান নগরের ব্রেরা প্রাসাদে এইখানি রক্ষিত আছে। যীশুর অযত্ন বিন্যস্ত দীর্ঘ কেশ স্কন্ধে ও বাহুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রশান্ত ললাট, উন্নত নাসা ও ঠোঁট দু'খানির মাঝখানে বিমল হাসির রেখা আধ ফোঁটা ফুলের মত অর্দ্ধ বিকশিত। সংসারের দুঃখ দৈন্য, হাহাকার ও পাপীর মর্ম্মভেদী যাতনা দূর করিবার জন্য ত্যাগের এক মহান্ আদর্শ—বিদ্যমান। ধৈর্য্য, সেবা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি সদ্‌গুণরাজি জীবন্তভাবে যীশুর এই মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত। এ মূর্ত্তি-এ মুখ-পৃথিবীর নহে—স্বর্গের।

যোদ্ধার প্রতিকৃতি

—লিওনার্ডা—

এই চিত্রখানিও লিওনার্ডার অঙ্কিত। যোদ্ধার জীবন বৈচিত্র ময়। যোদ্ধার জীবনে—ধৈর্য্য, সাহসিকতা, আশা ও নিরাশার বিচিত্র দোলাদুলি, বিজয়ের গৌরবানন্দ—মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতর আহত সৈনিকের করুণ আর্ত্তনাদের সম্মুখে নির্ভীকভাবে—অশ্বপৃষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শত্রুকে আক্রমণের জন্য ব্যাকুলভাবে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। লিওনার্ডার চিত্রিত এই মুখখানির ভিতরে—যোদ্ধ, জীবনের ঐসব ভাবগুলি পরিস্ফুট—অই মুখখানি, অই চক্ষু হইতে যেন যোদ্ধার বিচিত্র বাণী নির্গত হইতেছে—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে থাকা পিছে—মরে থাকা মিছে
—আগে চল্, আগে চল্ ভাই।"

ঋণী

(গল্প)

[শ্রীশরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

সেদিন হেমলতা বাড়ীর রোয়াকে ব'সে পৈতার সুতা কাটছিলেন, এমন সময় চাটুয্যে পাড়ার নরেশের মা ক্ষেমঙ্করী সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রতে ক'রতে বল্‌লেন—"মেজ বৌ বাড়ী আছিস ?"

"কে, বড়দি ? এস ভেতরে এস।"

হেমলতা একখানা কুশাসন এনে সেইখানেই পেতে দিলেন। ক্ষেমঙ্করী উপবিষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন,—"কত পৈতে কাটলি রে বৌ ? আমি ত আর পারি না। চোখে ছাই আর তেমন যুতও নেই।"

"আমারও তাই দিদি। কল্পনা যা' সময়ে অসময়ে একটু আধটু কাটে। আজ কোন কাজ না পেয়ে কাট্‌নাটা নিয়ে সবে ব'সেছি।"

"কল্পনার বিয়ের কি হ'ল মেজ বৌ ?"

আর দিদি সে কথা কেন বল ? চেষ্টার ত' বাকী কিছু হ'চ্ছে না। বিয়ের ফুল না ফুট্‌লে কি আর করব বল না ?"

"আর কবে ফুট্‌বে ? বয়েস ত নেহাত মন্দ হয় নি ? আমরা ত' ও বয়সে ছেলেপুলের মা হ'য়ে পুরদস্তুর সংসারী হ'য়ে পড়েছিলুম।"

"আর সেদিন নেই দিদি,—আমাদের সময় এত টাকারও খাঁকৃতি ছিল না ;—আর রূপসীরও খোঁজ হ'ত না।"

"কল্পনার বয়স কত হ'ল মেজ বৌ ?"

"এই ভাদ্দরে তেরোয় পেরিয়ে চোদ্দয় পড়েছে।"

"বলিস কি মেজ বৌ, চোদ্দবছর বয়েস !"

ক্ষেমঙ্করী গালে হাত দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে হেমলতা বল্‌লেন,—"তা দিদি, কি ক'রব বল ? আমাদের ত' আর তেমন আয় নেই,—যা ওই মাইনের ওপর ভরসা ? আর যা দু' এক কাঠা জমী-জিরেত আছে, তা কোন মাসে খাজনা আদায় হ'ল কোন মাসে বা একদমই হ'ল না,—অবস্থা ত' এই। আমাদের ত সবদিক বজায় রেখে এরই মধ্যে গুছিয়ে করতে হ'বে।"

"না ভাই তোরা যে কি ক'রে চুপ ক'রে বসে আছিস তাই আমি কেবল ভাবি। আচ্ছা, ঠাকুরপো কি কোথাও পাত্র ঠিক করেছে ?"

"চেষ্টা ত' ক'রছেন দিদি, কিন্তু প্রজাপতি কৈ মুখ তুলে চাইছেন ?"

"এই ত' বাড়ুজ্যে, মুখুজ্যে পাড়া ক'রে আট দশটা মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল, আর তোদেরটা যে কেন প'ড়ে থাকে তা বলতে পারি না বাপু। ঠাকুরপোকে একটু চেষ্টা করতে বলিস। নইলে পাড়ার হরিশ মুখুয্যেকে চিনিস ত ? এখুনি একঘরে ক'রে দেবে।"

হেমলতা এ কথাটায় বেশ একটু মর্ম্মাহত হয়েছিলেন। তিনি রাগটাকে একটু সামলে নিয়ে বল্‌লেন,—"তাতে আমরা বড় ভয় করি না দিদি। একটা মেয়ে, আর যে হবে এমন আশাও দেখি না। পাড়ার লোকের যদি এত দরদ্ বেজে থাকে, তা হ'লে তাঁরা পাঁচজনে মিলে কল্পনার বিয়েটা দিয়ে দিন্ না।"

ক্ষেমঙ্করী তাড়াতাড়ি হেমলতার মুখটা নিজের হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বল্‌লেন,—"চুপ্, চুপ্, মেজ বৌ। আমার কাছে আজ যা বল্‌লি বল্‌লি, আর কারুর কাছে যেন বলিস্ নি। তা হ'লে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হ'য়ে যাবে।"

"তুমি ব'লে তাই ত বললুম। আমাদের সময়ে অসময়ে পাঁচ কথা বল ব'লেই ত' তোমাকে সব বলি।"

"মা।" কল্পনা কতকগুলা পান একটা চুবড়ী ক'রে ধুয়ে এনে রোয়াকের ওপর দাঁড়াল। ক্ষেমঙ্করীকে দেখে সে তাঁর

কাছে এসে বল্‌লে,—"এই যে জেঠাইমা—অনেক দিন পরে যে? কেমন আছেন?"

"আর মা বুড়ি হ'য়েছি, নরেশকে রেখে মরতে পারলে বাঁচি।"

"নরেশদা কেমন আছেন?"

"ভাল।"

"আর বৌদি?"

"কেন বলিস মা আজকালকার বৌদের কথা। সে তোকে যে যাবার কথা ব'লে দিয়েছে। তুই গেলে আমার একটু মহাভারত শোনা হয় আর সেও একটু সঙ্গি পেয়ে তাজা হ'য়ে নেয়। তা তুই ত' আর আসা যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিস মা।"

অতীতের একটা কি যবনিকার বিদ্রুপ ছাওয়ায় কল্পনার গোটা মুখটা লজ্জায় নুইয়ে দিলে। প্রত্যুত্তরে হেমলতা তাঁকে বল্‌লেন—"কেমন ক'রে যাবে বল বড়দি? পাড়ার বুড়ি থেকে সেদিনকার ছুঁড়ীগুল পর্য্যন্ত ওকে দেখলেই গা টেপাটেপি হাসাহাসি করে—ও যেন একটা অপরূপ। তাই ওকে আমি যেতে বারণ করেছি।"

ক্ষেমঙ্করীর মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা উঠেই আবার মিশিয়ে গেল। তিনি বল্‌লেন,—পাঁচ জনের মুখ কি আর হাত চাপা দিয়ে রাখা যায় মেজ বৌ?"

"সেই জন্যেই ত' ওকে বেরুতে মানা ক'রেছি।

কল্পনার লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। তারই জন্যে ত আজ এ অভিনয়। মাতা পিতা সকলের কাছে আজ সে লজ্জিত ও সর্ব্বদা শশঙ্কিত। হেমলতা মেয়েকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন,—"তোর জেঠাইমাকে গোটা কতক পান এনে দে কল্পনা।"

"আজ যে একাদশী মেজ বৌ।"

কল্পনা এ কথায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে বল্‌লে,—"জেঠাইমা যখন এসেছেন তখন না হয় একটু মহাভারত শুনে ওবেলায় বাড়ী যাবেন? বইটা আনব?"

"না থাক মা। নরেশের আসবার সময় হ'ল। বৌমা একলা বাড়ীতে আছে। খাবার দাবার তৈরি করতে হবে।"

"আপনি কেন আর কষ্ট করবেন জেঠাইমা। আজ আবার তায় একাদশী।"

"আজ কালকার বৌদের মান অভিমান কত। তারা কি হেঁসেলের ধারে যেতে পারে? সোণার অঙ্গ পুড়ে যে কালি হ'য়ে যাবে।"

কল্পনা মনে মনে ভাবলে যে স্ত্রীলোক ততদিন সকলের কাছে সুখ্যাতি পায়, যতদিন না সে শাশুড়ী হ'য়ে বৌদের ওপর তার আধিপত্য চালায়।

"উঠি মেজ বৌ। আর একদিন অবসর পেলে নয় আসা যাবে।"

ক্ষেমঙ্করী আস্তে আস্তে উঠে চ'লে গেলেন। কল্পনা তাঁকে দোরগোড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে মায়ের হাত থেকে কাট্‌নাটা নিয়ে নিজেই সূতা কাটতে বসে গেল। হেমলতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলেন।

তখন সূর্য্যদেব কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে দুনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার ইচ্ছায় পশ্চিম আকাশে একটু একটু ক'রে ঢলে পড়ছিলেন।

(২)

অনেক চেষ্টা করেও যখন পরেশবাবু কল্পনার বিয়ের কোন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না তখন তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আফিসত্তে কাজের অবধি নেই, তায় আবার বিয়ের চিন্তা। চিতা যেমন অসাড় প্রাণহীন দেহটাকে খেয়ে ফেলে তেমনি আজ শত শত চিন্তা পরেশ বাবুর রক্ত মাংসে গড়া দেহটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিচ্ছিল। ভাবনা শুধুই কেবল কল্পনার বিয়ে! বিয়ে!! বিয়ে!!!

সেদিন রবিবার। নিদ্রার পর পরেশবাবু বাইরের আটচালায় শুয়ে একখানা বই পড়ছিলেন। এমন সময় আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হরিশ চাটুয্যে এক হাতে একটা তল্‌তী বাঁশের লাঠীর ওপর ভর দিয়ে আর এক হাতে ডাবা হুঁকায় তামাক টান্‌তে টান্‌তে এসে সেইখানেই থেমে পড়লেন। তারপর আটচালার দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—"কে পরেশ না কি হে?"

পরেশবাবু বই থেকে মুখ তুলতেই সামনেই হরিশ চাটুয্যেকে দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সসম্ভ্রমে বল্লেন,—"আসুন আসুন। আজ হঠাৎ যে এদিকে আগমন হ'ল ?"

"রবিবার ছাড়া ত আর তোমার দেখা পাওয়া যায় না।"

"তা কি করি বলুন, চাকরী যে আমার একমাত্র সম্বল।"

হরিশ চাটুয্যে কলিকা শুদ্ধ হুঁকাটি নামিয়ে রাখলেন। কলিকা শূন্য দেখে পরেশবাবু ডাকলেন,—"কল্পনা।"

বাপের ডাকে কল্পনা ছুটে আসছিল, হঠাৎ হরিশ চাটুয্যেকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। পরেশবাবু বল্লেন,—"একটু তামাক সেজে আন ত মা।"

কল্পনা ফিরে এসে কল্কেটা আস্তে আস্তে রেখে দিয়ে আবার চলে গেল। হরিশ চাটুর্য্যে হুঁকার উপর কলিকাটি চাড়িয়ে ফুঁ দিতে দিতে বল্লেন,—"পরেশ আমায়, একদিন একটা কথা বলেছিলে তা তোমার মনে আছে ?"

পরেশবাবু একটু ইতঃস্তত ক'রে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বল্লেন,—ঠিক মনে হচ্ছে না ত'।"

"একটা পাত্রের কথা—।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তা আর মনে নেই।"

"আমি সেই জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।"

"তা কোথাও কিছু ঠিক করেছেন কি ?"

পরেশবাবু উদ্গ্রীব হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

হরিশ চাটুয্যে বল্লেন,—"হ্যাঁ ঠিক একরকম করেছি বটে তবে তোমার মতটা জানতে পারলে শুভকার্য্যটা হ'য়ে যায়।"

"কোথায় ঠিক ক'রলেন ?"

"ও পাড়ার ক্ষেন্তিকে চেন ?"

"হ্যাঁ, খুবই চিনি।"

"তার ছেলে হেমেনকে—।"

"সে ত নিষ্কর্ম্মা। রোজগার করবার কোন শক্তি নেই।"

"তা নেই বটে। তবে তার যে জমী জমা আছে তাই যথেষ্ট।"

"শাউড়ী কি ভাল হবে ?"

"সেটা তোমার মেয়ের বরাত ভায়া।"

"আর হেমেনের একজন বিধবা ভগ্নীত তাদের বাড়ীতে আছেন না ?"

"হ্যাঁ তা ত' আছে।

"ওখানে কি মেয়ের বিয়ে দেওয়া সুবিধা হবে ?"

"যে বিনা পয়সায় মেয়ের বিয়ে সারতে চায় —।"

পরেশ বাবু বাঁধা দিয়ে বল্লেন,—"আমি পাঁচ ছ'শ টাকা খরচ ক'রব।"

"মোটে পাঁচ ছ'শ ? আমি মনে করেছিলাম হাজার দুই !"

"না সে ক্ষমতা আমার নেই।"

"তা হলে আর আমি একথায় থাকতে চাই না ! হাজার দুই না হ'লে কল্পনার বিয়ে সেখানে সম্ভব নয়। তা হ'লে ভাই তুমি অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ।"

এই ব'লে চাটুয্যে মশাই ধীরে ধীরে আটচালা থেকে পথে এসে দাঁড়ালেন। পরেশবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার বইটার ওপর চোখ রাখলেন। হেমলতা এতক্ষণ ভিতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবসর খুঁজছিলেন। চাটুয্যে মশাইকে চলে যেতে দেখে তিনি সেখানে এসে বল্লেন—"কি হ'ল গো ?"

তখন চিন্তার একটা ক্ষীণ আলোকের ছায়া তাঁর মুখের ওপর আধিপত্য করছিল। তিনি বইটা নামিয়ে রেখে বল্লে, হেমেনের সঙ্গে কল্পনার বিয়ের জন্যে এসেছিলেন।"

"তুমি কি মত দিলে না কি ?'

"না তা আমি দিতে পারলুম না।"

আশার আলোকে হেমলতার সারা দেহটিতে একটা স্পন্দন এনে দিয়েছিল। একটা নিশ্বাসের সঙ্গে তিনি যেমনই এসেছিলেন তেমনই নীরবে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগ্ল। মাতাপিতার ভাবনার ত' আর অবধি নেই। যত দিন যায় ততই তাঁরা আশা থেকে বঞ্চিত হ'তে থাকেন। এত চেষ্টা ক'রলেন কিন্তু ভগবান তবুও বিরূপ। একদিন স্বামী স্ত্রীতে রাতভোর পরামর্শ ক'রে হরিশ চাটুয্যেকে ডেকে হেমেনের সঙ্গে বিয়েতেই মত দিলেন। হরিশ চাটুয্যে তামাক টানতে

টানতে হেসে বল্‌লেন—"তখনই ব'লছিলুম ভায়া অমন জামাই পাবে না।"

পরদিন উভয় পক্ষে আশীর্ব্বাদ করে দেনা পাওনা ও দিন স্থির হ'য়ে গেল।

টাকাকড়ি সবই একরকম যোগাড় হ'য়ে গেছে—গয়নাপত্র তাও তৈরি যা দু একখানা এখনও সেকরার দোকানেতে পড়ে আছে। পরেশবাবু ও হেমলতা আজ অনেক দিন বাদে একটু শান্তিতে ঘুমোচ্ছিলেন।

সকালে উঠে বড় ঘরটাতে ঢুকতেই হেমলতার বুকটা ছ্যাং ক'রে উঠল। একি! সিন্দুক ভাঙ্গা কেন! তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে পরেশবাবুকে ডেকে নিয়ে গেলেন। ব্যাপার দেখে তাঁদের দুজনেরই মাথা ঘুরতে লাগল। এখন উপায়! রাত্রে বিয়ে কি ক'রে কি ক'রবেন। সবই ত' চুরি হ'য়ে গেছে—সম্বলমাত্র গৃহিনীর গায়ে বাকি গহনা কটা; আর সবই প্রায় সেকরার দোকানে পড়ে আছে। হেমলতার গহনা কয়খানা নিয়ে তিনি কোন গতিকে কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে আনলেন। কোন গতিকে সবদিক বজায় রেখে তাঁর যেন কিছু হয়নি এইটেই বাইরে দেখাতে লাগ্‌লেন।

ক্রমেই সন্ধ্যা হ'য়ে এল। আড়ম্বর বেশি কিছু না থাকলেও বাড়ীটাতে ছোট ছোট পাড়ার ছেলেদের কলরবে গম্ গম্ ক'রছিল। যথাসময়ে বরযাত্রি সমেত বর এসে হাজির হ'লেন। কাজ আর কিছু বাকি রইল না।

হরিশ চাটুয্যে আসরে পরেশবাবুকে ডেকে বল্‌লেন—"যা ক'রে দিলুম ভায়া—একেবারে রাজ জোটক!"

পরেশবাবু কৃতাঞ্জলি পুটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রলেন।

(৩)

জোরক'রে বাসন রাখবার একটা শব্দে হেমলতা রোয়াকে বেরিয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন,—"কিরে রমার মা, হঠাৎ চলে এলি যে?"

"গায়ের জ্বালায়।"

"কেন কি হ'য়েছে?"

"এত যায়গা থাকতে অমন মেয়েটাকে কিনা জলে ফেলে দিলে।"

"কি বল্‌ছিস রমার মা?"

"বুঝবে, দুদিন যাক আগে।"

"এ আবার তোর কি হ'ল?"

"বাবা ঢের ঢের শাউড়ী ননদ দেখেছি কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখিনি।"

"ব্যাপারটা কি খুলেই বল না রমার মা?"

"ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু। যদি টাকাকড়ি গয়নাপত্র না দিতে পারবে তবে মেয়ের বিয়ে ওখানে দিতে গিছলে কেন বলদিকিনি? গঞ্জনায় মেয়েটা কেঁদে কেঁদে চোকমুখ একেবারে ফুলিয়ে ফেলেছে। আবার বলে কিনা যারা পয়সা দিতে পারে না তারা আবার কোন সাহসে মেয়ের সঙ্গে ঝি পাঠায়। নূতন বৌ, কোথায় একটু আদর যত্ন কর্—তা নয়, এর মধ্যে সংসারের কাজ করতে লাগিয়েছে। বলে কিনা গরীবের মেয়ে ব'সে থাকলে বাতে ধ'রবে। মুখে আগুন—মুখে আগুন।"

রমার মা এতগুল কং। ব'লে হাঁপাচ্ছিল। হেমলতা পাশে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিলেন। এরকম যে একটা কিছু হবে তা তিনি চুরি যাবার পর থেকেই ভেবে ঠিক করে ছিলেন। সবই ত' যোগার হ'য়েছিল কিন্তু—। তিনি একটু চুপ্ করে থেকে বল্‌লেন,—খাটুক তাতে দুঃখ নেই রমার মা। কল্পনা আমার কাজ ছাড়া কখন থাকে না।"

"তা হ'ক মেজ গিন্নী। আমি ত' এই পাঁচটা দিন ছিলুম। এরি মধ্যে কল্পনাকে বাসন মাজতে, ঘর নিকুতে, ঝাঁড় দিতে, এমন কি কোদাল হাতে বাগানে যেতে পর্য্যন্ত দেখেছি। বলে কি না যে টাকাটা তোমরা দিতে পারনি তা তারা তোমার মেয়েকে খাটিয়ে তুলে নেবে।"

রমার মা আপনার মনে গজ্ গজ্ করতে লাগল।

হেমলতা যে কি উত্তর দেবেন কিছুই ঠিক করতে পারলে না। তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল! তিনি বললেন,—"রমার মা তুই চলে এলি কেন?"

"না খেয়ে খেয়ে কদ্দিন থাকব বল না। একবার খোঁজও নেয় না গা। অবাক করলে যে!"

"কল্পনা কিছু বলে দিয়েছে?"

"কে বাবা তার সঙ্গে কথা কয়ে নিজের মাথাটা দিতে

যাবে ? যে রায় বাগিনী চব্বিশঘণ্টা তার সঙ্গে ফিরছে ! একটু অবকাশ পেয়ে আমি থালাখানা নিয়ে দে ছুট। পথে দুপয়সার মুড়ি কিনে খেয়ে আসছি ।"

হেমলতা নীরবে দুফোটা অশ্রু বিসর্জ্জন করলেন। তারপর রমার মাকে কিছু খেতে দিলেন। পথশ্রান্ত রমার মা সেগুলি খেয়ে নিজে আচল খানি রোয়াকে বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরেশবাবু বাড়ী এলে হেমলতা তাঁকে সবই খুলে বল্লেন। রমার মার মুখেও তিনি কতক কতক শুনলেন। কি করবেন আর ত উপায় নেই—এ বিষ যে নিজের হাতে ক'রে দেওয়া !

গৃহিনীর তাড়নায় সত্যি সত্যি পরেশবাবু একদিন কল্পনার শশুর বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। হেমেন তখন বাইরে বসেছিল। শশুরের পায়ের ধূলো নিয়ে বাড়ীর ভেতরে এ সংবাদটা দিয়ে এল। একটা কিসের অস্পষ্ট গোলমাল ঘরে শোনা গেল।

একটু পরেই দু'জন স্ত্রীলোক সেখানে এলেন। পরেশ বাবু তাঁদের একজনকে নমস্কার ক'রে পুনরায় নিজের যায়গায় এসে বসলেন। হেমেনের বোন নীরবতা ভঙ্গ করে বল্‌লে,—"তা যাই হ'ক খুব ফাঁকিটা দিলেন।"

এই অযাচিত প্রশ্ন পরেশবাবু একেবারে আশা করেন নি। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা গুরুতর হ'য়ে অনেকদুর গড়িয়েছে। হেমেনের বোন বল্‌লে, "দাদার বিয়ের সময় যা যা দোবার কথা হ'য়েছিল তা কি দিয়েছেন ?"

পরেশবাবু নিজের চুলের মধ্যে আঙ্গুলগুলা আস্তে আস্তে চালনা করতে করতে বল্‌লেন,—"সবই ত করেছিলুম, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে—।"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়ে হেমেনের বোন তীব্রস্বরে বল্‌লে,—"ওসব আমরা শুনতে চাই না। আমরা একটা সাফ জবাব চাই, কবে আপনি আমাদের পাওনা গণ্ডাটা দিয়ে দেবেন ?"

"একটু সময় না দিলে হবে কি করে। আমার অবস্থা জানতে ত আর আপনাদের বাকি নেই।"

"তা জানি, কিন্তু আপনি বড়মানুসি চাল চালতে ছাড়েন না ত'। মেয়ের সঙ্গে যে ঝি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে সঙ্গে ভাতের ব্যবস্থাটা করে দিয়েছিলেন কি ?"

পরেশবাবু নির্ব্বাক। হেমেনের বোন ব'লে যেতে লাগল—"বেশ তাই হবে, কিন্তু এক মাসের মধ্যে যদি সব না দিতে পারেন তা হ'লে মনে থাকে যেন আপনাকে মেয়ের মায়া পরিত্যাগ করতে হবে।"

দু'জনেই চলে গেলেন। পরেশ বাবুর মনে হ'ল যদি এর আগে ভগবান তাঁকে মরণের দোরে হাজির করতেন তা হ'লেও তাঁর শান্তি ছিল। কল্পনা যে তাঁর বড় আদরের ! কখনও তাকে কেউ একটা কড়া কথা বল্‌তে সাহস করে নি, আর আজ তার এই অবস্থা ! পরেশ বাবুর আজ অনেক কথাই মনে পড়ল। আরো দু' তিন ঘণ্টা এরকম ভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ একটা ছায়া পড়াতে তিনি মনে করলেন বুঝি কল্পনা আসছে। চোখ তুলে চাইতেই দেখলেন বেয়ান ঠাকুরাণী। দুঃখে অপমানে তাঁর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এল। তিনি হঠাৎ উঠে বেয়ান ঠাকুরাণীর দুটো পায় ধরে বল্‌লেন,—"আমার কল্পনা !"

উত্তর আর তাঁর দেওয়া হ'ল না। ঘরের ভেতর থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে হেমেনের বোন বলে উঠল,—"মনে করুন না সে নেই।"

"একবারটি যদি দেখতে দেন।"

"সে অধিকার আপনি হারিয়েছেন।"

এইবার পরেশ বাবুর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে হেমেনের মায়ের পায়ের ওপর পড়ল। পরেশবাবু পুনরায় বল্‌লেন,—"বেশ, কল্পনাকে না দেখান তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। তবে আমার আর একটা অনুরোধ, দয়া করে যদি একটিবার ক্ষণেকের তরে হেমেনকে পাঠিয়ে দেন।"

"দাদা বাড়ীতে নেই।" এই বলে হেমেনের বোন তার মায়ের হাত ধরে প্রায় একরকম হিড় হিড় ক'রে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল। একটা শব্দ হওয়াতে পরেশবাবু চেয়ে দেখলেন ভিতরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। তবুও অনেকক্ষণ তিনি এইভাবে ব'সে রইলেন। তারপর আর কোন আশা নেই দেখে আস্তে আস্তে বাটীর বাহিরে এসে দাঁড়ালেন।

বাটীতে এসে যখন পৌছিলেন তখন সন্ধ্যার ম্লান আলো প্রাচীরের গায়ে লেগে রয়েছে। ভেতরে ঢুকতেই হেমলতা

স্বামীর মুখ দেখে একেবারে চম্‌কে উঠলেন। উৎকণ্ঠার স্বরে বল্‌লেন,—"তোমার কি কোন অসুখ করেছে না কি!"

পরেশবাবু ক্লান্তদেহে মেঝের ওপর বসে পড়ে বল্‌লেন,—"মেজ বৌ, আজ আমি সত্যি সত্যি ঋণের দায়ে মায়া, মমতা, এমন কি মেয়ের ওপর পিতার অধিকার পর্য্যন্ত হারিয়ে এসেছি।"

হেমলতার মুখ দিয়ে একটা কথা পর্য্যন্ত বেরুল না। তিনি বাঁ হাতে কপালটা চেপে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

(৪)

পরেশবাবু আগেই আফিস থেকে কল্পনার বিয়ের জন্ত টাকা ধার ক'রে নিয়েছিলেন। পুনরায় চাইলেও তিনি আর সে অনুগ্রহ সেখানে পেলেন না। কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। এদিকে এক মাস যায় যায়। এই একমাস পরে কল্পনার যে কি অবস্থা হবে তা ভাবতে তাঁর সারা গা'টা শিউরে উঠল। কোন উপায় না দেখে গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করে ভিটে আর অবশিষ্ট সম্বলগুলার বিনিময়ে কিছু টাকা ধার নেওয়াই ঠিক করলেন। অবশেষে একদিন সত্যি সত্যি তিনি হরিশ চাটুজ্যের দুয়ারে এসে এ প্রস্তাবটা করে ফেল্‌লেন। উত্তরে হরিশ চাটুয্যে বল্‌লেন,—"ভারি ত' তোমার ভিটে। ওতে কি আর হাজার টাকা দেওয়া যায়।"

পরেশ বাবুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। তিনি সাহসে ভর ক'রে বল্‌লেন,—"বেশ, আমরা দু'জনে আপনার দোরে না হয় খেটে খাব। এতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হবে না?"

"না হে ভায়া আজ কালকার বাজার বড় আক্কারা।" এই কথা বলে তিনি গাড়ু হাতে বাগানের দিকে চলে গেলেন।

আজ প্রথম পরেশবাবুর চোখের সামনে সংসারটা একটা বিরাট ধাপ্পাবাজীর আড্ডা বলে বোধ হ'ল। চোখ দুটো আজ আর জলে ভ'রে এল না, জ্বালা ক'রতে লাগল। তিনি বরাবর বাড়ী এসে বল্‌লেন,—'মেজবৌ' আজ থেকে মনে কর কল্পনা আমাদের নেই—মারা গেছে!"

"ছিঃ ষাট্, বাছা আমার বেঁচে থাক,—অমন কথা বলতে নেই। কি ক'রবে বল সবই অদৃষ্ট বিধি লিপি।"

"যদি কল্পনার বিয়ে না দিতুম?"

"সমাজ একঘ'রে করত।"

"ব্যাস ওইটুকু তার সীমা। মনের ওপর, দেহের ওপর তার কোন অধিকার নেই। এ সমাজ থেকে দূরে থাকা—সে যে বড় শান্তি মেজবৌ।"

এরপর হেমলতার মুখ দিয়ে আর কোন জবাবই বেরুল না।

(৫)

বাইরের কাজ সেরে হেমেন যখন শু'তে এল তখন রাত বারটা! কল্পনা একপাশে শুয়ে আছে। বালিসে হাত দিয়ে দেখলে তার সবটাই প্রায় চোখের জলে ভিজে গেছে। হেমেনের বুকের ভেতর কেমন ক'রতে লাগল। প্রত্যেক রাত্রির এই নীরব চোখের জল তার প্রাণে বড় আঘাত দিত। আজ আর সে স্থির থাকতে না পেরে ধীরে ধীরে ডাকল, "কল্পনা!"

কল্পনা স্পন্দনহীন ভাবে বিছানার একপাশে প'ড়েছিল।

হেমেন আবার ডাক্‌লে,—"কল্পনা!"

কল্পনা সে ডাক শুনে আর সহ্য ক'রতে পারছিল না। এমন প্রাণভরা ডাক তার জীবনে এই যে প্রথম। কল্পনা এই ডাক আর একবার শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হ'য়ে রইল। হেমেন আর থাকতে না পেরে কল্পনার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। সে অভিশপ্ত মুখখানাকে দুহাতে ঢেকে ফেল্‌লে। তার সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। হেমেন তখনি মুখের ওপড ঝুঁকে বল্‌লে,—"তুমি আমায় বড় ঘেন্না কর কল্পনা?"

কল্পনা আর ঠিক থাকতে পাড়লে না। তার গলার ভেতর আওয়াজ যেন আটকে গেল। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে কি বল্‌তে গেল কিন্তু তাও বলা হ'ল না। একটা দারুণ লজ্জায় তার হাত দু'খানাকে মুখের ওপর চেপে রেখে দিলে।

হেমেন হাত দু'খানা মুখের ওপর থেকে টেনে সরিয়ে বল্‌লে,—"কথা কবে না?"

এবার লজ্জার বাঁধ যেন ভেঙে গেল। কল্পনা বল্‌লে,—"আমায় আর অপরাধিনী কোর না।"

"তুমি অপরাধিনী? না কল্পনা, মিথ্যে বল না। আমি "কি জানি না তুমি আমার জন্যে কত ব্যথিত।"

কল্পনা স্বামীর বুকে মাথা রেখে বল্‌লে,—"আমার আজ সব বেদনা ধুয়ে মুছে গেছে।

কল্পনা চেয়ে দেখলে স্বামীর চোখের কোণে জল-বিন্দু।

হেমেন বলে যেতে লাগল,—"শোন কল্পনা আজ আমার ঘুম ভেঙেছে। আমার হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যে পাপ এতদিন ধরে প্রশ্রয় পেয়ে আসছিল আজ সেটা তোমার কাছে বলে একটু হাল্কা হব। দিদির ব্যাপার তোমার কাছে কিছুই নূতন নয়। যখন দিদির স্বামী মারা যায় তখন তিনি নিজের বাস্তু-ভিটা ইত্যাদি সব জিনিষ বিক্রী ক'রে অনেক টাকা নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এসে ওঠেন। সে অর্থের একমাত্র আমিই অধিকারী তা আমায় জানিয়েছিলেন। মূর্খ আমি, তাই সে লোভে আমি সবই ভুলে গিছলুম। মা একটা কলের পুতুলের মতন দিদির হুকুমে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—শুধু স্নেহের বিনিময়ে আমাকে এই অর্থ পাইয়ে দেবার জন্যে। আর আমি—।"

কল্পনা বাধা দিয়ে বল্‌লে,—"আজ এসব কি বলছ? তোমার সুখেই আমার সুখ—তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ।"

হেমেন দ্বিগুণ উত্তেজনায় ব'লে যেতে লাগল,—"শুধু তাই নয় কল্পনা! আমি দিনের পর দিন লক্ষ্য ক'রে আসছি তোমার ওই অক্লান্ত পরিশ্রম। ঘরের কাজ বাইরের কাজ এমন কি তোমায় বাগানেও খাটতে দেখছি। তোমার আসার পর থেকে দিদি চাকর আর ঝি ছাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"তাঁরা ত ঠিকই ক'রেছেন। নারীর ত' সেবাই ধর্ম্ম।"

"সত্যি, তুমি ঠিক ক'রে বল দিকি কল্পনা এসব কাজ বাড়ীতে ক'রতে কি না?"

কল্পনা নীরব!

"শুধু ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে এত বড় একটা মিথ্যেকে ঢেকে ফেল না। নারীর সেবাই ধর্ম্ম—তা আমি জানি। কিন্তু আজ বেশ ভেবে বলদিকি কল্পনা তুমি এই অধম স্বামীর জন্য সেবা ক'রে কতটা ধর্ম্ম অর্জ্জন ক'রেছ?"

কল্পনা ছোট্ট ক'রে বল্‌লে,—"না।"

"তবে তুমি তোমার কাজ না ক'রে কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে পাপের আশ্রয় ক'রেছ—কোন প্রতিবাদ কর নি কেন?"

"লজ্জায়!"

"হ্যাঁ আজ শুধু এইটের জন্যে বাংলার ঘরে ঘরে যত আগুন। যাক, আমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইনা কল্পনা কাল আমায় কোন কাজে যেতে হবে, আসতে দু'চারদিন দেরীও হ'তে পারে। খুব সাবধানে থাকবে।"

"আমার দিব্বি তুমি আর এ কথা নিয়ে মাকে কষ্ট দিও না।"

"আচ্ছা।"

সকালে উঠে হেমেন নিজের কাজে চলে গেল। বাড়ীতে বলে গেল যে তার আসতে দু' একদিন দেরী হ'তে পারে। হেমেনের বোন দোর খুলে দেখলে বাসি কাজ সব পড়ে আছে। রোয়াকে বেরিয়ে ডাক্‌লে,—"বৌ, ও বৌ?"

কোন সাড়াশব্দ নেই। আস্তে আস্তে ঘরে এসে দেখে তখনও কল্পনা শুয়ে আছে। রাগে তার সর্ব্বশরীর জ্বালা করতে লাগল। সে ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌লে,—"আজ যে আর ঘুম ভাঙে না গো? বলি কাল সারারাত উৎসব গেছে নাকি?"

কল্পনার এ ডাকে চেতনা হতেই সে মরমে মরে গেল। বিছানা থেকে উঠতে গেল কিন্তু মাথায় গুরুভার বশতঃ সে টলে বিছানার ওপর পড়ে গেল। কল্পনার গায়ে একটা জোরে ঝাঁকানি দিয়ে ননদ কর্কশ স্বরে বল্‌লে,—"বলি আজ কি মরণের ঘুম ঘুমিয়েছ না কি।"

"আমার বড্ড অসুখ কোরেছে ঠাকুরঝি।"

"কি? অসুখের অছিলায় পার পাবে মনে করেছ?"

গায়ে হাত দিয়ে বল্‌লেন,—"কৈ তেমন ত কিছু হয় নি বাপু। যাও আগে কাজগুলো সেরে এস তারপর নয় শোবে। গতরে এতই যদি সুখ পোয়াবে ত' বাপকে চাকর পাঠিয়ে দিতে বলতে পার নি?"

এই কথায় কল্পনার গায়ে কে যেন সূচ ফুটিয়ে দিলে। সে তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু পরক্ষণেই মাথা টলে

মেজের ওপর পড়ে গেল। মাতা এ শব্দে সেখানে এসে হাজির হ'লেন। মেয়ের মুখেই ব্যাপারটা সব শুনলেন। তারপর কল্পনার গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন গা খুবই গরম। মায়ের ভাব দেখে মেয়ে বল্‌লে,—"তা না হয় থাক। দেখি যদি শ্যামের মা'কে ডেকে কাজ কটা করিয়ে নিতে পারি।"

একদিন দু'দিন ক'রে তিনদিন কেটে গেল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না, বেড়েই চলেছে। কল্পনা জ্বরের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ ক'রছে কিন্তু জনপ্রাণীও তার কাছে নাই। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে গেলেও তাকে আজ আর কেউ এক ফোঁটা জল দিয়েও উপকার করে না। সেদিন দুপুর বেলায় সে আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে না পেরে "জল জল" বলে পরিত্রাহি চীৎকার করতে লাগল। খিড়কির পথ দিয়ে নথগিন্নি যাচ্ছিলেন, তিনি শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর কাণে "জল, একটু জল" ভিন্ন আর কিছু বড় একটা প্রবেশ করল না। তিনি খিড়কির দোর দিয়ে ঘরে ঢুকে ব্যাপার দেখে চম্‌কে উঠলেন। তাড়াতাড়ি দালান থেকে একঘটি জল এনে কল্পনাকে খাইয়ে দিলেন। কল্পনা চোখ মেলে চেয়ে শুধু একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে বল্‌লে,— "আঃ।"

নথগিন্নি সটান রান্নাঘরে এসে দেখলেন মায়ে ঝিয়ে পা ছড়িয়ে তখনও বুড়ো আঙ্গুলের ঠেলায় ভাত মুখে দিচ্ছে আর গল্পগুজবও চলছে। দেখে তাঁর সমস্ত দেহটা জ্বলে গেল। তিনি বল্‌লেন,—"কি গো তোমাদের বৌয়ের কবে অসুখ হ'ল?"

"আজ তিন দিন।"

কোন্ ডাক্তার দেখছে?"

"কি হবে ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ ত' আর খাবে না।"

এ মিথ্যার ভাণে নথগিন্নী মর্ম্মাহত হ'লেন, কোন কথা না বলে "যাই কাজ আছে" ব'লে আস্তে আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

হেমেনের বোন খেতে খেতে বল্‌লে,—"তা মা এক কাজ কর না কেন, বৌকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। কে ওর জন্যে টাকা খরচ ক'রে মরবে বল?"

"সেখানে গিয়ে কি হবে। বাপ ত' চোখে ছানি প'ড়ে অন্ধ হয়েছেন।"

"সে সব চিন্তায় আমাদের দরকার নেই মা। আমার বাড়ীতে মরে ও যে আমার ভায়ের অকল্যাণ ক'রবে তা আমার সহ্য হবে না। আমি এখুনি শ্যামের মাকে ডেকে সব ব্যবস্থা ক'রছি।"

মাতার মুখদিয়ে অস্পষ্ট ভাবে বেরিয়ে পড়্‌ল,— "হেমেন—।"

"সে আমার কখনও অবাধ্য হবে না।"

খাওয়া দাওয়ার পর মাতা এসে বৌয়ের কাছে দাঁড়াতেই কল্পনা চেয়ে দেখে বল্‌লে,—"কে মা! একটু জল দিন না।"

মাতা জল এনে তাকে খাইয়ে দিলেন। হেমেনের বোন সেখানে এসে বল্‌লে,—"বৌ তুমি তোমার মার কাছে যাও।"

এ যাওয়া আনন্দের নয় জেনে কল্পনা বল্‌লে,—আমি ত এখানে বেশ আছি।"

"না সে জন্যে নয়। এখানে রাত দিন কে তোমার ঝক্কি বইবে?"

কল্পনা দ্বিতীয় কথা বল্‌ল না। শ্যামের মাকে ডেকে কল্পনাকে পাঠিয়ে দেবার সময় ব'লে দিলে,—"দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে তুই সটান এখানে চ'লে আসবি।"

শ্যামের মা সম্মতি জানিয়ে পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল।

* * *

বাইরে গোলমাল শুনে হেমলতা সেখানে এসে দেখলেন কল্পনা পাল্কি থেকে নামছে। তার দেহ খানায় আর কিছু নেই বল্‌লেও হয়। কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিতেই দেখলেন গা গরম। কল্পনার যে জ্বর হ'য়েছে তা তিনি সহজেই অনুমান ক'রলেন। তারপর তাকে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর এনে ঘরে শুইয়ে দিলেন। কল্পনা বল্‌লে— "মা ভাড়াটা দিয়ে দাও।"

তাঁর মাথায় যেন বাজ পড়ল। বাক্সে কপালে ছোঁয়ান একটী টাকা মাত্র ছিল তিনি সেইটে নিয়ে গিয়ে তাদের দিলেন। তারপর যে ঘরে পরেশবাবু শুয়ে ছিলেন সেখানে এসে বল্‌লেন,—"কল্পনা এসেছে।"

"তার শাশুড়ী যে ঋণের টাকা না নিয়ে আমার হ্যাণ্ডনোট ফিরিয়ে দিলে। আমার কি ঋণ ফুরিয়েছে?"

"কতক কতক কল্পনা শোধ দিয়েছে।"

"সে আবার কি?"

"দেখবে এস।" এই বলে পরেশবাবুর হাত ধরে কল্পনার কাছে নিয়ে এলেন। পরেশবাবু কাছে বসতেই কল্পনা "বাবা" বলে তাঁর কোলে মুখ লুকলো। তিনি গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন সারা গাময় দাগ। অবাক হ'য়ে বল্‌লেন,—"এ কি কল্পনা?"

"এ আপনার ঋণ শোধের চিহ্ন বাবা! কালো কালো নগদ ঝাঁটা দিয়ে পিঠে এঁকে দিয়েছেন?"

কল্পনা কেঁদে ফেল্‌লে।

"গা গরম কেন মা? অসুখ করেছে কি?"

"হাঁ বাবা!"

"ওঃ ঋণের সুদ আদায় করতে পাঠিয়েছে!"

বৃদ্ধের চোখের দু' ফোটা তপ্ত অশ্রু টপ্‌ টপ্‌ করে গড়িয়ে কল্পনার গায়ে পড়ল।

কবিচূড়ামণি কালিদাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বি-এ, এম, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)]

ইহাদের মধ্যে অপ্সরস্ দিগের পুরুষের সংখ্যা নিতান্ত বিরল, তাই শাস্ত্রাদিতে উহাদের পুরুষের উল্লেখ দেখা যায় না। ইতিহাসাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মানবগণও দেবযোনিদের দেশে বিবাহ করিয়া তথায় চিরস্থায়ী হইয়া যাইতেন এবং তাহাদের বংশধরগণ ক্রমে দেবযোনি মধ্যে গণ্য হইতেন। মানুষ বংশীয় দেব-যোনিরা আবার সময় সময় উত্তরাধিকারসূত্রে দেবযোনিদের উপরে প্রভুত্ব করিতে গিয়া প্রবল কলহের সৃষ্টি করিতেন। নহুষ প্রভৃতি নরপতিগণ এমন কি দেবতাদিগের উপরও প্রভুত্ব করিয়াছেন। দেবতারা প্রথমে মেরুগিরিতে বাস করিতেন, ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধিতে সমগ্র বঙ্গদেশ ও সুমেরুদেশে ছাইয়া পড়েন। দেবযোনিগণ হেমগিরি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেন। দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে তাঁহার জননী মেনকা এই হেমগিরিতে তাঁহার বাসস্থানে আনিয়া দেবতাদিগের জনক দেবর্ষি কশ্যপের আশ্রমেই শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত মেরুপ্রদেশ হইতে দেবরাজ ইন্দ্রের শত্রুবিনাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে এই হেমগিরিতেই সপুত্রক শকুন্তলার সহিত পুনরায় মিলিত হ'ন।

উপরি-উক্ত কথাগুলি ব্রাহ্মণ ও মহাভারত হইতে সংগৃহীত। কবিবর কালিদাসও এতন্মতাবলম্বী। তাঁহার মতে অপ্সরোমণি মেনকা ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের মিলন দেবযোনিদের রীতিতে সমাজ সঙ্গত। সুতরাং শকুন্তলাকে জারজ কন্যা বলিবার যো নাই। তারপর অপ্সরাদের স্বতন্ত্র আচার মানব সমাজের আদরণীয় না হইলেও মহর্ষি কণ্বের সুশিক্ষায় শকুন্তলা রাজার পক্ষে সত্যই কণ্ঠধার্য্য রত্নমালা। তাই কবি রাজার মুখে বলিতেছেন—

ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়োজাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্॥ ১।২৭।

(৮) কালিদাসের সময়ে ঋণদায় বড়ই গুরুতর ছিল। উত্তমর্ণ দ্বারা অধমর্ণের নিকট হইতে ঋণের আদান সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

ধর্ম্মেণ ব্যবহারেণ ছলেনাচরিতেন চ।
প্রযুক্তং সাধয়েদ্ অর্থং পঞ্চমেন বলেন চ॥ ৮।৪৯।

মহর্ষি ভৃগু বলিতেছেন—ঋণদাতা অধমর্ণ হইতে তাহার পরিবার পোষণের ব্যাঘাত না করিয়া ধর্ম্মানুসারে, অথবা রাজদ্বারে অভিযোগ দ্বারা, অথবা কোনও রূপ ছল দ্বারা, অথবা দায়িকের দার পশু ও পুত্রাদি হত্যা করিয়া তাহার দ্বারে ধন্না দিয়া কিংবা দায়িককে বাঁধিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিয়া মারপিট করিয়া আপন প্রাপ্য অর্থ আদায় করিবে। অর্থাৎ উত্তমর্ণ মহাশয় অধমর্ণের নিকট হইতে যেরূপে হউক তাহার প্রাপ্য ধন আদায় করিয়া লইতে পারেন। এ নিয়মটি অতীব কঠোর। মনুষ্য সমাজের অযোগ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নাট্যকারের কর্ত্তব্য সামাজিক ও ব্যবহারিক দোষগুলি চাক্ষুষ দেখাইয়া উহার প্রতিকার সাধন। কালিদাসও অভিনয়ে তাহার নায়িকা শকুন্তলার উপরে উহা দেখাইয়া রঙ্গস্থলে প্রেক্ষককে উহার কঠোরতা প্রাণে প্রাণে অনুভূত করাইয়া দিয়াছেন। প্রিয়ংবদার বিদ্রুপপূর্ণ বাক্যাবলী সহ্য করিতে না পারিয়া শকুন্তলা যখন আর্য্যা গৌতমীর নিকটে প্রস্থান করিতেছিলেন তখন প্রিয়ংবদা অমনি তাহার গতি নিরোধ করিয়া বলিলেন—সখি, তুমি যেতে পার না। শকুন্তলা (ভ্রূভঙ্গ করিয়া) কহিলেন—কেন? প্রিয়ংবদা। কেন? জল থেকে তুমি আমার দু' কলসী জল ধার। এস এখন। ঋণ শোধ, তারপর যাবে। (এই বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ করিলেন।) শকুন্তলার আর সাধ্য হইল না জোর করিয়া যা'ন। রাজা অমনি নিজের শিল অঙ্গুরীয় দানে শকুন্তলার ঋণ মোচনে উদ্যত হইলেন। ব্যাপারটী অতি সামান্য বটে। কিন্তু এক ঢিলে

দুই পাখী মারিলেন। রাজার আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ঋণ সংক্রান্ত বিধির দূষণীয় কঠোরতাও বিদ্বানগুলীর চক্ষুর উপরে ধরিয়া দিলেন। তদবধি ঋণ বিধির পরিশোধন হইয়াছিল কি-না উহার কোনও বিবরণ নাই বটে, তবে আমরা পরবর্ত্তী পুরাণ ও নিবন্ধকারদের ব্যবস্থায় ক্রমশঃ উহার কঠোরতার হ্রাস দেখিতে পাই।

(৯) প্রথম অঙ্কের শেষ শ্লোকে কবি শকুন্তলা সঙ্গত্যাগী সেনানিবেশাভিমুখগামী নৃপতির শরীর ও চিত্তের গতির আক্ষেপিক উপমায় রথধ্বজের চীনাংশুকের উল্লেখ করিয়া তৎকালে প্রচলিত হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবহার সম্বন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ চীন ও ভারতের মধ্যে তিব্বতের পথে যাতায়াত ও বাণিজ্য ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। রেভারেণ্ড গ্রিটজ্‌লাফ (Rev. Gritzlaff) সাহেব কৃত প্রাগৈতিহাসিক চীনের ইতিহাস পাঠে পাঠক মাত্রই উহা অবগত হইয়া থাকেন।

(১০) প্রথম অঙ্কে আর একটি বিষয়ও বেশ পরিস্ফুট ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে যেমন রাজধানী ও আশ্রমের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, শকুন্তলায়ও আমরা উহা বেশ পরিস্ফুটরূপে অভিব্যক্ত দেখিতে পাই। তখন ঋষিরাই রাজাদের পৌরহিত্য করিতেন! রাজারাও আধ্যাত্মিক উপদেশের জন্য যখন তখন সপত্নীক আশ্রমে ঋষিদের নিকট যাইতেন। তখনকার ঋষিরাই এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তবে গুণ গরিমায় ও ত্যাগ স্বীকারে তাঁহারা পুরাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের চাইতে সহস্র গুণ উচ্চ আসন রাজদ্বারে প্রাপ্ত হইতেন। রাজা যেমন রাজধানী, গ্রাম ও সমগ্র জনপদ রক্ষা করিতেন, সেইরূপ তাঁহাকে তপোবনগুলিও সুরক্ষিত করিতে হইত।

(১১) কালিদাস কৃত কোনও গ্রন্থেই বাল্য বিবাহের উল্লেখ নাই। তাঁহার কুমারসম্ভবের গৌরী পর্য্যন্ত আর পুরাণোক্তা অষ্টবর্ষা নহেন, পূর্ণা তরুণী। শকুন্তলা, মালবিকা, রঘুবংশের সীতা, কেহই বাল্যে বিবাহিতা নহেন। সকলেই নিজ নিজ বর নিজেরা মনোনীত করিয়াছেন। বাল্য বিবাহ কবির আদৌ মনোনীত বলিয়া মনে হয় না; তবে যৌন-সম্বন্ধ কেবল বর ও বধূর মনোনয়নের উপর নির্ভর করিতে কবি রাজি নহেন, তাঁহার মতে তাদৃশ মনোনয়ন "ধূমাকুলিত দৃষ্টি যজমানের প্রদত্ত হব্যের অগ্নিতে পতনের ন্যায় অনিশ্চিত।"

(১২) প্রথম অঙ্কে কবিবর রাজশক্তি সম্বন্ধে এক কথায় সমুদায় রাজনীতির মূলতত্ত্বে ইঙ্গিত করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রমতে রাজা অষ্ট লোকপালের শক্তির অবতার। তাঁহার ক্ষমতা অপার্থিব, সুতরাং অপ্রতিহত। বালক হইলেও রাজা সর্ব্বশক্তির অবতার। তাঁহার রাজদণ্ডে শাসন গ্রহণ ব্যতিরেকে মানুষের অপরাধের ইহকালে ও পরকালে মুক্তি নাই। কিন্তু এই সমুদায় অসীম শক্তিই আর্ত্তত্রাণে নিয়োজিত করিতে হইবে, নিরপরাধের উপরে নহে। নিরপরাধে শক্তি প্রয়োগ অমার্জ্জনীয়। উহার ফল অতি মন্দ।

(১৩) নির্ম্মল অচঞ্চল সরোবরে বসন্তের মলয় সমীরে প্রথম হিল্লোলের ন্যায় প্রকৃতি পেলবা পূতমন্দাকিনী নির্ব্বিকার হৃদয়া তরুণী নায়িকার অন্তরে নবীন মন্মথ মনোহর মহিমময় রাজর্ষির দর্শনে প্রথম হইতে ভাব, হাব, হেলা, ললিত প্রভৃতি যে সমুদায় বিকার উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ তাহাকে পুষ্প বানের শরলক্ষ্য করিয়াছিল তাহা কবি এমনই সুমধুর অথচ সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন যে উহা পাঠক মাত্রেরই নেত্রপথ অতিক্রান্ত হইবার সম্ভব নাই। প্রেমের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও পরিপোষণ সংস্কৃত সাহিত্যে কেন পৃথিবীর অন্য কোনও সাহিত্য ভাণ্ডারে তাদৃশ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয় না। যেমন একদিকে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি একটির পর একটি করিয়া স্তরে স্তরে সুব্যক্ত হইয়াছে তেমনি কবিত্বের অপার্থিব সরস মাধুর্য্যের আচরণে উহা কি প্রেক্ষক কি পাঠক সকলকেই অতর্কিতভাবে তন্ময় করিয়া তোলে।

(ক্রমশঃ)

আয়েষা ও রেবেকা

[শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ এম-এ]

আয়েষা ও রেবেকা—এই চরিত্র দুইটীর একসঙ্গে সমালোচনা এদেশে প্রায় একপ্রকার পুরাতন হইয়া গিয়াছে। তথাপি আজ আবার সেই বিষয়ের পুনরবতারণায় শুধু এই কৈফিয়তই যথেষ্ট হইবে যে কবি কুলের অসীম ভাবরাশি সমালোচনা দ্বারা কখনই নিঃশেষিত হইতে পারে না। আয়েষা যে রেবেকা অপেক্ষা উচ্চদরের চরিত্র, এ সিদ্ধান্তও একপ্রকার নির্দ্ধারিত ও সর্ব্বানুমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনেকেই এই প্রচলিত মতের ঠিক বিপরীত মত পাইয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাতে এমন কিছুই নাই। বঙ্কিম বাবুর লেখনী যখন আয়েষা 'অঙ্কণে নিযুক্ত ছিল, তখন তাহা নবীন, সুপক্ক নহে—সকলেই জানেন "দুর্গেশনন্দিনী" বঙ্কিম বাবুর সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। আর স্কটের লেখনী প্রবীণ অবস্থায় রেবেকা—চরিত্রের অঙ্কণে নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কারণে "আইভানহো" এবং "দুর্গেশনন্দিনী"—এই দুইখানি উপন্যাস পাশাপাশি ফেলিয়া মনোযোগের সহিত চর্চ্চা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে রেবেকা চরিত্রাঙ্কণে স্কট অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। নবীনের প্রথম সৃষ্টিতে কলা নৈপুণ্যের চরম বিকাশ থাকিবে না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

অবশ্য এই সকল মন্তব্য হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে বর্ত্তমান লেখক ঘোর আয়েষা বিদ্বেষী। আয়েষার করুণ কাহিনী যিনিই পাঠ করিবেন, তিনি কখনও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে পারিবেন না। আয়েষার প্রেম জগতে দুর্ল্লভ, ত্রিদিবের সামগ্রী। এ সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী রেবেকা বোধ হয় কোন অংশেই তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ নহেন—উভয়েরই প্রেম নৈরাশ্যে, গভীরতায় ও পবিত্রতায় একই দরের—উভয়েই সমভাবে প্রেমের চরণে জীবন যৌবন বলিদান করিয়াছে। এ বিষয়ে কেহ কাহারও নিকট পরাজিত হ'ন নাই। তবে এই একই দরের প্রেমের অঙ্কণে একজন কবি অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন ও অপর জন ততটা দেখাইতে পারেন নাই। অবশ্য উভয় চরিত্রেই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য আছে। যাহা হউক, এখন উপক্রমণিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উভয় চরিত্রের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

আয়েষার সহিত যখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎলাভ ঘটে, তখন তিনি গম্ভীরভাবে জগৎসিংহের রোগশয্যা পার্শ্বে সমাসীনা। এই গাম্ভীর্য্য যে কঠিন রোগশয্যা পার্শ্বে সমাসীনা বলিয়া তাঁহাকে ধারণ করিতে হইয়াছে তাহা নহে, এ গাম্ভীর্য্য ছিল তাঁহার মজ্জাগত। কবি এইস্থানে তাঁহার অপরূপ রূপের যে অপরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বর্ণনা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, আয়েষা অপরূপ সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যেও একটা গাম্ভীর্য্য ছিল। তিনি কোন চিত্তবিভ্রমকারিণী, চপলা, চঞ্চলা বালিকা ছিলেন না—তাঁহার একটা গাম্ভীর্য্য অলৌকিক গরিমায় বিরাজিত ছিল। কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার "বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, যৌবনের যাদুময় কক্ষ-কবাট তিনি অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন—তাই তাঁহার রূপ আমার স্ফুটনোন্মুখতার মাদকতাময় রহস্য অথবা সদ্যঃস্ফুটনের প্রমত্ততা কিছুই পাই না। কবি বলিতেছেন :—

"আয়েষার সৌন্দর্য্য নব-রবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকশিত, সুবাসিত, রস-পরিপূর্ণ, রৌদ্র-প্রদীপ্ত, না সঙ্কুচিত না বিশুষ্ক; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণদলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।......

আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্ব্বাহ্নিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।"

(দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ)

রসজ্ঞ পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, আয়েষার সৌন্দর্য্যে একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও একটা পূর্ণতা আছে—আয়েষা পূর্ণযৌবনা সুন্দরী।

আর রেবেকা আমাদের নয়নপথে প্রথম উপস্থিত হ'ন, রোগশয্যা পার্শ্বে নয়—টুর্ণামেণ্টের গ্যালারীতে। কবি তাঁহার সঠিক বয়স কোথাও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার দীপ্ত যৌবনশ্রী ও তাহার প্রভাব হইতে অনুমান করা যায় যে রেবেকা যাদুময় যৌবন দ্বারে সদ্যঃ পদার্পণ করিয়াছেন। আয়েষার সৌন্দর্য্যে যে একটা গাম্ভীর্য্য ও অচঞ্চলতা আছে, আমরা রেবেকার সৌন্দর্য্যে তাহা পাই না; এবং সুবৃহৎ উপন্যাস খানির মধ্যে যেখানেই রেবেকার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা পাওয়া যায়, কোথাও হইতে অনুমান করা যায় না যে তিনি আয়েষার মত পরিপূর্ণযৌবনা রমণী। যতদূর অনুমাণ করা যায় (জানি না এই অনুমান ঠিক সঠিক্ হইবে কি না।) তাহা হইতে বোধ হয় আয়েষাই বয়ঃজ্যেষ্ঠা।

এই যে গাম্ভীর্য্য আয়েষার সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছে, এ গাম্ভীর্য্য শুধু ক্ষণেকের জন্য তিনি ধারণ করেন নাই, এ গাম্ভীর্য্য তাঁহার অন্তরের গাম্ভীর্য্য হইতেই প্রতিফলিত। এই গাম্ভীর্য্যই আয়েষা চরিত্রের একটী বিশেষ লক্ষণের মূলে নিহিত, আর আয়েষার ছায়াময় ভাব হইতেছে সেই বিশেষ লক্ষণটী। কবি যেন তাঁহাকে ঈষৎ Shadowy করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি এক অশরীরী পরীর মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, শুধু চারিপাশ উন্মুক্ত পক্ষচ্ছটায় প্রদীপ্ত করিয়া। যখন তাঁহার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় তখন দেখি তিনি গম্ভীরভাবে রোগ শয্যা পার্শ্বে সমাসীনা—এই গাম্ভীর্য্য চির দিনই তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। "আয়েষা" চরিত্র এইরূপ ছায়াময় হইবার কারণ এই যে কবি তাহা কর্ম্মের (action) ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলেন নাই—আমরা আয়েষার জীবনে কর্ম্মের একান্ত অভাব দেখিতে পাই। কর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতেই মানব চরিত্র গড়িয়া ও ফুটিয়া উঠে। আয়েষার জীবনে আমরা এই কর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত কিছুই লক্ষ্য করি না। আয়েষা আসরে উপস্থিত হ'ন উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ যখন ঝটিকা প্রায় বহিয়া অবসান হইয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে, রেবেকাকে আমরা দেখি উপন্যাসের প্রায় প্রথমেই, এবং রেবেকার স্রষ্টা অতি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন যে কেমন করিয়া রেবেকা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবা মাত্র ঝটিকা উঠে এবং তাঁহাকেই ঘেরিয়া গর্জ্জিতে থাকে।—সেইদিন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই রেবেকার জীবনটী ক্রুদ্ধ সাগরোর্ম্মিমালায় ভাসিয়া যায়। আয়েষা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ ছয়টী দৃশ্যে মাত্র উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু রেবেকা স্রষ্টা রেবেকাকে সহস্র ঘটনার অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া রেবেকাকে লইয়া গিয়াছেন, এবং উপরন্তু নিপুণ তুলির রেখায় রেখায় প্রেমের বিচিত্র লীলা অঙ্কিত করিয়াছেন। তাই রেবেকা এত সজীব—রেবেকার রোমে রোমে সৌদামিনীর মত প্রাণস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। রেবেকা এক মুহূর্ত্তের তরেও মর্ম্মর প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তির দশা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার ধমনীতে চঞ্চল রক্তস্রোত চিরকালই বহিয়াছে। কিন্তু আয়েষার জীবনে প্রায় একরকম কর্ম্মের লেশ না থাকায় আয়েষা শুদ্ধ মর্ম্মরময়ী প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। কর্ম্মের অভাব থাকা সত্ত্বেও কবি তাঁহাকে অধিকতর সজীব করিতে পারিতেন যদি তিনি আয়েষার অন্তরের ভাবরাশির উত্থান পতন বা লীলা খেলার বিচিত্র ছবি অঙ্কিত করিতে পারিতেন। একমাত্র কর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতেই যে চরিত্র মাত্রই ফুটিয়া উঠে তাহা নহে—এক একটী চরিত্র আছে যাহারা বহির্জ্জগতের কর্ম্মবন্যা হইতে সুদূরে আপনাদের হৃদয়-রাজ্যে পরিভ্রমণ করে, অন্তর্জ্জগতের উত্থান পতন লইয়া তাহারা অধিকতর ব্যস্ত, অন্তরের ভাবের বিকাশ লইয়াই তাহাদের জীবনের বিকাশ হয়,—অবশ্য বহির্জ্জগৎ হইতে এক একটা দুর্ণিবার তরঙ্গ আসিয়াই তাহাদিগকে মানসজগৎ আলোড়িত করে। কিন্তু তাহারা বহির্জ্জগতের কর্ম্ম-বন্যায় তাহাদিগের জীবন-তরী ভাসায় না, তাহারা শুধু বহির্জ্জগতের কর্ম্মের আলোচনা লইয়া ব্যস্ত থাকে না (ইংরাজিতে যাহাদিগকে বলে psychological characters ইহারা তাহাই। আয়েষার স্রষ্টা কিন্তু মানস জগতের উত্থান পতন বা তাহার ভাব রাশির লীলা খেলার ছবি অধিক দেন নাই। আয়েষা স্বয়ং জগৎ সিংহকে লিখিতেছেন, "রমনী হৃদয় দুর্দ্দমনীয়", কিন্তু আয়েষার স্রষ্টা এই "দুর্দ্দমনীয় রমণী হৃদয়ের" বিচিত্র ছবি আমাদিগকে ভাল করিয়া অধিকবার দেখান নাই—

যে ছবি, উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি আমরা দেখিতে পাই শেষ দৃশ্যে তিলোত্তমাকে অলঙ্কার পরাইয়া দিবার সময় ও পরে নিস্তব্ধ বাতায়নে তরলাধার অঙ্গুরীয়ের গরল—পানের আকাঙ্ক্ষায়। এইসব ভাবের খেলা না থাকিলে কবির মানস-প্রতিমা সকল সজীব হয় না। গাম্ভীর্য্য থাকুক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু এই গাম্ভীর্য্যে যেন সজীবতা নষ্ট না করে। এই নির্ব্বাক্, গম্ভীর প্রকৃতির রমণীর হৃদয়-রাজ্য প্রায় চিরদিনই এক সুনিবিড় যবনিকায় আবৃত—সে রাজ্যের বিশেষ কোন সংবাদ বা চাঞ্চল্য বহির্জগৎ পায় নাই। শুধু একটীবার বহির্জগৎ হইতে একটী প্রচণ্ড তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার হৃদয়-দুর্গের পাষাণ প্রাচীর ভাঙিয়া, দুর্গ-কবাটের অর্গল উড়াইয়া লইয়া গিয়া অন্তরতম প্রদেশের গুপ্ত দৃশ্য জগৎ-সমক্ষে খুলিয়া দেখায়। আমরা শীঘ্রই সে বিষয় আলোচনা করিব।

এইবার আয়েষা ও রেবেকা উভয়ের প্রেম বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। হায়! কবিগণ যে সকল ছবি বিচিত্র বর্ণের সমষ্টি করিয়া সৃজন অঙ্কিত করেন, সমালোচকগণকে আবার সেই বিচিত্র বর্ণের সমষ্টিকে ভাঙিয়া ফেলিয়া এক একটি বর্ণকে জগৎ সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু কবিগণের প্রতিভা স্পর্শে সেই বর্ণ সমষ্টি যেরূপ ধারণ করে, সমালোচকের ছুরিকা স্পর্শেও সে রূপ নষ্ট হয় না। আমরা এই ভরসায়ই আজ এই দুইটী প্রেমের ছবি বিশ্লেষণ করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। আমরা প্রথমেই বলিয়াছিলাম আয়েষা ও রেবেকা উভয়েরই প্রেম সমান গভীর ও একই উচ্চদরের; কিন্তু এই প্রেমের কাহিনীর অঙ্কণে, আমাদের যেন মনে হয় বঙ্কিমবাবু স্কটের মত নৈপুণ্য দেখান নাই। আয়েষাকে আমরা প্রথম দেখি কুমার জগৎসিংহের রোগ-শয্যাপার্শ্বে। তিনি এক দেববালার ন্যায় পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা করিয়া চলিয়া যাইতেন, মূর্ত্তিমতী গাম্ভীর্য্যের মত রোগশয্যা পার্শ্বে বসিতেন ও রোগীর গৃহে বিচরণ করিতেন। আয়েষা আমাদিগকে কিছুমাত্র জানিতে দেন নাই যে তিনি এই শয্যাশায়ী বীর যুবকের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু সেই কারাগার দৃশ্যে মূর্চ্ছিতা তিলোত্তমাকে আপন শয়নাগারে পাঠাইয়া দিয়া আয়েষা যখন একাকী জগৎসিংহের নিকট ছিলেন, তখনই আমরা প্রথম বুঝিতে পারি যে আয়েষার মনোমধ্যে প্রেম প্রবেশ করিয়াছে, যে পাষাণেও আগুণ ধরিয়াছে। এই দৃশ্যে যতক্ষণ না ওস্‌মান প্রবেশ করিয়াছেন, ততক্ষণ কবি সুন্দর কলা নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। "আয়েষা কবরী হইতে একটী গোলাপ খসাইয়া তাহার দলগুলি নখে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিলেন", আয়েষা স্নেহময়ী রমণীর ন্যায় যত্নে কোমল করপল্লবে রাজপুত্রের করধারণ করিলেন; আবার তখনই তাঁহার হস্ত ত্যাগ করিয়া রাজ পুত্রের মুখপানে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা কি—।" তারপর আয়েষার নীরব ক্রন্দন ও জগৎ সিংহের উক্তি "আমি যে বন্দিত্ব স্বীকার করিলাম, কেবল ইহাতেই কখনও আয়েষার চক্ষে জল আইসে নাই। তোমার পিতার কারাগারে আমার ন্যায় অনেক বন্দী কষ্ট পাইতেছে,"—এই সকল এক একটী সুন্দর রেখায় কবি আয়েষার অন্তরের অন্তঃপুরের সুন্দর ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সমস্তই সুন্দর—আয়েষার হৃদয়ের দুর্নিবার ভাবরাশি তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া সুন্দর রূপে আধ আধ ভাবে তাহাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে ও জগৎ সিংহ আধ আঁধারে, আধ আলোয় পড়িয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না আয়েষার এই আবেগের যথার্থ কারণ কি—এ সকলই অতি সুন্দর কলানৈপুণ্যের সহিত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে "প্রকোষ্ঠ প্রকারে আর এক তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া পড়িল," ও আগন্তুকের "ক্রোধ-কম্পিত-স্বর" ধ্বনিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই যেমন উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল একটা বজ্র পড়িল ভাবিয়া, তেমনই সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কবির সমস্ত কলানৈপুণ্য ভস্মসাৎ হইয়া পড়ে। আয়েষার হৃদয়ের যে রহস্যভরা ইতিহাসের আভাস কবি অতি নিপুণতার সহিত দিতেছিলেন, সেই রহস্যের এত শীঘ্র উদ্ঘাটনে কবি সকল কলানৈপুণ্যেরই এক প্রকার হত্যা করিয়াছেন। এত শীঘ্র "রাজ কুমারের মনের অন্ধকার মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া," এত শীঘ্র "আয়েষার নীরব রোদনের" কারণ রাজপুত্রকে বুঝিতে দেওয়া, কবি উপযুক্ত কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন নাই। আর আয়েষারও পক্ষ হইতে আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে কবি এই ঘটনাটীর

অবতারণা করিয়া তাঁহার প্রেমকে ঈষৎ খাটো করিয়া দিয়াছেন ও তাঁহার অবস্থাও বড় সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছেন। যাহাকে ভালবাসি, অথচ যাহাকে পাইবার কোন আশা নাই, এমন প্রিয়জনের সম্মুখে আপনার গুপ্ত প্রণয় যে কারণেই হউক না কেন প্রকাশ করিয়া ফেলায় সেই প্রণয় খাটো হইয়া পড়ে—যাহা রহস্যের আবরণে গোপনীয় রাখা কর্ত্তব্য, সেই রহস্যের মোহময় অবগুণ্ঠন ছিন্ন করিয়া জগৎ-সম্মুখে তাহা বাহির করিলে, তাহা ঈষৎ মলিন হইয়া যায়—যেমন লজ্জাবতী লতা ঈষৎ স্পর্শ মাত্রেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাই আমাদের মতে এই দৃশ্যের অবতারণা না করিলেই হইত-- ইহা আদৌ artistic নহে। তা ছাড়া, আমাদের মতে কবি যদি আয়েষার মুখ দিয়া আয়েষার হৃদয়ের এই গূঢ় রহস্য ব্যক্ত না করিয়া জগৎসিংহকে চিরদিনই এই ব্যাপার সম্বন্ধে আলো আঁধারে রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে আয়েষার প্রণয় অধিকতর করুণ ভাবে ফুটিয়া উঠিত ও শেষ দৃশ্যে আয়েষার আচরণ জগৎ সিংহের অন্তরে চিরদিন প্রহেলিকার মত ভাসিয়া বেড়াইয়া তাঁহার প্রেমকে এক নূতনতর স্বপ্নসুষমায় ভূষিত করিত। এই বিষয় আমরা আয়েষার প্রেমের সহিত রেবেকার প্রেমের পার্থক্য লক্ষ্য করি। রেবেকার স্রষ্টা রেবেকাকে এমন কোন সঙ্গীন অবস্থায় ফেলেন নাই যেখানে তাঁহাকে জগৎ সমক্ষে নির্লাজ্জ হইয়া আপন প্রেমের ঘোষণা করিতে হয়। রেবেকাকে কখনও কাহারও সম্মুখে আপনার এই রহস্যটী ব্যক্ত করেন নাই,—যখনই তিনি করিয়াছেন, তখনই তিনি নিভৃতকক্ষে আপনার হৃদয়েরই কাছে করিয়াছেন —বোধহয় জগতে আর দ্বিতীয় প্রাণী সে হৃদয়ের রহস্যপুরীর রহস্যের সংবাদ পায় নাই। হয়ত বা আইভানহো শেষ দৃশ্যের পর, তাহা অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—কিন্তু তাহা অনুমানের অধিক আর কিছু নহে। প্রবন্ধ শেষে কবি ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে রেবেকার মূর্ত্তি আইভানহোর স্মৃতিপথে মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিত, কতকটা রেবেকার সৌন্দর্য্যের জন্য, কতকটা রেবেকার মহানুভবতার জন্য *; কিন্তু কবি শুধু ইঙ্গিতেই বলিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আইভানহোর প্রতি রেবেকার আচরণে যে একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুরী ছিল, তাহা রেবেকার অন্তরের প্রেম-নির্ঝরিণী হইতেই নিঃসৃত বলিয়া তাহা আইভানহোর এত মধুর লাগিত এবং তাহাই আইভানহোকে অধিকতম স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু আইভানহো সে হৃদয়ের কোন সম্বাদ পান নাই, তাই তিনি রেবেকার শুধু সৌন্দর্য্য ও মহানুভবতার কথাই ভাবিতেন—তিনি জানিতে পারেন নাই কেন এই ঘৃণিত জাতির কন্যা এইরূপে তাঁহার আলোছায়াময় মানসপটে মাঝে মাঝে এত স্বপ্নমাধুরী লইয়া ফুটিয়া উঠে। এখন বলুন দেখি আইভানহোর এই আলোক ছায়াময় মনের অবস্থা জগৎসিংহের আলোকিত মনের অবস্থা হইতে অধিকতর artistic ও সুন্দর কি না ?

আয়েষা ও রেবেকা—উভয়ের প্রেমের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকারে হয়। (জগৎসিংহের সম্বাদ আয়েষা পূর্ব্বে কখনও পাইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হয় নাই)—আয়েষার প্রেম জন্মলাভ করে জগৎসিংহের রোগশয্যায়। কিন্তু আয়েষা যে রুগ্ন রাজপুত্রটীকে সেবা করিতে করিতে প্রতিদান না লইয়া আপনাকেই দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন এ সম্বাদ আমরা রোগশয্যা পার্শ্বে সমাসীনা আয়েষার নিকট হইতে ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যখন সেই কারাগার দৃশ্যে তিনি আপন হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন, তখনই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, রোগশয্যা পার্শ্বে সমাসীনা এই নিস্তব্ধা রমণীটির অন্তর রাজ্যে কি না বিপ্লব জগতের নয়নের অন্তরালে ঘটিয়া গিয়াছে। আর রেবেকার প্রেম সম্বন্ধে আমরা লক্ষ্য করি যে রেবেকার হৃদয়ে প্রেম ঠিক প্রেমের বেশে প্রথমে প্রবেশ করে নাই। এও রেবেকা আইভান্‌হোর রোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি আইভান্‌হোর চরণে আপনাকে অঞ্জলি দিয়া ফেলেন। আইভান্‌হো কিন্তু এই পূজারিণীর নিভৃত পূজার কোন সংবাদ পান নাই, জগতে কেহই তাহা পায় নাই। কবি কিন্তু শত শত ইঙ্গিতে পাঠক-গণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে অভাগিনী বালিকাটি মনসিজের শরজালে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল।

এখন একে একে "আইভান্‌হো" উপন্যাসের এই দুইটী

* Yet it would be enquiring too curiously to ask, whether the recollection of Rebecca's beauty and magnanimity did not recur to his mind more frequently than the fair descendant of Alfred might altogether have approved.

রোগশয্যা দৃশ্যের আলোচনা করিয়া দেখা যাউক ও সঙ্গে সঙ্গে "দুর্গেশনন্দিনী"র সমদৃশ্যটীরও বিষয় উল্লেখ করিব। আমরা রোগীর গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। অতএব ধীরে, অতি ধীরে, অতি সাবধানে আমাদিগকে কথা কহিতে হইবে। এস্‌বিতে আইসাকের নিবাসে আইভান্‌হো যখন মূর্চ্ছা হইতে জাগরিত হইলেন, তখন তিনি চমকিয়া দেখিলেন যে চারিপার্শ্বে প্রাচ্য সাজসজ্জা আর চমক বাড়াইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল একটী অনবদ্য স্ত্রী মূর্ত্তি প্রাচ্য বেশভূষায় ভূষিতা। আইভান্‌হো এই পরী মূর্ত্তিটীকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতে যাইবেন এমন সময় অধরের উপর অঙ্গুলী রাখিয়া নীরব থাকিতে সঙ্কেত করিল। তাঁহার অনুচর একটী ভৃত্য আইভান্‌হোর ক্ষতবন্ধন উন্মোচন করিলে রেবেকা ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলেন। এই স্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে রেবেকা যে আয়েষার মত শুধু সেবা করিতেছিলেন তাহা নহে। রেবেকা আপনি বৈদ্যেরও কাজ করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা এত সুন্দর, এত সুস্পষ্টভাবে করিতেছিলেন যে, একটী রমণী যে আর একটী পুরুষকে সেবা করিতেছেন সেইরূপ বলিয়া মনে হইত না।

কবি নিজেই বলিতেছেন যে, "She performed her task with a graceful and dignified simplicity and modesty which might, even in more civilised days, have served to redeem it from whatever might seem repuguant to female delicacy. The idea of so young and beautiful a person engaged in attendance on a sickbed and in dressing the wound of one of a different sex, was melted away and lost in that of a beneficent being contributing her effectual aid to relieve pain and to avert the stroke of death"

(ch. XXVIII.)

তারপর হিব্রু ভাষায় তাঁহার অনুচরের প্রতি আদেশ দান ও আইভান্‌হোর উপর সেই সুন্দর অধর নিঃসৃত অজানা ভাষার মন্ত্রবৎ প্রভাব। তারপর আইভান্‌হোর আরব ভাষায় সম্ভাষণে রেবেকার স্বতঃই বিষাদমণ্ডিত মুখমণ্ডলে হাসির হিল্লোল। রেবেকার কুলশীল জানিবা মাত্রই আইভান্‌হোর প্রেমময় দৃষ্টির চকিত অন্তর্ধান ও সেই কারণে রেবেকার অন্তর্বেদনা—এই সকলই কবি অতি সুন্দর তুলিতে অঙ্কিত করিয়া দৃশ্যটীকে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। আর জগৎসিংহের শয্যাপার্শ্বে আমরা আয়েষাকে দেখি এক সুদূর ত্রিদিবের প্রাণীর মত—গম্ভীর, নিস্তব্ধ, তিনি যে আমাদেরই মত ভাবপ্রবণ প্রাণী সে বিষয়ে কোনরূপ নিদর্শন নাই। কবি দ্বিতীয়বার রেবেকাকে আইভান্‌হোর রোগশয্যা পার্শ্বে আনিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভাব লহরীর উত্থান পতনের বিচিত্র ছবি আমাদিগকে দেখান। যখন দস্যু-দুর্গে আইভান্‌হো ও রেবেকা উভয়েই বন্দী। তখন রেবেকারই মিনতিতে ও রুগ্ন আইভান্‌হোর ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হয়। এই দৃশ্যটী এত সুন্দর, ইহাতে কবি রেবেকার হৃদয়ের তরঙ্গায়িত ভাব-রাশির ছবি এত সুন্দর তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন যে আমরা সেই দৃশ্যটীর ঈষৎ বিস্তারিত ভাবে এই স্থানে বর্ণনা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আশা করি, ছবির সৌন্দর্য্যই যথেষ্ট justification হইবে। এইরূপে যখন বিধির বিচিত্র লীলায় রেবেকা দস্যু-গৃহে নিভৃত কক্ষে আপনাকে এই রুগ্ন বিভিন্ন কুলশীল তরুণ যোদ্ধার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত দেখেন, তখন তাঁহার চাঞ্চল্য কি না অসংখ্য ভাবব্যঞ্জক। এ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলে কাহারও তাঁহার রহস্যের কথা বুঝিতে বাকী থাকিবে না! "Her voice faltered and her voice trembled" তিনি কোন দেবীর পাষাণ মূর্ত্তির মত সেইখানে শুধু বিরাজিতা ছিলেন না—হাত কাঁপিতেছিল কণ্ঠস্বরও কাঁপিতেছিল। সারা অঙ্গ একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের হিল্লোলে টলটল্ করিতেছিল। তারপর তিনি আইভান্‌হোর নাড়ী দেখিলেন এবং তাঁহার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কিরূপভাবে, কবি নিজেই তাহা বর্ণনা করুন!

As she felt his pulse and inquired after his health there was a softness in her touch and in her accents,inplying a kinder interest than she would herself have been pleased to have voluntarily expressed."(CH. XXIX.)

তিনি voluntarily স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এতটাinterest দেখাইতেন না। কিন্তু কি করিবেন—হঠাৎ কোথা হইতে "বাঁশী বাজিয়া উঠিল," "প্রাণ কেমন করিল" আর তাঁহাকে "যাইতে হইল"। হৃদয়ের এই বিচিত্র লীলা দেখিয়া স্বয়ং রেবেকাই আশ্চর্য্য হয়েন—Rebecca herself was astonished at the smeen sensation of pleasure which she experienced even at a time when all around them both was danger (ibid) কিন্তু তাহা বলিয়া কি আইভান্‌হো ঘুণাক্ষরে এই বিহ্বলা বালিকার গুপ্ত কাহিনী জানিতে পারিয়াছিলেন ?—না। নিভৃত কক্ষে একাকিনী প্রিয়জনের পার্শ্বে থাকিয়া চঞ্চল হইয়াও এই চাঞ্চল্যকে তাঁহার দুষ্প্রাপ্য বাঞ্ছিতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে দেন নাই। আর তিনি আইভান্‌হোকে দ্বিতীয় বার পাইলেন কখন ?—ঘোর বিপদের সময়, যখন মনের সঙ্কোচ দূর হয়। কবি নিজেই এই অনুপম পরিচ্ছেদটী আরম্ভ করিতেছেন এই বলিয়া যে A moment of peril is often also a moment of open hearted kindness and affection. We are thrown off our guard by the general agitation of our feelings, and betray the intensity of those which at more tranquil periods our prudence at least conceals, if it cannot altogether suppress them." (Ch. XXIX) কিন্তু এইরূপ সঙ্গীন সময়ে পড়িয়াও রেবেকা আইভান্‌হোকে আপনার হৃদয়ের কোন চাঞ্চল্যই জানিতে দেন নাই। আর একটা কথা—এই দৃশ্যটীর অবতারণা করায় স্কট্ অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছেন আপনার কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিবার। আর প্রলয়ের কোলে এই যুগল মূর্ত্তিকে ফেলিয়া দিয়া স্কট্ যে সুন্দর ছবি খানি আঁকিয়াছেন, বঙ্কিম বাবু সেইরূপ সজীব ছবি আঁকিবার সুযোগ কোথাও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। আমরা একটু অপেক্ষা করিয়া এই প্রলয় দোলায় দোদুল্যমান দুইটী প্রাণীকে লক্ষ্য করিব। চারিধারে ঘন ঘন প্রলয় বিষাণ বাজিতেছে, প্রলয় রুদ্র মূর্ত্তিতে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, কোন তৃতীয় ব্যক্তি নিকটে নাই—বালিকাটী কী ভীত হইয়াছিল ? না—এই প্রলয়ের রুদ্র মূর্ত্তিতে ভীত হওয়ার কোন চিহ্ন বালিকাতে লক্ষিত হয় নাই, বরং প্রিয়জনকে এত নিকটে পাইয়া প্রলয় যেন তাহার কাছে নিবিয়া গিয়াছিল, সে এক অনির্ব্বচনীয় হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল "In finding herself once more on the side of Ivanhoe।

কিন্তু এত নিকটে থাকিয়াও যুগব্যাপী কুসংস্কারের প্রাচীর উভয়ের মধ্যে হিমাচলের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদিগকে তফাৎ করিয়া দিয়াছিল। সরলা বালিকা প্রেমের আবেগে এই প্রাচীরের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল, আইভান্‌হোর একটী সামান্য কথায় তাহার চমক ভাঙ্গে, তখন সে ব্যথিত হইয়া আপনমনে বলে : "His war horse his hunting hound. are dearer to him than the despised jewess" (Ibid)

(ক্রমশঃ)

বহুরূপী বিদ্যা
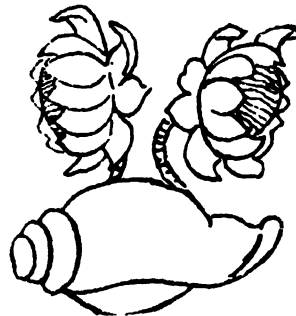
[৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত]

কিম্বদন্তী আছে যে, কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলে, "সীতার প্রতি যখন তোমার অনুরাগ, তুমি রামরূপ ধরিয়া তাহার মন হরণ করিলে না কেন ?" রাবণ উত্তর করিলেন, "আমি এরূপ কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু যে রূপ ধারণ করিতে হয়, সে রূপ ধ্যানের প্রয়োজন ; নচেৎ সে রূপ ধারণ করা যায় না। রাম রূপ ধারণ করিতে গেলে রামের ধ্যানের প্রয়োজন, কিন্তু রামরূপ ধ্যান করিলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরবধূর ধ্যান করিব কি ?" কথাটী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশ করে, বহুরূপী নটের কার্য্যেও বিশেষ উপদেশপ্রদ। মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোক সভায় পঠিত যে প্রবন্ধ "অর্চ্চনায়" "অভিনয় ও অভিনেতা"—নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে অভিনেতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, অভিনেতা যে ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, কেবল সে ভূমিকা বুঝিলেই অভিনেতার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে ভূমিকার ধ্যান অভিনেতার প্রয়োজন ; যে ধ্যানমুগ্ধ হইয়া অভিনেতা অনেক সময়ে নাটককারকে মুগ্ধ করিয়াছেন। অনেক সময়ে অভিনয়কালীন নাটকের অভিনয় দর্শনে বুঝিয়াছেন যে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি বোঝেন নাই, অভিনয় দর্শনে তাহা বুঝিলেন। "অভিনয় ও অভিনেতা" প্রবন্ধে তাহার দৃষ্টান্তও আমরা দিয়াছি। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যে নাটককার লিখিয়াছেন, অথচ বোঝেন নাই কিরূপে ? তাহার কারণ এই, যে তন্ময় অবস্থায় তিনি লিখিয়াছেন, তাহার পর সে অবস্থা তাঁহার স্মরণ থাকে না। অভিনেতার তন্ময়ত্বে নাটককার তাঁহার তন্ময়ত্ব প্রত্যক্ষ করেন, এই তাঁহার চমৎকৃত হইবার কারণ। বলিয়াছি, ভূমিকা (Part) বুঝিলেই অভিনেতা হয় না, নাটককার সকল সময়ে অভিনেতা নয়। সেক্সপীয়র 'হ্যামলেটের' ghost মাত্র সাজিতে পারিতেন। কেবল ভূমিকা বুঝিয়া নয়, কেবল মানসিক ধ্যানে নয়, ধ্যানস্থ ছবি তাঁহার দেহে পরিণত করিয়া অভিনেতাকে অভিনয় করিতে হয়। তাঁহার মাংসপেশী সকল ইচ্ছামত চালিত হওয়া চাই,—প্রেমিকের প্রেমিকা দর্শনে তাঁহার প্রেমভাব বদনে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক ; কাহাকেও বা মৃত্যু শয্যায় মুমূর্ষের ন্যায় দর্শক দেখিবে। যে ভাবের অভিনয় হইতেছে সেই ভাব সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাইবে। এ সকলে বেশের (Make up) সাহায্য অত্যাবশ্যক। কোন যুবা বেশের সাহায্য ব্যতীত বৃদ্ধ সাজিতে পারে না, প্রৌঢ়াবস্থার অভিনেতাকে সাজের সাহায্য ব্যতীত প্রণয়মুগ্ধ যুবা দেখাইবে না। অভিনেতা ধ্যানে নিজ ভূমিকানুসারে প্রত্যেক ভূমিকার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে না শিখিলে তিনি ভ্রম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। গদাধারী ভীমের বেশ, ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের সাজিবে না ; এলোকেশী দ্রৌপদীর বেশভূষা মলিন বসনা জানকী হইতে বিস্তর প্রভেদ হইবে। অবশ্য এক ব্যক্তির সকল ভূমিকা শোভা পায় না। যথা—কোন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি লম্বোদর ব্যক্তি হাস্যরস উদ্দীপনের বিশেষ উপযুক্ত। সুন্দর সুগঠন পুরুষ নায়কের উপযুক্ত, অবশ্য খর্ব্বাকার কখনও দীর্ঘাকার হয় না, স্থূলদেহ কখনও সুঠাম হয় না। কিন্তু সুঠাম দেহ যাহা অভিনেতার হওয়া উচিত, তাহা বেশ-সাহায্যে বিকৃত করা যায় ; এবং যদি আকারে বিশেষ অন্তরায় না থাকে, রূপবান পুরুষ না হইলেও তাহাকে রূপবান সাজান যায়। কিন্তু প্রত্যেক অভিনেতাকে প্রত্যেক ভূমিকায় বুঝিতে হইবে, কিরূপ সজ্জা তাঁহার ভূমিকার উপযোগী হয়। প্রেমিক উপযোগী সরল সুঠাম কোমল বাহু সব্যসাচি অর্জ্জুনের চলিবে না। ধনুর্গুণ ঘর্ষণে কঠিন হস্ত, যাহা শঙ্খ দ্বারা আবরিত করিয়া অর্জ্জুনকে বিরাট গৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে হইয়াছিল তাঁহার সে রমণী চিত্তাকর্ষক ধীরমূর্ত্তি একরূপ এবং পঞ্চবান ধারী মদন মূর্ত্তি অন্যরূপ—বেশের সাহায্যে তাহা দর্শক দেখিবে। কোন্ ভূমিকায় কি বেশের প্রয়োজন, তাহা রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার বা নাটককার অপেক্ষা অভিনেতার বোঝা আবশ্যক। দর্পণ সাহায্যের কল্পনায় তাহার কিরূপ মূর্ত্তি হওয়া উচিত, তাহা অভিনেতাই অবগত। অবশ্য নাট্যকার একরূপ ধারণা করিয়াই লিখিয়াছেন, তিনি 'খড়ির আদরা' আঁকিয়াছেন, রং ফলাইতে হইবে অভিনেতাকে, ছবিকে প্রাণ দিতে হইবে অভিনেতাকে, ইহা অভিনেতার ধ্যানের প্রাণ, অন্যে তাহা জানে না।

পাশ্চাত্য বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়ে দেখা যায় যে ধ্যান অনুসারে বেশের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যথা—Mrs. Siddonsএর Lady Macbeth এর বেশ এবং Sara Barnhardt (বার্ণহার) এর Lady Macbethএর বেশ ধ্যানানুসারে প্রভেদ। মিসেস্ সিডনসের Lady Macbeth উগ্রস্বভাব, স্বামীসঞ্চালনকারিণী, ক্রূরকর্ম্মা নারী মূর্ত্তি। বার্ণহার (Barnhardt) লেডী ম্যাকবেথ স্বামী অনুরাগিনী মূর্ত্তি। তিনি সিংহাসন প্রয়াসী নন ; মিসেস সিডনস্ উচ্চাভিলাসী সিংহাসন প্রয়াসী। আমাদের যে প্রবন্ধ "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখ করিয়াছি যে, এদেশে রামলীলাতে প্রতি বৎসর যেরূপ

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বদল হয়, বিলাতে সেইরূপ প্রতি বৎসর রোমিও জুলিয়েট বদল হয়। কিন্তু প্রতি বৎসরে প্রত্যেক রোমিও জুলিয়েটই কোন না কোন প্রকার নূতন ভাবে দর্শকের সম্মুখীন হয়। প্রত্যেক রোমিও জুলিয়েটের ধ্যান্ পরস্পর স্বতন্ত্র এবং সেই ধ্যানানুসারে তাঁহাদের পরিচ্ছদও পরিবর্ত্তিত হয়; নতুবা দর্শক নূতনত্ব দেখিত না।

অভিনেতার ধ্যানের মূর্ত্তি অভিনেতার প্রকৃত মূর্ত্তি নয়। সাজের সাহায্যে তাঁহার শরীরে ধ্যানের মূর্ত্তি যতদূর প্রকাশ পায়, নিশ্চয় তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে। রং পরচুলা, মোম ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সাহায্যে এতদূর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভব যে, পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে পরম আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে চেনা যাইবে না। একজন সুন্দর পুরুষ কাফ্রী সাজিয়াছে, কালো রংএ রং ঢাকিয়াছে। নাকের অগ্রভাগ দড়ি দিয়া তুলিয়া দড়ির রংএর সহিত মিলাইয়া দিয়া কাফ্রির নাসিকা করিয়াছে, গালের হাড় মোম দিয়া উঁচু করিয়াছে, মোম দিয়া ঠোঁট পুরু করিয়াছে, কোঁকড়া পরচুলা পরিয়াছে, পোষাকও কাফ্রীর মত। কাফ্রীর চলন অনুকরণ করিয়াছে; ইহাতে সহজে তাহাকে চেনা কোন রকমেই যায় না।

অভিনেতা কুরূপই সাজুক বা সুরূপই সাজুক, এমন কি ভিখারী সাজিলেও যে সাজে দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক হয়, সে সাজ পরিহার্য্য। কেননা দর্শক আমোদ করিতে আসিয়াছে, গলিত কুষ্ঠরোগী ভিখারী দেখিয়া তাহার আমোদের নিতান্ত ব্যাঘাত হইবে। এ আবার এক তর্কের স্থল; কেহ বা বলিবেন,—"স্বাভাবিক দেখান উচিত।" কিন্তু যদি বোঝেন, কলাবিদ্যা ও স্বভাব এক নয়, কলাবিদ্যা বলে স্বভাবছবি হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয় মাত্র, কলাবিদ্যা আনন্দপ্রদ, যদি ইহা সকলে বুঝিতেন, তাহা হইলে "স্বাভাবিক" "স্বাভাবিক" বলিয়া এত চীৎকার করিতেন না।

চিত্রকরের ন্যায় অভিনেতারও রং বোঝা আবশ্যক। চিত্রকর যেমন তাঁহার অঙ্কিত ছবি কোথা হইতে দর্শক দেখিবে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ রং দেন, অন্যাবস্থায় তাঁহার ছবি দেখিলে তাঁহার চিত্র বিদ্যা সেরূপ বোঝা যায় না। অভিনেতাও সেইরূপ দর্শক যাহাতে তাহার সজ্জিতরূপের ছবি সম্পূর্ণ পায়, সেই অনুসারে রং মাখিবেন। দৃশ্যপট দিনের বেলায় দেখিলে এক কথা স্পষ্টরূপ প্রকাশ পাইবেন। রজনীতে দূর হইতে দর্শক দেখিবে, চিত্রকর সেইভাবে লিখিয়াছেন। দৃশ্যপট দীপালোকে দূর হইতে ভ্রমোৎপাদন করে, দিবালোকে মোটা মোটা রংএর দাগ দেখা যায়। অভিনেতাকেও রং মাখিবার সময় বিবেচনা করিতে হইবে যে বৈঠকখানায় যেরূপ পাউডার মাখিয়া সুন্দর হইলে চলে, রঙ্গমঞ্চ হইতে সেরূপ চলিবে না। বেশী করিয়া লাল রং তাহার গালে দিতে হইবে, তবে গোলাপ আভার ন্যায় দূর হইতে দেখাইবে। ক্ষুদ্র চক্ষু বৃহৎ দেখাইতে গেলে চোখের কোণে কাজলের রেখা বিশেষ কারয়া দিতে হইবে বা চক্ষু কোঠরাগত করিতে হইলে চোখের কোণে বেশী করিয়া কালো রং দেওয়া আবশ্যক। দোকানে পরচুলা ভাল দেখিয়া না লইলে চলিবে না, পরচুলা তাহারই উপযুক্ত হওয়া উচিত। অংশ (part) অনুসারে বৃহৎ ললাট বা ক্ষুদ্র ললাট হওয়া তাহার প্রয়োজন, তাহাকে প্রয়োজন অনুসারে ফরমাস দিতে হইবে, ভাল পরচুলাটী দেখিয়াই পরিলে চলিবে না। আমরা দেখিতে পাই, যদি কেহ পরের দেখিয়া চুল ফেরান তাহাতে অনেক সময়ে কদর্য্য দেখায় কিন্তু যদি নিজের আকার অনুসারে অনুকরণ না করিয়া যেভাবে তাঁহাকে শোভা পায় সেইভাবে চুল ফেরান, তাহা হইলে সুন্দর দেখায়। অতএব কিরূপ পরচুলা ও পরিচ্ছদ তাঁহাকে ভাল দেখাইবে, তাহা অভিনেতার বিশেষ বোঝা আবশ্যক।

নাটকের ভাল ভূমিকা লইয়া সকলেই কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু কোন ভূমিকা তাহার শোভা পাইবে, বেশ ভূষা করিলে সে ভূমিকায় তাহাকে কিরূপ দেখাইবে, ইহা বিবেচনা না করিয়া যদি ম্যানেজারের প্রতি কেহ ক্রুদ্ধ হন, তাহা যে কেবল অসঙ্গত হইবে তাহা নয়—তিনি যে ভূমিকা না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তাহা পাইলে দর্শককে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া কল্পনারাজ্যে দর্শককে আনা তাহার কার্য্য। সেই কার্য্যের সহায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান; দ্বিতীয়—ধ্যানানুসারে অভ্যাস; তৃতীয়—সজ্জা। তৃতীয় হইলেও সজ্জার স্থান সামান্য নয়। তিনি অভিনয় করিতে না পারিলেও যদি তিনি ভূমিকানুসারে ঠিক সাজিতে পারেন, তাহাতেও ভূরি ভূরি প্রশংসাভাজন হইবেন। অভিনেতার কার্য্য যিনি সামান্য জ্ঞান করেন, তিনি ধ্যানাভ্যাস ও সাজের কথা কিছুই বুঝিবেন না, যিনি বুঝিবেন তাঁহার জন্যই প্রবন্ধ লিখিলাম। যিনি না বুঝিবেন, তিনি যেন বৃদ্ধ বলিয়া আমায় মার্জ্জনা করেন।

(নাট্য মন্দির)
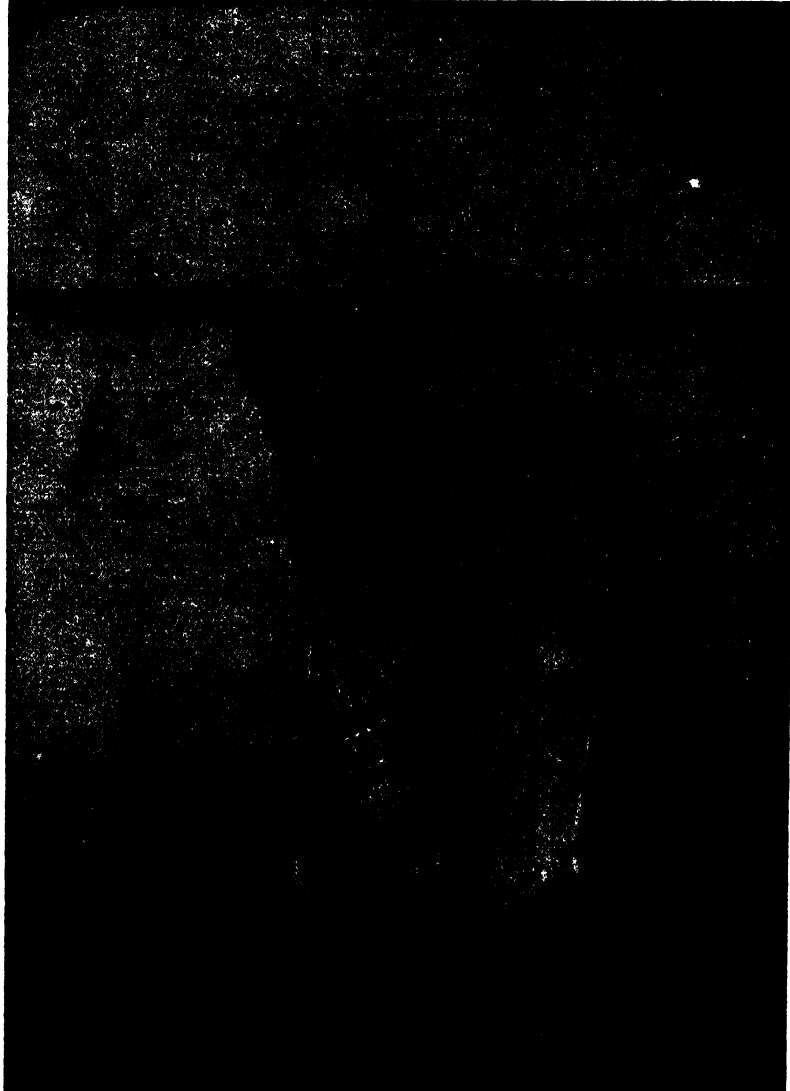
সিনয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি।

* ● * *

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৯ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩২। [৩৭শ সপ্তাহ

ভেন্‌ডিক্

গেইনস্‌বরো নামে ইংলণ্ডের একজন প্রধান চিত্রশিল্পী ছিলেন; তিনি মৃত্যুশয্যায় শুইয়া বলিয়াছেন—"আমরা সকলেই স্বর্গে যাইব—সেখানে ভেন্‌ডিকের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হইবে।" এই ভেন্‌ডিক কে ছিলেন তোমরা জান কি? তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর। সেই কবে তিনশত বৎসর আগে ভেন্‌ডিক জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু আজও তাঁহার নাম কেহ ভোলে নাই। ভেন্‌ডিকের চিত্র পৃথিবীর সকলের কাছেই আদরণীয়।

ভেন্‌ডিকের জীবনের বেশী ভাগটা ইংলণ্ডে কাটিয়াছিল; এমন কি সেখানে মরিলেও কিন্তু জাতিতে তিনি ইংরেজ ছিলেন না। ভেন্‌ডিক ছিলেন বেলজিয়াম। ১৫৯৯ খৃঃঅঃ ২২শে মার্চ্চ এন্‌টোয়ার্প নগরে ভেন্‌ডিকের জন্ম হয়। ভেন্‌ডিকের বাপ মস্ত বড় ধনী সওদাগর ছিলেন। জগতের অধিকাংশ শিল্পীর জীবনেই দুঃখ দৈন্যের সহিত লড়াই করিতে হইয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে ভেন্‌ডিকের বাল্যে বা যৌবনে দুঃখ দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় নাই। ছেলেবেলা হইতেই বালকের মন চিত্র-শিল্পের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, অতি শৈশবেই তাহার বিকাশও হইয়াছিল। শৈশবে সহরের একজন বিখ্যাত চিত্র শিল্পীর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ভেন্‌ডিক্ সে যুগের রুবেন্‌স নামক একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের কাছে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রুবেনসের নাম তখন লোকের মুখে মুখে। ইতালি হইতে তিনি চিত্র শিক্ষা শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ভেন্‌ডিক্ এহেন বিখ্যাত শিল্পীর শিষ্য হইয়া ধন্য জ্ঞান করিলেন। রুবেন্‌স্ এই তরুণ শিষ্যের নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন—তাঁহার আদর্শ, তাঁহার রঙ্ ফলান—ভেন্‌ডিক্ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিখিয়া ফেলিল। রুবেন সংকীর্ণমনা ছিলেন না, তিনি আনন্দে গদগদ হইয়া—

শিষ্যকে বলিলেন—"তুমি ইতালিতে যাও, চিত্র শিল্পীদের—আদর্শ মহাপুরুষগণের চিত্রগুলির আলোচনা করিয়া আইস।"

ভেন্ডিকের সে সময়ে ইতালি যাওয়া হইল না। রুবেনসের কাছেই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এন্টোয়ার্প নগরের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি এন্টোয়ার্প শিল্প পারিষদের একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহার পর বৎসর সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে 'ক্রুশে বিদ্ধ যীশুর' একখানা ছবি আঁকিয়া সেখানকার গীর্জ্জায় উপহার দিলেন।

এ সময়ে ভেন্ডিকের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। তাঁহার যশের কথা চারিদিকেই প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। এ যুগে ইংলণ্ডে শিল্পীদের বড় আদর ছিল। রাজা যেমন চিত্রের আদর করিতেন, শিল্প ভালবাসিতেন, তেমনি পৃথিবীর কোন দেশে কোনও শিল্পীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি শুনিলে, তাঁহাকেও অর্থের দ্বারাই হউক বা অন্য কোনরূপ সম্মান বা প্রতিপত্তির লোভ দেখাইয়াই হউক, ইংলণ্ডে লইয়া আসিতেন। রাজার ন্যায়—দেশের বড় লোকেরাও শিল্পীর প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন।

টমাস্ নামে একজন বড় জমিদার অত্যন্ত চিত্রানুরাগী ছিলেন। তাহার নিযুক্ত লোকেরা কোন্ দেশে কে বেশ বড় নামজাদা শিল্পী আছেন—নানা দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সংবাদটা তাঁহাকে জানাইতেন। বেলজিয়াম হইতে তাঁহার একজন অনুচর পত্র লিখিল—"এখানে ভেন্ডিক্ নামে একজন তরুণ শিল্পী আছে। বেশ নাম করিয়াছে। তার গুরু রুবেন্সের চেয়ে সে কম প্রতিভাশালী একথা আমার মনে হয় না। তবে ভেন্ডিকের অবস্থা বেশ ভাল, সে যে দেশ ছাড়িয়া আসিবে তা মনে হয় না।

অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়া গেল। যে বৎসর রুবেনস্ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছে, এ সংবাদ শুনিয়া তরুণ-শিল্পী ভেন্ডিকের মনেও ইংলণ্ড যাইবার বাসনা বলবতী হইল। ভেন্ডিক ইংলণ্ডে আসিলেন প্রথম জেমস্ তখন ইংলণ্ডের রাজা। তিনি ভেন্ডিকের বেতন ধার্য্য করিলেন—বৎসরে একশত পাউণ্ড। ভেন্ডিকের এদেশে মন টিকিল না, তিনমাস পরে আট মাসের ছুটি লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। আট মাস কাটিয়া গেল কিন্তু শিল্পী আর ফিরিলেন না। ভেন্ডিক—এই সুযোগে ইতালি চলিয়া গেলেন। ইতালী যাইবার পূর্ব্বে গুরু রুবেন্সকে একখানা চিত্র উপহার দিয়া গেলেন।

ইতালি যাইবার পথে বেলজিয়ামের বহু নগরের মধ্য দিয়া গেলেন। যে নগরে যে সকল চিত্রশালা ছিল যেখানে যিনি বিখ্যাত শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাদের সকলের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। এইভাবে পথ চলিতে চলিতে ইতালি পৌছিবার পূর্ব্বেই—তাঁহার টাকার অনটন হইল, সেই অভাব পূরণের জন্য তাঁহার—মানুষের প্রেতমূর্ত্তি আঁকিতে হইয়াছিল।

ইতালিতে কি ভাবে তাঁহার জীবন কাটিয়াছিল, সেখানে তিনি কি করিয়াছিলেন, সে সব কথার বিস্তারিত পরিচয়ের কোনও প্রয়োজন নাই। সাত বৎসর কাল নানা দেশে ঘুরিয়া তিনি আবার ইংলণ্ডে আসিলেন! এ সময়ে চার্লস ষ্টুয়ার্ট ইংলণ্ডের রাজা—তিনি ভেন্ডিককে একেবারেই আমল দিলেন না! অভিমানী শিল্পীর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—তিনি আবার দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন কেমন খেয়াল হইল, ভেন্ডিক্ ঘোড়ায় চড়িয়া—ফ্রান্স হাল্স নামক বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্রশালায় যাইয়া তাহাকে বলিলেন "মহাশয়! আমার প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া দিন।" হাল্স—দুই ঘণ্টার মধ্যেই ভেন্ডিকের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিলেন! হালস্ কিন্তু আগন্তুক যে তাহা জানিতেন না।

ভেন্ডিক বলিয়া উঠিলেন—"প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা দেখিতেছি বড় সহজ. আমায় একবার রঙ ও তুলিটা দিন্ ত, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।"

দুই ঘণ্টা সময়ও লাগিল না। ভেন্ডিক হাল্সের ছবি আঁকিয়া ফেলিলেন। কি স্বাভাবিক! কি সুন্দর রঙের বাহাদুরী, একেবারে যেন জীবন্ত ছবি। এইবার দুইজনের পরিচয় হইয়া গেল। দুইজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল।

ভেন্ডিক—প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে যাইয়া হাত আঁকিতে খুব মনোযোগ দিতেন। তাঁহার আঁকা প্রত্যেক ছবিতেই এই বিশিষ্টতা দেখিতে পাইবে। সমালোচকেরাও

বলেন যে তাহার ন্যায় হাত আঁকিতে কেহ পারিতেন না। একবার ভেন্‌ডিক একজন সুন্দরী স্ত্রীলোকের ছবি আঁকিতেছেন। রমণী বলিলেন—"আমার মুখের চাইতেও দেখিতেছি আপনি আমার হাত আঁকিতে বেশী সময় দিতেছেন, কেন বলুন ত ?" ভেন্‌ডিক্ হাসিয়া বলিলেন—"আপনি যে হাত দিয়ে আমাকে বেশ একটা বড় রকমের পুরস্কার দিবেন, সে জন্ম হাত দু'খানা খুব যত্ন করিয়া আঁকিতেছি।"

ভেন্‌ডিক—সাধারণতঃ খুব তাড়াতাড়ি কাজ করিতেন না—বেশ ধীরে আস্তে কাজ করিয়া যাইতেন। কাহারও ছবি আঁকিতে হইলে তাহাকে ন্যূন পক্ষেও চৌদ্দ পনের বার বসাইতেন। তাঁহার আঁকা নিকোলাস্ লাইনার্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের চিত্রের কথাটা চার্লসের কাণে পৌছিল। চার্লস পণ করিলেন যত টাকাই লাগুক না কেন এই শিল্পীকে ইংলণ্ডে আনিতেই হইবে। চার্লস পণ রক্ষা করিলেন। ১৬৩২খৃঃ অঃ তৃতীয়বার ভেন্‌ডিক ইংলণ্ডে আসিলেন।

চার্লস চিত্র শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সভায় অনেক শিল্পী ছিলেন। তাঁহার কাছে ভেন্‌ডিককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইল। চার্লস তাঁহাকে রাজচিত্রকর নিযুক্ত করিলেন—দু'খানা বাড়ী দিলেন এবং উপযুক্ত বিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভেন্‌ডিক এদেশেই বিবাহ করিলেন।

তাঁহার নাম ও যশের ধারা যখন পূর্ণ বেগে ছুটিয়াছিল, সে সময়ে তিনি একে একে রাজা, রাণী এবং রাজপরিবারের ছেলেমেয়েদের অনেক গুলি ছবি আঁকিলেন। দেশদ্রোহী রাজা চার্লসের চিত্র—এক নূতন ভাবে তাঁহার শিল্পী-বন্ধুর তুলির মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজার কাজ করিয়াই যে তাঁহার সময় যাইত তাহা নহে—কতলোক যে তাঁহার দ্বারা চিত্র অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

রাজ প্রাসাদের ভোজনাগারটী চিত্রিত করিবার জন্য রাজা ভেন্‌ডিকের উপর ভার দিলেন। ভেন্‌ডিক এই কাজটির জন্য আটলক্ষ টাকা পারিশ্রমিক চাহিলেন। কিন্তু টাকা কোথায় ? টাকাও সংগ্রহ হইল না—কাজও হইল না।

এদিকে চার্লসের অত্যাচার ও অবিচারে দেশের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজাশক্তির অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাশক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, রাজশক্তি অস্তমিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভেন্‌ডিকের আশা ও ভরসা বিলুপ্ত হইল।

ভেন্‌ডিকের ইংলণ্ডে অর্থাভাবে সময় সময় ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। রাজকোষে টাকা নাই, সময় মত বেতন পাইতেন না, অথচ খাওয়া দাওয়া বিলাস সবই চলিয়া গায়ক বাদ্যকার দিগকে তিনি বেতন দিয়া রাখিতেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার সমুদয় আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল। এসময় কোথায় অভাব ঘুচাইবার জন্য একটু বেশী পরিশ্রম করিয়া চিত্রের দর বাড়াইয়া দিবেন, তাহা না করিয়া কি উপায়ে সোনা তৈয়ারী করা যাইতে পারে সে খেয়ালে মাতিয়া রহিলেন। অভাবে পড়িলে মানুষের কত রকম দুর্ব্বলতাই না আসে।

রাজা চার্লসের সহিত তাঁহার সত্য সত্যই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিদ্রোহী প্রজার আক্রমনের ভয় তুচ্ছ করিয়াও চার্লস নৌকায় বন্ধু ভেন্‌ডিকের চিত্রশালায় আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। চার্লসের শত দোষের মধ্যেও এইরূপ অকৃত্রিম শিল্পানুরাগ তাঁহাকে চিরস্মরনীয় করিয়া রাখিবে।

চার্লসের শোচনীয় মৃত্যুর আট বৎসর পর ১৬৪১ খৃঃ অঃ ভেন্‌ডিকের মৃত্যু হইল। গেইনসবোরোর ভবিষ্যদ্বানী বোধ হয় সফল হইয়াছে—স্বর্গে তাঁহারা মিলিত হইয়াছেন। ভেন্‌ডিকের অগনিত চিত্র পৃথিবীতে নানাস্থানে এখনও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ভেন্‌ডিক মানুষটি চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাম কি কেহ ভুলিয়াছে ?

ভেন্‌ডিক্

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর ভেন্‌ডিকের প্রতিমূর্ত্তি। শিল্পীর মুখে চোখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুখখানি যেন সরলতা মাখা, চোখ দুটিতে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিহিত রহিয়াছে। কি সুন্দর মুখ, কি সুন্দর আঁকা হাত। কি সুন্দর কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুলগুলি। চিত্রটি দেখিলেই মনে হয় চিত্রকর আমাদের সম্মুখে জলজ্যান্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এইখানেই চিত্রকরের তুলির সার্থকতা। ইংলণ্ডের রাজা চার্লসের ইনি বেতনভোগী চিত্রকর ছিলেন। মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে ইঁহার নিপুণতা ছিল অসাধারণ।

দুই বন্ধু

—ভেনড়িক্—

এক সরল শিশু ও তাহার প্রিয়তম বন্ধু—দুইটি কুকুরের ছবি। শিশু—তাহার বন্ধু দুইটিকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে! শিশুর মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে—সে যেন তাহার বন্ধু দুইটিকে কি বলিতেছিল, তাহারাও বন্ধুর কথা বুঝিয়া—ঊর্দ্ধমুখে তাহার দিকে চাহিয়া নীরব দৃষ্টিতে কত কি কহিতেছে! ছবিটির মধ্যে একটি ভাব বড় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবি দেখিলেই মনে হয় শিশুটি জানে কুকুর দুইটির সে শুধু সঙ্গীই নয়, প্রভুও বটে, কুকুরেরাও যে সে সংবাদটা ভালরকমই জানে তাহা তাহাদের নাক, চোখ, মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সাধের বউ

[৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত]

শরৎচন্দ্রের বিবাহ দিয়া বউ ঘরে আনিলেন, কিন্তু বউটী শ্বাশুড়ীর কুদৃষ্টিতে পড়িলেন। বউয়ের নাম কিশোরী। কিশোরী যে কুৎসিত ছিল এমন নয়,—তবে পাঁচ পাঁচি রকমের ছিল। কুদৃষ্টিতে পড়িবার কারণ যে, বউএর যে সকল গহনা পত্র, দান সামগ্রী দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে ধরে নাই। প্রতিবেশী মেয়েরাও সব ছিঃ ছিঃ করিয়া গিয়াছে। যদিও গুনাগুতে বউএর বাপ কম দেয় নাই, যাহা যাহা দিবার সব দিয়াছে, তবু শরতের মা বলেন, সব ফক্কিবাজী গয়না। শরতের মা বলেন, বউকে যন্ত্রণা দিয়া বউএর বাপের কাছে ভাল ভাল গহনা আদায় করিবেন। কিন্তু বউএর বাপ মেয়ে পার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—সুতরাং শরতের মার আশা পূর্ণ হইল না।

বউটী আটকা পড়িল; বাপের বাড়ীর লোক আসিলে, শরতের মা দেখা করিতে দেন না, কান্নাকাটি করিলে দুর্ব্বাক্য বলেন, বউটীর তখন বয়স ১১ বৎসর। কিন্তু শরতের মার চক্ষে ১৪ বৎসরের বুড়ো ধাড়ী মেয়ে। বিবাহের একমাস পরেই বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া—যতরূপ রাঁদীর পাট আছে—বউটীকে করিতে হইত। বালিকা ভাল পারিত না,—ইহার দরুণ প্রথমতঃ দুর্ব্বাক্য—তারপর ঠোনাটা আস্‌টাও চলিল। একজন মেয়ে রাঁধুনী ছিল, বিবাহের মাস ছয় পরে সে বাড়ী যায়,—শরতের মা ভাবিলেন, আর রাঁধুনী রাখার প্রয়োজন নাই, বউকে হাঁড়ী ঠেলিতে দিলেন। দাসীর কাজ; রাঁধুনীর কাজ—উভয়ই এখন বউএর উপর। তারপর দুপুরের সময় শরতের মা শুইয়া যখন একটু আলিস্যি রাখিতেন, সকাল হইতে বকিয়া বকিয়া চারিটী ভাত খাইয়া, যখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেন, তখন বউকে পাকাচুল বাছিতে হইত, পা টিপিতে হইত। একে তো বউএর রান্নার দৌরাত্মিতে অরুচি হইয়াছিল, ভাল খেতে পাচ্ছেন না, তার উপর ভাল পা টিপিতেও বউ পারে না—এ সমস্ত বজ্জাতি মাত্র। বুড়ো হাতী মেয়ে—পা টিপিতে পারিবে না কেন? তবে বজ্জাতির তো ওষুধ আছে। পা টিপিবার সময় আর বকা ঝকি করিতেন না; এক আধটা লাথি টাতি দিতেন। বউএর ভাত খাওয়ার সময় বিশেষ তদন্ত করিতেন,—পাছে বেশী খাইয়া পেটের অসুখ হয়। পাড়াশুদ্ধ লোক জানে বউটা হাঁড়ী খাকি। এ অবস্থায় বালিকা দিন দিন শীর্ণা হইতে লাগিল। অবশ্য সেও তার বজ্জাতি। তেমন তেমন শ্বাশুড়ি হইলে মুখটা উনোনের মধ্যে গুঁজড়িয়া ধরিয়া বজ্জাতি ভাঙ্গিতে পারিত, তিনি কেবল দয়াগুণে সেরূপ ব্যবহার করেন না। শরৎ দিবারাত্র শুনিতেন যে, পৃথিবীর যত দোষ আছে—সে সমস্ত দোষের আধার—এই বৌ। মরেও না—যে শরতের এবার বে দিয়ে মনের মত বউ ঘরে আনেন। শরতের ও বউয়ের উপর বড় ঘেন্না। মলিন বসন, শীর্ণ মলিন কান্তি।—চুলে কখনও চিরুণী পড়ে না। শরতের কাজেই স্ত্রীর প্রতি বিশেষ বীতরাগ জন্মিল। এক বিছানায় তাহার সহিত শুইতে ঘৃণা জন্মিত। এইরূপে এক বৎসর গত হইল।

শরতের মার বিশেষ খেদ যে, পোড়া যম অন্ধ হইয়া এ বউএর ঘাড় ভাঙ্গে না। যমের এই আলস্যতে বিরক্ত হইয়া একদিন পুরোন হাঁড়ি ভাঙ্গার উপলক্ষ্যে বউকে ধাক্কা মারেন, একখানা শীলের উপর পড়িয়া গিয়া বধূর বুকে আঘাত লাগে;—পূর্ব্বদিনে একটু জ্বরও হইয়াছিল, তাহার দরুণ উপবাস গিয়াছে,—বউটী পড়িয়া মূর্চ্ছা গেল। বউটী ওঠে না,—পা দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন,—"ওমা মলো নাকি? শেষটা কি হাতে হাত-কড়ি দেবে। এমন পোড়া বউও ঘরে এনেছিলুম!' চীৎকারে পাড়ার লোক জড় হইয়া গেল। হাতে মুখে একটু জল দেওয়াতে,—বউটীর চেতন হইল বটে, কিন্তু ভারি জ্বর আসিল।

লোকমুখে বউএর বাপ সমস্ত কথা শুনিলেন; এতদিন

ভাবিতেন যে, জোর করিয়া মেয়েটীকে বাড়ীতে আনিলে মেয়েটী স্বামী সুখে বঞ্চিতা হইতে পারে। কিন্তু অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার পর মায়ের কথায় আর ধৈর্য্য রহিল না, ভাবিলেন—বিধবাও তো হয়! স্বয়ং মেয়ে আনিবার জন্য জামাই বাড়ী গেলেন। বেয়ানঠাকুরুণ যথোচিত তিরস্কার করিলেন, কিন্তু বউএর বাপ দু' একটী কথার যেরূপ উত্তর করিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদ্‌কম্প হইল। বউএর বাপ বলিল যে, তুমি লাথি মারিয়া মেয়ের এই দশা করিয়াছ। আমি পুলিশে জানাইয়া রাখিতেছি। যদি মারা যায়,—খুনের দাবি আনিব। বেয়ানঠাকুরুণের বাক্‌রোধ হইল। ভাবিলেন,—বউ বিদেয় করাই বিধেয়। বেয়াই ও বউ বিদায় হইলে পর, শরতের মার ঝঙ্কার উঠিল। কাঁদিয়া গালে মুখে চড়াইয়া শরৎকে বলিল,—"এ বউকে তুই মা বলিয়া ত্যাগ কর্।" কিন্তু শরৎ তাহা করিল না। ক্রমে শরৎও বুঝিয়াছিল যে, বউএর কোন দোষ নাই। প্রতিবেশী সমবয়স্কের দ্বারা শরৎ তিরস্কৃত হইত। কিন্তু যদিও স্ত্রীকে দেখিতে পারিত না, তথাপি স্ত্রীকে ওরূপ কঠিন ও কুৎসিৎ সম্বোধন করিতে স্বীকার পাইল না।

শরতের মা আবার শরতের বিবাহ দিলেন। এবার সুন্দরী মেয়ে। কেবল মেয়েটী দেখিয়াই বউ ঘরে আনিয়াছে। মেয়েরও বয়স হইয়াছিল—প্রায় বার; অর্থাভাবে তাহার বাপ বিবাহ দিতে পারে নাই। ভাবিয়াছিল, দোজ পক্ষে কোনও বুড়ে বরের সহিত বিবাহ দিবে। শরৎ ভাল ছেলে, কম বয়স,—এই নিমিত্ত সতীনের উপর তবু বিবাহ দিলেন। বউএর নাম কুমুদিনী। এদিকে শরতের মা আহ্লাদ করিয়া পাড়া প্রতিবেশীকে বলিতে লাগিলেন,—আমার যেমন শরৎ, তেম্‌নি কুমুদিনী।—ওমা,—এতদিন বাছাকে যেন পেত্‌নিতে পেয়েছিল।

কুমুদিনী যথন ঘর করিতে আসিল, শাশুড়ী দু' একটা গৃহকর্ম্ম করিতে বলিলেন, কিন্তু কুমুদিনী সে পাত্রী নয়। বাসন তো মাজিবেই না, কশ্মের মধ্যে আপনার পান সাজা ও স্বামীর পান সাজা, তাহা ছাড়া কোন কর্ম্ম করিতে বলিলেই কামড়াইতে আসিত। একটী দেবর ছিল, নাম বসন্ত, তাহাকে খাবার সময় জায়গা করিয়া দিত—দু' একটা পানও তাহার অদৃষ্টে যুটিত। একটু কড়া কথা বলিলেই সাত গুণ তর্জ্জন করিয়া বলিত, "দে মাগী আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দে,—তোর বাড়ী বাঁদীগিরি কর্‌তে এসেছি?" এ কথা শরৎকে বলিলে শরৎ বলিত,—"তা আমি কি করিব—দাও বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

কুমুদিনীর বাপ কামাখ্যানাথ মাঝে মাঝে মেয়েটিকে দেখিতে আসিত। যদি শরতের মা কিছু বলিত যে কুমুদিনী অবাধ্য, কামাখ্যানাথ উত্তর করিত,—"পাগলী—চিরদিনই পাগলি।" বেনঠাকুরুণ বেশী বলিতে পারিতেন না। তিনি নিন্দা করিয়াছেন, একথা যদি কুমুদিনী শোনে, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা নাই! বউটীও বড় পয়মন্ত; শরৎ স্কুল ছাড়িয়া পাটের কলের দালালি করে, তাহাতে কিছু অর্থ পাইয়া, নিজে পাটের কাজ করিয়া কাজ খুব ফলাও করিয়াছে। দাস দাসীর অভাব নাই। এখন আর শাশুড়ী বউ একরকম দেখা সাক্ষাৎ নাই, বলিলেই হয়। শাশুড়ীও ভয়ে ভয়ে বউএর মন যোগাইয়া চলেন।

শরৎ তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীকে ভোলেন নাই। প্রথম প্রথম মাকে লুকাইয়া কিশোরীর কাছে যাইতেন। ক্রমে তিনি যে পূর্ব্ব শ্বশুর বাড়ীতে গমনাগমন করেন, তাহা প্রকাশ হইল। দিন কতক কুমুদিনী ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝি করিয়াছিলেন, কিন্তু শরৎ দৃঢ় বাক্যে বলিয়াছিলেন যে, তুমি যদি কিশোরীর কাছে যাইতে নিষেধ কর—তাহা হইলে আমি তোমার ঘরে আসিব না। কুমুদিনীকে এ কথায় নিরস্ত হইতে হয়।

কিশোরীর একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। নাম বিহারী লাল,—বিহারীলাল ইস্কুলের একটী রত্ন। বিহারী যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সেইরূপ সচ্চরিত্র। মাতৃ শিক্ষায় অতি দয়াবান হৃদয়। শরতের ছোট ভাই বসন্তর একান্ত ইচ্ছা যে, ভাইপোটীকে বাড়ীতে রাখে,—কিন্তু শরৎ তাহাতে কোনও প্রকারে সম্মত ন'ন। বসন্ত, দাদার সহিত পাটের কাজ করেন। এতদ্ব্যতীত রেলওয়ের কনট্রাক্টারীতেও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কারবার দাদার নামেই আছে। বসন্ত খুব যোগ্য, কিন্তু দাদা যা বলেন তাই।

এই সময়ে নাগপুরে একটী রেলওয়ে হইবার কথা উঠে।

সেই রেলওয়ে রাস্তা নির্ম্মাণের কণ্ট্রাক্ট বসন্তকুমার জোগাড় করেন। নাগপুরে যাইবার সময় কুমুদিনীর গর্ভে একটী সন্তান জন্মে; তখনও নাম করণ হয় নাই, কুমুদিনী পিতৃগৃহে প্রসব হ'ন, অবশ্য খরচ পাতি শরৎচন্দ্রের। পিতৃ গৃহে প্রসব হইবার কারণ তিনি শাশুড়ীকে বিশ্বাস করিতেন না, শাশুড়ী যদিও বউএর খোসামোদ করিতেন, বউ গ্রাহ্য করিত না। বসন্তের পরিবারও তেমন বয়স্থা নয়। তাই প্রথম পোয়াতি মার কাছে প্রসব হইতে যান। অধিক বয়সে সন্তান হইলে প্রায়ই পোয়াতির একটা দারুণ পীড়া হয়। পিতৃগৃহেও কুমুদিনীর বিশেষ পীড়া হইল। শরৎচন্দ্রের অর্থের অভাব নাই। চিকিৎসা প্রভাবে আরোগ্য লাভ করিলেন, তখনও সম্পূর্ণ সারে নাই।

তাহার আরোগ্যলাভের পরেই শরতের বড় পীড়া জন্মিল, তারে বসন্তর নিকট খবর গেল। বসন্ত আসিয়া দেখিলেন,—দাদার সাঙ্ঘাতিক অবস্থা; সকলে দাদার নিকট হইতে একটা উইল করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু বসন্ত সম্মত হইল না। বসন্ত বলেন, উইল না করিয়া দাদা যদি দু'দিন বাঁচেন, উইল করিয়া আর দু'দিন বাঁচিবেন না। যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেন, তিনি একজন শরতের বন্ধু। তিনি কিন্তু উইলের পরামর্শ দেন। তিনি নিজেই উইলের কথা বলেন, তাঁহার কথা শুনিয়া শরত বলিল,—"আগে বল নাই, আমার এখন আর সময় নাই। কিন্তু যে যে সব আছে তাহাদের সকলকে ডাক।" আমলা বন্ধু বান্ধব অনেকেই ছিল। মৃদুস্বরে সকলকেই ডাকাইয়া বলিলেন,—আমার বিষয় আশয় কারবারে বসন্ত অর্দ্ধেক অংশী, এ তোমরা সকলেই জান,—তাঁহার প্রধান আমলাদের বলিলেন, এই দুই ছত্র শীঘ্র লেখ, লেখা হইল, শরৎ সই করিল, কিন্তু সাক্ষীদের সই করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইল। সাক্ষীদের আর সই হইল না।

কুমুদিনীর পিতা কামাখ্যানাথ এ অবস্থায় কন্যার পীড়া বাড়িতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া শরতের রোগের সংবাদ কুমুদিনীকে দেন নাই। সুতরাং কুমুদিনী স্বামীকে দেখিতে যান নাই, কিন্তু ক্রমে মৃত্যুসংবাদ দিতে হইল। ঘাটকামানের দিন যদিও একত্রে ঘাটকামান করিতে হয়, তথাপি কামাখ্যানাথ কন্যাকে পাঠাইলেন না। বসন্ত আসিয়া বিস্তর সাধাসাধি করিয়াছিল, একত্রে ঘাটকামান না হইলে বসন্তর মার ধারণা অকল্যাণ হয়। তথায় কোনরূপ ক্লেশ হইবে না; যতদূর যত্ন করা সম্ভব তাহা হইবে। কিন্তু কন্যা-বৎসল কামাখ্যানাথ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কোন রকমে তিল-কাঞ্চনে শ্রাদ্ধ করাইয়া কন্যাকে শুদ্ধ করাইলেন।

জামাতার শোক কামাখ্যানাথের বড় লাগিল। তিনি মৎস্য ত্যাগ করিলেন, পরিবারের সহিত আহারের সময় যা দেখা, একত্রে শয়ন নাই। দিবা রাত্র চিন্তায় মগ্ন। কুমুদিনী মনে করিলেন, পিতা বা বুঝি ভাবিয়া পাগল হ'ল। কখনও কখনও পিতাকে বুঝান যে আমার অদৃষ্টে যা ছিল—হইয়াছে। বাবা, তুমি কি ভাবিয়া সংসার ভাসাইয়া দিবে? পাওনাদারেরা (কামাখ্যানাথের বিস্তর পাওনাদার ছিল), তাহার শোকাচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়াই হউক বা অপর কিছু বুঝিয়াই হউক দিনকতক তাগাদায় নিরস্ত ছিল। শোকাচ্ছন্ন পিতা যদিচ অপর কোন বিষয় কর্ম্ম করিতেন না, কিন্তু কন্যার জন্য বসন্তর কাছে যাইতে বাধ্য হইতেন। উইল সই করিয়া শরত মরিয়াছে, মৃত্যুর আগে সাক্ষীদের সই হয় নাই, লোক-পরম্পরায় এই কথা শুনিতে পাইলেন। কারবার শরতের নামেই, বসন্তর নামে নহে—তাহাও শুনিতে পাইলেন। বন্ধুদের পরামর্শে বুঝিলেন যে উইল জাল। সকলকেই "ঐ উইল জাল—ঐ উইল জাল" বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু বসন্তর সম্পত্তি না হইলেও কুমুদিনীর সতীনপোর তো অর্দ্ধেক বটে। তাই বা কেন? কুমুদিনীর সতীনকে তো শরৎ বহুদিন ত্যাগ করিয়াছিল। ছেলে—তা কিরূপ ছেলে তা কে জানে। এরূপ পরামর্শদাতা উকীলের অভাব নাই ও এষ্টেটের মোকর্দ্দমা বিনা খরচে চালাইবার ও উকীল বিস্তর; উইল আপত্তি করিয়া মোকর্দ্দমা উঠিল। অবশ্য কুমুদিনীর গহনাগুলি মোকর্দ্দমায় ব্যয় হইল। কিন্তু শরতের সম্পত্তির অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকাংশ ব্যতীত কুমুদিনীর ভাগে বিচারে আর কিছু ধার্য্য হইল না। এক মেয়ে হইতেই তা'র সর্ব্বনাশ হইল। তবে মেয়ে ত্যাগ করিবার নয়, তিনি সজ্জন,—তাই মেয়ে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যদিচ এখন আর দেনা নাই, পাওনাদার আর আনাগোনা করে না,

বন্ধকী বাড়ীখানি খালাস করিয়াছেন,—আর কিছু কিছু সম্পত্তিও খরিদ করিয়াছেন, তথাপি কুমুদিনী ও কুমুদিনীর পুত্রের ভরণপোষণ দিন দিন তাহার বড়ই ভার বোধ হইতে লাগিল। যদিও দুর্জ্জনেরা বলিত বটে যে, তাঁহার সমস্তই মেয়ের সম্পত্তিতে হইয়াছে। কিন্তু বলিলে কি হয়;—মোকর্দ্দমার ব্যয়ে তাঁহার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

এদিকে বসন্তর দিন দিন বোল বোলাও বাড়িতে লাগিল। ভ্রাতুষ্পুত্র বিহারীও যোগ্য। বিহারী ও বিহারীর মা বসন্তের সংসারেই আছে। বিষয় ভাগ করিয়া লয় নাই। বিহারী মাঝে মাঝে খুড়াকে বলে, "কাকাবাবু,—শুন্‌তে পাই, হরিদাস (বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম হরিদাস) বড় অযত্নে আছে ও মানুষ হইতেছে না। ছোটমাকে বাড়ীতে আনিলে হয় না?" সে কথায় বসন্ত বিরক্ত হন। বসন্তর মাও বলেন, "দ্যাখ বসন্ত! তুই যদি ছোট বৌকে ঘরে আনিস্, তাহলে তোর হাতে পিণ্ড নেব না।" বুড়ীর এখন বড় বৌ অন্ত প্রাণ। বড়বৌ এখন পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ীর যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করেন।

এদিকে দিন দিন কুমুদিনীর বড়ই দুরবস্থা হইতে লাগিল। ছেলেটী স্কুলে যায় না। বদ্‌সঙ্গে মিশিয়া দুশ্চরিত্র হইতে লাগিল। পেটের জ্বালায় এটা ওটা চুরি করিয়া খায়। দিদিমা একটু যত্ন আত্তি করিত, তাহারও পরলোক হইয়াছে। একদিন সে মামার বাক্স হইতে দুইটী টাকা চুরি করায় যথেষ্ট মার খায়। আর ঠাকুরদাদার হুকুম হয় যে, উহাকে আর বাড়ীতে আসিতে দেওয়া নয়। তিনদিন বালক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। কুমুদিনী কাঁদাকাটী করাতে পিতা কর্ত্তৃক এরূপ তিরস্কৃত হইলেন যে, পিত্রালয়ে থাকা আর সম্ভববোধ হইল না। কিন্তু কোথায় যাবে? আগের দিন ছেলেটীর আহার জোটে নাই। কুমুদিনী রান্না ঘরে আহারে বসিয়াছেন এমন সময় রাস্তা হইতে ছেলেটী বলিল যে, মা কাল হইতে আমি কিছু খাইতে পাই নাই,—খিড়্‌কি দোর হতে পুত্রকে আপনার ভাত দিলেন। এ সংবাদ কুমুদিনীর পিতা পাইল। আর রক্ষা কি?—বেরো বেরো আমার বাড়ী থেকে বেরো। কুমুদিনীর অসহ্য হওয়ায় ভিক্ষা করিয়া খাইব ভাবিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। পিতা তর্জ্জন করুন—কন্যাসন্তান অপেক্ষা বিপদ নাই বলিয়া বক্তৃতা করিতে থাকুন এদিকে নিরাশ্রয়া কুমুদিনী ছেলেটীকে লইয়া রাজপথে চলিল। একটা বাড়ী দেখিয়া মনে পড়িল, এটা তাহার মাতুলালয়। মামা নাই, মামাতো ভাই নাই, মামাতো ভায়ের একটি ছেলে আছে। যাই হউক, এখানে একদিনের নিমিত্ত আশ্রয় লই। মামাতো ভায়ের স্ত্রীর নিকট পরিচয় দিয়া বলিল তাহারা দুঃখী—দিন আনে দিন খায়। সপুত্র কুমুদিনীকে তাহারা আশ্রয় দিতে পারে না। বউটি আপনার অবস্থার কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। সে বাড়ীতে কুমুদিনীর স্থান নাই,—কুমুদিনী বুঝিল। তবে আর একজন পড়সির রাঁধুণীর দরকার, যদি রাঁধুণীবৃত্তি স্বীকার করে, তবে তথায় স্থান পাইলে পাইতে পারে। তবে ছেলের উপায়? যদি ছেলেটি ফাই ফরমাস খাটে, আর মা বেটায় পেট ভাতায় থাকে, তাহা হইলে অন্নের সংস্থান হইতে পারে। কুমুদিনী তাহাই স্বীকার করিল।

এক মাস এইরূপে যায়। বাড়ীর কর্ত্রী সেকালে মানুষ, ক্রমে কুমুদিনীর অবস্থার সমস্ত পরিচয় পাইল। পরিচয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ মা, তোমার শ্বশুর বাড়ীর কি কেউ কোথাও নাই।" কুমুদিনী বলিল,—"না আমি তাহাদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে তাহারা আর স্থান দিবে কি? থাকিবে না কেন আমার দেবর আছে, সতীন সতীনপো আছে, শাশুড়ী আছেন, কিন্তু কোন মুখে আর সেখানে যাইব।" গিন্নি উত্তর করিল—"যেরূপ ব্যবহারই করিয়া থাক, তোমার দেবর ও সতীনপো তোমায় কখনও ত্যাগ করিতে পারিবে না। এখানে রাঁধুনী বৃত্তি করিতে আসিয়াছ, না হয় সেইখানেই রাঁধুনীবৃত্তি করিবে। যে অবস্থায় আছ অন্ততঃ ইহা অপেক্ষা তোমার মন্দ অবস্থা হইবে না।"

এদিকে বিহারীলাল ও বসন্তকুমার কুমুদিনীকে যে তার বাপ তাড়াইয়া দিয়াছে তাহা শুনিল। কিন্তু কোথায় তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার সন্ধান জানে না। লোক নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধান করেন;—কোন সংবাদ নাই। লোকের নিকট মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না। বড়ভাজ যত দুর পরের পরামর্শে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, সকলেই ভুলিয়া

গিয়াছে। কিরূপে আপনার ঘরে আনিবেন এই জন্ত ব্যতিব্যস্ত। একদিন বাড়ী আসিয়া বিহারীলাল দেখিল যে একটি স্ত্রীলোক ও একটী বালক বাটীর ভিতর বসিয়া আছে ও তাহার ঠাকুরমা যা মুখে আসে বলিতেছেন। বিহারীলালের মাও সেখানে আছে ; বিহারী যাইবামাত্র বিহারীর মা বলিল, "এই তোর ছোট মা প্রণাম কর। আর এই তোর ভাই।" বিহারীলাল প্রণাম করিল। তখন ঠাকুমা বুড়ী তিরস্কার করিতেছে। বিহারী বলিল,—"ঠাকুরমা যদি তুমি ছোটমাকে আদর করিয়া ঘরে না লও, তাহা হইলে আমি দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যাইব।" বুড়ী বিহারীকে স্নেহ করিত—নিরস্ত হইল। এমন সময় বসন্ত বাড়ী আসিল। ব্যগ্রভাবে বিহারী বলিল,—কাকাবাবু! কাকাবাবু! ছোট মা আসিয়াছেন আর এই হরে।" বসন্ত বড় ভাজকে নমস্কার করিয়া হরেকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইলেন। তখন কুমুদিনীর বাল্যকালের একটা কথা মনে পড়িল। কথাটী মা শিখাইয়াছিলেন, কুমুদিনী এখন তা বুঝিলেন,—

"দেইজীর ভাত হউক সতীনের পো হউক।"

"নাট্যমন্দির"

আয়েষা ও রেবেকা

[শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ এম-এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও রেবেকা বাতায়নে উঠিয়া বাহিরের ভীষণ যুদ্ধের খবর আইভান্‌হোকে জানাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই! আইভান্‌হো তাঁহাকে বিপদের কথা, "Some random shaft" এর কথা বলিয়া বারণ করিলেও রেবেকা পশ্চাংপদ হ'ন নাই, বরং তিনি বলেন, 'It shall be welcome" (Ibid) এই একটী ছোট্ট কথায় অভাগিনী বালিকার হৃদয়ের কত করুণ কাহিনী ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তারপর যখন অপূর্ব্ব বাগ্মিতার সহিত তিনি এই যুদ্ধ বর্ণনা করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকে এক উদ্দীপ্ত, চারণ বালিকারই মত দেখাইতেছিল! অবশেষে এই যুদ্ধ বর্ণনা শুনিতে শুনিতে যখন রুগ্ন আইভান্‌হো পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, তখন রেবেকার কথাগুলি কী সুন্দর! "Alas! Is it a crime that I should look upon him, when it may be for the last time?......And my father!—Oh, my father! evil is with his daughter when his grey hairs are not remembered because of the golden locks of youth! What know I but that these evils are the messengers of Jehova's wrath to the unnatural chils, who thinks of a stranger's captivity before a parent's? Who forgets the desolation of Judah and looks upon the comeliness of a gentile and a stranger? But I will tear this folly from my heart, though every fibre bleed as I rend it a way!" (ch. XXIX.)

তারপর তিনি রুগ্ন যোদ্ধ্ পুরুষের পালঙ্কের দিকে পিছন ফিরিয়া, ঘন অবগুণ্ঠনে আপনাকে আবৃত করিয়া বসিলেন, 'Fortifying and endeavouring to fortify her mind against these treachereus feelings which assailed her from within" এই অতুলনীয় পরিচ্ছেদে রেবেকার অন্তরের ভাব-লহরীর উত্থান পতন যেরূপ সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে, আয়েষার চিত্রে আমরা সেরূপ কোথাও পাই নাই। এরূপ জীবন্ত ছবি আয়েষার আমরা কোথাও দেখি নাই। আয়েষার গাম্ভীর্য্য শ্রেয়ঃ না রেবেকার এই চাঞ্চল্য শ্রেয়:—এ বিষয়ে মতদ্বৈধ্য থাকিতে পারে, তবে রেবেকা যে অপেক্ষাকৃত সজীব, সাধারণ মানুষের মত ভাবময়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আশা করি এই দুইটী ছবির পার্থক্যটুকু বিশদরূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

আয়েষা ও রেবেকার প্রেম বর্ণনায় যে বিশেষ লক্ষণ পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, এখন তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া সে বিষয়ে সকলের মনোযোগ পুনরাকর্ষণ করায় কোন দোষ দেখি না—আয়েষার ব্যক্ত ও রেবেকার অব্যক্ত গুপ্ত প্রেমেরই কথা লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইতেছে। এই যে প্রেম যাহা রেবেকা নির্জ্জনে বিরলে জগতের নয়নের আড়ালে সযত্নে লালিত পালিত করিতেছিলেন, যে গুপ্তরত্নকে কখনও বিশ্বের তীব্র আলোর মাঝে বাহির হইতে দেন নাই—এই প্রেমের পেথস্ (Pathos) যেন আয়েষার ব্যক্ত প্রেম অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয়। তাই আমার মতে কারাগারের সেই দৃশ্য ও পশ্চাতে জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার পত্র, এই উভয়ই ত্রুটীশূন্য নহে—এইগুলি না আনিলেই ভাল হইত। বঙ্কিমবাবু "রজনীতে" অজ্ঞাত প্রণয়ের অসীম রহস্য অমর লেখনীতে আঁকিয়া গিয়াছেন, অজ্ঞাত প্রণয়ের অসীম রহস্য শূন্য হইয়া আয়েষার প্রণয় ঈষৎ মলিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যখন দেখি রেবেকা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া গেলেন একজনের জন্য যিনি রেবেকার অন্তরের ইতিহাস ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই, তখন আমাদের

হৃদয় স্বতঃই রেবেকার প্রেমকে জয়মাল্য প্রদান করে। রেবেকার প্রেম গভীর নিশীথের ক্রোড়ে অজানা ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়া শুধু আপনার বুকভরা আনন্দে আপনি উতলা হইয়া অন্ধকারের ক্রোড়েই বিলীন হইয়া যায়—অসীম জগতে একটী প্রাণীও তাহার সন্ধান পায় নাই।

রেবেকার চরিত্রে আর একটী বিশেষ লক্ষণ আছে, যাহা আমরা আয়েষার চরিত্রে পাই না। রেবেকা আয়েষার মত বজ্রাঘাত ঝঞ্ঝাবাত হইতে দূরে জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। যে মুহূর্ত্ত হইতে তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার অপরিসীম রূপলাবণ্য ঘেরিয়া লেলিহান্ অগ্নি খেলা করিতে থাকে। রেবেকা যে এই অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে পড়িয়াও আপনার চরিত্র অটুট রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা রেবেকার চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য ত বটেই ও কতকটা তাঁহার প্রেমের দৃঢ়তার জন্যও। দোর্দ্দণ্ড Bois guilbertএর প্রদীপ্ত কামানল সম্মুখে রেবেকা বিচলিত হ'ন নাই—যাঁহারা "আইভান্হো" উপন্যাসে রেবেকা Bois guilbert সঙ্গের দৃশ্যগুলি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, কিরূপে পাশবিক বল, পাশবিক রোধ, প্রলোভন—সমস্তই রেবেকা অনায়াসে অগ্রাহ্য করেন। (ch. XXIV ও XXXIX) আর যখন বন্দিনী রেবেকা সম্মুখে তাঁহারই মৃত্যুর জন্য সাজসজ্জা দেখিয়া যদিও প্রথমে শিহরিয়া উঠিয়া নয়ন মুদিয়াছিলেন, তথাপি পুনরায় মুহূর্ত্ত মধ্যে নয়ন মেলিলেন এবং বদ্ধ দৃষ্টিতে সেই মৃত্যুর সাজসজ্জা পানে তাকাইয়া রহিলেন। যেন মনে হইল তিনি তাহার হৃদয়কে ঐ দৃশ্যটীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন এবং তারপর পুনরায় ধীরে ধীরে ও অতি স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে প্রেরণ করিলেন। এই যে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে এই ধৈর্য্য, এই গাম্ভীর্য্য, ইহা অতি মহান্। রেবেকা বিপদের কোন আঘাতেই আপনার মহত্ব জলাঞ্জলি দেন নাই—বরং প্রত্যেক আঘাতেই তাঁহার মহত্ব অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর একটী দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে দিব। রেবেকা যখন বন্দিনী হইয়া বিচারার্থে নীত, তখন জনতার সম্মুখে যখন তাঁহাকে তাঁহার বদন হইতে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার আদেশ দেওয়া হইল, তখন তিনি যেন মৃত্যু অপেক্ষা কঠোরতর অদৃষ্টের সম্মুখে উপস্থিত হ'ন। তখন তিনি যেরূপ মহত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা যে শুধু দর্শক মণ্ডলীকে অভিভূত করিয়াছিল তাহা নহে, আজ পর্য্যন্ত পাঠককে অভিভূত করিয়াছে। প্রথমে তিনি এই প্রস্তাবে অস্বীকার করায়, রেবেকা যখন দেখিলেন একজন বর্ব্বরোপম সৈনিক বলপ্রয়োগ করিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিতে অগ্রসর হইতেছেন, তখন তিনি তাহাকে বাধা দিয়া বিচারপতির সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া যেরূপ উদার, করুণ ও সুন্দর কথাগুলি বলিয়া আপনি আপনার সরম-কুণ্ঠিত অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি প্রকাশ করেন, তাহা আমরা কবির ভাষাতে বর্ণনা করিতেছি—"Nay, but for the love of your own daughters -" "Alas," She said, re-collecting herself, "Ye have no daughters !"—এইস্থানে বলিয়া দিই যে রেবেকা যাঁহাদের হস্তে বন্দিনী ছিলেন তাঁহারা এক অবিবাহিত ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়; ইউরোপের মধ্য যুগের এই অবিবাহিত ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়, যাহা Knights Templars নামে অভিহিত। ইহারই আদর্শের আভাষে বঙ্কিমবাবু "আনন্দমঠের" সন্তান সম্প্রদায়ের কল্পনা করিয়াছিলেন—"Yet for the remembrance of your mothers— for the love of your sisters and of female decency, let me not be thus handled in your presence ; It suits not a maiden to be disroped by such rude grooms. I will obey you." (ch. XXXVII) এই কথা বলিয়া যখন তিনি আপনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি অবগুণ্ঠন মুক্ত করিলেন, তখন জগৎ দেখিল যে সেই মুখখানি সরম-কুণ্ঠিত নহে। তাহা মহিমমণ্ডিত! "She withdrew her veil, and looked on them with a countenance in which bash-fulness contended with dignity." আর যখন সদ্যঃ আরোগ্য প্রাপ্ত আইভান্হো অশ্বপৃষ্ঠে রেবেকার জীবন রক্ষার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন কবি বলিতেছেন যে, রেবেকা was fluttered by an emotion which the fear of death had been

unable to produce." মৃত্যু ভয়ও যে রেবেকাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, সেই রেবেকা আইভানহোকে দেখিবামাত্রই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন! মৃত্যুর করাল বদন যখন গ্রাসোন্মুখ, তখনও রেবেকার এই চাঞ্চল্য কি মানবতা পূর্ণ। স্কট্ রেবেকাকে এইরূপে অগ্নি পরীক্ষা করাইয়া তাঁহার এক দীপ্তিময় পুণ্য আভামণ্ডিত মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। আয়েষা এইরূপে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হ'ন নাই, সুতরাং রেবেকার চরিত্রের এই অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী আমরা তাঁহার চরিত্রে লক্ষ্য করি নাই।

আয়েষা ও রেবেকা জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে আমরা এখন শেষ পরিচ্ছেদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তিলোত্তমা ও রাওয়েনা—উভয়েরই ফুল ফুটিল আর আয়েষা ও রেবেকা এ যুগলের ফুল চিরতরে মুদিল। পাশাপাশি এই যে দুইটী ছবি— আলোছায়ার খেলা, হাসি অশ্রুর মিলন—জগতে ইহাই নিদারুণ, মর্ম্মভেদী, সত্য আর আমাদের এই দুই জন কবি এই সত্যটী তাঁহাদের দুইটী অপূর্ব্ব কাব্যে প্রতিফলিত করিয়া গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। আয়েষা ও জগৎ সিংহের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহার অপেক্ষা শত গুণ অধিক ব্যবধান ছিল রেবেকা ও আইভানহোর মধ্যে—প্রথমের মধ্যে ছিল ধর্ম্মের ব্যবধান, কিন্তু সেই যুগেই সেই ব্যবধান দুরতিক্রম্য ছিল না; আর দ্বিতীয়টীর মধ্যে ছিল কুসংস্কারের ব্যবধান, তাহা সেই যুগে এক প্রকার দুরতিক্রম্য ছিল। আয়েষা রুগ্ন জগৎ সিংহের মুখ হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিলোত্তমা তাঁহার প্রণয়িণী—যদি তাহা না হইত, যদি জগৎসিংহ অপর রমণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা শেষ পরিচ্ছেদ মান সিংহের পুত্রের সহিত যবনী আয়েষার বিবাহ সভায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিতাম; কিন্তু আইভানহো রাওয়েনার সহিত প্রণয় পাশে বদ্ধ না হইলেও বোধ হয় উভয়ের বিবাহ বন্ধন কিছুতেই ঘটিত না। রেবেকা তাহা ভাল রকমই জানিতেন, তাই তিনি রাওয়েনাকে এরূপ বলেন যে, "There is a gulf betwixt us. Our breeding, our faith alike fobid either to pass over it," হয় ত ইহাও হইতে পারে যে এই দুরতিক্রম্য ব্যবধানের জন্যই রেবেকা এত সযত্নে আপনার রহস্যটী গুপ্ত রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাতে চরিত্র বিশেষ কিছু খাটো হইয়া যায় না। এই রহস্যটী গুপ্ত রাখাই যে কঠিন ব্যাপার যাহা অঙ্গের প্রতি ধমনী ছিন্ন করিয়া বাহির হইতে চায়, যাহা প্রত্যুত্তরের আশায় উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় তাহাকে দমন করাই একটী বিষম কঠিন ব্যাপার; আর আমরা আনন্দের সহিত লক্ষ্য করি যে বীরোপম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া রেবেকা তাঁহার হৃদয়ের বিদ্রোহী ভাব রাশি দমন ও তাহাদিগকে আইভানহোর সম্মুখে প্রকাশ হইতে দেন নাই। কিন্তু এই বিদ্রোহী ভাবরাশি তাঁহার সংযমের বাঁধ প্রায় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, যখন রেবেকা শেষ দৃশ্যে নব বধূ রাওয়েনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন। রেবেকার সকল প্রচেষ্টাই বিফল হয় তিনি যে আজীবন ধরিয়া আপনাকে আইভানহোর নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার এই কঠোর ব্রত প্রায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় এই শেষ মুহূর্ত্তে যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার প্রিয়তম সত্য সত্যই অপরের হইয়া গেল। আইভানহোর সহিত তাঁহার মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই—এ বিষয়ে যতই না কেন পূর্ব্ব হইতেই রেবেকা উত্তম রূপে জানিতেন এজন্য যতই না কেন তিনি আপনাকে সংযত রাখিবার ব্রত করিয়াছিলেন—সে সমস্তই প্রায় ভাসিয়া যায় যখন সত্য সত্যই আইভানহোর অপর রমণীর সহিত বিবাহ বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইয়া গেল—তাঁহার মানস জগতে ভূমিকম্প হইয়া গেল, সমস্তই খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল—তাঁহাকে আইভানহোর দেশ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প লইতে হইল। কবি "আইভানহোর" শেষ দৃশ্যে একটি মাত্র অতুলনীয় তুলিস্পর্শে এই অপর রমণীর সহিত আইভানহোর মিলনে রেবেকার হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত লাগে, তার ছবি বিশদ ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রেবেকা রাওয়েনাকে বলিতেছেন, "Long long will I remember your features, and bless god that I leave my noble delivers united with—" কবি পরেই বলিতেছেন! "She stopped short—her eyes filled with tears," এই যে রেবেকার আচরণ

তাহা কি মানবতা পূর্ণ—রেবেকার কণ্ঠে যে বাধিয়া গেল "রাওয়েনার" নাম উচ্চারণ করিতে! আমরা তাই এতক্ষণ বলিতেছিলাম, শেষ মুহূর্ত্তে তাহার ব্রত প্রায় ভাঙিয়া আসে। কবি বিশদ ভাবে আমাদিগকে জানান নাই যে এই দৃশ্যে রেবেকার রহস্য পূর্ণ আচরণ রাওয়েনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না, অর্থাৎ কবির ইচ্ছা নয় যে এমন কি শেষ মুহূর্ত্তেও যাহা আঁধারের কোলে লালিত পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাকে আঁধারের কোল হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া কর্কশ আলোর মাঝে ফেলিয়া দেওয়া। কবি তাই রাওয়েনাকে রেবেকার গুপ্ত প্রেম সম্বন্ধে সকল সম্পূর্ণ রূপে আলোকিত করিলেন না—রাওয়েনাকে এ বিষয়ে একটী মধুর আলো আঁধারে ফেলিয়া রাখিলেন। বঙ্কিম বাবুও শেষ পরিচ্ছদে এ অনুরূপ দৃশ্যে আয়েষার মুখ হইতে প্রায় এই একই ধরণের কথা বাহির করাইয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমবাবু আয়েষার মনোভাব চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। আয়েষা বলিতেছেন, "আর আমার-তোমার সার রত্ন হৃদয় মধ্যে রাখিও।" আমাদের মতে "আমার" কথাটী উচ্চারণ করায় আয়েষা ধৈর্য্যের অভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তবে আয়েষাও যে এইখানে আপনার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া মানবতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুইটী দৃশ্যের ফলে বোধ হয় একটু পার্থক্য আছে। আয়েষা যখন তিলোত্তমার সম্মুখে আপনার হৃদয় বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া "আমার" বলিয়া ফেলেন, তখন হয় ত তিলোত্তমার বুঝিতে আর কিছু বাকী থাকিল না, কিন্তু সরলা তিলোত্তমা অতটা ঝটিতি বুঝিতে পারিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু তিলোত্তমা যখন জগৎ সিংহের সম্মুখে আয়েষার দত্ত অলঙ্কার ও তৎকালীন আয়েষার আচরণের কথা বর্ণনা করিবেন (এবং আমাদের বিশ্বাস আয়েষার নিষেধ সত্ত্বেও তিলোত্তমা তাঁহার স্বামীকে এই রহস্য পূর্ণ ঘটনার বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না) তখন জগৎ সিংহের অন্তরে এ সম্বাদ "শেল" সম বিদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু আয়েষার হৃদয়ের ইতিহাস পূর্ব্ব হইতেই জানা থাকায় তিনি শুধু বেদনাই অনুভব করিবেন, কিন্তু আইভান্‌হোর মত রহস্যময় এক অনিশ্চিতের কণ্ঠকে বিদ্ধ হইবেন না। তাই যেন মনে হয় "দুর্গেশ নন্দিনীর" কারাগার দৃশ্যের ছায়া আয়েষা তিলোত্তমা সম্বাদের এমন সুন্দর দৃশ্যেও উঁকি ঝুঁকি মারিয়া তাহার সৌন্দর্য্য একটু মলিন করিয়া দিয়াছে। আমাদের তাই মনে হয় যে এই দৃশ্যটি একেবারে বাদ দিলে অথবা জগৎ সিংহের নয়নের অন্তরালে প্রাসাদের একটী কক্ষে ইহার অবতারণ করিলেই ভাল হইত। স্কটের কৃতিত্ব এই যে তিনি সুদীর্ঘ ঘটনা বহুল উপন্যাসের কোথাও রেবেকার গুপ্ত প্রণয়ের ইতিহাস আইভান্‌হোকে জানিতে দেন নাই—শুধু শেষ দৃশ্যে চকিতের জন্য রেবেকার হৃদয়ের যবনিকা ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া রাওয়েনা ও আইভান্‌হোকে একটী রহস্য পূর্ণ অনিশ্চিতের দোলায় দোলাইয়া দিয়া আবার সেই যবনিকা ফেলিয়া দেন—উপন্যাস যখন শেষ হইল তখনও আমরা রাওয়েনা আইভান্‌হোকে এই অনিশ্চিতের দোলায় দুলিতে দেখি সে দোলা আনিবার পূর্ব্বেই এই অপূর্ব্ব নাটকের যবনিকাপাত হয়—বোধ হয় যবনিকার অন্তরালেও সে দোলা আনে নাই ; রেবেকার বিষাদিনী মূর্ত্তি মাঝে মাঝে আইভান্‌হোর অন্তরে আনমনে ছুটিয়া বেড়াইত! এখন বুঝিতে পারা যাইবে কোন্ কবি অধিকতর কলা-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

আমরা এখনও আয়েষা রেবেকার জীবন নাটকের সর্ব্বশেষ দৃশ্যে উপস্থিত হই নাই। সর্ব্বশেষ দৃশ্যে আমরা আয়েষাকে দেখি "দুর্দ্দমনীয় রমণী হৃদয়" লইয়া আপন কক্ষ বাতায়নে বসিয়া গরলাধার অঙ্গুরীয় লইয়া খেলা করিতে করিতে দুর্গ পরিখার জলে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রেবেকার জীবনের শেষ ছবি কী করুণ রসপূর্ণ, তাহা একবার সকলের সম্মুখে ধরিব। রাওয়েনাকে অলঙ্কারগুলি গ্রহণ করিতে অনুরোধ কালে রেবেকা বলেন, "Accept them, lady ; to me, they are valueless. I will never wear jewels more." কি গভীর, কি করুণ কথাগুলি! রেবেকা তখন আপনার সোণার অঙ্গ হইতে সকল অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া আপনাকে নিরাভরণা করিলেন আপনার প্রিয়তমের প্রিয়তমার জন্য। আপনাকে নব বিধবা জ্ঞান করিয়া তিনি যৌবনে সন্ন্যাসিনী হইলেন। রাওয়েনা

যখন জিজ্ঞাসা করেন, "You are then unhappy!" রেবেকা উত্তর দেন, "Unhappy lady I will not be." উত্তরটী কত সূক্ষ্ম তাহা একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—"বর্ত্তমানের" অবস্থা সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া শুধু "ভবিষ্যতের" কথাই তিনি বলিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, "He to whom I dedicate my future life will be my Comforter, if I do his well." গোবিন্দলাল শেষ জীবনে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অবসানে যাঁহাকে পাইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভ্রমরাধিক ভ্রমর পাইয়াছি," আজ এই বিবাহের পূর্ব্বেই নব বিধবা যৌবনে যোগিনী, জীবনের পরিপূর্ণ রঙীন রসপাত্র অনাস্বাদিত রাখিয়াই তাঁহারই চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিতে নিযুক্ত! রেবেকা অতঃপর সংসার ত্যাগ করিয়া নিযুক্ত থাকিবেন, "Tending the sick feeding the hungry and relieving the distressed." অহো আমাদের মানস পটে কি করুণ ছবি ভাসিয়া উঠিল—নিরাভরণা প্রস্ফুটিত অনুপম যৌবনে সন্ন্যাসিনী একটী বালিকা পীড়িত ও আতুরের সেবা কার্য্যে, ধীরে, অতি ধীরে নিঃশব্দ পদ চারনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে স্বর্গীয় দেবীর মত! সে এই সেবাতে ভগবানের আস্বাদ পাইবে,—আর পূর্ব্বে একটী উচ্চ কুলের তরুণ যোদ্ধ্ পুরুষের সেবায় সে হর্ষ অনুভব করিয়াছিল সেই হর্ষের হিল্লোল কি এই সকল আতুরের সেবাতেও জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আকুল ব্যাকুল করিবে না? এ ছবি আমাদের মানস পটে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতে এইরূপ দ্বিতীয় ছবি আর দেখি নাই। আর দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচকগণ এই অনুপম রেবেকা চরিত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। রেবেকার জীবনের এই ছবির পার্শ্বে আয়েষার শেষ ছবি যেন মলিন হইয়া পড়ে!

কাব্য ও দৃশ্য

[৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত]

বাল্যকালে দেখিয়াছি, নারাণদাসের যাত্রার দলে প্রহ্লাদকে বিষ প্রদান করিতে হইবে, কোন পাত্র তো উপস্থিত নাই—মন্দিরাই বিষপাত্র হইল। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা একটী হাসিবার কথা। কিন্তু যখন প্রহ্লাদ গান ধরিল,—

"দুখ দেবে প্রাণে সবে ক্ষতি তায় কিছু হবে না।
আমি ম'লে ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ নাম কেউ লবে না।"

অমনি সহস্র দর্শক স্তম্ভিত, ভক্তি করুণায় আর্দ্র হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। এই অভিনয়, দৃশ্যপট সাজ-সরঞ্জাম না থাকায়, যিনি অস্বাভাবিক বলেন, তিনি কি বলেন তাহা তিনিই জানেন না। যাঁহারা এই যাত্রাকে থিয়েটারের সহিত প্রভেদ করেন, তাঁহাদের বোধ হয় অজানিত সেক্‌স্‌পিয়ার, বেন, জন্‌সন্‌, প্রভৃতি মহাকবির নাটক সকল প্রথমে এই যাত্রার ন্যায়ই অভিনীত হইত। কবির বর্ণনায় রম্য উপবন, সাগর, বিশাল প্রান্তর, নিবিড় কানন দর্শককে বুঝিতে হইত, যেমন আমাদের দেশে যাত্রায় দর্শককে বুঝিতে হইয়াছিল। তাহার পর পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আমাদের দেশে দৃশ্যপটাদি হইল, এখন আর কাব্যের প্রশংসা তাদৃশ নয়। আমার স্মরণ আছে, 'বেলগেছিয়ায়' "রত্নাবলীর" অভিনয় দেখিয়া, এক ব্যক্তি প্রশংসা করিতেছে,—"কি চমৎকার ব্যাপার! রাজার গলায় প্রকৃত মুক্তার মালা, পশ্চাতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে শুনিয়া রাজা 'সাগরিকা'কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছুটিলেন, একজন রাজভক্ত সভয়ে তাঁহাকে বাধা দিল। তিনি বাধা উপেক্ষা করিয়া ছুটিলেন, অমন মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া গেল, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না।" কাব্যের প্রশংসা নাই, অভিনেতার বক্তৃতায় কিরূপ হৃদয় দ্রব হইয়াছিল তাহা নাই, কোন সরস পংক্তির আবৃত্তি নাই—কেবল মুক্তার মালা, সাজসরঞ্জামের প্রশংসা। এই শ্রেণীর সমালোচক প্রথমে যাত্রার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করেন, ইহাতে ক্ষতি লাভ উভয়ই হইল। যাত্রায় কতকগুলা অশ্লীল ভাঁড়ামি ছিল,—তাহা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারীর মধুর রসের সঙ্গীতস্রোতও লোপ পাইল।

এখনকার অভিনয় সভ্যভাবে সভ্য কথায় চলিতে লাগিল। রসের উদ্ভব যত হোক্ বা না হোক্, সভ্যতাই ইহার প্রশংসা। অভিনেতারা নানা সভ্য নিয়মে বাধ্য। দর্শককে কোনও অভিনেতা পশ্চাৎ দেখাইতে পারিবেন না; ক্রুদ্ধ ভীমও রণস্থলে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবেন না; সকলেই সভ্যভাবে চলিবে, তবে মূর্চ্ছা যাবার অধিকার ছিল, তাহাও খুব সংযতরূপে। দৃশ্যপটের বাহার, সাজ-সরঞ্জামের বাহার, এরূপেই রঙ্গালয় চলিল।

তাহার পর ঐরূপ সভ্য নাটকের আদর কমিয়া আসিল। সাজসরঞ্জাম, ছবির মত দৃশ্যপট, বুক্‌নিদার কথাবার্ত্তায় নাটক চলিতে লাগিল। প্রহসনেরই আদর, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি চাপা লক্ষ্য থাকিলে আরও আদর, এক সম্প্রদায়ের প্রহসনে অপর সম্প্রদায়ে দ্বারা উত্তর প্রদান—ক্রমে এই সকলের বাড়াবাড়ি হইল। এই স্রোতে—

"মুই থিয়েটারের ছিষ্ট্রি।
গ্রিন চশমা চ'খে দেখি গ্রিন রুমের মিষ্ট্রি॥"

প্রভৃতি গানের তরঙ্গ চলিল। অনেকেই বলিলেন, এ সব ভাল নয়। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারাই দর্শকশ্রেণী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এই সময়ে কবি ও ভাবুক উভয়েই যে সকল পুরাতন আমোদ ছিল, তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। দাশু রায়ের কাব্যরসপূর্ণ পাঁচালী, কৃষ্ণলীলার মধুর রস পূর্ণ গান ইঁহাদের রুচি-বিরুদ্ধ হইয়া উঠিল তাঁহারা বুঝিতেন না যে ঐ সকল সঙ্গীত মহাভাবুকের রচিত। উপস্থিত অবস্থা আমাদের দেশের মৌলিক নয়, ইংরাজের অনুকৃত অবস্থা। কবি ড্রাইডেন, যাঁহাকে পোপের সহিত

তুলনা করিয়া, স্থির করিতে হয় যে পোপ বা তিনি দ্বিতীয় শ্রেনীর প্রধান কবি, তিনি প্রথম শ্রেণীর কবিগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বিশেষতঃ নাট্যকার গণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

"Wits now arrived to a more high degree ;
Our native language more refined and free ;
Our ladies and our men now speak more
wit ;
In conversation than those poets writ.

তিনি বলেন, সে এক সময় গিয়াছে, এখন " * * critics weigh each line, and every word, throughout a play" ও সকল কবি আর চলে না। সত্যই চলিল না। বাঙ্গলায়ও ইংরাজি চলিয়াছে, বাঙ্গলায়ও পুরাতন ভাবুক কবি চলিল না। এ অবস্থায় নাটকে সকলেই রসের কথা কয়। চাকর, নাপ্তিনী, পুরোহিত, কর্ত্তা, গিন্নী সকলকেই রসের কথা কহিতে হইবে। দুই একটা সন্ন্যাসী যখন দেখা দিতেন, তখন তারা দুই একটা ঔষধ পালা দিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া যাইতে পারিতেন।

কিন্তু এ ভাব কোন মতেই স্থায়ী হইবার নয়। ক্রমে ভাবুকের পূর্ব্বতন ভাবুক কবির প্রতি দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাঁহাদের চক্ষে মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি অসঙ্গত কবিতা বর্জ্জিত ঠাকুমার গল্প নয়। এ সময় সেক্‌সপিয়ারের বাঙ্গালায় যথেষ্ট আদর। সমালোচক ক্রুদ্ধ হইয়া সমালোচনা করেন, "বাঙ্গালায় সেক্‌সপিয়রের স্থায় নাটককার হইতেছে না।" কিন্তু সকলেই তো সমালোচক নয়। নাটককার সেক্‌সপিয়ার না হইয়াও, অনেকের নিকট চলিল।

এ সময়ে দৃশ্যপট, সাজসরঞ্জাম, কাব্য রসিকতা প্রভৃতির সাধ্যমত চেষ্টা হইতে লাগিল। তীব্র সমালোচনার দৃশ্যপট প্রশংসার নয় কিন্তু চলনসই, সাজসরঞ্জামও চলনসই, সকলই চলন সই, কতকটা আমোদ করিতে পারিলেই দর্শক সন্তুষ্ট। অসন্তোষের কারণ ক্রমে দেখা দিতে লাগিল। খবরের কাগজ মেলে মেলে আসে, তাহাতে পাশ্চাত্য থিয়েটারের ধুমধামের বর্ণনা; সে বর্ণনানুসারে এখানে কিছুই নাই, সে বহুমূল্য পরিচ্ছদ নয়, যে পরিচ্ছদের কথা সংবাদপত্রে দর্শক পড়িয়াছেন। দর্শক পড়িয়াছেন—ষ্টেজে ষ্টীমার আসে, তোপ ছাড়ে, যুদ্ধ হয়; হায় হায় আমাদের সেরূপ নয় বলিয়া আক্ষেপ চলে! কিন্তু যে দেশে এ সকল চলিতেছে, সে দেশেও আক্ষেপ; তাহাদের আক্ষেপ এই যে, দৃশ্যকাব্যে কেবল দৃশ্যেরই প্রাচুর্য্য, কাব্যের ততোধিক অভাব। ক্লেট হ্যামিল্টন নামক জনৈক সমালোচক আক্ষেপ করিতেছেন, মহারাণী এলিজাবেথের সময়ে নাটকাভিনয়ে যদিচ দৃশ্যপট ছিল না, অনেক সময়েই দিবসে অভিনয় হইত, কিন্তু তখন কবি কল্পনা প্রভাবে দিবসেই রাত্রি দেখাইতে পারিতেন। যখন সমুদ্র বর্ণিত হইতেছে, দর্শকের নাসিকায় যেন সাগরের লবণবাহি বায়ু প্রবেশ করিত, কূলে সমুদ্র প্রতিঘাতের শব্দ শুনিত। প্রেমিক প্রেমিকা চন্দ্রালোক দৃশ্যে প্রেম কথা কহিতেছে, মানস চক্ষে দেখিতে পাইত। অরণ্যবাসীর আনন্দ বর্ণিত কথায় বুঝিত; সূর্য্যোলোক সত্ত্বেও ম্যাক্‌বেথের কথায় বুঝিত "Light thinkens and the crow makes wings to the rooky woods. কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত জল পড়িলে তবে বৃষ্টি বুঝিব, ষ্টিমার আসিলে তবে ষ্টিমার বুঝিব, কল্পনায় কিছুই অনুভব করিব না। কাব্যে আমরা ঠিক যেমন নিত্য দেখি, সেইরূপ দেখিতে চাই; ইহা স্বভাব চিত্র বটে, কিন্তু অতি সঙ্কীর্ণ স্বভাবচিত্র। যে দেশের চিত্র, সেই দেশে দিনকতক চলে; এলিজাবেথের সময়ের কাব্যের স্থায় জগদ্ব্যাপী ভাবপূর্ণ নহে। আমাদের নাটক আমরাই বুঝি, অন্ত কেহ বুঝিবে না।"

বিলাতের এ অবস্থা আমাদের দেশীয় সংক্রামিত হইতেছে। দৃশ্যপটের সুখ্যাতি একরূপ নাটকের সুখ্যাতি হইতেছে। নাটক দেখিয়া গিয়া অভিনেতার কথা আলোচনা হয়, কিন্তু যাহাকে সুখ্যাতি করিতেছে, তাহা যে কি, বর্ণনা শুনিয়া অন্যে বুঝিতে পারে না। এই ত অবস্থায় আমরা উপনীত।

উন্নতির বিস্তৃত পথ সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু সকলেই সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। যতদিন কলাবিদ্যা বিশারদ অভিনেতার সংখ্যা না বৃদ্ধি হয়; ততদিন উচ্চাঙ্গের নাটক জনপ্রিয় হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। অভিনেতা না বুঝাইয়া দিলে সাধারণ দর্শক কখনই বুঝিতে পারিবে না। আবার উৎকৃষ্ট নাটক না পাইলে অভিনয় বিদ্যার উৎকর্ষ

কিরূপে হইবে ? রাজা বিদেশী, তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। রাজপুরুষেরা ভাষা বোঝেন না, উৎসাহ প্রদান কিরূপে করিবেন ? এই দেশে যাঁহারা উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারা উদাসীন। রঙ্গালয়ের ড্রেস সার্কেল ও বক্স না রাখিলেও চলে। অনেক অভিনয় রাত্রে ঐ সকল আসনের অধিকাংশই খালি থাকে। যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, প্রায়ই তাঁহারা রঙ্গালয়কে উপেক্ষা করেন; অনেক সাধ্য সাধনায় কেহ বা কখনও উপস্থিত হন। যদি কোন উচ্চাঙ্গের নাটক কখনও অভিনীত হয় এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে যদি কেহ দেখিতে আসেন, ম্যানেজারের অনুরোধে ভিজিটার বুকে Opinion লিখিয়া রঙ্গালয়ের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেন। যদি ঐ সকল ব্যক্তিরা রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠ পোষক হইতেন, রঙ্গালয় যদি ধনী ও পণ্ডিত সমাগমে হীনরুচি দর্শককে উপেক্ষা করিতে পারিত, এবং ঐ সকল উচ্চ ব্যক্তির আদর্শে যদি হীনরুচি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ক্রমে উচ্চরুচিসম্পন্ন হইতে পারিত,—উচ্চরুচি হইবারই সম্ভাবনা,—তাহা হইলে রঙ্গালয়ের অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তন হইত নিশ্চয়। অর্থ সাহায্য থাকিলে ম্যানেজাররা সুনিপুণ চিত্রকর নিযুক্ত করিতে পারিতেন, উচ্চাঙ্গের অভিনয় হইলে যদি Box, Dress circle প্রভৃতি উচ্চাসন গুলি পরিপূর্ণ হইত, নিম্ন শ্রেণীর নাটকের অভিনয় চলিত না, উচ্চভাবে নাটক সৃষ্টি করায় নাটকারের চেষ্টা হইত, অভিনেতারা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া clap লইবার চেষ্টা করিত না, রসিকবৃন্দের মনোরঞ্জনেরই চেষ্টা পাইত; নিজ ভূমিকা যত্নে বুঝিতে কণ্ঠস্থ করিত, prompter-এর উপর নির্ভর করিত না। ভূমিকা (part) যেরূপ বুঝাইয়াছে কিরূপে তাহার দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়, সে নিমিত্ত বিরলে ধ্যানস্থ হইত, আপনার পরিচ্ছদ আপনি আদেশ দিয়া প্রস্তুত করাইয়া লইত। কোন সাজে কিরূপ অবস্থায় আসিলে তাহার অভিনয় চাতুর্য্যের নাটকীয় রসের বিকাশ পাইবে তাহা বুঝিত। এবং ভুল হইলে সহৃদয় দর্শকের শিক্ষাপ্রদ উপদেশ সংশোধন করিতে পারিত এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি বিদেশীকে রঙ্গালয় দেখাইয়া জাতীয়ত্বের পরিচয় দিতে পারিতেন।

"নাট্যমন্দির"

বিধবা না ত কি ?

(গল্প—সত্যের ছায়া)

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ এম্, আর, এ, এস্]

(১)

তারা দুই বোন, বামা ও শ্যামা। কি কপাল দোষ, দুইজনই বাল বিধবা। বামাকে তার বাবা গৌরীদান করিয়া অক্ষয় স্বর্গ কামনায় আট বৎসরে বিবাহ দিয়াছিলেন, নবম বৎসরে সে বিধবা হয়। তাই শ্যামাকে এত শীগ্‌গির বিবাহ না দিয়া চৌদ্দ বৎসরে তার বিবাহ দেন। কিন্তু হায় তার বিবাহের দুই মাস যাইতে না যাইতেই তার কপাল পুড়িল। দ্বিরাগমন হইল গিয়া যমের সাথে।

দুই বোনই শ্বশুর বাড়ীর ফেরতা হইয়া বাপের বাড়ী আসিয়া ডেরা গাড়িল। এত দুঃখের মধ্যেও মা তাদের নিয়া সুখের মুখ দেখিতেছেন। মা তাদের সকল হবিষ্যান্ন করেন, একাদশী, অম্বুবাচি যত কিছু পর্ব্ব রক্ষা করেন। তাদের বাবা ভট্‌চায্ বামুন, শিরোমণি ঠাকুর। তাঁর কাছে শাস্ত্রের ব্যবস্থা নিতে চারদিকের লোক আসে।

বামা যখন নয় বৎসরের কচি বিধবা তখন তার মা শিরোমণি মহাশয়ের কাছে অতি গরমের দীর্ঘ একাদশীর দিনে বামাকে দুধ, কলা, অগত্যা সরবতটুকু দিতে ব্যবস্থা চাহিলেন। শিরোমণি মহাশয় চটিয়া লাল, "আমি দেশের ব্যবস্থাপক, দেশশুদ্ধ লোক আমার কাছে ব্যবস্থা নিতে আসে, সকলকেই আমি শাস্ত্রের উপদেশ দিই, আর আমি নাকি সৃষ্টিছাড়া অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিব। রাম, রাম, রাম।" ইহার পর হইতে গৃহিণী কর্ত্তাকে এ বিষয় আর কিছু বলিতেন না। তবে পাড়ার লোক বলাবলি করিত গিন্নী নাকি বামাকে একাদশীদিনের রাত্রে সরবত এমন কি দুধ, কলাটা পর্য্যন্তও দিতেন। শিরোমণি মহাশয় জানিলে অনাসৃষ্টি কাণ্ড হইবে বলিয়া তাহাকে আর জানান হইত না।

(২)

বামার এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া সে পাড়ার রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যের ছেলে রমাকান্ত গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী আসিয়া বড় দুঃখিত হইয়া পড়িল। সে কলেজে বি-এ পড়ে। বামাকে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিতে সে শিরোমণি মহাশয়ের কাছে অনুমতি চাহিল। রাম মাষ্টার বয়সে প্রবীণ, তাহার দ্বারা গ্রামের যুবকেরা একটী বালিকা স্কুল করিয়াছে। শিরোমণি মহাশয় এই প্রস্তাব শুনিয়া চটিয়া গিয়া কহিলেন "রাম, রাম. রাম, লেখাপড়া শিক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ, উহাতে বিধবা হয়।" রমাকান্ত কহিল, "বামা কি এখনো সধবা আছে?" শিরোমণি দেখিলেন ছেলেটা কি বাচাল, আমার সঙ্গেও তর্ক করে। তখন তিনি কহিলেন "পর জন্মেও বিধবা হবে। তোমাদের যত সৃষ্টিছাড়া কথা, আচ্ছা যা তোমাদের ইচ্ছা তাই কর। গিন্নীও দেখিতেছি তোমাদের কথায় সায় দিতেছেন, তবে আমি একলা আর কি করিব? ঘোর কলি।"

যেদিন বামাকে স্কুলে দিতে রমাকান্ত আসিয়া শিরোমণি মহাশয়ের নিকট শুভদিনের ব্যবস্থা চাহিল তখন তিনি কহিলেন "আচ্ছা বাবা, তোমরা যে মেয়ে পড়াইতেছ তা করে কি তাহাদিগকে হাকিম, উকীল, ব্যারিষ্টার করিবে নাকি? কলির রাজত্ব, আমার আর ব্যবস্থা অব্যবস্থা কি?" তারপর একটা দিন দেখিয়া বামা স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইল। রেঁধে বেড়ে খেয়ে বামা স্কুলে যায়। কোনদিন মাও রাঁধেন।

প্রথম যেদিন বামা স্কুলে গিয়া বাড়ী আসিল সেই দিনই তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তোর মুখে একটু মহাভারত শুনিতে চাই, পড়িয়া শুনাও।" বামা কহিল "আজই মহাভারত? বর্ণমালা পড়িতেই যে অনেক দিন যাইবে।" মা বল্লেন "তোর মুখে মহাভারত শুনব বলেই তোকে স্কুলে দিয়াছি, তার কত বাকি।" বামা উত্তর করিল "সেত মা অনেক দিনের কথা।" মা বামার মুখের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

(৩)

বামা স্কুলে পড়িতে লাগিল, অতি অল্প দিনে সে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া বামার কৃতিত্ব দেখিয়া গুরুমহাশয় ভারি খুসী হইলেন। বামা এখন মহাভারত পড়িতে পারে, তাহার জননী অবসর সময় তাহার কাছে বসিয়া মহাভারতের গল্প শুনেন। কৃষ্ণকথা, যুধিষ্ঠিরাদির বর্ণনা ও অন্যান্য অনেক কথাই মুখে মুখে শুনিয়া তিনি পাড়ার মেয়ে মজলিসে একজন সুবক্তা হইয়া পড়িয়াছেন। একদিন গিন্নী কর্ত্তাকে কহিলেন "আমার বামা বেশ মহাভারত পড়িতে পারে। একদিন তার মহাভারত পাঠ শুন না।" কর্ত্তা কহিলেন "কি ঘেন্নার কথা, ঘোর কলি কি না, তাই স্ত্রীলোকের মুখে মহাভারত শুনিতে হইবে। এমনই অনাচার আমার বাড়ীতে ঢুকিয়াছে না জানি কোন্ অমঙ্গল হয়।" এরপর হইতে বামার প্রশংসা করিয়া গিন্নী আর তার কাছে কোন কথা কহিতেন না।

যেদিন শিরোমণি ঠাকুর শুনিলেন, বামা একাদশীর দিন রাত্রে সরবত খাইয়াছে—সেইদিন হইতে তিনি বামার হাতের জল পর্য্যন্ত পান করা বন্ধ করিয়া দিলেন। বামা তাতে বড় বেশী দুঃখিত হইল না, গিন্নীও না।

বামার পড়া এখানে শেষ হইলে রমাকান্ত মাঝে মাঝে বন্ধে অবন্ধে বাড়ী আসিয়া তাহাকে ইংরাজী পড়াইত। শিরোমণি ঠাকুর এই অনাচারের কথা শুনিয়া রমাকান্তকে যে শাসন না করিয়াছিলেন এমন নহে। তবে কলিকালের ছেলে মেয়েরা তাঁর কথায় গ্রাহ্যই করিল না। বামা যখন স্থানীয় মাইনার স্কুলের মাষ্টার মহাশয়ের নিকট মাইনরের পড়া শেষ করিল তখন রমাকান্তর চিন্তা হইল "কেমন করিয়া ইহাকে আরো পড়ান যায়।"

বামার মামা সবডিভিসনে ওকালতী করিত। বামা তাহাকে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে মামাকে পত্র দিলেন অধিকন্তু রমাকান্তও একদিন গিয়া তাকে বামার কথা কহিয়া আসিল। বামাকে তার মামা সাগ্রহে তার বাসায় নিয়া হাইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেদের স্কুল, তাই তাহাকে গৃহের এক কোণে স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বামা কৃতির সহিত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইল। এদিকে রমাকান্তও এম্-এ পাশ করিয়া কলেজের প্রফেসার হইয়াছে। একদিন বামা কহিল "রমাদা এখন আমার উপায় কি হইবে?" রমাকান্ত সাগ্রহে উত্তর করিল, "তোমাকে পড়িতেই হইবে, আর কোথাও স্থান করিয়া দিতে না পারি, আমার বাসায়ই রাখিয়া দিব।" ইহার পর আর কোন কথা নাই। তারপর একদিন বামা আই-এ পড়িতে গেল।

(৪)

অনেকদিন শ্যামার খবর রাখি নাই একবার সে কথার আলোচনা করা যাউক। শ্যামাও গ্রামের স্কুলে কিছু কিছু পড়িত। শ্যামার স্বভাব চঞ্চল, যখন তার বয়স সতের তখন একদিন রমাকান্তকে কহিল "রমাদা, বিধবা বিবাহ সমাজে চলে না, অনেক বিধবা আছে তাদের সঙ্গে স্বামীর কলাতলায়ই দেখা, ইহাদের বিবাহ না হইয়া সমাজ যে কলঙ্কিত হইতেছে তা তোমরা দেখনা আর হাত পা বাঁধিয়া রমণীগণকে কতদিন রাখিবে?" রমাকান্ত ধরা-বাঁধা যে সকল কথা ছিল তাহা দিয়াই উত্তর করিল।

একদিন শিরোমণি ঠাকুরের ঠাণ্ডা মেজাজে অপর কয়জন ভদ্রলোকের সাক্ষাতে রমাকান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "জ্যাঠা মহাশয় অক্ষতযোনী বিধবার বিবাহ দেওয়া কি সঙ্গত নহে? বিধবার যে অন্য গতি নাই, এই সব করিয়া যে সমাজ কলঙ্কিত হইতেছে। আপনি সমাজের মঙ্গল চাহিয়া মত দেন তবে অনেক বিধবারই বিবাহ দিতে পারি। তাহা হইলে সমাজ-কলঙ্ক দূর হয়, হিন্দুর বংশও বৃদ্ধি হয়। বরং উহাদিগকে বৈরাগী করিয়া দেওয়াও ভাল। আর যাহারা ইহাদিগকে লইয়া সমাজে চলিতে না চান তাহারা বরং পৃথকই রহিলেন। একজন বেশ্যা হইলে কি তাহার পিতা, মাতা বা আত্মীয়গণ কি সমাজে পতিত হইবে? সমাজে কত কত পাপ গোপনে চলিতেছে এখন প্রকাশ করিয়া দিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতে আপত্তি কি?"

শিরোমণি—এই সকল ছেলেরাই কলিরাজের চেলা, তোমরা কি করিতে না পার? অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিতে পারিব না।

রমাকান্ত—আপনি ব্যবস্থা না দিন, কিন্তু আপনি অমত করিবেন না বরং তাহাদের লইয়া সমাজ করিবেন না। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রে বৈধ বলিয়াও ত উক্ত হইয়াছে।

শিরোমণি—কোন কোন শাস্ত্রকার বৈধ বলিয়া উক্তি করিলেও তাহা সমাজে চলে না।

আধুনিক ধরণের রসময় কাব্যতীর্থ বলিলেন—"কাল ক্ষেত্র ও সময় বুঝিয়া বিধবা বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। অন্য সমাজের লোকেরা আমাদের কলঙ্ক ও ব্যভিচার, ভ্রূণ ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের নিন্দা করে। অধিকন্তু আমাদের জন সংখ্যা ক্রমে লোপ পাইতেছে। হিন্দু আর কত কাল বাঁচিতে পারিবে ?"

শিরোমণি—তুমি বুঝি নাস্তিকদের ওকালতী ধরিয়াছ। এ সকল উক্তি করিও না, ব্রাহ্মণ সমাজে তোমার অপবাদ হইবে।

রমা—কি জ্যাঠা মশায় আপনি কি আমাদের যুক্তির উত্তর করিবেন না ? যাই হউক, আপনার কন্যা শ্যামার সঙ্গে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। সে যদি বেশ্যা হয় তবে কি আপনার জাতি যাইবে ? তাহাকে বিবাহ দিলেও আর পাপ নাই, বরং বিবাহ দিয়া আর ঘরে আনিবেন না।

শিরো—রাম, রাম, রাম। বাতুল, বাতুল, বাতুল। বাতুলের উক্তি অগ্রাহ্য। এ যে সরিষার মধ্যেই ভূত। বাপু কাব্যতীর্থ কি করা যায় এখন ?

কাব্যতীর্থ—আজ্ঞা কথাত স্বতই। একটা উপায় করুণ। শ্যামাকে বরং সুপাত্র দেখিয়া বিবাহই দিন। আপনি সমাজ পতি হউন।

শিরো—হতভাগা নাস্তিক। নাস্তিকের দলে গিয়া মিলিয়াছে। প্রাণ থাকিতে আমি শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতে পারিব না। হায়, আমি কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি। মেয়ে দুইটাকে উহাদের হাতে দিয়ে লিখা পড়া শিখাইতে দিয়াছি—যত সব মাটী করিয়াছি। এখন আর উপায় নাই, উহারা যে এখন খাচার বাহিরে। আমি একাই বা কি করিব, ব্রাহ্মণী শর্ম্মাও যে ওদের পক্ষ হইয়া বসিয়া আছেন। হরি হে দীনবন্ধু, তুমি জান।

কাব্য—আর অনুশোচনায় ফল কি, যাহা ভাল বোধ করেন শীঘ্রই করিয়ে ফেলুন।

শিরো—তোমরাত কহিয়া ফেলিলে কিন্তু কাজটা বড় সহজ নয় ?

কাব্য—সহজই যদি শীঘ্র কিছু না করেন, মেয়েরা যে আপনার নামে কলঙ্ক আনিবে।

শিরো—আমার দ্বারা তা হবে না আমি যদি ইহাদিগকে শাসনে রাখিতে না পারি তবে আমি আর শিরোমণি শর্ম্মাই নই।

বেড়ার ফাক দিয়া শিরোমণি গৃহিণী সকল কথাই শুনিতে পারিয়াছিলেন। এদিকে দেউড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া শ্যামাও সব কথা শুনিয়াছে, বুঝিয়াছে।

শিরোমণি মহাশয় সন্ধ্যার পর সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য নারায়ণ বিগ্রহ ঘরে গিয়েছেন এমন সময় রমাকান্ত ও কাব্যতীর্থের কথা গুলি মনে হওয়ায় তিনি গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলেন, "একি কথা শুন গিন্নি, শ্যামা নাকি বিধবা বিবাহ করিতে চায় ?"

গৃহিনী—তা কেন ? সে কি তোমার অমতে একটা কিছু করিবে ?

শিরো—আমার গৃহে নাস্তিকের অনাচার হইতে দিব না। উহাদিগকে লিখাপড়া শিখাইতে দিয়া হাত ছাড়া করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি। এখন অনুতাপ করিয়া লাভ কি ? তবে যথা সাধ্য চেষ্টা করিব বরং সকলকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেই ধর্ম্ম রক্ষা করিব।

গৃহিনী—শুনিয়াছি নানাস্থানে নাকি বিধবা বিবাহ হইতেছে। এরূপ দুখের মেয়ের উপর সমাজের দয়া হওয়া উচিত। তারপর শাস্ত্রের যে বিধান আছে তা তোমরা শুন কই। শাস্ত্রের নিষেধ গুলিই আকড়াই ধরিয়া রাখিয়াছ।

শিরো—আর তোমার কাছে শাস্ত্র শিখিতে হইবে না। তুমি যে আমার ঘরের ঢেঁকি কুমির। এই বলিয়ে শিরোমণি মহাশয় হরি স্মরণ করিয়া আহ্নিক করিতে বসিলেন।

(৫)

যথা সময়ে খবর আসিল বামা আই, এ পাশ করিয়া বৃত্তি ও পুরস্কার পাইয়াছে। গৃহিণী আহ্লাদে সে সংবাদ কর্ত্তাকে দিলেন। শিরোমণি মহাশয় কহিলেন "ও আমার লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, হয়ত একদিন শুনিব যে বেশ্যা হইয়াছে।"

গৃহিণী—এত লেখাপড়া শিখিয়াছে বেশ্যা হবে কেন ?

শিরো—এখনই কি বাকী আছে ? বিধবার বিবাহ হইলেই ত বেশ্যা হইল। হায় কলির শেষ, ধর্ম্ম যে এক পদও নাই। হরি তোমার ইচ্ছা।

গৃহিণী—বামা বুঝি এখন বি, এ পড়িবে।

শিরো—হতভাগাটা চুলোয় যাউক, এখন ওরা মরিলে বাঁচি।

গৃহিণী—ওমন অভিশাপ করিও না।

শিরো—বংশের মুখে চুণ, কালী দিয়াছে, আবার তাদিগকে আশীর্ব্বাদ করব কিনা ?

(৬)

বামা কলেজ বন্দের সময় বাড়ী আসিল না। রমাকান্ত বাড়ী আসিলে গৃহিণী শ্যামের একটা উপায় করিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন। রমাকান্ত কহিল "জ্যাঠাই মা, তা কেমন করিয়া হয় ? জ্যাঠা মহাশয় মত না দিলে কেমন করিয়া হইবে ?"

গৃহিণী—বাবা, আমি বড় ভয় পাইতেছি, শ্যামা নাকি কোন্ সর্ব্বনাশ করিয়া বসে, হয়ত আত্মহত্যা করিবে। লোক নিন্দাও যে না হইতেছে এমন নহে। ইহাকে বিবাহ দাও, বরং আমরা তাকে আর গৃহে আনিব না। তুমি তাহাকে লইয়া যাও।

রমা—জ্যাঠা মহাশয়ের মত না লইয়া শ্যামাকে এখান হইতে নিতে পারিব না।

গৃহিণী—যা ভাল বুঝ কর কিন্তু কর্ত্তা কিছুতেই তাহাকে বাড়ী ছাড়া করিবেন না। হয়ত বা কোন দুশ্চরিত্র লোক তাকে আমাদের অজ্ঞাতে বাহির করিয়া নিবে। তুমি আমার এ কথা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিও।

(৭)

ক্রমে কয়েক দিন গেল। একদিন প্রাতে গৃহিণী গিয়া কর্ত্তার কাছে একটা দুঃসংবাদ দিয়ে তাহাকে চমকাইয়া দিলেন। "ও গো, কি ভাবছ শ্যামা যে ঘরে নাই। আমার সঙ্গে ছিল আমি কিছু জানিতে পারি নাই আমার বোধ হয় লক্ষীছাড়া মেয়ে কোন যুবকের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে। তাত হবেই অকাল বিধবা মেয়ে, তার প্রতি তোমাদের শাস্ত্রের দয়া হইল না, যেখানে শান্তি, সুখ আছে, মেয়ে আমার তাহাই খুজিতে গিয়াছে তারা লিখা পড়া শিখেছে তোমার শাস্ত্রের দোহাই তারা মানিবে কেন ? পল্লী বেশ্যা হওয়া অপেক্ষা ইহা মন্দ হয় নাই।"

শিরো—আরে গিন্নি চুপ কর লোকে শুনলে জাত যাবে যে, তোমার দুর্ব্বুদ্ধিতে মরিলাম। কাউকে আর ও কথা বলো না। শ্যামা তার মামার বাড়ী বা বামার কাছে গেছে বললেই হবে।

গৃহিণী—তাই কর, লোকের মুখ কেমন করিয়া বন্ধ করি।

গ্রামে এই সকল কথা লইয়া কাণাকাণি হইতে লাগিল। পদি পিশি গিয়া ও পাড়ার গঙ্গা মাসিকে গোপনে এই অতি প্রয়োজনীয় সংবাদটী তাড়াতাড়ি দিয়া আসিল। গঙ্গা মাসিও এই জরুরী সংবাদ টেলিগ্রাফের মত ঘরে ঘরে দিয়া আসিলেন। আর সকলকেই সাবধান করিয়া দিয়া আসিলেন "কেহ যেন এই সংবাদটী প্রকাশ না করে।" আর তাহারাও ক্ষীপ্রতায় পদিপিসী বা গঙ্গামাসী অপেক্ষা কম করে নাই। পদিপিসী ও গঙ্গামাসী নিজেদের চরিত্রের সাফাই গাহিতেও কম করিলেন না। "ওমা, কি ঘেন্নার কথা, আমরাই আর কি কচি বিধবা ছিলাম না, আমরা কেমন ঘরে থাকিয়া বাপ মায়ের ইজ্জত রক্ষা করিয়াছি। হায় কলিকাল, শিরোমণি ঠাকুরের বুড়া বয়সে কি দুর্গতি। ছুড়ীটা দেশ গাঁয়ের মুখ পুড়ালে।" ফলে যৌবন ও প্রৌঢ় কালে তাদের খুব সুনাম ছিল, তাদের কয়েকবার গর্ভ নষ্টের কথা কে না জানে। পল্লী গ্রাম তাদের দ্বারা খুব একবার আন্দোলিত হইয়াছিল। তাদের বাড়ীতে যুবক চাকরেরা অল্প বেতনে বা বিনা বেতনেও চাকরী করিত এ সুসংবাদও অনেকেই রাখে।

(৮)

পরদিন শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই আসিতে লাগিলেন কিন্তু কর্ত্তার মুখ তার দেখিয়া কেহ কিন্তু প্রথমে বলিতে সাহস করে নাই, পরে যখন কথাটা প্রকাশ পাইল তখন শিরোমণি মহাশয় চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন "তোমরা যদি মেয়ে ছেলেদের কুটুম্ব বাড়ীতে

যাওয়া নিয়া এমন গোলযোগ কর তবে গ্রামে তিষ্ঠান ভার ভার হইবে।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন "যা হবার তা হয়েছে—শাক দিয়া মাছ ঢাকিলে লোকে তা বুঝে। একবার কুটম্ বাড়ীই খোঁজ করিয়া দেখ না।

এ কথার পর শিরোমণি আর জবাব দিলেন না, বিদ্যারত্নও আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন। শিরোমণি অন্তঃপুরে গিয়া কহিলেন, "শুন গিন্নি গাঁ ময় ত রাষ্ট্র হইয়াছেই। ঐ রমা ছোড়াটাই আমার যত সর্ব্বনাশ করেছে। একবার তাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর—সে শ্যামাকে কোথায় চালান দিয়েছে।"

গৃহিনী বলিলেন, "অমন সাধু ছেলেকে আমি ওরূপ করে জিজ্ঞেস করতে পারব না।"

শিরোমণি—"হরি হে তুমি জান" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে থানায় জানাইয়া মামলা করিতে কহিলেন, কিন্তু তিনি জাত যাওয়ার ভয়ে সে কথায় কাণ দিলেন না। এ মেয়ে ঘরে ফিরিয়া আসিলে সানন্দে গ্রহণ করিবেন ইহাও ইচ্ছা।

(৯)

শ্যামা বাহির হইয়া যাওয়ার দুঃসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া রমাকান্ত অনন্যোপায় হইয়া তাহার তল্লাসে কলিকাতা চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া জানিতে পারিল, সে নাকি একদিন বামার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল কিন্তু তাহার ঠিকানা বলিয়া যায় নাই। সঙ্গে ছিল তাহার রামহরি ভট্টাচার্য্যের পুত্র প্রাণহরি। প্রাণহরি লেখাপড়া শিখে নাই কিন্তু সে কলিকাতা থাকিয়া ব্যবসা করিয়া দু' পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। প্রাণহরির চরিত্র মন্দ, তাই রমাকান্ত শ্যামার জন্য চিন্তিত হইল।

একদিন প্রাণহরির নিকট গিয়া রমাকান্ত কহিল, "দেখ প্রাণহরি, শিরোমণি জ্যাঠার কপালে যা ছিল তা ত হইলই, এখন একটা কথা বলি রাখিবে কি ?"

প্রাণ - কি কথা, বলনা।

রমা—কথাটা এই, শ্যামা যুবতী ও সুন্দরী। ইহাকে ভাসাইয়া না দিয়া তুমিই তাহাকে বিবাহ কর।

প্রাণ সে কথা কি ? আমি বিবাহ করিয়া কি সমাজের বাহিরে যাইব ? আমি তা পারিব না।

রমা—পারিবে না ত বুঝিলাম কিন্তু তুমি যে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ইহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছ, ইহাতে কি তোমার ও তাহার নরকের পথ প্রশস্ত করা হয় নাই ? তাহার চরিত্র মন্দ ত তুমিই করিয়াছ ?

প্রাণ—যাহাই বল, তাহার সম্মতি না থাকিলে কি আর আমি জোর করিয়া করিয়াছি বলিতে চাও ?

রমা যাউক, এখন তাকে কোথায় রাখিয়াছ বলিয়া দাও একবার তার সঙ্গে দেখা করিব।

এ কথার উত্তরে সে কোন কথাই বলিল না, অনেক সাধ্য সাধনায় জানিতে পারিলেন শ্যামাকে সে সোণাগাছি রাখিয়াছে। ফলে কিন্তু শ্যামা সে সময় তাহারই দোকান ঘরের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাদের সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। সবগুলি কথা শুনিয়া তার দুর্ব্বল হৃদয়ে সমুদ্রের ঢেউ উঠিয়াছিল। রমাকান্তের সঙ্গে দেখা করিবে কি না, দেখা করিয়াই বা কি বলিবে আর কিই বা করিবে ইত্যাদি নানা বিষয় আন্দোলন করিতেছিল।

দুই তিন দিন পরে একদিন বামার অনুরোধে প্রাণহরিকে লইয়া রমাকান্ত সোণাগাছীতে গিয়া শ্যামার সঙ্গে দেখা করিল। শ্যামা কহিল "রমাদা, তুমি কেন এ পতিতার গৃহে এই পতিতা পল্লীতে আসিয়াছ, তুমি সৎ চরিত্রের লোক। আমি আর ফিরিব না, যে পথে আসিয়াছি তাহাতেই আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমাকে ভুলিয়া যাও। আমি নরকে ডুবিতেছি তোমার কি সাধ্য আমাকে তুলিয়া লইবে।

রমা দেখ শ্যামা তুমি সদ্বংশজাত পণ্ডিত শিরোমণি মহাশয়ের কন্যা, তোমার সাধ্বী জননী তোমার জন্য কাঁদিয়া অস্থির, এখনো ফিরিয়া চল, তোমার গতি করিয়া দিব। ইচ্ছা ছিলনা, পতিতার গৃহে পদার্পণ করি—কিন্তু তোমার চারিদিক দেখিয়া তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলাম।

এই কথা কহিয়া রমাকান্ত বিদায় হইয়া আসিল। এদিকে শিরোমণি মহাশয়ের গ্রামে শ্যামা কথা লইয়া নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয়

দুর্বুদ্ধিতার বিষয় ভাবিয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া শরীর ক্ষয় করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ এখন তার আর সমাজে তেমন প্রতিপত্তিও নাই। কাহারো ভালমন্দে এখন তিনি কোন কথাও বলিলেন না।

একদিন সংবাদ পাওয়া গেল, দুই প্রণয়ীতে ঝগড়া করিয়া শ্যামার বুকে ছুরি মারিয়াছে। হাসপাতালে গিয়া ঐ ছুরি খসাইতেই শ্যামার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। হায়, পণ্ডিতের কন্যার কি অধোগতি।

রমাকান্তকে তাহার পিতা অনেকদিন যাবত বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন কিন্তু সে বরাবরই অসম্মতি জ্ঞাপন করে। তাহার মনের উদ্দেশ্য তিনি বুঝিতে পারেন না।

(১০)

বামা বি, এ পাশ করিয়াছে। রমাকান্তের সঙ্গে বামার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর রমাকান্ত ও বামা উভয়েই হিন্দুধর্মে আস্থাবান হইয়াছে, নিত্য তারা গঙ্গাস্নান করিয়া পূজা আহ্নিক করে গীতা, চণ্ডী পাঠ করে তা'দেখে সকলে অবাক্। প্রথমে যারা ঘৃণা করিত, ক্রমে তারাই সমাজে তুলিয়া লইয়াছে, দেখিয়া শিরোমণি মহাশয়ও অবাক হইয়াছেন। বামা বি, টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী পরে সে বিভাগীয় বালিকা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইয়া এবং রমাকান্ত কলেজের প্রফেসার হইতে প্রিন্সিপাল হইয়া উভয়ে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয়ও বিধবা বিবাহের পক্ষবর্ত্তী হইয়া পরাশরের মতে মত দিতে লাগিলেন। অনেকেই বলিতে লাগিল সাপ মরিলেই সিধা হয়।

জাগরণ

[অজ্ঞ]

একটি পথিক পথশ্রমে কাতর হইয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন গোধূলির আলো অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। অবিলম্বে সন্ধ্যারাণী আঁধার অঞ্চলে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। নিস্তব্ধ রজনী। সকলের নয়নান্তরালে কালো, কালো মেঘ আসিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিল। দামিনী চমকিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণ ও ভীষণ করকা পাত আরম্ভ হইল। কিন্তু পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। ক্রমে নিশা শেষ—উষার আলোক পথিকের চোখে, মুখে আসিয়া পড়িল। শিশু রবি মায়ের কোল ছাড়িয়া গগনাঙ্গনে খেলিতে আসিল, কিন্তু পথিক জাগিল না। নির্ঝরিণী মৃদুস্বরে বলিল, "পথিক জাগ"। পক্ষিগণ কলরব করিয়া ডাকিল, "পথিক জাগ"। ফুলগুলি পথিকের অঙ্গে ঝরিয়া বলিল, "বন্ধু জাগ", কিন্তু পথিক জাগিল না। ক্রমে বেলা বাড়িল। রবি কিরণ অগ্নি-বানের ন্যায় পথিককে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বসুন্ধরা উত্তপ্তা হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিল। বায়ু অনল-শাস্ত্রে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝলসিয়া দিল, কিন্তু পথিক জাগিল না। সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিল। পাখিগণ কুলায় আসিয়া ব্যথিত কণ্ঠে আবার বলিল, "পান্থ জাগ"। চাঁদ আকাশ হইতে ডাকিল, "সখা জাগ"। নক্ষত্রাবলী নীরব ভাষায় বলিল, "ভাই জাগ," পথিক তবুও জাগিল না।

জননী পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। পুত্র আসিল না। তিনি উদ্বিগ্ন অন্তরে, আকুল নয়নে পথপানে চাহিলেন—পুত্রকে দেখিলেন না। নিবিড় অন্ধকার—অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া আসিল। জননী আর থাকিতে পারিলেন না। পাগলিনীর মত তিনি পথে পথে ছুটিলেন। বহুদূর আসিয়া দেখিলেন—তাহার নয়ন-মণি ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। পুত্রের মাথায় হাত দিয়া জননী কাঁদিয়া ডাকিলেন "বাবা জাগ"! সেই করুণ-কোমল-কর স্পর্শে নিদ্রাচ্ছন্ন নয়ন দুটি ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল। পুত্র অবাক্ হইয়া দেখিল— সে কেমন করিয়া কখন্ মায়ের কোলে আসিয়া পড়িয়াছে!

উদ্বোধন

মৃত্যু-মিলন

[শ্রীফণীশচন্দ্র মজুমদার]

—এক—

রাঁধুনে বামুনের সঙ্গে ঝগড়া করে আধপেটা ক'রে খেয়ে সরল ঘরে ঢুকেই দেখল ঘড়িতে এগারটা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি। তাড়াতাড়ি চটী পরতে গিয়ে বাঁ পায়েরটা ডান পায়ে ঢুকিয়ে দিল—পাণের বাটা থেকে গণ্ডা খানেক আস্ত সুপারি পকেটে ফেলে বই নিতে গিয়ে দেখল, কে যেন তার বই খাতায় কালী ঢেলেছে। বুঝতে দেরী হ'ল না কে এই কাজ করেছে। ক্রোধ কম্পিত-স্বরে ডাকল—"পারু!" ভয়ে ভয়ে একটী কচি টুকটুকে মেয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। সরল জিজ্ঞাসা করল—"কে করেছে?" বলির আগে ছাগ-শিশু তার হত্যাকারীর মুখের দিকে যেমনি ক'রে চায় তেমনি করেই পারুল তার ফোর্থ ক্লাশে পড়ুয়া বালক স্বামীর দিকে চাইল। তার চোখে ছিল জল—চাউনিতে ছিল ভয়। সরল আবার জিজ্ঞাসা করল—"কে কালী ঢেলেছে?" দুই তিনবার ঢোক গিলে পারুল ভয়ে ভয়ে বল্‌ল—"লিখছিলুম পড়ে গেছে।"

"লিখছিলুম পড়ে গেছে—কে তোকে লিখতে বল্ল?"

"তুমি যে লেখ?"

"আমি লিখি বলে তুইও লিখবি? আমি স্কুলে যাই তুই যাস্‌নে কেন?"

"তুমি যে নিয়ে যাও না।"

"ফের কথা—যা বলছি এখান থেকে।"

"আমায় বকছ—বাবাকে বলে দেব।"

"দিগে যা।" এই কথা বলেই সরল হন্ হন্ করে স্কুলে চলে গেল। আর পারুল? পারুল তার কালী মাখা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে শ্বশুরের কাছে নালিশ করতে গেল।

—দুই—

নরেন বাবু বড় লোক। এক সরল বই সংসারে তাঁর আপন বলতে তেমন কেউ আর ছিল না। মা মরা ছেলেটার সব আবদার তিনি হাসিমুখে রক্ষা করতেন। হৃদয় রত্নাগারের শ্রেষ্ঠরত্ন ভালবাসা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। প্রীতির প্রতিমা পারুলকে তার সঙ্গী করে দিয়েছিলেন যখন পারুলের বয়স ছিল পাঁচ। আজ সে তিন বছরের কথা। * * * মানুষের মুখে সুখের হাসি ভগবানের চোখে অসহ্য বোধ হয়। সে হাসিটুকু কেড়ে নেবার জন্যে তিনি সচেষ্ট হ'ন। তিন দিনের জ্বরে সরল পারুলের সিঁথির সিন্দুর মুছে দিয়ে, বুড়ো বাপের বুকে শোকের পাষাণ চাপিয়ে দিয়ে কোন্ অজানা দেশে চলে গেল। পারুল নিজের পুতুলটাকে কাপড় পরাতে ব্যস্ত—বুঝল না তার আজ কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। দেখল দাসদাসী সব কাঁদছে। পুতুলটী রেখে দিয়ে শ্বশুরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"বাবা ওরা কাঁদছে কেন? তুমি বকেছ বুঝি?" নরেন বাবু বল্লেন—"আমি তো কিছু বলিনি মা—সরল—" দু' ফোঁটা অশ্রু বাধা না মেনে চোখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে এল। নরেন বাবু তাড়াতাড়ি চোখ মুছলেন।

"সরল ভারী দুষ্টু না বাবা?"

"হাঁ মা বড় দুষ্টু।"

"ভয়ে পালিয়েছে—তুমি বকবে কি না তাই। আবার আসবে।"

"আর আসবে না।"

"জ্বর হয়েছে না—না যদি আসে আরও জ্বর হবে।—ওকি তুমি কাঁদছ? আমি বলছি সরল আসবে। ক্ষিধে পেলেই আসবে। সেদিন আমি রাগ করে আম বাগানে লুকিয়েছিলুম—কিন্তু যখন ক্ষিধে পেল তখন আর থাকতে পারলুম না—আসতেই হোল। তুমি কেঁদ না আমি সরলকে খুঁজে আনছি।" বালিকা ছুটে আম বাগানের দিকে গেল। * * * কিছুক্ষণ পরেই পারুল ফিরে এল। তাকে একা

ফিরতে দেখে নরেন বাবুর বদ্ধ অশ্রু আর বাধা মান্‌ল না। কি বলতে যাচ্ছিলেন—কথা ফুটল না—কণ্ঠরোধ হ'ল। শুধু ঠোঁট দুখানি কেঁপে উঠল। পারুল ডাকল "বাবা"

নরেন বাবু চিৎকার করে বল্লেন—একা ফিরে এলি মা—"

পারুল বল্ল "খুঁজতে যাচ্ছিলুম—হরিবোল শুনে ফিরে এলুম। চল দুজনে যাই।"

—তিন—

ভয়ানক অন্ধকার দৃষ্টি চলে না। আকাশে একটা নক্ষত্র পর্য্যন্ত উঠে নাই। নরেন বাবু সেই জমাট অন্ধকার ভেদ করে পারুলের হাত ধরে চলেছেন শ্মশানে। পারুল ক্লান্ত ভাবে বল্ল—"আর চলতে পারছি না।"

সহসা সামনে আগুন জ্বলে উঠল। পারুল বল্ল—"আগুন কেন বাবা? চলতো—ওখানে বোধ হয় সরল আছে।" বিরাট অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে—কত চিরস্বপ্নের স্মৃতি চিতাভস্ম বুকে করে চিরনিদ্রায় শুয়ে ছিল পল্লীর শ্মশান চুল্লীর গর্ত্তে বুক তার ক্ষত বিক্ষত। নরেন বাবু সদ্য-বিধবা পারুলবালার হাত ধরে আজ সেই শ্মশানের বুকের উপর এসে দাঁড়ালেন! কয়েক জন লোক একটা চিতা সাজিয়ে—সামনে আগুন জ্বেলে বসে ছিল। পারুল বল্ল—"যদুকাকা। এখানে তোমরা কি করছ? সরলকে দেখেছ?" * * * কি করছে এরা? যেদিন সরল পারুলের বিয়ে হয় সেই দিন উৎসবের প্রধান পাণ্ডা ছিল এরাই। বর কনের যখন শুভ-দৃষ্টি হয় এরাই পিড়ী উঁচু করে ধরেছিল। আজ? আজ এরা কনের হাত দিয়ে বরের মুখে আগুন দেওয়াবার জন্যে বসে আছে। একদিন মিলন দেখে সুখী হয়েছিল, আজ বিচ্ছেদ দেখে বাড়ী ফিরবে।

নরেন বাবু বল্লেন—"এই অন্ধকারে তোমরা জোনাকির মত আলো জ্বেলে বসে আছ। আমার চোখে কিন্তু সবই অন্ধকার। তোমরা আগুন জ্বেলেছ আমার মনে হচ্ছে ঐ আগুনই আমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নেবে।" যদুবাবু বল্লেন—"পারু, মা! এই কাঠের গাদায় আগুন দাও না? বড় অন্ধকার আলো হয়ে যাবে এখন।" পারুল বল্ল—"আমি পারব না। আমার ভয় করছে।" যদুবাবু বল্লেন—"ভয় কি—আমরা এখানে এত লোক রয়েছি।" পারুল বল্ল—"ওর মধ্যে যদি সরল থাকে?" যদুবাবু বল্লেন—পাগলী—!"

"আচ্ছা দাও।" যদুবাবুর হাত থেকে আগুন নিয়ে যেমনি পারুল চিতায় দিতে যাবে—হাতের আগুনে চিতার মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেল সরল শুয়ে রয়েছে। মৃদুস্বরে ডাকল—"সরল বাড়ী চল। বাবা বকবেন না।" কথাগুলি নরেন বাবু শুনলেন—বুক ভরা শোক উথলে উঠল। বড় করুণ করে ভারী গলায় বললেন "মারে তোর আর আঁধার দেশে আলো জ্বেলে কাজ নেই।" উত্তরে পারুল যেন কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু যদুবাবুরা একরকম জোর করেই তাকে চিতায় আগুন দেওয়ালেন। ধূ ধূ চিতা জ্বলে উঠল। সমস্ত শ্মশানটা আলোময় হয়ে গেল। পারুল দেখল সেই নির্ম্মম বিশ্বগ্রাসী আগুন লেলিহান জিহ্বা দিয়ে সরলকে ঘিরে ফেলল। সরল কিন্তু তখনও নিশ্চিন্ত হয়ে সেই আগুনের মাঝখানে ঘুমচ্ছিল। পারুল চিৎকার করে ডাকল—"সরল বেরিয়ে এস, আগুন!" সরল শুনল না তার ঘুম ভাঙ্গল না। ব্যস্তভাবে সকলের কাছে করুণ করে বল্ল—"পুড়ে গেল—বার কর!" কেউ শুনল না। পারুল তখন সরলকে বাঁচাবার জন্যে নিজেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সকলে ব্যস্ত হয়ে ধরতে গেল বিধির লিখন খণ্ডায় সাধ্য কার—রাক্ষস শিখা কচি মাংসের অপূর্ব্ব সাদ গ্রহণ করবার জন্যে শত হস্ত বিস্তার করে সকলকে বাধা দিল।

স্বপ্ন

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন দে

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১৬ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩২ । [৩৮শ সপ্তাহ

বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন

[শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা]

মানবের অন্তরাত্মা দিয়া যিনি সাগর সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন তাঁহার বক্ষ মহাসিন্ধুর মতই প্রশস্ত ছিল। চিত্তরঞ্জন সাগর সঙ্গীত গাহিয়া কবি, আত্মোৎসর্গ করিয়া দেশবন্ধু, নরপূজা করিয়া বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।

চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব, কিন্তু তিনি কেমন ধারা বৈষ্ণব তাহা হয়তো অনেকেই জানে না বা বোঝে না। তিনি মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সাধন পন্থার কোনটুকু যে গ্রহণ করিয়াছিলেন বৈষ্ণব তন্ত্রের কোন মার্গের পথিক তিনি ছিলেন তাহা জানিলে বোঝা যাইবে কি করিয়া চিত্তরঞ্জন অমন বিরাট ত্যাগ করিতে পারিলেন, কেমন করিয়া—দেশবন্ধু হইয়া দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া দেশ ও জাতিকে ধন্য করিলেন।

বৈষ্ণবতার যে ধারা গৌড়িয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত তাহার সহিত বহিরঙ্গ তুলনায় হয়তো চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব নহেন, তাঁহার আচার আচরণ তাঁহার ক্রিয়া ও সাধনা হয়তো প্রচলিত বৈষ্ণব পন্থার সহিত ঠিক ঠিক মিলে না। তবু তিনি বৈষ্ণব আদর্শ বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ভাষায়—"সাড়ে তিনশত বৈষ্ণবের মধ্যে" চিত্তরঞ্জন একজন।

চিত্তরঞ্জন কেমন ধারা বৈষ্ণব ছিলেন তাহা বুঝিতে হইলে অদ্বৈত প্রভুর সেই মঙ্গল সাধনা বুঝিতে হইবে। গৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য নিরালা কুটীরে যে সাধনা করিতেন তাহা যোগমার্গ নহে, ভক্তি সাধনা অথবা মুক্তি সাধনা নহে—উহা নর কল্যাণের জন্য বিশ্ব বিধাতার কাছে কাতর ক্রন্দন। ইহা একেবারে আত্ম বিবার্জ্জিতা।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের এই ভাবটাই রূপান্তরিত হইয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উদ্গীত হইয়াছিল—

"নাম রুচি জীবে প্রেম বৈষ্ণব সেবম !"

গৌরাঙ্গ দেবের সংজ্ঞা অনুসারে অদ্বৈতের তুলনায় চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব। চিত্তরঞ্জনের অন্তরাত্মা নরপ্রেমে সাগরের মতই অগাধ ও উদ্বেলিত ছিল। জীব কল্যাণের জন্য তিনি নিত্য নিয়তই কাঁদিয়াছিলেন। "জীবে প্রেম" যদি বৈষ্ণবতার লক্ষণ হয়—মানব মঙ্গলের জন্য ক্রন্দন যদ্যপি পরম ভাগবত ভাবের পরিচায়ক হয়; তবে বলিতে হয় চিত্তরঞ্জনের মত বৈষ্ণব আর কে আছে।

ত্যাগ! ত্যাগ করিতে পারে কে? যে ভালবাসে যে আত্মোৎসর্গ করিয়া ভালবাসে—সেই ত্যাগে সমর্থ। তাই না বুদ্ধ গৌরাঙ্গ পরম ত্যাগী। আর চিত্তরঞ্জন তাঁহার দেশকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধু হইয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই অমন একনিষ্ঠ দেশভক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। দেশ তাঁর কাছে মাটি ছিল না—রাজনীতি ছিল না—আর্থিক অবস্থা ছিল না—স্বদেশ তাঁহার কাছে জীবন্ত ছিল। দেশের মানুষই তাঁহার কাছে—দেশ ছিল তাই—তাহাদের কল্যাণের জন্য—তাহাদের স্বাধীনতার সাধনায় আপনাকে এমন করিয়া উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ মহাপ্রভুর সেই "জীবে প্রেম" ছাড়া আর কিছুই নহে। স্বজাতি মঙ্গল ব্রতী সন্তান সম্প্রদায়কে—বঙ্কিম তাঁহার আনন্দমঠে এই জন্যই বৈষ্ণব আখ্যা দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈষ্ণবতার ধারণা—চিত্তরঞ্জন তাহার দিক দিয়াও পরম বৈষ্ণব।

উপাসকের পরিচয়ে—বৈষ্ণবতার নিরূপণ হইতে পারে; সে উপাসনা কি দেবতার কোন সাম্প্রদায়িক বিগ্রহের অথবা তত্ত্বের। তত্ত্বের যদি হয় তবে সে তত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত।

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।"

আর বাংলার চিত্তরঞ্জন—চিত্তরঞ্জন এই "জীবে দয়া" পরম তত্ত্বের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াই বৈষ্ণব কবি দেশবন্ধু ত্যাগী। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মঙ্গলব্রত চিত্তরঞ্জন সেই মঙ্গলব্রতী হইয়াই বৈষ্ণব। আনন্দমঠের সত্যানন্দ জীবানন্দ ছাড়া এমন বৈষ্ণব বাঙ্গলা দেশে চিত্তরঞ্জন ব্যতীত আর কে ছিল বা আছে?

———

দেশোদ্ধার
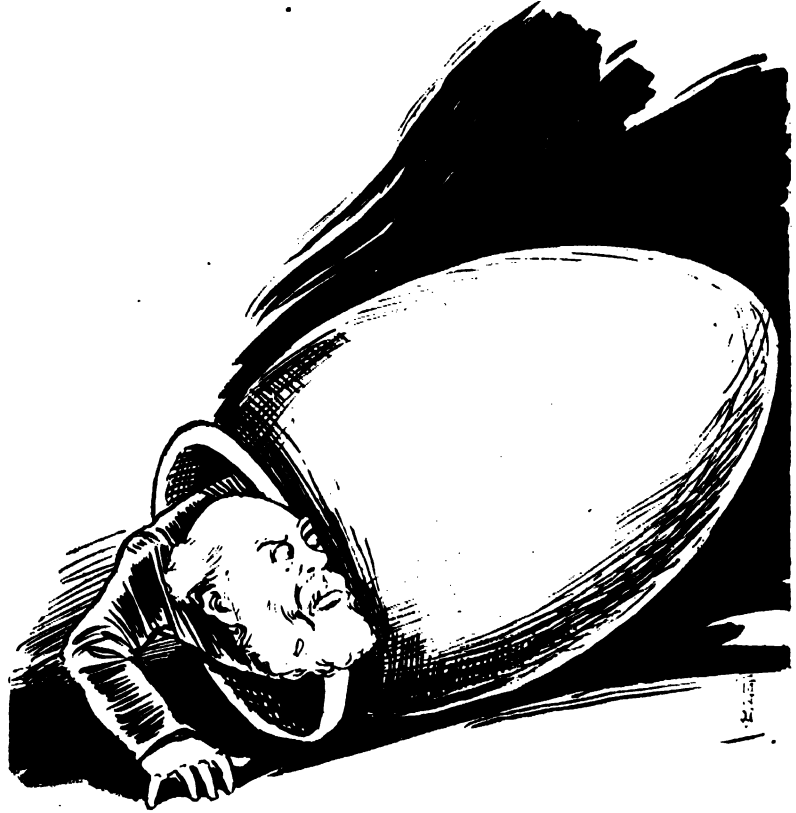
আর কতকাল রব অন্ধকারে ?

সময় হইয়াছে এবে—
বাহিরিব দেশোদ্ধারে—
সঙ্গী করি তিন পত্রিকারে—

সমস্যা

[শ্রীমতী বেবি বোস্]

পাঠক পাঠিকা—

আজ আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা আপনাদের জানাতে উৎসুক হলুম কেন তা জিজ্ঞাসা করে আপনারা আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। লজ্জা বা ঐ রকম যা কিছু আছে আমার প্রাপ্য তা জানি কিন্তু উপায় নাই—আমার বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ নির্ণয় আপনাদের করে দিতেই হবে !!!

আমার নাম "আশালতা"। মা বাবা বার বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন—স্বামী পড়তেন এম্, এ। দু বছর যেতে না যেতেই তাঁকে আমরা হারাই। বাঙ্গালীর ঘরে চোদ্দ বছরের মেয়ে নেহাৎ ছেলেমানুষ নয় তাই স্বামীকে এই দুই বৎসরেই বেশ চিনে নিয়েছিলুম। তিনি আমায় বিয়ে করেছিলেন বোধ হয় নেহাৎ পিতামাতার বাধ্য ছিলেন বলে। যখন এল্, এ পড়েন তিনি এক খৃষ্টান অধ্যাপকের বোনের প্রতি আকৃষ্ট হন * * * সেই খৃষ্টানিটির কবল হইতে রেহাই পাবার দরুণই তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু বিধির ইচ্ছা অন্যরূপ ! তিনি যা চান, বার বছরের ঘোমটা টানা মেয়ে দিতে পার্বে এ রূপ আশা করা অন্যায়। বিবাহের পর ফুলশয্যার রাত্তির ছাড়া তাঁর সঙ্গে একবিছানায় শোবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এরূপ ক্ষেত্রে আমার অকাল বৈধব্য যে আমাকে বিশেষ ব্যাকুল করে তুলেছিল সে কথা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে (দাম্পত্য জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও মধুর থাকতে পারে তার কিছুরই আস্বাদ আমি তখনও পাইনি।)

* * * *

কয়েক বছর হল বাপের বাড়ি এসে রয়েছি। বাবা ও মা উভয়েরই খুব উদার-মতাবলম্বী। বিধবা মেয়ের পাছে কোনও কষ্ট হয় এই ভেবে আমার জন্য সব আলাদা বন্দোবস্ত করে দিলেন। অতীতকে ভোলাবার জন্য ভাল অর্গ্যান, সেলায়ের কল প্রভৃতি কিনে দিলেন। গান বাজনা, লেখাপড়া নিয়েই সব সময় পড়ে থাকতুম।

কমল আমাদের পাড়ার ছেলে আমারই বয়সী। তার সঙ্গে আমার ভাব ছেলে বেলা থেকে। এখানে ফিরে আসার পর তার সহিত ঘনিষ্ঠতা আমার আরও বেড়ে উঠ্ল—কেননা সেই ছিল বল্‌তে গেলে আমার একমাত্র সঙ্গী—আমার ব্যথার ব্যথী, সুখের সাথী। ক্রমে আমাদের ঘনিষ্টতাটা এমন যায়গায় এসে দাঁড়াল যে উভয়ের পক্ষেরই সেখান থেকে নড়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠ্ল। মা বাবা আমাদের মেশা-মিশিটা প্রীতির চক্ষেতেই দেখ্‌লেন। কমল !"—লতার" আমাদের তার সঙ্গে মিশলে মন যদি ভাল থাকে দোষ কি ?

দোষ কি ? যখন দেখলুম নিরুপায়—দুদিন পরেই জানা জা ন হয়ে যাবে—কমলকে উপায় স্থির কর্ত্তে বল্লুম। কমল যাকে জানতুম এত সরল, এত উদার, এত সৎ, আমার একটী কথার জন্য যে সারা দুনিয়াকে ভুলতে প্রস্তুত ছিল—সে পেছিয়ে গেল আমার প্রস্তাবেতে। বিধবাকে বিবাহ করা—তা সভাসমিতিতেই ভাল, বাস্তব জীবনে অসম্ভব। তার মা বাপ আছে, ভবিষ্যৎ তার উজ্জ্বল আশাপ্রদ—আমার সঙ্গে মিশেছিল একটা যৌবন সুলভ চপলতার আবেশে—পরে কি হবে, হতে পারে অত ভাব্‌বার অবসর সে পায় নি।

যখন তাকে আমার কাতর মিনতি জানালুম সে কী করেছে—দেখালুম—আমার পরিণাম কোথায় বোঝালুম—সে তার সব দোষ স্বীকার করে বল্লে "একটা ভুলের সংশোধন আর একটা ভুল দিয়ে কর্ত্তে পারি না—সে অধিকার সমাজ

ও স্বজন আমায় দেয় নি—ক্ষমা কর—লতা! আমাদের অতীতের স্মৃতি রক্তের অক্ষরে ধুয়ে মুছে ফেলে ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করে নূতন জীবন আরম্ভ কর—আমিও নিজের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব।"

আজ খবর পেলুম কমল কদিন হল কোন সুদূর দেশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থে চলে গেছে। সে তার বাপ মা, আত্মীয়, স্বজন, সমাজ সকলেরই সন্মান শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে আমার কাছ থেকে দূরে—বহুদূরে চলে গেছে। কিন্তু আমি কি কর্ব্ব? * * * বাবা মা সবই জানতে পেরে গেছেন! দোষ? বিধবা মেয়েকে তার শ্রদ্ধাচারের মধ্যে থাকতে না দিয়ে তাকে আধুনিক সভ্যতার জালে ফেলে তার কি পরিণাম করেছেন—আমার জীবনের কঠোর উপলব্ধি দিয়ে—আজ তাঁরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছেন।

আমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে নিজের উপায় স্থির করে নিতে হবে—ইহাই হ'ল তাঁদের আদেশ। বাপের বাড়িতে আমার আর স্থান নাই। অতঃ কিম্?

পানের শোক

[শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

(সুর—দেখ হৃদয় আসন রেখেছি শূন্য)

দেখ ডিবারি আসন রেখেছি শূন্য—
তব দ্বার পথে চাহিয়ে—।
দশটা অবধি ছিলাম বসিয়ে—
শুধু দুটী পান মাগিয়ে।
পলে পলে আমি গণেছি মিনিট
ঘড়িটী ত হাতে ধরিয়ে—
কে জানিত ওগো সুপুরি কাটিতে—
এত বেলা যাবে কাটিয়ে।
ভেবেছিনু—ডিবা বুকের পকেটে—
রাখিব যতনে ভুলিয়ে—
বিরলে বসিয়ে খাব দু' একটী
কত ভনে ওগো ছলিয়ে।

জাতির জীবনে নারীর স্থান

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ]

জাতির মূল হ'ল শিশু। এই শিশুর জননী হন নারী। তিনি শিশুকে জন্ম দেন এবং জন্ম দেবার পূর্ব্বে প্রায় দশমাস কাল আপনারই বুকের নীচে, আপনার রক্ত দিয়ে তাকে রক্ষা করেন। তিনি হলেন জীবধাত্রী, তাইতো শাস্ত্রে তাঁকে সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার চেয়েও গুরু বলে সম্মান করতে আদেশ করেছেন। জীবগণের জীবকে পৃথিবীর যে স্থান জাতির জীবনে নারীর শুধু সেইটুকু মাত্র স্থান তা নয়। তিনি জনয়িত্রী ও পালয়িত্রী; জনয়িত্রী বলে তাঁকে সুস্থশরীর হওয়া প্রয়োজন, পালয়িত্রী বলে তাঁকে সুশিক্ষিতা হওয়ার দরকার।

শিশু জন্মগ্রহণ করার পরও অনেকদিন ধরে যাঁকে বক্ষরসধারায় শিশুর শরীরকে পুষ্ট করতে হবে তাঁকে যে সুগঠিত দেহ এবং স্বাস্থ্য সম্পদে শ্রীযুক্তা হতেই হবে একথা বলার প্রয়োজন আমাদের দেশে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তেই। সভ্যতার বড়াই করে, এমন করে নারীজাতিকে অবহেলা, করা আর কোনও জাতির মধ্যে বোধ হয়, দেখা যায় না। বার বৎসরের শিশু বলা যায় যাকে সে হ'ল এদেশে যুবতী এবং কুড়ি হতে হতেই সে বুড়ী। পূর্ণাঙ্গী সুগঠনা হবার জন্ম যে সব ব্যায়াম অন্যান্য সভ্যদেশে স্ত্রীলোকেরা করে থাকেন তা আমাদের দেশে করবার চেষ্টা করলেই তো বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা।

স্কুলে Physical Exercise (ব্যায়াম) করাবার কথা উঠলে বাঙ্গালী বাবা মাকে বলতে শুনেছিলাম—"তোরা কি সব দেবী চৌধুরাণী হবি", মাড়বারী ভদ্রলোকদের বলতে শুনেছি ড্রিলের মার্চ্চ করা শেখালে মেয়েরা নাকি আর কখনও সহজ ভাবে পা ফেলতে পারবে না, তাঁদের গতিভঙ্গী আর সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত থাকবে না, হয়ে যাবে গড়ের মাঠের গোরা সৈন্যের মত। গোরা সৈন্যের চলনভঙ্গী আমি কুশ্রী বলছি না বরং তাঁদের একসঙ্গে পা ফেলাটা দেখতে অনেক সময় বেশ সুন্দর লাগে। কিন্তু ড্রিলের সময় বা অন্য সময়ে একজনের পিছনে আর একজন বা দুজন কি চারজন একসঙ্গে তালে তালে পা ফেলে চল্লেই যে রান্না ঘরে যাবার সময় বাজনা না হলে যেতে পারা যাবেনা কিম্বা নিমন্ত্রণ বাড়ীতে Goose stepএর মত করে ভিন্ন যাওয়া যেতে পারে না এরকম কোন সত্য আমার জানা নেই, অভিজ্ঞতাতেও এমন কিছু লাভ করিনি যাতে করে এ কথাটা ঠিক বলে মেনে নিতে পারি। যাঁরা বলেন তাঁদের এ সম্বন্ধে কতটা অভিজ্ঞতা আছে জানি না; কিন্তু তাঁরা বলেন এবং বোধ হয় চিরকালটাই বলবেন।

বাটনা বাটা, জল তোলা, জাঁতা পেষা, চাল ডাল ঝাড়া এসব কাজেই যথেষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন হয়ে থাকে অতএব এসব করেই স্ত্রীজাতি আপনার দেহ পরিপুষ্ট করুন এরকম কথাও অনেকের মুখে শোনা যায়। এসকলে অঙ্গ সঞ্চালন খুবই হয়, এ কথা সত্য কিন্তু সকল অঙ্গই সমান ভাবে সঞ্চালিত সকলগুলিতে হয় না, যে অঙ্গগুলি সঞ্চালিত হল না, বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনও একটা আদৌ সঞ্চালিত হ'ল না এবং অন্যটা অতিরিক্ত সঞ্চালিত হ'ল, এতে করে শরীর সুগঠিত ও শ্রী সম্পন্ন হয়ে ওঠে না। এসব কাজও যদি শরীর বিজ্ঞানের জ্ঞান সাপেক্ষ ও সম্মত হয় তা হলে হয়তো এসব কাজের মধ্যে দিয়েই ব্যায়াম করা হয়ে যায়—অন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না।

ব্যায়াম করতে হয় যেখানে আলো বাতাসের অবাধ গতি আছে। পাড়াগাঁয়ে গৃহকর্ম্ম উন্মুক্ত স্থানে হতে পরে কিন্তু সহরের পাঁচীলঘেরা, স্বল্পদরজা-জানালা বদ্ধ ঘরে আলো বাতাস কই? আর স্যাঁৎ সেঁতে অন্ধকারে দিনের পর দিন একই ভাবে একই ধরণের কাজে ততটা তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া যায় না, যতটা সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবাহের অবারিত সম্ভোগের মধ্যে পাওয়া। এক্ষেত্রে নারীই আগে চোখ

কপালে তুলে, জিভ কেটে আমায় বলবেন "ওমা, ছি, ছিঃ! স্বামীপুত্রের জন্ত রান্নাবাড়ার কাজে তৃপ্ত আর আনন্দ নেই? তাঁদের জন্ত করছি যখন তখন দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ধোঁয়ায় দুই ফুসফুস্ ভরিয়ে, পায়ে হাজা ধরিয়ে কাজ করে সুখ। তাঁদের জন্ত এসব কষ্ট কষ্ট বলেই মনে হয় না।" মনকে তাঁরা শাসনের বাঁধে একরকম করে ফেলেন বটে কিন্তু মন তাঁর শাস্তি দেয়ই দেয়, শরীরটি নানা রোগের আকর ত হয়ই এবং মনের উপর শাসনের চাপে স্নায়বিক নানা রকম রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ব্যায়ামের অভাব আলো বাতাসের অভাব তো আমাদের দেশের নারীদেহকে সুপরিপুষ্ট ও সুন্দর হতে দেয় না, তার উপর অকাল মাতৃত্ব তাকে অকালে বৃদ্ধত্ব এনে দেয়। বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে ও বিরুদ্ধে মাসিক পত্রিকায় নানা প্রকার আলোচনা হয়ে গিয়েছে। সুলেখিকা, সুশিক্ষিতা, শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বাল্য বিবাহ সমর্থন করে অনেক কথাই লিখেছেন, অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু এসকলের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে যা আছে, যাকে তিনি ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন নি সেইটার অভাবই বাল্য বিবাহকে যে বিষময় ফলপ্রসু করে তুলছে আমাদের জাতীয় জীবনের দিক থেকে একথাটা বোধ হয়, তিনি ভেবে দেখেন নি। তিনি বাল্য বিবাহ সমর্থন করেছেন একথা ধরে নিয়ে যে আমাদের দেশের নরনারী উভয়েই সংযমী; বাক্যে, মনে ও দেহে, আহারে বিহারে দৈনন্দিন জীবন যাত্রায়। কিন্তু যেটা তিনি সত্য বলে ধরে নিয়ে, যুক্তি তর্ক মীমাংসার উপরে উঠিয়ে রেখেছেন সেটাই তো সত্য নয় সেখানেই তো আসল গলদ।

তারপর ক্রমাগত বংশ পরম্পরায় মানুষ যদি ১২।১৩ বৎসরের মায়ের সন্তান হয় তবে কয়েক পুরুষ পর জাতি যত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, প্রথম ২ তত হয় না। পুরুষানুক্রমিক ভাবে অল্প বয়সী মায়ের এবং অল্প বয়সী বাবার সন্তান হওয়ার ফলে বাঙ্গালী আজ শারীরিক শক্তিতে হীন, হীনকায়, অস্থিমজ্জা রক্ত ইত্যাদির উপাদানের নিকৃষ্টতায় জাতি হিসাবে নির্জ্জীব। অসংযমের ফলে ২০ বৎসর বয়সী মেয়েটী ৪।৫টী সন্তানের জননী; ২৪।২৫ বৎসরে সে দিদিমা। এবং কাজে কাজেই কথায় বার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে সে বৃদ্ধা।

আগেকার দিনে একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকার দরুণ ১৩।১৪ বৎসরের বালিকা মা-টী সন্তান পালন কুশলা না হলেও তার সন্তানের পালন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে ত্রুটী তত হতে পারত না তার প্রায় ৪০ বৎসর বয়স্কা শাশুড়ী স্থানীয়াদের যত্ন ও কৃপায়। এখন চাকুরীর জন্ত ঘর ছেড়ে আসায় অল্পবয়স্ক দম্পতি অনেক সময় সন্তানকে যথোচিতরূপে পালন করতে পারেন না, ফলে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

আজকাল অনেক যায়গাই দেখা যায় বিয়ের বয়স হয়ে এলে মা'রা মেয়েদের একটু গান বাজনা, দু'চারটা ফ্যান্সি সেলাই, চপ, কাট্‌লেট, সন্দেশ রসগোল্লা তৈরী করা এসব নানারকম বিদ্যা শেখাতে আরম্ভ করেন। এগুলি নাকি জামাইদের মনোরঞ্জন করবার জন্ত এবং মনকে ধরে রাখবার জন্ত কন্তাগণের অবশ্য শিক্ষণীয়। গান বাজনা আনন্দের সাধনার জন্ত, জীবনকে সরস কর্ব্বার জন্ত শেখার দরকার সেলাই এবং রান্না ফ্যান্সি হলেও কাজে লাগাবার সুযোগ অনেক পাওয়া যায়। শুধু জামাইএর মনোরঞ্জনের জন্তই যে এগুলি শেখা অত্যাবশ্যক তা নয়। জামাইএর মনোরঞ্জন করাটা বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু কন্তার মনোরঞ্জন করাও জামাইর পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়। তবে সেজন্ত ছেলেরা যে কিছু শেখেন বা পুত্রবধূর মনোরঞ্জন কি করে করবে ছেলে এই ভেবে যে ছেলের মা অস্থির হয়ে ওঠেন তা দেখা যায় না। তার কারণ মেয়েদের Economic Independence নেই বলেই যে অনেকটা তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু জামাইএর মনোরঞ্জন করাটার উদ্দেশ্য যা এবং জামাইএর ঘর করতে যাবার উদ্দেশ্য যা—কন্তার জামাইএর সন্তানের জননী হওয়া—তার জন্ত কন্যাকে কোন শিক্ষাও দেওয়া হয় না। তাকে সন্তান পালনে সুদক্ষা করবার জন্ত যা' যা' তাকে শেখান দরকার তা করা হয় না। কতকাল ধরে এরকম ধারা চলে আসছে, ফলে উদ্দেশ্যটার কথা লোকে ভুলে গিয়েছে, উপায়টাকেই বড় করে তুলেছে।

নারীকে মনে রাখ্‌তে হবে যে সে ভবিষ্যত জাতির জননী এবং তার দেহ মনকে তারই উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষায়, দীক্ষায়, স্বাস্থ্য ও পূর্ণগঠিত দেহ সৌন্দর্য্যে। দেহ যদি মাতৃত্বলাভের অনুকূল না হয়, দেহে যদি সে সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা না ঘটে, মনকে মাতৃত্বের মহিয়সী সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত কর্‌তে হবে।

এসব থেকে কেউ যেন এরকম ধারা মনে না করে বসেন যে, আমি একথা বলছি যে, আমাদের মেয়েরা ঘর গৃহস্থালীর কাজ বা রান্নাবাড়ার কাজ কর্‌বেন না। তাঁদের যে সে সব কাজ করা বড় দরকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে শুধু নয়, স্নেহশীলতার দিক থেকে শুধু নয়, পরিবারের দিক থেকেও শুধু নয়—তাঁদের নিজেদের দিক থেকেও এসব কাজ তাঁদেরই হাতে থাকাই শ্রেয়। আমাদের দেশের মেয়েদের আমরা বাহিরের জগতের সন্ধান কিছু দিই না নিজের ক্ষুদ্র পরিবারের বাহিরে যেখানে মানুষের Civic life সঙ্ঘবদ্ধ জীবন আরম্ভ হয়েছে, সেখানে তাঁদের কোনই স্থান নেই, এর উপর যদি নিজের সংসারে এই কল্যাণী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতেও তাঁদের বিকশিত হতে না দেওয়া যায় তা হলে তাঁদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হবে। এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল শারীরিক ও মানসিক অবসাদ তাঁদের দেহ ও মনের নানা রোগের সৃষ্টি কর্‌বে।

আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘর গৃহস্থালীর এই সব কাজকেই ব্যায়াম করা হয়ে গেল মনে করে যেন আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে না থাকি; তাঁরা এ সবেতে ব্যস্ত থাকেন বলে, এরই ভিতর মগ্ন থাকেন বলে যেন মনে না করি যে তাঁদের মুক্ত আলো বাতাসের প্রাচুর্য্যের দরকার নাই—তাঁদের সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অঙ্গ সঞ্চালনের দরকার নাই, এই সব কাজের ভিতর দিয়েই জীবনের সকল রস গ্রহণ করা ছাড়া তাঁদের আর কোনও উপায় নাই।

প্রাণের লক্ষণ এক, যে সে বৈচিত্র্য চায় এবং তারই ভিতর থেকে নানা রসের সঞ্চয় করে বিকসিত হয়ে ওঠে। ঘরকন্নার একঘেয়েমীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য আনা যায় না এমন নয়। উদাহরণ স্বরূপ রান্নাবান্নার কথা নিয়েই বলা যাক্, একদিন দু'তরকারি আর একদিন পাঁচ তরকারী রাঁধিলে একটু বৈচিত্র্য আসে সন্দেহ নাই কিন্তু এটুকুতেই মন তৃপ্তির রসে ভরে ওঠে তা নয়। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ানেতেও আনন্দ। তাও আমরা করে থাকি। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ মেয়েদের শুদ্ধ নিয়ে একদিন বনভোজন কর্‌তে গেলাম, মাঠের মধ্যে বা বনের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি, আনন্দ কোলাহলের মধ্যে খুঁজে পেতে কাঠ কুটো কুড়িয়ে, দূর থেকে জল এনে, সবাই মিলে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে রান্না খাওয়ার যে আনন্দ তা কয়জনে সম্ভোগ করি? ফলাহার মাঝে মাঝে চলে, কিন্তু চিড়ে গুড় গামছায় বেঁধে কিছুদূর হেঁটে চলে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কিছু সম্ভোগ করে' যদি আমাদের ফলাহারটা জীবনে একদিন ঘটে তাতে তো ক্ষতির কিছু নেই বরং মনের দিক থেকে অনেকখানি লাভ। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ মেয়েদের জীবনে তা ঘটে কই? তীর্থযাত্রা তাও জীবনের এমন সময় ঘটে যে দূর দূর দেশে যাওয়ার যে আনন্দ, ঐতিহাসিক ও পুণ্যস্থান দেখার যে অপূর্ব্ব পুলক তা পরিপূর্ণভাবে সম্ভোগ করবার মনের অবস্থা থাকে না। জরাজীর্ণা বৃদ্ধা যে যে এখন জীবন থেকে মুক্তি চেয়ে ওপারের দিকে তৃষিত নয়নে চেয়ে আছে, শোকদগ্ধা, সংসার তাপ-বিশুষ্কা নারী যে, যার প্রাণ শুধু শান্তি শান্তি করে কেঁদে মরছে তাদেরই ভাগ্যে শান্তি ও মুক্তি লাভের জন্য এসব যাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে। আমরা তাই ভুলে বসে আছি যে মুক্তিদাতা যিনি, শান্তিদাতা যিনি, তিনি রসস্বরূপ, তিনি আনন্দময় শিব যিনি, তিনি সুন্দর।

গ্রামের মেয়েরা আলোবাতাসের অভাব ততটা বোধ করেন না এবং ভোগ করেন না যতটা সহরের মেয়েরা করেন। গ্রামের মেয়েদের জল আনতে বাসন মাজতে, স্নান ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন কর্‌তে, পুকুরে বা নদীতে যেতে হয়, পথ খানিকটা হেঁটে; উদার আকাশের নীচে, প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলে বসেই তাঁরা এসব সম্পন্ন করেন। সেদিন আমায় একজন বলছিলেন কোনও একটা গ্রামের গল্প কর্‌বার সময়ে "ওখানকার মেয়েদের স্বাস্থ্য তবে বেশ ভাল হবারই কথা; ভোরের পরিষ্কার বাতাস তাঁরা বেশ সম্ভোগ করেন"। আমি কিছুই বলতে পারলাম না। মনে হতে

লাগ্‌ল "হায়রে, এরা যে আমাদের বাংলা দেশের মেয়ে। ভোরের বাতাস যখন নূতন দিনের আগমন সূচনা করে, অশ্বিনী কুমার দুজন যখন উষার সঙ্গে এসে তাঁদের অমৃত ভাণ্ড হাতে নিয়ে বিশ্ব-জগতে অমৃত-ধারা সিঞ্চন করেন তখন কি এরা যায় তা সম্ভোগ কর্‌তে না সেই অমৃত-ধারায় সিক্ত হতে? এদের কি দুদণ্ড পরিপূর্ণ চিত্তে বিশ্ববিধাতার এই অমৃতময় রূপের স্পর্শ নেবার শক্তি আছে বা সময় আছে, এদের মন কি বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে এই সৌন্দর্য্য, এই জীবনের বিকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে ওঠে 'তৎসবিতুর্বরেণ্য'? একি তারা জানে, বোঝে বা উপলব্ধি করে? তারা যায় তখন কোনও রকম তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে ফেল্‌তে। লোকজন উঠ্‌বার আগে কোনও রকমে ঘরের মধ্যে কি করে ফিরে আস্‌বে তাই থাকে তাদের ভাবনা, তার উপর বাংলাদেশে আজ অনেক গ্রামেরই মহিলা কুল নারী-হরণ-কারীদের ভয়ে শঙ্কিত ত্রস্ত চিত্ত তারা কোনও রকমে বাড়ী ফিরে আসতে পারলেই বাঁচে। স্বর্গ বৈদ্যদের সুধার কলস থেকে যে অমৃতরস উপচে পড়ে, সেটা দেহে মনে গ্রহণ করে স্বাস্থ্যশক্তিতে সৌন্দর্য্যময় হয়ে ওঠে তারাই যারা ভক্তি বিস্ময় পরিপূরিত প্রাণে এঁদের দান গ্রহণ করবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকে। দাতার হাত শুধু উন্মুক্ত হলেই কি চলে? গ্রহীতারও যে নেবার শক্তি চাই।" এত কথা কিছুই বল্‌তে পারলাম না বলেই ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলাম "তারা কি তোমাদের মত Morning walk করতে যায় যে স্বাস্থ্য তাদের খুব ভাল হবে।"

স্বাস্থ্যসমিতি বা হিতসাধনী সভা যখন গ্রামে ২ ম্যাজিক ল্যান্‌ট্রান, নিয়ে বক্তৃতা দিতে যান তখন গ্রামের কত মেয়ে যে ঘরের মধ্যে বসে নারীজন্ম হয়েছে বলে দুঃখ করতে থাকেন তার কি খোঁজ কেউ জানেন? আমায় একবার কয়েকটি মেয়ে বলেছিলেন, "এই যে আজ বায়স্কোপ হবে না কি হবে তা কি আমাদের যেতে দেবে? বাড়ীর সদরের দিকে ঐ দুয়োরটার কাছ পর্য্যন্ত পা বাড়াইতো দেখো কেমন কুরুক্ষেত্তর বেঁধে যাবে। তা ভাই, মেয়ে-মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে কি আমাদের প্রাণে সাধ আহ্লাদ বলে কিছু নেই? বেশ ভাই, আছ তোমরা, বেশ।" একটি গ্রামেই যে এরকম কথা শুনেছি, তা নয়, অনেক গ্রামেই নারীদেরকে নারী হওয়াটা একটা অভিশাপ বলেই মনে করতে শুনেছি। আমাদের দেশের শাস্ত্র বলে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূবানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তিঃ। যে জীবন আনন্দ থেকেই সম্ভূত হয়েছে, যে জীবন আনন্দ দ্বারা বিধৃত হয়ে আছে, যা আনন্দের মধ্যেই বিলীন হবে তাকে অভিশাপ বলে মনে করা একি জাতির পক্ষে কম দুর্ভাগ্য, কম দুর্দ্দিনের পরিচায়ক?

এমনও হয়েছে যে গ্রামবাসিনী, অপরিচিতারা আমাদের মত মেয়েদের স্বামী মহাশয়দের হৃদয়ের উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমায় তখন বল্‌তে হয়েছে যে এই হৃদয়ের উদারতা তাঁদের স্বামী মহাশয়দের বা অভিভাবকদের অনেককেই প্রশংসা কর্‌তে দেখা যেতো যদি তাঁরা ও নিজেরা সমবেত হয়ে এই উদারতা লাভের চেষ্টা করতেন। আমার প্রাপ্য যা' তা যদি আমি কড়ায় গণ্ডায় আদায় না করে নিতে চেষ্টা করি তা হলে আমাকে অনেক সময় ঠক্‌তেই হবে—যার কাছ থেকে পাবার সে ইচ্ছা না করেও, না জেনেও সময় সময় ঠকিয়ে ফেল্‌তে পারে। নিতে না জান্‌লে হাতে যে জিনিষটা তুলে দেওয়া হ'ল সেটাকে সহজেই হারিয়ে ফেলা যেতে পারে। নারীকেই তাঁর অধিকার বুঝে আদায় করে নিতে হবে।

আগেই বলেছি প্রত্যেক নারীকেই তিনি দেহে মা হউন আর নাই হউন মনে মা হতে হবে. তাঁদেরকে পেতে হবে ও শিক্ষা দ্বারা মার্জ্জিত করে নিতে হবে মায়ের মন—যার দৃষ্টি দূর প্রসারিত, যে মন কল্যকার সংস্থান করে রাখে, যে মন ভবিষ্যতের কথা ভাবে।

এই শিক্ষা বোধোদয় পড়তে পার্‌লে, স্বামীকে চিঠি লিখতে পারলে কিম্বা ইংরাজী বা ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে পারলেই সম্পূর্ণ হয় না। এই শিক্ষা শুধু লিখতে পড়তে জানে কিনা, গাইতে বাজাতে জানে কিনা, ঘর কন্নার কাজ করতে পারে কিনা তাই শুধু দেখে না এবং সেইটুকু জানলেই পূর্ণ-শিক্ষা হয়ে গেছে বলে মনে করে না। এই শিক্ষা দেখে যে নারী ও তাঁর মনুষ্যত্বের যা' শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার শক্তি তাকে

লাভ করেছেন কিনা, তাঁর বিচার বিবেচনা করবার যা ঈশ্বরদত্ত দান তাকে সুপরিচালিত করবার ক্ষমতা লাভ করেছেন কিনা। লিখতে পড়তে ও অঙ্ক কষ্‌তে তো সেই জার্ম্মাণীর ঘোড়া আর নেদারল্যাণ্ডের কুকুরও শিখেছিল, যন্ত্রেও তো গান বাজনা চালাতে পারে, ঘরকন্নার কাজও তো যন্ত্র সাহায্যে সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু মানুষে যখন এসব করে তখন তো তার সকল কাজের আড়ালে জেগে থাকে তার সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা, তার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি, তার দেবত্বের প্রমাণ স্বরূপ তার বুদ্ধি যা এইরূপ রসগন্ধময়ী ধরণীকে আয়ত্ত ক'রে—তার থেকে নিজের আনন্দ ও সুখ লাভের জন্য যা কিছু সম্ভব তা গ্রহণ করে।

অনাগত শিশুটির জন্য মায়ের দেহ যেমন আপন রক্ত অমৃতময়ী দুগ্ধ ধারায় পরিণত হবার জন্য আপনা থেকেই প্রস্তুত হয় তাঁর মনকেও তেমনি প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে এই শিশু জন্মাবার আগে এবং পরে তার দেহের ও মনের সকল রকম কল্যাণ সাধন করবার প্রণালী গুলি আয়ত্ত করে। কল্যাণকে সাধন করবার জন্য শিক্ষা চাই সংযম চাই; নিয়ম মেনে চলা চাই। শুধু গতানুগতিকের অনুসরণ করে চল্লে হবে না - সকল কাজের, সকল কিছুর "কেন"র অনুসন্ধান করা চাই এবং সেই "কেন"টা তাঁর শিশু যে আসবে বা এসেছে, তাঁর জাতির ভবিষ্যৎ যা তাঁর হাতে গড়ে উঠ্‌বে ও উঠবার অপেক্ষায় আছে তার পক্ষে কতখানি কল্যাণ নিয়ে আসবে তাও তাঁকে বিচার করে দেখ্‌তে হবে। তাঁরই সেই কাজ।

জাতির জননী হিসাবে তাঁর পুরুষের কাছ থেকে দাবী করবার আছে অনেক কিছু। সমাজ আচারের দোহাই দিয়ে, শুচিতা সংযমের দাবী করে তাঁকে যে পুরুষ বদ্ধ দুয়ার-জানালা, আলো বাতাসহীন অন্তঃপুরে ঠেলে রেখে দেবে, নোংরা অপরিষ্কার ঘরে, অশিক্ষিত দাইএর হাতে তাঁর ও তাঁর প্রাণের ধনের জীবনকে বিপন্ন করতে দেবে তার বিরুদ্ধে তাঁকেই তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে; তাঁকে বল্‌তে হবে "তোমার সন্তানের জননী আমি তবেই হব যদি আমার দেহ সুস্থ রাখ্‌বার, আমার শিশুকে নিরাময় রাখবার সকল প্রকার উপায় তুমি আমায় অবলম্বন করতে দাও। মুক্ত বাতাস, রবির কিরণ এই দুই যদি আমরা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে পারি।' তাঁকেই এখন বল্‌তে হবে 'আমার সন্তানের জনক যদি হতে চাও তো তুমি হও সুস্থদেহ, সবল শরীর; তুমি হও সংযত-চরিত্র, শুচি-সুন্দর। তুমি হও শ্রম সহিষ্ণু ও স্নেহ-শীল। আর আমরা উভয়েই হই পূর্ণ-পুষ্ট দেহ, স্বদেশ প্রেমিক, কর্ত্তব্য পালনে তৎপর ও পরস্পরের শুভানুধ্যায়ী। শক্তি আমাদের সংহত হউক, ভাব আমাদের সংযত হউক, দেহ ও মন উদার পবিত্র হউক। আমরা বংশ ও জাতির জন্ম দেবার ও কল্যাণ সাধন করবার উপযুক্ত হই।

(স্বাস্থ্য ও শক্তি)

নাট্যকার

[৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত]

সমস্ত জগৎ রঙ্গালয় ও জগতের লোক তাহার অভিনেতা, এ কথাটী পুরাতন। কিন্তু বালকের মুখে একটী নূতন প্রশ্ন ষ্টেটস্‌ম্যানের বিবিধ স্তম্ভে প্রকাশ হইয়াছিল যে, যদি সকলেই অভিনেতা, তবে দর্শক কে? কথাটী হাসির কথা বলিয়াই প্রকাশিত হয়; কিন্তু ভাবুক-হৃদয়ে হাস্যরস-উদ্দীপক কথা নহে। প্রত্যেক অভিনেতার সঙ্গে এক একজন দর্শক আছে ও সেই দর্শক নাট্যরঙ্গ দিন দিন দেখে। পণ্ডিতেরা বলেন, বাহ্য-জগত মনোজগতের প্রতিরূপ মাত্র। মনোজগতে সাধু আছে, বিষয়ী আছে, জোচ্চোর আছে, লম্পট আছে, মনোজগতে যাহা নাই, বাহ্য জগতেও তাহা নাই। এই মনোজগতে রঙ্গালয়ের অভিনয় একজন দর্শক মনোজগতে বসিয়া নিত্য দেখেন, কিন্তু অভিনেতা আপনার অভিনয়েই বিভোর, দর্শকের প্রতি প্রায়ই তাঁহার দৃষ্টি পড়ে না। এই বাহ্য জগত রঙ্গালয়ে মনোনাট্যক্ষেত্রের ছায়া মাত্র পড়ে এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে অভিনেতারা অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এ নাট্যালয়ে নিজ নিজ অংশ ভুলিবার কোনও সম্ভব নাই। ধন-লিপ্সা, মান লিপ্সা, ইন্দ্রিয়-সুখ-লিপ্সা, অভ্রান্ত ভাষায় তাহার অংশ তাঁহাকে উপস্থিত মতে শিখাইয়া দেয়। পরে জীবন নাটকের ফলাফল আপনি ফলিয়া যায়। কথায় বলে, "চোর নিযুক্ত করিয়া চোর ধর।" বাহ্যজগতে চোর ধরিতে গেলে অন্তর্জগতে যে চোর আছে, তাহাকে নিযুক্ত করিতে হয়। অন্তর্জগতের সাধু বাহ্য জগতের সাধুকে চেনেন। অতএব বাহ্য জগতের সমস্ত অভিনয় দর্শন করিতে হইলে মনোজগতের যে বৃত্তি, যে অভিনয় দর্শনে সক্ষম, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া দেখিতে হয়। সচরাচর যে সমস্ত অভিনয় চলিতেছে, তাহার দর্শনোপযোগী বৃত্তি খুঁজিয়া পাইবার প্রয়োজন হয় না। স্বার্থ ঘন্টায় ঘা পড়িলেই যে বৃত্তির সাহায্য প্রয়োজন—সজ্জিত হইয়া মন রঙ্গালয়ে অধিষ্ঠিত হ'ন এবং তাহার অভিনয়ের প্রতিরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়েরা বাহ্যজগতে প্রকাশ করিতে থাকে। পাঠক, দেখুন বাহ্য জগতে একজন অভিনেতা অপর অভিনেতার ধনাপহরণ মানসে আসিয়া প্রলোভন বাক্য রচনা করিতেছে। প্রলোভন বাক্য, লোভের শ্রুতিমধুর হইল, লোভ চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরামর্শ করিতে লাগিল,—কি করি। লোভের সঙ্গে সতর্কতা ছিল,—সে মহা কৌশলী; শুধু যে আপনি সতর্ক, তাহা নয়,—পরকে ভুলাইয়া যে ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, সে বৃত্তি এই সতর্কতার পরম বন্ধু। হীরা, হীরা কাটিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্বার্থ, কি কথার কি উত্তর দিতে হয়, উত্তমরূপ শিখাইতেছে দিব্য নাটক চলিতে লাগিল। আবার সে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। অন্য অঙ্কে আবার ঐ সকল নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের অভিনয় হইবে। কিন্তু আপাততঃ দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইয়া মধুপানে উন্মত্ত, সজ্জিত কাম নারীরত্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। কাম বেশ প্রেমের ভাণ জানে, স্বার্থ তাহাকে শিখাইয়াছে।—এদিকে রতিও বিস্তর অর্থ-লোলুপা; রতিও সুসজ্জিতা—স্বার্থর দ্বারা প্রেমের কথায় বেশ শিক্ষিতা। এ দৃশ্যে ফাঁকা একটী প্রেম বাক্যের খানিক অভিনয় হইল। দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনে যশোলিপ্সা ক'রিতে যে না জানে, মূর্খতা ঢাকিয়া বিদ্যার বুকনি ঝাড়িতেও শিখিয়াছে, সদ্‌গুণের পরিচ্ছদ চুরি করিয়া ভূষিত রঙ্গালয়ে খানিক বেশ রঙ্গ করিতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বী যশোলিপ্সার সহিত বেশ খানিক সংঘর্ষ হইল। পরে ঘৃণা আসিয়া দুই নেতাকে রঙ্গালয়ের দুই ধারে লইয়া গেল। এইরূপ অহর্নিশি অভিনয় হইতেছে। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন-সহযোগে সে অভিনয় চলিতেছে। অবিরাম স্রোতে রসের অবতারণা হইতেছে। নিরপেক্ষ দর্শক সকলই দেখিতেছে। কিন্তু সে দর্শকের প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই অভিনয় ফুরায়। মনকে মনোজগতে

নিবিষ্ট করিতে পারিলে, বাহ্য-জগতের সমস্ত অভিনেতাকেই দেখা যায়। কিন্তু দর্শককে খুঁজিয়া পাওয়া বড় কঠিন। লক্ষের ভিতর দুই একজন, সেই দর্শকের অনুসন্ধান করে এবং এইরূপ লক্ষ "দুই একজনের" ভিতর দুই একজন সেই দর্শকের দর্শন পায়। কেহ বা দর্শন পাইয়া আর খেলিতে চাহে না, তাহার আর খেলার প্রয়োজন। কিন্তু কেহ বা আর পাঁচ জনকে সেই দর্শককে চিনাইবার নিমিত্ত রঙ্গালয়ে পুনঃ প্রবেশ করে। নাটকের অভিনেতা, নাটকের ভাষাই বুঝে। নাটকের ভাষায় এই অভিনেতা অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করে। এই বুঝাইবার চেষ্টাতে এই বৃহৎ রঙ্গালয়ের উপর ক্ষুদ্র একটী রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। এই বুঝাইবার চেষ্টায় নাটক সৃষ্টি হয়। বৃহৎ রঙ্গালয়ের অভিনেতাবর্গ দুই ভাগ হইয়া যান। কতকগুলি অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন, আর অধিকাংশই দর্শক। আর জীবন-নাট্যের দর্শককে যিনি দর্শন করিয়াছেন—তিনি নাটককার। নাটককার সেক্সপীয়র এই শ্রেণীর লোক,—মলেয়ার এই শ্রেণীর লোক ;—কিন্তু ইঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মনোক্ষেত্রে অভিনয় চলিতেছে, — মনোক্ষেত্রের অভিনয়ে স্তরে স্তরে দৃশ্যপট আছে,—রসের ঐক্যতান বাদন শব্দ না পাইলে এ দৃশ্য লক্ষিত হয় না, যবনিকা উঠে না। তাঁহারা রসের ঐক্যতান বাদন বাজাইয়া মনোরঙ্গালয়ের যবনিকা উত্তোলন করেন এবং বাহ্য জগতে যে সকল অভিনয় হইতেছে, মনোজগতের অভিনয়ের সহিত মিলাইবার চেষ্টা পান। মনোজগতে যাহা নাই,—তাহা বাহ্য জগতে দেখাইলে কেহই চিনিতে পারে না। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জগতে মনোজগতের ছায়া অভিনয় হইতেছে। মনোজগতে দ্রষ্টার সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নাটক লিখিয়াছেন। সেই দ্রষ্টারই পরামর্শ লইয়া ক্ষুদ্র রঙ্গালয়ে কিরূপ অভিনয় হয়। কোন মনোবৃত্তি সুসজ্জিত হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা মনের ছায়া অভিনয় প্রকাশ করিতেছে। সেই ছায়া অভিনয়ে কিরূপ স্বার্থ সংঘর্ষ হইতেছে, তিনি দর্শককে মনোদৃষ্টি প্রদান করিয়া বাহ্যিক ছায়া অভিনয় দেখিতে বলেন। তাহাদের নাটকের অভিনয় দেখিতে হইলে মনঃসংযোগ প্রয়োজন। মনঃসংযোগ করিতে গেলে, মনকে কতকটা বাঁধিতে হয়। সে বন্ধনে মনের কষ্ট আছে। কিন্তু সে কষ্ট-স্বীকারে, কষ্টের সহস্র গুণ আনন্দ উৎপাদন করে। সংযোগী দ্রষ্টা দেখিতে পায় যে, রিপুর তাড়নায় মানব মরিচীকায় বারি পান করিতে ছুটিতেছে। ছুটিয়া তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়িতেছে,—অবশেষে সেই পিপাসা প্রাণ বিনাশক হইয়া উঠে। আবার দেখিতে পায়, উচ্চবৃত্তি চালিত হইয়া দয়া, দাক্ষিণ্যতা প্রভৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক কষ্টের জীবন পথে শান্তিলাভ করিয়া মানব চলিতেছে। যাদু নির্ম্মিত রঙ্গভূমিতে কষ্টের হাত এড়াইবার উপায় নাই। কিন্তু বারি অন্বেষণে মরিচীকাবৎ ধাবিত না হইয়া বুদ্ধি প্রদর্শিত পথে চলিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

এই সকল নাটককার কেহ হাসিয়া, কেহ কাঁদিয়া অভিনয় দেখাইতেছেন। কিন্তু হাসুন বা কাঁদুন, বৃহৎ রঙ্গালয়ের একই পরিণাম, বিয়োগান্ত নাটক ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে সকল দর্শক বিয়োগান্ত নামে কম্পিত হইয়া, অভিনয় দর্শনে পরাঙ্মুখ হ'ন, তাঁহাদিগকে নাটককার হাসিয়া হাসিয়া, মনোভিনয় ও তাহার প্রতিরূপ বাহ্য অভিনয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু ইহাতেও সেই স্বার্থ সংঘর্ষণ,—ইহাতেও সেই আত্মপ্রসাদ লাভ, ও বারি উদ্দেশ্যে মরিচীকার অনুসরণে নিদারুণ তৃষ্ণা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উচ্চ ও নীচবৃত্তির স্বরূপ ছবি, উভয় নাটকেই প্রকাশিত হয়। মনঃসংযোগী দর্শক সেই সকল ছবি দেখিয়া মনোদৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত করেন, মন রঙ্গালয়ের অভিনয় দর্শনে সক্ষম হ'ন এবং সেই অভিনয়ে নিরপেক্ষ দ্রষ্টার উপর কাহারও কাহারও লক্ষ্য পড়ে এবং সেই নিরপেক্ষ দ্রষ্টার দৃষ্টান্তে নিরপেক্ষ হইয়া সংসার অভিনয় দর্শন করিতে পারেন। যে সকল মহাত্মা মনোদৃষ্টি প্রদর্শনে এরূপ সমর্থ,—তাঁহারা মানব-পূজ্য। তাঁহাদের দ্বারা মিলনান্ত (Comedy) নাটক প্রকাশ পায়।

যাঁহার নিজের মনোক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, তিনিও বুঝিতে পারেন যে মন কত রকমে সং সাজে। কেবল পরের নিকটে হাস্যাস্পদ হইবার ভয়-রূপ একটী আবরণ ঢাকা আছে, এক শ্রেণীর নাটককার আবরণ খানি তুলিয়ে দেখান যে, মন কিরূপ সং সাজিয়া থাকে—সং দেখিয়া আসি। কিন্তু

যিনি বুঝিতে পারেন যে, তাহারও মন সং সাজিয়া নাচিতেছে এ অভিনয় দেখা তাঁহার সার্থক। এই অভিনয় যিনি চিত্র করেন; তাঁহাদিগের নাটক লেখাও সার্থক। আমরা যাহাকে নক্‌সা (Burlesque) বলি, ইনি সেই নক্‌সা অঙ্কিত করেন।

আর এক জাতিয় নাটককার, মানসিক অভিনয়ের আর এক দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করেন। এ স্থলে মন সং সাজিয়াও সং সাজিয়াছে বুঝিতে পারে না। ক্রোধকে ন্যায় বলিয়া আদর করে, কামকে প্রেম জানে, লোভকে দশকর্ম্মান্বিত বিবেচনা করে, মোহকে দয়া বলিয়া আদর করে। মদের নাম আত্ম-সম্মান, ও মাৎসর্য্যের নাম কুকার্য্যদ্বেষী জ্ঞান করিয়া সম্মানের সহিত স্থান দেন, এই শ্রেণীর নাটককার মানবপ্রতারিত বুদ্ধির দণ্ডকর্ত্তা। ব্যঙ্গচ্ছলে ঐ প্রতারিত বুদ্ধির প্রতি তীব্র তীর আঘাত করে। তাহাদের ব্যঙ্গ-রচনায় দর্শক কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির কতক পরিমাণে স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন পায় এবং হাসিতে হাসিতে বুঝিতে পারে তাহারাও কিরূপ প্রতারিত হইতেছে। এরূপ দর্শকের দর্শন সার্থক ও নাটককারের কল্পনাও সার্থক। এই নাটক-কারের নাম প্রহসন (Farce) রচয়িতা।

অপর জাতীয় নাটককার আর একটী হৃদয়-পট উত্তোলন করে। সর্পের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া খেলায়। বাহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন নিমিত্ত মনোক্ষেত্রের দাবানলের আলোকে, যে স্বার্থসংঘর্ষণ জনিত অভিনয় হইতেছে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর বস্তু অনুসন্ধানে যে ঘোরতর মনোদ্বন্দ্ব চলিতেছে, সেই স্তরে বাহেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর অথচ নির্দ্দোষ কতকগুলি সুন্দর ছবি প্রদর্শন করে। মনোরাজ্যের নন্দন কাননে কতকগুলি অপ্সরী নৃত্য করিতেছে, ইন্দ্রিয় তাড়নায় সেই নন্দন কাননের অভিনয় প্রায়ই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই শ্রেণীর নাটককার সেই অপূর্ব্ব কাননের ছায়া অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সুন্দর কাননের প্রতি মনোদৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং রসময়ী সুন্দরী লহরীতে ভাসাইয়া পরম সুন্দরের রূপের ছটায় দূর আভা সম্মুখে আনিয়া ধরে। যে দর্শক পরম সুন্দর ছটার দূর আভাষ পান, তাঁর সেই অভিনয় দেখা সার্থক এবং যিনি দেখাইতে পারেন—তাঁহারও কল্পনা সার্থক। এই শ্রেণীর নাটককার ক্ষণকাল অভিনয় ছাড়াইয়া যথায় সঙ্গীত-স্রোত ও কবিতা স্রোত মিলিত হইয়া মহা সৌন্দর্য্য-স্রোতে ধাবমান, সেই সৌন্দর্য্যে প্রতিফলিত ছবি আনিবার চেষ্টা পান। ইহার চরম অভিনয় কেহ কখনও দেখেন নাই। বোধ হয় এই অভিনয় বলে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা হইয়াছিলেন।

কিন্তু উৎকৃষ্ট বস্তু মন্দ হইলে যতদূর মন্দ হয়, সাধারণ বস্তু সেরূপ হয় না। সেই নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট দৃশ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া অনেকেই খ্যামটা নাচ ও তাড়িখানা আনিয়া সম্মুখে ধরেন এবং তাহাদের কল্পনা যে অতি হেয়, তাহা বলা বাহুল্য।

এইরূপ হীন কল্পনা-প্রসূত বিয়োগান্ত নাটকে কতকগুলি অস্বাভাবিক পাপের ছবি প্রদর্শিত হয়, শেষে কতকগুলি খুনাখুনি—সেই নিমিত্তই তাহার বিয়োগান্ত নাম। হীন কল্পনা-প্রসূত মিলনান্ত নাটক তাহা অপেক্ষাও ঘৃণিত হইয়া উঠে। পাপের ছবি তাহাতে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হয়। পাপের প্রতি ঘৃণা না হইয়া পাপ আরও আদরের হইয়া উঠে। হীন কল্পনা-প্রসূত Burlesque ও farce ব্যক্তি বিশেষের কুৎসা মাত্র ও কুৎসিত প্রসঙ্গ, কুৎসিত কথা, রসিকতা নামে সাধারণকে উপহার দেওয়া হয়। উন্নতরুচি রঙ্গালয়ে এ সকল নাটককারের স্থান নাই। রঙ্গালয় গুণীর গুণ প্রকাশের স্থান, —রঙ্গালয় হীন অনুকারী কুরুচি সম্পন্ন নির্গুণের স্থান নয়। রসিকবৃন্দের আদরের স্থান রঙ্গালয়।

"নাট্যমন্দির"

বংশ রক্ষা

[শ্রীপ্রভাংশুকুমার গুপ্ত]

—এক—

সকলে তাকে বল্‌তো সাইলক্‌।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন জমিদারের ম্যানেজার-পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, উপ্‌রির কল্যাণে শীতল মল্লিক সঞ্চয় করেছিলেন অগাধ ধন-সম্পত্তি, আর স্ফীত নিটোল ভুঁড়ি।

আজীবন গরীবদের রক্ত শোষণ করে, সহায়হীনা বিধবাদের সম্পত্তি আইনের প্যাঁচে বেমালুম হজম করে, মল্লিকের মনটাও পাষাণের চেয়ে কঠিন হয়েছিল; তাতে মানুষের সুকুমার বৃত্তি, অর্থাৎ দয়া দাক্ষিণ্যের লেশমাত্রও ছিল না। সৎ ও অসৎ এ দুটো বস্তু একেবারে বিভিন্ন, কিন্তু মল্লিকের নিকট এ দুটোর বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না,—নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি বোধ করি মানুষ বধ করতেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। বয়স ষাট উত্তীর্ণ হলেও তিনি পরকালের কথা কখনও চিন্তা কর্‌তে চেষ্টা করতেন না, সাম্‌নে যে অতলস্পর্শী বিপদসঙ্কুল পথ চলে গিয়েছে, যার ওপর দিয়ে তাঁকে এক অজানা দিনে মহাযাত্রা করতে হবে, তা' তিনি চোখ খুলে একবারও দেখতেন না। মল্লিক মহাশয় ভেবেছিলেন এ জগতের আসন থেকে তিনি কোনও দিন স্থানচ্যুত হবেন না, চিরজীবন এইস্থানে বিরাজ করবেন, বোধ হয় সে-কারণে অর্থোপার্জ্জনের যে কোনও ঘৃণিত পথ অবলম্বন করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি।

পঞ্চাশের কোঠায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, এই উপরির সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগে মল্লিক মশায়কে বাধ্য হয়ে চাক্‌রীতে ইস্তফা দিয়ে, কলকাতায় তাঁর নব নির্ম্মিত বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল; তারপর এই দশ বছর একটানা সুদের পর সুদে তাঁর টাকাগুলোর পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়ে চলেছিল। তিন কুলে কেউ না থাকলেও মল্লিক টাকার নেশায় এমন মেতে উঠেছিলেন, যে তিনি জাগরণে চিন্তা করতেন টাকার, নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন টাকার ..

মল্লিক মশায়ের কাছে যদি কোন দুঃস্থ প্রপীড়িত ব্যক্তি কোনদিন কিছু সাহায্য প্রার্থনা করতো, তা'হলে তিনি গ্রামোফোনের মত সকলকেই এক উত্তর প্রদান করতেন—তোদের ভগবান মেরেছেন, আমি সামান্য মানুষ তোদের কি সাহায্য করবো? তাঁকে ডাক্‌, তিনিই তোদের দুঃখ দূর করবেন।

ইংরাজী চিঠিপত্র লেখা, অসুখের সময় ডাক্তার ও ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করা, প্রভৃতি দুই একটি অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য বাধ্য হয়ে, তিনি বীরেন্দ্র ঘোষ নামে একটি যুবককে নিযুক্ত করেছিলেন,—বীরেন্দ্রের মাসিক মাহিনার কোন বন্দোবস্ত ছিল না, দু'বেলা আহার্য্য পেত ও বাটীতে বাস করতে পেত।

পত্নী বিয়োগের পর ছ'মাস রীতিমত শোক প্রকাশ করবার পর, হঠাৎ মল্লিক মশায় বংশ রক্ষা করবার অজুহাতে ষাট বছর বয়সে পুনরায় টোপর মাথায় দিতে মনস্থ করলেন। 'শুভস্য শীঘ্রম্‌' এই মহা বাক্যের অনুসরণ করে, দ্বিতীয় বিবাহ পর্ব্বটা অনতিবিলম্বে সমাধা করবার জন্য, তিনি বেশ উঠে পড়ে লেগে গেলেন ও সেজন্যে বুড়ো ঘটক মিলন ভট্‌চাযকে গোপনে সুন্দরী এবং বয়স্থা মেয়ের সন্ধান নিতে বল্লেন। আজকালকার আবহাওয়ায় তাঁর বিয়ের কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে, তাঁকে যে এহেন শুভকার্য্য শেষ করতে বেশ কিঞ্চিৎ বেগ পেতে হবে, তা' তিনি ভাল করেই জানতেন; কথাটা রাষ্ট্র যাতে না হয়ে পড়ে, সেজন্য তিনি বিশেষ লক্ষ্য করে কাজ করতে লাগলেন।

তখনও সহরে তেমন শীতের আমেজ পড়ে নি, তথাচ মল্লিক মশায় একখানি জীর্ণ তক্তপোষে, ঠিক সেই প্রকারই একখানি শতচ্ছিন্ন লেপে, আপাদমস্তক আবৃত করে সুগভীর নিদ্রা যাচ্ছিলেন; উষার প্রচুর তরুণ কিরণে শয়ন কক্ষখানি আলোকিত হয়ে উঠেছিল। সহসা সদর দরজায়

প্রবল কড়া নাড়ার শব্দে, তাঁর নিদ্রা আচম্‌কা টুটে গেল ; শীতকালে, বিশেষতঃ শীতের সকাল বেলায় লেপের মায়া কাটিয়ে কার শয্যা ত্যাগ করতে ইচ্ছা হয় ? মল্লিক নিছক্ বিরক্তিভরে নীচে নেমে এসে সদরের অর্গল খুলে দিয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি জড়ো করে বল্লেন—কে হে ?

দরজা খুলে যাবার পর নতুন আগন্তুকের কেশশূন্য মসৃণ মস্তক দেখতে পেয়ে, মল্লিকের বিরক্তি-ব্যঞ্জক কুঞ্চিত মুখ নিমেষের ভিতর পরিবর্ত্তন হয়ে গেল ; তাঁর স্বভাব কুৎসিত মুখখানা কুঞ্চিত হওয়াতে ভয়ানক বিশ্রী হয়েছিল, কিন্তু এক লহমার ভিতর যেন কোন্ যাদুকরের মায়া মন্ত্রের প্রভাবে, সেই কুৎসিত কদাকার মুখে হাসি ফুটে বেরুলো।

শুভ্র কৃত্রিম দন্তগুলো বের করে, মল্লিক বল্লেন—তুমি ! এসো, এসো , ভেতরে এসো।

তোমরা কিন্তু অবগত হও, মল্লিক কোনওকালে নিজ বাটীতে লোককে অভ্যর্থনা করে বসান নি, আদর আপ্যায়িত করে কাউকে সাদরে আহ্বান করেন নি, কাউকে মুখের দুটো মিষ্টি কথা বলেন নি ; কিন্তু আজ তিনি মিষ্ট সম্ভাষণ করলেন—আজ ডেকে তিনি আদর অভ্যর্থনা করলেন।

যে ব্যক্তি আলোয়ান গাত্রে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করলে,— সে মিলন ভট্‌চায।

ভট্‌চাযকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে, মল্লিক ভেতর থেকে অর্গল বন্ধ করতে করতে বল্লেন—তারপর কি খবর ?

মিলন ঘটক মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত আঁধার করে, নির্ব্বাক হয়ে বসে রইলো ; মল্লিক ঘরের কোন্ থেকে হুঁকোটা নিয়ে এল, তারপর একছিলিম তামাক সেজে দিয়ে ভীতভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে—তারপর কতদূর কি করলে ?

তথাপি তাকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখে মল্লিক বল্লেন—আমি তো একেবারে অপ্সরা বলি-নি, মুখখানি নেহাৎ একেবারে শ্রীহীন না হয়, আর কাটখোট্টা না হয়ে মেয়েটি কিঞ্চিৎ লাবণ্যময়ী হয় ; আর কি বলে রংটা দুধে আলতা না হউক চলনসই ফরসা হওয়া চাই, এ আর আমি বেশী কি বলেছি ?

ইতিমধ্যে বীরেন্দ্র ঘরে একজন অপরিচিত লোককে দেখে ও দু'জনের কথা বলবার ভঙ্গী দেখে, বাইরে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলো ; তারপর তাদের আলোচনার বিষয় শুনে, সে দাঁড়িয়ে তাদের অলক্ষ্যে কথাবার্ত্তা শুনতে লাগলো !...

মিলন ঘটক মুখের ভেতর থেকে একরাশ ধোঁয়া উদ্গীরণ করে, সহাস্যমুখে বল্লে—তা'হলে অপ্সরা বা ডানাকাটা হতে বাকি রইলো কি ? আজকাল বাপ মায়ের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় না হ'লে ষাট বছরের বুড়োকে কেউ মেয়ে দিতে চায় না, সে দুধে-আলতাই বলুন, আর কয়লার-খনিই বলুন।

মল্লিকের মুখখানা মিলন ভটচায্যের কথা শুনে বিশুষ্ক হয়ে গেল, মল্লিক হেসে বল্লেন—দেখ ভট্‌চায ! যদি আমার কথামত ঐরকম মেয়ে জোটাতে পার, তাহ'লে দক্ষিণাটা বেশ কিঞ্চিৎ দেওয়া যাবে,—চেষ্টা কর, চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই।

বলা বাহুল্য মিলন ঘটক মেয়ের,—বেশ ভাল মেয়েরই সন্ধান পেয়েছিল ; দক্ষিণাটার পরিমাণ বর্দ্ধিত করবার জন্য, সে ঐ প্রকার টোপ্ ফেলেছিল, এখন মল্লিককে টোপ্ গলাধঃকরণ করতে দেখে, সে ধীরে ধীরে বল্লে—মেয়ের জোগাড় তো করেছি, কিন্তু অতি কষ্টে—

মল্লিক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে আবেগে বলে উঠলেন— সত্যি ! সত্যি !

ভট্‌চায হুঁকোটা ঘরের কোণে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্লেন— তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে।

মল্লিকের ক্ষণিক হাসি ঠোঁটের নীচেই মিলিয়ে গেল !...

ভট্‌চায বলে যেতে লাগলো—মেয়ের বাপ মেয়ে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন এক সর্ত্তে,—মেয়ের পরিবর্ত্তে নগদ সাত হাজার রৌপ্যমুদ্রা দিতে হবে, আর বিবাহের খরচপত্রের জন্যে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রা, মোট আট হাজার তাঁকে দিতে হবে ; কারণ আর চারটী মেয়েকে পার করতে গিয়ে, দেনার দায়ে তাঁকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েছে। এই টাকাটা দিলে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করতে দেরী হবে না।

বীরেন্দ্র বাইরে দণ্ডায়মান থেকে তাদের কথাবার্ত্তা

যতই শুনছিল, ততই বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছিল, আর মনে মনে ভাবছিল বুড়ো তা'হ'লে ডুবে ডুবে জল খায়! ..

'নগদ আটহাজার' শুনে, মল্লিকের ভেতরটায় কে যেন হাতুড়ির ঘা দিতে লাগ্‌লো; হার্টের কাজ দ্রুত হতে লাগ্‌লো।

মল্লিক মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, সবই সুখবর,—কেবল ঐ একটা ফ্যাসাদ্ ...

মল্লিককে বাক্যহীন অবস্থায় নিশ্চল হয়ে বসে থাক্‌তে দেখে, মিলন ঘটক বল্লে—মল্লিক মহাশয়! এ স্বর্ণ সুযোগ হাতের কাছে পেয়ে ঠেলে দিলে, বিবাহের দ্বিতীয় বার আর সানাই বাজ্‌বে না।

মল্লিক তখনও ভাবছিলেন সবই সুসংবাদ, কেবল ঐ আটহাজার—

মিলন ভট্‌চায বলে উঠলো—আর আপনি যেমনটি চাইছেন, ঠিক তেম্নি,—অপ্সরা না হউক, সুন্দরী ও বয়স্থা, আর মেয়েটির শরীরে এম্‌নি একটা লাবণ্য, একটা সুকুমার ভাব আছে, যে দেখ্‌লেই আপনার, কি বলে,—ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে। এ রকম মেয়ে, বি এ পাশ যুবকেরাও পায় না; আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, নেহাৎ অর্থাভাবে পড়েছে বলে আপনাকে এ হেন রূপসী ও গুণবতী মেয়ে দিতে চাইছে।

মল্লিক আর নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌তে পারলেন না, কর্ণে তখন তার এই দুটো কথা ধ্বনিত হচ্ছিল 'সুন্দরী ও বয়স্থা'... তিনি রাজী না হয়ে আর থাক্‌তে পারলেন না।

বীরেন্দ্র ভাব্‌লে এ বিয়ে হওয়া অসম্ভব, কেননা আট-হাজার টাকা মল্লিকের আটখানি বক্ষের পাঁজরার চেয়ে মূল্যবান; কিন্তু এই অতি কৃপণ, অর্থ পিশাচ, লম্পট বৃদ্ধ বিবাহের জন্য এরূপ অধীর হয়েছিলেন, যে বক্ষপঞ্জর অপেক্ষা প্রিয় অষ্টসহস্রমুদ্রা দিতে সম্মত হলেন। বীরেন্দ্র স্বকর্ণে মল্লিকের কথা শুনেও বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্ছিল না, এও কি সম্ভব? সে আর সে স্থানে তিলার্দ্ধ না দাঁড়িয়ে, উপরে চলে গিয়ে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, কেমন করে বিয়ে ভণ্ডুল করে দিয়ে লালসা মাখা বুড়োকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে তার আর বিয়ে কর্‌বার বয়স নেই।

মিলন ভট্‌চায প্রস্থান কর্‌বার পর, তখনও মল্লিক বৈঠকখানায় চুপ করে বসে রইলেন; তাঁর কাণে তখনও ধ্বনিত হচ্ছিল মিলন ভট্‌চাযের কথা—সুন্দরী ও বয়স্থা।

—দুই—

মল্লিকের গ্রহের ফের,—বীরেন্দ্রের কৃপায় বিয়ের কথাটা যেন হাওয়ায় ভেসে, তার বিহীন টেলিগ্রাফের চেয়ে দ্রুত গতিতে, অবিলম্বে পাড়া প্রতি বেশীদের কানে পৌঁছুল; মল্লিকের বিয়ের কথা শুনে সকলেই চটে গেল,—বিশেষতঃ ঐ কালেজের ছোক্‌রাগুলি। ষাট বছরের বুড়ো তাদের চোখের সাম্‌নে, নির্ব্বিঘ্নে একরকম টাকা দিয়ে মেয়ে কিনে বিয়ে কর্‌বে, এ তারা কোন ক্রমেই বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌লে না; সেই দিনই সন্ধ্যার সময় তাদের ক্লাবে, পাণ্ডা অলোকের সভাপতিত্বে গোপনে একটা পরামর্শ স্থির হয়ে গেল।

পরদিন সকাল বেলায় মিলন ভট্‌চায মল্লিকের বাটীতে আস্‌বার পথে, একটি ক্ষুদ্র যুবক বাহিনী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হল; ঐ দলে সর্ব্বাপেক্ষা জোয়ান ছিল অসমঞ্জ। অসমঞ্জ তার মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটীয়ে গম্ভীর স্বরে বল্লে—তুমি সামান্য কয়টা টাকার লোভে ঐ ষাট বছরের বুড়োর জন্য মেয়ে ঠিক করেছ,—ভাব মেয়েটি যদি তোমার হত', তা' হলে কি তুমি—যাক্ আশা করি তুমি এ ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়াবে, আর কোথায় মেয়ে ঠিক করেছ, তাও আমাদের সন্ধান দিতে হবে। যদি বল তা'হলে ভালই, আর না হলে—না হলে—এই বলে সে তীব্রদৃষ্টিতে ভট্‌চাযের দিকে চেয়ে রইলো।

অলোক বড়লোকের ছেলে, সে বল্লে—যদি আমাদের কথা মত রাজী হও, তা' হলে পঞ্চাশ টাকা পাবে।

মিলন ভট্‌চায এ সব দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। শ্মশ্রু-গুম্ফ বর্জ্জিত চক্‌চকে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, তারপর অলোকের কথা শুনে প্রকৃতিস্থ হয়ে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, মল্লিক তাকে একশো টাকা দিবেন বলেছেন বটে, কিন্তু ও লোকটা ভয়ানক ধূর্ত্ত,—ওর কথায় বিশ্বাস কর্‌ছি বটে, শেষ কালে হয় তো ঠকাতে পারে!...তার চেয়ে বিনা পরিশ্রমে হাতের কাছে যেটা পাওয়া যাচ্ছে, সেটা মন্দ কি? যো ধ্রুবাণি প'রতজ্য... সেই শ্লোকটা তার

মনে পড়ে গেল। সে কাল বিলম্ব না করে সম্মত হয়ে গেল, তারপর সে যে একটু ভীত না হয়েছিল তা' নয়। সে বুঝতে পেরেছিল বীরত্ব দেখাতে গেলে শেষকালে বুড়ো বয়সে হাড়গোড় ভেঙ্গে চুর করে দেবে!··· সে বল্লে—আচ্ছা আমি অরাজী নাই।

অলোক সন্ধ্যা সম্মিলনে বন্ধুদের বল্লে -দেখ ভাই! আমাদের খুব সাবধানে কাজ কর্‌তে হবে, বুড়োকে শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে, যে তার বিয়ে কর্‌বার এজ্‌ (বয়স) পেরিয়ে গেছে।

ক্লাব অর্থাৎ সন্ধ্যাসম্মিলন থেকে বাড়ী ফিরে অলোক দেখ্‌লে, তার মা বসে আছেন তার জন্যই; অলোকের আহারের সময় সাম্‌নে বসে তাকে খাওয়ান তাঁর ছিল দু'বেলা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। অলোক ধনীর পুত্র,—তবুও সে অবিবাহিত; বাংলা দেশে আশ্চর্য্য বটে! এর একটু ইতিহাস আছে। অলোক বন্ধু বান্ধবদের নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে অবিবাহিত থেকে দেশের সেবায়, পরহিত ব্রতে লেগে যাবে,—পয়সার তার অভাব নেই। মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করে, সে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরবে তাদের সেবা কর্‌তে, যারা চিকিৎসার অভাবে, পথ্যের অভাবে, ওষুধের অভাবে শেয়াল কুকুরের মত মর্‌ছে। বাস্তবিক সে স্বদেশ প্রেমিক ছিলও খুব; খদ্দরের পোষাক ছাড়া তার অঙ্গে আর কিছুই শোভা পেত না! ·· অলোক বোধ হয় গত জন্মে খুব পুণ্যবান ছিল, কেননা তার মত সৌভাগ্যবান আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে একান্ত বিরল। অর্থের, বিদ্যার অভাব কিছুই ছিল না তার, চেহারাও তার ছিল অতি সুন্দর!···সুস্থ সবল, শক্তিমান্‌, হাস্যদীপ্ত অলোককে সকলেই চেয়ে দেখ্‌ত; সর্ব্বোপরি তার মনটা ছিল এক অপূর্ব্ব মালমশলা দিয়ে তৈরী। সচরাচর এতগুলি গুণের সমাবেশ একজনের ভিতর বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না,—দুষ্টের দিকে তার মনটা যেমন বেঁকে যেত, আবার সৎলোকের দুঃখ দেখলে তার প্রাণ কেঁদে উঠতো দুঃখ মুছে দেবার জন্য। অলোকের বাপ মা কতবার যে বিয়ের জন্য মেয়ে ঠিক করে অপ্রস্তুত হয়েছেন, তার ঠিক নেই,—ছেলের কাণ্ড কারখানা দেখে অবশেষে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

—তিন—

অমরবাবু মার্চ্চেণ্ট আফিসের কেরাণী,—শুধু কেরাণী, মাইনে পান সত্তর টাকা। ছেলে একটি ছোট, মেয়ে পাঁচটী সুতরাং পারিবারিক অবস্থা যে কি প্রকার তা' বলা নিষ্প্রয়োজন। চারটি মেয়ের বিয়ে দিতে চার দুগুণে আটহাজার টাকা খরচ হয়েছে; টাকা পৈতৃক ভদ্রাসনখানি বন্ধক দিয়ে সংগ্রহ হয়েছিল, ছোট সুরমার বিয়ে আজকালের ভিতর দিলেই ভাল হয়। সুরমা দেখতে শুনতে ভাল! সুন্দরী, ইংরাজী-বাংলা মোটামুটী জানে, তথাপি এক অর্থাভাবে আইবুড়ো নাম ঘুচ্‌ছে না। এই সুরমাকেই মিলন ঘটক মল্লিক মশায়ের জন্য পাত্রীরূপে ঠিক করেছিল।

অমরবাবু আফিস থেকে সন্ধ্যার সময় শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ নিয়ে বাড়ী এসে দেখলেন, তাঁর নামে একখানি চিঠি এসেছে! চিঠিখানি এইরূপ—

মহাশয়,

আগামী কল্য আমি নিজেই পাত্রী দেখিতে যাইব। মিলন ঘটক চিঠি দিয়াছে যে, সে জরুরী কার্য্যের জন্য দেশে গিয়াছে, এখন শীঘ্র আসিতে পারিবে না। যাক্‌ তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, প্রাতে ছয়টার সময় গিয়া পৌছিব, আহারাদির বন্দোবস্ত করিবেন না।

বিনীত—

শ্রীশীতলচন্দ্র মল্লিক।

ষাট বছরের বৃদ্ধের হস্তে সুরমাকে সমর্পণ করতে হবে ভেবে, অমরবাবু ও তাঁর স্ত্রী শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন, হাজার হউক বাপ মায়ের প্রাণ তো! কিন্তু নিরুপায়,—যার কাছে বাড়ী বন্ধক আছে, সে মাত্র আর একমাস সময় দিয়েছে; এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিতে পারলে, বাটী নীলামে উঠবে। তখন তিনি স্ত্রীপুত্র নিয়ে কোথায় যাবেন? সুরমাকে মল্লিকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেইটেই তাঁদের ধ্বংশের পথ থেকে রক্ষা করবে।

পরদিন সকালবেলা সুরমাকে সাজানো হল। সুরমার বুক কান্নায় ফেটে যাচ্ছিল; বাংলার নারী সে, একান্ত অসহায়,—একটা মেষ শাবকের চেয়েও। তার বান্ধবীদের বিয়ে হয়েছে ভাল ভাল বিদ্বান যুবকদের সঙ্গে, আর সে কিনা আজ তাদের সমান হয়ে, বরঞ্চ তাদের চেয়ে সুন্দরী ও গুণবতী হয়ে, আজ অর্থের অভাবে এক বৃদ্ধের সঙ্গে!... ...হায় রে সমাজ, অমোঘ তোমার বিধান!

মল্লিক তাঁর নির্দ্দিষ্ট সময় অনুসারে যথা সময়ে উপস্থিত হলেন, ও মেয়ে দেখে একেবারে দিনস্থির করে গেলেন। বাড়ীতে এসে বীরেন্দ্রকে নিরিবিলিতে ডেকে এনে বল্লেন—বাবা বীরেন! আমি পুনর্ব্বিবাহ করতে মনস্থ করেছি, তা' বোধ হয় তুমি জান না। আজ সোমবার, বুধবার শুভকার্য্য হবে; খুব সন্তর্পণে সারতে চাই, কারণ তোমার তো অজানা নেই, আমার এ বিয়ে সাধের বিয়ে নয়; নেহাৎ পুত্র অভাবে পারলৌকিক পিণ্ডটা অসমাপ্ত থাকবে, আত্মার সদ্‌গতি হবে না। ওঃ আজ তাঁর কথা মনে পড়ে—

এই বলে ধূর্ত্ত, লম্পট মল্লিক, মৃতা স্ত্রীর কপট শোকে চোখ দুটো সাদরে একবার মুছে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বল্লেন পুরোহিত ঠাকুরের নিকট গিয়ে তাঁর কাছ থেকে অতি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির একটা ফর্দ্দ করে নিয়ে এস! বিলম্ব করো না। এ বিবাহতে যেটা না করলে শুভকার্য্যের অঙ্গহানি হবে, কেবল সেইটেই করতে হবে; হ্যাঁ একটা কথা, এ সব কারুর কাছে যেন প্রকাশ করো না।

বলা বাহুল্য বীরেন্দ্র এই সুসংবাদ শীঘ্রই অলোক ও অসমঞ্জকে বিস্তারিত ভাবে বলে এলো; সেইদিনই বৈকালে অসমঞ্জ ও বীরেন্দ্র অমরবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বল্লে—আমরা আসছি মল্লিক মশায়ের কাছ থেকে। তিনি পরশু অর্থাৎ বুধবার দিনস্থির করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পুরোহিতের পরামর্শে বুধবার নাকচ করে, কাল মঙ্গলবার দিনস্থির করেছেন; লগ্ন বোধ করি ছটা, দুপক্ষের সুবিধেও হবে, আর এই আটহাজার টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বীরেন্দ্র বল্লে—যা কেনবার কাটবার আজই করতে হবে, আপনি একলা না পারেন, আমরাও সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় তিনজনে জিনিষপত্তর ক্রয় করে ফিরলেন; রাস্তায় তখন সবে মিউনিসিপ্যালটির গ্যাস্ গুলো জ্বলে উঠেছে।

পরদিন সকালবেলা থেকে অমরবাবুর ক্ষুদ্র বাটীতে দুই একজন লোক সমাগম হয়েছে!...সুরমার মনে হচ্ছিল নানা কথা!...তার বুক মথিত করে কান্না ঠেলে ঠেলে উঠছিল, বড় বড় কালো চোখদুটো অশ্রুজলে ভরে উঠেছিল, সে কি এমন দোষ করেছে, যে তার আজ এত শাস্তি!......এক একবার আত্মহত্যা করবার ইচ্ছাও হচ্ছিল, অসহায় বাংলার মেয়ে সে, লৌহ-কারাগারে বন্দিনী; নিজের সুখ-দুঃখ যেখানে নির্ভর করছে, সে ক্ষেত্রে তার নিজ মতের কোন মূল্য নেই, বিদ্রোহের ক্ষমতা নেই, প্রতিবাদের অধিকার নেই।

সুরমার মা এক হস্তে অঞ্চল দিয়ে চোখ মার্জ্জনা করছিলেন, আর এক হস্তের সাহায্যে মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।

ধূসর অবসন্ন সন্ধ্যা দিনকে আচ্ছন্ন করে নেমে এল, বিবাহ বাটীতে আলো জ্বলে উঠ্‌লো!...ম্লান স্তিমিত আলো! হঠাৎ শোনা গেল বর আসছে, সকলেই বাইরে বর দেখ্‌তে ছুটে গেল।

সুরমার বুকটা কেঁপে উঠলো বৃদ্ধ মল্লিকের চোখ দুটো স্মরণ করে, কি পঙ্কিল দৃষ্টি সে, কি কুৎসিত সে চাহনি!...

অসমঞ্জ এবার সব অমর বাবুকে খুলে বল্‌লে। উপবাস ক্লিষ্ট চিন্তামগ্ন অমরবাবু পুলকে দু'হাত জোড় করে, ওপর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বল্লেন—তোমার করুণা অসীম।

শুভদৃষ্টির সময় সুরমা দেখলে, এতো সেই হীন বৃদ্ধের নিষ্প্রভ লালসা মাখা আঁখি নয়, এ চোখে তো উজ্জ্বল সপ্রেম গভীর দৃষ্টি!...

অসমঞ্জ তখন বৈঠকখানায় অর্গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তার স্বাভাবিক সুমিষ্ট স্বরে গাইছিল—নয়নে নয়নে, চকিত চাহনে—

ঠিক এই সময় শীতল মল্লিক নিজ গৃহে শয়ন কক্ষে তামাক খেতে খেতে মনে মনে বল্‌ছিলেন—মিলন যথার্থই বলেছিল, সুন্দরী ও বয়স্থা বটে।

পরদিন অলোক যখন সুরমাকে নিয়ে বাড়ী পৌছিল, তখন তার মা সুরমাকে কোলে করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে এসে, আনন্দভরা স্বরে আদর করতে করতে বল্লেন তোমার জন্তই অলোক বিয়ে করলে।

পরদিন যখন শীতল মল্লিক দশ আনা ছ' আনা চুল কেটে, স্বহস্তে কোঁচানো ফরাস ডাঙ্গার ধুতি, শিল্কের ঢিলে হাতা পাঞ্জাবী ও চীনে বাড়ীর পেটেণ্ট চামড়ার পাম্পস্থ পরে, সম্ভ-ক্ষৌর মুখে স্নো ঘষ্‌ছিলেন, তখন বীরেন্দ্র মুখে রুমাল দিয়ে প্রচুর হাস্‌ছিল। হঠাৎ বাটীর বহির্দ্দেশে পিওনের গম্ভীর স্বর শোনা গেল 'টেলিগ্রাম'।

মল্লিক মশায় মুখে স্নো আরও জোরে ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে বল্লেন—বাবা বীরু! নীচে গিয়ে সই করে নিয়ে এসো তো।

বীরেন্দ্র জান্‌তো কিসের টেলিগ্রাম, সে নীচে থেকে টেলিগ্রাম খানি নিয়ে এসে মল্লিকের হাতে দিলে। টেলিগ্রাম খানি খুলে পড়্‌তে পড়্‌তে মল্লিক মশায় ধপ্‌ করে মাটীতে বসে পড়লেন; টেলিগ্রাম খানায় লেখা ছিল—"Marriage ceremoney over Tuesday, with son of Ramesh Sarkar Commissioner of Police sorry Amar Sen" (বিবাহ কার্য্য মঙ্গলবার পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রমেশ সরকারের পুত্রের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; দুঃখিত ইতি অমর সেন।)

বীরেন্দ্র হাসি চাপতে না পেরে হেসে ফেল্লে; মল্লিক পাগলের মত চীৎকার করে বল্লেন—তুইও ছিলি এর মধ্যে, বেরো এখান থেকে। যে মিলন শা গেল কোথায়?

তখনও তাঁর মনের মধ্যে মিলন ভট্‌চাযের কথা ধ্বনিত হচ্ছিল, সুন্দরী ও বয়স্থা।

* * * *

বিয়ে হয়ে্‌ যাবার পর অলোকের বন্ধুরা অলোককে বল্লে—বন্ধু! এইবার হার ম্যাজেষ্টীকে সঙ্গে নিয়ে দু'জনে দেশ সেবায় লেগে যাও; তুমি তো ডাক্তার আছ, তিনি হবেন নার্শ।

অলোক সহাস্ত মুখে বল্লে—ঠাট্টা করছো কি, দেখরে। একলা যতটুকু দেশসেবা কর্‌তে পারতাম, এবার বোধ হয় তার ডবল পারবো।

দু'তিন দিন বাদে অলোক সুরমাকে আদর করতে করতে বলছিল—ভাগ্যিস্‌ বুড়ো তোমায় বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল, তা না হলে তোমাকে তো পেতাম না।

সুরমার গালদুটী লজ্জার লালিমায় অপরূপ আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল; সেও মনে মনে বলছিল—তা' না হলে আমিও তো তোমায়......
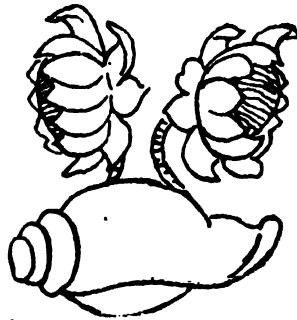
ইতিহাস *

[রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ]

সমবেত সুধীগণ,

আপনারা এই অধিবেশনে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে সভাপতির পদে বরণ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহের বা নিগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। ইতিহাস যাহার আলোচ্য বিষয়, সর্ব্বতোমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের অমর নাম যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট, বিবুধজননী ভট্টপল্লীর অধিবাসীরা যাহারা উদ্যোক্তা, সে সভায় আপনাদের প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কিংবা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের ন্যায় কোন মহামহোপাধ্যায় অধিনায়ক হইলেই শোভন হইত, তাঁহাদের মুখে অনেক নূতন তথ্য শুনিয়া আপনারা শ্রম সার্থক মনে করিতেন। যখন আমাকে অদ্যকার এই বিড়ম্বনা ভোগ করিবার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন নিজের দীনতা ভাবিয়া আমি প্রথমে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলাম ; কিন্তু আমার সোদরকল্প শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রামরূপ বিদ্যাবাগীশ এবং আত্মজবৎ প্রীতিভাজন উদীয়মান ভিষক্‌সূর্য্য শ্রীমান্ শিবপদ ভট্টাচার্য্যের আদেশ ও অনুরোধে শেষে আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। আমি নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় আপনাদের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় ইতিহাসের আলোচনা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের ত কথাই নাই, কারণ এই গ্রন্থে তিনি মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থার্ণব মন্থন করিয়া শত শত প্রত্নরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার যে সকল গ্রন্থকে লোকে কল্পনা প্রসূত মনে করে, তাঁহার সেই দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারাম নামক উপাখ্যানাষ্টকও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিক কি সাধারণ ইতিহাসে যাহা নাই, অর্থাৎ তত্তৎকালের সামাজিক রীতিনীতি ও জনসাধারনের অবস্থা, তাহাও এই সকল গ্রন্থে এমন সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে পড়িবামাত্রই মনে হয় আমরা যেন স্বচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি।

'ইতিহাস' শব্দটী 'ইতি', 'হ' ও 'আস' এই শব্দত্রয়ের সংযোগে উৎপন্ন। 'ইতি' শব্দের অর্থ ইহা বা এইরূপ। 'হ' শব্দটী 'কিল' বা নিশ্চয়বাচক, অতএব 'ইতিহাস' বলিলে পরম্পরাগত প্রবাদ এবং যাহা প্রকৃত ঘটিয়াছিল উভয়ই বুঝায়, 'ইতিহ' যাহাতে আছে সেই শাস্ত্রের নাম ইতিহাস। ইহাতে বুঝা যাইতেছে কিংবদন্তীও ইতিহাসের উপাদান। এরূপ হইবার কথা, কারণ প্রাচীনকালে মানুষ যখন লিখিতে পড়িতে শিখে নাই তখন অনেক ঘটনা পুরুষপরম্পরায় লোকের মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় লোকের অতিপ্রাকৃতপ্রিয়তাবশতঃ, বক্তার রুচি অনুসারে কিংবা শ্রোতার চিত্তবিনোদনার্থ কল্পনার যে যথেষ্ট প্রসর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই কারণেই কিংবদন্তী সত্যপ্রসূতা হইলেও কল্পনাপরিপুষ্টা। কিন্তু তাহা বলিয়া পুরাবৃত্তকার ইহাকে পরিহার করিতে পারেন না। ইংরাজী history শব্দটী গ্রীক্ historia শব্দ হইতে জাত। Historia বলিলে অনুসন্ধান বুঝাইত। যে সকল পুরাকাহিনী অনুসন্ধানদ্বারা সত্য বলিয়া নির্ণীত হইত তাহাদের বর্ণনা করাই ছিল history শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তথাপি এই শাস্ত্রের জন্মভূমি গ্রীসদেশে Herodotus এবং তৎপরে ইতালি দেশে Livyপ্রভৃতি লেখকগণ কল্পনাকলুষিতা কিংবদন্তীসমূহ লইয়াই স্বস্বদেশের পুরাবৃত্তসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে পুরাকালে পুরাণ ও ইতিহাস স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। বেদের ব্রাহ্মণাদি অংশে যে সকল পুরাবৃত্ত আছে, বোধ হয় সেইগুলিই তখন ইতিহাস আখ্যা পাইয়াছিল। পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টিপ্রকরণ বর্ণনা করা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে উর্ব্বশী ও পুরূরবার কথোপকথনাদি ইতিহাস এবং অসৎ হইতে সতের

---

* অভিভাষণ।

উৎপত্ত্যাদি সৃষ্টি ও পুনঃ সৃষ্টি বর্ণনা পুরাণ। ইহাতে বোধ হয় যে বংশ ও বংশানুচরিত, পুরাণের এই লক্ষণ দুইটী উত্তরকালে কল্পিত হইয়াছিল এবং পুরাণ ও ইতিহাস উভয়ে তখন মিশিয়া গিয়াছিল। ইতিহাস যে বিষ্ণুপুরাণাদির অঙ্গীভূত হইয়াছে ইহাই সম্ভবতঃ তাহার কারণ।

ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ নামে বিদিত ছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব ও যুগান্তরের বৃত্তান্ত আমাদের অপ্রত্যক্ষ হইলেও ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ ছিল, অনেকে এই বিশ্বাসে উক্ত শাস্ত্রদ্বয়কে প্রামাণিক বলিয়া ধরিতেন। বেদচতুষ্টয় ছিল যাজ্ঞিকদিগের সম্পত্তি; ইতিহাস ও পুরাণ ছিল নরনারী সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। বেদের আখ্যায়িকাগুলি অতিসংক্ষেপে বর্ণিত, জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনার্থে পুরাণে ও ইতিহাসে হইয়াছিল সেগুলি শাখাপল্লবিত।

আমাদের একটা অপবাদ আছে যে আর্য্যগণ কাব্য ব্যাকরণ, গণিত, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইতিহাসশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহারা বড় উদাসীন ছিলেন। এ অপবাদটা নিতান্ত অমূলক না হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমাদের ইতিহাসের উদ্দেশ্য ছিল চতুর্ব্বর্গপ্রাপ্তির পথপ্রদর্শন—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাম্ উপদেশসমন্বিতম্। পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তম্ ইতিহাসং প্রচক্ষতে॥ এই জন্যই আমাদের মহাভারত ইতিহাস বলিয়া গণ্য। পাশ্চাত্ত্যখণ্ডেও History is philosophy taught by examples.

আর যদি ইতিহাস বলিলে রাজা ও রাজবংশাবলীর নাম ও সময়ের তালিকা, তাঁহাদের সত্যমিথ্যা দোষগুণ বর্ণন, ও বীরত্বকীর্ত্তন বুঝায়, তাহা হইলেও এদেশে এতাদৃশগ্রন্থের নিতান্ত অভাব ছিল না। রাজতরঙ্গিণী, রাজাবলী, কীর্ত্তিকৌমুদী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আরও কত যে কালবশে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? প্রাচীন রাজগণ অতিযত্নে স্ববংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত করাইতেন, তবে লেখকেরা প্রভুদিগের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য যে সর্ব্বদা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন না ইহাও অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ইতিহাস কেবল রাজা ও রাজবংশাবলীর বৃত্তান্ত লইয়া গঠিত নহে। কবে কোন্ হবচন্দ্র রাজা ও তাঁহার গবচন্দ্র মন্ত্রী কোন্ দেশের দণ্ডবিধানের ও মুণ্ডপাতনের কর্ত্তা হইয়াছিলেন ইহা জানিয়া লোকের কোন উপকার হয় না। প্রবাদ আছে পারস্য দেশের কোন রাজা সিংহাসনারোহণের পর পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর পুরাবৃত্ত সঙ্কলন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা বিশ বৎসর অবিরাম পরিশ্রম করিয়া এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং বিশটা উটের পিঠে তাহার পাণ্ডুলিপি চাপাইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা ত দেখিয়া অবাক্! তাঁহার বয়স হইয়াছে তখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর; সারাজীবন পড়িলেও ত এতবড় পুস্তক শেষ করা যাইবে না। তিনি পণ্ডিতদিগকে অনুরোধ করিলেন, আপনারা দয়া করিয়া ইহাকে সংক্ষেপ করুন। পণ্ডিতেরা আরও দশ বৎসর খাটিয়া সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করিলেন, তাহার পাণ্ডুলিপিও হইল দশটা উটের বোঝা। এইরূপে ক্রমে কমাইতে কমাইতে শেষে তাঁহাদের একজন একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লইয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিলেন। কিন্তু রাজা তখন মুমূর্ষু; তাঁহার সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকা পড়িবারও সময় নাই! পাছে তিনি অতৃপ্ত বাসনা লইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করেন, এই আশঙ্কায় উক্ত পণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ, পড়িবার প্রয়োজন নাই; ইহার স্থূলমর্ম্ম এই—সকল রাজাই আপনার ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্রিতাপ ভোগ করিয়াছিলেন এবং কালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" প্রাচ্য, পাশ্চাত্য উভয় খণ্ডের অনেক প্রাচীন ইতিহাসের সম্বন্ধেই এই মন্তব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। লম্বা লম্বা বংশ-বল্লী, আদম ও হবা হইতে যীশুখৃষ্ট পর্য্যন্ত ষাটপুরুষের বিকট নাম, তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি কাটাকাটির কথা—এসকল পড়িতে গেলে পাঠশালার ছেলেদের কান্না পায়, প্রবীন-দিগেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তবে সুলেখকের হাতে পড়িলে এসকল হইতে কাব্যের উপাদান পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। ইলিয়াড, সাহানামা, রামায়ণ, রঘুবংশ প্রভৃতি মহাকাব্য এইরূপ উপাদান লইয়াই গঠিত; প্রতিভার প্রভাবে তাহারা জীবন্ত ছবিতে পরিণত হইয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করিতেছে। পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে ইতিহাস গদ্যে লিখিত; কাব্য পদ্যময়, আমাদের

দেশে কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ প্রভেদ ছিল না। মহাভারত প্রভৃতি প্রধানতঃ পদ্যেই রচিত।

পাশ্চাত্যদিগের মতে ইতিহাসের উদ্দেশ্য সমাজচরিত বর্ণন। যেমন জীবনচরিতে ব্যক্তিবিশেষের জীবন বৃত্তান্ত থাকে, কিরূপে, কত চেষ্টায় পারিপার্শ্বিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র গঠিত হয়, ইহা জীবন-চরিতের প্রতিপাদ্য বিষয়। সেইরূপ কি কারণে জাতি-বিশেষের—কেবল রাজার ও অভিজাতবর্গের নহে, আপামর সাধারণ সকলের—উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে, সমাজে কখন্ কোন্ সম্প্রদায়ের কি স্থান ছিল, কিরূপে তাহা হইতে উন্নতি বা অধোগতি হইয়াছে, দেশের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, শাসন প্রণালী, অধিবাসীদিগের দৈহিক নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা, এ সমস্ত দেশকালপাত্রভেদে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া প্রমাণপ্রয়োগদ্বারা এ সকল তথ্য নির্ণয় করা ইতিহাসের প্রধান কার্য্য। তদুপলক্ষ্যে ব্যক্তিবিশেষের, রাম ও যুধিষ্ঠির, অশোক ও সমুদ্রগুপ্ত, হারুণ অল রসীদ ও আকবর, মুসা ও ইষা, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যের জীবনবৃত্তান্ত ও কার্য্যাবলী আলোচনা করিতে হয় কর, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিকে যেন লক্ষ্য থাকে।

এইভাবে ইতিহাস রচনা করা যে অতি কঠিন কাজ তাহা বলিতে হইবে না। যুগযুগান্তরের কথা বলিবার কালে প্রতিপদে প্রমাণ বাহির করিয়া সত্যাসত্যতা নির্ণয় করা বড়ই দুষ্কর। অতীতের কথা দূরে থাক; যাহা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতেছে তাহার সম্বন্ধেও মতভেদ বিরল নহে। শুনা যায় সার ওয়াল্টার রলী বন্দিদশায় পৃথিবীর ইতিহাস সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন কারাগারের বাহিরে তাঁহার বাতায়নের ঠিক নিম্নদেশে রাজপথে কতকগুলি লোকে ভীষণ কলহ করিতেছিল। এই হাঙ্গামার কারণ জানিতে গিয়া রলী ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা শুনিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন—ভাবিলেন, আমি যখন এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনারই প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারিলাম না, তখন যাহা অতীত কালে শত শত বর্ষ পূর্ব্বে ও শত শত যোজন দূরে ঘটিয়াছিল কিরূপে তাহার তথ্য নির্ণয় করিব? অধুনাতন ঘটনার সম্বন্ধেও, ধরুন না কেন সেদিনকার মহাসমরের কথা। ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা কি সহজ বিবেচনা করেন? বিবদমান সকল পক্ষই বলিতেন (এখনও বলিতেছেন) আমরা নির্দ্দোষ, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কেবল আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়া-ছিলাম।

কিন্তু দুরূহ হইলেও বর্ত্তমান কালের সকল সভ্যদেশের পণ্ডিতেরাই প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমি যখন পাঠারম্ভ করি তখন ভারতবর্ষের হিন্দুশাসন-কালের কোন ইতিহাস ছিল না বলিলেই হয়। তখন প্রিন্সেপ, মাক্রিণ্ডল্, কানিংহাম প্রভৃতির গবেষণায় চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের নাম শুনা গিয়াছিল বটে, কিন্তু অন্ধ্ররাজবংশ, কুশানবংশ, গুপ্তবংশ, রাষ্ট্রকূটবংশ, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু হিন্দুশাসন-কালের ইতিবৃত্ত এখন কি অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই নষ্টোদ্ধার কার্য্যে যে সাফল্য হইয়াছে তাহার জন্য আমরা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকটেই ঋণী। সুখের বিষয় আমাদের স্বদেশবাসী পণ্ডিতেরাও এ সম্বন্ধে অসাধারণ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিতেছেন। রামকৃষ্ণ, গোপাল ভাণ্ডারকর, হরপ্রসাদশাস্ত্রী, শ্যামশাস্ত্রী, রমাপ্রসাদচন্দ, নগেন্দ্রনাথ বসু, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি মণীষিগণ প্রাচীন ইতিহাসে নূতন নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছেন। তাঁহারা নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ বহু প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তীর্থযাত্রীর ন্যায় দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন ও মুদ্রা সংগ্রহ পূর্ব্বক অতীতকে বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং বিবদমান ঐতিহ্যগুলিকে সাবধানে পরীক্ষা করিয়াও পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া কোন্‌টি সত্য, কোন্ মিথ্যা তাহার অবধারণে ব্রতী হইয়াছেন।

প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা এ দেশে এই সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। সাঁচী, সারনাথ, ভারহুৎ, তক্ষশিলা, রাজগৃহ, পাটলিপুত্র প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন স্থানের ধ্বংসাবশেষ উৎখাত হইতেছে সম্প্রতি সিন্ধুদেশে নাকি ভূগর্ভপ্রোথিত

প্রাচীনতর আর একটি নগরেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সুবিশাল জম্বুদ্বীপে অতঃপর আরও যে কত কি আবিষ্কৃত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? ফলতঃ আমরা এখনও প্রত্নতত্বরূপ মহার্ণবের বেলাভূমিতেই অবস্থিতি করিয়া উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছি; অনন্ত জ্ঞানরত্নাকর আমাদের পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই সকল লুপ্তরত্নের উদ্ধার হইলে এবং পালি ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের আরও প্রচার হইলে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে ইহা আশা করা যায়।

প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। কেহ কেহ মনে মনে পূর্ব্ব হইতেই একটা বিশ্বাস পোষণ করেন এবং প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া যাহা কিছু সেই বিশ্বাসের অনুকূল বলিয়া ভাবেন সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে একদল আছেন যাঁহারা আর্য্যসভ্যতার প্রাচীনত্ব মানিতে একেবারেই নারাজ। তাঁহারা বেদকে বড় জোর সাড়ে তিন হাজার বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ বলিতে চান; রামায়ণ মহাভারত ত তাঁহাদের মতে সেদিনকার খোকা। শিল্পে ও বিজ্ঞানে তাঁহারা হিন্দুদিগের মৌলিকত্ব মানেন না; তাঁহারা বলেন যে আমাদের রাজভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল পারস্য দেশের আদর্শে, দেবমূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল গ্রীকতক্ষকদিগের অনুপ্রেরণায়, জ্যোতিষের উৎকর্ষ হইয়াছিল গ্রীক্ পণ্ডিতদিগের শিক্ষাবলে। তাঁহারা মিশর বা আসিরিয়ার ইতিহাসকে আট দশ হাজার বৎসর প্রাচীন বলিতে পারেন; কিন্তু ভারতবর্ষের বেলা পাঁচহাজার বৎসর মঞ্জুর করিতেও শিরঃপীড়া অনুভব করেন।

আবার কেহ কেহ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া একটা অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মনে পড়ে একবার কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃতের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৮ম ও ৯ম কবিতা তুলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে চৈতন্যের সময়ে উচ্চজাতীয়া হিন্দুবিধবারা একাদশীর উপবাস করিতেন না। কবিতা দুইটি এই:--

এক দিন মাতার করি চরণে প্রণাম
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান।
মাতা কহে তাহি দিব যে তুমি চাহিবা
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা।

লেখক মনে করিয়াছিলেন একাদশীতে উপবাসের প্রথা থাকিলে প্রভু কখনও এ প্রার্থনা করিতেন না; কিন্তু যদি তিনি ঐ পরিচ্ছেদের একাদশ কবিতাটি পড়িতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, শচী দেবী তখন সধবা; মিশ্র ঠাকুর অর্থাৎ জগন্নাথ মিশ্র তখনও জীবিত। অনুশাসনপত্রসমূহের পাঠনির্ণয়ে ও ব্যাখ্যাতেও অনেক সময়ে এই রূপ বিভ্রাট ঘটে এবং তজ্জন্য Pickwick প্রহসনের সৃষ্টি হয়। Bil Stump his mark এই উৎকীর্ণ লিপির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া Pickwick সমিতি যে কত মাথা ঘামাইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকালব্যাপী বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা আপনাদের অপরিজ্ঞাত নহে। তাই বলিতেছি প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় অতি সতর্কতার সহিত অতি নিরপেক্ষভাবে চলা আবশ্যক।

হিন্দুশাসনকালের ইতিহাস রচনা সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে। প্রাচীন সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল; মধ্যে মধ্যে কোন কোন রাজা প্রবল হইয়া সার্ব্বভৌম হইতে চেষ্টা করিতেন এবং হয়ত দুই চারি পুরুষমাত্রস্থায়ী একটা সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়া যাইতেন। এ অবস্থায় প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতিক ইতিহাস রচনা করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার; তাহার আদ্যন্ত শৃঙ্খলা রক্ষা অসম্ভব। ফলতঃ ভারতবর্ষের রাজনীতিক ইতিহাস একখানি মাত্র হইলে চলে না; শত শত ইতিহাসের প্রয়োজন। রাজনীতি সম্বন্ধে জনসাধারণেরও তত আগ্রহ ছিল না, কারণ আর্য্যানার্য্যভেদে এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রভাবে সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে পরস্পর তত সদ্ভাব ছিল না. একের ব্যথায় অন্যে বড় ব্যথিত হইত না, কাজেই একতার অভাব ছিল, সকলে মিলিয়া সাম্রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করিত না। জনসাধারণের পক্ষে রাজা যে কেহ হউক না কেন—সারসপক্ষী কিংবা কাষ্ঠখণ্ড—তাহাতে বড় কিছু আসিয়া যাইত না

ভারতবর্ষ যে পুনঃ পুনঃ আগন্তুকদিগের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে ইহাই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ।

পক্ষান্তরে সমগ্র হিন্দুজাতির, কেবল হিন্দুর কেন বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মধ্যেও একটা সাধারণ ধর্ম্মবন্ধন আছে। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব উপাস্যদেবতাসম্বন্ধে ভিন্নমত হইলেও, তাহাদের এমন একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে যাহা-দ্বারা হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী ও বালিদ্বীপ পর্য্যন্ত, আসাম হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত, হিন্দুমাত্রেরই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইতেছে। হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করেন কর্ম্মফলভোগের জন্য জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের শাখান্তর বৌদ্ধধর্ম্ম এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মা অমর কি না, অমর হইলে স্থূলদেহনাশের পর ইহার গতি কি হয় তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। লোকায়ত-বাদীদের কথা বলিতেছি না, কারণ তাঁহারা ত আত্মাই মানেন না। আস্তিকদিগের পক্ষে স্বর্গ ও নরকের ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু তাহাতেও সকল সমস্যার সমাধান হয় না। মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কেন এ প্রশ্নের উত্তর কি হইতে পারে? একজন জন্মান্ধ বা জন্মবধির, সদ্যোজাত শিশু নিরতিশয় যাতনা পাইয়া পেঁচোর বা ধনুষ্টঙ্কারের কোপে মারা গেল; মঙ্গলময়ের এ কি বিধান? খৃষ্টান বলেন ইহা আদিপুরুষ আদম ও হবার পাপফল। কথাটা একটু মজার নয় কি? ঈশ্বর আদমকে বলিলেন তুমি চিরকাল বোকা হইয়া থাক, আদম এ হুকুম মানিলেন না, অমনি ঈশ্বর চটিয়া লাল; তিনি আদমকে ত সাজা দিলেনই; তাঁহার সন্তান-সন্ততিদিগের জন্যও অনন্তকাল পর্য্যন্ত নানারূপ নিষ্ঠুর দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। বেশ করুন, কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার পক্ষপাতিত্ব কেন? একই পিতার ঔরসে ও একই মাতার গর্ভে জন্মিয়া একজন সারাজীবন সুখে কাটায়—সে সাধু সুবুদ্ধি, ধনী ও সর্ব্বজনপূজ্য; আর একজন চিরদুঃখী, সে রুগ্ন, মূর্খ, দরিদ্র, সকলের ঘৃণার পাত্র। এক কর্ম্মবাদী ভিন্ন অন্য কেহই এই বৈষম্যের হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। কর্ম্মবাদী বলিবেন, ইহা ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বজনিত নহে, জীবের জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল। এ সিদ্ধান্তও যে প্রত্যক্ষপ্রমাণ-মূলক, তাহা নহে; কিন্তু ইহাতে যেমন সহজে মঙ্গলামঙ্গলের, সুখদুঃখের সমন্বয় ঘটে এবং মনকে পঙ্কপাপ হইতে নিবৃত্ত করিয়া কর্ম্মশুদ্ধির জন্য উৎসাহিত করে, অন্য কোন উপায়ে তাহা করিতে পারা যায় না। ফলতঃ দর্শনশাস্ত্রের কর্ম্মবাদ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে সৌরকেন্দ্রিক বাদ আমার বিবেচনায় তুল্যমূল্য। বৎসরে একবার পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে কিংবা দ্বাদশমাসে সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ইহা কেহ দেখিয়া আসে নাই। কিন্তু স্যাকেন্দ্রিক মত গ্রহণ করিলে গ্রহনক্ষত্রাদির আপাতদৃশ্যমান অবস্থান সম্বন্ধে যে সকল খট্‌কা লাগে, সৌরকেন্দ্রিক মতে তাহার কিছুই লাগে না, সমস্ত জলের মত তরল হইয়া যায়। এই একমাত্র কারণেই প্রমাণান্তরের অভাবেও সৌরকেন্দ্রিক মত আদরনীয়। জন্মান্তরবাদেও মানবজীবনের অনেক সমস্যার অতি সহজে মীমাংসা করিতে পারা যায়, অতএব যতক্ষণ ইহা অপেক্ষা সন্তোষজনক আর কিছু পাওয়া যাইতেছে না, ততক্ষণ ইহা মানিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। জন্মান্তরবাদের এতাদৃশী উপযোগিতা আছে বলিয়াই ইহা হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে এবং ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ। কোন্ সময়ে হিন্দুরা এই সিদ্ধান্তে প্রথম উপনীত হইয়াছিলেন, কিরূপে ইহার প্রভাবে এক এক শ্রেণীর দর্শনশাস্ত্র এক একটী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ঐ এক ভিত্তি আশ্রয় করিয়া রহিল, কোথায় কখন কি কারণে, কোন্ গুণে বা কোন্ দোষে সম্প্রদায় বিশেষের উৎপত্তি, উন্নতি বা অবনতি ঘটিল, তাহাদের উত্থান ও পতনের সঙ্গে সমাজের নৈতিক ও আর্থিক অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইল, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারকর্ত্তাকে কাজপারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া এই সমস্ত নির্ণয় করিতে হইবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস হইবে প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের আর দুইটি প্রকরণ মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বের কথা। মুসলমানরাজত্ব-কাহিনী এতদিন প্রধানতঃ মুসলমান পুরাবৃত্তকারদিগের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের সকল কথার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা নিরাপদ নহে। তাহারা স্থানে অস্থানে কাফেরের নিন্দা করিয়াছেন; তাহাদের চরিত্রে যে প্রশংসার্হ কিছু আছে তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। সমাজের অবস্থা সম্বন্ধেও তাঁহারা নিতান্ত উদাসীন; লোকে সুখে ছিল বা দুঃখে ছিল সে দিকে তাঁহারা দৃক্পাত করেন নাই; কোন্ বাদসাহ কত ফৌজ লইয়া কাহার সহিত লড়াই করিয়াছিলেন, কয়টা মন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন বা কয়জন কাফেরকে জাহান্নামে পাঠাইয়া গাজী হইয়াছিলেন, প্রধানতঃ এইরূপ বৃত্তান্তেই তাঁহাদের গ্রন্থকলেবর পুষ্ট হইয়াছে। মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের ইতিবৃত্ত, শিখজাতির ইতিবৃত্ত, বিদেশী পর্য্যটক বণিক্‌দিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রাচীন বাঙ্গালা, হিন্দী ও অন্যান্য সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমাদিগকে এইরূপ মুসলমান শাসনকালের অনেক তথ্য বিনিশ্চয় করিতে এবং প্রচলিত ভ্রমপ্রমাদের অপনোদন করিতে হইবে।

ইংরাজ রাজত্ব সম্বন্ধেও বিবদমান মতের অভাব নাই। ধরুন না কেন অন্ধকূপ-হত্যার কথা। একদল ত ইহা আদৌ বিশ্বাস করিতে চান না। তাঁহারা বলেন মাত্র বার হাত

লম্বা চৌড়া একটা ঘরে ১৪৬টা খাসগোরাকে পুরিয়া রাখা নিতান্ত অসাধ্য ব্যাপার। রেলগাড়ীতে যাত্রীরা প্রথমে চড়ে তাহারা সমস্ত দরজা জানালা এমন আবদ্ধ করিয়া বসে যে ভিতরে খালি যায়গা থাকিলেও তাহা জানিতে পারে কার বাপের সাধ্য? অথচ কি না ১৪৬ জন ইংরাজ যোয়ান সুড় সুড় করিয়া সুবোধ বালকের মত বিনাবাক্যব্যয়ে সেই ছোট অন্ধকূপটার ভিতরে মরিতে গেল। এ ত গেল তর্কের স্থল। যাহা অবিসংবাদিত সত্য তাহা বলাও নিরাপৎ নহে—বিশেষতঃ বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকে। ক্লাইব ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সম্বন্ধে লোকে পূর্ব্বে যাহা জানিত, এখন তাহা ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কারণ এখন তাঁহাদের দুইজনেই অবতারের পদে উন্নীত হইয়াছেন। প্রচলিত ইতিহাসে দেখা যায় ইংরাজেরা ভরতপুর অধিকার করিয়াছিলেন অত্যাচারী দুর্জ্জনশালকে দমন করিয়া নাবালক রাজাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তদানীন্তন কোন ইংরাজ পুরবৃত্তকারই বলিয়াছেন ইংরাজেরা গিয়াছিলেন রক্ষকের বেশে বটে, কিন্তু শেষে নিজেরাই হইয়াছিলেন ভক্ষক, কারণ যখন দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল তখনই বিজয়ীরা ধনাগার লুঠ করিয়াছিল। এই লুটের বড় ভাগটা—পাঁচলক্ষ টাকা, এখনকার প্রায় ১৫ লক্ষ—পাইয়াছিলেন স্বয়ং প্রধান সেনাপতি লর্ড কম্বারমিয়ার! কিন্তু বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকে এ সব কথা এখন খুলিয়া বলা যায় কি? পুরাবৃত্তলেখককে অর্থাগমের আশা ত্যাগ করিয়া প্রমাণপ্রয়োগদ্বারা এই সকল সত্য প্রদর্শন করিতে হইবে—মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্ এ নীতি ইতিহাসে খাটে না।

ইতিহাসরূপ মহাবৃক্ষের মূল ও কাণ্ডের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম; কিন্তু বাহুল্যভয়ে ইহার শাখাপল্লবাদির সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কেবল রাজনীতির ও সমাজনীতির কেন, যাহা কিছু মনুষ্যের জ্ঞাতব্য ও ব্যবহার্য্য, স কলেরই এক একটা ইতিহাস আছে। ভাষার ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, দর্শনের ইতিহাস, বিজ্ঞানের ইতিহাস, চিকিৎসার ইতিহাস, গণিতের ইতিহাস, জ্যোতিষের ইতিহাস, শিল্পের ইতিহাস সঙ্গীতের ইতিহাস, বাণিজ্যের ইতিহাস—এমন কি তৈল লবণ প্রভৃতিরও এক একটা ইতিহাস আছে। আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন ভারতবর্ষের রসায়নের ইতিহাস রচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন হিন্দুদিগের নৌবিদ্যার এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ক্ষেত্র বিশাল; আপনারাও কেহ ইহা কর্ষণ করুন না কেন? কোন্ সময় দশগুণোত্তর অঙ্কলিখনপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া হিন্দুরা জগতের গণিতাচার্য্য হইয়াছিলেন, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কি কারণে এক সময়ে এই বিদ্যার এত উন্নতি এবং শেষে এত অবনতি ঘটিয়াছিল, কোন্ পাপে যাহারা জগদ্গুরুর সন্তান তাহারা আজ জ্ঞানকণা লাভের জন্য ক্যাম্ব্রিজের দ্বারে ভিখারী? এই সমস্ত প্রদর্শন করিয়া গণিতের ইতিহাস প্রণয়ন করা যায় না কি? কোণার্কের, ভুবনেশ্বরের, সারনাথের, যবদ্বীপের ও কাম্বোডিয়ার সেই স্থপতি ও তক্ষকগণ কোথায়, আর অজন্তার সেই চিত্রকরদিগকে দেখিতে পাই না কেন, কি কারণে শিল্পের এত অবনতি ঘটিল শিল্পশাস্ত্রের ইতিবৃত্তকারকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। এইরূপ নানাদিকে গবেষণার বহু বিষয় আছে। শাখা পল্লব হইলেও ইহারা মূল ও কাণ্ডের পরিপোষ্ট, কারণ শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি লইয়াই জাতীয় জীবন। শাখা প্রশাখা আওতায় থাকিলে মূল ও কাণ্ড শুকাইয়া যায়।

উপসংহারে ইতিহাসের লিখনভঙ্গী বা ধোরণ (style) সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। বর্ত্তমান কালে সকল ইতিহাসই গদ্যে লিখিত হয়। লেখক সুনিপুণ হইলে গদ্যকেও পদ্যের ন্যায় সুখপাঠ্য করিতে পারেন। ভাষা হইবে তাঁহার ভাবের প্রতিধ্বনি - ইহা কখনও প্রাবৃট্‌কালীন গিরিতরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবলবেগে ছুটিবে, কখনও নিদাঘশীর্ণা কেদারবাহিনী তটিনীর ন্যায় কুলুকুলুরবে বহিবে; ইহা কোথাও ভ্রমরগুঞ্জনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে, কোথাও দম্ভোলিনির্ঘোষে হৃদয়কে উত্তেজিত করিবে। অনুবাদ পড়িয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় ফরাসী লেখকেরা এসম্বন্ধে সিদ্ধহস্ত। তাঁহারা ইতিহাস রচনায় সময় সময় এমন সুন্দর উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগ করেন, যাহা কালিদাসের মহাকাব্যেও অশোভন হয় না। ইংরাজীতেও গিবন, ফ্রিম্যান, গ্রীণ, কার্লাইল প্রভৃতি পুরাবৃত্তকারগণ ভাষার উৎকর্ষে ইতিহাসকে মহাকাব্যের আসন প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এশ্রেণীর লেখকের কিছু অভাব আছে। আমাদের কেহ কেহ কেবল তথ্য লইয়াই ব্যস্ত, কিরূপে সেগুলি সুসজ্জিতবেশে ও সুবিন্যস্ত আকারে পাঠকের সম্মুখে ধরিতে হয় সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। আবার কেহ কেহ ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া অযথা বাগাড়ম্বরের অবতারণা করেন, মশা মারিতে কামান দাগেন। ভাষা গুরুগম্ভীর, সুমার্জ্জিত, শ্রুতিসুখকর, অনাবশ্যক পদহীন ও পুনরুক্তিদোষ রহিত হইবে, বিষয়ের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে, বিষয়গুলিও কার্য্যকরণসম্বন্ধে ও কালানুবর্ত্তিতায় যথাক্রমে সুবিন্যস্ত হইবে। এইরূপে রচিত হইলে ইতিহাস সুকুমার সাহিত্যে স্থান পাইবে; লোকে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিবে, লেখকও যশস্বী হইবেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে অর্থপ্রাপ্তি ঘটিবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু সাবধান—লোকের চিত্তরঞ্জনের জন্য যেন সত্যের অপলাপ না ঘটে, লেখক যেন বলিতে পারেন, "নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিৎ নানপেক্ষিতমুচ্যতে।"

সাম্রাজ্ঞী

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৩শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩২। [৩৯শ সপ্তাহ

পরিত্যক্ত

[শ্রীউমা দেবী]

তখন সন্ধ্যা হইতে কিছু বাকী ছিল, রাঁচির একটী দ্বিতল বাটীর বারান্দায় একখানি আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া মিহির গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। সে সম্মুখের বিস্তৃত মাঠের দিকে চাহিয়াছিল। এমন সময় পশ্চাৎ দিকের দ্বার দিয়া একটী তরুণী আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া দাঁড়াইল। তরুণীটি তাহার স্ত্রী, বয়স সপ্তদশ কি অষ্টাদশ হইবে, চেহারায় এমন একটি বিশেষত্ব আছে যে একবার চাহিলে চক্ষু কর্ণ ফিরিতে চাহে না, দেহের সমস্ত গঠনই পরিপূর্ণ যেন একটী প্রস্ফুটিত পুষ্প। নাম মঞ্জুরাণী। সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সাড়া না পাইয়া মিহিরকে ধাক্কা দিয়া কহিল, "কি এত ভাবা হচ্ছে যে একঘণ্টা ধ'রে দাঁড়িয়েও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না?"

কিছু না মঞ্জু।

না, কিছু না বুঝি তাহলে আর এমন সমাধিস্থ হয়ে থাকতে না।

তোমার শুনে কোন লাভ নেই।

বলবে না আমায়—বলিতে বলিতে মঞ্জুরাণীর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তখন মিহির একান্ত নিরুপায় হইয়া তাহাকে আদর করিয়া চেয়ারের হাতায় বসাইল। কিছুক্ষণ পরে সে মঞ্জুর দিকে চাহিয়া ব্যথাভরা কণ্ঠে কহিল, আজ বাবার চিঠি পেয়েছি।

কি লিখেছেন তিনি?

কি আর লিখবেন, যা বারবার লেখেন তাই, তা এবার একটা শেষ উত্তর চেয়েছেন। তিনি তোমাকে কাশীমপুর রেখে আমাকে বাড়ী যেতে বলেছেন, যদি তার কথা না শুনি তবে আমাকে ত্যজ্য পুত্র করবেন। সম্পত্তি সমস্ত শৈলেশকে দিয়ে যাবেন।

তা তুমি কি করবে ঠিক করেছ? এই বলিয়া মঞ্জু স্বামীর দিকে আগ্রহপূর্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিল।

মিহির কিছুক্ষণ পর বলিল, তুমি কি ভেবেছ যে সম্পত্তির লোভে আমি তোমাকে ত্যাগ করব? তাহলে ত তখনই

করতাম, মিথ্যেকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে কি তার মর্য্যাদা বাড়াব? তোমার কি মনে হয়?—এই বলিয়া সে মঞ্জুকে আরও নিকটে টানিয়া আনিল।

মঞ্জুরাণী ত স্বামীর বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া কহিল এস না আমাকে কাশীমপুর রেখে?

রেখে আসা মানে কি তাত জান? বলিতে বলিতে মিহিরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মিহির পূর্ব্ববঙ্গের কোন জমিদারের একমাত্র পুত্র। পিতার নাম ভবতোষ রায়। কয়েক বৎসর আগে সে যেবার বি-এ পাশ করে সেইবার তাহার পিতা তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহে সকলেই সুখী হইয়াছিল। মিহির কিছুদিনের জন্য অন্যত্র গিয়াছিল, সে অনুপস্থিত থাকার সময় তাহাদের বাটীতে ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা মঞ্জুরাণীর শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও তাহার ফলে সকলে তাহার অত্যন্ত কুৎসা রটনা করে। গ্রামের সমস্ত সমাজপতিরা একজোটে ভবতোষ বাবুর কাছে আসিয়া কহিল, আপনি যদি অচিরে উঁহাকে ত্যাগ না করেন তবে আমরা কেহই আপনার বাড়ী আসিব না, ব্রাহ্মণেরা কেহই আপনার বাড়ী পূজা করিবেন না।

ভবতোষবাবুর সহিত বিবাহের সময় মঞ্জুরাণীর পিতার বিবাহের দান সামগ্রী লইয়া মনোমালিন্য হইয়াছিল, কাজেই তিনি বধূর উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি এই সুযোগে বধূকে ত্যাগ করিয়া বৈবাহিককে জব্দ করিবেন ঠিক করিলেন। মিহির আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কয়েকদিন পর মিহির ফিরিয়া আসিল। সে মঞ্জুরাণীর মুখে সমস্তই অবগত হইল, পিতাও কহিলেন। তাহার পর তাহার পিতা তাহাকে ডাকাইয়া কহিলেন "আমি বৌমাকে আজই কাশীমপুর পাঠাব।" শুনিয়া তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। সে মঞ্জুরাণীকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিত, সে জানিত যে তাহার কোন দোষ নাই, সে ফুলের মতই নির্ম্মল। মিহির অত্যন্ত সাহসে ভর করিয়া কেবল কহিয়াছিল যে "তার কি দোষ?" ইহাতেই ভবতোষবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কি আমার মুখের উপর কথা? ছেলেটা একেবারে উচ্ছন্ন গ্যাছে, বলিয়া তিনি দ্বার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, যা তুই শুদ্ধু আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা। মিহির সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া একখানি গাড়ী লইয়া আসিল ও অন্তঃপুর হইতে মঞ্জুরাণীকে লইয়া চলিয়া আসিল।

আজ কয়েক মাস হইল ইহারা রাঁচি আসিয়াছে। এখানে সে বহুকষ্টে একটী একশত টাকার চাকরী জোগাড় করিয়া লইয়াছে, ইহাতেই ইহাদের দুইজনের বেশ চলিয়া যায়।

ভবতোষবাবু তাঁহার ভাগিনেয় শৈলেশকে দিয়া বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া তাহার ঠিকানা জানিয়া, তাহাকে ফিরিবার জন্য দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন, এই তৃতীয় পত্র।

কিয়ৎকাল মিহির ও মঞ্জুরাণী চুপ করিয়া রহিল; মঞ্জুরাণী স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া বলিল, আমার জন্যই তোমার এত কষ্ট, আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে এ বিদেশে আছ, বাবা মা পর, ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত, জমিদারের ছেলে হয়ে এত কষ্টে থাক, এসব ভাবলে আমার মরতে ইচ্ছা করে। আমাকে কাশীমপুর রেখে এস, তারপর আমার অদৃষ্টে যা থাকে তা হবে। আমার দুর্ভাগ্য এমন স্নেহময় স্বামী পেয়ে নিজেও সুখী হতে পারলাম না, তোমাকেও সুখী করতে পারলাম না। এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

মিহির তাহাকে উঠাইয়া তাহার অশ্রুসিক্ত গণ্ডে চুম্বন করিয়া কহিল—

ছিঃ মঞ্জু, এতদিন এক সঙ্গে থেকে শেষকালে আমার সম্বন্ধে এই ধারণা করলে যে নিজের সুখের জন্য আমি নির্দ্দোষ তোমাকে ত্যাগ করব? আমি ত জানি তোমার দেহ-মন কত পবিত্র, তুমি ফুলের মতই নির্ম্মল। আর তোমাকে ছাড়া আমার ত কিছুই থাকবে না তা ত জান, তবে কেন বারবার ত্যাগ করার কথা বলে আমাকে কষ্ট দাও! তুমি চিরদিন এইভাবে থাকবে বলিয়া সে মঞ্জুরাণীকে নিবিড়ভাবে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল।

এইভাবে খানিকক্ষণ কাটিবার পর মঞ্জুরাণী নিজেকে বন্ধন মুক্ত করিয়া মিহিরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সে মিহিরের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছিল মানুষ না দেবতা।

যেতে নাহি দিব

—সার জন্ মিলে—

যে সময়ে ইউরোপে রোম্যান পোপের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতারও অপব্যয় হইতেছিল, সেই সময়ে একদল লোক পোপের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়—ইহাদের নাম হইয়াছিল, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের আবার হিউজনট্ও বলা হইত। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের মধ্যে এক সময়ে বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই সময়কারই এক ঘটনা লইয়া শিল্পী এই চিত্রখানি আঁকিয়াছিলেন! যুবক সেই বিপ্লবে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিবে—মেয়েটির নিকট বিদায় চাহিতেছে। মেয়েটি কিন্তু কিছুতেই ছাড়িবে না। সুদৃঢ় বন্ধনে প্রিয়তমকে বাঁধিয়া বলিতেছে—যেতে নাহি দিব।

মিলে তেইশ বৎসর বয়সের সময় এই ছবিখানি আঁকিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রভূত যশ হইয়াছিল।

ব্লু-বয়

—গেন্‌সবোরো—

মাষ্টার বাটালের প্রতিমূর্ত্তি। এমন সব পোষাক-পরিচ্ছদ সত্ত্বেও ছেলেটির সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা একটা শান্তসরলতা বিরাজ করিতেছে। ছবিটিতে রঙের বিশেষ জাঁকজমক নেই, রঙের মধ্যে নীল রঙটাই যা প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই কত শোভা।

পবিত্রতা

—সার জোস্থয়া রেণল্ডস্—

এই যে মেয়েটি বসিয়া রহিয়াছে দেখ দেখ, কি পবিত্র, নির্দ্দোষ, সরলতামাখা তার মুখখানি। এ সেই বয়সের একটি স্থকুমার শিশুর ছবি যে বয়সে সংসারের ভাবনা, চিন্তা কিছু থাকে না। কপটতা, ছলনা—এ সব যখন মনে স্থান পায় না—সেই সময়কার ছবি—রেণল্ডসের অঙ্কিত চিত্র-গুলির মধ্যে এই খানিকেই অনেকে সর্ব্বাপেক্ষা স্থন্দর ও নয়নরঞ্জক ছবি বলিয়া মনে করেন।

অভাগিনী

[শ্রীজগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

এই দিনটির কথা ভুলিয়া যাইতে কত চেষ্টাই না করিয়াছি। কিন্তু সেই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যটি প্রতি বৎসরের এই দিনটিতে এমন উজ্জ্বল হইয়া মনের ভিতর দেখা দেয় যে, ভোলা তো দূরের কথা শত চেষ্টাতেও অশ্রুরোধ করিতে পারি না। কি অভিশপ্ত জীবন নিয়েই অভাগিনী জন্মগ্রহণ কোরেছিল! সমাজের নিষ্ঠুর অবিচারে অতবড় সমাজে যখন তার এতটুকু স্থানও হইল না, নিজের উপর প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া তখন আর তার কোনো উপায়ই ছিল না! অত্যাচার যখন চরম হইয়া উঠে, মানুষ বুঝি তখন এইরূপেই সর্ব্ব-সন্তাপহারী মৃত্যুর সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়।

সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে তার সংজ্ঞাশূন্য দেহ পাই। নানারূপ শুশ্রূষার পর গভীর রাত্রে তাকে জ্ঞানলাভ করিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হ'লাম। কিন্তু এই জ্ঞানলোপের সঙ্গে সঙ্গেই যে অভাগিনীর জীবন প্রদীপও নিভিয়া যাইবে ইহা তখনও জানি না। জ্ঞানলাভ করিয়া বিস্মিত নেত্রে সে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। তাহাকে কি অবস্থায় কোথায় পাওয়া গিয়াছে, এবং বর্ত্তমানে সে নিরাপদ স্থানেই আছে বলায় সে অশ্রু-জড়িত কাতর কণ্ঠে বলিল,—"কেন আমায় বাঁচালেন? মৃত্যু ছাড়া যে আমার আর কোনো উপায়ই নাই, আমি যে বড় অভাগিনী!"

কথা বলিতে তার কষ্ট হইতেছে দেখিয়া বলিলাম,—"এখন একটু ঘুমাও বোন, পরে সব শুনবো।" দুর্ব্বল দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সে বলিল, "না না এখনি আমায় বলতে দিন; আর তো আমার বেশী দেরি নাই।"

তারপর দুর্ব্বলকণ্ঠে বলিতে লাগিল:—

"দুই তিনটি সন্তানের অকাল-মৃত্যুর পর আমাকে পাইয়া বাপ-মা বড় আদর করিয়া আমার নাম রাখিয়াছিলেন "শান্তি।" বারো বৎসর পার হ'য়ে গেলেও আমার বিয়ে দিতে না পারায় বাবা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। একে কুলীনের মেয়ে, তাতে কালো, কাজেই দরিদ্রের কাতর ক্রন্দনে কোনো ছেলের বাপেরই প্রাণ গলিল না। বাবার অবস্থা দেখিয়া একদিন মাকে বলিলাম যে আমি চিরকুমারী থাকিব। বাবা ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "তা হয় না মা, সমাজে তা দেবে না। এতবড় মেয়ের বিয়ে দিতে পারি নাই ব'লে এর মধ্যেই অনেক কথা উঠেছে। কিন্তু সমাজ তো আমার অবস্থার দিকে চাইবে না মা! একটা পয়সা দিয়েও তো আমার সাহায্য করবে না! তবু তার প্রত্যেক বিধি, আদেশ অবনত মস্তকে আমায় মানতে হবে।"

যাহোক অনেক চেষ্টার পর পাত্র মিলিল। নৈকষেয় কুলীন। তৃতীয় স্ত্রী-বিয়োগের পর, আমার পিতার উপকার করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বাড়ী ঘর এবং যা কিছু জমি-জমা ছিল সমস্ত রেহান্ দিয়া বাবা দুইশত টাকা জোগাড় করিয়া একশত একান্ন টাকা পণে, হাতে পায়ে ধরিয়া পাত্রকে সম্মত করিলেন। বিবাহ হইয়া গেল। শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার দিনে মা চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "মা ইনিই তোর শিব!...

বিবাহের পর এক বছরও যায় নাই, একদিন বাড়ীতে ডাকাতি হইল। কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত আসিয়া আমার মুখে কাপড় গুঁজিয়া কাঁধে তুলিয়া লইল। অজ্ঞান হইয়া গেলাম। জ্ঞানলাভ করিয়া দেখি, হাঁসপাতালে আছি। কয়েকদিন পরে কোর্টে উপস্থিত হইতে হইল। দুর্ব্বৃত্তদের জেল হইয়া গেল। কাছারী হইতে বাড়ী গেলাম। কিছু পরেই সমাজপতিরা আসিয়া স্বামীকে বলিলেন যে তখনই আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে। স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "আমি কোথায় যাব?" প্রত্যুত্তরে তিনি কতকগুলি কুৎসিত কথা বলিয়া এমন স্থানের কথা বলিয়া দিলেন যে ঘৃণায় ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বাটির বাহির হইলাম। কোথায় যাব, আমি যে কলঙ্কিনী, সমাজে তো আর আমার স্থান নাই। নানা চিন্তায় পাগলের মত হ'য়ে গেলাম। সেই সময় কে যেন কাণে কাণে উপায় বলিয়া দিল। স্বামীর ঘরে গিয়া তাঁর আফিংয়ের কৌটাটি নিয়ে নদীর ধারে গেলাম। কৌটার সবটুকু গিলিয়া ফেলিয়া মা গঙ্গার কোলে ঝাঁপ দিলাম।" অভাগিনীর কথা জড়াইয়া আসিতেছিল। অতি কষ্টে বলিল, "পরলোকে আমার কোথায় স্থান হবে?"

উত্তর শোনবার আগেই তার শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল।

———

[২৮শ সপ্তাহ

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩২।

রঙ্গ-রস

[শ্রীপ্রমথকুমার সমাদ্দার]

..."তা'হলে আজকাল কি করছ?"

"আজ্ঞে সেকথা আর জিজ্ঞেস করচেন কেন।—আমার চুল দেখেই বুঝতে পারা উচিত যে আমি এখন "আর্ট" শিখচি।
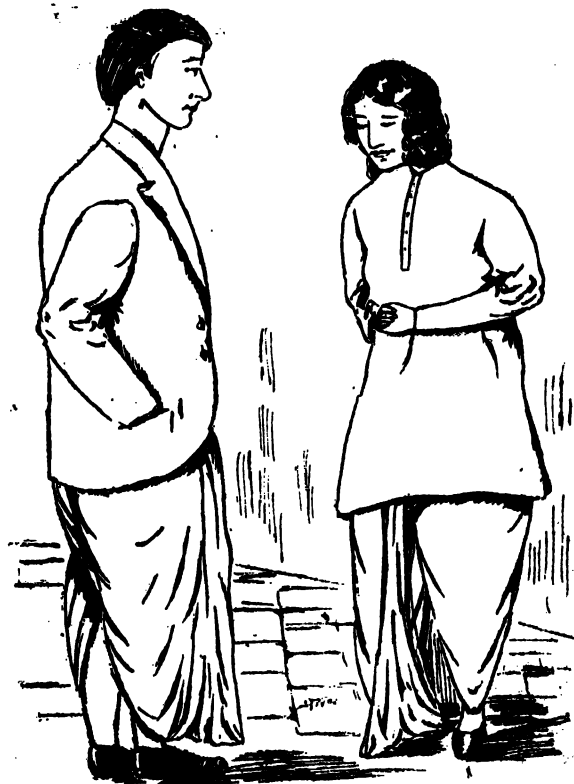
"কি রে আজকে বুঝি অঙ্ক পরীক্ষা হ'ল ?"

"আজ্ঞে হঁ্যা।"

"কেমন দিলি ?"

"মন্দ না।"

"কটা ভুল করেছিস ?"

"একটা।"

"বাঃ বেশ—আর বাকি গুলো ?"

"লিখিনি।"

মুক প্রণয়ী ও তাহার চিকিৎসক

(স্পেনীয় লেখক Matias delos Rayes হইতে)

[৺জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর]

স্যাভয়ের ডিউক এর রাজ-ধানী তুরিণ হইতে অনতিদূরে 'মণ্টকলার' দুর্গ-প্রসাদে, ঐ দেশের একজন প্রধান নাইটের বিধবা পত্নী বাস করিতেন। তাঁহার নাম ফিনেয়া। তিনি তরুণী, রূপসী, ও গুণবতী; তাঁহার নির্জ্জন-প্রিয়তা ও মধুর ব্যবহার, তাঁহার রূপ-লাবণ্যের উপর একটা উজ্জ্বল প্রভা নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাঁহার চাল-চলন এরূপ আড়ম্বরশূন্য ছিল যে, দেখিলেই মনে হয়, সারা জীবন বুঝি তিনি প্রাসাদের পরিবর্ত্তে, একটা সামান্য গ্রাম্যকুটীরে বাস করিয়া আসিয়াছেন। আর কখনও বিবাহ করিবেন না ইহাই তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র নির্জ্জন একটা পল্লী-ভবনে বাস করিতেন। একটি মাত্র ভৃত্যের সাহায্যে এইখানে সামান্য ঘর-কন্নার কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। কাহারও সহিত বড় একটা দেখাসাক্ষাত করিতেন না। কেবল পর্ব্ব উৎসবের দিনে গির্জ্জায় যাইতেন; এবং নিজের অবস্থা অপেক্ষা নিচু ধরণে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

সে দেশের একটা প্রথা আছে. শান্তির সময় যদি কোন খ্যাতনামা বিদেশীয় ব্যক্তি ভ্রমনের জন্য আসেন; তাহা হইলে ঐ দেশের মহিলারা তাঁকে অতিথি বিবেচনায় বিশেষ রূপ আপ্যায়ন যত্ন ও করিয়া থাকেন। কিন্তু ফিনেয়া এই প্রথাটা পালন করিতেন না। এবং সব সময়েই, "আমি একাকিনী বাস করি"—এই অছিলায় কাহাকেও আমন্ত্রণ করিতেন না।

কিন্তু এই সময় মণ্টকলারের নাইট এইখানে আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার নাম লেলিও। তিনি দুর্ব্বলের সহায়, একজন প্রখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন; এখানে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে আসিয়াছিলেন। নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া, গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে, 'মাস' উপাসনার মন্ত্র পাঠ শুনিতে তিনি গির্জ্জায় গেলেন। এই গির্জ্জায় ফিনেয়াও প্রায় যাইতেন। তিনি ফিনেয়াকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন—তৎপূর্ব্বেই এই মহিলার বিদ্যা-বুদ্ধি ও কলানৈপুণ্যের খ্যাতি তিনি লোক মুখে শুনিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি "ঘাড়মোড় ভাঙিয়া" তাহার প্রেমে পড়িয়া গেলেন। সুতরাং সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, যেমন বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে তাঁর প্রেমানল আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাই তিনি তাড়াতাড়ি তুরিণে গিয়া, সরকারী কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া, ফিনেয়ার হৃদয়-জয়ের উদ্দেশ্যে মণ্টকলারে ফিরিয়া আসিলেন। আশপাশের অন্ধি-সন্ধি নিরূপণ করিতে কিছুদিন কাটাইলেন; কিন্তু তাঁহার বাঞ্ছিতা নিজ নিয়মানুসারে কেবল গির্জ্জায় যাইবার সময়েই বাড়ী হইতে বাহির হইতেন। যদি কখনও নাইট্ মহাশয় তাঁহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন, তিনি তখনই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া এইরূপ কথোপকথনে নিজের অসম্মতি জানাইয়া দিতেন। রমণীর এই আচরণ লেলিওর অসহ্য হইয়া উঠিল; কিন্তু ফিনেয়া যতই তাঁর প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতে লাগিলেন, ততই তাঁর প্রেমানল আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রেমিকের সর্ব্বপ্রকার কৌশলই তিনি খাটাইয়া দেখিলেন। তাঁহার আশা যতই ক্ষীণ হইতে লাগিল, তাঁহার চেষ্টার প্রাবল্যও ততই বাড়িতে লাগিল। ফিনেয়া যতই তাঁহাকে কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল, ততই তিনি তাহার প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিলেন; ততই তিনি আরও আগ্রহের সহিত তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই বিধবার দৃঢ়তা ও কঠোরতার সম্মুখে কি উপহার কি আদর-যত্ন, কি ধৈর্য্য—সমস্তই বিফল হইল। হতভাগ্য প্রেমিক কার্য্য সিদ্ধির কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না;

তথাপি তাঁহার সঙ্কল্পের একটুও পরিবর্ত্তন হইল না। তাঁর ক্ষুধা চলিয়া গেল, চোখে নিদ্রা নাই,—শীঘ্রই গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসকেরা রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম হইয়া, কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না—ঐরূপে আস্তে আস্তে তিনি মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার এইরূপ অবস্থা, তাঁহার এক বন্ধু এস্‌পোলেটোর নাইট্, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। লেলিও বন্ধুর নিকট তাঁহার প্রেমের বিবরণ ও তাঁর রোগের কারণ সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রেয়সীর নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতার কথা একটু বেশী করিয়াই বলিলেন। আরও বলিলেন, ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইবে।

এস্‌পোলেটোর নাইট্ তাঁহার বন্ধুর পীড়ার কারণ অবগত হইয়া তাঁহাকে সস্নেহভাবে বলিলেন, "লেলিও, তোমার এই প্রেমের ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও। কোন ভয় নেই, আমি, এই মহিলাকে কোন রকমে বাগিয়ে আন্‌তে পারব।"

লেলিও উত্তর করিলেন, "আর কিছু আমি চাই নে; তুমি তাকে কেবল বল্‌বে, তার নিষ্ঠুর ব্যবহারের দরুণ আমার কি শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। আমার মনে হয়, যদি সে একথা জান্‌তে পারে তাহলে সে আর ওরকম ধনুকভাঙ্গা পণ করবে না, আমার ভালবাসার প্রস্তাব এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে না। কিন্তু বল দেখি, তুমি কাজটা কি ক'রে আরম্ভ করবে? কেবলমাত্র একঘণ্টা কালের দর্শনের জন্যে, তাকে আমি কত কাকুতি মিনতি করেছি, কত রকম ফিকির ফন্দি করেছি—তবুও সফল হতে পারি নি।"

বন্ধু বলিলেন, "তুমি শুধু তোমার আরোগ্যের জন্য চেষ্টা কর; আর বাকি সমস্ত কাজ আমাকে করতে দাও।"

লেলিও, তাহার বন্ধুর আশ্বাস বাক্যে পরিতুষ্ট হইল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই রোগশয্যা পরিত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতে পারিল। তাহার চিকিৎসকেরা যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। এস্‌পোলেটো-বাসীরা খুব বচনপটু, ও সুরসিক। উহারা অন্যকে নিজের মতে আনিতে খুব দক্ষ। তা-ছাড়া যে সব জিনিষ নারীর খুব পছন্দসই, নারীর কৌতুহল জাগিয়া উঠে, উহারা সেই সব জিনিষের ব্যবসা করে। নাইট্ মনে করিলেন, এইরূপ একটা সামগ্রীর দ্বারা নিজের মৎলব হাঁসিল করিবেন। তাই তিনি একটা ঝুড়ি কিনিয়া, তাহা নানাবিধ সামগ্রীতে পূর্ণ করিলেন এবং পথ-চলতি বুড়া ফেরিওয়ালা সাজিয়া সেই বিধবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফিনেয়ার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌছিয়া, সেই জিনিষগুলার কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

ফিনেয়া, এই হাঁক-ডাক শুনিয়া, নিজেই দ্বারদেশে আসিল, এবং হস্ত ইঙ্গিতে ফেরিওয়ালাকে ডাকিল। ফেরিওয়ালা এই আহ্বানে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, স্বকীয় ছদ্ম-বার্দ্ধক্যের সুযোগ লইয়া খুব সহজভাবে ও বাচালতা সহকারে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। ফিনেয়া ঝুড়ির ভিতর হাত দিয়া জিনিষগুলা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং বিভিন্ন সামগ্রীর নির্ব্বাচনে বেশ একটু সুরুচি প্রদর্শন করিয়া, একখানা বহুমূল্য সুন্দর কাপড়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—"আমার যদি সাধ্য হ'ত আমি সমস্তই খরিদ করতাম।"

ফেরিওয়ালা বলিল, "ঠাকরুণ, সমস্তই আপনি নিন্ না; দাম জিজ্ঞাসা করবেন না—এ সমস্তই আপনার নিজস্ব বলে মনে করুন। আপনার পছন্দ হয়েছে—এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।"

ফিনেয়া বলিল, "ওমা! সে কি কথা? এমন কোন জিনিষ আমি চাইনে, যার আমি দাম দিতে পারব না। আমার মত স্ত্রীলোক বিনামূল্যে কোন জিনিষ নিতে পারে না। যাই হোক এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কাপড় খানির দাম কত আমাকে বল। তোমার জিনিষ বিনামূল্যে নেব, এ হতেই পারে না।"

ফেরিওয়ালা উত্তর করিল, "আপনার মুখখানি যেমন সুন্দর, আপনার হৃদয়খানিও তেমনি উদার। আমি আপনাকে যা দিচ্চি, আপনার সৌন্দর্য্যের সম্মুখে সেটা আমার ভক্তি অঞ্জলি স্বরূপ মনে করবেন।"

এই কথা শুনিয়া বৈশাখ-সূর্য্যরশ্মিতে প্রথম উদ্‌ঘাটিত গোলাপ-কুঁড়ির মত ফিনেয়ার গাল লাল হইয়া উঠিল।

তথাকথিত দ্রব্যবিক্রেতার আপাদ মস্তক মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে বলিল, "তুমি যে ধরণে আমার সঙ্গে কথা বলচ, তাতে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। বল দেখি তোমার মতলবটা কি? আমার মনে হয়, যার কাছে তোমাকে পাঠান হয়েছে, তার কাছে না এসে, তুমি ভুলক্রমে অন্য লোকের কাছে এসেছ।"

তখন, মুখের ভাবে কোন বদল না করিয়া, নীচের দিকে চোখ নত করিয়া, ফেরিওয়ালা বাক্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিল। বলিতে লাগিল, তাঁর অবজ্ঞার দরুণ লেলিও কত কষ্ট পাইয়াছে, তাঁর প্রতি লেলিওর কি জলন্ত অনুরাগ, লেলিও কত গুণবান পুরুষ, কি ধন ঐশ্বর্য্য, কি সাহস বিক্রম, কি সৌজন্য, কি প্রিয়ভাষিতা,—সমস্ত বিষয়েই সে কত উচ্চ—ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশেষে, সে এতটা সফল হইল যে, ফিনেয়া কোন এক সঙ্কেত স্থানে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার প্রণয়াতুরকে দেখা দিবে প্রতিশ্রুত হইল।

লেলিও, তাহার বন্ধুর পরিশ্রমে প্রীত হইল, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত স্থানের অভিমুখে তাড়াতাড়ি যাত্রা করিল। ফিনেয়া তাহার ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া, লেলিওকে নিজ বাড়ীর পিছনের নিম্ন মহলের একটা কক্ষে লইয়া গেল। কক্ষখানি খুব প্রশস্ত—উহার শেষ প্রান্তে ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিল। ঘরটা এত প্রশস্ত যে তাহাদের কথাবার্ত্তা সেখান হইতে ভৃত্যের শুনিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। লেলিও প্রেমার্দ্র নয়নে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিল, তার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে সমস্ত বলিল। শেষে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাহার দয়া ভিক্ষা করিল। বলিল—"যদি তুমি আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য কর তবে আমি তোমার চিরদাস হয়ে থাকব।"

রমণী উত্তর করিল, "আমি একজন বিধবা, প্রেমের কথা আমার মনে আর স্থান পায় না। আমি এখন ধর্ম্মের সেবাতেই নিযুক্ত। এমন কত সুন্দরী মহিলা ত আছে যারা এই সব নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়।"

অবশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর লেলিও যখন দেখিল তার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছে, তখন সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "আমার যখন আর কোন আশা নেই, আমার উপর যখন তোমার একটুও দয়া হল না, তখন, যে দেশ আমাদের দুজনেরই দেশ, সেই দেশের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে শাস্তি দাও—তোমার পদতলেই আমি জীবন বিসর্জ্জন করব।"

ফিনেয়া একটু ভাবিয়া উত্তর করিল, "আমার উপর তোমার ভালবাসা সত্যই খুব বেশী কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আমার একটা অনুরোধ যদি তুমি ধর্ম্মতঃ রক্ষা কর তাহলে তার প্রতিদান স্বরূপ আমার ভালবাসা পাবে।"

মোহাচ্ছন্ন নাইট, না ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়া ফেলিল, আমি শপথ করছি তোমার অনুরোধ আমি ধর্ম্মতঃ নিশ্চয়ই পালন করব, বল তোমার কি অনুরোধ।"

রমণী বলিল, "আমার অনুরোধ এই—এখন থেকে তিন বৎসরকাল, তুমি কোন মানুষের সঙ্গে কথা কবে না—সে পুরুষই হোক, স্ত্রীলোকই হোক। এই তিন বৎসর তোমায় বোবার মত থাকতে হবে!"

প্রেয়সীর নিদারুণ অনুরোধ শুনিয়া লেলিও একেবারে বজ্রাহত হইয়া পড়িল। এ যে পাগলের মত অনুরোধ। এ যে নেহাৎ পাগলামি! এই অনুরোধ পালন করা যে অসম্ভব। কিন্তু গুরু গম্ভীর শপথের পর, এই অঙ্গীকার পালন ভিন্ন উপায় নাই। নিজ মুখের উপর হাত রাখিয়া লেলিও হস্তের ইঙ্গিতে ফিনেয়াকে তার সঙ্কল্প নীরবে জানাইয়া দিয়া, নীরবে বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

লেলিও গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় অঙ্গীকার অনুসারে হঠাৎ বোবা হইয়াছে বলিয়া ভাণ করিল। যাহারা তাহাকে জানিত, সকলেই এই দুর্ঘটনার জন্য তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিতে লাগিল। লেলিও মণ্টকলার হইতে তুরিনে গেল, সেখানেও বাক্‌শক্তি লোপের ভাণ করিতে লাগিল। তাহার পর সে ফেরারায় যাত্রা করিল; যুবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া তাহার খ্যাতি সেখানকার ডিউকের দরবারে আগেই পৌছিয়াছিল।

ডিউক দরবারে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। লেলিওর বীরপুরুষোচিত চালচলন সভাসদ্‌গণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। শীঘ্র একটা সুযোগও উপস্থিত হইল। একটা যুদ্ধে তিনি

বিপুল বিক্রম প্রদর্শন করিয়া ডিউকের সাহায্য করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইলে ডিউক এই উপকারের জন্য লেলিওকে সর্বোচ্চ সম্মানের উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। কিন্তু তার মূকতায় ডিউক অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; এবং যাহাতে আরোগ্য লাভ হয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমস্ত ইটালিময় ঘোষণা করিয়া দিলেন—যে কেহ এই মূক নাইটের জন্য ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারিবে তাহাকে তিনি লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন। যদি তাহার ঔষধে আরোগ্য লাভ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইবে; ঐ টাকা না দিতে পারিলে সে কারাবদ্ধ হইবে।

অসংখ্য চিকিৎসক তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির সমস্ত সম্বল নিঃশেষ করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইল এবং কারাগারে বদ্ধ হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। অবশেষে ফিনেয়া, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে মনে মনে স্থির করিয়া, রাজদরবারে আসিয়া জানাইল সে নাইটের মূকতা সারাইয়া দিতে পারিবে। বড় বড় বিদ্বানেরা যাহা পারে নাই, একজন সামান্য স্ত্রীলোকে তাহা করিতে পারিবে রাজসভা-সদেরা এই কথা নিতান্ত হাস্যজনক মনে করিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ রমণীর নিপুণতার পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসুকও হইলেন—এবং তাহাকে লেলিওর ঘরে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। লেলিওর ঘরটি প্রাসাদের একটা নিভৃত অংশে অবস্থিত ছিল।

ফিনেয়া, লেলিওর নিকট যেরূপ সাগ্রহ আদর ও অভ্যর্থনা পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, তাহা ঘটিল না। লেলিও প্রতিজ্ঞায় অটল ছিল, সে ফিনেয়ার সমস্ত প্রণয় সম্ভাষণ উপেক্ষা করিল; মনে করিল ফিনেয়া অর্থলুব্ধ হইয়াই এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে তাহাকে কতটা ভাল বাসিয়াছিল, এবং তার নিষ্ঠুর আচরণে কত না কষ্ট পাইয়াছে সে সব কথাও তার মনে জাগিতেছিল।

এইরূপ চিন্তার দ্বারা লেলিও নিজ জলন্ত প্রেমকে একটু প্রশমিত করিয়া, ফিনেয়ার নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইবে, এবং তাহাকেও একটু কষ্ট দিবে বলিয়া স্থির করিল। ফিনেয়া তাহাকে মিষ্ট ভাষায় অভিবাদন করিয়া তাহাকে নিজ মনোগত অভিপ্রায় জানাইল—কিন্তু প্রত্যাশার অনুরূপ উত্তর না পাইয়া বলিল, "লেলিও, তুমি কি আমায় চিন্‌তে পারছ না? আমি তোমার সেই প্রেয়সী ফিনেয়া, কিছুকাল পূর্ব্বে যার প্রতি তুমি কত ভালবাসা জানিয়েছিলে।"

লেলিও ইসারা ইঙ্গিতে তাকে উত্তর দিল, "আমি তোমাকে খুবই চিনি" এবং নিজের জিহ্বা স্পর্শ করিয়া ও মাথা নাড়িয়া তাহাকে জানাইল যে তাহার বাক্‌শক্তি নাই।

ফিনেয়া একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উত্তর দিল, "তোমার প্রতিজ্ঞা থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিচ্ছি; তোমার নীরব থাকিবার মেয়াদ পূর্ণ হতে এখনও ছ'মাস বাকী থাকলেও আমি নিজের অঙ্গীকার পালন করিতে প্রস্তুত আছি। তোমার প্রতি আমার অনুরাগ অক্ষুণ্ণ আছে।"

এই সব কথার কোন উত্তর না দিয়া লেলিও শুধু তাহার জিহ্বা স্পর্শ করিল, ও দুঃখের একটা ভাব মুখে প্রকাশ করিল।

লেলিওর প্রতিজ্ঞা অটল দেখিয়া ফিনেয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। সে যে অলৌকিক কাণ্ড করবে বলিয়া এত বড়াই করিয়াছিল—সেই অলৌকিক কাণ্ড কি অশ্রুপাত, কি অঙ্গীকার, কি অনুনয়-বিনয়—কিছুতেই ঘটাইতে পারিল না। অবশেষে তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সে হতাশ হইয়া প্রস্থান করিল। রাজ দরবারে তাহার অর্থ দণ্ড হইল এবং অর্থদণ্ডের টাকা দিতে না পারায়, অন্য লোকেদের ন্যায় সেও কারাগারে আবদ্ধ হইল।

এই ঘটনার পর, প্রতিশোধটা বেশ ভাল রকমই লওয়া হইয়াছে মনে করিয়া, লেলিও ডিউকের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং যে জিহ্বা এতদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, সেই জিহ্বাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া,—কেন সে এতদিন নীরব ছিল, তার সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। তারপর ডিউকের নিকট অনুনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিল,—যে সকল লোক তাহার জন্য অন্যায়পূর্ব্বক কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে

তাহাদিগকে যেন এখনই মুক্তি দেওয়া হয়। ফিনেয়াকেও ডাকিয়া পাঠানো হইল। সমস্ত দরবারের সম্মুখে লেলিও তাহাকে এইরূপ বলিল,—

"তুমি ত বেশ জানো ফিনেয়া, কত আশা করে' আমি তোমার আরাধনা করেছিলুম। তার প্রতিদানের আমি সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলাম না কি? আমার পরিশ্রমের পুরস্কার আমি কি পেয়েছি তাও তুমি জান একটা গুরুগম্ভীর শপথের দ্বারা তিন বৎসর কাল নীরব থাক্‌তে তুমি আমাকে বাধ্য করলে। এই দণ্ডাজ্ঞা আমি এতদিন অবিরাম পালন করে এসেছি। এখন তুমি যে দণ্ড ভোগ করছ, তোমার নিষ্ঠুরতার দরুণ তার চেয়ে বেশী দণ্ড তোমার প্রাপ্য হলেও, আমি তোমার হয়ে ডিউক বাহাদুরের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমি সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে বলছি; আমার আরোগ্যের জন্য যে পুরস্কার অঙ্গীকৃত হয়েছিল সেই পুরস্কার তোমারই প্রাপ্য। মহামহিম ডিউক বাহাদুরের নিকট আমি অনুনয় করছি যেন ঐ পুরস্কারের টাকা যৌতুকস্বরূপ তোমাকে দেওয়া হয় এবং তিনি যেন তোমার পাণিগ্রহণ করতে আমাকে অনুমতি দেন। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে তুমি আর একটু সাবধান হবে, আর একটু সহজ-বশ্য হবে।"

ডিউক ও তাঁর সভাসদ্‌বর্গ সকলেই লেলিওর সম্ভাষণের প্রশংসা করিলেন। ডিউক বাহাদুর ফিনেয়াকে এক লক্ষ টাকা দিবার হুকুম ক'রলেন। বলিলেন, লেলিওর আরোগ্য সাধন ফিনেয়া দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। নাইটেরও পদোন্নতি হইল; লেলিও ডিউকের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়া উঠিলেন। খুব ঘটা করিয়া বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। ডিউক নাইটকে তাঁহার রাজধানী ফেরারায় বাসস্থাপন করিতে সম্মত করাইলেন। লেলিও ফিনেয়ার সহিত সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

মানসী ও মর্ম্মবাণী

অভিমত

(ছোট গল্প)

[শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়]

সেদিনের বর্ষাসন্ধ্যা আমাদের কাছে একটা বড় সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল।

জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে আমাদের সান্ধ্য অধিবেশন সন্ধ্যার প্রথমেই বস্‌ত আর কোন কোন দিন তা ভাঙতে দশটা বেজে যেত। সেখানে আমাদের চা পান, গান, তর্ক সকল রকমই বেশ জোরের সঙ্গেই চলত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা থেকেই খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছিল—বাইরে শব্দময়ী ধরিত্রীর সকল শব্দ বৃষ্টিপাতের অবিশ্রাম ঝম ঝম শব্দের নীচে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আমরা সকলেই চুপ করে বসেছিলাম। আমাদের মধ্যে নলিন ছিল গায়ক এবং কবি—সে একটা গান গাইতে গেল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের বিশ্রী শব্দে গানটা মোটেই সুশ্রী শোনাচ্ছিল না; কাজেই গান বন্ধ করে হারমনিয়ামটা কোল থেকে নামিয়ে পাশে রেখে বল্‌লে—"এস আজ শুধু গল্প করাই যাক্।"

কথায় কথায় আমাদের তর্কের গতি ক্রমে পড়ল নারীর অন্তরের সম্বন্ধে। নলিন বল্‌লে—যে নারীর ভালবাসাটা কখনও বিবাহের গণ্ডীর উপর নির্ভর করে না - তার অনন্ত উৎস স্থান কাল পাত্র না মেনে ইচ্ছামত দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বীরেন ছিল একজন সমালোচক। সে বল্লে—"তাহ'লে তুমি বলতে চাও যে হিন্দুদের বিয়েতে স্ত্রী স্বামীকে প্রকৃত ভালবাসতে পারে না ?"

নলিন মাথা নেড়ে বল্লে—"ঠিক তাই—লৌকিক ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান কখনও অন্তরের প্রেরণা আনতে পারে না।"

বীরেন একটুখানি সরে এসে বললে—"তবে শোন—তোমার কথার প্রতিকুল একটা প্রমাণ আমি জানি—তা বলছি।"

সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। বীরেন খুব ভালো গল্প বলতে পারত—তার গল্প শোনবার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে রইল।

বীরেন বলতে আরম্ভ করলে—"দেখো আমিও বরাবরই নলিনের মতই ছিলাম আর বলতাম যে দুটো শাস্ত্রের মন্ত্র দিয়ে বিয়ে দিলেই হৃদয়ের মিলন সম্পন্ন করা হয় না। কিন্তু আমার সে ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেছে, আর তার সঙ্গে কিরকম লাঞ্ছনা পেয়েছি তাও বল্‌ছি।

তখন আমি আই-এস্-সি পড়ি। আমি মেসে থাকতাম—তার পশ্চিম দিকে কেবল একখানা ঘর ছিল। আর সেই ঘরে আমি অন্য দুজন ছেলের সঙ্গে থাকতাম। সেই ঘরটার পাশেই একখানা একতলা বাড়ীতে একজন লোক থাকৃত। সে নাকি কোন পাটের গুদামে কাজ করৃত, সারাদিন বাড়ী থাকত না। তার নাম ছিল যতীন।

আমার ঘরখানা ছিল তেতালায় আর দোতলায় ও এক-তলায় যথাক্রমে 'সিক্‌রুম' ও রান্নাঘর ছিল। তার স্ত্রীকে আমরা জান্‌লা দিয়ে প্রায়ই দেখতে পেতাম—কি সুন্দর মুখখানি তার—সমস্ত মুখে কি একরকম করুণ কোমলভাব মাখানো।

আমাদের সুপারিটেণ্ডেন্টের নিষেধ ছিল যেন ওদিকে না তাকাই। আমরাও বড় তাকাতাম না, তবে যখনই নিজের অজ্ঞাতসারে যেদিকে দৃষ্টি গেছে, তখনই দেখেছি যে বসে বসে বই পড়ছে কিংবা সংসারের প্রয়োজনীয় কাজ করছে।

যতীন ছিল মাতাল। অনেক রাত্রে বাড়ীতে এসে কড়া নাড়ত আর যদি দরজা খুলতে একটু দেরী হত, তাহলে স্ত্রীকে প্রহার করত। কাঁদবার অধিকারটুকু ছিল না—তাহলে প্রহারের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে যেত। তবুও সময়ে সময়ে যখন নীরবে সহ্য করতে না পেরে সে চাপা কান্না তুলত, অমনি তার মাতাল স্বামী আরও বিষম প্রহার করত। কত রাত্রে তার করুণ ক্রন্দন আমাদের নিস্তব্ধ 'মেস' কাঁপিয়ে তুলত, তা বলা যায় না। প্রায়ই মাঝরাত্রে শুন্‌তে পেতাম তার রুদ্ধ ক্রন্দন আর প্রহারের শব্দ—আমাদের চঞ্চল করে তুলত—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমুতে পারতাম না—চুপ করে বসে বসে ভাবতাম, হিন্দু ঘরের স্ত্রী কি এম্‌নি করেই জগতে দুঃখ পেতে এসেছে—সেই রামের রাজত্বকাল থেকে ত এ দেশের নারীরা স্বামীর স্বেচ্ছ অত্যাচার নীরবে অম্লান বদনে সহ্য করেই আসছে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মাথা তোলবার অধিকার নেই। যত কিছু শাস্ত্রপুরাণ—সবগুলো নারীর অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে !

তার সম্বন্ধে আমার কৌতুহল বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। সে শিক্ষিতা, সে কেন এমনি করে মাতাল স্বামীর পশুবৎ অত্যাচার সহ্য করে—এই কথাটাই কেবল ভাবতাম। প্রায়ই দেখতাম সে স্বামীর একটা সামান্য আদেশ পালন করবার জন্য তার মন বাক্য উৎসর্গ করত—তার সকল ক্রটী সংশোধন করে—সকল অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করে তোলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে সেবা করত। আমি ভাবতাম যেখানে সার্থকতা নেই, সেখানে কার্য্যের প্রয়োজন কি। তখন বুঝিনি, ভালবাসাটা নারীর সাধারণ হৃদয়বৃত্তি—কোন ফলের প্রত্যাশা করে। তারা ভালবাসে না।

একদিন সকাল বেলা দেখি তাদের বাড়ীতে কিসের একটা পূজা হচ্ছে। মেয়েটী গরদের কাপড় পরে পুরোহিতের সাম্‌নে বসে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। ঝির কাছে খপর নিয়ে জান্‌লাম স্বামীর মঙ্গলের জন্য সাবিত্রীপূজা হচ্ছে। শুনে আরও বিস্মিত হলাম। যে স্বামী স্বামীত্বের বিসর্জ্জন দিয়ে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করে—তার স্ত্রী সেই সমস্ত অসার্থকতা মুছে—এমনি করে ! মনের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তার প্রতি কেমন একরকম ভক্তির উদয় হল।

সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে যতীন বোধ হয় সমস্তই জানতে পেরেছিল। তারই মঙ্গলের জন্যই যে পূজা করা হয়েছিল, তা সে জেনে স্ত্রীর প্রতি খড়্গ হস্ত হয়ে উঠল। আশ্চর্য্য এই যে এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও সে বললে না কেন এ পূজা হয়েছিল প্রতিদিনের মত সেদিনও নীরবে সহ্য করতে লাগল। সেদিন প্রহারটা গুরুতরই হয়েছিল বোধ হয়, তাই অজ্ঞান হয়ে পরদিন সারাক্ষণ পড়ে রইল। স্বামী আর দুদিন বাড়ী এল না।

তারপর আমি কি রকম লাঞ্ছনা পেয়েছিলাম, তাই বলি। এমনি একদিন রাত্রে প্রহারের ও ক্রন্দনের শব্দ শুনে আমরা তিনজন জেগে উঠলাম। আমার আর সহ্য হচ্ছিল না; চেঁচিয়ে বলে ফেললাম—"মার বেটাকে, আর একজন বললে—"কালই আমি পুলিশে খবর দেবো। এমনি করে তিনজনে মিলে খুব গাল দিতে লাগলাম। কিন্তু তাতে ফল কিছু হ'ল না।

পরদিন সকালে সামনের রাস্তায় পায়চারী কর্‌ছি, যতীনের বাড়ীর ঝি এসে বল্‌লে—"আপনাকে একবার মা ডাকছেন।"

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"আমাকে ?"

সে বল্‌লে—"হাঁ।

আমি ভাব্‌লাম কাল আমাদের কথা শুনে হয়ত তার প্রতি অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য আমাদের সাহায্য চাইবে—আর বোধ হয় সে সহ্য করবে না।

ঠিক বিপরীত! আমি গিয়ে দাঁড়াতেই যে দরজার পাশ থেকে নির্ভীক স্বরে বল্‌লে—'আপনারা পাড়াশুনা কর্‌তে এসেছেন, পড়াশুনা করবেন—পরের খপরে এত দরকার কি ? আমাদের বাড়ীতে যাইহক না কেন, আপনাদের তাতে হাত দেবার কি অধিকার আছে ? আর কখন যদি এমন করে বল্‌তে যাবেন; তাহলে আপনাদের সুপারীটেণ্টকে জানাব, যাতে তিনি আপনাদের এ বিষয়ে একটু শিক্ষা দেন। আর মনে রাখ্‌বেন, যাঁকে কাল রাত্রে আপনারা গাল দিচ্ছেলেন, তিনি যেই হন না কেন আমার স্বামী ত—তার সম্বন্ধে আর কোন কথা আপনারা কইবেন না—আমি কোন কথা শুন্‌তে ইচ্ছা করি না।"

এই কথা শুনিয়া একজন বন্ধু বল্‌লেন—তুমি সেই একটা মেয়ের কথায় একেবারে ভয় পেয়ে গেলে, কোন কথা শুনিয়ে দিতে পার্‌লে না ?"

বীরেন সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লে—"আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে আবার বল্‌লে—'দাঁড়িয়ে থাকবেন না, চলে যান্। আর একটা কথা বলে দি—এ দিকের জান্‌লা আর কখন খুলবেন না। যান্।'

আমি এত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম, যে আমার মুখে আর কথা বার হল না—নির্ব্বাক হয়ে ধীরে ধীরে চলে এলাম। সেই থেকে না জেনে শুনে আমি আর কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করে তাকে নির্ব্বোধ ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে যাই না।"

প্রত্যুত্তরে নলিন বোধ হয় কিছু বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু বীরেন আর ক্ষণ মাত্র অপেক্ষা না করেই ঝড়ের মতই সেই বাদলা রাতে বা'র হয়ে গেল।

আধুনিক বঙ্গ-নাট্যশালা

[শ্রীরাধাকিশোর কর লিখিত]

আজ কাল দেখি সব নূতন এক্টার,
বিকট চীৎকার সার ভীষণ হুঙ্কার।
পাঁয়তাড়া কসে আর তুড়ি লাফ খায়,
কি যে বলে মাথা মুণ্ড বোঝা নাহি যায়!
গ্রীক কি ল্যাটিন কিবা নিজ মাতৃভাষা,
বুঝিবার চেষ্টা করা কেবল দুরাশা।
বাঙ্গালীর মুখে বাংলা বুঝিতে না পারি,
নিজ মনে মনে হায় সরমেতে মরি।
এক্টারের মুখ যবে করি নিরীক্ষণ,
নাহি দেখি তাহে কোন ভাবের স্ফুরণ।
কাঁদিছে, কি হাসিছে, কি করিয়াছে ক্রোধ,
মুখ দেখি কোন মতে নাহি হয় বোধ।
ঠিক যেন দেখিতেছি "বিজু থিয়েটার",
ভেদ মাত্র তুড়ি লাফ, হুঙ্কার, চীৎকার।
কিবা রণে, কি গহনে, কিবা প্রিয়া কাছে,
গলাবাজি লাফালাফি সব তাতে আছে।
বলিহারী শতবার দর্শক মণ্ডলী,
যত উচ্চ চীৎকার তত করতালী।
তারপর, নৃত্যরঙ্গ—কিবা চমৎকার,
কেমন বর্ণিব বল কি তার বাহার!
'সার্কাস্ দেখিতেছি কিম্বা থিয়েটার,
পদে পদে এই ভ্রম ঘটে অনিবার।
সমগ্র শরীর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের,
সুতজিম সঞ্চালন—লক্ষণ নৃত্যের।
আধুনিক নৃত্য এক বিকট ব্যাপার
ভাবিয়া না পাই কোথা তুলনা তাহার।
দপাদপ্ ধপাধপ্ নাচের কি দাপ,
ধূলায় আঁধার সব একি হল বাপ।
সম্মুখ আসনে বসে হেন সাধ্য কার,
তিলমাত্র নাকের রুমাল খোলা ভার।
ডাম্বেল ভাঁজে কেহ, কেহ ঘুষি ছোড়ে,
লাফ দিয়া ওঠে কেহ অপরের ঘাড়ে।
কভু ওঠে, কভু বসে, কখনও শয়ন,
কুস্তির কসরৎ কভু, কভু বা লম্ফন।
ক্ষুদ্র জীব আমি কিবা করিব বর্ণন,
সার্কাস থিয়েটার একত্রে মিলন।
এ ক্ষেত্রেও ত্রুটি নাই—ঘন করতালি,
উপরন্তু ফুলমালা, তোড়া দেয় ডালি।

— - —

নিবেদন

কলা-বিদ্যা শিখিবার প্রধান মন্দির,
তার অধোগতি দেখি, হয়েছি অস্থির।
প্রাণের আবেগে তাই দু'কথা বলিনু
আরও বলিবার আছে—ভয়ে সম্বরিণু।
ক্ষমা কোরো নাট্যশালা-কর্তৃপক্ষগণ,
বড় দুঃখে এ কাহিনী করিনু বর্ণন।
ইতিমধ্যে পথে যদি না খাই প্রহার,
প্রকাশিব আরও যাহা আছে বলিবার।

(নাট্যমন্দির)

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, পি-এচ্-ডি]

জগতের সর্ব্বত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্কীর্ণতা আছে। প্রথমতঃ অনেকের মতে বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লব্ধ হয় তাহাতে বিদ্যা পূর্ণতা লাভ করে না; ছাত্রকে নিরূপিত পাঠ্য পাঠ ও অধ্যাপকের মতগুলিকে আবৃত্তি করিতে শিখিতে হয়—ইহাতে তাহার নিজের চিন্তাশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। এই দলের ব্যক্তিরা বলেন যাঁহারা জগতে গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই—যথা "জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, হারবর্ট স্পেন্সর্" ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষায় এবম্প্রকারের দোষ থাকিলেও একটি বিশেষ সুবিধা আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় চিন্তাবৃত্তিকে একটা Training দিয়া দেয় যাহাতে লোক জীবন সর্ব্বকর্ম্মে যুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে পারে। দ্বিতীয় দোষটী অতি মারাত্মক—এবং এ দোষসংশোধনের আর এখন পথ নাই। এই দোষটীর মূল কারণ এই যে, সর্ব্বত্রই বিদ্যালয়গুলি হয় গভর্ণমেণ্টের অথবা কোন সম্প্রদায়ের, আবার সর্ব্ব বিদ্যাপীঠ ধনিশ্রেণীর অর্থে চালিত। কোন বিদ্যালয়ের একটা স্বাধীনমতের উদ্ভব হইতে পারে না। Upton Sinclair এর Goose step in Education নামক পুস্তক পাঠ করিলে এই দোষটী কি তাহা ভালরূপে বোধগম্য হইবে। সে সব বিদ্যালয় গভর্ণমেণ্ট পোষিত তথায় তাহার স্বার্থবিরুদ্ধ কোন প্রকার শিক্ষার বা মতের চর্চ্চা হইতে পারে না; যে সব বিদ্যালয় সাম্প্রদায়িক, তথায় তৎ সম্প্রদায়ের গোঁড়ামিই কেবল শিক্ষা দেওয়া হয়। তৎপরে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় এ সব বিষয়ে স্বাধীন অথচ ধনিশ্রেণীর দ্বারা পোষিত তথায় যে শ্রেণীর স্বার্থবিরুদ্ধ কোন প্রকার শিক্ষা চর্চ্চা হইতে পারে না। ফলে আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি "গোলামখানায়" পর্য্যবসিত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকালের বিদ্যাপীঠ হইতে বর্ত্তমানের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপদ্ধতি নিকৃষ্ট। ইহাতে মানুষ গঠিত না হইয়া গোলামেরই সৃষ্টি হইতেছে।

আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এইটি প্রধান দোষ—তথায় Capitalist শ্রেণী-পরিপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রের চিন্তার স্বাধীনতার উদ্বোধন না করিয়া তাহাকে গোলামে পরিণত করা হয়। এইজন্য অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্ম, সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনৈতিক, radical মতাবলম্বী অধ্যাপকের স্থান নাই। সাম্প্রদয়িক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গোঁড়ামীর শ্রাদ্ধ করা হয়, আর Capitalist পোষিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ধনিশ্রেণীর অর্থনীতি—বিজ্ঞানই যথার্থ তথ্য, তাহাদের স্থাপিত সমাজই মানুষের চরমোন্নতি। এই সব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার radical মতের চর্চ্চা হইতে পারে না বলিয়া কতকগুলি একদেশদর্শী Fanatic বাহির হয়। এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সর্ব্বত্রই সঙ্কীর্ণতার দুর্গস্বরূপ হইয়াছে। ইহার ফলে স্বাধীনদেশ সমূহের বেশীর ভাগ ছাত্রবৃন্দ Chauvinist রোগাক্রান্ত। ইহাকে তাহারা স্বদেশপ্রেম নামে অভিহিত করে।

আমেরিকার বিদ্যালয়ে ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে রাজনীতির আলোচনা হয়। জাতীয় পর্ব্ব উপলক্ষে অথবা Semster শেষ হইলে বা কলেজ বন্ধ হইলে Chapel এ সমবেত ছাত্রবৃন্দ জলদগম্ভীরস্বরে জাতীয় সঙ্গীত গান করে। কলেজে জাতীয় ভাবের বিশেষ আধিক্য; কিন্তু তাহা শাসকশ্রেণীর জাতীয় ভাব ও রাজনীতিক মতবাদ; বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার প্রস্ফুরিত হইতে পারে না, যথা সোসালিজমের চর্চ্চা করিতে আপত্তি নাই কিন্তু তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি করিলেই Dean এর কাছ হইতে ধমকানি খাইতে হয়।

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র নব্য শিক্ষার ফলে মানুষের মন এক ছাঁচে ঢালা হইতেছে। আধুনিক বিদ্যা আন্তর্জাতিক,

তজ্জন্ত শিক্ষিত ব্যক্তির মন ও চিন্তাও তদ্রূপ স্বদেশের গণ্ডীর বাহিরে যাইতেছে। সেইজন্য একজন জাপানী, একজন আমেরিকান, ও একজন ইউরোপীয়, এই নব শিক্ষার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নিজেদের বোধগম্য করিতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে বলিয়া মনে করে না। তথাপি প্রত্যেক দেশের শিক্ষায় একটা বিশেষত্ব আছে। আমেরিকার বিদ্যার মধ্যে দিয়া যে World view শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা ইংলণ্ড, বা জার্ম্মাণি, বা ফ্রান্স হইতে পৃথক্। ইহা বিভিন্ন দেশে বিদ্যালাভ ও সেই সব দেশের সাহিত্যের সহিত পরিচয় না থাকিলে বোধগম্য হওয়া দুরূহ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক বিজ্ঞানই (Concrete Science) পড়ান হয়, তথায় কোন গোল নাই। কিন্তু Abstract Science যথা সামাজিক বা অন্য প্রকারের দর্শন শাস্ত্রে ভিন্ন মুনির ভিন্ন মত ত আছেই, তদ্ব্যতীত বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক, সামাজিক, ও অর্থনীতিক সমস্যার আবর্ত্তে পড়িয়া ঐ সব দর্শনে তদনুযায়ী বিশেষ প্রকারের World-view সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা—আমেরিকার প্রাচ্যভূখণ্ডের সভ্যতার উপর যে মত দেখা যায় ইউরোপে সেরূপ নয়। আমেরিকায় জাতিসমস্যা (race-Problem) আছে, তাহার বিষময় ফলও তদ্দেশের সভ্যতার সর্ব্ব অঙ্গেই প্রবেশ করিয়াছে। আমেরিকানের মনে ও চিন্তায় তাহা প্রতিনিয়তই প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু জার্ম্মাণিতে সে সমস্যা নাই বলিয়া সে স্থানে প্রাচ্য সভ্যতা ও জাতিসমূহের সম্বন্ধে অন্য ধারণা। আমেরিকায় Colour problem আছে বলিয়া তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তথাকার সমাজ রং বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সমাজতন্ত্রের world view ও তদনুরূপ। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্ম্মাণিতে ঐ সমস্যা নাই বলিয়া জাতিতত্ত্ববিষয়ে অন্য প্রকারের ধারণা। ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্যের রং সমস্যা আছে বলিয়া তথাকার জাতীয় জীবনে রং বিভীষিকা এত প্রবল যে আমেরিকান জাতি পৃথিবীর মধ্যে একটা সৃষ্টিছাড়া জাতি হইয়াছে। এ বিষয়ে আমেরিকানেরা নিজেরাই বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু অন্যদিকে এই বৈষম্যের জন্যই আমেরিকায় radicalism এর প্রাবল্য। ফ্রান্স ও বল্‌শেভিক রুষ ছাড়া আমেরিকা বোধ হয় জগতের তৃতীয় দেশ যথায় radical চিন্তা জনসমাজে বর্ত্তমান আছে।

আমেরিকার শিক্ষা অন্যান্য দেশ হইতে স্বভাবতঃই নূতন ভাবপ্রসূত। তথাকার পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবস্তু ও চিন্তাতে আধুনিক ভাব বর্ত্তমান। তথাকার অধ্যাপকেরা এই সব বিষয়ে ইংলণ্ডকে ঠাট্টা করেন কারণ ইংলণ্ডে পুঁথিপাতি সবই মান্ধাতার আমলের! আমেরিকা নূতন দেশ বলিয়া প্রাচীন সংস্কারবদ্ধ নয় এবং আধুনিক জ্ঞান ও ভাবকে সহজেই জীর্ণ করিতে পারে। এই জন্যই আমেরিকা যতই অগ্রগামী হউক না কেন এক জায়গায় তাহার একটা গণ্ডি আছে, radicalism তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর (আমেরিকায় ধনী শ্রেণীই শাসক যথায় plutocracy, বর্ত্তমান) স্বার্থ ও সংস্কার বিরুদ্ধ মতবাদ আলোচিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান সমাজ ও state যে প্রকারে অবস্থিত তাহাকে radical অবস্থায় রূপান্তরিত অথবা radical মতবাদ প্রচার করা আইন বিগর্হিত কর্ম্ম। এই জন্যই স্বাধীন চিন্তা বা মানবের স্বাধীনতা পূর্ণ ভাব তথায় স্ফূর্ত্তি পাইতে পারিতেছে না। অবশ্য অন্যান্য দেশেরও এই অবস্থা।

The Monthly Massenger

গিন্নীর গুণপনা

(Mark Main অবলম্বনে)

[শ্রীতারানাথ রায়]

(১)

সহরে হুপিং কফ্ এত বেশী লেগেছে যে ছেলের মা'দের সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকতে হচ্ছে। সেদিন খুকুর মাকে বল্লাম খুকুর দিকে একটু নজর দিতে—

"আমি হলে কিন্তু অমন যা তা চিবুতে দিতাম না।"

"বেশ, বেশ, ব'লি চিবুলে ক্ষতিটাই বা কি ?"

খুকুর মা প্রতিবাদটা কবুল বটে কিন্তু ওদিকে খুকুর হাত থেকে চুষিকাঠিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। হাজার সুযুক্তি দাও, বিনা তর্কে, বিনা প্রতিবাদে মেয়েরা তা সংজে গ্রহণ করবে না—বিশেষ করে বিবাহিত মেয়েরা।

"তোমার চুষিকাঠি এমন পুষ্টিকর কিছু নয় যা কচিদের মুখে গুঁজে না দিলেই নয়।"

তবু প্রতিবাদ—তবু তর্ক।

"তোমরা পণ্ডিত মানুষ, বেশীই বোঝ। আমার বুঝ আমি বুঝি। জান না সেদিন ওবাড়ীর ঠান'দি এসে বলে গেল এতে উপকার আছে ?"

"যেমন তোমাদের ঠান'দি, তেমনি—"

"তেমনি আমি ? বেশ, বেশ ! আমিও তেমনি। আমি ত আর তোমার মতন নই। খুকু চুষি খুব চুষবে, একশ বার চুষ্‌বে।"

"খুব হয়েছে, যথেষ্ট বুদ্ধি খরচ করেছ, কিছু জিইয়ে রাখ। এবার বাজার থেকে এক গাড়ী লকড়ি এনে দেব তাই চুষিও !"

"ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে—আফিসে যাচ্ছ আফিসে যাও, আমায় আর জ্বালাও কেন ! বাবা ! তর্ক, তর্ক, তর্ক !"

আমি আফিসের দিকে রওনা হ'লাম। খুকু তখন মা'র কোলে কচি হাতে তার চুল নিয়ে খেলা করছে। যাবার সময় গিন্নীকে একটা কটাক্ষ করে গেলাম। গিন্নীও খুকুর পিঠে দুম করে এক কিল বসিয়ে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

(২)

রাত্রে খেতে বসেছি। গিন্নী ব্যস্ত হয়ে এসে বল্লে—সর্ব্বনাশ হয়েছে !

"কি—কি সর্ব্বনাশ !"

হাত থেমে গেছে। গিন্নীর ভীতিব্যঞ্জক ব্যস্তভাব দেখে আমিও একটু ভীত হ'লাম।

"খুকুরও বুঝি—"

"হুপিং ?"

"ওমা আমার কি হবে ?"

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিলাম। ঝি খুকুকে আন্‌লে। খুকু এসে আমার চশ্‌মা নিয়ে খেলা করতে লাগল।

একটু খুক্ করে কাশি। খুকুর মা চম্‌কে উঠে আমার দিকে তাকালে। মুখ ফ্যাকাশে, সাম্‌লে নিয়ে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিন্নী তাড়াতাড়ি খুকুর জামা বিছানা সব ঠিকঠাক করতে লাগল। পাশের ঘরে আমাদের বিছানা পাতা হ'ল। খুকুর মার কি যেন হঠাৎ মনে পড়তেই একরকম দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আমিও নামলাম। গিন্নী বল্লে—ঝি যে তুকতাক জানে, ওকে ছাড়া হবে না। কাজেই খুকুর মা আবার আমাদের বিছানাপত্র সরিয়ে সেখানে ঝির জন্য জায়গা করে দিল।

(৩)

সবাই ঘুমুচ্ছে। আমিও। খুকুর মা হঠাৎ আমায় ঝাঁকুনী দিয়ে বল্লে—

"ওঠ ! ওঠ ! দেখত, খুকু অমন করে ঘুমুচ্ছে কেন ?"

"ঘুমুবে না ত কি হবে, অমনি ঘুমোয়!"

"ঘুমোয় ত, আমি কি আর জানিনে যে ঘুমোয়, কিন্তু এ ঘুমে আর সে ঘুমে? দেখ, ঠিক—ঠিক সমান তালে নিঃশ্বাস পড়ছে—কি হবে?"

"আহা! নিঃশ্বাস অমন সমান তালেই পড়ে থাকে।"

"সেত পড়ে, তবু—নাঃ, ঝি মাগীকে দিয়ে কিছু হবে না, এদিকে আমার বিপদ আর ও মাগী ফোঁস্ ফোঁস্ করে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছেন।"

আবার ঘুমুলেম।

খুকু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দু'বার কেশে উঠ্‌ল।

"ওগো! ডাক্তার কেন আসে না! ঝি—ঝি ওঠ্ না! শীগ্‌গির উঠে জানালাটা এঁটে দে ভাল করে।"

ঝির নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হ'ল না দেখে নিজেই উঠলাম। জানালা দরজা পরীক্ষা করে দেখলাম ঠিকই আছে।

গাড়োয়ান ফিরে এসে বললে, ডাক্তারের অসুখ। খুকুর মা আমার দিকে নিরাশভাবে তাকিয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—

"যা ভেবেছিলাম! কপাল—কপাল! আগে ত ডাক্তারের অসুখ কক্ষণো হয় নি। দেখ্ ঝি তোর জন্যই এমন হ'ল—কালই তোকে দূর করে দিব।"

খুকুর মা কান্না জুড়ে দিল। হঠাৎ বলে উঠল—ডাক্তার ওষুধ ত পাঠিয়েছে?"

"এই ত ওষুধ।"

এইত ওষুধ! দাও আমাকে! কি যে হয়ে যাচ্ছ তুমি দিন দিন। হুঁস্ নেই, এখন এক মিনিটের দাম একদিন। কিন্তু ওষুধ পাঠিয়েই বা কি হ'ল। ও রোগ ত সারবে না।"

গিন্নী আবার কাঁদতে বসল। মেয়েদের অশ্রুজলীর বাহাদুরী আছে।

"আহা অকল্যাণ কর কেন—যতক্ষণ শ্বাস—"

"ততক্ষণ আশ! ডাক্তার লিখেছে ঘণ্টায় ওষুধ এক চা চামচ করে। ঘণ্টায় এক চামচ! যেন কত বছর আমাদের সামনে! নাও, তাড়াতাড়ি কর! চা চামচ নয়, বড় চামচ করেই তাড়াতাড়ি।"

"যাদু ঘুমুচ্ছে! ঘুমোও যাদু ঘুমোও! দেখ, দেখ—বাছা বুঝি বাঁচবে না। আধঘণ্টা অন্তর বড় চামচ করেই ওষুধটা দিও। ওর বেলেডোনা চাই, একোনাইটও চাই। যাও তোমাকে দিয়ে কুটোটি পর্য্যন্ত ভাঙ্গা হবে না, আমাকেই সব করতে হবে! কি অদৃষ্ট নিয়েই এসেছি—"

গিন্নীর কথা শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। গিন্নী ডেকে উঠিয়ে বললে—

"বলি, ঘুমুচ্ছ যে বড়, দরজা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে।"

বিরক্ত হয়ে উঠলাম। শব্দে খুকুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজা এঁটে দিয়ে আবার ঝিমুচ্ছি। কাণে গেল—

"একটু পুরাণো ঘি হ'লে হ'ত, কে বা আন্‌বে নীচে থেকে!"

ঘুমের চোখে নাম্‌তেই মেনীর গায়ে পা পড়তেই মার্জ্জার রত্ন তীব্র প্রতিবাদ উঠল। উত্তরে লাথি দিতে গিয়ে দেখি সামনের চেয়ারটা উলটে গেল।

বেশ চেয়ারটার দফা সারলে? মেনীরও বোধ হচ্ছে—"

কিছু বোধ হচ্ছে না। ঝিকে ডাকলেই পার, আমি এসব পারি না।"

"পার না—এই সামান্য কাজটুকু।"

ঘি এনে দিয়ে আবার ঘুম!

"আহা একি ঘুমোবার সময়; ওঠ, উঠে একটু আগুন করে দাও; শেক দিতে হবে।

উঠলাম। টিকে ধরিয়ে নীচেই পরবর্ত্তী হুকুমের প্রতীক্ষায় বসে রয়েছি।

"নীচে বসে থেকো না, বিছানায় উঠে একটু ঘুমিয়ে নাও।"

বিছানায় যাচ্ছি এমন সময় খুকুর মার আবার ফরমায়েস্—

"ওষুধটা দিয়েই ওঠ!"

ওষুধ দিলাম। আবার ঘুম। আবার আহ্বান—পুলটিস তৈরী করে দিতে হবে। কি করি! তাও দিলুম! ঝিটা রীতি ও নিয়মমত ঘুমাচ্ছে।

"ওগো টিকেটা নিভে গেল।"

টিকে জ্বালিয়ে দিলাম। ওদিকে খুকুর মা ওষুধ ১০মিনিট পরপরই দিতে সুরু করেছে। পুলটিস দিয়ে দিয়ে খুকুর বুকে ফোস্কা পড়বার জোগাড়। ভোরটার সময় আগুন

আবার নিভে গেছে। গিন্নী বল্লে নীচে গিয়ে ভাল করে আগুন নিয়ে এসে! আমি বল্লুম—ঢের হয়েছে। সমস্ত রাতের অনিদ্রা ও অবসাদে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লুম। কয়েক মিনিট গেছে। আবার চীৎকার—মেয়েরা যে এত চীৎকার করতে পারে এইবার আমার অভিজ্ঞতা ভাল করে হ'ল।

"সব শেষ—ওগো সব ফুরুল! খুকু যে ঘামছে। কি হবে? কি হবে? কি করব গো?"

"কি আর করবে—আরও এক রাত পুলটিস দাও! যে কাপড় জড়িয়েছ বাছার এতে ঘাম বের না হয়ে কি করে? যাও একটু হাওয়ায় নিয়ে যাও!"

"জ্বালিও না—জ্বালিও না, দৌড়ে ডাক্তারের কাছে যাও! নিজেই যাও, গিয়ে বল মরুক বাঁচুক তাকে আস্‌তেই হবে।"

উপায় নেই। ডাক্তার বেচারাকে জোর করে তুলে আনলাম। খুকুকে দেখে তিনি বল্লেন—কিছু হয় নি।

গিন্নী ক্ষেপে আগুন! আড়াল থেকেই "ডাক্তার না চাই!" বলে দুম্ দুম্ করে নীচে নেমে গেল।

কি একটা ওষুধ দিতেই খুকু খুব কাশ্‌তে সুরু করে দিল। কাঠের গুটি দুই আঁশ বেরিয়ে এল।

'ডাক্তার তুমি কি জান? আমার গিন্নি বলে দেছে চুষি কাঠিতে ঢের ঢের উপকার!

ডাক্তার চলে গেল। খুকুর মা চায়ের বাটি হাতে করে এসে বল্লে—না চা খেয়ে ঘুমোও।

"ডাক্তার বল্লে মাথার চিকিৎসা দরকার?"

"খুকুর?"

"না—তোমার।"

গিন্নী ছোট একখানি কীল দেখিয়ে খুকুকে চুমু দিতে দিতে চলে গেল। বেলা দশটা পর্য্যন্ত আমার ঘুম গিন্নী আর দয়া করে ভাঙ্গায় নি।

পাগলা

[শ্রীসরোজবন্ধু রায়]

সে সেই ছোট্ট নদীটির তীরে কামিনী গাছতলায় ব'সে তার-ছিন্ন বীণাটি ল'য়ে বাজাত আর প্রকৃতির উন্মুক্ত দৃশ্যগুলি দর্শন ক'রে হৃদয়ের কোন এক মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রত। যখন ছোট্ট ছোট্ট তারাগুলি সেই সুনীল গগণে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হাসে তখন কোন্‌ রাজ্যের কোন্‌ ছবির কথা তার মনে প'ড়ে যায়! আবার যখন নদীর ঢেউগুলি হাস্‌তে হাস্‌তে নাচ্‌তে নাচ্‌তে তার পায়ের কাছ দিয়ে চ'লে যায় তখন তার মন কোন্‌ ভাবনায় কেঁদে উঠে। সে এমনি ক'রে প্রত্যেক দিন নদীর তীরে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌ত আর আপন মনে কি যেন ভাবত। সংসারের লোক তার কোন খোঁজ খবর করত না সেও সংসারে কোনরূপ লিপ্ত থাকৃত না—সবাই তাকে পাগলা বলে ডাকৃত সেও গম্ভীর ভাবে তাতে অনুমোদন করত। এমনি ক'রে যে কতদিন চলে গেছে তার ঠিক নেই। হঠাৎ বসন্ত সমাগমে যখন চারিদিকে একটা সঞ্জীবতার সাড়া পড়ে গেল। বসন্তের মধুর হিল্লোলে ভাসমান লোক-দিগকে যখন সে দেখ্‌ত তখন তার প্রাণের মাঝে অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতিগুলি মনে পড়ে যেত।—সে ভাবতে লাগল তার অতীতের জীবন, তার আনন্দের সময়, তার যশঃ মান ও অর্থের কথা। সে ভাবতে লাগল তার ত সবই ছিল, কিন্তু হায় বিধির রোষে সবই কোন কালের স্রোতে ভেসে চলে গেছে। তার আর কিছুই নাই—আছে শুধু তার নিজের জ্বালাময় জীবন ও তার স্ফূর্ত্তি বিহীন দিন গুলি—সে এমনি ক'রে ভাব্‌ত আর প্রাণের মাঝে গুমরে গুমরে কাঁদত। একদিন সে তার হৃদয়ের রুদ্ধ বাসনার প্রতিরোধ মানসে বীণাটি হাতে ল'য়ে আস্তে আস্তে তাতে করাঘাত করছে, নদীর ঢেউগুলি যেন তার দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে বিষাদের কান্না কেঁদে চলেছে,—বেসুরা বীণায় যেন কিছুতেই সুর বাঁধছে না—তখন তার নিষ্ফল জীবনের সাথে এরূপ নিষ্ফলতার চিত্র দেখে সে বিমর্ষ হ'য়ে ভাবতে লাগল। হঠাৎ কে যেন "পাগ্‌লা দাদা" কি হচ্ছে ব'লে তার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে তখন চমকিয়ে দেখে একটি পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা তাহার—সম্মুখে। তখন সে তাকে কোলে টেনে নিয়ে বলল—"কি দিদি, কি পাগলার কথা কেন?" এই বলিয়া তাকে আদর ক'রতে লাগ্‌ল—"কমলা আমার কোথায় ছিলি?" "আমার নাম কমলা নয়, বাণী—পাগলা দাদা!" বলে সে হাসতে লাগল। তখন তার মন ছ্যাৎ ক'রে উঠল ও ভাবল "ঠিক 'এত' সে নয়।" বালিকা রোজই আসত আর পাগলা-দাদার সাথে খেলা ক'রত, ফুল তুলে মালা গাঁথত আর তাকে পরিয়ে দিয়ে হাততালি দিয়ে হাসত। এমনি ক'রে তাদের জীবন বেশ আনন্দের মাঝে কেটে যেতে লাগল।

একদিন বাণী এলো না, দুই দিন, তিন দিন এমনি ক'রে বহুদিন চ'লে গেল, তাও বাণীর দেখা নাই। তার মন ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ল—সে তখন নানা জায়গায় খোঁজ করেও তাকে পেল না। এখন সে কামিনী ফুলের জন্য ব্যস্ত নয়, তার সঙ্গী বীণাটি এখন ধূলায় সমাচ্ছন্ন, তার আসনটি কর্দ্দমাক্ত, তবুও তার ভ্রূক্ষেপ নাই—সে 'বাণী বাণী' বলে ক্রমাগত ডাকতে লাগল।

* * * *

শ্মশানে আজ বড় ভীড়। জমিদার রামলোচন বাবুর একমাত্র দুহিতা আজ কালের কবলে শয়ান। চারিদিকে বিষাদের ঘনছায়া সন্নিবিষ্ট হওয়াতে শ্মশাণ ভয়ানক ভাব ধারণ ক'রেছে। আর দেরী নাই। ঐ যে জমিদারবাবু তার আদরের দুহিতার কমনীয় মুখে অগ্নি সংযোগ ক'রলেন। চিতাগ্নি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। এমন সময় কে এক উদ্‌ভ্রান্ত মানব "বাণী" "বাণী" ব'লে চিতায় বাণীকে দেখে বলল, "বাণী" পাষাণী তোর এই কাজ—এই ব'লে সে দ্রুতগতিতে শ্মশান ত্যাগ করে একদিকে চ'লে গেল—সকলে অবাক হ'য়ে পাগলার দিকে চেয়ে রইল।

* * * *

সেই থেকে পাগলাকে আর কেউ দেখতে পায় নি।

এখনও নদীটির তীরে সেই কামিনী গাছ র'য়েছে; তার তলায় ঐ যে ছিন্ন বীণাটি ধূলায় সমাচ্ছন্ন হ'য়ে সেইভাবে একধারে পতিত। ফুলগুলিও তার দুঃখে গাছেই শুকিয়ে যাচ্ছে। নদীর ঢেউগুলিও দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে আছড়িয়ে পড়ছে শুধু সকলকে এই ঘটনা বিহিত ক'রবার জন্য; প্রকৃতিও নীরব! সবাই আছে, নেই শুধু—পাগ্‌লা।

নাট্য-রহস্য

[সারাবার্ণাডের যৌবন-রক্ষা]

যেমন রাধা ও চন্দ্রাবলী না হইলে কৃষ্ণলীলার কথা হয় না, সেইরূপ সারাবার্ণাড আর প্যাতির কথা না হইলে রঙ্গলীলার কথা হয় না। আজ আমরা ইঁহাদের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা পাঠকগণের গোচর করিব।

সারা জন্মিয়াছেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ৬৭ বৎসর। তথাপি সারা সুন্দরী, সুন্দরী সারা এখনও যুবতী। নিজের যৌবন সারা নিজের গুণে বজায় রাখিতেছেন। তিনি স্বাস্থ্য-রক্ষায় যেমন সযত্না, তেমন সুদক্ষা। সারা মধ্যে মধ্যে একান্তে বিশ্রাম করিয়া থাকেন। সারা সচরাচর স্বল্প পরিচ্ছদেই তুষ্ট থাকেন, পোষাক পরিচ্ছদের জাঁক জমক আদৌ ভালবাসেন না। আহারেরও তাঁহার আড়ম্বর নাই। যে সকল দ্রব্য সহজে জীর্ণ হয়, সারা তাহাই আহার করিয়া থাকেন। সারা মাঠে ময়দানে বিশুদ্ধ-বায়ু সেবন করিবার জন্য ব্যস্ত। দুই তিন ঘণ্টাকাল তিনি প্রত্যহ মাঠ ময়দানে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে সাগরতীরে গিয়া নিভৃত নিকেতনে নিশ্চিন্তমনে কালযাপন করেন। সেখানে কোনরূপ আদব কায়দা রাখেন না। নগর জীবনের কায়দা কারখানায় যে, মানুষকে বিলাসী করিয়া তুলে! শস্যশোভিত শ্যামল ক্ষেত্রে প্রবীণা সারা এখনও নবীনার মত নাচিয়া বেড়ান। ঘাসের মাঠই যেন তাঁহার খাসের বাগান। অনেকেই বলেন এই সব কারণেই সারার স্থিরযৌবনা। সারার নিজের বিশ্বাসও এইরূপ।

সারা সদাই ক্রীড়া কৌতুকে থাকিতে ভালবাসেন। ক্রীড়া কৌতুকে মন তাজা থাকে, মন তাজা থাকিলে শরীরও তাজা থাকে; সারার ক্রীড়া কৌতুকও কিন্তু সারার মত। যাহা কাহারও নাই তাহা সারার আছে। সারার মত সারমেয়-স্নেহ অল্প রঙ্গিনীরই দেখিতে পাওয়া যায়। সারার এক এক কুকুর যেন এক এক রাজকুমার। এক এক কুকুরের যে খরচ হয়, আমাদের ভারতের এক এক কলেক্টারও সে খরচ করিতে পান না। সারার কুকুরের যত খরচ, বিভাগের কমিশনরেরও তত খরচ নহে।

কিন্তু সারার আবার কুমীর আছে। সারা কুমীর লইয়া ক্রীড়া করিতে বড় ভালবাসেন। সাপেও সারার সখ আছে। ক্লিয়োপেট্রা সাপ ভালবাসিতেন। সাপকে কাছে কাছে রাখিতেন। ক্লিয়োপেট্রা স্থিরযৌবনা ছিলেন। সর্পেও যৌবনে সারা ক্লিয়োপেট্রার সমান।

কিন্তু যৌবন রক্ষার জন্য সারা আর একটী প্রক্রিয়ার সাহায্য লইয়াছেন। তিনি গা হাত পা টেপাইবার জন্য লালায়িত। কোমলাঙ্গরা কোমল হস্তে সারার কোমলাঙ্গের মর্দ্দন করে, এরূপ পরিচারিকা সারার অনেক। সকলেরই বেতন অধিক।

ফলতঃ রঙ্গরাণী সারা সদা সর্ব্বদাই নিয়মানুবর্ত্তিনী,—কদাচ তিনি স্বাস্থ্য রক্ষায় উদাসীন নহেন, তাই প্রবীণা হইলেও আজ তিনি যুবতীর তুল্য আদৃতা! এ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের রঙ্গিনীগণের নিকট 'নিশার স্বপন তুল্য' তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্যাতির মজুরা

শ্রীমতী প্যাতি সভ্য জগতে 'সঙ্গীতেশ্বরী প্যাতি' নামে আখ্যাতা। ইনি রঙ্গের গায়কা অভিনায়িকা। সঙ্গীত প্রধান অভিনয়ে ইনি প্রথমা ও প্রধানা। পসারে প্যাতি অদ্বিতীয়া।

ইঁহার কাছে আর কেহই পেয়ালা পান না। প্যাতীর মজুরায় একটু বৈচিত্র্য আছে। তিনি সময় হিসাবে মজুরা করেন না, গীত হিসাবেও দক্ষিণা ল'ন না, গানে তান ধরিয়া—তানে তানে দাম লন, প্রত্যেক তানে একশত কুড়ি টাকা

নির্দ্দিষ্ট দর, যে গানে যত তান, সেই সেই গানেই তত একশত বিশ। প্যাতীর প্রত্যেক গানের তান হিসাবে দর আছে।

কিন্তু মজুরায় বোধ হয় ধারক রাখিতে হয়, সুর-ফাঁকতালে ত তাল-ফাঁকীও দেওয়া চলে, প্যাতী সকল রকমেই অদ্বিতীয়া, বয়সে আটান্ন বৎসর পার করিয়াও শ্রীমতী এখন অপূর্ব্ব শ্রীমতী; প্রবীণা হইয়াও যুবতী, রূপে রতি, গুণে সরস্বতী, এই তৃতীয় পক্ষের অর্দ্ধাঙ্গ, বয়সেও অর্দ্ধাঙ্গ; কিন্তু প্যাতীর সবই শোভা পায়, মজুরায় তিনি সাত রাজার ধন ঘরে পুরেন, রূপে কত ষোড়শী রূপসীকেও লজ্জা দেন, গুণে কত বৃহস্পতিকেও মুগ্ধ করিয়া রাখেন।

সঙ্গীতের রাজা স্যাণ্টলী

মিঃ স্যাণ্টলী ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক। ইয়োরোপে ইনিই এখন সঙ্গীতের রাজা বলিয়া আখ্যাত। সঙ্গীতের মজুরায় ইনি ঘণ্টা হিসাবে দক্ষিণা গ্রহণ করেন। ঘণ্টায় ইঁহার দর ১৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২২৫০ টাকা। ইহার কমে ইঁহার মন উঠে না। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল।

চার্লস স্যাণ্টলী ১৮৩৪ সালে ইংলণ্ডের লিবারপুল সহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাল্যে সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন ইতালি রাজ্যে; ১৮৫৭ সালে লণ্ডনেই তাঁহার প্রথম মজুরা। প্রথম মজুরাতেই অতুলনীয় প্রতিপত্তি। ১৮৫৯ সালে লণ্ডনেরই "কবেণ্ট গার্ডেন" রঙ্গালয়ে তাঁহার কীর্ত্তিতরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। অপেরায় তিনি এখনও রাজত্ব করিতেছেন, গীতিনাট্যে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিপত্তি; বিলাতের কোন সঙ্গীত মহোৎসবই স্যাণ্টলীকে না হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, স্যাণ্টলী হীন উৎসব, যেন শিবহীন যজ্ঞ।

স্যাণ্টলী কণ্ঠ সঙ্গীতে অদ্বিতীয়, ১৮৮৯ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া ১৮৯০ পর্য্যন্ত সেখানে তিনি দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপরাজ্যে আসিয়াও স্যাণ্টলী রাজার অধিক পূজা পাইয়াছিলেন; উত্তমাশায় তাঁহার উত্তমাশাই পূর্ণ হইয়াছিল! এত যে বয়স, তথাপি গলা যেন কাঁসরের মত; সে কাঁসর কিন্তু বড় মিষ্ট কাঁসর।

স্যাণ্টলীর বয়স এখন প্রায় ৭৭ বৎসর। তথাপি এই বয়সেই স্যাণ্টলী কত সুন্দরী যুবতীকে—কত কুবের তনয়াকে পাগলিনী করিয়া দিতে পারেন।

আশা পথে

[শ্রীকিরীট ঘোষ]

(১)

স্ত্রীর শেষ সম্বল গায়ের অলঙ্কার খানি খুলিয়া লইতে শান্তিনাথের ইচ্ছা আদৌ ছিল না; কিন্তু অভাবের তীব্র তাড়নায় তাহাও যখন তাঁহাকে করিতে হইল তখন তাঁহার নয়ন কোনে যত রাজ্যের অশ্রু আসিয়া উদয় হইল। তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল এমন করে আর ক'দিন চলবে প্রভা!

প্রভা সান্ত্বনার স্বরে কহিল—অত ভয় পেলে চলবে কেন? ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না।

শান্তিনাথ কহিল--সেই আশাতেই ত বসে আছি।

প্রভা দৃঢ় স্বরে কহিল—ভয় কি? যা হবার তা ত হবেই। তবে অনর্থক ভেবে ভেবে কেন শরীর নষ্ট কর।

শান্তিনাথ দুঃখের সহিত কহিল—ভাবি কি সাধে? অভাবের তীব্র তাড়না যে আমায় পাগল করে তুলছে প্রভা!

প্রভা কহিল—একটু ঘুরে এস শরীরটা ঠাণ্ডা হবে।

সদাগর অফিসে ষাট টাকা মাহিনার সামান্য কেরাণী—শান্তিনাথ। ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির পাল্লায় পড়িয়া তাহাও যেদিন তাঁহার চলিয়া গেল তখন যত রাজ্যের সৃষ্টি ছাড়া ভাবনা গুলো একে একে কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয় টুকু জুড়িয়া বসিল—তাহা শান্তিনাথ জানিতে পারিল না। চাকরির বাজারের অবস্থা তাহার জানা ছিল—কাজেই এরূপ বিপদে পড়িয়ে তাঁহার বুদ্ধি লোপ পাইতে বসিল। মুদীর টাকা, খোকার দুধের টাকা মাসে মাসে না দিলেই নয়। কি করিয়া যে এ সব টাকা জোগাড় করিবে ভাবিয়া পাইল না। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে দিনের আলো ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

স্ত্রীর গহনা পত্র বেচিয়া মাস তিনেক কোন রকমে চলিয়া গেল। কিন্তু এবার? এবার তাঁহার কি হইবে? ভাবিয়া শান্তিনাথ কোন কূল কিনারা পাইল না।

চিন্তায় তাঁহার মুখটা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে দেখিয়া প্রভা কহিল—পরের ভাবনা পরে ভাব্‌লে চলবে—যাও এখন বেড়িয়ে এস।

(২)

খোলা ময়দানের হাওয়া লাগিয়া শান্তিনাথের শরীর অনেকটা জুড়াইয়া আসিল। ফাঁকা মাঠে আপন ভোলা হয়ে সে কতক্ষণ বসিয়াছিল তাহা সেই জানে। হঠাৎ জন কতকের উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া চেতনা ফিরিয়া আসিতেই শান্তিনাথ দেখিল, সারা আকাশটা কালো কালো মেঘে ভরিয়া গিয়াছে। শান্তিনাথ উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

পথে চলিতে চলিতে পুরানো চিন্তাগুলো আবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার হৃদয় দখল করিয়া লইল।

শান্তিনাথ যখন তাহার ঘরের দুয়ারে আসিয়া পৌছাইল তখন রীতিমত বর্ষন আরম্ভ হইয়াছে। সিক্তবস্ত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে শান্তিনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শান্তিনাথকে সিক্তবস্ত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইয়া, প্রভা একখানি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া কহিল—একেবারে ভিজে গেছ যে। নাও কাপড়টা ছেড়ে ফেল।

কাপড় ছাড়িয়া শান্তিনাথ জানলার ধারে গিয়া বসিল। প্রভা কহিল দিনরাত অত ভেবো না। ভগবান আছেন তিনি কি আর মুখ তুলে চাইবেন না।

শান্তিনাথ কহিল—সেই আসাতেই ত বসে আছি।

প্রভা কহিল—আমি বলছি তিনি চাইবেন—না চেয়ে কি থাকতে পারেন। চুপ করে বসে থেকোনা কাগজটা আছে পড়। আমি ঘরের কাজ গুলো সেরে আস্‌ছি।

প্রভা চলিয়া গেল। শান্তিনাথ কাগজটা টানিয়া পড়িতে বসিল। দু' লাইন না পড়িতে পড়িতে তাহার মনটা কাগজ

হইতে উড়িয়া ভাবনার রাজ্যে গিয়া পড়িল। আজ যদি তাহার কিছু হয় তাহা হইলে প্রভার কি অবস্থা হইবে ভাবিতে ভাবিতে শান্তিনাথ শিহরিয়া উঠিল। ভবিষ্যতের চিত্রখানি তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। শান্তিনাথ আর ভাবিতে পারিল না। তাহার দু'চোখ ফাটিয়া দর দর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। প্রভার পায়ের শব্দ পাইয়া চট করিয়া চোখ দু'টো মুছিয়া ফেলিয়া শান্তিনাথ বাহিরের দিকে তাকাইল। দেখিল কালো ঘন মেঘের মাঝ দিয়া ঝর ঝর করে জল ঝরিছে। কি সুন্দর! শান্তিনাথের ব্যথিত চিত্ত ওই মেঘের মাঝে উড়িয়া হালকা হইয়া আসিল।

(৩)

ওগো শুনছো!

সহসা প্রভার ডাকে শান্তিনাথের মোহ-মোহিত-চিত্ত আবার সংসার মাঝে ফিরিয়া আসিল। শান্তিনাথ গভীর কৌতুহলে স্থির হইয়া প্রভার দিকে চাহিল। প্রভা কহিল— ক'দিন থেকে খোকার গা-টা কেমন কেমন ঠেকছে। তোমাকে রোজই বলবো মনে করি, কিন্তু তোমার দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে সাহস হয় না। একবার খোকাকে দেখবে।

খোকার অসুখের কথা শুনিয়া শান্তিনাথ সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। বুকটা কি যেন এক অজানা ব্যথায় ভরিয়া গেল। চোখ দু'টো ছলছল্ করিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে পড়িল তাহাকে হঠাৎ এরূপ বিচলিত হইতে দেখিলে প্রভার অবস্থা কি হইবে? বহু ক্লেশে আত্মদমন করিয়া শুষ্ক শীর্ণ অধর প্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটাইয়া কহিল— ভয় কি! ছেলে মানুষের অমন হয়েই থাকে। চল দেখে আসি।

* * * *

খোকার অসুখ দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সম্বলহীন শান্তিনাথ ভাবিয়া কোন কূল-কিনারা পাইল না। প্রভার করুণ স্বর—ওগো! তোমার পায়ে পড়ি একবার একটা ডাক্তার ডাকো—শান্তিনাথের হৃদয়ে তীরের মতন বিদ্ধ হইতে লাগিল। ডাক্তার ডাকিলেই ত অসুখ সারিয়া যাইবে না। তাহার ওষুধ চাই—রীতিমত পথ্যাদি চাই। এসব খরচ সে কোথা হ'তে জোগাড় করিবে? শান্তিনাথ ভাবিতে পারিল না—তাহার চোখের আলো নিবে এল। শান্তিনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ফুটন্ত ছোট গোলাপটী ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। প্রভা ও শান্তিনাথ বিরস বদনে খোকার শিয়রে বসিয়া; ভগবান নিশ্চয়ই এ দুর্দিনে মুখ তুলিয়া চাইবেন এই আশাতে সজল চোখে বসিয়া রহিল।

সাড়ী

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী]

(১)

বিজয় এবারে ৺পূজায় সুনীতিকে কি একটা দেবে ঠিক করতে না পেরে, একদিন রাত্রিতে তাকে জিজ্ঞাসা কল্লে— "এবারে ৺পূজোয় কি চাই সুনীতি ?"

সেদিন, পাশের বাড়ীর বৌয়ের সেই লাল চওড়া পাড় শাড়ীর কথা চট্ করে মনে পড়ে গেল। সেটা তার ভারী পছন্দ হয়েছিলো।

"কৈ বল্লে না" বিজয় তার নিটোল গালটা টিপে দিয়ে যখন ফের জিজ্ঞাসা কল্লে ; তখন সে একটু মুচকে হেসে বল্লে "একটা লাল চওড়া পাড় সাড়ী—ওদের বৌয়ের মতন— সত্যি কাপড় খানা পরলে তাকে এমন সুন্দর মানায় !"

"তা—তোমাকেও যে মানাবে তার কি কোন মানে আছে, সুনীতি ?" একটু হেসে বিজয় তাকে রাগাবার জন্যেই কথাটা বল্লে।

স্বামীর, এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে কথাটা শুনে, প্রথমে একটু থতমত খেয়ে, মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। কিন্তু কথাটা বজায় রাখবার জন্য বলে উঠ্লো "তা—মানাগ্ বা না মানাগ্—তুমি জিজ্ঞাসা কল্লে তাই বল্লুম, আমার পরতে বড় সাধ হয়েছিলো বল্লুম।"

(২)

আজ ষষ্ঠী, ৺মায়ের আগমনে দেশময় একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। সকলেই নতুন প্রাণে, নতুন বসনে ৺মায়ের আগমনের প্রতীক্ষা করছে। রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায় নীল, লাল রংয়ের পোষাকধারী ছেলে মেয়েদের স্ব স্ব পোষাকের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণে একটা বেশ সরগোল পড়ে গেছে।

কিশোরীদের ষষ্ঠী ব্রত পালনে, পুকুর পাড়েও স্নানের বেশ একটা ভিড় হয়ে উঠেছে। স্নানান্তে কেউ বা নতুন কাপড় পরে, গলায় আঁচল দিয়ে সাম্‌নে ৺কালী মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে—মন্দিরে ইতস্ততঃ আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্চে। সর্ব্বত্রই যেন আজ একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়েছে।

সুনীতি বারওয়ারীতলা হতে ৺মাকে দর্শন করে, বাড়ী ফিরছিলো সামনে বিজয়ের সঙ্গে গলির পথে দেখা হতেই বিজয় বলে উঠলো "কৈ সাড়ীখানা পরলে না ?"

শুধু "পরবো ওখন" এই বলেই একটু হেসে সুনীতি বিজয়ের পাশ কাটিয়ে বাড়ী ঢুকে পড়লো।

বাড়ী এসে ট্রাঙ্কটা খুলে, সে সাড়ীখানা বার করলে— কিন্তু কি আবার মনে হওয়াতে বেশ যত্ন সহকারে সেখানা আবার তুলে রেখে দিলে। পাশ হতে তার ছোট ননদ্ বলে উঠলো "বেশ ত পরনা ভাই- আবার তুল্লে কেন ? আজকের দিনে নতুন কাপড় পরতে হয়।" সে শুধু একগাল হেসে বল্লে "পরবো—আজ না ভাই—৺বিজয়ার দিন—এখন পাট্ ভাঙবো না" বলেই রান্নার আয়োজন করতে সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো।

৺পূজার নবমী অবধি দিনগুলো, বিজয়ের বেশ আমোদ, আহ্লাদের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। কাল ৺বিজয়া ক্লাবের সকলে এসে বিজয়কে ধরলে যে—তাদের আজ রাত্রি যতই হোক- কালকে ৺বিজয়ার কনসার্টের গৎ, টৎগুলো বাজিয়ে সব ঠিক করে নিতে হবে—তাতে রাত্রি কাবারই হোক্ আর যাই হোক্ ! সুতরাং বিজয় তাদের অনুরোধ মত চারটি খেয়ে ক্লাবে এসে বস্‌লো। তখন বিজয় সবে মাত্র ক্লারিওনেট্‌টা নিয়ে ৺বিজয়ার উপলক্ষ্যে তৈরী গানটা বাজাতে যাবে—অমনি দয়াল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "বাবু শীগ্‌গির চলুন—বৌমা কি রকম কচ্ছেন।"

"সে কিরে !" ইহার বেশী প্রশ্ন না করিয়া হাতের ক্লারিওনেট্‌টা সেখানে ফেলে ছুটে বেরিয়ে এলো ; অন্ধকারে একটা ইটে না কিসে লেগে, নগ্ন পায়ের তার খানিকটা

চামড়া উঠে গেল—সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। আসতে আসতে খালি একবার দয়ালকে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে রে" সে শুধু উত্তর করলে "কি জানি বাবু—বৌমা দুবার ভোমি করে, কিরকম নেতিয়ে পড়েছ্যান্" সশঙ্কিত বিজয়ের ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। সূর্য্যের আলো উঠোনের একটা কোণে এসে পড়েছে।

উঠোনে ঢুকতেই সকলে সমস্বরে কেঁদে উঠলো "ওরে আমাদের লক্ষ্মী কোথা গেল রে!" এ অকস্মাৎ ক্রন্দন-রোলে বিজয়ের মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠতেই, উঠোনের কোণের দিকে নজর পড়তেই দেখলে—একখানা লাল চওড়া পাড় শাড়ীপরা সীমন্তে সিঁন্দুর রঞ্জিত কে শুয়ে রয়েছে!

তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে—দশমীতে ঘাটে অনেক লোক স্নান করতে এসেছে।

"আহা কি মানিয়েছে—যেন সতী লক্ষ্মী!" কথাটা কাণে আসতেই বিজয় ফিরে চাহিতেই দেখে চিন্‌তে পারলো—এ শুভ্র থান পরিহিতা নারীটি যে তাদেরই পাশের বাড়ীর বৌ!

বিজয়ের মনে কেবল ঝঙ্কার দিতে লাগিল "আহা কি মানিয়েছে!"

প্রকাশ

[শ্রীবিভু কীর্ত্তি]

দিনের আলোয় পাইনি দেখা যার
তারেই আজি বিকাশ করে রাতের অন্ধকার।—
আলোয় ভরা, মুখর এদের কোলাহলে
লুকিয়েছিলো প্রাণের বাণী ধূলোর তলে—
সেই বাণীরে প্রকাশ করে কেমন করে
আঁধার-ভরা মৌনতারি নীরব অশ্রুধার ?

প্রাণের বাণীর প্রকাশ হল আজি—
ওই সুদূরের আকাশ-ভরা তারাফুলের সাজি,
অন্ধকারের সূত্রে গাঁথা বেদন মালা গাছি
বক্ষধারায় সিক্ত হয়ে উঠলো সে আজ বাঁচি—
সেই বেদনার উপহারে সাজিয়ে লয়ে তরী
ভাসিয়েছে আজ মরণপথে জীবন-তরীর মাঝি!

প্রাণের ধ্বনীর উঠ্‌লো প্রতিধ্বনী,
হৃদয় ব্যেপে উঠ্‌লো কেঁপে অন্ধকারের বাণী
সেই আঁধারের গভীরতায়
হৃদয় ভরে উঠ্‌লো ব্যথায়
অন্ধকারের সুপ্ত তারে
উঠ্‌লো বেজে সারা হৃদয় খানি।

বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৩০শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩২। [৪০শ সপ্তাহ

চিতা-নির্ব্বাণ

[শ্রীঅমৃতলাল বসু]

(১)

সাড়ে তিন কুড়ি সাত,
ইস্তক বিস্তিতে মাৎ,
শেষ হাতে হারকাত,
বঙ্গের সুরেন্দ্রনাথ চ'লে গেল বাড়ী।

(২)

সেখানে জরুরি ডাক,
চলে না ফিকির ফাঁক,
"যাই যাই" শোনে নাকো, বড়া তাড়াতাড়ি॥

(৩)

বিদ্যাবুদ্ধি ধন মান,
উচ্চ আশা অভিমান,
জীবন-বাণিজ্য কাজে যা' কিছু অর্জ্জন।

(৪)

সজোরে আঁকড়ি' বুকে,
ভেবেছিল আছি সুখে,
খেলা চুকে যেতে হোলো করিয়া বর্জ্জন।

(৫)

চক্ষে অন্ধকার সব,
বন্ধ হোলো কণ্ঠরব,
ছিল দেহ এবে শব শয্যা অগ্নিমাঝ।

(৬)

কর্ম্মপটু কলেবর,
যতনে সাজানো ঘর,
দেরাজে রহিল প'ড়ে সমাজের সাজ॥

(৯)

আবার বঙ্গের অঙ্গ,
রাজ-বলে হ'লে ভঙ্গ,
তর্কের তরঙ্গ তুলে বাক্যের তুফানে।

(১০)

দাঁড়ায়ে সুরেন্দ্রনাথ,
বাড়ায়ে বীরের হাত,
ছড়াবেনা মুক্তামালা বক্তৃতা প্রদানে॥

(৭)

আর নাহি কিছু ক্ষতি,
কংগ্রেস কার্য্যের গতি,
এ-দলে ও-দলে কিম্বা গেলে অন্য দলে।

(৮)

ভাগ্যবান ভাগ্যবতী,
যারে খুশী সভাপতি,
কর' বর দাও মালা তুলে তার গলে॥

(১১)

মৌসুমী হরির লুটে,
কুড়ায়ে বেড়াতে ছুটে,
ভোটের বাতাসা আশে আসিবে না আর।

(১২)

পশি' কর্ম্মনাশা নদে,
বসিতে মন্ত্রীর পদে,
আর কভু খুঁজিবে না বাঁড়ুয্যে চেয়ার॥

(১৩)

শুভ্র শ্মশ্রু শুভ্র কেশে,
গঙ্গাযাত্রা করি, শেষে,
"বেঙ্গলী" আফিসে এসে সম্পাদক সাজে।

(১৪)

ম'রে গিয়ে হয় ভূত,
তবু-ও মানব পুত,
আনাচে কানাচে ঘোরে নিজ বাস্তু মাঝে॥

(১৫)

তুলসী দলের স্থলে,
কাগজ ভিজায়ে জলে,
কলেতে ফেলিতে জল্‌দি দেবেনা অর্ডার।

(১৬)

বাঙ্গালী "বেঙ্গলী" আজ,
ফুরালো সুরেন্দ্র-রাজ,
তাঁরই মৃত্যু পত্রে ঘোষে তামসী বর্ডার॥

(১৭)

সাধের শিমূল তলা,
পোঁতা গাছে আতাফলা,
সকালে বিকালে চলা পরিচিত মূর্ত্তি।

(১৮)

বিদায় বিদায় শেষ,
বিদায় মা বঙ্গদেশ,
ফুরাইল ধূমধাম উত্তমের স্ফূর্ত্তি॥

(১৯)

দৃষ্টিহারা সে প্রবাসে,
তুষ্টি দেন স্বাস্থ্য নাশে,
দেবীর সমান তব মিষ্টভাষী জায়া।

(২০)

নহে রাজনীতি নেতা,
গৃহস্থ সুরেন্দ্র সেথা,
বালক-সুলভ হাসি সুতাসুতে মায়া॥

(২১)

আমিও বেঁধেছি ব্যাগ্‌,
সম্বল কম্বল ব্যাগ,
যশের পোষাক নাই কীর্ত্তি তীর্থ বল॥

(২২)

তবু ইচ্ছা তুচ্ছ চিতে,
পাছু পাছু সঙ্গ নিতে,
একটু দাঁড়ায়ে যেও দেবো অশ্রুজল;—
ধোয়াতে তেজীর চিতা দ্বিজ পদতল॥

অন্তিম-শয্যা

'এক্‌জিবিশন !'

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ]

কলিকাতার নন্দনকানন—ইডেন গার্ডেনে বসিল এক্‌জিবিশন, তারই হুজুগের একটা ঢেউ নোয়খালীর বেগমগঞ্জে গিয়া সারা গ্রামটাকে তোলপাড় করিয়া ফেলিল। বড়দিনের বন্ধে এবাড়ী ওবাড়ীর মেয়েরা নিষ্কর্ম্মা বুড়ো কর্ত্তাদের সঙ্গে একজোটে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিল, তাই দেখিয়া পুষ্পরাণী ওরফে পুঁটির আর অস্থিরতার সীমা রহিল না! কলিকাতা সহরে তার জন্ম, সেইখানেই সে মানুষ,—বিধিনির্ব্বন্ধে বাঙাল দেশের' এক গণ্ডগ্রামে শ্বশুর ঘর হইয়া তার কোনো সাধ-আহ্লাদ আর মিটিবার উপায় নাই!

শাশুড়ীকে কিছু বলিতে পারিল না, বুড়ী ত মুখখানাকে বাঁকাইয়াই আছে। কাজ, কাজ, চব্বিশঘণ্টা কাজ! জন্মের মধ্যে কর্ম্ম—একটা এক্‌জিবিশন, অর্দ্ধোদয় যোগের মত কতদিন অন্তর হয়, তাই যদি দেখা হইল না তবে বাঁচিয়া থাকা দরকার? কলিকাতায় স্বামী চাকরী করে, তাকেও ভরসা করিয়া লিখিতে পারিল না, অগত্যা বেচারাকে অন্য ফন্দী ঠাওরাইতে হইল।

হঠাৎ একদিন কোথা হইতে কার হাতের লেখা চিঠি আসিল, তার মার ভারী অসুখ, পত্র পাঠমাত্র না আসিলে হয় ত দেখা হইবে না।

পুঁটি কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিল। তিন বৎসর বাড়ী যায় নাই, মা কেমন আছে জানে না। আজ এ চিঠি পাইয়া আর কি থাকা চলে? শাশুড়ী মত করিলেন। ছোট দেওর তাকে কলিকাতায় বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিল।

মার অসুখ, এমন কিছু নয়, অম্বলের ব্যথা। মাঝে মাঝে হয়। আসল কথা, আদরের মেয়েটিকে একবার দেখিবার ইচ্ছা. আর তার একজিবিশন দেখার সাধ পূর্ণ করার মৎলব।

কলিকাতায় পৌছিয়াই পুঁটি মামাতো-ভাই কালোশশীকে পাকড়াও করিল—মেজদা, এক্‌জিবিশন নিয়ে চলো!

কালোশশীর বয়স হইয়াছে, কিন্তু রাস্তাঘাটে মেয়েদের কি করিয়া সাম্‌লাইয়া লইয়া যাইতে হয়, সে সব তার জানাশুনা নাই। সে কলিকাতার ছেলে বটে, কিন্তু চালচলন তার একেবারে পাড়াগেঁয়ে ধরণের। গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিয়া অবধি তার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল! তারা গরীব মানুষ, একজিবিশনে কত বড় বড় লোক যাইতেছে, সেখানে তাহাদের কি যাওয়া উচিত?

পুঁটিও যে বাড়ীতে বসিয়া অত ফড়ফড় করিতেছিল, গাড়ীতে উঠিয়া তার আর কথা নাই! চুপ করিয়া পাখী তুলিয়া দেখিতে লাগিল। রাস্তায় অত গাড়ী ঘোড়া লোক-জনের ভিড় দেখিয়া তার এক্‌লার রাজত্ব সেই সুদূর রান্না-ঘরটি মনে পড়িতে লাগিল।

একজিবিশনে নামিয়া প্রথমটা তার খুব ভালো লাগিল। সারি সারি কত দোকান, লতাপাতা আলো নিশানের কত বাহার কাপড়ের দোকান, গয়নার দোকান, ছবির দোকান, পুতুলের দোকান, পানের দোকান, খাবারের দোকান—কোন্ দোকানটি রাখিয়া কোন্‌টি সে দেখিবে? তবু নিরীক্ষণ করিয়া কত কি দেখিল,--এক জায়গায় একটি কাঁচের বাক্সর মধ্যে একটি মুসুর ডালের গায়ে পঁচিশটা হাতী আঁকা দেখিল, বাঙালীর মেয়েরা দু' চারজন টুলে বসিয়া সিগারেট খাইতেছে দেখিল, কোথায় কোন্ দোকানদারের ছেলেটি মেমের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া ইয়ে—ইয়ে—ইউ সি দিস্—করিতেছে দেখিল।

গাছে গাছে পাতায় পাতায় লাল নীল সবুজ আলোর চমৎকার বাহার দেখিয়া পুঁটির আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তার উপর কত সুন্দর সুন্দর লোক, কত দেশের—কত সুন্দর সুন্দর পোষাক কত রংএর!

একটা ছবির দোকানে একটি 'কেষ্ট ঠাকুরের' ছবি দেখিয়া পুঁটির ভারী ভালো লাগিল। সে কালোশশীকে জিজ্ঞাসা করিল, ক' পয়সা ওটার দাম?

কালোশশী দোকানদারকে প্রশ্ন করিয়া জানিল—পাঁচশো টাকা।

"রক্ষে করো" বলিয়া পুঁটি অগ্রসর হইয়া চলিল। থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাসের তাঁবু ছাড়াইয়া তারা লটারী দেখিতে গেল। সেখানে যত রাজ্যের ঘড়ির লোভে লোকে কত পয়সা নষ্ট করিতেছে দেখিয়া পুঁটি বিষম আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

পা আর চলে না। পুঁটি বলিল, মেজদা চলো, কোথাও বসি। একটু জিরিয়ে আবার ঘুরব।

কালোশশী অগ্রসর হইল, পুঁটি পিছাইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া একবার তাকে ডাকিয়া ঘুরিতেই একটি সুসজ্জিতা মেয়ের গায়ের উপর গিয়া পড়িল। মেয়েটি রুমাল দিয়া রিষ্ট্ ওয়াচটা ঝাড়িয়া বলিল—অদ্ভুত!

সঙ্গের দুটি সঙ্গিনী অপ্রস্তুত কালোশশীর দিকে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চাহিল। তাহাদের পিছন হইতে সাহেবী পোষাক পরা একটি যুবক অগ্রসর হইয়া বলিল—ইউ ছোক্‌রা লেডিস্‌দের গায়ের ওপর দিয়ে না চল্‌লে তোমার চলা হয় না?

কালোশশীকে নীরব দেখিয়া তার রক্তচক্ষু শান্ত হইল। যাইবার সময় পুঁটির দিকে কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে বলিতে গেল, দেখেছ লুসি, মেয়েটা বেশ লভ্‌লি।

তারপর কি একটা কথা বলিতে বলিতে তিনটি মেয়ে যে কলহাস্য করিয়া উঠিল, অন্য লোকের পক্ষে তা হয়ত খুব শ্রুতিমধুর হইতে পারে, কিন্তু কালোশশীর কাণ দুইটা সেই শব্দে বিষম রাঙা হইয়া গেল!

দাদার অপমানে বোনের চোখ দুটি ছলছল হইয়া আসিল, সে বলিল, চলো তাড়াতাড়ি, ওধারটা দেখে বাড়ী ফিরি। আর কোথাও বসব না।

পুঁটিকে কিছু মিষ্টি আর এক বোতল লেমনেড খাওয়াইয়া কালোশশী তাকে আমোদ বিভাগের দিকে লইয়া গেল। সেখানে স্লিপারি স্লুট্ এবং হেল্টার স্কেল্টারে লোকে কেমন পিছলাইয়া পড়িতে—দেখিয়া পুঁটির যা মজা লাগিল! সে বলিল, মেজদা, তোমায় ওতে উঠতে হবে, আমি দেখব কেমন গড়গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ো!

মেজদা অপ্রস্তুত হইবার ভয়ে কিছুতেই তাহাতে রাজী নয়!

—তবে ঘোড়ায় কিংবা এরোপ্লেনে চড়ো।

কালোশশী বলিল, অত কিংবা করতে হবে না, এবার বাড়ী! এখানে আলো দেখে বুঝতে পারছ না, কত রাত্তির হয়েছে! বাইরে গেলেই বুঝবে।

পুঁটি ফিরিল। ফটকের দিকে খানিক যাইতেই বাধা পড়িল। অজস্র লোক—যে যেদিকে পারিতেছে, ছুট্ দিতেছে। দোকানদারেরা সভয়ে প্রশ্ন করিতেছে, কি মশাই কি ব্যাপার?

কেহ বলিল, ভারী মারামারি! কেহ বলিল, আগুন লেগেছে। আবার কেহ বলিল, গরু হারিয়েছে; কেহ বলিল, বাঘ বেরিয়েছে। কেহ মেয়ে চুরি, কেহ গুম খুন—যার যা খুসী বলিয়া গেল। উৎকণ্ঠার মধ্যে একটি পাগলা আবার হাসাইয়া গেল।

একটা ব্যাংএর তিনটে ছানা,
সে সব কথা কেউ জানে না…
কেউ জানে না..

এই গোলমালের মধ্যে একপাশে দাঁড়াইয়া আমাদের পুঁটি এবং কালোশশী দেখিল, পূর্ব্বপরিচিত সাহেবী পোষাক পরা লোকটিকে একটা গোরা ছুটিতে ছুটিতে বেতের বাড়ী দু'চার ঘা লাগাইয়া গেল। সঙ্গের মেয়েগুলি কলকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহাদের বেশীক্ষণ সে জায়গায় থাকিতে হইল না। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড জনসমুদ্র সেইপথে আসিয়া দুজনকে যে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া চলিল, তারা বুঝিতেই পারিল না। সহসা একটা চৌমাথার মোড়ে আসিয়া কালোশশীর হাত ছাড়াইয়া পুঁটির সন্ত্রস্ত জনসঙ্ঘের সঙ্গে আর এক রাস্তায় ছিটকাইয়া পড়িল। ভিড় সরিয়া গেলে কাছাকাছি কোথাও মেজদাকে না দেখিতে পাইয়া ভয়ে তার গলা শুকাইয়া গেল, একবার চীৎকার করিয়া ডাকিবার ক্ষমতাও যেন রহিল না।

সামনের একটা দোকানের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে বেচারা সতৃষ্ণ চোখে তার জানা মুখখানি খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল—একবার এদিক, একবার ওদিক।

ষ্টলের মধ্যে চার পাঁচজন যুবক গণ্ডগোল করিতেছিল। একজন বলিল, চল হে দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে পড়া যাক্। ওদিকে ব্যারিষ্টারে পুলিশে মারামারি চলেছে।

আর একজন অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, দোকানের সামনে ও আবার কে ঢং করে দাঁড়াল? বাইজী বোধ হয়। অরবিন্দ দেখো ত!

'অরবিন্দ' তেমনি ধীরে বলিল, বাইজী কিসে বুঝলে? ভদ্রলোকের মেয়েও হতে পারেন ত!

বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া সে লোকটি জবাব দিল—নাকছাবি ত আজকাল ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েরা পরেন না।

পরে না কি? যথেষ্ট পরে—বলিতে বলিতে 'অরবিন্দ' পুঁটির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

ভয়ে উৎকণ্ঠায় পুঁটির ঘোমটা একেবারে সরিয়া গেছে সেদিকে তার লক্ষ্য নাই। 'অরবিন্দ' তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াই—ওগো তুমি? তুমি কোত্থেকে? বলিয়া অধীর আগ্রহে চাহিয়া রহিল।

পুঁটি লম্বা এক ঘোমটা টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অরবিন্দ তার হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিয়া বলিল, ওহে ইনি হচ্ছেন আমারই স্ত্রী! তারপর স্ত্রীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আস্তে বলিল, বসো এই চেয়ারটায়। এঁরা হচ্ছেন সব আমারই বন্ধু।

ও হরি, বৌদি?—সমস্ত রসিকতা বন্ধ হইয়া গেছে। মুখফোঁড় বন্ধুটি বড় লজ্জায় পড়িল, ছি ছি বাইজী বলাটা ঠিক হয় নাই!

একটা বর্ম্মা চুরোট ধরাইয়া অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল, কার সঙ্গে এলে?

অবগুণ্ঠনের আড়াল হইতে প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া পুঁটি বলিল—মামার বাড়ীর মেজদার সঙ্গে। হঠাৎ পথ হারিয়ে গিয়ে মেজদাকে আর দেখতে পেলুম না।

অরবিন্দ বন্ধুদের উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমার সম্বন্ধী এসেছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

কি নাম তাঁর? কি নাম?—সকলে একসঙ্গে উঠিয়া পড়িল।

কালোশশীবাবু পটলডাঙ্গার।

পটোলডাঙ্গার কালোশশীবাবু—ও মশাই পটলডাঙ্গার—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তারা ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডএর কাছ হইতে কালোশশীকে খুঁজিয়া আনিল।—পুঁটিকে এতক্ষণ ডাকিয়া ডাকিয়া তারও গলা ভাঙিয়া গেছে। একজন সাড়া দিয়াছিল, কিন্তু সে অন্য বাড়ীর অন্য 'পুঁটি'!

কালোশশী আসিয়া ভগ্নীপতিকে বলিল, কাগজে লিখেছে কি মিথ্যে—একজিবিশন নয় ত, এক-যে-ভীষণ! আজ যা ভাবনা হয়েছিল! চলুন, বাড়ী যাওয়া যাক্।—অরবিন্দ ট্যাক্সি ভাড়া করিতে গেল।

একজিবিশন হইতে বাহির হইতে হইতে পুঁটি কালোশশীকে বলিল, বাড়ীতে চলো না, আমি সকলকে বলে দোব, মেজদাদা কোন কর্ম্মের নয়।

কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া সে সব কিছুই করিল না, বরঞ্চ যে ন্যাকড়ার গোলাপ ফুলটা একজিবিশন হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল, তারই বোঁটায় "মেজদাকে উপহার"—লেখা একটা কাগজ মারিয়া দিল। তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, পাশের বাড়ীর এক খুলনা বাসী হার্ম্মোনিয়মে সাধিতেছে—সারেগা-রেগামা-গাইমাপা-মাইপাধা-পাইধানি-ধাইনি সা—!!

———

চীনের থিয়েটার

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

(১)

বিলিতি নাটক নভেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনবাসীদের সম্পর্কীয় অসংখ্য চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে চীনকে যেন আমাদের একটা বিপুল রহস্তের বিরাট আগার বলে মনে হয়। তাঁদের সদা গম্ভীর মুখ, পোষাক পরিচ্ছদ, চলিবার কায়দা, ও ভাবভঙ্গী দেখলে তাঁদের রসবোধ ও কলাজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকেরই বিষম সন্দেহ জন্মে।

অবশ্য বাংলাদেশ জুতোর দোকান কিংবা কাঠের গুদাম ছাড়া চীনাদের সঙ্গে পরিচয় লাভের সাধারণ সৌভাগ্য আমাদের হয়ে উঠে না। কাজেই তাঁদের সম্বন্ধে নানারূপ অলীক ধারণা পোষণ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু চীন আজ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হচ্ছে, তাঁদের নানারূপ আইন কানুনের বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তাঁদের চোখ রাঙানকে উপেক্ষা করতে সুরু করেছে, সর্ব্ব বিষয়েই নিজেদের অধিকার জোর গলায় প্রচার করতে আরম্ভ করেছে। কাজেই তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলা আজ আর বোধ হয় অবান্তর হয়ে পড়বে না। চীনে থিয়েটারের জন্ম বহু পূর্ব্বে। এর আধুনিক পরিপূর্ণতার পরিচয় দিতে গেলে গোড়ার ইতিহাসকে বাদ দেওয়া আমাদের চলবে না। কত বিপ্লব, সংঘর্ষণ ও বাক্য প্রভৃতির ভেতর দিয়ে এই মুহ্যমান আফিম পিয়াসী জাতি কলাদেবীকে ধীরে ধীরে তাঁর আসনখানি ছেড়ে দিচ্ছে তা না বললে চীনের থিয়েটারের ঠিক প্রকৃত পরিচয় বোধ হয় দেওয়া হবে না।

চীনে কখন যে থিয়েটারের জন্ম ইতিহাসে তাঁর সঠিক খবর পাওয়া যায় না। যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে এই— টি' আং বংশের সম্রাট মিং-হুয়াং (তাঁহার রাজত্বকাল ৭১২— ৭৫৫খৃঃ) প্রায় তিনশত অভিনেতাকে নিজে শিক্ষা দিয়ে তাঁর ন্যাসপাতি ফলের বাগানে প্রথম অভিনয় করান।

কিন্তু এ ছাড়া ইতিহাসে আমরা আরও কতকগুলি মূল্যবান সংবাদ পাই। টি' আং বংশের শেষ দিকে তাঁর অন্যতম সম্রাট (রাজত্বকাল মাত্র তিন বৎসর ৯২৩—৯২৬) চুয়াং-ছং (Chuang-Tsong) সঙ্গীত এবং অভিনয় উভয়ের প্রতিই অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্ত ছিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদে বহুবার অন্যান্য অভিনেতাদের সঙ্গে নিজেও ছদ্মবেশে অভিনয় করেন। রঙ্গমঞ্চের প্রতি এই অতিরিক্ত আকর্ষণই প্রথমে তাঁর যশকে ক্ষুণ্ণ ও পরে তাঁর প্রাণকে নষ্ট করে।—তাঁর অন্যতম প্রিয় অভিনেতাই ছোরা দিয়ে তাঁকে হত্যা করে।

এ সময় থেকে প্রায় অর্দ্ধশত শতাব্দী কাল, ছং (Song) বংশীয়দের রাজত্বকাল আরম্ভ পর্য্যন্ত নানারূপ রাজনৈতিক গোলমালের দরুণ নাটকীয় আর্ট রীতিমত ক্ষুণ্ণ হতে থাকে।

ছং বংশীয় রাজারা প্রায় তিন শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছেন। এঁরাই সেই পুরাতন নাট্যকলাকে নতুন ভাবে নানাদিক দিয়ে ধারাবাহিক রূপে ফুটিয়ে তুলতে থাকেন। এ সময় থেকেই এ বিষয়ের আশ্চর্য্য রকম উন্নতি হতে থাকে। এ যুগের নাটক গুলিকে হি-ক' ইউ (Hi' K' iu) বলা হয়। এরপরে মঙ্গোল বংশীয় য়ুয়ানদের রাজত্বকালে (১২৮০—১৩৬৮) নাট্যকলার চমৎকার উন্নতি সাধন হয়। এঁদের রাজত্বকাল অতি অল্প হলেও এঁরা এ সময়ের ভেতরেই অসংখ্য নাটক অভিনয় করে গেছেন। তার ভেতরকার প্রায় একশত নাটক (Masterpiece) এখনও চীনের নানাস্থানে অভিনীত হয়।

সর্ব্বসাধারণ কিন্তু এতদিন এ বিষয়ে ততটা অনুরক্ত ছিল না। কিন্তু মিং বংশের রাজারা (১৩৬৮—১৬৪৪) যখন হুয়েই-ডিয়াউ (Huei-Diou) নামে এক নতুন

ধরণের অভিনয় পদ্ধতির আবিষ্কার করে অভিনয় সুরু করলেন, তখন সবাই এদিকে ঝুঁকে পড়ল। হুয়েই-চিয়াউ (Huei-Cheou) নামক সহরে যেখান থেকে রাজবংশের উৎপত্তি সেখানেই এ ধরণের অভিনয় প্রথম হয়। এ সময় থেকে ক্রমেই নাটকের আকার অত্যন্ত ছোট হতে থাকে। বইখানা সাধারণতঃ এক অঙ্ক, সাহিত্যের দিক দিয়ে অতি যাচ্ছেতাই ও গোলমেলে সঙ্গীতে পরিপূর্ণ থাকত। এ ধরণের অভিনয় অনেকদিন পর্য্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু মাঞ্চু রাজাদের রাজত্বকালে (১৬৪৪—১৯১২) পিকিংএর সঙ্গীত অথবা কিং-ডিয়াউ (King-diou) নামে এক নতুন অভিনয় পদ্ধতিতে এর পুনর্গঠন করেন। এ প্রণালীর অভিনয় সুরু হতে না হতেই দেশের প্রায় প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা এ পদ্ধতি গৃহীত হয়।

আধুনিক শতাব্দীতে সমস্ত সময় পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এসে চীনের রঙ্গমঞ্চ ইউরোপীয় ধারা থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে নি। এর পরিচয় আমরা "ওয়েন্-মিং-হি" (Wen-ming-hi) অথবা সভ্যতার থিয়েটার (Theatre of civilization) নামক নাটক খানা থেকে পাই। বইখানা আগাগোড়া ইংরেজী ছাঁচে লেখা।

এ নতুন ধরণের অভিনয় পদ্ধতি যদিও এখন খুবই পরিপূর্ণতা লাভ করে নি, তবু বর্ত্তমানে এর প্রতি চৈনিকদের লোলুপ দৃষ্টি দেখে অনায়াসে ভবিষ্যৎ বাণী করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এ ধাঁজের অভিনয়ই চীনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করবে।

(২)

চীনের সর্ব্বত্রই সাধারণ রঙ্গমঞ্চ দেখতে পাওয়া যায়। পিকিং সাংহাই প্রভৃতির মত বড় বড় সহরে এদের সংখ্যা চার থেকে ছয় পর্য্যন্তও দেখতে পাওয়া যায়।

গঠন অতি সাধারণ। সম্মুখ ভাগে কতিপয় অতি সামান্য কারুকার্য্য ছাড়া এতে আর কিছুই বিশেষত্ব নাই। সব চীনা থিয়েটারই প্রায় একরকম দেখতে। সবগুলি দেখলে কারও অনায়াসে মনে হতে পারে যে আকারের পার্থক্য ছাড়া আকৃতিতে এদের বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই!

চীনা থিয়েটারের প্রবেশ দ্বার হচ্ছে প্রকাণ্ড একটি দরজা। দরজাটি শ্বেত এবং লোহিত বর্ণে রঞ্জিত অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি কাঠ দিয়ে ঘেরা। মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে রঙ্গমঞ্চের নাম লেখা। অক্ষরগুলি রাতে বৈদ্যুতিক আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আধুনিক ধরণের দু' একটি থিয়েটারে বৈদ্যুতিক অক্ষরেও নাম লেখা থাকে। দরজার দক্ষিণে ও বামে প্রশস্ত লাল থামে কাল কাল অক্ষরে দৈনিক ও পরবর্ত্তী দিবসের অভিনয় বৃত্তান্ত লেখা থাকে।

প্রথমে প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকে একটি বারান্দা বা ছোট হল পার হয়ে তারপর বড় হলের ভেতর গিয়ে পড়তে হবে। হলটী প্রায় গোলাকার। এতে সাতশ' থেকে আটশ' পর্য্যন্ত লোক ধরতে পারে। হলের একেবারে সর্ব্বশেষে ষ্টেজ ঠিক প্রবেশ দ্বারমুখী হয়। এটীও প্রায় গোলাকার এবং প্রায় ছ' ফিট উঁচু। ষ্টেজের প্রত্যেক ধারেই একটি করে রক্তাক্ত স্তম্ভ, তাতে নানান্ কবিতা লেখা। স্তম্ভগুলি প্রায় ত্রিশ ফিট উঁচু হবে। ষ্টেজটি রক্তবর্ণ কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। পশ্চাতে প্রত্যেক দিকে একটি করে দরজা। দরজাগুলি সিল্কের পর্দ্দা দিয়ে আবৃত।

এদের চিরকেলে প্রথাই হচ্ছে যে অভিনেতারা দক্ষিণ দিক্ দিয়ে প্রবেশ করবে ও বাম দিক দিয়ে প্রস্থান করবে। ষ্টেজের পশ্চাতের সমস্তটি দেয়ালই জড়োয়া কাজওয়ালা সিল্কের পর্দ্দা ও ছোট ছোট আয়না দিয়ে ঘেরা থাকে।

ষ্টেজের ভিতর ভাগ কার্পেটদ্বারা আবৃত, এবং টেবিল চেয়ার, টুল প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। অবশ্য এ সমস্তই বিভিন্ন অঙ্ককে খাপ খাইয়েই হয়। ভেতরের যা কিছু পরিবর্ত্তন দর্শকদের চোখের সাম্নেই হয়। কারণ যবনিকার ব্যবহার চীনে একরকম অজ্ঞাত। ছাদ সমতল, তাতে অসংখ্য জানালা। দিনে এর ভেতর দিয়ে প্রচুর পরিমাণে আলো ভেতরে আসে। ভিতরে চতুর্দ্দিকে গ্যালারী। সম্মুখভাগে বক্স। বড় জোর আটজন কি দশজন বস্‌তে পারে। দূরে মেজের উপর তক্তা বিছান থাকে। এ হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রের বস্‌বার জায়গা।

চীনে অডিটরিয়ামকে বলা হয় চিউ-ড্জি (Cheudge) রাতে থিয়েটার তেলের বাতি জ্বালান হত। কিন্তু গত

পনর বৎসর যাবত প্রায় থিয়েটারের গ্যাস অথবা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালান হয়।

(৩)

চীনবাসিরা রঙ্গমঞ্চকে সাধারণ বাজে আমোদ প্রমোদের মধ্যে বলে মনে করে না। তাঁদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এটাকে অজ্ঞ সাধারণদের ভেতর নীতিমূলক শিক্ষা প্রচারের ও উপদেশ দেবার একটি প্রধান স্থান বলে মনে করে। আজকাল গভর্ণমেণ্ট ও এ বিষয়ে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সুরু করেছেন।

রঙ্গমঞ্চের ভেতর বাধা ধরা কোন নিয়ম নেই। জনসাধারণ এর ভেতর প্রচুর স্বাধীনতা পায়। তাঁরা এর ভেতরে বসেই চা কেক্ ফল প্রভৃতি ত খায়ই পরন্তু কেহ কেহ রাতের আহার ও এখানে বসে সেরে নেয়।

রঙ্গমঞ্চকে নীতি প্রচারের কেন্দ্রস্থল মনে করে সবাই আশা করে যে এখানে যে সমস্ত এই অভিনীত হবে, তা যেন ধর্ম্মভাবমূলক অথবা ঐতিহাসিক বীরবৃন্দের স্বদেশীয়তা বা উচ্চ সাহসের ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ থাকে। তাতে পাপের নিন্দা, বিশ্বাসঘাতকের অসৎকর্ম্মকারী, অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী পত্নী, প্রভৃতির কঠোর শাস্তির বিধান অবশ্যই যেন দেখান হয়। সমাজের গ্লানিকর কার্য্যাবলীর নিন্দাও যেন এতে থাকে।

(৪)

চীনে সুরবোধ জাগিয়ে তোলবার জন্য অথবা আবৃত্তি শিক্ষা দেবার জন্যে কোনরূপ শিক্ষাগার নেই। সাধারণতঃ বংশপরিচয়বিহীন নিম্নশ্রেণীর যুবকেরাই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য এই পথ অবলম্বন করে থাকে। কোনও পুরাতন দক্ষ অভিনেতার দ্বারা এঁদের শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থিদের প্রায় চার বৎসর ধরে অভিনয়ের ভাবভঙ্গী, আবৃত্তি, সঙ্গীত, ম্যাজিক, ও তরবারীচালনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই সুদীর্ঘ সময় শিক্ষকেরা বিনা মাহিনাতে শিক্ষা দেন, এই চুক্তিতে যে ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হলে সে শিক্ষকের সমস্ত মাহিনা শোধ করে তবে অন্যত্র স্বাধীন ভাবে যেতে পারবে।

সমাজে অভিনেতাদের স্থান অতি নীচে। পূর্ব্বতন চীন সম্রাটদের অভিনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্টতার ব্যাপার থেকে আমাদের এ কথা মনে হয় যে তারা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেই বলে যে সমাজ তাঁদের স্থান দেয় না তা নয়, জন্ম পরিচয়ই তাঁদের সমাজ থেকে আলাদা করে রেখেছে।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে স্ত্রী ভূমিকা সকল অভিনেত্রীরাই গ্রহণ করত। ঐ বংশেরই অন্যতম সম্রাট (K'ien—long) কি'য়েন্—লং যখন জনৈকা অভিনেত্রীকে সকলের বিপক্ষতা সত্বেও উপপত্নী স্বরূপ গ্রহণ করেন, তখন থেকেই ১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়। তরুণ বয়স্ক সুশ্রী যুবকদের দ্বারাই স্ত্রী ভূমিকা সকল গৃহীত হ'ত।

এ বিষয়ের অন্যতম ব্যতিক্রম এখানেই বলা উচিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সাংহাইয়ে মাত্র স্ত্রীলোক দ্বারাই গঠিত একদল ম্যাউ-ইউল-হি নামক থিয়েটারে (Man-eul-hi) অভিনয় করতে সুরু করেন। এ দলের অস্তিত্ব এখনও সম্পূর্ণ বজায় আছে। এ থিয়েটারে সমস্ত পুরুষের ভূমিকাই স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনীত হ'ত। মাত্র গত ১৯০০খৃঃ থেকে স্ত্রী ও পুরুষ একই রঙ্গমঞ্চে এক সঙ্গে অভিনয় করবার অনুমতি পেয়েছে।

চীনের অভিনেত্রীরা একসঙ্গে সকল থিয়েটারেই অভিনয় করে থাকে। তবে অনেক রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষেরা ওঁদের না নিয়ে অভিনয় করাটাকেই অধিক পছন্দ করে থাকেন। চীনের রাজধানী পিকিং সহরে এখনও এইরূপ বিভিন্ন দলের যেমন মাত্র পুরুষ মাত্র স্ত্রীলোক কিংবা মিশ্রিত রঙ্গমঞ্চ দেখা যায়।

(৫)

অরচেষ্ট্রা প্রত্যেক থিয়েটারে থাকতেই হবে। কারণ চীনে সঙ্গীত ব্যতিরেকে অভিনয়ই সম্পূর্ণ হয় না। প্রত্যেক নাটকই অজস্র সঙ্গীতে পরিপূর্ণ থাকে। আট কি দশজন লোক নিয়ে এই দল গঠন করা হয়। এর প্রধান যন্ত্র হচ্ছে, একটি দু'তারে ভায়োলিন্, ঢাক্, ট্যাম্-ট্যাম্ (Tam-tam) প্যান্-কাউ (Pan-kou) (এ থেকে খুব তীক্ষ্ণ স্বর বের হয়) ক্লারিওনেট, ক্যাষ্টানেট্‌স (Castanets) সিম্বালস (Cymbals) ফ্লুট, গুইটার (Guitar) ম্যাণ্ডোলিন্

(Mandoline) হিয়েন্‌ডজ (hiendze) (সাপের চামড়া লাগান তিনটি তার সংযুক্ত একটি লম্বা ম্যাণ্ডোলিন্ বিশেষ) এবং প্যাঙ্ডজি (Pang-dze) (একখণ্ড ফাঁপা কাঠ। এটাকে কাঠি দিয়ে বাজান হয়)।

সাধারণতঃ সব কটা যন্ত্র এক সঙ্গে বাজান হয় না। কাসি, ঢাক্ এবং প্যান্-কু প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যে বাজান হয়। অন্যান্য তারওয়ালা যন্ত্র সব গানের সঙ্গে বাজান হয়। Pang-dze Pang নামক যন্ত্রটি অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যখন Pang-dze জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ করে শুধু তখন বাজান হয়। এ ধরণের সঙ্গীতের প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কিং-দিয়াউ জাতীয় থিয়েটারে প্রথম প্রচলন হয়। এর উৎপত্তি স্থানের নাম শেন্ সি। খুব আস্তে আস্তে টেনে টেনে এ গান গাওয়া হয়। এ জন্য স্ত্রীলোকের পক্ষেই এটা অধিকতর উপযোগী।

চীনা থিয়েটারের গ্রীণরুম মাত্র একটি পাতলা দেয়াল দিয়ে আলাদা করা থাকে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া সাধারণের এ অংশে প্রবেশ নিষেধ।

চীনা অভিনেতাদের কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাসও আছে। প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চেই যে পাতলা দেয়ালটি গ্রীণরুমকে ষ্টেজ থেকে আলাদা করে রেখেছে, তার গায়ে একটি শিশুর আকৃতি ছোট কাঠের পুতুল থাকে। প্রত্যহ একে ফুল সুগন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। কোন অভিনেতাই এঁকে নমস্কার না করে ষ্টেজ ঢ়ুকবে না।

এই মূর্ত্তিটি সাধারণের নিকট লাং-লা-পাও-সা (Lang-Lang-Pao-Sa) এই নামে পরিচিত। চীনা অভিনেতাদের ভেতর এঁর এত প্রতিপত্তি সত্বেও এঁর প্রথম উৎপত্তির ইতিহাস সকলের নিকটই তিমিরাচ্ছন্ন। কখন এবং কোন্ যুগে যে এর জন্ম সে সম্বন্ধে ইতিহাসও নীরব। তবে কেউ কেউ বলেন সম্রাট্ চুয়াং-ছং এর প্রতিকৃতি ছাড়া এ আর কিছুই নয় সম্রাট্ রঙ্গমঞ্চের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও ভক্ত ছিলেন। এই আসক্তি থেকেই জনৈক অভিনেতার হস্তে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। এবং শুধু এজন্যেই অভিনেতারা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখান।

(৫)

চীনে প্রত্যহ দুবার করে অভিনয় দেখান হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার ও রাত্রে একবার প্রত্যেকবার অভিনয়েরই বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম থাকে। এক একবারে একসঙ্গে অনেকগুলি নাটকের অভিনয় দেখান হয়। নিম্নে একটি প্রোগ্রামের অবিকল নকল দেওয়া গেল!

১। সুখী পরিবার
২। মূর্খের বিয়ে।
৩। কবরের ধারে যুবতী বিধবা।
৪। ম্যাজিক কিংবা সার্কাস।
৫। নীলনদে আত্মবিসর্জ্জন।
৬। সেনাপতি ইয়াং-টুর মাতার নিকট গোপন প্রত্যাবর্ত্তন।
৮। নিউ-লিয়েন-টং (ধর্ম্মমূলক অভিনয়)

প্রায় থিয়েটারেই

অভিনয় সুরু হওয়ার পূর্ব্বে একটি অতিরিক্ত দৃশ্য দেখান হয়। তার নাম হচ্চে চিয়া-হুয়ান্ (chia-huan) এর নৃত্য। এই দৃশ্যে লোকটি একটি অদ্ভুৎ রকমের পোষাক পরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে গাইতে গাইতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। ও সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে থামিয়া নানারূপ অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে। প্রোগ্রামে এ দৃশ্যটি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ থাকে না।

(৬)

আমি পূর্ব্বেই বলেছি চীনে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটাদি অতি সরল। আবার কতগুলি জিনিস দেখে অধিকাংশই কল্পনা করে নিতে হয়।

যেমন—

১। চাবুক—ঘোড়া
২। মাছ আঁকা নিশান্—জল
৩। দুটো নিশান, প্রত্যেকটিতে একটি করে চাকা আঁকা—গাড়ী।
৪। সাদা দাগওয়ালা সবুজ পর্দ্দা—দুর্গ।
৫। দুটো পার্শ্বেলের প্রত্যেকটীর উপর একটি পাথর—পাহাড়।
৬। লাল কাপড়ে মোড়া একটা পার্শ্বেল—মানুষের মাথা।
৭। উড়ন্ত পতাকা—বিশুদ্ধতা, ধর্ম্ম, এবং আত্মা।
৮। পাখা উচ্ছৃঙ্খল, অমিতব্যয়ী।

বারান্তরে চীনের বর্ত্তমান অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাটকের ও তাহার গ্রন্থকার প্রভৃতির সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা

[শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

(১)

রাত্রি প্রায় একপ্রহর, আমরা এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজনের প্রত্যাশায় বসিয়া আছি—সঙ্গীত, আমোদ প্রমোদ ও গল্প গুজব চলিতেছে, এরূপ সময় আমাদের আর এক বন্ধু আসিলেন, তাহার মুখ বিষণ্ণ, একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন! তাঁহার ঐরূপ বিষণ্ণ মুখ ও নত দৃষ্টি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাই, তুমি এমন বিষণ্ণ কেন?" বন্ধু অশ্রুভরা চোখে বলিলেন "বড় দুঃসংবাদ?" আমরা সকলে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিসের দুঃসংবাদ? কি হইয়াছে, বলনা?' বন্ধু বলিলেন—'ভাই সি, আর, দাশ মারা গিয়াছেন। তাঁহার মুখ হইতে একবার কথা উচ্চারিত হইবামাত্র একটা হৃদয়ভেদী হাহাকার ধ্বনি আমাদের ভিতর হইতে ধ্বনিয়া উঠিল!" পুনরায় আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই সত্য বলছ ত?" বন্ধু কাঁদিয়া ফেলিলেন "ভাই, দেশবন্ধুর কথা লইয়াও কি তামাসা করিতে পারি? এই মাত্র টেলীগ্রাফ আফিস্ হইতে শুনিয়া আসিলাম, আজ বেলা পাঁচটার সময় দার্জ্জিলিং এ হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। টেলিগ্রাফ আফিসে লোকারণ্য, এসময়ে বোধ হয় সমুদয় ঢাকা সহরে সংবাদ তড়িৎগতিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আনন্দ কোলাহল থামিয়া গেল, আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

আমার একজন আত্মীয় সে সময় আমার বাসায় কোন কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত স্বদেশ সেবক এবং স্বরাজ্য দলযুক্ত। তাঁহাকে এ দুঃসংবাদ বলিবামাত্র, প্রথমে তিনি কথাটা বিশ্বাস করিলেন না, পরে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, আমার মা ছেলে মেয়েরা সকলেই প্রিয়জন বিয়োগ কথায় আত্মহারা হইলেন, সকলে একত্র বসিয়া দেশবন্ধুর কথা আলোচনা করিয়া রাত কাটাইয়া দিলাম।

পর দিন প্রভাতে, দেখিলাম কেহ বলে নাই, কেহ অনুরোধ করে নাই, ঢাকার হিন্দু মুসলমান সকলেই দোকান বন্ধ করিয়াছেন। মুসলমানরাই সকলের আগে দোকান পাট বন্ধ করিয়াছিলেন। যেখানে যাই, ঐ এক কথা, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু স্ত্রীলোক সকলের মুখে বিষাদের কালিমা, কেবল নাই নাই রব আর হাহাকার, কেহ কেহ উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়াছেন।

তখনও ঢাকার কি ভাবে কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার প্রকৃত বিবরণ পৌছে নাই, কেহ বলিতে-ছিলেন রিক্শতে বেড়াইতে যাইয়া হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপ বিবিধ জনপ্রবাদ চলিয়াছে।

চিত্তরঞ্জন এমনভাবে অসময়ে চলিয়া যাইবেন এমন কথাত কেহ কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। বহু পুণ্য ফলে আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম, শতবর্ষের মধ্যেও এমন লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। কোন দেশেই গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনী, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, রাণাপ্রতাপ বেশী জন্মগ্রহণ করেন না। আমাদের দেশেই বা একজনের বেশী দুইজন চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন কি পুণ্য আমরা করিয়াছি? কে জানিত সূর্য্য যখন মধ্যাহ্ন গগণে উজ্জ্বল কিরণ প্রভায় চারিদিক আলোকিত করিতেছিলেন, তখনই চিরকালের জন্য রাহুগ্রস্থ হইবে?

আমরা ধরার মানব, দেবতার কথা আমাদের কল্পনা, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রত্যক্ষ মহামানব আমরা চিত্তরঞ্জনকে দেখিয়াছিলাম। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মন তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয়, জীবনে অর্থে বল, বাক্যে বল, স্নেহ সম্ভাষণে বল, উদারতায় বল, ভালবাসায় বল, এ জীবনের শত শতবার

তাঁহার বিরাট বিশাল হৃদয়ের স্নেহ ও প্রীতিলাভে গৌরবান্বিত হইয়াছি। চিরদিন সমান ভাবে স্নেহ পাইয়াছি একদিনের জন্যও সে স্নেহদান হইতে বঞ্চিত হই নাই। আমরা অক্ষম তাই তাঁহার এই স্বদেশ সেবার মহতী যজ্ঞে যোগদান করিবার মত শক্তি ও সাহস লাভ করিতে পারি নাই, এজন্য প্রতি মুহূর্ত্তে আপনাকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছি, তবুও তাঁহার স্নেহলাভে বঞ্চিত হই নাই। বিগত বৎসর তাঁহার রসারোডের প্রিয় ভবনে অতি প্রত্যুষে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, আমাদের অনাবশ্যক বাক্যালাপে তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করা গর্হিত, তাই শুধু একবার ঐ তীর্থভবনে দেবতার চরণ ধূলি মাথায় লইতে গিয়াছিলাম। যেমন বাহির হইয়া আসিলেন—আমি তাঁহার চরণ ধূলি মাথায় লইলাম, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই যে যোগেন্দ্রবাবু, ভাল আছেন ত? এখনও ঢাকায়ই আছেন?" আমি বলিলাম "আজ্ঞে হাঁ, আপনাকে অনেকদিন দেখিতে পাই নাই, তাই দেখিতে আসিয়াছি। আপনার শরীরত অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, এত খাটেন অথচ শরীরের প্রতি যত্ন নিতে একেবারেই মন দেন না।" একটু হাসিয়া বলিলেন "শরীর কি কারু চিরদিন থাকে? এরূপ সময় আমাদের গ্রামবাসী দেশবন্ধুর আত্মীয় শ্রীযুক্ত কালীপদ উকীল মহাশয় আসিয়া বলিলেন "শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু আরও কয়েকজন স্বরাজ্যদলের নেতা বাড়িতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে উপরে আসিতে বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আর এক সময় আসিবেন, গল্প করা যাইবে।" দেশবন্ধু তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে লইয়া হল ঘরে যাইয়া বসিলেন, আমি পুনরায় তাঁহার চরণধূলি লইয়া চলিয়া আসিলাম। সেই দীর্ঘ, সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ রোগজীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চক্ষুদু'টীতে প্রতিভার দিব্য জ্যোতিঃ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে, মুখে হাসি তেমনি লাগিয়া আছে। আর সেই বিশাল পুরী, যাহা প্রতিনিয়ত প্রার্থীর দলে, দীন ভিক্ষুকের দলে—সাহিত্য সেবক, ব্যবহারজীবি, মক্কেল প্রভৃতির দ্বারা ও আত্মীয় স্বজনের কলকোলাহলে উজ্জ্বল দীপমালা পরিশোভিত নাট্যশালার ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত, তাহা নীরব ও নির্জ্জন। কালীপদবাবু ও দেবেন্দ্রবাবু মাত্র দুইজন সেখানে রহিয়াছেন, সেই চাকর, খানসামা, ঠাকুর, বাবুর্চ্চি কেহ কোথাও নাই। সাধারণ মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন গৃহস্থের ন্যায় ক্ষুদ্র আয়োজন, ক্ষুদ্র চালচলন, কে বলিবে যে ইহা ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশের বাসগৃহ। এ যেন নিভৃত তপোবন। কোন সাড়া শব্দ নাই, সমুদয় স্তব্ধ ও শান্ত এ দৃশ্য দেখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম। চোখে জল আসিল। তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার প্রথম হইয়াছিল সেই বরিশালের বিখ্যাত প্রাদেশিক সমিতির সময়। তখন গ্রামে গ্রামে বানের জলের ন্যায় স্বদেশীর বন্যা আসিয়া ঢুকিয়াছে। বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমি ও আমাদের গ্রামবাসী কয়েকজন বন্ধু পরম উৎসাহের সহিত রওনা হইলাম। চাঁদপুর যাইয়া আমাদিগকে জাহাজ ধরিতে হইয়াছিল। জাহাজে লোকে লোকারণ্য—'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত। দেশের শ্রেষ্ঠ মহারথীগণ দেশের সেবায় চলিয়াছেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বি, সি, চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতি আরও অনেক নেতৃবৃন্দের সহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও চলিয়াছেন। পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে গ্রামবাসিগণের অপূর্ব্ব অভ্যর্থনা ও জয়োল্লাসের ভিতর দিয়া আমরা যখন বরিশাল পৌছিলাম, তখন রাত্রি হইয়াছে। ষ্টীমার তীরে ভিড়িয়াছে, কিন্তু একটা ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। কোন যাত্রীই তীরে নামিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন না, ব্যাপার কি? এমন সময় শোনা গেল বরিশালের সরকারি কর্ম্মচারীগণ জানাইয়াছেন যে তোমরা তীরে নামিতে পার যদি 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি না কর, এ বিষয় লইয়া স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহিত পুলিশ সাহেবের তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল। চিত্তরঞ্জনের এ সকল দিকে লক্ষ্য ছিল না, তিনি সহরের বিপরীত দিকে জাহাজে ক্যাবিনের পার্শ্বস্থ রেলিং ধরিয়া আধ আলো আধ অন্ধকারের মধ্যে যে পরপারের ঘনকৃষ্ণ তরুরাজি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল আকাশে ভাসমান তারকা রাজি জ্বলিতেছিল তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন।

আমি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। ভীত সঙ্কুচিত মনে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হইলাম, আমার

মনে এই জোরটুকু ছিল যে আমি বিক্রমপুরবাসী, তিনিও বিক্রমপুরের অধিবাসী। সেদিন বাহিরে জনস্রোতের প্রবল উচ্ছ্বাস, সহস্র সহস্র কণ্ঠে গগনভেদী চীৎকার, কিন্তু যোগরত তাপসের ন্যায় ধ্যানী, মৌনী চিত্তরঞ্জন কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বিশ্ব প্রকৃতির সহিত আপনাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

আমার সহিত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রায় একঘণ্টা কাল অনেক কথা হইল। আমি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কত কি বলিয়া যাইতে লাগিলাম। দেশের কথা অর্থাৎ বিক্রমপুরের কথাই বলিতেছিলাম। আমি তখন বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখিতে-ছিলাম, আমাকে বলিলেন 'যদি কখনও কলিকাতা যান, তাহা হইলে আমার সহিত দেখা করিবেন।'

বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে যে দুইদিন ছিলাম, সর্বক্ষণ আমি তাঁহার সেই উজ্জ্বল প্রতিভা দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকিতাম, তাঁহার এমনি একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে সেবার সমিতিতে উপস্থিত অনেকের দৃষ্টিই তাঁহার দিকে নিবদ্ধ ছিল।

বাঙ্গালা ১৩১৫ সালে আমার বিক্রমপুরের ইতিহাস ছাপা হইতেছিল। আমি স্বর্গীয় কালিমোহন ও দুর্গামোহনের ছবি প্রস্তুত করিবার জন্য দেশবন্ধুর বাড়ীতে যে সুবৃহৎ তৈলচিত্র ছিল, তাহার ফটোগ্রাফ লইবার ব্যবস্থা করিতে গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে ফটোগ্রাফার ছিল। সেদিন ছিল রবিবার। দেশবন্ধু কয়েকজন বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম কার্ড ইত্যাদি কত কি হাঙ্গামা হইবে, কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। কে বলিবে বিলাত ফেরতের বাড়ী? সাহেবিয়ানার নাম গন্ধও নাই। আমি সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম—'আপনি বোধ হয় আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন,' আমার দিকে একটু তাকাইয়া হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনিই ত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' লিখিতেছেন, কতদূর করিলেন? আমি তাঁহাকে পাঁচ ছয়টি মুদ্রিত ফর্ম্মা দেখাইলাম। সাদরে হাত পাতিয়া লইয়া ফর্ম্মাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন—"আমাদের দেশের ইতিহাস হওয়াটা খুবই দরকার। আপনি এত অল্প বয়সে এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন বেশ ভাল।" ছবি দু'খানি উপর হইতে নামাইয়া দিবার জন্য তখনি আদেশ দিলেন। নিজে ছবি তোলার ওখানে আসিলেন এবং আমাকে বলিলেন—"টাকা পয়সা যে বিষয়ে আপনার ইতিহাস প্রকাশ সম্বন্ধে আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমি তাহা করিব।" ইতিহাস লিখিতে যাইয়া শুধু নিরাশার কথাই শুনিয়াছি, এমন স্নেহের কথা ত কেহ বলেন নাই! হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল।

আমার সৌভাগ্যবশতঃ দেশবন্ধুর পিতৃদেব স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাশ মহাশয় আমাকে নিজ হস্তে তাঁহার অগ্রজ-দ্বয়ের জীবন কথা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু অনুরোধ করিয়াও কিন্তু নিজের জীবনী সম্বন্ধে একটি কথাও লিখিতে পারি নাই। দেশবন্ধুর পিতৃদেব আমাকে যে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, যেরূপ সস্নেহ সম্ভাষণ করিতেন, তাহা এ জীবনে কোনদিন বিস্মৃত হইব না।

(ক্রমশঃ)

আমার কথা

(ছোট গল্প)

[শ্রীভবতারণ বসু]

আজ মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত নব যুগের প্রথম সম্বৎসরে, প্রবর্ত্তিত যুগের ঘটনাবলীর মাঝখান দিয়ে এখনও আমার মনে জেগে ওঠে –"সেই অতীতের একটা ক্ষীণ শুভ মুহূর্ত্তের স্বেচ্ছা প্রদত্ত একটা চির জাগ্রত স্মৃতির পূর্ব্ব কথা।"

আমার কথা—পতিতার আত্মকথা। রুচির খাতিরে যাঁরা এ কথা না শুনতে চান তাঁদের কাছে আমার বলবার কিছুই নাই, কিন্তু যাঁরা ছোট গল্প পড়বার আনন্দ উপভোগ করবার জন্য পড়তে আরম্ভ করবেন তাঁরা যে নিশ্চয়ই হতাশ হবেন তা আমি বেশ জোর করে বলতে পারি।

কবি, কল্পনার তুলিতে যেটা তাঁর মনের মতন করে তৈয়ারী করেন, বাস্তবের সঙ্গে তার যে কতখানি প্রভেদ যাঁরা সেটা উপভোগ করবার অবকাশ পেয়েছেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন এটা আমার নিজের মনের কথা। এর সঙ্গে কাব্যের কোনও মাদকতা নেই, বিরহের হা-হুতাশ নেই। আছে কেবল কর্ত্তব্যের একটা ইঙ্গিত; নিজের একটা স্বাবলম্বনের উপায়ের কথা।

আর যদি কেউ প্রেমিক থাকেন, যদি নভেলের ভালবাসা তাঁদের অস্থি মজ্জাগত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তাঁরা আমার সেই পুরাতন স্মৃতির মধ্যে দেখতে পাবেন একটা নিরাশা-দীপ্ত ব্যথিত জীবনের অস্পষ্ট যন্ত্রণা, জীর্ণ বুকের অস্থি পঞ্জর ভেদী পুরাতনের মধ্যে একটা চির নূতন স্মৃতির অস্পষ্ট ছায়া।

কর্ম্মফলের সঙ্গে অনুতাপের একত্র মিলনের একটা সুদীর্ঘ অবসর দিয়ে যেদিন আমি সমাজের গণ্ডীর বাহিরে এসে পড়েছিলাম, সেদিন অবশ্য একটা তুচ্ছ ক্ষণিক সুখের প্রলোভন আমাকে স্বর্গের বিমল আনন্দ দান করতে স্বীকার হয়েছিল, কিন্তু এখন বুঝেছি সেটা স্বর্গের সুধা নয়—কামনার তীব্র হলাহল। সাধ করে সেদিন সেই বিষ পান করেছিলাম। "ভাবিতে উচিত ছিল –" কিন্তু কাজের সময় ক'জনে তা ভেবে কাজ করে?

দু'দিন বাদে—যেদিন সে স্বপ্নের সুখ ভেঙ্গে গেল, সেই দিন নিজের জীবনের চেয়ে বেশী ঘৃণা হ'ল এই স্বার্থপর পুরুষ গুলোদের ওপর। সংসারের কূট নীতির সঙ্গে চির অপরিচিতা, আমার মত কত অনাথার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করে তারাই আবার সমাজের কোলে স্থান পাচ্ছে। আর আমরা? আমাদের কথা ভাবতে গেলে সমাজের সঙ্কীর্ণতার কথাই মনে আসে।

ইহকাল আর পরকালের জন্য যা কিছু সম্বল ছিল, যেদিন সেগুলো হারাইয়া ফেললাম, সেদিন মরবার জন্য একটা আগ্রহ এসেছিল বটে কিন্তু মরা হ'ল না। মরণ হ'লে এ অনুতাপ কোথায় থাকবে?

নৈয়ায়িক, দার্শনিক, যাই বলুন না কেন, কিন্তু মরণের পর যে নরকের কথা আছে, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস জীবনের এই অনুতাপই সেই পাপের শাস্তি। এই অনুতাপের জ্বালা যে কত অসহ্য, অনুতপ্তরাই তা বেশ জানে। নরকের জ্বালা কি এর চেয়ে বেশী?

সবার চেয়ে আশ্চর্য্যের জিনিষ সংসারের কর্ম্মসূত্র। নিয়তি যে কাকে কখন, কোন সময়ে, কোন পথে, কি ভাবে নিয়ে যায়, সেটা বুঝে ওঠা বড় কঠিন। যাকে ত্যাগ করতে চেষ্টা করলাম, সেই আবার আমার ভবিষ্যতের উপায় হ'য়ে উঠলো।

চেষ্টা করেছিলাম রূপের বাজার থেকে নিজের দোকান পসার তুলে নেবার জন্য। কিন্তু তাহ'লে নিজের অভাব পূরণ হয় কোথা থেকে? দু'টী উদরান্নের জন্য—সকলের চেয়ে প্রধান সভ্যতার উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্য আবার আমাকে নিজের ইচ্ছার প্রতিকূলে সেই পথেই চলতে হ'ল।

সমাজ তন্ত্রীরা হয়ত এ কথা শুনে চম্‌কে উঠবেন ; হয়ত তাঁরা উদরান্ন সংগ্রহের অনেক সহজ উপায় নির্দ্দেশ করে দেবেন, কিন্তু তাঁরাই যদি বেশ মন স্থির করে ভেবে দেখেন, তাহ'লে বুঝতে পারবেন 'সহানুভূতি' বাঙ্গালা দেশ থেকে অনেকদিন আগে বিদায় নিয়ে গিয়েছে।

অনুকরণ প্রিয় সুসভ্য দেশে 'সহানুভূতি' যে পথ দিয়ে গিয়েছে, ভরা যৌবন নিয়ে যেদিন প্রথম সে পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেম সেদিন যারা আমার সঙ্গে 'সহমরণে' যেতেও প্রস্তুত ছিল, যৌবন জোয়ারে ভাঁটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারাও আমায় ত্যাগ করে তাদের সে অকৃত্রিম সহানুভূতির পরকাষ্ঠা দেখাতে ক্রুটী করে নি।

পোড়া রূপের সঙ্গে সঙ্গে সবই গেল। এই রূপদীপ্ত দেহের অভ্যন্তরে যে নরকের পূতীগন্ধ আছে, পরিণামে যে শ্মশান ভস্মের স্তুপ সঞ্চিত রয়েছে, লোকে যদি সে সময় তা মনে করতে পারত, তাহ'লে তারা এ নশ্বর রূপের জন্য পাগল হ'ত না—ইহকাল পরকাল নষ্ট করত না।

যেদিন এই নশ্বর রূপের অভাবে আমাকে নিরাশার একটা অকূল সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খেতে হ'য়েছিল জীবনের সবচেয়ে দুঃখের, সবচেয়ে মর্ম্ম যাতনার সেই দিনগুলো, আবেগভরা হৃদয়ের একটা উষ্ণ তপ্তশ্বাসের সঙ্গে পুরুষ-গুলোকে অভিশপ্ত করবার জন্য যে কি পর্য্যন্ত ব্যস্ত হ'য়েছিল তা আমি নিজেই বলতে পারি না। অত্যাচার পীড়িত দুর্ব্বলের সহায় যিনি, যদি এ সংসারে তাঁর কোনও অস্তিত্ব থাকে, তাহ'লে তিনি বুঝতে পারবেন সে জ্বালা কত বড় ভয়ানক।

সে দুর্দ্দিনে ছেলেবেলার অন্ধ বিশ্বাস, জন্মগত সংস্কার সবই যেন আমার প্রতিকূল হ'য়ে উঠেছিল। পতিতা আমি—পতিতপাবনী গঙ্গাও আমার সে বুকের জ্বালা তাঁর সমস্ত পূত পবিত্র জলে ধুয়ে ফেলতে পারলেন না। ভগবানকে আত্মসমর্পণ করে তাঁর দয়াল নামের কোনও সার্থকতা খুঁজে পেলাম না।

কিন্তু বুঝতে পারলাম না—কে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে আমার ভবিষ্যতের এই জীবনটাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। সে সময় যারা আমার সহকারিণী ছিল, সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে তারা যে কে কোথায় চলে গিয়েছে তা আমি জানি না, কিন্তু আমি ঠিক সেই রকমই আছি। আমার বাইরের চালচলন দেখে লোকে বলত ভগবান নাকি আমার ওপর সদয় আছেন বলেই আমার চির দিনটা এক রকমেই কেটে গেল।

আসল কথা কিন্তু তা নয়। তখনকার দিনে আমার আকাঙ্খার পরিসমাপ্তির যে অভাব ছিল এখন আর ঠিক তা নেই। লোকে যাই বলুক না কেন কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারি আমার অতীতের সেই দুঃখের দিনগুলোর মাঝখানে একটা অপূর্ব্ব শুভ মুহূর্ত্ত খুব নীরবে এসে নীরবে চলে গিয়েছে। সেই শুভ মুহূর্ত্তটা যে আমাকে এতটা পরিবর্ত্তনের পথে এনে দেবে তা আমি কোনওদিন কল্পনায়ও আনতে পারিনি।

কেউ বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু আত্মবিক্রয় করে এই নশ্বর দেহটাকে লালসার আগুনে ফেলে দিতে আমার যে আদৌ অভিপ্রায় ছিল না তা আমি শপথ করে বলতে পারি। কিন্তু জীবনের একদিনের একটা ভুলে সমাজ আমাদের যে পথে এনে ঠেলে রেখেছে, সে পথে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন ধারণের জন্য আর যে কোন সহজ উপায় আছে তা আমি তখন ঠিক করতে পারি নি!

* * * *

একদিন বসন্তের একটা গভীর রাতে—জোছনার স্নিগ্ধ আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হঠাৎ তাঁর সেই শান্ত গম্ভীর চেহারা খানা নিয়ে আমার চোখের কাছে ফুটে উঠলেন। স্বর্গের দুর্লভ রূপ দিয়ে আমি তাঁর চেহারা খানা কল্পনার তুলিতে তুলে ধরতে না পারলেও আমার মনে হ'ল কি সুন্দর তাঁর রূপ।

কিন্তু তাঁর চেহারার অনুরূপ ছিল না তাঁর সাজগোজ। কমলার বরপুত্রের মত রূপবানও কি অভাবের পীড়নে নিষ্পেষিত? কিন্তু তা দেখবার আমার দরকার ছিল না। আমার যা দরকার তাই পেলেই হ'ল।

নিজের ঘরে গিয়ে—দীপের আলোক আরও উজ্জ্বল করে দিয়ে আর একবার সেই মুখখানি ভাল করে দেখে নিলাম।

মোটা একটা খদ্দরের কোট তাঁর গায়ে ছিল; আর ছিল পরিধানে চটের মত একখানা 'খদ্দরের' কাপড়।

তবুও কিন্তু সেই সামান্ত মোটামুটী রকমের পোষাকের মাঝখান দিয়ে আমি দেখতে পেলাম একটা দেব দুর্লভ কমনীয় রূপ।

বলতে লজ্জা করে—কালামুখী আমি, লালসার আগুনে আত্মাহুতি দিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হ'লেও সেইদিন সেই বসন্তের আনন্দ রজনীতে আমি তাতেই আসক্ত হ'য়ে পড়লাম।

স্পষ্ট বোধ হ'ল—তাঁর মুখখানার বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমি তাঁকে বসতে অনুরোধ করলাম, কিন্তু তিনি বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন বড় সুন্দর বলে বোধ হচ্ছিল তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর মুখখানা, তাঁর টানা টানা চোখ দু'টী।

আমার দিকে একটুখানি চেয়ে তিনি মাথাটা নিচু করে নিলেন। বেশ বুঝতে পারলাম—তাঁর সেই প্রশান্ত গম্ভীর মুখখানা যেন আরও গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—বসতে কি কোনও আপত্তি আছে?

অন্যমনস্ক ভাবে 'না' বলিয়া তিনি আর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তাঁর সে চাহনির অর্থ বুঝতে আমার সামর্থ্য ছিল না, তাই মনে হ'ল রূপের বাজারে এত দিনের পর বুঝি আমার এ রূপেরও আদর হ'ল। মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে জিজ্ঞাসা করলাম কি ভাবছেন শুনতে পাই কি?

যা উত্তর পেলাম এ পথের পথিকদের কাছে তেমন নীরস মর্ম্মভেদী সত্য কথা শোনবার আশা করা যায় না। তথাপি তিনি বেশ সরলভাবে সম্ভ্রমস্বরে বললেন—কথাটা শুনে হয় ত আপনি সত্যের মর্য্যাদার ওপর আঘাত করতে উদ্যত হবেন, কিন্তু তা'হলেও এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

'সত্যের মর্য্যাদার ওপর আঘাত করবার ইচ্ছে না হলেও' রাগ হ'ল তাঁর এই ঔদ্ধত্যতার উপর। কিন্তু তা প্রকাশ করা গেল না। কেন না আমি যে মরিয়াছি।

বসবার জন্তে অনুরোধ করে আমি তার হাতখানি ধরতে গেলাম, তিনি দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বললেন—আমি এই বেশ আছি।

যেন নিতান্ত অপরাধীর মত তিনি আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি আর তাঁকে একটা কথা বলবারও সাহস পেলাম না।

চুপটী করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে পড়ল তাঁর সেই কথাটী। দেহ বিক্রয়ের গ্রাহক হ'য়ে তিনি আসেন নাই। এসেছেন একটা অভ্রান্ত সত্যের অন্বেষণে।

তাঁর সেই অভ্রান্ত সত্যটীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাণটা জলে উঠলো। সেই জ্বালাটা শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহের সঙ্গে সমস্ত দেহটা ঘিরে ফেললে। মাথা ঘুরতে লাগল, স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারলাম না। মাথাটা পালংএর ওপর রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যখন চোখ খুলে মাথাটা তুলে চেয়ে দেখবার অবসর পেলাম, তখন তিনি নিতান্ত অপরাধীর মত আমার পিছনে দাঁড়িয়ে।

তিনি আমায় বললেন—লতিকা! বেশ নামটী তোমার। বেশ সুন্দর রূপটী তোমার। জানি না ভগবান অমৃতের মাঝখানে কেন গরল রেখেছেন। জানি না তোমার কপালে এ দুর্গতি কেন? এটা কি কর্ম্মফল না আমাদের সমাজের সংকীর্ণতা?

*　　*　　*　　*

জানি না এই 'কেন'র উত্তর কি? কোন সুখের প্রলোভনে আমরা এ পথে এসেছিলাম? কোন সুখের প্রলোভনে এই দেহ বিক্রয়ের জন্য এখনও আমি অপরের করুণা প্রার্থিনী?

আমি তাঁর দিকে আর একবার খুব একটুখানি সময়ের জন্য ফিরে চেয়েছিলাম। তিনি আমার চাহনির কি অর্থ ঠিক করেছিলেন জানিনা, তবে এই কথা বললেন- সব চেয়ে বেশী ভুল করেছেন যদি আমাকে তাই ভেবে স্থান দিয়ে থাকেন।

কথার ভাবে বুঝলাম দুনিয়ার ভেতর তাঁর সব চেয়ে ঘৃণার পাত্র সে, যে এই রূপের বেসাতি নিয়ে মানুষকে ঠকাতে চেষ্টা করে।

রাগ হ'ল তাঁর এই সমালোচনার ওপর। বললাম, আপনারাই আমাদের এ পথ দেখাবার মালিক। সকলেই একদিন ওই রকম সংসারের আবর্জ্জনা-হীন বিমল চরিত্র দিয়ে আমাদের কাছে দেখা দেয়। শেষে কিন্তু তাঁরাই আমাদের সর্ব্বনাশ করে।

তিনি খুব সরল ভাবে সে কথার উত্তর দিয়ে বললেন—সেটা বিশ্বাস করতে কোনও দিন অস্বীকার করবার সুযোগ আসবে না। তবে সমাজের স্বার্থপরতার দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের সাবধান হওয়া দরকার।

আমি উত্তর দিলাম— কিন্তু এখন আমাদের প্রাণ বাঁচাবার এইটেই সহজ উপায় যে।

তিনি একটু দৃঢ়স্বরে বললেন—ভুল কথা! ছেলেবেলায় তোমাদেরই মুখে তোমাদেরই ব্রত কথা—'আলপনা পূজায়' শুনেছিলাম—

চরকা আমায় ভাতার পুত, চরকা আমার নাত্তী,
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী ॥

এ কথাটার ভেতর তবে কি সত্যের কোন নাম গন্ধ নেই?

আমি সে কথায় কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। মাথাটা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিনি চলে যাবার আগে আরও অনেক কথা বললেন—বললেন না কেবল তাঁর নামটী। ইচ্ছা করে—কি ভুল করে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

* * * *

দরজা বন্ধ করে সে রাত্রির মত আমিও বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না, তার বদলে কতগুলো পুরাণ স্মৃতি এসে আমায় আকুল করে তুললে। মনে পড়ল—সংসার জীবনের সেই মূর্ত্তিমান দেবতা—জীবন সংগ্রামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সহযোগী স্বামীর কথা।

কত অবিশ্বাসিনী আমি। যিনি আমাকে বিশ্বাস করে তাঁর সংসারের অসমাপ্ত কাজগুলোর ভার আমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ইহ সংসার থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন, সামান্ত দিনের ভেতর ভুলে গেলাম আমার সে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা ভুলে গেলাম—নারীর কর্ত্তব্য ইহকাল পরকালের কথা। সমাজ আমাদের সেই অপরাধের শাস্তি দিয়েছে। এ শাস্তি কি যথেষ্ট?

জীবনের সেই পরিবর্ত্তনের দিনে মনে পড়ল এক বিশ্বাসঘাতকের কথা; যে দিন সে আমার কাছে প্রথম এসে দেখা দেয়, কত ভাল মানুষটী বলে মনে হইয়াছিল। কে জানে অমৃতের মধ্যে এত গরল;—কে জানে দয়ার মধ্যে এত পৈশাচিকতা?

আমি তখন বুঝতে পারি নি, তার সহানুভূতির মধ্যে কামনার আগুন এমন ভাবে লুকাইয়ে আছে। যদি সংসারের এ কুটীলতা তখন ভেবে দেখবার ক্ষমতা থাকৃত, তা'হলে বোধ হয় আজ এই অনুতাপের আগুনে পলে পলে জলে পুড়ে মরতে হ'ত না।

অনেক দিন সে নিঃস্বার্থ দয়াশীলের মত আমার সেই বৈধব্যের বিষাদক্লিষ্ট চঞ্চল যৌবনের জন্য চোখের জল ফেলে ছিল। তখন সে সহানুভূতি কত মিষ্ট লেগেছিল তা তখন নিজেই বুঝে উঠতে পারি নি, তবুও মনে হয় তার ভেতর কোনও কৃত্রিমতা ছিল না।

কিন্তু এ পথে এসে ক'জন তার অফুরন্ত কামনাকে দমন করে রাখতে পেরেছে? যেদিন সেটা বুঝতে পারলাম সেদিন অভিমান হল এই বিলাসের স্বপ্ন সুখের ওপর।

ভুল করে তারই ইঙ্গিতে—তারই প্রদর্শিত পথে চলে এসেছি। এখন ত আর এ পথ থেকে ফিরে যাবার উপায় নেই। সঙ্কীর্ণ সমাজ অত্যাচারী পিশাচকে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হ'ল না, যত কুণ্ঠা হ'ল তার এই অত্যাচার পীড়িতা অনাথাকে আশ্রয় দিতে।

অত্যাচার পীড়িতাকে—অনাথাকে স্থান দেওয়া দূরে থাক তার জন্য একটু সহানুভূতি দেখাবার ক্ষমতা বোধ হয় আমাদের সমাজের ছিল না।

* * * *

পরদিন ঠিক তেমনি সময় আবার তিনি আমাকে দেখা দিতে এলেন। আমি তাকে বেশ চিনতে পারলাম, যদিও তিনি তা আশা করেন নি। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমিও তাঁকে অনেক কথা বললাম; তিনি তা শুনলেন

কিন্তু কোনও কথা বললেন না, যাবার সময় আবার আমায় দর্শনী দিয়ে বিদেয় হ'য়ে গেলেন।

একবার মনে হ'য়েছিল টাকাটা তাঁকে ফিরিয়ে দি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল ওই ত আমাদের সর্ব্বস্ব। ওকে অনাদর করলে পেট চালাব কেমন করে? জীবন ধারণের জন্ম পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ঘৃণিত যা সেই উপায় অবলম্বন করার অপেক্ষা মরণ যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ একথাটা তখন দু'একবার মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু পাপীও যে মরণে ভয় পায়। তাই মরতে ইচ্ছে হ'লেও মরা হ'ল না। সংসারের অভাব মোচনের জন্ম উপায়ের সব ক'টী পথ খোলা থাকলেও সে পথে যেতে সাহস হল না। তার সঙ্গে আত্ম-অভিমান আছে, লজ্জাও আছে। কিন্তু হায় বুঝতে পারলাম না, এই ঘৃণিত উপায়ে, সে লজ্জা, সে আত্ম অভিমান রক্ষা করবার চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হ'তে পারে?

ভালবাসার ব্যবসাদারীতে যতগুলো ক্রেতাকে আমি নিজের হস্তগত করেছিলাম, তার মধ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের ছিলেন—আমার এই নব পরিচিত যুবকটী। তাঁর চাল-চলন দেখে মনে হ'ত, তিনি খুবই ঘৃণা করেন এই পথটাকে। কিন্তু তাঁর প্রাণের খুবই সহানুভূতি ছিল এই সব পতিতাদের ওপর। একদিন এই সমস্ত কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক তর্ক হ'য়েছিল। তিনি আমাদের চেয়ে তাঁদের মত নব্য-সমাজকে খুবই নিন্দা করলেন।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, তাঁর এই সহানু-ভূতির মাঝখানে কিসের স্বার্থ লুকান আছে।

তর্কের খাতিরে তিনি তাঁর নিজের মত প্রকাশ করে বললেন—সমাজকে রীতিমত ভাবে পূর্ণ অবয়বে গড়ে তুলতে হ'লে আমাদের ওপর সহানুভূতি দেখান দেশের শিক্ষিত সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না আমাদের এই কর্ম্মের ফলভোগের সঙ্গে সমাজের অঙ্গ হীনতার সম্পর্ক কি?

* * * *

ক'দিনের ভেতর তিনি আমার মনটীকে তাঁর নিজের আয়ত্বের মধ্যে কতদূর নিয়ে গিয়েছেন তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। সবার চেয়ে তাঁর একটা অসীম ক্ষমতা দেখলাম—আমার মনের উপর তাঁর প্রভুত্ব করা। তেমন কিছু বাঁধাবাঁধির মধ্যে না থেকেও কেন যে বুঝতে পারলাম না—আমি মাথা হেঁট করে মেনে নিলাম তাঁর সেই প্রভুত্বটাকে।

চূর্ণ হয়ে গেল আমার বিলাসের অভিমান। বুঝতে পারলাম এ জীবনটা কিছুই নয়। তবে কেন এ বিলাসিতা, তবে কেন এ আত্ম অহঙ্কারের সোজা পথে অগ্রসর হওয়া? একদিন তাঁর সেই সামান্ত বেশভূষা দেখে যে মনে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছিল, আজ সেই মনই নিজে স্বীকার হ'ল,—তেমনি সরল ও সহজভাবে কর্ম্মের পথে চলে যেতে।

ইচ্ছা করে একদিন সব পরিত্যাগ করলাম। হাতের কাটা সূতার মোটা কাপড়ে সেজে দেখলাম, এই দেহ-খানিকে—দেখতে কেমন সুন্দর হয় কি না? কাপড় পরে আরসীর কাছে এসে নিজের মুখখানা দেখে শিউরে উঠলাম। মনে পড়ল আমার কর্ত্তব্যের কথা—স্বামীর নীরব আদেশের কথা।

বুঝতে পারলাম—হিন্দুর সংসারে এ ব্রহ্মচারিণী বেশের আদর কেন?

আমার সে বেশ দেখে তিনি সন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন কিনা, তা জানিনা, কিন্তু তাঁর মুখে চোখে যে একটা প্রীতির আভা ফুটে উঠেছিল, তাই দেখে আমি আত্মহারা হ'য়ে পড়লাম।

ভুল করলাম—অনেক দিনের একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে সে সময় নিজের কাছে এনে। সাধ হ'ল তার পদসেবা করতে। মনের সম্পূর্ণ অগোচরে আবেগটাকে কখন তাকে ইঙ্গিতে সে কথা বলে ফেলেছিল তা আমি ঠিক বুঝে নিতে সময় পেলাম না।

তিনি আমার সে ভুল ভেঙ্গে দিতে গিয়ে বললেন—লতিকা! পাপের যে শক্তিটাকে আমি এতদিন সব চেয়ে বেশী হীন বলে মনে করতাম, এই কয়দিনের মধ্যেই বেশ বুঝতে পেরেছি ওই শক্তিটাই মানুষকে পশু প্রকৃতির বাধ্য করে ফেলে।

বেশ মনে পড়ে তখন আমি তাঁর পায়ের ওপর মাথা রেখে নিজের তৃপ্তির সঙ্গে একটা ভবিষ্যতের ভাবনায় ব্যস্ত ছিলাম। তিনি আমার সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার

জন্য খুব সন্তর্পণে আমার হাতখানি ধরে আমাকে টেনে তুলবার চেষ্টা করলেন। বেশ অনুভব করতে পারলাম তাঁর সেই কম্পিত করস্পর্শ কত সুন্দর—কত মধুর!

লালসার স্ফুরিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চাইতেই তিনি খুব বিষণ্ণভাবে মাথা হেঁট করে বললেন—আমি আশা করিনি যে তুমি আমাকে এমনি করে লালসার পথে টেনে নিয়ে যাবে।

রাগ হ'ল তাঁর এই ভণ্ডামীর উপর। যদি তিনি এত সাধু, যদি তিনি এত চরিত্রবান তবে এ পথে কেন? তিনি তার উত্তর দিয়ে বললেন—তিনি শুধু চেষ্টা করছিলেন এই বিরাট পতিত সমাজের কাছে দেশের জন্য কিছু সহানুভূতি পেতে পারেন কি না?

আশ্চর্য্য হ'লাম তাঁর একথা শুনে। মনে পড়ল সেই প্রথম দিনের কথা—'সংসারে থাক্‌লে এরূপের কত আদর হ'ত।'

একটা লালসার তীব্র মদিরায় তখনও আমি বাহ্যজ্ঞান হীনা। কখন যে তিনি আমায় ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন তা আমি জান্‌তে পারি নি।

দরজা বন্ধ করে বিছানায় ফিরে এসে দেখি একখানি সুন্দর 'হাফটোন' সেখানে পড়ে রয়েছে। আলোর কাছে ধরে দেখলাম সে 'ফটোখানি' তাঁরই নিজের। তেমনি সরল হাসিমুখ—তেমনিই প্রশান্ত স্নিগ্ধ চাহনি।

'ফটোখানাকে' যত্ন করে তুলে রাখলাম।

* * * *

তিনমাস আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। বোধ হয় সহরের সে রাস্তাটা তিনি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের এ ভাবান্তর হ'ল কেন তা বুঝতে পারলাম না।

সকলের চেয়ে অধিক ঘৃণা হ'ল এই ব্যবসাদারীতে। মনে মনে স্থির করলাম, না খেতে পেয়ে মরতে হয় সেও স্বীকার, কিন্তু ও পথে আর পা দেব না।

* * * *

জ্যৈষ্ঠ মাসের একটা শেষ দিনের কথা বলছি। নীচের ঘরের সেই নূতন ভাড়াটে, 'নলিনী' একখানা মস্ত বড় 'আলবাম' হাতে করে আমার কাছে এসে বললে—কি করছ দিদি!

আমি তখন গীতার 'কর্ম্ম-যোগ' নিয়ে অন্যমনস্ক। কর্ম্মের আসক্তিই সংসারের দুঃখের মূল, অথচ এই কর্ম্মই নিষ্কাম পথের পথ প্রদর্শক কথাটা তখন ভালরকম বুঝে উঠতে পারিনি। তখন এই কথাটাই মনে হ'চ্ছিল—

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সী কেশব?

নলিনী বললে—দিদি! তোমার জন্য খুব ভাল একটা জিনিষ এনেছি। দেখতে চাও?

আমি তার দিকে বক্রদৃষ্টিতে ফিরে চেয়ে বললাম—কি জিনিষ নিয়ে মরতে এসেছ?

নলিনী বললে—খুব ভাল একখানা ছবি। বাঁধিয়ে রাখলে ঘরটা খুব মানাবে।

নলিনী আমার চোখের সামনে সে ছবিখানা খুলে ধরলে।

কি দেখলাম তা আর বলতে পারিনি। হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠলো, চোখ ফেটে জল এলো। চেষ্টা করেও তা নলিনীর কাছে লুকিয়ে ফেলতে পারলাম না।

নলিনী বললে—ওকি কাঁদচ কেন দিদি!

এই হতভাগিনীর পাপ চক্ষের দুই ফোঁটা অশ্রু যে প্রতিকৃতির উপর পড়েছিল—এত সেই প্রতিমূর্ত্তি। সেই সরল হাসিমাখা মুখ—সেই প্রশান্ত গম্ভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি।

তবে কি তিনি এখন স্বরাজ তীর্থের যাত্রী?

* * * *

ঘৃণা এল এই বিলাসীতার ওপর। আমরা যাদের সহ-কর্ম্মিনী হ'য়ে, ভবিষ্যৎ মাতৃত্বের দাবী নিয়ে সংসারে এসেছি, তাঁরাই আজ দেশ মাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছেন। আর তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য আমরা কি একটু স্বার্থ ত্যাগ করতে পারি না?

মিলিয়ে নিলাম সেই ফটোখানির সঙ্গে এই প্রতিমূর্ত্তিটা। সংশয় দূর হ'য়ে গেল। ভক্তিতে মস্তক আপনিই নত হ'য়ে পড়লো।

হতভাগিনী এখন গুরুমন্ত্রে দীক্ষিতা। উদার হিন্দুসমাজ নিজেদের সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখতে গিয়ে যাদের ত্যাগ করেছে, ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সমাজ সেই পতিতা সমাজ বিতাড়িতা-দের রক্ষা করবার জন্য নিজের কোলে স্থান দিয়ে তাদের ধন্য করেছেন। এখন এই ব্রহ্মচারিণী বেশে যখনই চেষ্টা করি ইষ্টদেবতার কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি আরাধনা করতে, তখনই চোখের সামনে হৃদয়ের মাঝখানে জেগে উঠে সেই সজীব মূর্ত্তিখানি। মনে হয় আমার ইষ্টদেবতা এখন——

"স্বরাজ তীর্থের যাত্রী।"

"নির্ব্বাসন"

[শ্রীঅনীতা বোস্]

—এক—

'মা অরু সীতার বনবাস খানা নিয়ে এস'ত মা।'

কন্যা অরুণা পিতার নির্দ্দেশ মত বইখানি তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া আনিল, এবং পিতার নিকটেই একখানা আসনে বসিয়া পড়িল।

পিতা তন্ময়চিত্তে পাঠ করিতেছিলেন — "প্রজারঞ্জন রামচন্দ্র জনপদবর্গের সন্দেহ অপনোদনার্থ অন্তঃসত্বা জানকীকে বনবাসে পাঠাইলেন, সরলা স্বামীগত প্রাণা লক্ষণ সমভিব্যহারে তপোবন দর্শন অছিলায় বাল্মিকীর পরম রমণীয় তপোবনে আগমন করিলেন।

অরুণার চোখ হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল—হায় অভাগিনী জানকী জানেনা ত আজ তাহার চির বিসর্জ্জন—স্বামী দেবতার সান্নিধ্য হইতে তাহার চির নির্ব্বাসন।

সন্ধ্যার প্রহেলিকাময় নিস্তব্ধ নিশিথিনীর ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া আকাশে ২।১টী নক্ষত্র চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে কিন্তু ওই যে খড়ো ঘরের অঙ্গনে স্তিমিত দীপালোকে বসিয়া দুটী নরনারী অনন্য চিত্তে পতিগত প্রাণা সাধ্বী সীতাদেবীর অসহনীয় দুঃখ ক্লেশের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিতেছিল—দুটী চোখের পাতা ভিজিয়া কখন যে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিতেছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই।

—দুই—

তারিণীচরণ ৩০৲ টাকা মাহিনার স্কুল মাষ্টার। দশ বৎসর পূর্ব্বে পত্নীহারা হইলে, পাড়া সচকিত করিয়া তাহার করুণ বিলাপ যখন শোনা গেল না, বয়স্যগণ তখন নিশ্চিত ধরিয়া লইয়াছিল যে দ্বিতীয়বার তারিনীর গৃহে সানায়ের মিলন রাগিনী বাজিয়া উঠিতে আর বিশেষ বিলম্ব নাই। কিন্তু বছর কয়েক পরেও যখন তারিণীর গৃহ কোন এক তরুণী ঘরনীর নূপুর নিক্বণে মুখরিত হইয়া উঠিল না; তখন অনেকেরই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া কপালে উঠিল, এবং সকলেই একযোগে তারিণীচরণের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গেল। কিন্তু আরও বছর দুই পরে যখন একমাত্র কন্যা অরুণা সিঁথির সিঁদুর ও হাতের নোয়া হারাইয়া তারিণীর চোখের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, —আসন্ন বর্ষণ, জমাটবাধা মেঘের মত অসীম সহনশীল তাহার হৃদয় এ আঘাতও নীরবে সহিতে পারিল না। এতদিনকার সঞ্চিত অশ্রুরাশিকে বাঁধনহারা স্রোতধারার মত অবিরাম ঝরিতে দিয়া সদ্য বৈধব্যগ্রস্ত কন্যাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল।

* * * *

সে সব অনেক দিন গত হইয়াছে।

অরুণার জীবনের এক নতুন অধ্যায় সুরু হইয়াছে। তাহার সমস্ত যত্ন এখন সে তাহার শোকতাপ জর্জ্জরিত পিতার পরিচর্য্যায়, সে নিয়োজিত করিয়াছে। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া তাহার যৌবন-পরিপুষ্ট দেহে—যেন প্রস্ফুটিত শতদলের মত দিনে দিনে লাবণ্য বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, হয়ত বা কোন এক রঙ্গীন বাসন্তী সন্ধ্যার পাগলা হাওয়ার মৃদু পরশে তাহার অন্তর্নিহিত কোন এক গোপন কুঠুরিতে ক্ষণেকের তরে আনন্দের শিহরণ জাগিয়া ওঠে, কিন্তু সে শুধু বিদ্যুৎরেখার ক্ষণিক প্রকাশের মতই মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই অভ্যস্ত শিখায় তাহার সমস্ত চিত্ত ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ওঠে—"তাহার কর্ম্মফলেই ত আজ তাহার প্রাপ্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে—তবে আজ তাহার প্রাপ্য শাস্তিবহন করিতে অক্ষমতার নালিশ করলে চলিবে কেন।

—তিন—

ভট্‌চায খুড়ো সকাল বেলা আসিয়া হাঁকিল—"তারিণী বাড়ী আছ।"

তারিণীচরণ তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল, "কি গো খুড়ো—কি মনে করে?"

"না !—না—তা এমন কিছু নয়—হেঃ হেঃ বুঝলে কিনা —ওই ও পাড়ায় এসেছিলুম সুদের পয়সা কটা আদায় করতে ব্যাটা নচ্ছার, নিমকহারাম—ছ ছমাস হয়ে গেল—একটা পয়সা শোধ করতে পারবে না—তার আবার নাকে কান্না—হেঃ—চুলোয় যাক্...

হেঃ হেঃ তা তোমাদের অনেক দিন খোঁজ খবর নিতে পারিনি, তাই মনে করলুম—হেঃ হেঃ মায়ার কি টান দেখেছ বাবাজী ! আর তাও বলি তোমাদের জন্যেই যদি না হবে তবে হবে কি আর ওই হারাণে মুচির জন্যে—হেঃ হেঃ—বলিয়া একবার চারদিক্‌টা দেখিয়া লইয়া কহিল—"তোমার মেয়েটা কোথায় গেছে—দিঘীতে নাইতে গেছে বুঝি ?"

তারিণী দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী কন্যার উদ্দেশে ডাকিয়া কহিল—"অরুণা এস ত তোমার দাদা ঠাকুরকে প্রণাম করে যাও ত ?"

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তাভা আনতা অরুণার মুখে পড়িয়াছিল, তাহারই দিকে লোলুপ নেত্রে চাহিয়া পক্ককেশ ভট্‌চায বরাহ-নিন্দিত তাম্রকূট মলিন দন্তরাজি বিকশিত করিয়া এমনি একটা কদর্য্যস্বরে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিল, যে স্থানকাল পাত্র অনুসারে তাহা নিতান্তই বিশ্রী শুনাইল।

ভীত ত্রস্ত কুরঙ্গীর মত অরুণা দ্রুতপদে গৃহে চলিয়া গেল।

কতক্ষণ মৌন থাকিয়া, গদগদ কণ্ঠে ভটচায একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—আহা মেয়েটার দিকে চাইলে যেন দুচোখ ফেটে জল পড়ে—এমন লক্ষ্মী মেয়ে—ওর অদৃষ্টে নাকি এই লেখা ছিল।"

কণ্ঠস্বর আরও একপর্দ্দা নামাইয়া এবং ভারী করিয়া পুনরায় কহিল, "তাই ত আমাদের রাজা বাহাদুর বল্লে—আচ্ছা দ্যাখ ভটচায এই যে আমাদের দেশে যত পুরুষ এক স্ত্রী মরে গেলেই অন্য একটীকে বিয়ে করে আনে, কই এতে ত কেউ কোন কথা কইতে আসে না—যত দোষ হ'লো কিনা ঐ মেয়েদের বেলায়—তোমাদের শাস্ত্রটা কি এতই নীচ যে মেয়েদের বেলা আর কোন ব্যবস্থাই থাকতে নেই।"

এর উত্তরে তোমাদের এই ভটচায খুড়ো কি বললে জানো—"তা থাকবে বই কি নিশ্চয়ই আছে।" আমাদের হিন্দু শাস্ত্রটা ত আর ঐ পুকুর ডোবা নয় হেঃ—হেঃ—এ যে অতল সমুদ্র বুঝলে বাবাজী একেবারে বিশাল সাগর হেঃ হেঃ—কথায় আছে ধর্ম্মস্য তত্ত্ব হেঃ হেঃ"—উত্তরের আশায় কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল—"দ্যাখ আমি বলছিলুম কি জান—বুঝলে কি না—আমাদের রাজাবাবু—এই সমস্ত গাঁয়ের এই যে—হেঃ হেঃ—মেয়েটার অদৃষ্টেও অগ্নি——"

ভটচাযের কথার ইঙ্গিতে ও ইতঃস্তত ভাব লক্ষ্য করিয়া তারিণী পূর্ব্বেই কতকটা অনুমান করিয়াছিল এখন মস্তপ চরিত্রহীন লম্পট জমিদারের নাম, শুনিয়া অসহ্য ক্রোধে তাহার দুই চোখ রাঙা হইয়া গেল, কিন্তু প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া তর্জ্জনী দ্বারা ভটচাযকে বহির্দ্বারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

পুঞ্জীভূত বারুদে অগ্নি সংযুক্ত হইলে যেমন ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক সচকিত হইয়া ওঠে, তেমনি বিকট চীৎকারে ভটচায তাহার তৈল লিপ্ত অতি মলিন উপবীত হস্তে লইয়া সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া কহিয়া গেল—"আচ্ছা দেখি তোমার তেজ কতকাল থাকে—নেমক হারাম—পাজী—লচ্ছার——"

—চার—

দুইদিন হইল তারিণীচরণের স্কুলের চাকুরী গিয়াছে। তদুপরি তহবিল ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া স্কুল হইতে আরও পঞ্চাশ টাকা তাহার নিকট দাবী করিয়াছে, ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সে তাহাই চিন্তা করিতেছিল। কোন পাপে ভগবান তাকে এমন দণ্ড দিলেন। ছোটবেলা হইতে সে ভগবানে অসীম বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া সকল দুঃখ দৈন্য সে চিরদিন বরণ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আজ জীবন সন্ধ্যায় ভগবানের এ বিধানের বিরুদ্ধে তাহার সারা চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

"বাবা আজ ত ঘরে কিছু নেই—"

কন্যার আহ্বানে চমকিত হইয়া, মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত মন কঠোর হইয়া গেল, সমস্ত সকালবেলা ধরে যাই সংসারের সকল বিধি ব্যবস্থার প্রতি তাহার মন বিমুখ হইয়াছিল, তাই

অনাটনের বার্ত্তা কর্ণে যাইতেই সে তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খেতে পেরেছিস্ ত! স্বামীকে খেয়েছিস্, আমাকেও শেষ করে তবে ছেড়ে যাবি রাক্ষুসী।"

পিতার অন্তর্নিহিত অফুরন্ত বেদনার পরিমাপ করতে গিয়া এমন কঠিন তিরস্কারও অভিমানী অরুণাকে তেমন করিয়া বিঁধিল না। কতখানি দুঃখের মর্ম্মান্তিক আঘাতে তাহার পিতার অসীম ধৈর্য্যের বাঁধ আজ অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহা মনে মনে আলোচনা করিয়া, উদ্যত অশ্রু গোপন করিতে অরুণা, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

আর তারিণী পিতা হইয়া কেমন করিয়া কন্যার প্রতি এমন কঠোর লাঞ্ছনার বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তাহা স্মরণ করিতেই তাহার সমস্ত হৃদয় একটা প্রবল ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল। দীর্ঘ বিংশ বৎসর তাহার মুখে কেহ কোনদিন কঠিন কথা শোনে নাই। অন্যের কাছে যত অপরিজ্ঞাতই থাকুক তাহার ত বিন্দুমাত্র অবিদিত নাই যে অরুণা গভীর স্নেহে একমাত্র তাহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে,—

দাবদগ্ধ ধরণীর উপর তরল অগ্নিস্রোত ঝরিয়া পড়িতেছিল, এবং অদূরে জলাশয় হইতে ধূমায়মান বাষ্পরাশী ধরিত্রীর বক্ষে নিঃশ্বাসের মতই শূন্যে কুণ্ডলীকৃত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল,—

সেইদিকে চাহিয়া তারিণীচরণ একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার তেম্নি বসিয়া রহিল।

—পাঁচ—

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, আকাশের পশ্চিম দিক্ হইতে সিঁদুরে মেঘের ফাঁক দিয়া এক ঝলক রোদ চৌধুরীদের বাঁধা ঘাটে পড়িয়া, তাহার রক্তপ্রস্তরে রঙ্ ফলাইয়া দিয়াছে। পুকুরের আশে পাশে ও অদূরে, আম, কাঠাল বকুল, বাগানে দীর্ঘ ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে।

ঘাটের এক পার্শ্বে তারিণীকে ঘিরিয়া মহা কোলাহল চলিতেছিল।

ভটচায টিকি নাড়িয়া পার্শ্বোপবর্ত্তী আর একজনের উদ্দেশ্যে কহিল—"বুঝলে দাদা এ ভটচায এখনো জলজ্যান্ত বেঁচে আছে—হেঃ হেঃ—আমরা থাকতে কিনা যত সব মেলেচ্ছ—হেঃ হেঃ—"বলিয়া হস্তদ্বয় ও মুখের এমন ভঙ্গী করিল যে তারিণী ভিন্ন উপস্থিত সকলেই হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শ্যামাচরণ বাবু বিজ্ঞ লোক। কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি মাখিয়া বলিলেন—"যা হবার তা ত হয়েই গেছে ওর জন্যে আপশোষ কি বল—তা মেয়েটার নামে যখন একটা কেলেঙ্কারী উঠেছে—তখন তাকে ত্যাগ কর্লে ত সকল ন্যাটা চুকে যায়—আর তাও বলি—আমরাই বা কি করে" কেমন কি হে? বলিয়া সম্মতির আশায় তারিণীর মুখের দিকে চাহিল।

তর্কালঙ্কার সোৎসাহে কহিল—"বলি ভায়া সব দিকেই বিবেচনা করে—আর মেয়েটারও না হক্ তেমন কিছু ক্ষেতি হচ্ছে না—বয়েস আছে—চেহারা আছে—"

গভীর আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া শ্যামাচরণের পদযুগল ধারণ করিয়া তারিণী কহিয়া উঠিল "যথেষ্ট হয়েছে - আমার ওই একটী মাত্র মেয়ে বই আর কেউ নেই আমি ওকে কোন মতেই ছেড়ে থাকতে পারবো না, এতে আপনারা আমাকে যে শাস্তিই দিতে চাইবেন, তার ভার গুরুভার হলেও, শুধু এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন, আমি তাকে বইতে পারি" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

নিজেকে আর সংযত করিতে না পারিয়া ভটচায সরোষে কহিয়া উঠিল "আস্পর্দ্ধা দেখলে, ছোকরার। মেয়ের জন্যে যেন সোহাগের বান ডেকে গেছে। এতগুলো লোকের কথা যেন গ্রাহ্যই হলো না। নেমকহারাম আর কাকে বলে।"

* * * *

রান্না চাপাইয়া জলন্ত উনানের দিকে করুণা অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়াছিল। আজ একাদশী। সম্মুখে ছোট একটা পাথর বাটীতে কিছু ডাল ভেজান ছিল। কন্যার দিকে চাহিয়া গভীর বেদনায় তারিণী একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল—ডাকিয়া কহিল—"আহ্নিকের জায়গাটা করে যাওত মা।"

—ছয়—

ক্যান্ত বর্ষণ বর্ষার অপরাহ্নে ঘোলাটে মেঘের অন্তরালে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, এবং তাহারই ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত ক্ষীণ রশ্মিতে উড্ডীয়মান দু' একটী বিহঙ্গের

শুভ্রপক্ষ রজত খণ্ডের মতো জ্বলিতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া অরুণা আনমনে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আজ তাহাদের ঘরে চাল বাড়ন্ত—

ক্ষীণতোয়া পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী যেমন প্রস্তরাবরোধে আপনার গতি হারাইয়া ফেলে, এবং প্রতিঘাতকে জয় করিতে তাহার সহজ সরল গতি, কোন এক মুহূর্ত্তে বাঁকা হইয়া দেখা দেয়, সহস্র বিরুদ্ধ ঘটনার সংঘাতে ও দুঃখ দারিদ্রের অসহনীয় নিষ্ঠুর আঘাতে তারিণীর মনও তেমনি কোন মুহূর্ত্তে অসরল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গৃহের প্রাঙ্গনে বসিয়া ক্ষুব্ধমনে, ক্ষীণকণ্ঠে সে আপনার দুরদৃষ্টের কাহিনী অবিরাম আবৃত্তি করিতেছিল "একা থাকিলে কি তাহার দু'মুঠো অন্নের জন্য এত অভাবই বোধ করিত, কোন পাপে তাহাকে আমরণ শুধু বোঝা বহিয়াই বেড়াইতে হইবে।"

সহসা নির্ব্বাক উপবিষ্ট কন্যার প্রতি চাহিয়া তাহার উদ্বেলত ক্রোধ, অগ্নিতপ্ত বিস্ফোরকের মতই ছড়াইয়া পড়িল।—"হতভাগী আকাশের দিকে হাঁ করে কি চেয়ে দেখছিস—দু'মুঠো সেদ্ধ করে দিবি, তাও পারবি নে—"

গৃহে যে চাল বাড়ন্ত অরুণা তাহা বলিতে পারিল না। পিতার তিরস্কার তাহাকে তীব্র শেলের মত বিঁধিল। প্রাণপণে উদ্গত অশ্রুকে নিরুদ্ধ করিতে দ্রুতপদে গৃহে চলিয়া গেল।

—সাত—

অপরাহ্নে ভটচায স্বভাব-বিকট দন্তরাজি আরও বিকশিত করিয়া তারিণীচরণের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া ডাকিল "কৈ গো, তারিণী—"

তারিণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই ভট্‌চায সোৎসাহে কহিল—"হেঃ হেঃ আমি ত জানতুমই—বুঝেছ দাদা—এ তোমার ভট্‌চায খুড়ো ত তক্ষুণি বলেছিল, তারিণী আবার একঘরে—হে হেঃ যত সব ছেলে জান কি।—বাবাজি মায়া মায়া—বলি ভালবাসাটা ত আর উপে যায় না—ছোটবেলা তোমাকে কত কোলে পিঠে করেছি—বুঝেছ বাবাজি, তোমার বাবা আর আমি ছিলুম হরিহর আত্মা—লোকে বলত—হেঃ হেঃ, আর তুমি যদি একটু অন্যায়ই করলে, তা আর এমন কি লঙ্কাকাণ্ড হলো যার জন্তে তোমাকে একেবারে সমাজ থেকে—একেবারে হেঃ হেঃ কি বলে—"যেন নির্ব্বাসন" বলিয়া চকিতে তারিণীর মুখের প্রতি একবার চাহিয়া কহিল—"বলি সমাজটা ত আর ঐ হরিশ মুখুজ্জের মত এক চোখো নয়—বেটা চামার—আহা বিধবা বৌটার নামে একটা কেলেঙ্কারী রটিয়ে সতীলক্ষ্মীকে কি না অমনি তাড়িয়ে দিলে" বলিয়া এমনভাবে হাঁপাইতে লাগিল যেন এইমাত্র সে ভীষণ ওয়াটারলুর যুদ্ধ জিতিয়া আসিয়াছে।"

"হাঃ হাঃ বুঝলে না বাবাজী স্বামীর সম্পত্তিটা হাত করাই ছিল বেটার অভিসন্ধি—হেঃ হেঃ, আমার চোখে কি আর ধুলো দেবার জো আছে!"

তারিণীচরণ উৎকণ্ঠিত হইয়া আসল কথাটা শোনার অপেক্ষা করিতেছিল, ব্যস্ত হইয়া বলল—"থাক আর খুড়ো ওসব পুরাণো কথা তুলে আর কি কাজ!"

ভট্‌চায একবার কাশিয়া দুই একবার ইতঃস্ততঃ করিয়া অবশেষে কথাটা পাড়িল "এই বুঝেছ বাবাজী, আমরা সবাই মিলে বলছিলাম কি—এইত কাল বিকেলেই ত শ্যাম দাদার বাড়ীতেই কথা হচ্ছিল—তোমার ত আর অনিচ্ছা নাই, আমরা কি আর জানি না- সমাজের জীব সমাজ ছেড়ে থাকা, আর জলের মাছ ডাঙ্গায় থাকা দুটোই সমান—তা জান ত জমিদার মহারাজের বাড়ী একটা আশ্রম রয়েছে—বিধবা আশ্রম—কত দেশ থেকে কত বিধবা সেখানে আসচে—দিব্যি থাকচে—খাবার দাবার সবই ত ঐ রাজা বাহাদুর দিচ্ছেন—হেঃ হেঃ তা আর দেবেন না শিব তুল্য লোক বাবাজী, একে বলবে সাক্ষাৎ শিব।"

কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া পুনরায় কহিল—"তাই ত আমরা সবাই মিলে বাবুর পা জড়িয়ে ধরে বল্লাম "বাবু আপনাকে এ অনুগ্রহটা করতেই হবে, কত দেশ থেকে কত লোক আসচে আর আমাদের গাঁয়ের লোক কি না থাকতে স্থান পাবে না—তুমি বল্লে না পেত্যয় যাবে তারিণী শিব তুল্য বাবু অমনি কেঁদে—"

অধীর হইয়া তারিণী ভট্‌চাযের প্রতি একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হানিয়া কহিল—"তুমি যাও খুড়ো, এদিকে আর বিরক্ত করতে এসো না—"

প্রসন্ন হাস্যে প্রাঙ্গন মুখরিত করিয়া ভটচায কহিল "তা

আসবো বৈ কি বাবাজী—তা বুঝলে না বাবাজী এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম—মায়া—মায়া—হেঃ হেঃ" বলিয়া আর একবার উচ্চহাস্যে পাড়া সচকিত করিয়া ভটচায বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

—আট—

গভীর রাত্রে ভীষণ অগ্ন্যুত্তাপে তারিণীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল সমস্ত ঘরময় আগুন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনুকূল বায়ুযোগে গগনস্পর্শী প্রচণ্ড অগ্নি শিখা, লেলিহান জিহ্বা চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া ধ্বংশের তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে।

উন্মত্তের ন্যায় তারিণী তনয়ার কক্ষে ছুটিয়া গেল। উন্মুক্ত দ্বার ও শূন্য কক্ষ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল "মা অরু আয় মা। তিরস্কার সইতে না পেরেই আমায় ছেড়ে গেলি মা আমার।"

* * * *

কথাটা রটিতে বেশী বিলম্ব হইল না। সকলেই সোৎসাহে শুনিল যে দুপুর রাত্রে তারিণীর ঘরে আগুন দিয়া কাহারা তাহার মেয়েকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

জ্ঞাতি বৃদ্ধ হরিশ খুড়ো বলিল, "এ ত জানা কথা, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?"

বিজ্ঞ গোবর্দ্ধন তর্কালঙ্কার টিকি আস্ফালন করিয়া সগর্ব্বে চাটুযোকে কহিল, "দেখলে ভায়া হাতে হাতে বিচারটা, বলি পাপ কি আর ঢাকা থাকে, তা কুলো চাপাই দাও আর পাথর চাপাই দাও" বলিয়া হিন্দুর পুরাণ গ্রন্থে এবং আধুনিক কালের ইতিহাসে, কোন সমাজ-দ্রোহিতার জন্য কে কবে কি শাস্তি ভোগ করিয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইল।

সর্ব্বজ্ঞ শ্যামাচরণ দাদা আনন্দের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল "আমি ত তক্ষুণি বলেছি সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ঘর করা—কি বল" বলিয়া উপবিষ্ট কেনারামের অগ্রজ বেচারামকে অর্থসূচক ইঙ্গিত করিল।

হিতাকাঙ্ক্ষী ভট্‌চায এতক্ষণ ক্ষতির পরিমাণটা অনুমান করিতেছিল,—তাড়াতাড়ি তারিণীচরণের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিল, "ওঠ বাবাজী—তোমার খুড়ীমা তোমার জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে আছে—যা হবার তা হয়েই গেল, ওর জন্যে আর দুঃখ করলে আর লাভ কি? ঐ ত কথায় বলে, গতস্য শোচনা নাস্তি তা আমরা আজই রাজা বাহাদুরকে বলে তোমার চাকুরীটা করে দোব।"

তারিণীচরণ হিতাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি একটা কোপ কটাক্ষ করিয়া নীরবে ভস্মাবশিষ্ট গৃহের দাওয়ায় উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় মথিত করিয়া বুঝিবা অস্থিপঞ্জর ভগ্ন করিয়াই একটা গভীর নিঃশ্বাস পড়িল,—দরদী কেহ থাকিলে বুঝিতে পারিত তাহার ঐ একটী মাত্র নিঃশ্বাসের সহিত তাহার কতবড় ক্ষতির বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভট্‌চায তর্কালঙ্কারকে চাপা গলায় কহিল "দেখলে দাদা ছোকরার তেজটা—আমরা যেন ওর কেউ নই।"

* * * *

—নয়—

সন্ধ্যার ধূসর আলো ফিরিয়া রাত্রির গভীর আঁধারের যবনিকা গ্রামখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, আকাশের কোলে বিকাশোন্মুখ পুষ্প কোরকের মতো দুই একটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেইদিকে চাহিয়া তারিণীচরণ দগ্ধাবশিষ্ট গৃহের অঙ্গনে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বাহিরে আঁধারের মতোই তাহার হৃদয়কে যে ঘন কালো আঁধার বেষ্টন করিয়াছিল, তাহার মাঝে আজ এতটুকু আলোর প্রবেশ পথও নাই। ক্ষতির পরিমাপ করিয়া লাভ লোকসানের হিসাব করিতে তাহার কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না, কিন্তু ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তের মতোই যে দুঃসহ বেদনা অকস্মাৎ এ কাল মেঘে তাহার সমস্ত হৃদয়কে নিষ্পিষিত করিয়া গেল। তাহারই নিষ্ঠুর আঘাতে অভিভূত হইয়া অতীতের কত কথাই না আজ তাহার মনে জাগিতে লাগিল।

মনে পড়িল যখন তাহার পত্নী ছয় বৎসরের অরুকে তাহার কোলে দিয়া চিরদিনের জন্য চোখ মুদিয়াছিল। তারপর কতদিন চলিয়া গিয়াছে—কত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুঝিয়া সে মাতার স্নেহে পিতার আদরে অতটুকু অরুণাকে এত বড়টী করিয়াছে, তাহার বিবাহ দিয়াছে এবং বৎসর না কাটিতেই পতিহারা কন্যাকে শোকতপ্ত বক্ষে পরম স্নেহে

ধরিয়াছে। যৌবনশ্রী-মণ্ডিত কন্যাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে করিয়া তাহাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে জাগিল অকারণে চিরাভিমানী অরুকে কত তিরস্কারই করিয়াছে এবং একটী প্রতিবাদ না করিয়া হাসিমুখে সব সহিয়াছে—" তাহার দু'চোখ বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া হস্ত দ্বারা চোখ মার্জ্জনা করিয়া সে অনুচ্চকণ্ঠে রাম আবৃত্তি করিতে লাগিল "আয় মা অরু—আর নো তোকে কিছু বলবো না অভিমানী মা আমার।"

দুর্ব্বলের প্রতি সবলের এই চির অত্যাচারের প্রতি হার মন গভীর বিদ্রোহে বিমুখ হইয়া উঠিল, অনুক্ষণ কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল। আজ কে গৃহহারা করিয়া তাহারই বক্ষোনীড় হইতে তাহার মা কন্যাকে যাহারা কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদিগকে কোনমতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না।—গভীর জলস্রোত সম্মুখে বাধা পাইয়া গভীর আবর্ত্ত রচনা করিয়া চলে, আবর্ত্তকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই চারিদিকে অবিরাম ঘূর্ণপাক করিতে থাকে তেমনি অসহায় নিরুপায় তাহার শক্তি প্রবলের অত্যাচারের প্রতিবিধানে পরাঙ্মুখ হইয়া বিরামহীন উহাকেই মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিল।

সহসা পৃষ্ঠে কোমল হস্তস্পর্শ অনুভব করিতেই তারিণীচরণ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, আলুলায়িতকেশা বিস্রস্ত বসনা অরুণা পাংশুমুখে পরিপূর্ণ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

বিপুল আগ্রহে তারিণীচরণ অরুণার মস্তক সজোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিল "মা আমার! এসেছিস মা আমার অপরাধ ভুলে গিয়ে ফিরে এসেছিস মা!—"

অরুণা পিতার কাঁধে অশ্রুপূর্ণ মুখখানা রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল—"চল বাবা আমরা এ গাঁ ছেড়ে যাই—"

পিতা পিতামহের স্মৃতি বিজড়িত আবাল্য স্নেহের নীড় ভগ্নস্তূপে পরিণত দগ্ধ গৃহের দিকে ক্ষণেক নির্ব্বাক স্তব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তারিণীচরণ কহিল—"তাই চল মা—তাই চল।"

তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন

কিনেছি বিশ্বাস জানে

কিবা মনে আর অধিকার কার
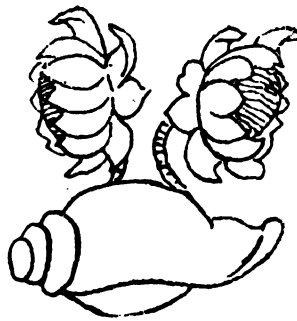
এ বড় গৌরব মনে।

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৬ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৩২। [৪১শ সপ্তাহ

"নাট্যকার"

নাট্যকার— দেখো জী — চমৎকার নাটক লিখা বাবা—তোমরা বাবুকা শুনায়েগা—তোমরা থিয়েটারমে প্লে হোনেকো আস্তে।

দরওয়ান—আচ্ছা পহেলা হাম-লোককো শুনাও—

নাট্যকার (অভিনেত্রী নিরোবালার গৃহে উপস্থিত হইয়া) দেখুন—এই—এই—নিউ মার্কেটে গিয়েছিলুম—দুই পাঁচটা ভাল জিনিষ দেখলুম—আপনার জন্যে নিয়ে এলুম —এই—এই—(হাত কচলাইতে কচলাইতে) বলছিলুম কি—যদি দয়া করে আপনি একটু ব্যবস্থা করেন যাতে আমার বইখানি প্লে হয়।—

নাট্যকার—তোমাদের মদ খাওয়াব না? তোমরা আমার বাপের ঠাকুর! বাপরে—তোমরা সন্তুষ্ট না হ'লে আমার বইতে—কাটা সৈন্য, মড়া—এসব সাজবে কারা? আগে তোমাদের পুজো—পরে হিরো অ্যাক্টরদের——
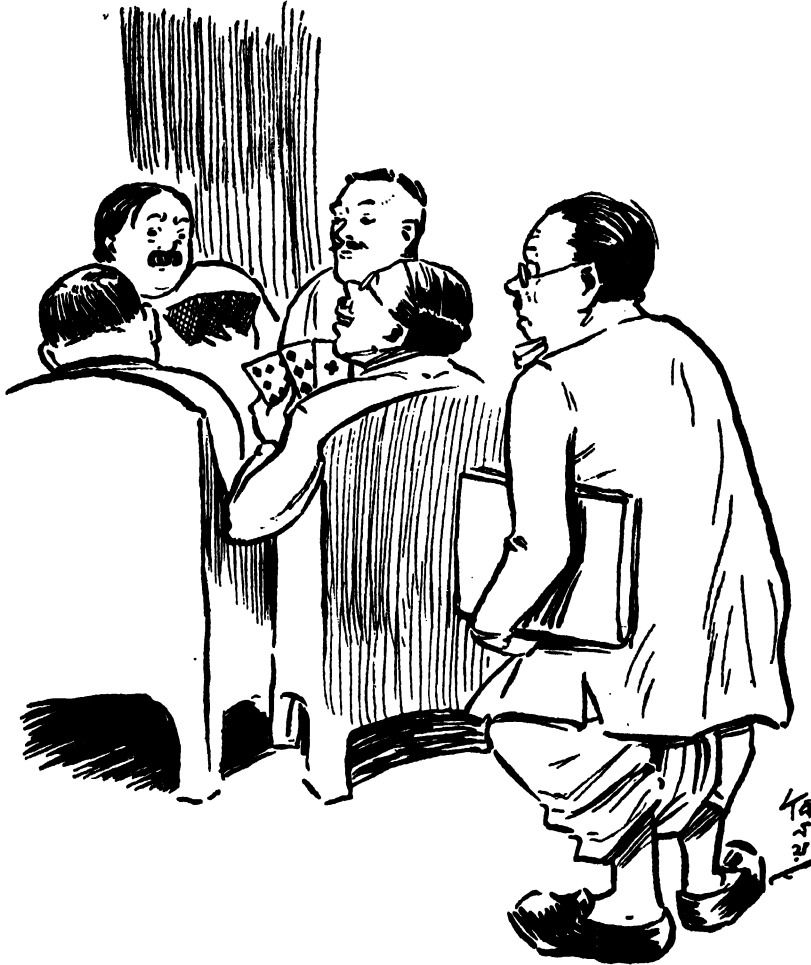
প্রোপ্রাইটার (বহু বান্ধব সহ তাস খেলায় মত্ত) এই বিস্তি——

নাট্যকার—(শুষ্ক ও ভগ্নকণ্ঠে) হুজুর—বইখা—

প্রোপ্রাইটার—(সাহঙ্কারে) এই মারো গোলাম—বিস্তি কাবার—
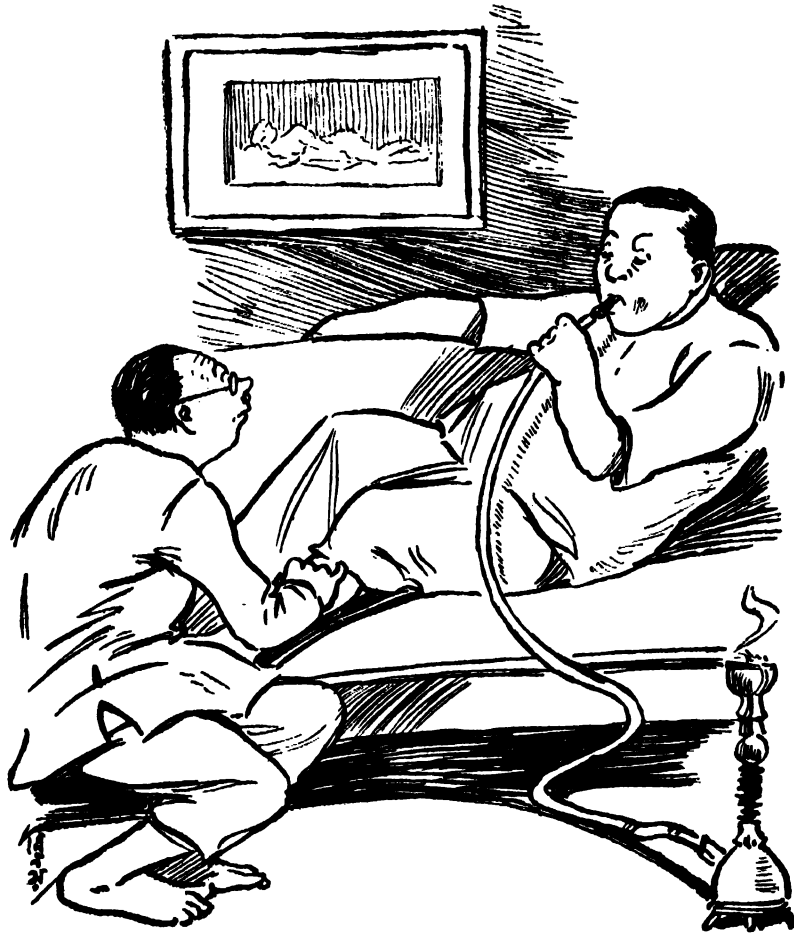
নাট্যকার—(ম্যানেজার বাবুর বাতরোগগ্রস্ত পদদ্বয় টিপিতে টিপিতে) মশাই তাহ'লে বইখানি একবার শুনবেন ?
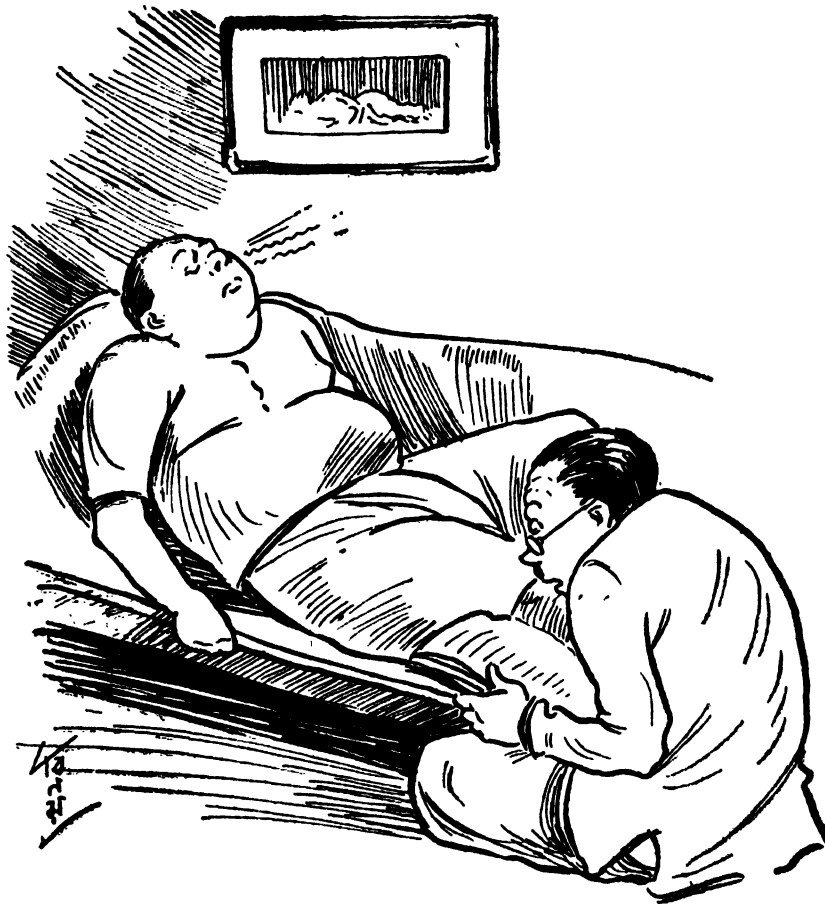
পুস্তক পাঠরত নাট্যকার ও নাসিকা গর্জ্জনকারী প্রোপ্রাইটর
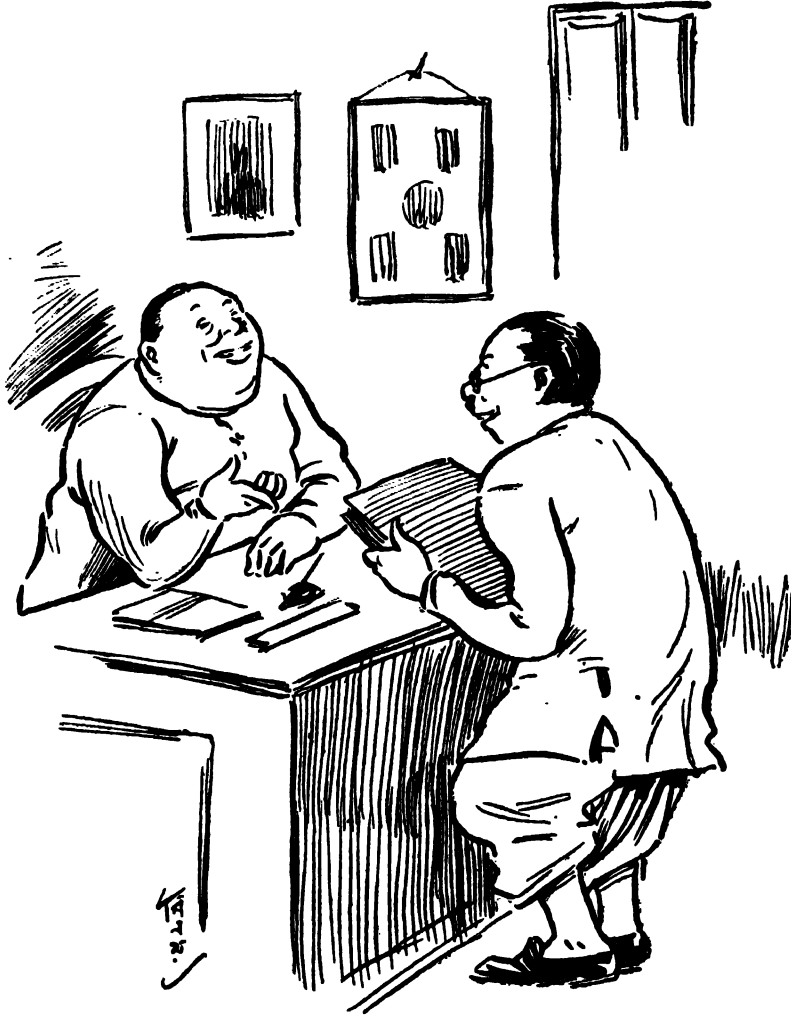
ম্যানেজার—হেঃ হেঃ বইখানা রেখে যান—মাস ছয় পরে এসে খবর নেবেন।

নাট্যকার—[আনন্দে স্বর্গ প্রাপ্তির সম্ভাবনা]
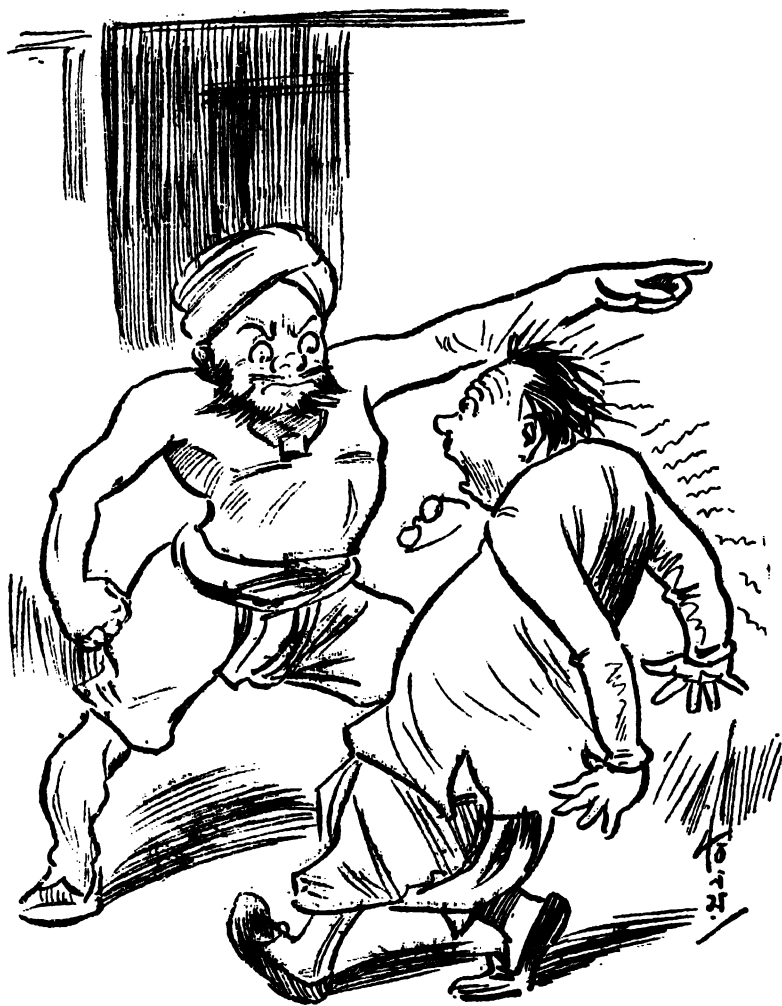
নাট্যকার (ছয়মাস পরে) দেখো জি ম্যানেজার বাবু হায় ?

দরওয়ান—নিকালো—শা—ম্যানেজার বাবু তোমরা বাপকা নোকর হায় ?—

নাট্যকার— (রাস্তায় দেওয়ালে বিজ্ঞাপন দেখিয়া অঝোর ঝরে কাঁদিতে কাঁদিতে) হায় হায়—আমারই— "হনুমানের বস্ত্রহরণ"—আজ প্লে হচ্ছে ম্যানেজারের নামে রে—

আশাহত

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

কণার কথা

(১)

সেদিন বিকেলে কিউলের ষ্টেশনের ধারে ছোট্ট একখানা বেঞ্চের উপর আনমনে বসে ছিলাম। বিদায়োন্মুখ অরুণ-দেবের ম্লান রশ্মিটুকু তখনও গাছের মাথায় মাথায় ঝিক্ মিক্ কর্চ্ছিল। পাশে লাল কাঁকর বিছান সরু পথটি দিয়ে অনেক যাত্রী আনাগোনা কর্চ্ছিল—সে দিকে আমার লক্ষ্যই ছিলনা। সহসা 'গেল গেল' শব্দ ও কুলীদের চীৎকারে আমি চম্‌কে উঠলাম—সর্ব্বনাশ! বেনারস এক্সপ্রেসখানিতে একটা মাল গাড়ীর ভীষণ ধাক্কা লেগে গাড়ীখানি ষ্টেশনের কিছু দূরেই উল্টে পড়েছে। শত শত দুর্ভাগ্যের করুণ মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে আমি বিচলিত হ'য়ে পড়লাম। ঠিক সেই সময় দাদা ব্যাকুল ভাবে এসে আমায় বল্লে—"কণা লক্ষ্মী দিদি আমার শীগ্‌গীর বাড়ী গিয়ে রামচরণকে ডেকে নিয়ে আয়, আর পারিস ত' একখানা আরাম চেয়ার ও নিয়ে আয়। বড্‌ড বিপদে পড়ে গেছি '

আমি দাদার ভাবে ভীত হ'য়ে বল্লাম—"কি বিপদ হল আবার তোমার দাদা, আরাম চেয়ারে কি হবে?"

"সমীরকে জানিস না বোন্ সেই যে রে একবার পুজোর সময় এখানে এসেছিল? সে কি একটা দরকারী কাজে বেনারস যাচ্ছিল, পথে এই বিপদ উঃ গাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে তার বড্‌ড আঘাত লেগেছে রে।"

আমি আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব কর্ল্লাম না। তখনি বাড়ী গিয়ে রামচরণকে ডেকে আনলাম। আমায় দেখে দাদা বল্লে—"কণা তুই এইখানে একটু দাঁড়া, আমি সমীরকে নিয়ে এখনি আসছি।".

দাদা আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ব্যস্ত ভাবে চলে গেল। আর আমি একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—সেই বেঞ্চ খানাকে দু হাতে ধরে।

সেই সমীর বাবু। তাঁকে আবার চিনি না—পূজোর সময় এখানে এসে মাত্র পাঁচটি দিন ছিলেন, মা সেই সময় তাঁকে কত পীড়াপীড়ি করেছিলেন এখানে থাকবার জন্যে। কিন্তু মার অত স্নেহের আহ্বান সত্ত্বেও তিনি এখানে থাকলেন না। কারণ তিনি গরীব। তাঁর যে আত্মমর্য্যাদায় তাতে আঘাত লাগবে। তাঁর এ পৃথিবীতে আপন বল্‌তে কেউ নেই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী থেকে নিজের অধ্যবসায়ের বলে এম, এ পাশ করেছেন। আমার মনটা একটা অকারণ বেদনায় দুলে উঠ্‌ল। উঃ ভগবান তুমি এত নিষ্ঠুর কেন গো। খানিক পরে দেখি আরাম চেয়ারে তাঁকে শুইয়ে দাদা আমার ধীরে ধীরে আসছে। আমি এগিয়ে গেলাম—উঃ এ কি হয়েছে—অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থা মাথা দিয়ে, দু কাঁধের পাশ দিয়ে অজস্র রক্তস্রাব হচ্ছে অমন সুন্দর মুখখানি বিবর্ণ কালীমাময় হ'য়ে গ্যাছে। আমার দুই নয়ন ভরে জল এল—মাগো এ অবস্থা যে আর চোখে দেখা যায় না। গোপনে অশ্রু মুছে দাদার সাহায্য করতে লাগলাম।

(২)

যখন সকলে বাড়ী পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যার গাঢ় আঁধার ধীরে ধীরে প্রকৃতি দেবীকে গ্রাস কর্চ্ছিল। মা আমার সমীর বাবুর অবস্থা দেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল্লেন। আমরা সকলে মিলে ধরাধরি করে সাবধানে ওপরের একটা ঘরে বিছানার উপর শুইয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু এসে তাঁকে একজামিন করে বল্লেন—"ঈশ্ মাথাটায় যে বড্‌ড চোট লেগেছে মুকুল বাবু।

দাদা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বল্লে "তবে কি ভাল হবার কোন আশা নেই ডাক্তার বাবু?"

"না না সে কথা বলছিনা—তবে দেখুন এ সব ভগবানের হাত। ভাল হ'বেন কিনা সেটা নিশ্চিত আমরা কিছুতেই বলতে পারিনা। অবশ্য আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা কর্ব্ব।

আচ্ছা এখন চল্লাম—যদি কিছু খারাপ দেখেন তাহলে আমায় খবর দেবেন।"

নাঃ—আর—বুঝি সামলাতে পারি না! আমার এ গোপন হিয়ার জমাট অশ্রু গলে বুঝি এখনি বেরিয়ে পড়বে আমারই বা একি হল গো? কে উনি - আমার ত আপন জন কেহ নয় তবে ঐ পীড়িতের যাতনাক্লিষ্ট মুখ পানে তাকালে প্রাণ এমন শতধা হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে কেন! একি নারীর প্রকৃতিগত স্বভাব না আরও কিছু।

* * * *

সময় কারও সুখ দুঃখ বোঝে না। সে ঠিক তার আপন গতির নিয়মানুসারেই চলতে থাকে। এত বড় একটা মস্ত —বিপদ বাড়ীতে—অথচ বাবা বাড়ীতে নেই। কিছুদিন আগে 'টুরে' বেরিয়েছেন ক্রমে রাত বারোটা বেজে গেল মা তখন দাদাকে ডেকে বল্লেন—"মুকুল তুই একা এই রুগীকে নিয়ে সামলাতে পারবি কি? না হয় পাশের বাড়ী থেকে কনককে ডেকে নিয়ে আয়।"

দাদা বল্লে—"তবে আমি যাচ্ছি—মা তুমি আর কণা বসে থাক।" আমি তখন মাকে ডেকে বল্লাম—"মা আপনি যান সুনীল আর গীতাকে খাইয়ে দিনগে, ওরা যে ঘুমিয়ে পড়ল।"

মা বল্লেন—"তুই একা থাকতে পার্ব্বি? কাউকে ডেকে দেব কি?" —"না আমার কাউকে দরকার নেই, একাই থাকব খ'ন।"

মা আমার ছোট ছোট ভাই বোন দুটিকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে গেলেন। আমি তখন রোগীর শিয়রে বসে তাঁর মাথায় 'আইস্‌ব্যাগটা' চেপে ধরলাম।

বৈশাখী পূর্ণিমার মিষ্টি রাতটি—নিস্তব্ধ নিশীথিনি জ্যোৎস্নার শুভ্র রূপালী ওড়না খানি গায়ে দিয়ে অলসভাবে যেন তার প্রিয়ের প্রতীক্ষা কর্চ্ছে। এক ঝিলিক জ্যোৎস্না মুক্ত বাতায়ন পথ ভেদ করে ঘরে ঢুকে সমীর বাবুর রোগ পাণ্ডুর মুখ খানির উপর সযতনে আপনার স্নেহ পরশটুকু ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিচ্ছিল। সেই চন্দ্র করোজ্জ্বল সমাচ্ছন্ন আলোকময়ী ধরণীর পানে তাকিয়ে সহসা আমার দুই চোখ ছেপে জল এল। দয়াময়, দয়াময়, তুমি যে অনাথের নাথ প্রভু। তবে এই অভাগার ওপর তোমার এত রোষ কেন দেব। বাহির হ'তে চোখ ফিরিয়ে দেখ্‌লাম সমীর বাবু ভয়ানক ছট্‌ফট্‌ কর্চ্ছেন। আমি একটু হেঁট হ'য়ে বল্লাম —"আমায় কি চিনতে পার্ব্বেন সমীর বাবু?"

সমীর বাবু চোখ মেললেন—উঃ কি সে আঁখির দৃষ্টি। আরক্ত-নয়ন যুগল হ'তে ধারার পর ধারা নেমে আসতে লাগ্‌ল। সযত্নে চোখের জল মুছিয়ে বল্লাম—"বড় কষ্ট হচ্চে কি আপনার?"

চোখেই সে ভাষা প্রকাশ হল। সেই সময় পিছনে ভারী জুতার শব্দ শুনে ফিরে দেখ্‌লাম দাদা আর কনক বাবু।

"সমীরের জ্বর এখন কতরে কণা।

তাইত এতক্ষণ সে খেয়ালই হয়নি। দাদা বল্লে—"তুই এবার উঠে যা. আমরা দুজনে বসে থাকছি খালি টেম্পারেচার টা একবার দেখে যা।" আমি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি থার্ম্মোমিটার লাগিয়ে দিলাম। ক্ষণপরে থার্ম্মোমিটার তুলে বাতীর সামনে নিয়ে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার সর্ব্ব-শরীর হিম অসাড় হ'য়ে গেল। দাদা আমার অবস্থা দেখে ভীত ভাবে বল্লে—"কিরে কণা কত জ্বর উঠল?"

আমি অশ্রু জড়িত স্বরে বল্লাম "একশ ছয়।" কথা কটি কোন রকমে শেষ করেই দ্রুতপদে আমার শোবার ঘরটায় গিয়ে মেঝের উপর উপুড় হয়ে উচ্ছ্বসিয়া কেঁদে ফেল্লাম।

ওঃ ঈশ্বর তুমি এত নিষ্করুণ কেন নাথ, কেন তোমার অপার করুণা ধারা ওঁর ওপর বর্ষণ কর্চ্চে না গো? আহা ওঁর যে কেহ নাই। "যার কেহ নাই তুমি আছ তার" এ কথা কি তবে মিথ্যে হবে? না না কেন এ কথা মনে আসে ওগো দয়া কর, দয়া কর প্রভু আমার এ গোপন কাতর নিবেদনে কাণ দাও। কতক্ষণ এইরকম বিবশা হয়ে কাঁদছিলাম জানিনা যখন রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়ল চকিতে তখন অশ্রুমুছে দ্বার খুলে দেখি, দাদা!

"উঠে আয় বোন অত কাঁদছিস কেন? এইমাত্র ডাক্তার বাবু এসে বলে গেলেন ভয়ের কোন কারণ নেই তবে অতটা জখম হয়েছে, সেই জন্যে জ্বরটা অত বেশী এসেছে।"

দাদার সেই কথাগুলি শুনতে শুনতে আমার বড় লজ্জা হ'ল। সত্যই ত, আমার এত বিচলিত হবার কারণ কি ?

(৩)

ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া বেলফুলের মিষ্টি গন্ধটুকু বহন করে দ্বারে দ্বারে যখন প্রভাত রাণীর আগমন বার্ত্তা জানিয়ে গেল সেই সময় একবার টেম্পারেচার নিয়ে দেখলাম জ্বর তখন অনেকটা কম। মাকে বল্লাম, মা সমীর বাবুর জ্বরতপ্ত ললাটে হাত রেখে বল্লেন—"বাবা সমীর চেয়ে দেখ বাবা।" সে স্নেহস্পর্শে সমীরবাবু ধীরে ধীরে চোখ মেলে ক্ষীণকণ্ঠে বল্লেন—"মা, এখানে আমি কি করে এলাম, আমার মাথায় এত ব্যথা হ'ল কেন মা ?"

মা বল্লেন—"সে সব কথা এখন থাক বাবা তুমি আগে সেরে ওঠ, পরে সমস্ত শুনবে—মা কণা একটু বেদানার রস করে এনে দেতো মা।"

আমি কম্পিত হস্তে খানিকটা বেদানার রস চামচ করে খাইয়ে দিলাম।

"মুকুল কোথা কণা ?"

"দাদা এইমাত্র শুতে গেছেন ডাকব কি মা ?"

"না—না—থাক্, তুই এবার একটু বোস এখানে আমি এখনি আসছি।"

মা উঠে গেলেন। আমি সমীর বাবুর মাথার কাছে বসলাম। সমীরবাবু বল্লেন—"তুমি স্নেহকণা না ? উঃ কি মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে আর পার্চ্ছি না সহ্য কর্ত্তে।"

আমি কথার জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে তাঁর মাথায় হাত বুলুতে লাগলাম। দূরে একটা অশ্বত্থ গাছের উপর দিয়ে এক ঝলক রোদ্দুর এসে বিছানার উপর লুটোপুটি খাচ্ছিল। আমি জানলাটা বন্ধ কর্ব্বার জন্যে উঠতেই, উনি আমার হাতখানি ধরে বল্লেন—"না স্নেহকণা জানলা বন্ধ ক'রো না, বেশ মিঠে লাগছে এই রোদটা।" তারপর আমার হাতখানি নিজের কপালের উপর রেখে বল্লেন—"কি মিষ্টি আর নরম তোমার হাতটি। আঃ এই রকম স্নেহ পরশ আমি কতকাল পাই নি।"

* * * *

পাঁচটি দিন কেটে গ্যাছে। উঃ এই গোনা পাঁচটি দিন যেন দীর্ঘ পাঁচটি বরষ বলে মনে হচ্ছিল। এই ক'টা দিন কি দুর্ভাবনাতেই না আমাদের কেটেছে। দিনরাত গুলো কোথা দিয়ে যে কেটে গ্যাছে তা টেরই পাই নি। আজ ডাক্তারবাবু বলে গ্যাছেন—"আর এখন বিশেষ কোন ভয় নেই তবে উনি ভয়ানক দুর্ব্বল এখন, একটু সাবধানে রাখবেন যেন উঠে চলাফেরা না করেন—তাহ'লে আবার জ্বরটা আসতেও পারে।"

আজ সারাটি দিন অসহ্য গরমের পর বিকেলের দিকে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। আমি জানলার পাশে একখানা চেয়ার টেনে একখানা পড়বার বই নিয়ে বসলাম। দূর ছাই এই এক্কাগুলোর জ্বালায় গেলুম। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যে পড়ব তারও জো-টি নেই। কেবল দিনরাত ঝন্‌-ঝন্‌। বইখানাকে পাশে ফেলে রেখে চুপ করে বসে রইলাম। বন ফুলের কি রকম উগ্র গন্ধ মাখান ভিজে ভিজে জোলো হাওয়াটুকু বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। কতক্ষণ এই রকম এমনিই বসেছিলাম। হঠাৎ কাঁধের উপর কার মৃদু স্পর্শ অনুভব করলাম—চম্‌কে ফিরে চেয়ে দেখি—ওমা—সমীরবাবু !

ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলাম—"বাঃ আপনি ত বেশ লোক, ঘুমুচ্ছেন ভেবে যাই উঠে এসেছি—আর সঙ্গে সঙ্গে আপনিও উঠে এলেন? সত্যি আমি ডাক্তার বাবুকে বলে দেব, আপনার না উঠতে মানা ?"

আমার এই স্নেহমিশ্রিত মৃদু ভৎর্সনা শুনে উনি একটু হেসে বল্লেন—"না—না—লক্ষ্মীটি, অমন কাজ ক'রো না—সত্যি একলাটি শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগল না, আর মাও আজ এখানে নেই।"

আমার চট্‌ করে মনে পড়ে গেল সত্যই ত মা ত বাড়ীতে নেই। দত্ত সাহেবের মেয়ের যে আজ "এন্‌গেজমেন্ট ডে।" মা আজ সেইখানে গ্যাছেন। সমীরবাবু বল্লেন—"আচ্ছা কণা, আরও কতদিন এমনি তোমাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকব বলত ?"

মাগো! কথা বলবার ভঙ্গী দেখে আবার একটু রাগ হ'ল। তাড়াতাড়ি বল্লাম—"না তা থাকবেন কেন ?

আমরা পর বইত না—পরের বাড়ী আপনার হয়ত কত অসুবিধা হচ্ছে ?"

"অমন কথা বলো না কণা, আমি কি তোমাদের পর মনে করি ? তুমি কি জান না কণা আমি কি রকম অভাগা—আমার যে মা নেই ! আমি যে এখানে এসে মার স্নেহ প্রাণ ভরে উপভোগ করছি, আমার এখানে অসুবিধা ?"

আমি তাঁর করুণ কাতর স্বরে ব্যথিতা হ'য়ে তাঁর মুখের পানে তাকালাম। উঃ এই কটা দিন রোগ ভোগ করে চেহারার কি পরিবর্ত্তনই ঘটেছে। পাতলা একখানা বাদামী রঙের শালে সারা দেহখানা আবৃত করে দাঁড়িয়েছিলেন। কপালের উপর একগোছা কাল চুল এসে পড়েছিল, বাঁ হাতে সেগুলোকে সরিয়ে শ্রান্তিভরে একখানা সোফার উপর উনি শুয়ে পড়লেন। আমি উঠে তাঁর কাছে গিয়ে বল্লাম—"এই গরমে শাল গায়ে দিলেন আপনার কি অসুখ করছে সমীরবাবু ?"

"না কণা, অসুখ আমার কিছু করে নি, তবে মাথাটা বড় ব্যথা করছে।"

আমি ব্যস্ত হ'য়ে তাঁর কপালে হাত দিয়ে ভীতভাবে বল্লাম—"করলেন কি সমীরবাবু আবার ত জ্বর এসেছে—খুব যে গরম হ'য়ে উঠেছে এই কপালটা, আর আপনি বলছেন কিছু না ?"

উনি এবার জড়িতকণ্ঠে বল্লেন—"আমার শালখানা ভাল করে গায়ে চাপা দিয়ে দাও না কণা, বড় শীত করছে"...

আমার বুকের ভিতর হাহাকার করে উঠল ছি ছি এই কতক্ষণ আগেই না ওঁকে কত রূঢ় কথা বলেছি।

তিনদিন পরে বাবা ফিরে এলেন, সমীরবাবুর চিকিৎসা নিয়মিত চলতে লাগল। একমাস পঁচিশ দিন পরে তিনি পথ্য পেলেন।

(৪)

আজ সমীর বাবুর ফিরে যাবার দিনটি। আষাঢ়ের বাদল ঝরা সন্ধ্যা, টিপ্ টিপ্ করে অনবরত বৃষ্টি পড়ছে। আমি ঘেরা বারান্দার রেলিং ধরে উদাস প্রাণে দাঁড়িয়েছিলাম। বুকের ভিতর কি একটা রুদ্ধ ব্যথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে গলার কাছে ঠেলে আসছিল—বর্ষণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ঘন মেঘরাশি যেমন পুঞ্জে পুঞ্জে জমে ওঠে। ঠিক পাশের বাংলোটাতে আমারই এক সহপাঠিনী গান গাচ্ছিল হার্ম্মোনিয়ম বাজিয়ে—

'মেঘের কোলে মেঘ জমেছে
　আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ—
　একা ঘরের পাশে।'

আঁধার! হ্যাঁ ঠিক, আঁধার ক'রেই ত আসছে। আসে, পাশে, সামনে, আমার কেবলই মনে হ'চ্ছে—যেন একটা বিশ্বব্যাপী আঁধারের পুঞ্জীভূত বিরাট স্তূপ ক্রুর দানবের মত ধরতে আসছে আমায়—তার কালো কালো পাখা দুখানা মেলিয়ে—।

'তুমি যদি এমন ক'রে—
　কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটবে আমার—
　এমন ভরা বেলা।'

একি আবার! নাঃ কমলা তোমার সুর আজ আমায় পাগল করে তুললে দেখ্‌ছি। কিন্তু কেন? এই গানটাতে কি আছে গো ?

এই সামান্য গানের লাইন কটি প্রাণে...এমন ব্যথার সৃষ্টি করে কেন? এ গানটা ত কমলার মুখে কতবার শুনেছি। কই তখন ত গান শুনে চিত্তে এমন ব্যাকুলতা আসত না।

"কণা রাণী।"

ছি ছি কি লজ্জা! সমীরবাবু কি আমার অস্থিরতা দেখে ফেল্লেন ?

মুখ তুলে আর চাইতে পারলাম না।

সমীরবাবু বল্লেন—"মুখ তোল রাণু। বিদায় দাও আজ। এই তিনমাস থেকে তোমাদের পরে অনেক অত্যাচার করে গেলাম। অভাগাকে মার্জ্জনা কর।"

বাবা আসবার দিন পনের পরে, মা, বাবা ও দাদা 'হলে' বসে চা খাচ্ছিলেন। আমি সেই ঘরটার পাশ দিয়া নীচে নামছিলাম। সহসা এই কথা কয়টা কাণে ভেসে এল।

মা বল্লেন—"হ্যাগা এইবার কণার বিয়ের চেষ্টা দেখ।"

বাবা হেসে বল্লেন—"এত তাড়াতাড়ি কেন ? আই-এটা আগে দিক্ তারপর বিয়ের চেষ্টা দেখবখ'ন। আর কণু মার যোগ্য ছেলে কোথায় ?"

মা একটু নিম্নস্বরে বল্লেন—"কেন সমীর ছেলেটি ত বেশ। এম-এ পাশ করেছে। দুঃখের বিষয় পয়সা নেই। তা হক্ গে, কণা বোধ হয় এ বিয়েতে সুখীই হবে।"

বাবা গম্ভীরকণ্ঠে বল্লেন—"কণা! কণা ঐ গরীব হতভাগাটার হাতে পড়ে সুখী হবে ভেবেছ ? কক্ষণো নয়। আমি আমার শিক্ষিতা মেয়েকে অমন দরিদ্রের হাতে দিয়ে তার চিরজীবনটা নষ্ট কর্ত্তে পার্ব্ব না। ওর আছে কি ? কেবল পাশ দেখলে ত চলবে না ? আমার মনের কথা কি শোন—কোন বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার কিম্বা ডাক্তারের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব ভেবে রেখেছি। যা হবে না, তা নিয়ে আর মিছে নাড়াচাড়া ক'রো না। এই পর্য্যন্ত শুনে সেখান থেকে আস্তে আস্তে ফিরে এলাম। ভাবলাম সত্যই কি তাই ? আমি সুখী হব না, বাবার এ ভুল ধারণা কেন হ'ল ? হ'লেনই বা তিনি গরীব ; গরীবের কি প্রাণ নেই ? না সে ভালবাসতে জানে না। কই আমি ত তাঁকে কখনও ঘৃণা করি নি ? ওঃ তাঁর যে মোটর, ল্যাণ্ডো কেনবার ক্ষমতা নাই। 'টেনিস্', 'টি', 'গার্ডেন', এই সমস্ত আজকাল যতগুলি পার্টি তৈরী হ'য়েছে—তাতে তিনি যোগদান করেন না। আরও একটা মস্ত অপরাধ তাঁর, তিনি বিলাত ফেরত 'সিভিলিয়ান' নন্। আজকালকার সভ্য সমাজের লোকেদের মনে এমন ধারণা জন্মে গ্যাচে যে যাঁরা না কালাপানীর ওপারে গ্যাছেন, তাঁরা আর মানুষই নন্। কিন্তু মনের ভিতর আমার যতখানি কথাই হ'ক মুখ ফুটে কাউকে কিছু বল্লাম না। ছি ছি বাবা, মা, শুনলে ভাববেন কি ? যতই শিক্ষিতা হই না কেন ? হিন্দুর মেয়ে ত আমি! সঙ্কোচ আসিয়া বাধা দিল। আজ এই বিদায় দিনে সেই কথাগুলি মনে পড়ে গেল।

বোধ হয় সমীরবাবু পাশের ঘর হ'তে সমস্তই শুনতে পেয়েছিলেন। তাই আজ ম্লানমুখে বল্লেন—"রাণু আজ চল্লুম। মনে মনে অনেক আশা করেছিলুম ; যখন রোগশয্যায় শ্রান্তি ক্লান্তিহীন সেবারতা ভাবে তোমায় দেখতাম। তখন মনে করতাম, এই স্নেহ, এই যত্ন বুঝি চিরকালই পাব। কিন্তু থাক্, আর না সে কথা। কণা—এত স্নেহ, এত করুণা এই হতভাগ্য কাঙালকে কেন ক'রেছিলে রাণী ? আঁধার ভরা বুকে যদি আশার আলো জ্বাললে তবে আবার নিমেষে সে আলো নিভিয়ে দিয়ে কেন অমানিশার গাঢ় অন্ধকার ছড়িয়ে দিলে! করুণাময়ী! তুমি ত স্নেহের কণা মাত্র নও। তুমি যে স্নেহের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি।"

আবেগভরে এই কথাগুলি বলতে বলতে উনি আমার হাতখানি ধরে ফেল্লেন। আবার আমার অবাধ্য নয়ন হ'তে ঝর ঝর করে জল ঝরে তাঁর দুর্ব্বল হাতখানি ভিজিয়ে দিল।

তিনি চম্‌কে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের উপর বিস্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—"ওঃ বুঝেছি। তোমার গোপন ব্যথা আমি সমস্ত জানতে পেরেছি। কিন্তু কি করব। বিধাতার অভিপ্রায় বোধ হয় নয় আমাদের মিলনে তাই তোমার বাবা বাধা দিলেন। ছিঃ কেঁদো না। ট্রেণের সময় হ'য়ে এল। আর ত দাঁড়াতে পার্ব্ব না। আমি আর একটি কথাও বলতে পারলাম না। কণ্ঠ যেন কে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল। শুধু নত হ'য়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথার পরে হাত রেখে বল্লেন—"সুখে ও শান্তিতে থাক। আর—আর—এই অভাগাকে ভুলে যেও। আজ আমি যে কতখানি ব্যথা বুকে নিয়ে বিদায় হচ্চি তা তুমি বুঝবে না কণু। যদি কখন ভগবান আমাদের পরে প্রসন্ন হন্ তবেই আবার দেখা হবে। না হ'লে আজই শেষ বিদায়। রোগশয্যায় যে শান্তি পেয়েছিলুম সে কটা দিনের মধুর স্মৃতি আমার হিয়ার পরতে পরতে আঁকা রইল। সেই আমার জীবন যাত্রার একমাত্র পাথেয়। সেই আমার একমাত্র সম্বল!

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে দেখতে লাগলাম। ক্রমে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। আমি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে সেই বর্ষণ সিক্ত ভিজে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লাম। কড় কড় করে মাথার উপর অশনি গর্জ্জে উঠল। চোখের সামনে বিজলী রাণী বিদ্রূপের হাসি হেসে চকিতে কাজল মেঘের আড়ালে মুখ লুকালেন।

(৫)

সমীরের ডায়েরী হইতে—

৩রা আশ্বিন—মুকুলের সে দিন একখানা চিঠি পেলাম। তাতে লেখা ছিল—'আত্মীয়ের বাসা ছেড়ে হঠাৎ কলকাতায় পালিয়ে গ্যাছ এর মানে কি?' মানে এর যে কী, মুকুল কেমন ক'রে তোমায় বোঝাব ভাই? যাক্ কিন্তু সেই চিঠি খানায় আরও কি কিছু লেখা ছিল না? ছিল বই কি, 'কণার এখানকার জল বায়ু সহ্য হচ্চেনা শীগ্‌গীর্ আমরা পুরী কি ওয়ালটেয়ার যাব।" হাসি পায়, এতকাল ত ঐ পশ্চিমের জল হাওয়াতেই কণার স্বাস্থ্য অটুট্ ছিল আজ কেন যে তার তরুণ দেহে ভাঙ্গন ধরেছে তার কারণ সবই বুঝতে পাচ্চি যে এই হতভাগ্যের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায় নি। কিন্তু যাওয়াই সম্পূর্ণ ভাল ছিল, যা স্বপ্নের ন্যায় অলীক, যা পাওয়া যাবে না, সে আশা মরিচীকার পিছু পিছু ছুটে নিজের অমূল্য স্বাস্থ্যটাকে কেন নষ্ট কর্চ্চ রাণী? আমার যে উপায় নেই। তোমায় যে পাবার নয়। তুমি ধনী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কন্যা। আর আমি—আমি দীন হীন পথের কাঙ্গাল। তোমার বাবা যে তাঁর আদরের দুলালীকে দরিদ্রের হাতে সমর্পণ কর্ব্বেন না। কিন্তু ওগো একবার এই কাঙ্গালের হৃদয় অন্বেষণ করে দেখ, দেখতে পাবে যে কাকে হৃদয় রাণী কর্ব্বার জন্যে তাহার দেহের প্রতি রক্ত বিন্দুটুকু তালে তালে নাচছে। তোমার বাবার যে ঐ নির্ম্মম কথাগুলি আমার অন্তরে হাতুড়ীর ঘা মেরেছিল।

তখনি যে সে বাড়ীটা থেকে পালিয়ে আসবার ছট্‌ফট্ করেছিলাম, কিন্তু কেন পারিনি হায় তখন যে আমার নিজের হাতখানি নাড়বার ও ক্ষমতা ছিল না।

* * * *

৩০শে কার্ত্তিক—

নাঃ আমার এ কর্ম্ম কোলাহলময় সজীব প্রকৃতিই ভাল। পল্লীমায়ের সে স্নিগ্ধ শ্যামল অঞ্চল ছায়ে গেল, পরে, আর একজনের শ্যামলিমা মুখশ্রী মনে পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ভিতর অতৃপ্তির তীব্র হাহাকার জেগে ওঠে। রাণু—রাণু আমার। মনে হয় এখনি ছুটে গিয়ে তোমার বাবার পায়ে ধরে, তোমায় ভিক্ষা চেয়ে নি। আমিও ত আর এ শূন্য হৃদয় নিয়ে জীবন কাটাতে পারি না। উঃ—নারায়ণ শুধু গরীব! শুধু গরীব বলে কি আমি এতই ঘৃণ্য। তোমার এই বিশাল রাজ্যে তোমারি দেওয়া মানবকে, মানুষ যে এতখানি ঘৃণা কর্ত্তে পারে তা আমি এতদিন জানতাম না।

—"কি হে সমীর আজকাল যে তোমার চুলের টিকিটী পর্য্যন্ত দেখা যায় না ব্যাপার খানা কি বলত?"

—"ব্যাপার গুরুতর হে। দেখছ না সমীর বাবু ছাদে বসে কার ধ্যানে আপনা ডুবিয়ে বসে আছে?"

সহসা বন্ধুগণের বাক্যস্রোতে আমার চিন্তাজাল কোথায় ভেসে গেল। উঠে বল্লাম—"না ভাই কারও ধ্যানে মগ্ন ছিলাম না, এমনিই বসে আছি।"

—"তবে আর আমাদের বাড়ী যাওনা কেন?"

আমি আর কি জবাব দেব? শুধু বল্লাম—আমি ত এতদিন এখানে ছিলাম না ভাই।"

—"আরে সে তো জানি, কিন্তু ফিরলে কবে? সেই যে ব'শেখ মাসে বেনারস যাবার নাম করে পালালে—ব্যস্ তারপর আর কোন খবরই নেই, আমরা ভাবলাম যে বন্ধুবরের হ'লো কি? তারপর দু মাস পরে সতীশের মুখে শুনলাম—কিউলেতে কোন বন্ধুর বাড়ী হাত পা ভেঙ্গে পড়ে আছে—তা যাক্ এখন এ ছাদের উপর কোন দেবীর স্মরণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা হ'ল হে?"

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে তার কথা শুনছিলাম। এখন তাকে আসতে দেখে মৃদু হেসে বল্লাম—"বাপ্, সুধা, এতক্ষণে পুর্ণচ্ছেদ পড়ল, তাহলে বাঁচলাম। না ভাই তোর ও উকীলি জেরা আদালতে মক্কেলকে করিস ভাই, আমি অতগুলির জবাব একেবারে দিতে পার্ব্বনা। তা এখন হেমন্তের নূতন হিমটা লাগিয়ে কাজ নেই চল নীচেতেই যাই।"

(৬)

—"তারপর।"

—"তারপর আর কি? এখন দেখতেই পাচ্চ আমার অবস্থাটা।"

—"মুকুলের কি সেই একখানা চিঠি ছাড়া আর পাওনি ?"

—"হ্যাঁ মধ্যে আরও তিন চার খানা পেয়েছিলাম ; কিন্তু জবাব বোধ হয় আমি একখানিই দিয়েছি —কাজ কি ভাই ? ও সব বড় লোকের সাথে বেশী আলাপ না জমানই ভাল।"

এতক্ষণ সতীশ নীরবে আমাদের কথা শুন্‌ছিল ।এখন হঠাৎ সে পকেটে হাত দিয়ে একখানা রঙীন কার্ড বের করে আমাকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে "যাবে ত ভাই সমীর দা ?"

—"নিশ্চয় যাব—আর পাঁচদিন পরে ত ?"

—"হ্যাঁ, তবে আজ উঠ্‌লাম ভাই, অনেক কাজ রয়েছে —চলহে সুধা, নমস্কার ভাই।"

—"নমস্কার ভাই।" বন্ধু যুগলকে বিদায় দিয়ে আমি আমার সেই নির্জ্জন ঘরটাতে জীর্ণ তক্তপোষটার ওপর, ততোধিক জীর্ণ ভগ্ন দেহটাকে এলিয়ে দিলাম। কোন মুহূর্ত্তে যে গোপন চরণ ফেলে আমার হৃদয় পথে এসে দাঁড়ালে তখনও কিছু টের পেলাম না। এখন যতদিন যাচ্চে ততই যেন তুমি আমার হৃদয় মাঝে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠছে। ওগো আগে যদি জান্তে পার্ত্তাম, তাহলে তখনি তোমায় বাধা দিয়ে বলতাম—থাক্ রাণী, অত কাছে এসে ধরা দিও না তুমি দূরেই থাক। কিন্তু কেমন করে যে তোমার ও মোহনিয়া ফাঁদে বন্দী হয়ে গেলাম তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। এখন এমন হ'য়ে গেল যে সে বন্ধন মুক্ত হবারও বিন্দুমাত্র আশা নেই। তুমি অসীম সেবার দ্বারায় আমাকে মরণের মুখ থেকে টেনে আনলে—আর তার প্রতিদান কি দিলাম—উঃ তার প্রতিদানে তোমায় নিষ্ঠুরের মত আঘাত করে চলে এলাম। কিন্তু শুধুই কি আঘাত দিয়ে এসেছি ! পায় নি কি কিছুই ? ওগো পেয়েছি—বড় কঠিন দাগাই পেয়েছি। তাই এমন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছি। কই কোথাও ত স্থির হতে পাচ্চি না, ওগো আমার এ মনের চঞ্চলতা কে ঘুচাতে পার বল গো ? কেগো—কেগো তুমি এই নিশীথ রাতে নিবিড় আঁধার ভেদ করে করুণস্বরে বীন্ বাজাও ? তোমারও কি অন্তরে আমারই মত হতাশার প্রবল হুতাশন জ্বলছে ? তা নইলে অমন হৃদয় মথিত করা বুকফাটা সুর — তোমার ও বীণার তারে ঝঙ্কৃত হয় কেন ?

ঐ ঐ আবার আবার সেই মরম ভাঙ্গা ব্যাকুল সুর ! ওগো কেগো তুমি—নিস্তব্ধ ঘুমন্ত প্রকৃতির কোলে ; অথবা আমারই মত ভাগ্যহীন নিরালা ঘরের কোনটিতে বসে প্রাণের গোপন বার্ত্তা কার কাছে জানাও ? বন্ধু ! যে হও তুমি, তুমি আমারই বন্ধু। ভাই তবু তোমার সাথের সাথী সাধের বীণা আছে। তার তারে তারে আঘাত দিয়ে তুমি আপনার মর্ম্মবেদনাটুকু শত মূর্চ্ছনায় জাগিয়ে তুলতে পার। কিন্তু আমার যে কিছুই নেই বন্ধু। আমি একা। আমার প্রাণের ব্যথা কেউ শোনে না। আমার বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাতাসের সাথে মিশে হাহা করে কেঁদে কেঁদে ফেরে ! যার কাছে দুঃখ জানাতে যাই - সেই মুখ ফিরিয়ে সরে যায়। তাই বলছি বন্ধু আমার কেহ নাই।

তখন যদি বেনারস যাবার ইচ্ছে না কর্ত্তাম, তাহলে বোধ হয় ভাল হত। বেশ ছিল সুখে তারা—শুধু মাঝখান থেকে কাল-বৈশেখীর ঝড়ের মত গিয়ে তাদের চির শান্তিময় সংসারটাকে লণ্ডভণ্ড করে, একটা জ্বালাও সৃষ্টি করে এলাম, আর তারই সঙ্গে একটা তরুণ তাজা প্রাণকে নির্দ্দয়ভাবে ছিন্নলতার মত নিষ্পেসিত করে ফিরে এলাম।

* * *

৬ই অঘ্রান—

কাল সতীশের বিয়ে হ'য়ে গেল। সতীশ আবার কাল বলে ফেল্লে—"ভাই সমীর কাল'কে আমি বড় ঘৃণা কর্ত্তাম, তেমনি বিধাতার দয়ায় আমার ত কাল'বউ হয় নি—"

হ্যাঁ সত্যিই বউটি খুবই সুন্দরী। কিন্তু সতীশ—হ'তে পারে তুমি কাল'কে ঘৃণা কর। হ'তে পারে তোমার রূপসী জীবন সঙ্গিনীটিকে এরি মধ্যে ভালবেসে ফেলেছ। কিন্তু ঐ কালো'ই যে আমার ভগ্ন হৃদয়ের নিভৃত কোনটিতে বসে শত জ্যোৎস্নার ফিনিক ফোটাচ্ছে—ঐ কালোর রূপই যে আমার অন্তর জুড়ে আলোর রাণী হয়ে বসে আছে—তাই আজ কৌমুদী কিরণে স্নাত হাস্যময়ী পৃথিবী আমার চোখের সামনে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

ওগো আমার আশার পরী, তুমি কি কখনও তোমার রঙীন সাড়ীর আঁচল দুলিয়ে আমার কাছে আসবে না? তোমার একনিষ্ঠ ভক্ত, সাধক যে তোমাকে পাবার তরে উন্মুখ হ'য়ে বসে আছে। জন্ম-জন্মান্তরে মানস প্রতিমা আমার আমি রূপের উপাসক নই—আমি তোমাকেই পাবার আশে—যুগ যুগ বসে থাকব—এম্নি করে তোমারই প্রতীক্ষায়। ধরা কি দিবে না একবারও?

(৭)

১লা বৈশাখ—

আবার আবার সেই বৈশাখ মাস। দীর্ঘ তিনটি বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। নবীন বরষ আবার আশা, নিরাশা, সুখ, দুঃখে, ডালাখানি সাজিয়ে আজ আমাদের দ্বারে এসেছে। এস এস হে রুদ্রদেব। এস হে মায়াবী বীর! ঠিক এমনিই এক নিদাঘ দিনে আমার জীবন মহা পরিবর্ত্তিত হয়ে গ্যাছে তাই তোমায় বন্ধু বলে সাদরে অভিনন্দিত করছি স্বাগতম হে নববর্ষ।

উঃ আজকের এই আকাশটা কেমন যেন ঘোলা ঘোলা হয়ে আসছে। সারা বিশ্বসংসারটা কিসের যেন মৌন ব্যথায় স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঃ এই ত আমি চাই আসুক প্রণয়ের ঝড়, তার এক একটী ফুৎকারে উঠুক দিক্‌বিদিক কেঁপে। এ রকম একঘেয়েমী নীরবতা আর ভাল লাগে না। হায় রে, মানুষ ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে কত রকমে আশার জাল বুনে চলে। আর আমার, আমার ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নেই। সে জিনিষটা গাঢ় আঁধারে ডুবে রয়েছে। তাকে টেনে যে কখনও দাঁড় করাতে পার্ব্ব, সে আশাও নেই। জীবনটা আমার ব্যর্থ হয়েই গেল। কিন্তু তবু আজ বেশী করে কেন প্রাণ কেঁদে উঠছে। কেন এমন ভাব? কিসের একটা অদমনীয় ব্যথায় সারা দেহ মন যেন আজ ভেঙ্গে পড়েছে। এই তিনটি বছর তাদের কোন খোঁজ নিইনি। নেবার ইচ্ছে শতবার এ যে মনে জাগলেও বিবেক এসে বাধা দিয়েছে, কানে কানে কে যেন কয়ে গ্যাছে—ছি ছি তুমি এত দুর্ব্বল, যারা তোমায় চায় না তাদের খোঁজ নেবার জন্যে এত ছট্‌ফটানী? তারা যে তোমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। হাঁ শুনি সে কথা। ঘৃণা তাঁরা করেন বটে। কিন্তু তার মধ্যে একজন, সে তো আমায় ঘৃণা করে না। সে মুখে আমায় কিছু জানায় নি সত্যি। কিন্তু তার অন্তরের প্রত্যেক কথাটি যে আমি তার অশ্রু ছল্‌ছল্ কাতর আঁখি যুগলে পাঠ করে এসেছি।

একি—! কার এ টেলিগ্রাম? আমার! হ্যাঁ আমারই ত' দাও, হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রাম খানা নিয়ে পিয়নকে বিদায় কর্ল্লাম। কিন্তু খুলতে গিয়ে হাত এমন কাঁপছে কেন? না জানি কি ভয়ানক কথাই এর বুকে জলন্ত অক্ষরে লেখা আছে * * * একি মুকুল তুমি! এতদিন পরে আজকের প্রভাতে এ কি খবর তুমি আমায় দিলে? ওঃ—দয়াময়! ভাল, খুব ভাল তোমার বিচার স্নেহকণা কেন এই হতভাগ্যের স্মৃতির তীব্র অনলে আপনার কুসুম কোমল হিয়াটি বিসর্জ্জন দিলে? উঃ—এই কাল টেলিগ্রামটার অক্ষর কয়টা যেন আমারই বুকের রক্ত দিয়ে লেখা বলে মনে হচ্ছে। * * যেতেত হবেই। আমার স্বহস্তে রোপিত তরুলতাটিকে যে আপন হাতেই উপ্‌ড়ে ফেলতে হবে। কেমন করে দূর থেকে মৃত্যু বান ছুঁড়ে হত্যা কর্ল্লাম দেখব না—হাঃ—হাঃ—।

(৮)

২রা বৈশাখ—

"মুকুল ভাই।"

—"সমীর ভাই এসেছ এস? দেখ কি রকম নিষ্ঠুর আমরা। শোন ব্যস্ত হ'য়োনা আগে এর সমস্ত কথাগুলি শুনে তবে দেখতে যেও। দেখ কেমন করে তার দেহের প্রতি রক্ত বিন্দুটুকু জল করে হাত ধরে তাকে মরণের পথে দাঁড় করিয়েছি। বাবা যেদিন থেকে তার বিয়ের সমস্ত ঠিক কর্ল্লেন, ঠিক তার পর থেকেই ও কেমন যেন শুকিয়ে যেতে লাগল, হায় তখনও বুঝিনি যে দিদি আমার বোনটি আমার সে কি চায়।"

"মুকুল মুকুল আর শুনিওনা ভাই, আর শুনতে পারিনি।" আর্ত্তস্বরে এই কথা কয়টি বলে উঠ্‌লাম।

মুকুল কম্পিত কণ্ঠে বল্লে—"অত অধীর হ'য়োনা ভাই—তারপর, হ্যাঁ, এই তিনটে বছর ওকে নিয়ে কত জায়গায় বেড়ালাম কিন্তু না কিছুতেই কিছু হ'লোনা, বিয়ের ব্যাপার

বন্ধ করা গেল * * শেষে একদিন ডাক্তারে স্পষ্ট করেই বলে গেল মিছে এসব কচ্চেন, ভেবে ভেবে ওঁর বুকের সমস্ত রক্ত শুকিয়ে গ্যাছে আর ভাল হবার আশা নেই * * "এই সময় মুকুলের গলাটা কেঁপে উঠ্‌ল। তারপর খানিকটা দম নিয়ে বল্লে—আর এখন অবস্থা বড্‌ডই খারাপ হ'য়ে পড়েচে ভাই তোমায় কাল খবর দিলাম।"

"—উঃ পরমেশ্বর।" দু হাতে কপালটাকে টিপে সেই খানেই বসে পড়্‌লাম। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে উঠ্‌ল, সমস্ত পৃথিবীটা চোখের উপর বন্ বন্ করে ঘুরে উঠল। কণা, রাণী আমার, আমার সর্ব্বস্ব, আমার প্রাণের নিধি, এত শীঘ্র বিদায় নেবে? তোমায় কি জন্মের মত বিদায় দিতে কলকাতা ছেড়ে এলাম।

—"সমীর চল ভাই একবার শেষ দেখা * * *"
মুকুল আর কথাটা শেষ কর্ত্তে পারল না ঝর ঝর করে তার বুক বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ল।

"মুকুল মুকুল তুমি কাঁদতে পেরেছ, এখনিই তোমার মনের অনেক ব্যথা কমে যাবে কাঁদ তুমি। কিন্তু আমার চোখে জল কই? বুকের ভিতর হুহু করে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্চে—উঃ একি আগুন—একি জ্বালা।

"চল মুকুল আমায় কি দেখাতে নিয়ে যাচ্চ চল।"

বিগারের রোগীর মত টলতে টল্‌তে চল্লাম—একি! এ যে সেই ঘর! যে ঘরে আমার রোগশয্যা একদিন এমনি সময়েই পাতা ছিল আজ সেই ঘরে, সেই বিছানায় আমার বড় সাধের কণা তাপদগ্ধ শুষ্ক কুসুম মালিকার মত বিছানায় লতিয়ে রয়েছে। আমায় দেখে মা নীরবে চোখে আঁচল চাপা দিলেন। ওঃ কি নিদারুণ দৃশ্য!

সেবারতা করুণাময়ী আমার; ঐ শোন প্রতি ঘরে ঘরে আজ অন্নপূর্ণার বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠেছে, এস রাণী আজ তোমাকে মনের মত করে নিজের হাতে সাজিয়ে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিয়ে আসি।

চোখের সামনে আর কিছু দেখতে পেলাম না। শুধু ঐ অনন্ত পথ যাত্রীর ম্লান মুখখানি হাজার বাতীর আলোর মত ঝলমলিয়ে উঠল। আছড়ে কণার বুকের উপর পড়লাম। ঘরের মধ্যে যে অতগুলি লোক বসে রয়েছে সেদিকে আমার দৃকপাতই নেই, আজ মনে হচ্চে এ বিশাল বিশ্বে বুঝি শুধু আমরা দুজনা মিশে গেছি। আজকের এ কাল রাত্রিটা বুঝি আমারই বহুদিনের চির আকাঙ্ক্ষিত মিলন রাত্রি। আজকের এ মিলনে বোধ হয় কেউ আমাকে বাধা দিতে পার্ব্বে না। কণা কণা একবার চাও—একবার তোমার মুখের দুটি কথা বলে যাও—একবার শুনে যাও—তুমি যাকে আত্মসমর্পণ করে প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছ তার একটা কথা আজ শুনে যাও। শোন রাণু শুনে যাও একবার যে এ হতভাগ্যও তোমায় প্রাণ ভরে ভালবাসে। নিভৃতে, নিরালায় হৃদয়ের রত্ন সিংহাসনে তোমারই মূর্ত্তিটিকে অতি সযতনে প্রতিষ্ঠা করে হৃদয়ের রক্তকমল দিয়ে পুজো করেছে। আমার বুকফাটা করুণ ডাকে সেই ঝরাফুল একবার—একবার তার প্রিয়ের আহ্বানে রক্ত গোলাপের মত আঁখিদল মেলে ধরল। ক্ষণিকের জন্যে মুখে তার তৃপ্তিপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল। ঠোঁট দু'খানি একবার এ বার নড়ে উঠল—তারপর উঃ—তারপর সব শেষ, সব ফুরিয়ে গেল।

৩রা বৈশাখ।

স্নেহকণা আমাকে চির ঋণী করে হাসতে হাসতে জয়ী হ'য়ে বিশ্বপিতার স্নেহময় কোলে আশ্রয় নিলে। কেমন করে আমি থাকব রাণী? এই কথা কটাকে আমি কেমন করে ভুলব যে আমারই জন্যে তুমি মরণকে সাদরে বরণ করে নিলে। না—না ও কথা স্মরণ কর্ত্তেও বড় কষ্ট হয় বড় ব্যথা বুকে বাজে। রাণী আমাকে শূন্য প্রকৃতির মাঝখানে একা দাঁড় করিয়ে কোন নূতন আলোকের সন্ধানে, কোন্ অজানার ডাকে তুমি পথ চলা সুরু করে দিলে? কোথায় তুমি থামবে? ঐ যে মৌন, স্তব্ধ, সুনীল আকাশের কোলে ফিরে ধুসর রঙের রেখাটুকু এঁকে বেঁকে চলেছে—ঐ পথ ধরে গেলে কি তুমি সেই চির সুন্দরের দেখা পাবে? অতদূরে কি তুমি যেতে পারবে? একা একা আঁধার ঘেরা পথ বেয়ে বেয়ে ঐ সুদূর দেশের কনক মন্দিরের দ্বারদেশে কি ঠিক পৌছুতে পার্ব্বে? না না পারবে না তোমার কোমল চরণ দুটি কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যাবে। না গো যেও না একা তুমি একটু দাঁড়াও—আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলে তোমার পথ চলায় কিছুও সাহায্য করে যদি আমার অসীম ঋণ ভারটা কিছুও হাল্কা কর্ত্তে পারি।

মনের জোর

[শ্রীসুবোধচন্দ্র সিংহ]

(১)

অমর—সে ছিল তার বাপ্-মার একমাত্র পুত্র। তার আর কোনও ভাই বোন ছিল না। তার বয়স হবে বছর পঁচিশ—যখন যুবা প্রাণে অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনার এবং রোম্যান্সের সমাবেশ হয়—যখন কিছু একটা নূতন করবার জন্যে প্রাণে বড্ড ইচ্ছা যায়। তার পিতাকে অধিকাংশ সময়ই বিদেশে ঘুরতে হ'ত—ব্যবসার জন্য। সে তার মাকে নিয়ে থাকত ল্যান্সডাউন রোডের উপরিস্থিত একটি সুদৃশ্য দ্বিতল অট্টালিকায়। তারা ছিল ধনী—এবং তার মা ছিলেন আলোকপ্রাপ্তা। সোজা কথায় তারা ব্রাহ্ম। তবে অমর—সে নিজেকে ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখতে ভালবাসতো না।

সে বিলাতে কয়েক বছর ছিল। সেখান থেকে বি-এস-সি পাশ দিয়ে এখানে এসে একটি কলেজের ক্যেমিষ্ট্রী প্রফেসারের আসনে সমাসীন হ'ল। লেকচার দেবার সময় সে চোখের সামনে সোনার চশমাটিও ঝুলিয়ে রাখত।

মনটি তার বেশ সৎ—কিন্তু একটু খেয়ালী সে—যার জন্যে সকলের সঙ্গেই প্রায় শীঘ্র আলাপ হয়ে যেত—আর পাড়ার বালক বালিকারা ভালও বাসত।

সে ক্যেমিষ্ট—কিন্তু মাসের মধ্যে অন্ততঃ দুবার বট্যানিক্যাল গার্ডেনের শোভা না দেখলে তার প্রাণটা কেন যে হাঁফিয়ে উঠে তা সে নিজেই ভাল করে বোঝে না। ভাল কথা সে একটু একটু ছবি আঁকতে পারত। কিন্তু সে যে ছবি আঁকবার জন্যে অতদূর যেত তা ত' বিশ্বাস হয় না। কারণ যতদূর মনে পড়ে তাকে একদিন মাত্র গঙ্গার ধারে বসে একখানা গঙ্গার দৃশ্য আঁকতে দেখা গেছল—এই পর্য্যন্ত।

সোমবার। কি একটা উপলক্ষ্যে সেদিন ছুটি ছিল। সময় কাটাবার জন্যেই হ'ক কিংবা তার স্বাভাবিক খেয়ালের জন্যেই হ'ক—সে বেলা প্রায় দুটোর সময় বট্যানিক্যাল গার্ডেনে এসে উপস্থিত।—তার সঙ্গে ছিল তার 'বেবী অষ্টিন' মোটরখানা, ড্রাইভার আর এক ফ্ল্যাস্ক জল।

শীতের প্রারম্ভ—সন্ধ্যার সময় থেকে শীতটা একটু অধিক মাত্রায় অনুভব করা যায়। অমর ষ্টীমার ঘাটের সামনের রাস্তাটার কিছু দূরে গাছের তলায় একটা বেঞ্চিতে বসে আপন মনে কি ভাবছিল। বোধ করি বা স্বপ্নেদৃষ্টা কোন এক মানস সুন্দরীর পায়ের গোপন সাড়া অনুভব করছিল। অদূরেই তার গাড়ীখানা গাছের আড়ালে ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল।

জেটিতে একটা ষ্টীমার এসে লাগতেই দু' তিনটি লোক নামল।

অমর ঘাড় ফিরিয়ে তার সামনের রাস্তাটার দিকে দৃষ্টিপাত করেই অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে পড়ল'।

অমর দেখতে পেলে তার অদূরে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে। তরুণী সুন্দরী, পরণে তার কালো সাড়ী আর হাফ হাতা টাইট সেমিজ, পদদ্বয়ে কালো জুতো ও একই রংয়ের মোজা। তরুণীর চুলগুলি কোঁকড়ান এবং নিপুণভাবে বাঁধা। চোখ দুটি আয়ত—সুন্দর।

অমরের মনে হ'ল তরুণী সুন্দরী। সে দেখলে তরুণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে দৃষ্টিপাত করছে। কোন্ দিকে যেতে হবে কি সে দেখবে—সে যেন জানে না—যন্ত্রচালিতার মত সে যেন এখানে এসে পড়েছে।

অমর তরুণীর সাদাসিদা পরিচ্ছদ দেখে বুঝলে যে তরুণী ধনী নয়। সে যে কখনও বট্যানিক্যাল গার্ডেনে আসে নাই তা তার ঐ মুখখানি দেখলেই বোঝা যায়। আবার ভাবলে তরুণী কলকাতাতেই থাকে, কিন্তু বেশীদিন কলকাতায় আসে নাই।

তরুণীর অবস্থা দেখে অমরের মনটি সহানুভূতিতে ভরে উঠল। সে ধীরে ধীরে উঠে তরুণীর সমীপবর্ত্তী হয়ে কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"আমি কি আপনার কোনও উপকার করতে পারি।" তরুণী পিছিয়ে গিয়ে বলল—"না না আপনি কেন করবেন—আমার কোনও দরকার নেই।" অমর বল্লে—কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—আপনার একজনকে দরকার যে আপনাকে গার্ডেনের

দেখবার মতন জিনিষগুলো সব আপনাকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়।"

অমর একটু থেমে বল্লে—"বিশেষ আপনি কি করে যে আজকের অপরাহ্নটা কাটাবেন তাই ভেবে পাচ্ছিলেন না—সমস্ত সকাল থেকে ভেবে ভেবে পেলেন যে বট্যানিক্যাল গার্ডেন দেখা হয় নাই অতএব আসতে হবে। নয় কি? কিন্তু আপনি ভাবছেন যে আমি একটা মস্ত বড় খারাপ লোক—। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি ভদ্রবেশী একটি বদমাইস। আমি যে তা নই তার প্রমাণ আপনি যখন আমায় দেখে ভয় পাচ্চেন তখন আমি আপনার সামনে থেকে এক্ষুণি সরে যাচ্চি।" এতগুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে সে হাঁপিয়ে উঠল।

তরুণী মৃদুকণ্ঠে বল্লে—"ভয় পাব কেন আপনাকে দেখে—তারপর আরও কোমল সুমিষ্ট স্বরে বল্লে—"আচ্ছা আপনি কি করে জানলেন?"

তরুণী কথা কয়টি বলবার সময় তার ভাসা ভাসা চোখ দুটি অমরের চক্ষের উপর স্থাপন করেছিল।

অমর ভাবল—কি সুন্দর চাউনি। বল্লে—"এমনি আন্দাজ করছিলুম।"

"সত্যি সত্যি আন্দাজ করছিলেন।"

"হ্যাঁ সত্যসত্যই—আরও আপনাকে দেখে মনে হচ্চে আপনি বেশীদিন কলকাতায় আসেন নি। আপনি এখনও ভয় পাচ্চেন—আমি চল্লুম—শুধু একটু উপকার আমায় করতে দিন—আমার গাড়ীটা আপনাকে বটগাছটা পর্য্যন্ত অন্ততঃ পক্ষে এগিয়ে দিক্—কারণ পথটা নিতান্ত কম নয় আর রোদ্দুরও বেশ।"

"না না আমি একলা মোটর চড়ে যেতে পারবো না।"

"তবে আমাকে আপনার পাশে থাকতে দিন—আমি যতদূর পারি আপনাকে সমস্ত দেখিয়ে দোব—তাতে কি কিছু দোষ হ'বে?"

"কিন্তু আপনাকে যে বিশেষ কষ্ট দেওয়া হবে। বিশেষতঃ আপনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক।"

"ওঃ—সকলে সম্ভ্রম করে তো কত। এত সম্ভ্রম করে যে মোড়ের মাথায় মোটরের হর্ণ না দিলে পুলিশ অমনি মাথা নীচু করে নম্বর নেয়।"

অমরের এইসকল কথায় তরুণীর মনটা কি এক আনন্দে ভরে উঠল।

অমর বল্লে—"কি বলুন রাজ্ঞী—না এখনও ভদ্রবেশী বদমাইস হয়েই আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।"

"আপনার অসীম দয়া" বলে তরুণী মাথাটা নত করলে। অমর বল্লে—"দয়া আবার কিসের, আসুন।"

(২)

'বেবী অষ্টিন' খানায় চড়ে দুজনে চল্ল। অমর নিজেই ড্রাইভ করছিল—তার পাশে তরুণী বসে। ড্রাইভার পিছনের সীটে বসেছিল। তরুণী বল্লে "বাঃ আপনার গাড়ীখানা কি চমৎকার।"

"গাড়ীটা ভাল,—না যে ভাল অনুভব করলে তার মনটি ভাল।"

তরুণী লজ্জায় কিছু বলে নাই।

শীঘ্রই বটগাছটার কাছে এসে পৌঁছিল। তরুণী বিস্ফারিত নেত্রে বটগাছটির দিকে কিছুক্ষণ সকল ভুলে চেয়ে রইল। অমর তরুণীর বিস্ফারিত সুন্দর চোখ দুটির দিকে চেয়ে বেশ আনন্দ অনুভব করছিল।

তরুণী বল্লে—"কি চমৎকার।" তারপর অমরের দিকে চেয়ে বল্লে—"আচ্ছা আপনি এই গাছটায় উঠতে পারেন।"

"কি জানি" বলে অমর তার দিকে চাইলে।

অনেক ঘোরাঘুরির পর তরুণী তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে পড়েছিল। গাড়ীখানা তখন একটু দূরে ছিল। জলের ফ্ল্যাস্ক তার ভিতর। অদূরে একটা লোকের কাছে গোটাকতক ডাব ছিল, তাই দুজনে আনন্দের সহিত কৌতুক অনুভব করতে করতে পান করলে।

তারা দুজনে যখন একটা পুকুরের ধারে ঘাসের উপর আধশোয়া অবস্থায় বসে প্রস্ফুটিত পদ্মফুল গুলির দিকে চেয়ে তাদের ক্লান্তি নিবারণ করছিল তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। অমর বল্লে—"এবার ত যেতে হবে—দেখাও সব হয়েছে।"

"হ্যাঁ—ষ্টীমার কটার সময় বলুন ত।"

"কেন ষ্টীমার কি হবে।" বলে অমর তরুণীর দিকে আশ্চর্য্যের ন্যায় চাইল।

"ওমা বাড়ী যাব না।"

"ওঃ! আচ্ছা আপনাদের বাড়ী কোথায় বলুন ত।"

"সে অনেক দূর—টালিগঞ্জের ডিপোর কাছে।"

"বেশ ত' আমারও ত' বাড়ী ওই দিকেই—চলুন না একই সঙ্গে যাওয়া যাক্।"

"আপনাকে বারবার কষ্ট দিতে আমি ইচ্ছে করি না।"

"কষ্ট যে কোথায় তা'ত খুঁজে পাচ্ছি না—উল্টে লাভ। এতটা পথ তবু গল্প করবার সঙ্গী পাব—বিশেষ আপনার মত সঙ্গী—এটা আমার একটা সৌভাগ্য নয় ?"

অবশেষে তরুণীকে পরাজিত হতে হল। অমরের পাশে বসে তরুণী চল্ল দুলতে দুলতে।

তরুণী বল্লে—"কিন্তু আপনার গাড়ীর একটা মস্ত দোষ আছে।"

অমর বল্লে—"শুন্‌তে পাই কি।"

"দোষটা হচ্ছে মস্ত বড়—সেটা হচ্চে আপনার গাড়ীটায় মোটে ঝাঁকুনি লাগে না—বড্ড আরাম দেয়। এটা খারাপ নয় কি। একটু আধটু ঝাঁকুনি না খেলে মানুষ হব কি করে আমরা।" বলে তরুণী হেসে উঠল। অমরও সেই সরল হাসিতে যোগদান করলে।

অমর যখন সুদক্ষ চালকের ন্যায় হাওড়া ব্রিজ, হ্যারিসন্ রোডের মোড়ের ভীড়ের ভিতর দিয়ে তার ছোট্ট গাড়ীখানা এঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিয়ে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের খানিকটা পথ অতিক্রম করলে—তখন তরুণী বল্লে—"বাঃ কি সুন্দরই আপনি চালান। আমরা যখন লাহোরে ছিলাম তখন বাবার বন্ধুর একখানা মোটর গাড়ী একদিন চালাতে চেষ্টা করেছিলাম। কি ভয়টাই না করছিল।"

"তাহলে আপনি ড্রাইভ করতে পারেন বলুন।"

"একদিন চেষ্টা কর্লেই বুঝি শেখা হয়ে গেল।"

"বেশ ত একটু চেষ্টাই করুন না। প্রথমে ষ্টেয়ারিং ঠিক করতে শিখুন।"

"না না—আজ থাক।"

অমর জিজ্ঞেস্ করলে—"একটা মজা দেখুন আমরা দুজনে এতটা সময় একসঙ্গে কাটালুম কিন্তু কেউ কারুর নাম জানি না।"

"ঠিক কথাই বলেছেন—কিন্তু আপনি যখন প্রথম পরিচয়ের কথা উত্থাপন করলেন তখন নিজেরটি আগে দেওয়া প্রয়োজন।"

"আমার পরিচয় খুব একটুখানি—আমার বাড়ী নেই কোথাও—থাকি মেছোবাজারের কাছে বেশীর ভাগ সময়—অনেকেই আমায় ডাকে মহাবীর গুণ্ডা বলে।" গম্ভীরভাবে অমর রাস্তার দিকে চেয়ে কথাগুলো বল্লে।

কৃত্রিম ভয়ের সহিত তরুণী বল্লে—"তাহলে সুশীলাকে ত' মহাবীর গুণ্ডার পাশ থেকে এক্ষুনি নেমে যেতে হচ্চে।" বলে হেসে ফেললে।

অমর তার দিকে ফিরে বললে—"আপনার নাম সুশীলা। কি বলে ডাকবো আপনাকে।"

"কেন সকলে যা বলে ডাকে—তবে আমার সম্পূর্ণ নাম হচ্চে শ্রীসুশীলা মল্লিক। আপনার যা ভাল লাগে তাই বলে ডাকবেন।"

"বেশ সকলে যা বলে ডাকে তাই বলেই ডাকব আপনাকে মিস্ মল্লিক বলতে এখন মুখে আটকাতেও পারে বোধ হয়।"

"আমিও নাম ধরে ডাকাকেই পছন্দ করি। কারণ আমরা ত' আর ইংরেজ নই। জাতেই না হয় ওদের পার্শ্বে দাঁড়ালুম—তাও আবার সব সময় ইচ্ছে করে নয়। এই দেশের ডাকের দিন আমরা হয়ে আছি জড়ের মত।"

কিছুক্ষণ পরে অমর বল্লে—"সুশীলা কই আমার নাম জিজ্ঞেস্ করলে না।"

"কবার করে জিজ্ঞেস্ করব।"

অমর ধীরে ধীরে তার নাম এবং কোথায় সে থাকে তা বল্লে।

(৩)

ইডেন গার্ডেনের ধার দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ীখানা চালিয়ে দুজনে ফিরছিল। অমর জিজ্ঞাস করলে—"এখন ত' সবে সাড়ে পাচটা বিকেলটার একটা ভাগ ত কোন রকমে কেটে গেল—এবার সন্ধ্যাটা কাটাবেন কি করে।"

"কি আর করব বলুন চুপ্‌চাপ্ ঘরে বসে থাকতে হবে—

যে জায়গায় থাকি সেখানে না আছে একটা লাইব্রেরী না আছে একটা কিছু যাতে করে সময়টা কাটে।"

"বই পড়তে খুব ভালবাসেন বুঝি—আচ্ছা এক কাজ করি না কেন দুজনে একটু বায়স্কোপ দেখে আসি—তারপরে বাড়ী ফেরা যাবে—বাড়ী ফিরতে বড় জোর সাড়ে আটটা হবে কি বল—না রাত হয়ে গেলে বকুনি খেতে হবে বাড়ীতে।"

"বকুনির ভয় করি না—তবে—নাঃ—আপনার বুঝি আর কোনও কাজ নেই—আমার সঙ্গে কি সমস্ত দিনই কাটাবেন, বাড়ীতে কি আর কেউ নেই যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন।"

"থাকবার মধ্যে ত' শুধু মা—সে ত রোজই মার সঙ্গে গল্প করি। অপর কেউ থাকলে কি আর বনের মধ্যে ঘুরে মরি।"

"কি বল যাবে না, বাড়ীতে জান্‌লার ধারে চুপটি করে বসে থাকবে, সেইটেই ভাল।"

অনেক সাধ্য সাধনার পর সুশীলা সম্মত হল। কথায় কথায় জানতে পারলে যে সুশীলা লাহোরে থাকত—এখানে পিসীর বাড়ী এখন রয়েছে—অবস্থা খুব ভাল নয়—বাড়ীতে বসে সে মেয়েদের জামা তৈরী করে—লেশ টেশও বোনে।

গাড়ীখানা ড্রাইভার রামচরণের কাছে রেখে দিয়ে অমর দুখানা টিকিট কাটলে "ড্রেস্ সারকেলের"। ম্যাডান থিয়েটার মেরী পিক্‌ফোর্ড‌এর একখানা বই ছিল—লাভলাইট।

অমর সুশীলা দুজনে বসলে। একটা কুশন্ কোচের উপর। সুশীলা বল্লে—আচ্ছা এত দামী সীটে না বসলে কি হত না।"

অমর কোনও উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে বল্লে—"একটা ভুল হয়ে গেছে—অনেকক্ষণ বাড়ী থেকে বেরিয়েছ, ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়—কি করা যায় আর পাঁচমিনিট পরে ত প্লে আরম্ভ হবে।"

"না না, আমার ক্ষিধে টিধে পায় নি।" কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বললে—"বেশ বাড়ীটা না।"

অমর বললে "দেখি যদি বেয়ারাটার কাছে চকোলেট পাওয়া যায়।" বলে সহসা সে উঠে গেল—সুশীলা কিছু বলবার পূর্ব্বেই। কিছুক্ষণ পরে এক বাক্স চকোলেট হাতে করে এনে সুশীলার পাশে বসে বললে—এই নাও—যা পার কিছু খাও।"

সুশীলা আন্তরিক চটে গিয়ে বল্লে "বলুন ত—আমি ও খাব না।"

"তাতে কি হয়েছে—খুব ভাল জিনিষ—আচ্ছা আমি চোখ বুজিয়ে আছি।"

সুশীলা চুপ করে বসে রইল।

অমর আরম্ভ করলে—"বাঙ্গালীর মেয়ের সঙ্গে ইংরাজ দুহিতার তফাৎ এইখানে। বিলাতে এ রকম একবার একটা মেয়েকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে গেছলুম—চকোলেটের বাক্স এনে সামনে ধরতেই একঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ করে দিলে।"

অনেক করে বলার পর সুশীলা খেতে সম্মত হল—তাও আবার যদি অমর নিজেও খায়।

(৪)

বায়স্কোপ আরম্ভ হ'ল। এক এক জায়গায় সুশীলা বুঝতে পারছিল না—অমর তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। বায়স্কোপ দেখতে দেখতে সুশীলার চোখ দুটি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এক জায়গায় আনন্দের আধিক্যে সে অমরকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছিল। অমরও শেষের বিদায়ের দৃশ্যে সুশীলার একটি হাত-এ একটু চাপ দিয়েছিল।

বইখানিতে করুণ রসের সমাবেশ ছিল। সুশীলার চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছিল। অমর একটু বেশী গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। সে প্লে দেখতে দেখতেই ভাবছিল যে সে ভাল কাজ করছে না।

বায়স্কোপ শেষ হয়ে যেতে ভীড়ের মধ্যে অমর সুশীলার হাত ধরে নীচে নেমে এসে নিজেদের গাড়ীটিতে উঠল।

সুশীলা বল্লে—"বড্‌ড করুণ—এখনও চোখের সামনে ভাসছে।"

অমর' রামচরণকে এল্‌গিন রোডের মোড়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বল্লে "মাকে বলিস আমি এক্ষুণি আসছি।"

রসা রোডের উপর দিয়ে চলেছিল দুটি তরুণ তরুণী পাশাপাশি বসে চুপ করে। দুজনের মনের গতি কোন্

দিকে বইছিল কে জানে। একই দিকে কি? না বিভিন্ন পথে?

যখন টালিগঞ্জের ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি এসে পড়ল তখন অমর জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা সুশী—আমি তোমার উপর নিশ্চয়ই কোন নির্দ্দয় ব্যবহার করি নি।"

এইরূপে সম্বোধন করাতে সুশীলা একটু থতমত খেয়ে গেল—তারপর লজ্জিত হয়ে বল্লে—"না আপনি আমার উপর খুব ভাল ব্যবহারই করেছেন। এই আমাদের বাড়ী।"

নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর সামনে গাড়ীখানা থামল। বাড়ীর সামনে গেট—গেট থেকে বাড়ীর ঘরগুলো অন্ধকারে বড্ড অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। অমর সুশীলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও গাড়ী থেকে নামল। যেখানটায় দুজনে দাঁড়াল সেখানটা অন্ধকার—শুধু চাঁদের ক্ষীণ রশ্মি দেবদারু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে সুশীলার মুখের উপর পড়েছিল।

সুশীলা জিজ্ঞাসা করলে—"কই আপনার ঠিকানা ত আমায় বল্লেন না।"

"ঠিকানা জেনে কি হবে।"

"হবে আবার কি তবু বলুন না।"

অমর তার বাড়ীর ঠিকানা বল্লে। তারপর বল্লে—"দু একটা বন্ধু জোগাড় করে নিও—না হলে এরকম একলা থেকে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।"

"চেষ্টা করবো এখন।" বলে সুশীলা অমরের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলে। অমর সে দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে গেল কিন্তু সে এক পাও নড়লে না।

তরুণী সুশীলা হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—"গুড নাইট।" অমর হাতটি ধরে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে—"গুড নাইট।"

বিদায় লওয়া হয়ে গেলেও অমরের হাতটি সুশীলার হাতটিকে চেপে ধরেছিল।

সুশীলা আর একবার অমরের দিকে চেয়ে হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—তারপর শেষ বারের মত ফিরে চেয়ে যখন দেখলে যে অমর কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন গেটের অপর পার্শ্বে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অমর বাড়ীর দিকে ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগল—"সুশীলা অমন করে আমার দিকে চেয়েছিল কেন—সে কি আমার কাছ থেকে একটা চুম্বন পাবার আশা করেছিল—কি জানি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে সে এটা চেয়েছিল কি না। যাক্ আমি যে নিজেকে সংযত রেখেছিলুম তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ—আমি যে তাকে চুম্বন করি নাই তার জন্যে আমি আনন্দিত।"

অমর বাড়ী ফিরে দেখলে যে তার বৌদি (মামাত ভাইয়ের বৌ) এসেছে।

বৌদি প্রথমে জিজ্ঞেস করলে—"কি ভাই বলি এতক্ষণ ছিলে কোথায় কখন এসে বসে আছি—দেখাটি নেই।"

অমর হেসে বলেছিল "এখন ত' এসেছি—এবার কিন্তু কম করে দু' মাস এখানে থাকতে হবে।"

"ছুটি মোটে এক মাসের দু' মাস থাকব কি করে বলত—তা বলি কোর্টশিপ্ কি আর কিছু হচ্ছে—না এই এসিডে এই এসিড মেশালে কি হবে তাই দেখছ।"

(৫)

সপ্তাহ খানেক পরে অমর একখানা চিঠি পেলে। তাতে লেখা ছিল—

"প্রিয় অমরবাবু—

আপনাকে পত্র লিখিলাম বলিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। সেদিনকার আনন্দের পর এখন কোনও দিনই আমার আর ভাল লাগে না। এখন নিজেকে বড্ড একা বোধ করি। যদি কিছু মনে না করেন তা হলে বুধবার সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীর কাছে আসিবেন—আমি ট্রাম ডিপোর কাছে অপেক্ষা করিব। আমাকে আপনার কোথাও লইয়া যাইতে হইবে না। আমি শুধু আপনাকে দেখিব। অমনি দু' একাখানা যদি বই নিয়ে আসেন তা হলে খুব ভালই হয়। আপনার অপেক্ষায় থাকিব।

ইতি—আপনার স্নেহ সম্মানিতা—'সুশী'।"

অমর তিন চারবার ক্ষুদ্র পত্রখানা পড়লে। সেদিন মঙ্গলবার—অমর মনে মনে ঠিক করলে যে সে যাবে না। পরের দিন সকাল বেলায় উঠে সে ঠিক করলে যদি সে যায় তাহলে সে জীবনে একটা মস্ত ভুল করবে।

অপরাহ্নে তার মত ফিরে গেল—সে ভাবলে যদি সে না যায় তাহলে হতভাগ্য বালিকা কত কষ্টই না পাবে। সে সাজগোজ করে নিজের ঘর থেকে বেরোচ্ছিল এমন সময় তার বৌদি জিজ্ঞেস্ করলে—"কতদূর।"

অমরের মন ফিরে গেল। সে তার বৌদিকে নিজের ঘরে ডেকে এনে আদ্যোপান্ত সমস্ত খুলে বললে এমন কি চিঠিটাও পর্য্যন্ত দেখালে।

বৌদি বললে—"তুমি তাকে চুম্বন করেছিলে।"

"না আমি খুব সাবধানই ছিলাম। তবে তার হাত দুটি চেপে ধরেছিলুম—এক সময়।"

"হুঁ—ওইখানেই যত গোল।"

"কিন্তু সেটা বন্ধুত্বের হিসাবে।"

"সেই জন্যে ত' গলদ বেশী—তুমি ভাবছ তোমার কাছে সেটা বন্ধুত্ব—কিন্তু তার কাছে সেটা অন্যরকম। সে হচ্ছে অবিবাহিতা। তুমি তাকে তোমার মধুর আচরণ দিয়ে তাকে স্নেহ করলে—লাভ হল কি সে তোমায় ভালবাসলে। তুমি দয়া দেখাতে পার। তোমার দয়াটা প্রকৃত হতে পারে। কিন্তু তোমার দয়া দেখিয়ে অপরের সর্ব্বনাশ করতে যাও কি হিসাবে? এটা জানা দরকার যে দয়াটারও আবার সৎ এবং অসৎগুণ দুই-ই আছে। দয়া বা অন্য কোন ধর্ম্মেরও পাপের মতন সংযম দরকার। তাকে দেখে তোমার মনে হল আহা মেয়েটির কি কষ্ট। তুমি এখন তার চোখে অনেক উঁচে। তুমি তাকে "সুশী" বলে সম্বোধন করেছো—আদর করেছো। তাতে সে তোমায় ভালবেসে ফেলেছে। এতে তার লাভের চেয়ে ক্ষতিটা কত বেশী দেখতে পাচ্ছো না। তোমার উচিত তুমি যেন তার সঙ্গে আর মোটে দেখা না কর। বিশেষ সে খৃষ্টান—তুমি তাকে বিবাহ করতে পার না।"

"কিন্তু সে যে আমার অপেক্ষায় থাকবে—আমায় যখন না দেখতে পাবে তখন তার বুকখানা যে ভেঙ্গে যাবে—তার মলিন মুখ যে আমার চোখের সামনে এখনও ভাসছে।"

"হাঁ তোমায় তার কষ্টের কথা ভাবতেই হবে—আর ঐটেই হবে তোমার ভীষণ শাস্তি—এখন চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেল, আর তোমার বিলাসী দয়ার পিঠে চাবুক মার।"

অমর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

বৌদি বললে—"কত নিঃশ্বাস পড়বে এখন—লোকে বনে গেলেও ব্রহ্মচারী হয় না বুঝলে—কোন নারীকে, যদি না সে তোমার বিবাহিতা পত্নী হয়, তোমার স্নেহমাখা দয়া দেখাতে যেও না—তাতে অনিষ্টই বেশী।"

অমর বললে—"হা ভগবান।" কিন্তু তার মনের খুব জোর ছিল সে সুশীলার সঙ্গে দেখা করতে এ পর্য্যন্ত যায় নাই।

খাস-মহল

[শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদার]

নবাবের বেগম মহলে ছিল তার বাস, পাঁচ পাঁচশ বেগমের মধ্য দিয়েই, রূপের আলো ছড়িয়ে দিয়ে সবুজ ওড়না উড়িয়ে দিয়ে, নুপুর ধ্বনির তালে তালে যখন সে চলে যেত তখন পাঁচশ বেগমের হাজার চক্ষু হিংসার আগুনে ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠ্‌ত। কত শত নবীন প্রেমিক রূপের আলোয় প্রতারিত হয়ে প্রতিবিম্বময় মুকুর ফলকে আপনাকে আঘাত করেছে; জীবনের শেষ রক্তকণাটুকু দিয়ে তার জন্যে এই বাদসার গুপ্ত হত্যাখানার দেয়ালে আপন ভুলের কথাটি লিখে রেখে গেছে। আলোক মুগ্ধ পতঙ্গের মত যারা তার যৌবনদীপ্ত জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ দিয়েছে তাদের সুন্দর সুঠাম দেহ এখনও এই বেগম মহলের অন্দর গোর-খানায় প্রোথিত। নবীন মহলে তার এমনি প্রতাপ যে স্বয়ং সম্রাট পর্য্যন্ত সময় সময় যবনীর মনোভাব বুঝতে না পেরে ভীত হয়ে উঠেন। তা'র এমনি একটা স্বভাব সিদ্ধ তেজ, এমনি তা'র চলা ফেরার কায়দা, এমনি তা'র কালো চোখের ভৎর্সনাময় কটাক্ষ যে বাদসাহের মহলে সবাই তা'র ক্রটি

সংশোধনে সদা শশব্যস্ত। সে যখন চলে তখন রাজহুকুমে পাঁচ পাঁচশ দাসী তা'র ওড়নার আঁচল ধরে, সোনার পানের-ডিবা বয়ে, গোলাপদানে আতর জল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। বাদসা ছিলেন তার কাছে খেলার পুতুল—তা'র রূপের গর্ব্বে সে শতমুখী ফণিনীর মত সদা সর্ব্বদা গর্ব্বিতা, আপন ভঙ্গিমায় আপনি মুগ্ধা; রক্ত পাদপদ্মে যখন সে প্রাসাদ গৃহের নীলপ্রস্তরময় গৃহপ্রাঙ্গণে পদচারণা করত তখন প্রাণহীন পাষাণ ফলকে ও প্রাণের সাড়া পড়ে যেত। এক একটী পদক্ষেপ নীল জলে শ্বেত পদ্মের মত ফুটে উঠ্‌ত।

লুদিয়া ছিল তা'র বড় আদরের বাঁদী; সে যখন আপন ঘরে গিয়ে মখমলের আরাম কেদারায় রূপ-যৌবন ভরা ললিত দেহখানি এলিয়ে দিয়ে বিশ্রামসুখ আশায় বসত, তখন পাঁচশ বাঁদীকে বিদায় দিয়ে লুদিয়া তা'র শিয়রে বসে গোলাপ বারি সিক্ত হাত পাখা নিয়ে ধীরে ধীরে হাওয়া দিত। সুন্দর পূর্ণ-যৌবন-ভরা শান্ত, স্নিগ্ধ, গোলাপী রঙে টুকটুকে অধর দেশে পাখার তাড়নে যখন অবাধ্য কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ খেলা সুরু করে দিত তখন লুদিয়া তা'র সেবা পরায়ণ সিদ্ধহস্তে সেগুলিকে সরিয়ে সরিয়ে দিত; আর একদৃষ্টে সেই শান্ত, সমুজ্জ্বল, দীপ্তিময়, ফুটন্ত গোলাপের মত পরিপূর্ণ যৌবন-দীপ্ত নীমলিত চক্ষু মুখ খানির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখ্‌তো। সময় সময় ভ্রমবশে শিথিল হাত থেকে হাত-পাখা পড়ে যেত। মুহূর্ত্তে রাণীর রক্তিম কপোলে বিন্দু বিন্দু স্বেদ বারি যেন গোলাপ পাপড়ির উপর শিশির কণার মত ফুটে উঠ্‌ত; লুদিয়া দ্রুত হস্তে ব্যস্ত ভাবে পাখা সঞ্চালন করে উঠ্‌ত, শিয়রের পাশে রাখা ফুলদানির ফুলগুলি অমনি যেন মধুকরের আগমন প্রত্যাশায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ত। রাণীর তন্দ্রা ভেঙ্গে লুদিয়ার সঙ্গে তা'র নিভৃত আলাপ সুরু হ'ত।

লুদিয়া একাধারে বেগমের বাঁদী এবং সখী, তাই তা'র বেগম মহলে এত মান, এত মর্য্যাদা—সে ছিল হিন্দু ঘরের মেয়ে, নবাবের আদেশে যখন তাকে এখানে আনা হয় তখন সে সদ্য বিবাহিতা বালিকা, বিকশোন্মুখ কুঁড়ির ন্যায় সবুজ পাতার আড়ালে অবনতা। লাজ, মান, ঘর বর সব ডুবিয়ে দিয়ে যখন সে নবাবের বেগম মহলে এসে মাথা গুজলো তখন সে সদা শাঙ্কতা, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় ভীতা, চঞ্চলা। বেগমের অপূর্ব্ব চাতুরী বলে লুদিয়া নবাবের করাল কবল হতে রক্ষা পেয়ে অবশেষে তা'রই খাস কামরায় বাঁদীরূপে নির্ব্বাচিত হয়। তা'র বাংলা নাম যাই হোক বেগম বাদসাহজাদী তা'কে আদর করে লুদিয়া নামেই ডাকত। লুদিয়ার এই পাষাণ কারাকক্ষে স্নেহ, ভালবাসা হীন মরু প্রান্তরে, প্রাণ-হীন বেগম মহলে এক অপূর্ব্ব জগতের অপূর্ব্ব লীলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক দিন কেটে গেছে। সে আপনার প্রদীপ্ত যৌবনকে বহু আয়াসে কারা-কষ্টের নিভৃত পাষাণে দলিয়া চাপিয়া মারিয়াছে। একদিনের জন্যও নিজের হৃদয়ে উদ্দাম চঞ্চলতার প্রশ্রয় দেয় নাই; তাই এখনও সেই আধ-মরা ক্ষীণ-কায়া যৌবন স্মৃতি প্রৌঢ় অন্তরে থেকে থেকে উঁকি মেরে উঠে। রাণীর নির্জ্জন কক্ষে একলা বসে বসে যখন বাদসাহের অন্দর মহলের নর্ত্তকীদের দূরাগত সুর লহরী এবং নৃত্যের তালে তালে নূপুর কিঙ্কিনী শুনত, তখন লুপ্ত যৌবন যেন মুহূর্ত্তে তা'র শুষ্ক হৃদয়ে বিদ্যুৎ খেলে যেত। লুদিয়া গবাক্ষ বন্ধ করে রাণীর শয্যা পার্শ্বে এসে বসত। শুভ্র অমলিন শয্যা প্রান্তে লুদিয়ার দু চক্ষু বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। আজ কতদিন অতীতের কক্ষে লীন হয়ে গেছে তবুও সেই বিবাহের প্রথম কয়েক দিনের স্মৃতি লুদিয়ার করুণ, কোমল নারী হৃদয় থেকে সরে যেতে পারে নি—কতবার মনে করেছে আর এই পাপময় জীবনে, এই যবনীর লীলা নিকেতনে নির্ম্মল প্রেমের স্মৃতিকে ডেকে এনে মলিন করবো না এতে যে সকলের অমঙ্গল; কিন্তু কই মুছে ফেলতে ত পারে নি। থেকে থেকে এক একদিন জ্যোৎস্না সন্ধ্যায় যখন যমুনার কালো জল কুল কুল করে বয়ে যেত, চাঁদ, শ্রাবণের বৃষ্টি-ভেজা মেঘের ভেতর থেকে উঠে আসত—দূরে দিগন্তর বনরেখার উত্তপ্ত কালো ছায়া ফেলে কেবলি চাঁদের আলো সমুখের দিকে ছুটে চল্‌ত তখন লুদিয়ার সেই একটী সন্ধ্যার কথা বাগানের রজনীগন্ধার মৃদু গন্ধের সঙ্গে অতীত স্বপ্নের মনের কোনে যেন একটী আধ-জাগা আধ-ঢাকা স্মৃতির পর্দ্দা তুলে দিত; সে অবাক হয়ে জল ভরা চোখে শ্রাবণের ভেসে যাওয়া কালো মেঘের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকৃতো—পাশে ফুলের মত প্রস্ফুটিতা পরিশ্রান্তা রাজ-নন্দিনী আলুলায়িত কেশে ভরা জ্যোৎস্নায় দেহ ভার

দুলিয়ে দিয়ে সুপ্তা। এমনি করে সুখের স্মৃতির ভার বয়ে বয়ে প্রেমহীন নারী জীবন, শুষ্ক বেগম মহলের একটী প্রান্ত বয়ে বেয়ে চলেছিল।

লুদিয়া সৌভাগ্যবতী, তাই আজ সে খাস বেগমের নিভৃত কক্ষের দাসী। এই নিভৃত আলয়ে লুদিয়ার সঙ্গে যখন বেগমের আলাপ হ'ত তখন বাদসাহজাদী বুঝতে পারতো যে লুদিয়ার হৃদয়ে তার আপনালয়ের নির্ম্মল, পবিত্র প্রেমের চিত্র কি সুন্দররূপে প্রতিফলিত। একদিন বেগম লুদিয়ার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল—"লুদিয়া! যদি তোকে তোর স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিই, তুই খুসী হোস্?" এই কথা শুনে মুহুর্ত্তে ভয়ে, বিস্ময়ে, ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চিন্তায় তার মাথা ঘুরে উঠল। হাতের পাখা ক্ষণিকের জন্য থেমে গেল। অবাক দৃষ্টিতে বেগমের চিন্তাক্লিষ্ট সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে রইল। লুদিয়ার মুখের ভাব রাণীর দৃষ্টি এড়াতে পারল না—সে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল—"লুদিয়া! আমায় বুঝি ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়?" আমার মধ্যে সবটাই নিরস, প্রেমহীন, প্রাণহীন জীবন। এই যে হাসিখেলা, নৃত্য, গীত এ'র মধ্যে লুদিয়া—একদিনও প্রাণের স্পন্দন অনুভব করি নি তোর মত যদি প্রকৃত নির্ম্মল, সত্য প্রেমের আভাস পেয়েও তাকে হারাতুম তবুও তার সুখময় স্মৃতি দিয়ে ঘিরে জীবনটাকে কল্পনার পুষ্পে পুষ্পিত করে তুলতুম। যদি তোর মত আজীবন ঐ একটু আধ ভাঙ্গা ভাসা ভাসা প্রেমের স্মৃতিকে বহিয়ে দিতে পারতুম তা হলেও উপরে খোদার দরবারে জবাবদিহির একটা পথ খোলা থাকত। লুদিয়া! তুই তোর অশ্রুকণার মধ্যে, নিভৃত স্মৃতি চিন্তার মধ্যেই অনেকটা সুখী—তোর সুখ স্বর্গীয়। আমার সবটাই কাঁটায় কাঁটায় ভরা। যখন গন্ধতৈল-সিক্ত লক্ষ প্রদীপ আধারে প্রজ্জ্বলিত আলোক মালার মধ্যে শত শত চক্ষুর হিংসার বান টেনে নিয়ে বাদসাহের পাশে গিয়ে দাঁড়াই, তখন সময়ে সময়ে এই প্রাণহীন অচেতন গহ্বর থেকে প্রেমের সত্য মূর্ত্তি সাড়া দিয়ে উঠে। মুহুর্ত্তে আবার সব নুপুর কিঙ্কিনী, ওড়নার চপলতা এবং নর্ত্তকীর নৃত্য তালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। থেকে থেকে এই পাষাণময়, রক্ষীঘেরা, রাজপ্রাসাদের কক্ষে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে।"

কথাগুলি শুনতে শুনতে লুদিয়ার চোখ জলে ভরে এল, আপনার প্রেমের পূর্ণগর্ব্বে সুন্দর মুখখানি আরো সুন্দর হয়ে ভরে উঠল কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে লুদিয়া অনন্যমনে, আত্ম-বিস্মৃতা বেগমের স্বেদসিঞ্চিত রক্তিম কপোলের দিকে চেয়ে রইল। বাতাসের মৃদু আঘাতে পদ্মের শিথিল পাপড়িগুলি একটী একটী করে নিভৃত কক্ষে, সবুজ মখমলের জাজিমের উপর ঝরে পড়ল।

বেগম বাদসাহজাদী আজ সর্ব্বত্রই রাণী,—সাম্রাজ্ঞী, বাদসাহের প্রধান রাজ-অন্তঃপুরচারিণী কিন্তু এই লুদিয়ার কাছে সে প্রাণময় নারী—এইখানে তার অনন্ত প্রকৃত প্রেমের সুন্দর সুকোমল হৃদয় পুষ্পটী অশ্রুজলে শিশিরসিক্ত। এইখানে তার নারীত্বের সৌন্দর্য্যময় বিকাশ।

একদিন শরতের সুন্দর দিনে খোলা ছাতের অলিন্দে বাদসাহজাদী একলা বসে উন্মুক্ত নীলাকাশে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র আপনালোকে আপনি বিভোর; শেফালির মৃদু গন্ধে প্রাসাদ প্রাঙ্গন আমোদিত।

বাদসাহজাদী তার নিস্তব্ধ ছাতে নিরালায় বসে বসে আপনার অতীত জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা একটীর পর একটী উলটিয়ে যাচ্ছে। যে সব স্মৃতিকে এতদিন মনের কোণে আমল দেয় নি, আজ যেন সেগুলিকে ডেকে আনতে বড়ই ইচ্ছা করছে—তাদের সঙ্গে নিরালায় বসে একবার আলাপের জন্য তার ব্যথিত হৃদয় যেন উন্মুখ; মনে পড়ল সেইদিন, আর এইদিন;—লুদিয়ার মত আমিও একদিন আমার স্বামীর ঘরের বউ ছিলাম,—না—না—আর কেন, যে সমুদ্রে ভেসেছি তাতেই ডুবে দেখি এর পরিসমাপ্তি কত দূরে—তাঁকে,—আর এ জনমে নয়, যদি কোনও পুণ্য করে থাকি হয়ত পরপারে তাঁর দেখা পাব! না—না, একি! আমি কি পাগল হলুম"—। হঠাৎ লুদিয়ার পদশব্দে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, চেয়ে দেখে নির্ম্মল চন্দ্রালোকে যমুনার কুলে কুলে, সুপ্ত পুরীর উপরে যেন এক স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করেছে।

* * * *

বসন্তের একটী দিনে, লুদিয়া খাস মহলের ভূমিশয্যায় আপনার শেষ শয্যা বিছাল—তারপর একদিন কোন ঝড়ের রাতে, বেগমের দেহভার যমুনার কালো জলে আশ্রয় নিলে—তারপর আর কেউ তাকে দেখে নি—।

ধাওত পিরীতি মদন বেয়াধি
তনু মন হলো ভোর।
সকল ছাড়িয়া তোমারে ভজিয়া
এ দশা হৈল মোর॥

িতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড] ১৩ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৩২। [৪২শ সপ্তাহ

শ্যা

ইস চুপ্‌

ছায়া

(গল্প)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী (চট্টোপাধ্যায়)]

"নাঃ—এর সঙ্গে আর পারা গেল না।" আপন মনে এই কথা বলিতে বলিতে নির্ম্মলচন্দ্র ড্রয়িং রুমের একখানা গদী আঁটা চেয়ারে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সুন্দর সদা-প্রফুল্ল মুখখানি আজ চিন্তায় ক্লিষ্ট—কি যেন কোন এক অজ্ঞাত ভাবনায় তাহার প্রত্যেক অবয়ব সঙ্কুচিত।

* * * *

বাহিরে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। উন্মুক্ত জানালা দিয়া বিদ্যুৎ তাহার বিশাল জিহ্বা মাঝে মাঝে আয়নার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার চিন্তায় বাধা প্রদান করিতেছিল। হু হু করিয়া বৃষ্টি-সিক্ত বাতাস ছোট ছোট গাছগুলির মাথা ভূমি চুম্বন করাইয়া আপন মনে বহিয়া যাইতেছিল—কোন্ অজানা দেশে প্রিয়ার সন্ধানে।

অদূরে গির্জ্জার ঘড়িতে বড় বড় ঘণ্টাগুলি প্রায় সব বাজিয়া গেল। তাঁহার আজ সেদিকে খেয়ালই নাই। কি চিন্তায় যে তিনি সমাচ্ছন্ন—যেন তাহার শেষ নাই।

সহসা তাহার মনে হইল কোন একটা চেতন পদার্থ ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—যেন কাহার উদ্দেশ্যে তাহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস শব্দ শুনা যাইতেছে, কখনও খুব দ্রুত কখনও খুব মৃদু। তিনি আবিষ্কার করিলেন—এসব আর কিছুই নয়—সমস্তই তাঁহার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র এবং তাঁহারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটাছুটী করিতেছে—তাহারই শব্দ ঐ শব্দের ন্যায় শুনাইতেছে। কিন্তু একি গা ছমছম্ করিতেছে কেন? জোর করিয়া অকারণ ভয় ভাঙ্গিবার জন্য তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া বলিলেন "কেও।"

কোন উত্তর নাই। চারিদিক নীরব নিথর। একটা অজানা ভয়ে দেহটা শিহরিয়া উঠিল। গলা আর এক পর্দ্দা উঠাইয়া—আবার বলিলেন "কেও।"

কণ্ঠস্বরের রেশ ঘর ভরিয়া গম্ গম্ করিতে লাগিল। মৃদুভাবে উত্তর আসিল "আমি। আমার বাড়ীটা একবার দেখতে এলুম।"

সম্মুখে ফিরিয়া—যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি ভয়ে বিস্ময়ে জড়ের মত চেয়ারে বদ্ধ হইয়া গেলেন। চেয়ারে বসিয়া তিনি যেন দেখিলেন, এক বিরাট ছায়া তাঁহারই দিকে চাহিয়া। উত্তমরূপে চক্ষু রগড়াইয়া আবার দেখিলেন—না এত চক্ষের ভ্রম নয়—তবে সত্যই কি—? আর ভাবিতে পারিলেন না—মনকে বলিলেন—ওটা আর কিছুই নয়—চক্ষের ভ্রম—নিজের কাল্পনিক সৃষ্টির নিকট ভয় দেখাইও না। সহজসুরে জিজ্ঞাসা করিলেন "দুপুর রাতে বেশ কাজটা ত বাগিয়েছ দেখছি—আর কি সময় পেলে না!"

ছায়া আগন্তুকটা খুব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "বল কি! আমার বুকের আনাচে কানাচে ভরে রয়েছে আমার স্ত্রীর স্মৃতি—তার সঙ্গে জড়ান এই বাড়ীটা। আমার কি সময় অসময় আছে—সবই ত সমান—দুপুর রাত কি—সন্ধ্যে রাত কি। তুমি বড্ড ভয় পেয়েছ না?"

তাতাতাড়ি তাহার শেষের কথাটা চাপা দিবার অছিলায় নির্ম্মলচন্দ্র বলিলেন "হাঁ হাঁ—তোমার কথাটা বড়ই সঙ্গত—তা তোমার কাজ কি আছে সেরে নাও আমি একটু বসে থাকি।"

সে হাসিয়া কহিল "কাজ ত ছাই—এই ঘরখানাই ত আমার সব। যাক্ তুমি আজ যে বড় একা—তোমার সঙ্গিনী গেল কোথা? ভালই হলো—তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাক।"

নির্ম্মলচন্দ্র নিরুপায়—কোন প্রতিবাদ করা যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনা করিয়া শুষ্কভাবে উত্তর দিলেন "সেই ভালো।"

"তবে আমার জীবনের একটা ঘটনা শুন।"

গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।

* * * *

দেখ—হাঁ—আজ প্রায় দশ বছর হলো আমি তোমাদেরই

মতন মানুষ ছিলুম। গল্প গুজব করে আনন্দে দিন কাটত আপন-ভোলা হয়ে। উঃ—আজ আবার কতদিন পরে ঠিক মানুষেরই মতন গল্প করতে বসেছি।

সহরের কোলাহল—আমার মোটেই ভাল লাগ্‌তো না ছোটবেলা থেকে। মাঝে মাঝে এইখানে পালিয়ে পালিয়ে আসতুম—কার যেন আকুল ডাকে।

খুব ভাল লাগ্‌তো এই জায়গাটা। কেমন সুন্দর—খোলা চারদিক। বর্ষাকালে আরও দেখতে ভাল হতো যখন বড় বড় ঝাকড়া ঝাকড়া গাছগুলো বৃষ্টি-ভেজা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াত সতেজ হয়ে—আর তাদের মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ যেদিন সুবিধে পেতেন ধীরে ধীরে উঠে এসে বসতেন ঐ পাঁচ-মিশ্‌লি রংয়ের সাদা চুমকির কাজ করা আকাশে তাঁর কিরণ চারদিকে বিলিয়ে দিয়ে। তখন আমি আপন হারা হয়ে তাদের দিকে চেয়ে থাকতুম এক দৃষ্টে। যাক্‌ বাবা মারা যাবার পরই আমি এখানকার চিরকেলে বাসিন্দে হয়ে পড়লুম। বিয়ে থাওয়া না করে কেটে যাচ্ছিল বেশ সুখেই—আমার সুখের ঘরে কেউ তখনও সিঁদ দিতে পারে নি।

ঐ যে দেখছ একটা ছোট্ট আঁকা বাঁকা নদী—ঠিক ওরই ওপারে আমার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকতো—আত্মীয়দের মধ্যে ছিল এক রোগা-শোকা বুড়ী আর তারই এক নাতনী নাম স্নেহ। তাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা বড় একটা—কেন—ছিলই না। স্নেহর রংটা গোলাপ ফুলের মত নিখুঁত ছিল না—তবু সে সুন্দরী ছিল। তার বাপ মা খুব ছোটবেলাতেই তাকে বুড়ীর কাছে রেখে কোন্‌ অজানা পথের যাত্রী হয়েছিল। বুড়ীও তাদের দানটীকে বুকে করে মানুষ করেছিল—সে তাকে মা বলেই ডাকতো।

সেদিন ছিল একটা আষাঢ়ের বাদলার দিন। সকাল থেকে কালো কালো মেঘগুলো যুক্তি করে বসেছিল সমস্ত আকাশটা ঢেকে! সূর্য্যি ঠাকুরটীও রেগে-মেগে একটী বারও দেখা দেন নি। ঐ ছোট্ট আঁকাবাঁকা নদীটার রোক্‌ দেখে ত আমি তাক্‌ লেগে গেছলুম—সেদিন সে বাতাসের সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছায় রেগে ফুলে ফুলে উঠছিল কোনও শক্তিতে। পাগলা হাওয়াটা শোঁ শোঁ করে সেই পাগলা নদীটার ইচ্ছে বিফল করছিল তাদের সেই লড়াইয়ের সূচনা বেড়ে যেতে লাগলো সেই কালো কালো মেঘ ঢাকা আকাশের নীচে।

আমায় কিন্তু তাদের তুচ্ছ করে একবার ওপারে যেতে হয়েছিল। ফেরবার সময় দেখি ঝড়বৃষ্টি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বে-গতিক দেখে বুড়ীর বাড়ীতেই উঠলুম। সারা দিন রাতেও ঝড়বৃষ্টি থাম্‌লো না—রাত কাটালুম সেইখানে। বুড়ী আর স্নেহ যেন মূর্ত্তিময়ী স্নেহ—কত যত্ন কত আদর আপ্যায়ণ যে করলে—তা বলা যায় না।

পরদিন বাড়ী ফিরলুম—মনটা তাদের ওখানে হারিয়ে। কিছু আর ভালো লাগতো না—মনটা সদাই উদাস যেন কার বিরহে। তার ভিতর একটা ভারী লড়াই বাধলো 'যাব কি যাব না' নিয়ে। যাবার দলই জয় করলে। মিথ্যে কাজে ওপারে গিয়ে তাদের বাড়ী উঠতে লাগলুম।

মনটার যেন পুনর্জ্জন্ম হলো স্নেহের আলাপে কিছুদিন যাবার পর আমাদের ভিতর এমন একটা ভাব এলো—যে কেউ কাকেও একতিল ছেড়ে থাকতে পারলুম না। বুড়ীকে ধরলুম—আমাদের বিয়ের জন্যে। সে ত বিশ্বাসই করবে না—অনেক করে বোঝাতে রাজি হলো—তার আহ্লাদ দেখে কে। বুড়ীর মত গিয়ে স্নেহকে জানালুম—তার মুখখানা কে যেন আবির রংয়ে রংইয়ে দিলে 'যাই কাজ আছে' বলে ছুটে পালালো—তার চঞ্চল চোখ দুটো আমার চোখে ফেলে।

* * * *

বিয়ের আর দুদিন বাকী। স্নেহর বাড়ী আমার দুবেলা যাতায়াত চলছে।

সন্ধ্যে হয় হয়—নদীর পাড় দিয়ে তাদের বাড়ী চলেছি—হঠাৎ স্নেহের কথায় আওয়াজ কাণে গেল—কার সঙ্গে কথা কচ্ছে। ওৎপেতে শুনবার আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না—একটা কড়া আওয়াজে আমায় সেখানে দাঁড়াতে বাধ্য করলে—কে যেন স্নেহকে বলছে—"দেখ স্নেহ তুই যদি ঐ নির্ম্মলকে বিয়ে করবি—তা হলে আমি তাকে খুন করে তোকে কেড়ে নেব।" উত্তরে স্নেহ খুব আস্তে আস্তে বলছে—চিরকাল তোমায় দাদা বলে এসেছি—তার বুঝি এই

উত্তর। আমি ত তোমায় বলেছি ওঁকে আমি ভালবাসি—আর বিয়ে! ওঁকে ছাড়া আর কাউকে করতে পারবো না। লক্ষ্মী ভাইটী আমার—ও মতলব ছেড়ে দাও।"

তাদের কোন রকম বিরক্তি না করে সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে তাদের বাড়ী গেলুম। স্নেহ যখন আমার কাছে এলো—বোধ হয় আধঘণ্টা পর তার মুখখানা সাদা কাগজের মতন হয়ে গ্যাছে আর ভিতর থেকে ভয়ের একটা ছবি ফুটে বেরুচ্ছে। তাদের নির্জ্জন আলাপের কোন কথা না জিজ্ঞেস করে তাকে আমার কাছে টেনে নিলুম। সেও কোন আপত্তি না করে আমার বুকের উপর তার মাথাটা নুইয়ে দিলে—একটা বড় রকমের নিঃশ্বেষ ফেলে—সেটা যেন জানিয়ে গেল 'এ সুখ কি তার হবে'। ধীরে ধীরে তার কাণের উপরকার চুলগুলো সরা'তে সরা'তে জিজ্ঞেস করলুম—"কি হয়েছে স্নেহ এমন করছ কেন?" জলে-ভরা চোখ দুটো আমার মুখের দিকে তুলে চেয়ে রইল। চাপা কান্না ভেতর থেকে বের হবার জন্যে আকুলি বিকুলি করছিল কাতর হয়ে ঠোঁটদুটো তাকে চেপে রাখতে পারবে না জেনে মিছে অভিমানে কেঁপে কেঁপে উঠছিল আমার ঠোঁট দুটো আর না থাকতে পেরে তার সেই কাঁপা ঠোঁট দুটোকে চেপে ধরলে। তাড়াতাড়ি নিজেকে খালাস করে—আমার পায়ের উপর তার মাথাটা ঢিপ্ করে ঠেকিয়ে ছুটে চলে গেল একরাশ চোখের জলের পা দুটোকে ভিজিয়ে দিয়ে।

* * * *

বিয়ে হয়ে গেল—বাড়ীতে নিয়ে এলুম। কি সুখে যে দিন কাটছিল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু একটানা সুখভোগ করা মানুষের কপালে সয় না। আমারও সয় নি।

কোন একটা কাজে সে'দিন সহরে গেছলুম ফিরতে রাত হয়েছিল—এই ঘরখানা থেকে সুন্দর আলোক তার চড়া তেজ বাইরের আঁধারে ফেলছিল একটা আনন্দে মাতওয়ারা হয়ে—যেন আমারই আবাহনে। মনে ভাবছিলুম কত ভাগ্যবান আমি।

জানলার কাছে এসে মনে হলো স্নেহ কি করছে দেখতে। কিন্তু যা দেখলুম তা না দেখলেই ছিলো ভাল—এ যে একেবারে উল্টো। আমারই স্ত্রী আমার বাড়ীতে—সেই হরিটার সঙ্গে প্রেমালাপে ব্যস্ত—অন্ততঃ আমার তখন মনে হয়েছিল। রাগে, ঘৃণায় সারা দেহটা রি রি করতে লাগলো—চীৎকার করতে গেলুম গলাখানা যে যেন চেপে ধরলে। তখন কেবলই মনে হচ্ছিল—কোথা শান্তি। চোখদুটো দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলুম—বুঝি না চাহিলেই শান্তি পাব—কিন্তু কোথা? পাগলের মতন খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটী করলুম—জ্ঞানহারা হয়ে। যখন হুঁস হলো—মনটা তখন প্রতিহিংসার তৃষ্ণায় পূর্ণ। ছুটে ঘরে ঢুকে দু'হাতে দরজার ধার দুটো চেপে ধরলুম খুব জোরে—একবার চোখদুটো ঘরখানায় ঘুরিয়ে নিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলুম—"বল্ সে সয়তানটা গেল কোথা? আর তোরই এই কাজ—আমি না তোকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।" সে ভয়ে ভয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—"ওগো কি হয়েছে—তুমি এমন করছ কেন?"

"কি হয়েছে।" বলে পাগলের মতন হেসে উঠলুম। সে চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ—তারপর তার দু'হাত দিয়ে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলে—নিজেকে মাটীর সঙ্গে এক করে। কান্না মিশানো কথায় বলতে লাগলো—"ওগো—তুমি আমায় অবিশ্বাস করো না—আমি তোমায় সব বলছি।" কে তখন তার কথায় কাণ দেয়—মাথার ভিতর আগুন তার সব শক্তি নিয়ে জলছিল যেন সয়তানেরই চালনায়—কান্না, মাটিতে লুটিয়ে পড়া সবই আমার কাছে তখন ছলনা বলে মনে হতে লাগলো—পা ছুড়ে তাকে ফেলে দিলুম।

তার মাথাটা পড়লো গিয়ে ঐ দেয়ালে—সে সব দেখবার আমার সময় নেই। ছুট্লুম সেই হরিটার সন্ধানে—প্রতিহিংসাই যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সে সবেমাত্র তার বাড়ীতে ঢুকবে লাফিয়ে গিয়ে তার জামাটা ধরলুম। সে ঘুরে দাড়িয়ে আমায় একটা ধাক্কা দিল—ধাক্কাটা সাম্লেই তার গলাটা চেপে ধরলুম দু'হাতে। আমার চেয়ে তার গায়ে জোর বেশীই ছিল সে আমার গলাটা এত জোরে চেপে ধরলে যে আমার কথা কইতে কষ্ট বোধ হচ্ছিল। সে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে বল্লে 'এতদিন পরে ভগবান তোকে আমারই হাতে পাঠিয়ে দিলেন।"

তার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলুম "বিশ্বাস-ঘাতক আমার চোখে ধুলো দিতে পারবি নি—আজ তোকে এর উচিত শাস্তি দেব।" সে একটু চমকে উঠে বললে—"ওঃ—তুই আমায় তোর বাড়ীতে স্নেহর সঙ্গে দেখিছিলি বুঝি।"

"সয়তান তুই মনে করেছিস্—আমার গলাটা আরো জোরে চেপে ধরলে কথা বেরলো না—সে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বলে যেতে লাগলো,—তুই যে স্নেহর অনুপযুক্ত তা আমি গোড়া হতেই জান্‌তুম—কিন্তু এত অনুপযুক্ত তা আজ না হলে জানতে পারতুম না। তবে আদত কথা শোন্।"

"যখন তুই স্নেহকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে—আমি জোর গলায় বলেছিলুম তোকে খুন করে স্নেহকে কেড়ে নেব। তার দিনও গুন্‌ছিলুম। এই পিস্তল দিয়ে তোকে মারবার জন্যে আজ সন্ধ্যে থেকে তোর বাড়ীতে লুকিয়ে বসেছিলুম। স্নেহ কি জন্যে বাইরে এসে ধরে ফেল্লে। তোর জীবনের জন্যে কত অনুরোধ করতে লাগলো আমি পিস্তলটা পকেটে রেখে তার সঙ্গে ঘরের ভিতর গেলুম। সে আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো—শুধু তোরই জীবনের তরে। তার কাতরতা আর দেখতে পারলুম না তার কাছে প্রতিজ্ঞা করে এলুম—আর আমি তাদের কাউকেও বিরক্ত করবো না। তুই আমার জীবনটা মাটী করে দি'লি—দূর হ।"

ছুড়ে দূরে ফেলে দিয়ে সে আপন মনে বাড়ী ঢুকে গেল। আর কোন কথা না কয়ে ছুটলুম বাড়ীর দিকে—স্নেহর প্রতি বড়ই খারাপ আচরণ করেছি ভেবে বুকের ভিতর একটা বড়ই যাতনা দিচ্ছিল—সদাই মনে হচ্ছিল কত ক্ষণে তার কাছে গিয়া ক্ষমা চাইব।

আলোটা সেইরূপ ভাবেই জলছিল কিন্তু তাতে আর যেন মন মাতান কিছুই ছিল না। ঘরে গিয়ে দেখলুম কি জান—আমার সাধের স্নেহ যার কাছে ক্ষমা চাইব বলে সারা পথ ভেবে ভেবে এলুম, অনেক আগে আমার ক্ষমা চাইতে না দিয়ে নিজেই আমায় ক্ষমা করে চলে গেছে অনেক দূরে। পড়ে আছে তার ঠাণ্ডা সাড়া-হীন দেহটা রক্তের ভিতর নিজেকে ডুবিয়ে। আচ্ছা বলতে পার—এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

* * * *

সব স্থির—নিস্তব্ধ—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুধু সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া লীন হইয়া গেল সেই ঘরখানায়—তাতে কত দুঃখ, কত বেদনাপূর্ণ। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া নির্ম্মলচন্দ্র চারিদিকে চাহিলেন—আবার চেয়ারটী শূন্য সেই ছায়া—আগন্তুক চলিয়া গিয়াছে।

বাহিরের বাতাসের প্রচণ্ডবেগ থামিয়া গিয়াছে—বৃষ্টি থামিয়া চারিদিকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা জ্যোৎস্নার ক্ষীণ কিরণ জানালা দিয়ে ঘরে খেলা করিতেছে। তিনি সেই ঘর পরিত্যাগ করিলেন।

নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। নিভা যেন কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রাভূতা হইয়াছে—চক্ষু দুটী অশ্রুতে পূর্ণ। তাহার মুখখানি অতি চমৎকার দেখাইতেছিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা শেষ জ্যোৎস্না তার এলোমেলো চুল-ঘেরা মুখখানির উপর পড়িয়া সুন্দর দেখাইতেছিল। কিসের শব্দে নিভার অশ্রুসিক্ত চক্ষুপল্লব দুটী—আধ ঘুমে, আধ অভিমানে হেমন্ত উষাকালীন শিশির স্নাতা হইয়া মেলিল। ঠোঁট দুটী ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। নির্ম্মলচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না—"নিভা নিভা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। তাঁহার দুষ্ট ঠোঁট দুটী তাহার ঈষৎ কম্পিত ঠোঁট দুটীকে দৈত্যের মত চাপিয়া ধরিল। নিভার হাত দুখানি তাঁহার কণ্ঠদেশে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া গেল।

—

জামাই ষষ্ঠী

['লতা']

জামাই ষষ্ঠীর আর দুদিন মাত্র বাকী আছে। চৌধুরীদের বাড়ীতে বেশ একটা গণ্ডগোল পড়ে গেছে। গৃহস্বামী রমেশ চৌধুরী বেশ একজন অমায়িক লোক। পূর্ব্বে গ্রামের চৌধুরীরাই বড় জমীদার ছিলেন, এখন কালের হাতে তাঁদের সে জমীদারী সব শেষ হয়ে গেছে; সুতরাং রমেশবাবু এখন একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বলিলেই চলে। তবে গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে জমীদারের মতন দেখেন, তাঁহাকে সকলে ভক্তি শ্রদ্ধা করে তবে সেটা জমীদারের দুর্দ্দান্ত প্রতাপের জন্য ভয়ে নয়, তাঁহার অমায়িকতা ও সদ্ব্যবহারের গুণে। রমেশবাবু দেশে চিকিৎসা বৃত্তিতে জীবন কাটাইতেছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর ডাক্তারী পড়ার খরচে প্রায় সমস্ত নিঃশেষ হইয়াছে। দেশে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি, তাঁহার সদাশয়তায় ও শিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। গ্রামে কোন গোলযোগ, মারামারি, ঝগড়া, বিবাদ হইলে লোকে তাঁহারই স্মরণ লয়, তাঁহার নিকট বাদী প্রতিবাদী বিচার প্রার্থনা করে; পরে তিনি তাঁহাদের বিবাদ মিটাইলে উভয় পক্ষেই সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাকে রাজা মশাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের বংশের পূর্ব্বস্মৃতি ও সম্মান বজায় রাখিয়াছে। ভদ্রলোকদের নিকট তিনি চৌধুরী মহাশয় নামে পরিচিত।

যাহা হউক, চৌধুরী মহাশয়ের অবস্থা এখন নিতান্ত মন্দ নয়। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র নরেন ও তিনটি কন্যা লীলা, লাবণ্য ও ললিতা। নরেন বাপের উপযুক্ত ছেলে। সে সম্প্রতি এম্-এ পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে এখন বাহিরে চাকরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। চৌধুরী মহাশয় একটি নিঃস্ব পরিবারের একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজিতেছিলেন কিন্তু পাত্রী তাঁহার ঠিক পছন্দমত না পাওয়ার জন্য বিবাহে বিলম্ব ঘটিতেছিল, যাহা হউক তিনি এ বৎসরের প্রথমে পুত্রবধূ ঘরে আনিবেন বলিয়া একরকম স্থির করিয়াছেন।

লীলা, লাবণ্য, ললিতা তিনটি মেয়েই বিবাহিতা। ভগবানের কৃপায় তাহারা বেশ অবস্থাপন্ন ও ভাল ঘরে পড়িয়াছে, কিন্তু ভগবান ত মানুষকে সম্পূর্ণ সুখ দেন না, তাই আজ ছোট মেয়ে আদর ও স্নেহের রাণী ললিতা দৈব-বিড়ম্বনা বশতঃ বিধবা। নরেন তাহার একটি ধনী উচ্চ শিক্ষিত বন্ধুর সহিত আদরের ছোট বোনটির বিবাহ দিয়াছিল কিন্তু বিবাহের দু' তিন মাস পরেই ললিতাকে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে—সে এখন বিধবা। শ্বশুর বাড়ী সে মাত্র দুইবার গিয়াছে; একবার বিবাহের সময় আর একবার তাহার স্বামী গিরীনের সাংঘাতিক পীড়ার সময় তাহাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে। স্বামীহারা হইয়া সে শ্বশুর বাড়ীতে চার পাঁচ মাস ছিল। গিরীনের মা পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রহারা হইয়া পুত্রবধূকে কাছ ছাড়া করেন নাই—সেই পৃথিবীর নিরীহ সর্ব্বসুখে বঞ্চিত চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকাটিকে দণ্ড দিবার জন্য নহে, পুত্রশোক সম্বরণ করিবার জন্য তাহাকে নিজের মেয়েটির মত কাছে রাখিয়াছিলেন। সম্পত্তিপন্ন লোকের বাড়ীতে আশ্রিত আত্মীয় ও অনাত্মীয় লোকের অভাব থাকে না। ঐ শ্রেণীর মেয়েরা আড়ালে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিত, "মেয়েটা কি অলুক্ষণে; বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই সোণার চাঁদ ছেলেটাকে আস্ত গিলে ফেল্‌লে গা; এমন অপয়া মেয়ে ত কখনও দেখি নি বাবা। মাগীর আবার ঐ হতভাগী মেয়েটার উপর দরদ দেখ না! না হয় দেখতে শুনতে ভাল বটে তাহ'লে কি হয়—আসলে সে রাক্ষুসী; বোধ হয় মায়া টায়া কিছু বিদ্যে জানা আছে তা না হলে আর গিন্নীকে বশ করতে পেরেছে? যার অমন

হাতীর মত ছেলে ধড়ফড় করে মরে গেল সে কি রাক্ষুসীটাকে অমন করে স্নেহ যত্ন করতে পারে ? যেন তার কিছুই হয় নি। আবার কথার ছিরি দেখ না—'বলে কি না ছেলে আমারি কপালের দোষে গেছে, তার বদলে ভগবান আমাকে এমন লক্ষ্মী মেয়েটিকে দিয়েছেন।' আহা! কেমন মেয়ে দিয়েছেন একেবারে সাক্ষাৎ রাক্ষুসী। আবার মাগীর আক্কেল দেখেছ ? ছুঁড়িটাকে সধবার বেশে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়, ওমা কি ঘেন্নার কথা গো ? লজ্জায় মরি! আবার আমরা কখনও একটু আধটু কিছু বললে কি আর রক্ষে আছে ? বলে কি না 'তোমরা কেউ আর ওর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না, আহা বাছা আমার কি দুঃখটাই না পেলে ? ভগবান ওর কপালে কি কষ্টটাই না লিখেছিলেন ?' কথার ঢং দেখেছ, যেন ওনার কিছুই হয় নি যত দুঃখ কষ্ট হয়েছে ঐ একরত্তি মেয়েটার !......"

ললিতা মা বাপের কাছে ও দিদিদের নিকট যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং ঐ চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যেই সে একটি পাকা গিন্নীর মত জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ বর্ষীয় একটি বালক ও বালিকার বুদ্ধির বিচার করিতে গেলে দেখা যায় সাংসারিক অভিজ্ঞতা হিসাবে ছেলেটি সম্পূর্ণ শিশু মাত্র। আর মেয়েটি পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত। সুতরাং এই হিসাবে তাহার যতদূর জ্ঞান হওয়া উচিত ললিতা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাইয়াছিল।

ললিতা সর্ব্বদাই শাশুড়ীর কাছে কাছে থাকে। তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য কাছ ছাড়া করিতে চায় না—। তিনি যাতে সুখী ও সুস্থ বোধ করেন ললিতা তাহাই করে। একবিন্দু চোখের জল পাছে তাঁর কাছে ধরা পড়ে এইজন্য সে সর্ব্বদাই নিজেকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া রাখে। যখন প্রাণ তার বড় শূন্য মনে হয় ও পার্থিব জিনিষগুলো যখন তাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে তখন সে নূতন মা-টির কোলে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়ে, মনে করে তাঁর কোলে মুখ লুকাইলে আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না। সে ভাবিত মানুষ ত দুঃখে কাঁদে, আবার সুখেও কখন কখন লোকে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না। যদি সে সর্ব্বসুখে একেবারে নির্ব্বাসিত না হইত তাহা হইলে তার মত সুখী বোধ হয় জগতে আর কেহ থাকিত না। পরের মা যে নিজের মা হতে পারে (বিশেষ এই অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে) এ কল্পনা করিতে সে গদ্গদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিত, তাই সে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কোথায় এক শান্তি নিবাসে অবস্থান করিত তাহা সে নিজেই জানিতে পারিত না ; সুখ ও শান্তির আবাসে সে অবসন্ন হইয়া পড়িত—চক্ষু দিয়া অবিরলধারে সুখাশ্রু ঝরিয়া তাহার গণ্ডদেশ বহিয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত করিত।

রমেশবাবু যখন ছোট মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথা শুনিলেন তখন সহসা বাজ পড়িলে মানুষ যেমন ভীত ও বিস্মিত হয় তিনিও সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী দুঃখে ও শোকে সংজ্ঞালুপ্ত হইয়াছিলেন। রমেশবাবু মেয়েকে নিজের নিকট লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন কিন্তু গিরীনের মা ললিতাকে পাঠাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ও সে থাকিলে শাশুড়ীর শোকাবেগ কিঞ্চিৎ উপশম হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া তিনি আর কোন কথা মুখে আনিতে পারেন নাই—। বিশেষ ললিতা না কি কান্নাকাটি করিয়া বলিয়াছিল, "বাবা, এখন আমাকে এখানেই কিছুদিন থাকিতে দিন, আমি গেলে মা আর বাঁচবেন না।" অগত্যা তিনি মেয়েকে নানা উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া ও তাহার কর্ত্তব্যগুলিকে একবার সজাগ করিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। অবসর মত নরেনও একবার ললিতাকে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠীর সময় লীলা ও লাবণ্য বাপের বাড়ী আসিবে শুনিয়া গিরীনের মা স্বেচ্ছায় ললিতাকে রমেশ বাবুর বাড়ীতে পাঠাইবার কথা বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি মনে করিলেন এ দুঃখের সময় একবার মা বাপের কাছে গেলে তার মন অনেকটা ভালই থাকিবে। দিদিদের সহিত কতদিন তাহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই ; তাহাদের মুখ দেখিলে ললিতা প্রাণের শোক অনেকটা দূর করিতে পারিবে। কিন্তু সেই করুণাময়ী সরল হৃদয়া সন্তান বৎসল নারী বুঝিতে পারিলেন না যে ইহাতে তাহার সুখের চেয়ে দুঃখ যে সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইবে।

যথা সময়ে রমেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ললিতা প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিবার সময় শাশুড়ীর পদধূলি মাথায় দিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, "মা আবার আমাকে কবে আনবেন? আমি বেশীদিন সেখানে থাকতে পারবো না—।" গৃহিণী বধূর মুখ চুম্বন করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন ও তাহাকে সস্নেহে বুকে চেপে ধরে বল্লেন, "মা! আমিই কি তোমাকে ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারবো? একবার মা বোনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করগে ললিতা, আমি শীঘ্রই তোমায় আনবো।" একজন বিশ্বাসী প্রৌঢ়া দাসী ও বুড়ো দ্বারবান্ রামেশ্বর সিংকে গৃহিণী বধূমাতার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

ললিতা গিয়া দেখিল, তাহার বড়দিদি ও মেজদিদি পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বড়দিদির ছেলে চারু ও হারু এবং মেজদিদির মেয়ে ঊষা খেলা করিতেছিল। ললিতাকে দেখিবামাত্র তাহারা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ইত্যবসরে বাড়ীতে একটা অস্পষ্ট মিহি কান্নার স্বর উঠিল। হঠাৎ কি এমন কাণ্ড হইতে পারে জানিতে না পারিয়া পঞ্চম বর্ষীয় বালক চারু ভড়কাইয়া ভয়ে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। হারু ও ঊষা ললিতাকে জড়াইয়া ধরিল। দিদিমা, মা ও মেজ মাসীমাকে কাঁদিতে দেখিয়া হারু ফোঁপাইতে আরম্ভ করিল। ঊষা অনন্যোপায় হইয়া ছোট মাসীমার বুকে মুখ লুকাইতে গিয়া তাঁহার মুখ চোক জলে ভাসিতে দেখিয়া ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বড় জামাই হরেন ও মেজ জামাই অজিত ষষ্ঠীর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ললিতা লীলার চেয়ে সাত বৎসরের এবং লাবণ্যের চেয়ে পাঁচ বৎসরের ছোট। সুতরাং লীলাকে ও লাবণ্যকে এই ছোট বোনটির অনেক আব্দার ও উপদ্রব সহ্য করিতে হইয়াছে। হরেন ও অজিত ললিতাকে ছোট অবস্থায় দেখিয়াছেন, তাহাকে কত গল্প বলিয়াছেন। তাঁহারা ললিতাকে ছোট বোনটির মতই মনে করিতেন। ললিতার বিয়ের সময় সে আর কয়দিনের কথা—তাঁহারা আসিয়া কত আমোদ আহ্লাদ করিয়া গিয়াছেন, আর আজ তাহার সহিত দেখা করিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত। দেখা হইলেও যেন কথা বলিতে সাহস হইতেছে না।

অবশেষে ললিতা নিজেই ধীরভাবে আসিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিয়া শান্ত ও সংযত হইয়া সহজ গলায় তাঁহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, 'ললিতা, তোমাকে এভাবে যে দেখতে হবে মোটেই তা ধারণা করতে পারি নি। ইস্ ভোজবাজির মত নিমেষে যে কি একটা কাণ্ড হয়ে গেল তা বলা যায় না। আমরা ত তোমার সঙ্গে কথা বলতেই পারি নি, ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিলাম। ভগবান্……" ললিতা প্রাণে অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেছিল, সে সহসা তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"আপনারা দিদিদের কিছুদিন এখানে রাখবেন ত? আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি, এবার আর দিদিদের শীঘ্র লইয়া যাইতে পারিবেন না।" তাঁহারা ললিতার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ! এরা থাকবে বই কি, অন্ততঃ তুমি যে কয়দিন এখানে আছ তাঁরা তোমায় ছেড়ে যেতে পারবেন না। তোমার বাবার মুখে তোমার শাশুড়ীর গুণের কথা শুনলাম—হয়ত তিনিই তোমাকে শীঘ্র লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইবেন।"

আহারের সময় পূর্ব্বের অভ্যাসমত এবারও ললিতা জামাই বাবুদের নিকট আসিয়া বসিল। তাঁহাদের নিজে বাতাস করিতে করিতে খাবার জিনিষ কোনটি কিরূপ হইয়াছে, কি চাই না চাই সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া আরও বেশী খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল কিন্তু এবার খাওয়ার বিষয়ে সে একটু বিশেষত্ব দেখিতে পাইল। এবার খাইবার সময় তাহাকে জামাই বাবুদের বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে হয় নাই, তাঁহারা নিজেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি চাহিয়া লইয়াছিলেন।

ললিতার যে আজ কি দুঃখের দিন এবং তাহার অভাব যে কত দুঃসহ ও দুঃখপূর্ণ তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। জগতের সমস্ত কান্না যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল, বুকের ভিতর যেন একটা প্রকাণ্ড কালো পাহাড় এসে জেঁকে বসেছিল, কিন্তু এমন দিনে তাহার স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশ্যে একবিন্দু চোখের জল ফেলিবার তাহার অধিকার ছিল না। আশঙ্কা পাছে দিদিরা দেখিয়া ফেলেন, মা জানিতে পারেন; তাহা হইলে যে দিদিদের অকল্যাণ

হইবে এবং মা কষ্ট পাইবেন। সে মনে করিতেছিল, 'আমার কষ্ট আমাতে থাকুক তাঁহাদের অকারণ কষ্ট দিয়ে লাভ কি?' কিন্তু সে যে বুদ্ধিমতী হইয়াও আজ কেন বুঝিতে পারিল না—তাহার মা ও দিদিরা তাহার জন্য তাহার অসাক্ষাতে কত কান্নাই কাঁদিয়াছেন, কেহ কাহাকেও সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই। গিরীন যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে আজ তাঁহাদের কি আনন্দের দিনই হইত। সরলা ললিতা ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারে নাই। সে প্রাণপণে নিজেকে শান্ত, সংযত ও হৃষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। চারু, হারু ও উষার সহিত বালকসুলভ চপলতার সহিত খেলা ও অকারণ ছুটাছুটী করিতেছিল। কখন বা আবার তাহাদের কত নিরর্থক গল্প বলিতেছিল এবং তাহারা অতি মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে উল্লাস প্রকাশ করিতেছিল। সময়ে সময়ে সকলের অসাক্ষাতে সে যুক্ত করে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতেছিল, "স্বামিন্, দেবতা! প্রাণে বল দাও, সহায় হও। প্রভু! এ দুঃখিনী তোমার নিকট কোন অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছে? তাহাকে কেন এমন অসহ্য শাস্তি দিলে? পতিই যে নারীর একমাত্র সহায় সম্বল, তাহার দুঃখভার মোচন করিতে একমাত্র স্বামীরই যে অধিকার আছে। প্রভু, আমি জানি তুমি আমাকে ত্যাগ কর নাই. তাই দাসী তোমাকে কাতরে জানাইতেছে, এ অবলার প্রাণে শক্তি দাও, এ শক্তিহীনা নারী তোমার কাছে করুণা প্রার্থনা করিতেছে।"

মা ও দিদিরা ললিতাকে প্রফুল্ল দেখে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন, ভাবিলেন মেয়ে বোধ হয় বিশেষ কাতর হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা ভুল বুঝিলেন, তাহার প্রাণের ক্ষত যে আজ নূতন আঘাত পেয়ে কত গভীর হয়ে গেছে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। একজন মাত্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতী ললিতার সমস্ত কৌশল অজিত বাবুর নিকট ব্যর্থ হইয়াছিল। অজিতবাবু একজন সুকবি। কবিদের প্রাণ অতি কোমল, তাঁহারা নির্জীব জড় পদার্থের মধ্যে যখন সজীবতা দেখতে পান তখন মূর্ত্তিমতী নারীর পূর্ণ প্রাণের ভাব তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি! তাই তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত আজ ললিতার ক্রিয়া কলাপ দেখিতেছিলেন। করুণ রসে তাঁহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল—লোক চক্ষুর অগোচরে দুই একবিন্দু অশ্রু তিনি মুছিয়া ফেলিলেন।

দিবাভাগ বেশ কাটিয়া গেল। রাত্রিতে আহারাদি সব সমাপ্ত হইলে ললিতা মাকে বলিল, "মা, চারু, হারু ও উষা আজ রাত্রিতে মস্ত বড় বড় গল্প বলিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে আমাকে নিমন্ত্রণ করে রেখেছেন। আজ আমি তোমার ঘরে না শুয়ে আমার ঘরে ওদের নিয়ে শোব। তুমি সমস্ত দিন খেটেছ ওদের উপদ্রবে একটু শান্তিতে ঘুমুতে পাবে না,---তাতে তোমার বড় কষ্ট হবে। ছেলেদের ত জ্ঞান রাত দুপুর পর্য্যন্ত ঘুমুবে না সমস্ত রাত হয়ত হৈ চৈ করে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করবে। সেইজন্যই বলচি আজ ওদের নিয়ে আমার ঘরে শুলেই ভাল হয়।"

মা প্রথমে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। পরে কি যেন ভাবিয়া সহজেই সম্মতি দিলেন আর ঐ সঙ্গে ইহাও বলিলেন রায়ের মা তাহার ঘরের দরজার পাশে শুইয়া থাকিবে।

ললিতা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে প্রফুল্ল চিত্তে ছেলেদের লইয়া নিজের ঘরে শুইতে গেল। কথা ছিল সমস্ত রাত্রি ছেলেদের গল্প বলিতে হইবে কিন্তু সমস্ত দিন দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া তাহারা এত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। ললিতা যখন দেখিল ছেলেরা বেশ শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে তখন সে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল এবং নিজের একটি বাক্স হইতে অতি যত্নের সহিত একখানি ছোট ফটো বাহির করিল। সে ফটোখানি একবার মাথায় স্পর্শ করিল ও তারপর অনিমেষ নেত্রে সেখানি দেখিতে লাগিল; দেখিয়া যেন তাহার সাধ মিটিতেছিল না। বারবার সেখানি বুকে ও মাথায় রাখিয়াও যেন সে তৃপ্তি পাইতেছিল না। এইরূপ বিনিদ্রভাবে যে কতক্ষণ কাটিয়াছে তাহা বলা যায় না। রাত্রি প্রায় যখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল তখন ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস তাহাকে শান্ত করিল। ফটোখানি বুকে রাখিয়াই সে ধীরে ধীরে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল

এবং কখন যে নিদ্রাদেবীর কোমল করস্পর্শে সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল তাহা সে জানিতে পারিল না।

প্রভাত অতীত হইয়াছে. ললিতা তখন বোধ হয় স্বর্গীয় এক শান্তিময় স্থানে স্বামীর সহিত বেড়াইতেছিল; সেই নিদ্রিত অবস্থায় মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর সোহাগে লজ্জিত ও কুন্ঠিত মুখখানিতে যেন এক অপূর্ব্ব শ্রী বিরাজ করিতেছিল, ঈষৎ ঘর্ম্ম বিন্দুর চিহ্নও সেই রক্তরাগ রঞ্জিত ললাটে দেখা যাইতেছিল যেন একটি শিশির সিক্ত সদ্য প্রস্ফুটিত বসোরার গোলাপ শোভা পাইতেছিল।

ঊষা অভ্যাস বশতঃ অতি প্রত্যুষেই উঠিয়া গিয়াছিল। অজিতবাবু শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন ঊষা তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি হাস্যমুখে মেয়ের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাসীমার কাছে কাল রাত্রে কেমন গল্প শুনলে ঊষা?" ঊষা আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া বলিল, "বেশ, ভাল গল্প বাবা, তুমি শুনবে?" "মাসীমা এমন কি করছেন?" "তিনি যে এখনও ঘুমুচ্ছেন।" অজিতবাবু স্ত্রীকে বলিলেন, "একবার দেখে এস দেখি তোমার ছোট বোনটির কাল কিভাবে কেটেছে? আমার মনে হয় সমস্ত রাত্রিটা কেঁদে কেটেই শেষ হয়েছে।" "কেন গো, ললিতা তেমন মেয়েই নয়।" "কে বললে?" "কেন আমি বলছি, আমি কি তাকে চিনি না?" "আর আমি যদি সেটা অস্বীকার করি!" লাবণ্য একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "তা তুমি করবে বই কি, কাল সারাদিন আমরা আড়ালে কেঁদে কেটে মরেছি আর ও কেমন শান্ত প্রফুল্লভাবে ছিল—তা সেই—" অজিতবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমরা মনে করছ তোমরাই কেঁদেছ। তোমরা ত কাঁদতেই পার নি। একবার দেখে এস দেখি সে কি রকম কেঁদেছে।" "তোমার যেমন কথা" বলিতে বলিতে লাবণ্য আর বৃথা তর্ক না করিয়া ধীর মন্থরগতিতে ললিতার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল ললিতা তখনও নিদ্রামগ্ন। তাহার মুখের উপর একটা অস্বাভাবিক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ যেন ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার মুখশ্রী আরও লাবণ্যময়ী করিয়াছে। যেন সে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে মগ্ন। লাবণ্য একদৃষ্টে সেই ভাবময়ী মূর্ত্তিখানির প্রতি চাহিয়াছিল। হঠাৎ হারু ঘুমের ঘোরে মাসীমার গায়ের উপর সজোরে পায়ের আঘাত করিল, তাহাতে ললিতা সহসা জাগরিত হইয়া চক্ষু মেলিতেই দেখিল তাহার মেজদিদি করুণ নয়নে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। সে একটু লজ্জিতা হয়ে তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিতেই হঠাৎ তার অজ্ঞাতসারে সেই ছোট ফটোখানি তার বুকের ভেতর থেকে খাটের পাশে পড়িয়া মেঝের উপর সশব্দে পড়িয়া গেল। ললিতার মুখখানি সেই সঙ্গে ভয়ে ও লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল এবং সহসা তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। "একি রে" বলিতে বলিতে লাবণ্য সেখানি তুলিয়া ছোট বোনটির হাতে গুঁজিয়া দিল। সে চকিতে দেখিয়া লইল সেখানি গিরীনের একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ। ললিতার মুখ পাংশু ও বিবর্ণ দেখিয়া লাবণ্য ব্যস্ততার সহিত সে ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিবস যাত্রা করিবার সময় অজিতবাবু শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন তাঁহার একটি ভিক্ষা আছে। যদি মা সেটি দেন তাহা হইলে সে প্রার্থনা করে। মা চারুকে দিয়া জানাইলেন, "বাবা তোমাদের না দিবার মত জিনিষ আমার কি আছে? কি চাই বল!" অজিতবাবু সলজ্জ ভাবে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "সে আমি অনেকদিন থেকেই জানি। আজ আমার প্রার্থনা শুনে বোধ হয় খুব দুঃখ পাবেন আর এ কথাও বলি আনন্দও নিশ্চয় একটু পাবেন। আমি বলছিলাম আগামী বৎসর থেকে আর আমাদের জামাই ষষ্ঠীতে নিমন্ত্রণ করবেন না। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আর জামাইষষ্ঠীর সময় আসতে পারব না। বড় সুখী হতাম যদি গিরীন বেঁচে থাকত, যখন সে চলে গেল তখন আর এ দিনে আমাদের আনবেন না। ললিতা এতে বড় কষ্ট পাবে।"

মা বলিলেন, "বাবা, তোমরা গিরীনকে ফিরিয়ে আন, ডেকে আন; যদি তা না পার তাহ'লে আমি আর কি বলব—" বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অজিত বাবু ধীরে ধীরে বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন একটি পথিক গাহিতেছিল—

যদি দাও তবে নাও কেন প্রভু
তোমার লীলা বুঝা ভার—

নারী জাগরণ

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

নারীর স্বাধীনতায় নারীর অধিকার লইয়া এ পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা হইতেছে। কেহ বা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া দেশের নারীকে সংযত থাকিবার উপদেশ দিতেছেন, কেহ বা শাস্ত্রলঙ্ঘন করিয়া সোজাপথে চলিবার ব্যবস্থা দিতেছেন এই দুইটী পথ নারীর সম্মুখে পড়িয়া আছে, ইহার মধ্যে কোনটী যে সে যথার্থ পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে তাহা ঠিক বলা যায় না। সম্ভব সোজা পথেই চলিবে, সেইরূপ ভাবে বুঝা যায়।

আমরা মধ্যপন্থীর দল, অনেকেই এই দলে আছেন, যাঁহারা ব্যাপারটা দেখিতেছেন, দুই দিককার কথাই শুনিয়া যাইতেছেন অথচ এমনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না কোন পথ ভাল। নারীদের মধ্যে যে সনাতন প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহাই নারীর পক্ষে ভাল না এই নবযুগের নব প্রথা নারীর পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে।

শাস্ত্রকারদিগকে অনেক নারী মানিতে চাহিতেছেন না শাস্ত্রকে ইঁহারা বৃথা বলিয়া তর্কও করিতে রাজি আছেন। কেন না শাস্ত্র পুরুষদের দ্বারা রচিত এবং ইহাতে এই শাস্ত্রকারগণ পক্ষপাতিত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। এ দেশের নারীরা পুরুষদের নিকট যে কিরূপ নির্য্যাতিতা হয় তাহা আজ এই তরুণ আলোকে সকলেরই চোখে পড়িয়াছে। নারীদের এই দিকটা—অর্থাৎ এই অত্যাচারজনিত বেদনাটা যাঁহারা হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই আজ নারীর অধিকার নারীর স্বাধীনতায় উর্দ্ধকণ্ঠে সমর্থন করিতেছেন।

ইঁহারা স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়তো এককালে ছিল কিন্তু আজকাল নাই। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম এ দেশের পুরুষ কয়টী মানিয়া চলিতেছেন আগে তাহাই দেখা হোক। নারীকে শাসনে রাখিবার জন্য শাস্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত করিলেই চলিবে না, কেন না শাস্ত্র একমাত্র নারীজাতির জন্যই সৃজিত হয় নাই, পুরুষের জন্যও হইয়াছে বটে। শাস্ত্র পুরুষদেরও বাঁধা-ধরা নিয়মে চলিতে ফিরিতে সংযত হইতে উপদেশ দিয়াছেন নারীর প্রতি পুরুষের যে কর্ত্তব্য তাহা পালন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু পুরুষ সে অনুশাসন কয়টী মানিয়া চলিতেছে? আহারে, বিহারে, শয়নে স্বপনে সব বিষয়েই তাহারা শিষ্টাচার দেখাইয়া আসিতেছে, নিজেদের মতটাই অকুণ্ঠিতভাবে শাস্ত্রের উক্তি বলিয়া প্রচার করিতে ভয় পায় না, কেন না ইহার প্রতিবাদ করিবে কে? মেয়েরা শক্তিহীনা, সংসারের কাজে নিবিষ্টচিত্তা, এক কথা যে ইহার মধ্যে তাহাদের বই পড়িবার অবকাশই কম, ইহার উপর যদিও কেহ পড়িতে চায় তবে পড়িতে পারে খুব সামান্যই কেন না নারীকর্ত্তব্য মালাই বেশীর ভাগ তাহাদের পড়িতে দেওয়া হয়। ইহাতে তাহারা জানিতে পারে তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে, ইহাপেক্ষা বেশী জানার আবশ্যক নাই।

নারীদের কাজ আগাগোড়া শাস্ত্রসম্মত, তাহার একটু এদিক ওদিক হইলেই পুরুষ চীৎকার করিয়া উঠিবেন,—সব গেল, ধর্ম্ম আর রহিল না।

দেশের নারীদের দুরবস্থার কথাতো গোপনে নাই। কয়জন স্বামী আছেন যিনি প্রকৃত শাস্ত্রোক্তমতে নিজের কাজ যথাযথ ভাবে পালন করিয়া যাইতেছেন সত্যই সকল নারীকে দেবীর মত চোখে দেখিয়া তেমনি ব্যবহার করিতেছেন? নারী দেবী এ ধারণা যে দেশের পুরুষের একদিন ছিল তাহা অস্বীকার করিতেছি না। একদিন পুরুষের মধ্যে যখন যথার্থ ধর্ম্মভাব ছিল তখন নারীকে রক্ষা করিতে বক্ষস্ফীত করিয়া দাঁড়াইত। শাস্ত্রানুসারে চালিত পুরুষ শাস্ত্রবিগর্হিত কাজ দেখিলে বিচার করিয়া তাহার যথাযথ দণ্ড দিত। দেশের একটী নারীকে কেহ অপমান করিলে সকলে দাঁড়াইত, যতক্ষণ না নারী-অবমাননাকারীকে শাস্তি দেওয়া না হইত কেহই শান্তি পাইত না। সেদিন এমন ছিল পথে একা নারীকে দেখিয়া চরিত্রবান পুরুষ তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া সসম্ভ্রমে গন্তব্যস্থানে পৌছাইয়া দিয়াছে, কিন্তু আজ

সেদিন কোথায় ? নারীকে একা পথে দেখিয়া আজ এই দেশের সেই পুরুষই ব্যঙ্গ করিতে ছাড়ে না, এ দৃশ্য নিত্য দেখিয়া এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

পুরুষের অত্যাচারের ফলেই নারী আজ বিদ্রোহিনী হইয়া উঠিয়াছে এ কথা বলা অশোভন বোধ হয় নয়। একদিন এই পুরুষেরাই নিজেরা অত্যাচারিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—অত্যাচারে রাজ্য থাকে না কখন, সেই কথা আজ মনে করিয়া যদি দেখেন তাহা হইলেই ভাল হয়। যে সিংহাসন হৃদয়ের বেদনার উপর স্থাপিত, চক্ষুজল ও দীর্ঘশ্বাস যাহা নিয়ত কাঁপাইতেছে তাহা কোন দিন না কোনদিন ভাঙ্গিয়া পড়িবেই, এ যে জানিত সত্য কথা। পুরুষের সংসার রাজ্য তাই আজ কাঁপিয়া উঠিয়াছে, এই বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছে।

সহ্যের সীমা তো সকলেরই আছে। সামান্য জীব যাহারা —যাহাদের কিছুমাত্র বোধশক্তি নাই, অত্যাচারে তাহারাও অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, তাহারও বোধশক্তি জন্মে, সেও তখন অধীনতার নাগপাশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নিজেকে মুক্ত, স্বাধীন করিতে চায়। নারীরাজ্যে যুগান্তর আসিয়াছে, কারণ সহ্যশক্তির আজ হার হইয়া গিয়াছে, মূকের মুখে তাই ভাষা ফুটিয়াছে। নারীর নীরব বুকের ব্যথা মূর্ত্ত হইয়া ভগবানের চরণ-প্রান্তে গিয়া পৌছিয়াছে। আজিকার এই শক্তি যে ভগবানেরই প্রেরিত তাহা কি আজ অস্বীকার করিতে পারা যায় ?

নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার যাঁহারা পক্ষপাতিত্ব দোষে এখনও দেখিতে পান নাই তাঁহারা এখনও যুদ্ধোন্মত মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন, নারীর যাহা কিছু সবই মিথ্যা ও শাস্ত্রবিগর্হিত বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। তাঁহারা বুঝিতেছেন না তাঁহাদের এ যুক্তি এখন মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে, এযুগে এ মিথ্যা আর চলিবে না, যথার্থ সত্যকে আর ভস্ম দিয়া ঢাকিয়া রাখা যাইবে না, এ অগ্নি ভস্মকেও দীপ্ত করিয়া তুলিবে।

বাহির হইতে কাহারও সংসারের দৃশ্য দেখিয়া জানিতে পারা যায় না ইহার ভিতরে কি আছে। যদি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় নারী ও নরের সত্যরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

নারীকে রাণী নামে অভিহিত করা হয়, কিন্তু রাণী কি যথার্থই সে ? পুরুষ থাকে একথা সত্য নারীর উপর সংসারের সব ভার ছাড়িয়া দিয়া সে শুধু দুইবেলা দুইটা খায় একথা একেবারেই মিথ্যা। রাণীর অধিকার কতটুকু, তাহাই আগে দেখা যাক তারপরে অন্যকথা। এই যে তাহার শাসনাধীন রাজ্যটী ইহার মধ্যে অনেকরূপ শাসন প্রণালী আছে, যে শাসনে তাহাকেই আগে মাথা নত করিয়া সর্ব্বদা ত্রস্তভাবে থাকিতে হয়। অনেক সংসারের ভিতর গিয়াছি, অনেকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া দেখিয়াছি, সংসারে নারীর কতটা ক্ষমতা, কতটা অধিকার! নিজের মনের সত্যকথা যাহার মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই, সে সংসারের সাম্রাজ্ঞী ; স্বামীর অসভ্য আচরণে যাহার বুক ফাটিয়া গেলেও ভ্রম সংশোধনের জন্য সত্য দেখাইয়া দিতে গেলে শুধু পীড়নই সহ্য করিতে হয় সেই সংসারের শাসনকর্ত্রী একথা বলতে পারা যায় না। পুরুষ যেখানে মিথ্যাকে বজায় রাখিয়া চলিয়াছে নারী সেখানে সত্যকে জাগাইতে সমর্থ হইয়াছে কি ? জানিয়া শুনিয়া একমাত্র দেবতার সম্মান রাখিতে,—নিজেকে নির্য্যাতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে তাহাকে মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দিতে হয় নাকি ? অনেক পুরুষকে বলিতে শুনিয়াছি মেয়েদের কোন কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে নাই, কারণ উঁহারা মেয়ে মাত্র। বার হাত কাপড়ে যাহাদের কুলায় না তাহারা আবার পুরুষের উপর কথা কহিতে আসে। স্ত্রীলোক বরাবর যেমন থাকে তেমনি থাকিবে, কাজকর্ম্ম করিবে, ছেলেমেয়ে মানুষ করিবে, স্বামী সেবা করিবে ; ব্যাস, তাহার কাজ শেষ হইয়া গেল। পুরুষ যাহা বলিবে তাহাকে তাহাই শুনিতে হইবে, তাহার উপর কথা বলিলে তাহা শাস্ত্রবিগর্হিত, তাহা স্বেচ্ছাচারিতা।

এ অত্যাচার আজ নূতন নয়। বিশেষ ভাবে খোঁজ করিলে অনেক নারীকে দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের পৃষ্ঠ স্বামীর হস্তের সহিত বিশেষ পরিচিত। এই নারীই মা, এই নারীই দেবী, সেটা সংসার প্রতিপালন ক্ষেত্রে সকল পুরুষ কি ভাবে প্রতিপালন করেন তাহা নারীর দৈনন্দিন জীবনী পাঠ করিলেই জানা যায়। পুরুষ যে শাস্ত্রোক্ত মত কিভাবে পালন করিয়া যাইতেছেন তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

অবশ্য সকল পুরুষই যে নারীর সম্মান রক্ষা এভাবে করিয়া থাকেন তাহা বলিতে পারি না। এমন লোকও আছেন যাঁহারা দৈনন্দিন জীবনী পাঠ করিয়াছেন, নারীর প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। কিন্তু এরূপ পুরুষের সংখ্যা কয়টী ? কয়টী নারী এরূপ স্বামীলাভে সৌভাগ্যবতী ? লক্ষ লক্ষ নারী-উৎপীড়িতা যথার্থ সৌভাগ্যবতী তাহাদের মধ্যে দুই একটী মাত্র। যদি নারীর প্রকৃত পরিচয় পাইতে হয় তবে তাহার সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিলে দেখিতে পাওয়া যায় কতদূর শাসনের মধ্যে সে বাস করে অথচ সত্যই সে গৃহের কর্ত্রী, সে সংসারের রাণীরূপে পরিচিতা। একটা পুতুলকে যেমন সাজাইয়া রাখা হয় না ?

পুরুষ যাহা খুসি তাহাই বলিয়া যাক, দুই পা দিয়া নারীর হৃদয় দলিত পেষিত করিয়া যাক্, নারী—নারী বলিয়াই তাহা সহ্য করিবে, সকল লাঞ্ছনা, দেবতার দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইবে। শাস্ত্র বলিয়াছে নারীর প্রত্যক্ষ দেবতা স্বামী ; দেবতা যতই নিষ্ঠুর হোক, ভক্তের উচিত তাহাকে একনিষ্ঠভাবে পুজা করিয়া যাওয়া, সত্যই এ দেশের নারী এখনও সে বাণী প্রাণপণে পালন করিয়া যাইতেছে, আজও অত্যাচারী ব্যভিচারী স্বামীর একনিষ্ঠ দেখা যায়। আজও এ দেশে দেখা যায় স্বামী স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিলেও স্ত্রী কর্ত্তব্যের জন্য ভালবাসার জন্য নিজের গায়ের ব্যথা বিস্মৃত হইয়া সাগ্রহে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "তোমার হাতে লাগে নি তো ?"

সে জিজ্ঞাসা করুক, সে ভালবাসায় আত্মবিস্মৃতা হোক, সে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাক, মূলে সেই কথাই রহিয়াছে—অত্যাচারে রাজ্য থাকে না কখন। এই যে সতীর চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস, এ গুলি কি ব্যর্থ হইবার ? একজন সহ্য করিতেছে জীবন ভোর, সকলেই সহ্য করিতে পারে না। একদিন সহ্য করিল, দশদিন সহ্য করিল, জীবনভোর হয়তো সহ্য করিতে পারে না ; গর্ত্তের সাপ খোঁচাইতে খোঁচাইতে হঠাৎ একদিন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, একথা সকলেই জানে। প্রথমটায় সে প্রাণপণে লুকাইবারই তো চেষ্টা করে, কোন মতে প্রকাশ হইতে চায় না। সে স্বামীকে ভালবাসে, ভক্তি করে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে যদি সে ক্রমান্বয়ে শুধু আঘাতই পায়, সেবা করিতে গিয়া পদাঘাতই পায়, তাহার সেই ভক্তি ভালবাসা ক্রমে ঘৃণাতেই পরিণত হইয়া যায় না কি ? ভগবান সব জিনিষেরই একটা সীমা বাঁধিয়া দিয়াছেন। মানুষের জীবনটাই সীমার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, প্রেম ভালবাসাও তেমনি সীমাবদ্ধ ; ক্বচিৎ কখনও অসীম হইলেও সকলের যে হয় না ইহা সত্য কথা।

শাস্ত্র ইহা মানিতে চাহিবে না। শাস্ত্র বলিবে স্বামী যাহাই হোক, যদি আজীবন কাল পদাঘাতও সহ্য করিতে হয় তথাপি স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভালবাসিতে হইবে, ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হইবে। কিন্তু যুগের এই আবর্ত্তনের দিনে সেই অতীতনীতি নারী আর মানিতে রাজী নহেন, তাই নারী আজ স্পষ্টতঃই শাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভাবিতে গেলে ইহাকে—এই আন্দোলনকে ঠিক বলিয়াই মনে। এত অত্যাচার, এত নির্য্যাতন সহিয়াও নারী সেই নির্য্যাতনকারী পুরুষকে দেবতা বলিয়া ভাবিবে, পূজা করিবে, ভক্তি করিবে, শাস্ত্র নারীর দিক দিয়া অত্যন্ত কঠোর বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে, তাই শাস্ত্রের অনুশাসন এড়াইবার জন্য নারীর আজ অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাই নারী নিজেকে আজ দুর্ব্বলা না ভাবিয়া সবলা ভাবিতেছে! নারী আজ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে যদি তাই হয়,—অর্থাৎ শাস্ত্রকে যদি সত্য বলিয়াই মানিতে হয় তবে একা নারীই বা মানিবে কেন, পুরুষ কেন মানিবে না ? শাস্ত্র নর-নারী উভয়েরই জন্য সৃষ্ট তবে একজন কেন শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিবে আর একজন কেন একনিষ্ঠার সহিত সে নিয়ম পালন করিয়া যাইবে ? লক্ষ লক্ষ নারী যে নিজেদের ব্যথা বুকের মধ্যে গোপন রাখিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য কাজ প্রাণপণে করিয়া যাইতেছেন, কয়জন পুরুষ সেরূপ নিষ্ঠার সহিত নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন ? নারীর হৃদয় অন্বেষণ কর সেখানে মৃত্যু বাসনা বিরাজ করিতেছে, দুর্ব্বিসহ যাতনা সহিয়া বাঁচার প্রার্থনা করে না।

বড় দুঃখেই নারী আজ নিজেদের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, পুরুষের অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বড় কষ্টেই নারী আজ শাস্ত্রকে তুচ্ছজ্ঞানে উড়াইয়া দিতে চান কারণ এই শাস্ত্র পুরুষদেরই স্বকপোল কল্পিত। যে যাহা করে তাহা নিজের স্বার্থ বাঁচাইয়াই করে,

এই শাস্ত্রও তাই পুরুষের পক্ষাবলম্বী। শাস্ত্র নারীকে যে হীন বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছে, নারীর চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছে, তাহাতে নারীর ক্ষুব্ধ হইবারই কথা। নারীকে যেভাবে দমনে রাখার কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তাহাদের পিশাচী দানবীই বুঝাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে তাহাকে দেবী নামে উল্লেখ করার অর্থ বোধ হয় একটু সন্তুষ্ট রাখা, যেহেতু সংসারে এ দেবী না থাকিলে সংসার যে অচল হইয়া যায়।

পুরুষ নারীর রক্ষার ভার লইয়াছে কারণ নারী মুক্তা—স্বাধীনা হইলেই নাকি সে উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া পড়ে, স্বেচ্ছাচারিতা আসে কাজেই ইহাতে ব্যভিচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অতএব তাহার মাথায় নিয়ত কাজের বোঝা চাপাইয়া রাখা চাই, সে যেন হাঁফ ছাড়িবারও অবকাশ না পায়। ইহার উপরও পাছে সে এতটুকু ফাঁক পাইয়া বাহিরের চিন্তা করিতে যায় তাই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া—ইহা করিতে নাই, উহা করিতে নাই ইত্যাদি।

এই নারী রক্ষার ভার যাহারা লইয়াছে তাহারা রক্ষায় কতদূর তৎপর তাহা দেখাই যাইতেছে, তাই নিত্য নারীর উপর অত্যাচারের কথা আমাদের কাণে আসিতেছে। এই যে - ইহা করিতে নাই, উহা করিতে নাই, এই অতিরিক্ত শাসনের ফলে নারী আজ অতিরিক্ত দুর্ব্বলা! কাহারও সাহায্য ব্যতীত সে এক পা হাঁটিতে পারে না; অভিভাবক একটু এদিক ওদিক হইলে পথ চিনিয়া বাড়ী যাইবার সাহস তাহার নাই। সম্মুখে লোক দেখিয়া সে দেড়হাত অবগুণ্ঠন টানিয়া অতিরিক্ত লজ্জায় একেবারে জড়সড় হইয়া পড়ে, কেহ হাতখানা চাপিয়া ধরিলেও লজ্জায় চীৎকার করিতে পারে না, আত্মরক্ষার জন্ম বল প্রকাশ বা পলায়ন করা তো দূরের কথা। নারীর শারীরিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি হইয়াছে শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলার ফলে এই-ই মাত্র।

এই লজ্জায় কাতরা দুর্ব্বলা অবলা নারীর উপর অত্যাচার করা পুরুষের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ নহে। রক্ষক যাঁহারা—অথচ কার্য্যকালে রক্ষার চেষ্টা দূরে থাক, তাড়াতাড়ি পলাইয়া নিজেদের পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচাইবার চেষ্টা করেন,—ইহার পরে তাঁহারাই অত্যাচারিতা নারীর বিচারের ভার গ্রহণ করেন। শাস্ত্রের অনুশাসনে—সে মনে প্রাণে স্বামীর স্ত্রী হইলেও পরপুরুষে স্পর্শ করার অপরাধে সে পতিতা, কাজেই আচারে সমাজ হইতে তাড়িতা হয়। এই দুঃসময়ে—নারী যাহাকে সেবা করিয়াছে, ভক্তি করিয়াছে, মনে প্রাণে ভালবাসিয়াছে, সে পর্যান্ত মুখ তুলিয়া চায় না। এ যে রক্তমাংসে গঠিত দেবতা, ভক্তি লইবে, প্রেম লইবে, ভালবাসা লইবে, শাসন করিবে, বিচার করিবে ও দণ্ড দিবে। কিন্তু পুরুষ যে কত সহস্র অপরাধ করিতেছে, শাস্ত্র তখন নির্ব্বাক হইয়া যায়?

সমাজ পরিত্যক্তা নারী যায় কোথায়, এই শাস্ত্র অনুশাসিত সমাজের মধ্যে কোথাও তাহার স্থান নাই। বাধ্য হইয়া কেহ মরে, কেহ বা খৃষ্টান বা মুসলমান হইয়া যায়, আবার কেহ বা পতিতা শ্রেণীর মধ্যে স্থান করিয়া লয়।

নারী এতকাল নীরবেই সব সহিতেছিল, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সহেরও একটা সীমা আছে, তাই আজ নারী দাঁড়াইয়াছে। কেঁচো খুঁড়িতে তাই আজ সাপ উঠিয়া পড়িয়াছে, দেশের নারীর তাই অত দুর্দ্দশা, তাহাকে দমন করিতে পারা তাই আজ পুরুষের দুঃসাধ্য। নারী সমাজ দেখিতেছে, শাস্ত্র দেখিতেছে ধর্ম্ম দেখিতেছে সবই তাহার বিপক্ষে, নরের স্বপক্ষে। নারী তাই চায় আজ তাহাকে মুক্তি দেওয়া হোক, সে নিজের কাজ নিজেই করিবে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবে, কাহারও মুখাপেক্ষী হইবে না।

অসীম শক্তিশালিনী নারী, তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে তাই সে বদ্ধ হইয়া আছে। তাহার শক্তি আছে, সামর্থ আছে, পুরুষের চেয়ে সে কোন অংশেই ন্যূন নহে তবে কেন সে নীরবে এত অত্যাচার সহিবে।

পুরুষের গঠিত সংসারে তাহার শাসনাধীনা নারীকে রাণী দেবী বলিলেই ঠিক বলা হইল না, উহার মধ্যে অনেকখানি খাদ মিশানো রহিয়াছে। রাণীর ক্ষমতা যথেষ্ট দেবীর ক্ষমতা অনেক, নারীর কি ক্ষমতা আছে? পান হইতে চুন খসিলে যাহার নিস্তার নাই, তরকারী বিস্বাদ হইলে ভাতের থালা যাহার পৃষ্ঠে গিয়া পড়ে তাহাকে রাণী বলা—দেবী বলা পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই নয় বলিয়াই মনে হয়।

নারী আজ আপনার বক্ষে স্পন্দন অনুভব করিয়াছে, নারীর উপর অবাধ অত্যাচার ও পুরুষের শাস্ত্রসঙ্গত শাসন তাহার বুকে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। এই নারীশক্তি যুগে যুগে অন্যায়ের বিরুদ্ধে—মিথ্যার বিরুদ্ধে জাগিয়াছে, ন্যায়কে জাগাইয়া দিয়াছে, সত্যকে চেতাইয়া তুলিয়াছে। আজও নারীর জাগরণের দিন, নারী উঠিতেছে, চোখ মেলিতেছে—এ সংঘর্ষের ফলে ভবিষ্যতে কি হইবে কে জানে।

ব্যথার প্রলাপ

[শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী]

এস শান্তি ! এস হেথা হৃদয়ে আমার,
মুছে দাও, ঘুচে যাক, অশান্তি আঁধার।
আশা ছোট বোনটীরে লয়ে এসো সাথী করে
নিরাশাকে দূর কর তাহারে রেখো না,
সে যে সব শান্তিহ'রে দেয় গো বেদনা।
যেদিকেতে মন ধায় ক্রিয়াহীন-নিরাশায়
অশান্তি তমসাবৃত ক্ষুদ্র জীবন,
এসো শান্তি ! এসে মম জুড়াও বেদন ॥
সুখের উজ্জ্বল ছবি, ফুটাইয়া তোল দেবী
দুঃখের কল্পনা আর দেখায়ো না মোরে।
এ জীবন ভার শুধু বহিতে না পারে ॥

সুশীতল শান্তিভরা নিরাশা অশান্তি হরা
সুন্দর রূপেতে তব হৃদয় ভাতিয়া
এস দেবী একবার দাঁড়াও আসিয়া ॥
মধুমাখা মৃদু হাসি, লয়ে মম হৃদে আসি
বেদনা মুছায়ে দাও শীতল পরশে—
একবার এ হৃদয়ে এসে ভালোবেসে।
অন্তরের হাহাকার, পারি না সহিতে আর
দিয়ে শান্তি নির্নিমেষ পূর্ণ কর চিদাকাশে
জাগাও নূতন প্রাণ নব ভাবাবেশে।

বুকের জ্বালা

(গল্প)

[শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

তোমাদের মনে ধরে—বিশ্বাস করিও; না ধরে—করিও না। আমাকে কিন্তু সে কথা বলিতেই হইবে! না বলিয়া থাকি কেমন করিয়া? তোমরা না হয় বিশ্বাস না-ই করিলে, কিন্তু সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য যে এখনো আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে! সে করুণ শব্দ যে এখনো আমার কাণে ধ্বনিত হইতেছে!—আমি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিব কিরূপে? সে অতৃপ্ত অশরীরী আত্মার করুণ অনুরোধ বাণী এখনো যেন আমার পায়ের তলায় লুটাইয়া মরিতেছে—"শোন, ওগো শোন—আমার এ বিষম জ্বালার কাহিনী শুনিয়া যাও,—জানি আমি, তোমরা আমার দুঃখে একবিন্দুও অশ্রু ফেলবে না,—জানি আমি, আমার বুকের জ্বালা তোমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিবে না—আমার জ্বালা আমিই সহ্য করিব—আমিই জ্বলিয়া মরিব—আমিই ছটফট করিয়া বেড়াইব—তাহাতে তোমাদের কি?—কিন্তু তবু—ওগো, তবু শোন—যদি একটুও তৃপ্তি পাই—তাতে একটুও শান্তি পাই?" না বলিয়া যখন থাকিতে পারিবই না তখন গোড়া হইতেই বলি।

ঐ "হেডমাষ্টারী" পদটা পাইলেও হইত, আর না পাইলেও হইত। অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় দরখাস্ত একখানা ছুড়িয়াছিলাম—যদি লাগে ত' লাগুক। এমন যে লাগিয়াই যাইবে তা জানিতাম না। ডাক্তার সাহেব বলিলেন—"চেঞ্জে যাও, স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে।" বন্ধুরা বলিলেন—"অতবড় এম-এ ডিগ্রিটা পাইয়াছ, তার বদলে না হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দক্ষিণা স্বরূপ তোমার স্বাস্থ্যটুকুও দিয়া আসিয়াছ—এ আর বেশী কথা কি?"

শুনিয়াছিলাম, বিষ্ণুপুরের জল বায়ুটা না-কি ভাল। তাই ঐখানেই যাওয়া ঠিক করিয়াছিলাম। কাল বাড়ী হইতে রওনা হইব, সব 'ঠিক্' হইয়া গিয়াছে—আর হাতে কোন কাজ না থাকায় আজ সেই যাওয়ার কথাই ভাবিতেছি—কখন সেখানে পৌঁছিব—কোথায় যাইয়া উঠিব ইত্যাদি—এমন সময় সেদিনকার "বেঙ্গলী"খানি হাতে করিয়া লইয়া গিয়া স্ত্রী আমার বলিলেন—"ওগো দেখ, বিষ্ণুপুরের ইংরেজি ইস্কুলে একজন হেডমাষ্টারের দরকার হয়েছে—তা তুমি একখানা 'দরখাস্ত' করে দেখ না। সেই ত তোমায় যেতেই হবে—এক ঢিলে যদি দুটো পাখী মারা যায় ক্ষতি কি?"

আমি বলিলাম—"তথাস্তু।"

(২)

আগে থেকে চিঠি দেওয়া হইয়াছিল। ট্রেণ হইতে নামিয়াই দেখি, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন ছেলে আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে। কতক ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়াছে, কতক সাইকেলে আসিয়াছে, আর কতক বা তত রোদে হাঁটিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। নামিবামাত্রই তাহারা সকলে আমাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। ষ্টেশন হইতে ইস্কুল প্রায় এক ক্রোশ। একটী ছেলে বলিল—"মাষ্টার মশাই, আমাদের গাড়ীতে চড়ুন"—আর একজন বলিল—"না সার, ঘোড়ার গাড়ীতে অনেক দেরী হবে, আপনি আমার সাইকেলে চলুন।" আমি আস্তে আস্তে সাইকেলটীতেই উঠিয়া বসিলাম। ছেলেটীও পিছনে চড়িল। সাইকেল ছুটিল। আরো যার যার সাইকেল ছিল তাহারা সকলেই আমার সঙ্গে সঙ্গে 'সাইকেল' ছুটাইল। যারা ঘোড়ার গাড়ীতে ছিল তারাও গাড়ী ছুটাইল। ছেলেটীর নাম নরেন্দ্র। অতটা পথ চুপ করিয়া যাওয়া তো আর ভাল দেখায় না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানকার জল

বায়ু কেমন, নরেন" জানিতাম সবই, তবু জিজ্ঞাসা করিলাম। নরেন বলিল,—"কিছুদিন আগে খুব ভালই ছিল, তবে কোতুলপুরের 'কাছারীটা' এখানে উঠে আসা অবধি লোকও বেড়েছে আর রোগও বেড়েছে তবু অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানকার লোকের স্বাস্থ্য অনেক ভাল।

আমি—ইংরেজী ইস্কুলটা সহরের কোন্‌খানে ?

নরেন—সহরের বাইরে জঙ্গলের পাশে, 'লাল বাঁধের' ধারে।

আ—'লালবাঁধ' কাকে বলে ?

ন—জানেন না ? একটা মস্ত বাঁধের নাম লালবাঁধ। এরকম বড় বাঁধ প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। মুসলমানেরা তখন দিল্লীতে রাজত্ব করত আর বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা তখন স্বাধীনভাবে চলত। সেই সময়ে এই বিষ্ণুপুরের কোন্ এক মল্ল রাজা "লালবিবি" নামে একজন মুসলমান রমণীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে তা'কে বিষ্ণুপুরে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তারই একটা চিরস্থায়ী স্মৃতি রাখবার জন্যে তিনি একটা প্রকাণ্ড বাঁধ খনন করান। 'লালবিবি'র নামানুসারে বাঁধটার নাম হয় 'লালবাঁধ।' সেই লালবাঁধ ঐ—এখনো রয়েছে। লালবাঁধের জল খুব ভাল। ওখানে কাউকে নেবে স্নান করতে দেওয়া হয় না। ও জল কেবলমাত্র খাবার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। লোকে কলসী এনে তুলে নিয়ে যায়।

আ—লালবাঁধটা কত বড় ?

ন—মস্ত বড়—একপাড় থেকে আর এক পাড়ে দৃষ্টি চলে না। কেও কখনও সাঁতারে ওটার 'এপার ওপার' করতে পারে নি।

আ—লালবাঁধের চারদিকে কি কেবলই জঙ্গল, না কারও বাড়ী টাড়ী আছে ?

ন—উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ এই তিনদিকে জঙ্গল, আর পশ্চিম দিকে "মৃণ্ময়ী" ঠাকুরের মন্দির আছে। মন্দিরে 'মৃণ্ময়ী' দেবীর পূজারী রামরূপ ঠাকুর থাকেন। বিকেল বেলায় আমরা লালবাঁধের ধারে বেড়াতে যাই—বেশ বাতাস দেয়। জলের ঢেউগুলিও দেখতে বেশ।"

আ—লালবাঁধের ধারে ঐ মৃণ্ময়ী মন্দিরের পাশে আমার থাকবার একটা বাসা করে দিতে পার ?

ন—কেন পারব না ? মন্দিরের পাশেই একটা ছোট্ট বাড়ী আছে—সেখানে আপনি 'ভাড়া' দিলে থাকতে পাবেন।

আ—আচ্ছা, বিষ্ণুপুরে দেখবার জিনিষ কি কি আছে ?

ন—অনেক দেখবার জিনিষ আছে। এক মন্দিরই প্রায় তিন চারশ' আছে—তাই দেখতেই আপনার একমাস কেটে যাবে। এখনো লোকে বলে, মল্ল রাজাদের আমলে বিষ্ণুপুরের সমস্ত মন্দিরে দিন সাতশ' ষাট মণ তেল পুড়ত ! তা' ছাড়া 'দল-মাদল,' 'লালগড়,' ইত্যাদি আরো অনেক দেখবার আছে।

আ—একদিন বিকেলে আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যেও—বুঝলে ?

ন—হাঁ।

আ—ঐ যে 'লালবাঁধের' 'লালবিবির' কথা বল্লে—শেষ পর্য্যন্ত তার কি হ'ল বলতে পার ?

ন—আপনি কি কিছুই জানেন না ?—রাজা লালবিবিকে খুব ভালবাসতে লাগলেন। ক্রমে রাজকার্য্যে তাঁর শৈথিল্য প্রকাশ হ'তে লাগলো। রাজ্যের যত সব হিন্দু প্রজা লালবিবি আর রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। তারপর রাজার এক ভাই ঐ সমস্ত বিদ্রোহী প্রজাদের সাহায্য নিয়ে রাজাকে হত্যা করলেন, আর লালবিবির বুকে ছুরি মেরে জীবন্ত থাকতে থাকতেই তাকে মাটীর নীচে পুঁতে ফেল্লেন। এই যে, আমরা ইস্কুলের কাছে এসে পড়েছি—"নেমে পড়ুন"—এই বলিয়া নরেন্দ্র লাফাইয়া পিছন হইতে নামিয়া পড়িল।

(৩)

ছোট বাড়ীটি। আশে-পাশে কেবলই সবুজ রংয়ের গাছপালা। কোথাও একটুও গোল নাই। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যটীও ভারী চমৎকার। বাড়ী হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়, লালবাঁধের অসংখ্য অসংখ্য ঢেউ কেমন উঠিতেছে, পড়িতেছে, ছুটিতেছে।—একটীর পর একটী, একটীর পর একটী এমনি করিয়া কত তরঙ্গ কেমন ছুটিয়া চলিয়াছে !

লালবাঁধের নির্ম্মল বাতাসে এই কয়দিনের মধ্যেই শরীর কেমন সারিয়া উঠিয়াছে।

কোথা হইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভাসিয়া আসিয়া যখন মন্দিরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিল তখন আমি চাহিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে ছাইয়া গেছে!

ক্লান্ত তপন কখন যে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে, পা টিপিয়া টিপিয়া কখন যে সন্ধ্যা আসিয়া পড়িয়াছে, শশাঙ্ক কখন সে দিক্ চক্রবালে হাসিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমি মোটেই বুঝিতে পারি নাই!

নরেন্দ্রের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসিয়া থাকা সত্ত্বেও যখন আসিল না, তখন আমি একাই বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাবিলাম, নরেন্দ্রের সঙ্গে ত কতদিন বেড়াইয়াছি, আজ কি আর একাই একটু ঘুরিয়া আসিতে পারিব না? সাহসে ভর করিয়া ছড়িটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

কতদূর যে চলিয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলাম, সম্মুখে একটা মন্দির আর তারপর কেবলই গাছপালার জঙ্গল। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, মৃণ্ময়ী ততবড় মন্দিরের চূড়াটী মাত্র সূর্য্যের শেষ সুবর্ণ-রশ্মিতে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

তখনই বাসায় ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল কিন্তু কি জানি কেন সামনের সেই মন্দিরের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িলাম। মন্দিরের ভিতরের 'সিঁড়ি' দিয়া উপরের চূড়ায় উঠিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম—সেখানে তিন চারিটা চেয়ার সাজানো রহিয়াছে! এই নির্জ্জন লালবাঁধের ধারে, শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য মধ্যে, মন্দিরের এত উচ্চ চূড়ার উপর কে যে কোথা হইতে কিরূপে এতগুলি চেয়ার আনিয়া রাখিল তাহা ত কোন ক্রমেই ভাবিয়া পাইলাম না। বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থায় ছড়িটা পাশে রাখিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিতেই চোখে পড়িয়া গেল, লালবাঁধের বিশাল বারিরাশি যেন রুদ্ধ আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে! এমনভাবে কতক্ষণ জলের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলাম কে জানে কিন্তু কোথা হইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ—একটা শব্দ মাত্র—বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া কাণে লাগিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখি, সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধরার বক্ষে নামিয়া আসিয়াছে। এই সন্ধ্যাকালে এ মানব-বিহীন স্থানে মনুষ্য-কণ্ঠের ধ্বনি কোথা হইতে আসে? ভয়ে বিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে চাহিলাম কিন্তু কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা নিকটে শব্দ হইল। কে যেন মন্দিরের মধ্য হইতে করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"বড় জ্বালা" কিন্তু কৈ, কেহ তো কোথাও নাই! ঐ আবার—আবার শব্দ শোনা গেল—"বড় জ্বালা" —কিন্তু দেখা তো কাহাকেও যায় না! ভয়ে আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু ওকি, ছড়িটা আমার অমন করিয়া লাফায় কেন! আতঙ্কে তখন আমার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া গেছে। মনে হইল, এ জঙ্গলের মাঝে বেড়াইতে আসিয়া প্রাণটা হারাইলাম। আবার ভাবিলাম, মরিতে হয় ত কাপুরুষের মত মরি কেন? জোর করিয়া একটু সাহস আনিয়া দৃঢ়হস্তে ছড়িটা চাপিয়া ধরিলাম। ছড়ি শান্ত হইল বটে কিন্তু ওদিকে আবার এক নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল! একটা চেয়ার নড়িয়া উঠিল। একটা, দুইটা, তিনটা ক্রমে চারটা চেয়ারই খটাখট্ শব্দ আরম্ভ করিয়া দিল।

কি করি? মন্দির হইতে নামিয়া যাইতেও পারিতেছি না—আর এখানে এমনভাবে দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিবার সাহসও নাই। একধারে দাঁড়াইয়া থর্-থর্ কাঁপিতে লাগিলাম। হঠাৎ চেয়ারগুলো আপনিই থামিয়া গেল। কে যেন আবার মর্ম্মস্পর্শী সুরে আমার কাণের গোড়ায় বলিয়া উঠিল—"বড় জ্বালা" যেন কার তপ্তশ্বাস আমার গা'য়ে লাগিল, যেন কার পায়ের মৃদু শব্দ আমার কাণে বাজিল, যেন কোথা হইতে একটা সুগন্ধ আসিয়া আমার নাকে প্রবেশ করিল।

অস্ফুটস্বরে আমার মুখ হইতে আপনা হইতেই বাহির হইয়া গেল—"কে তুমি?"

ঐ কথা বলিতে না বলিতে কোথা হইতে কঙ্কালময়ী এক রমণীমূর্ত্তি আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। হস্ত দুইটী তাহার বক্ষে আবদ্ধ, চোখ হইতে কি একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে, আর মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। রমণীমূর্ত্তি ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল—"শুনিতে চাও আমি কে?"

—এই বলিয়া সে একখানি হাত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া আবার বলিতে লাগিল—"ঐ দেখ, আমার সুরম্য প্রাসাদের ভগ্নাবস্থা আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, সম্মুখে চাহিয়া দেখ, ঐ বিশালবারি রাশির প্রত্যেক কণায় কণায় আমার বুকের রক্ত মিশানো রহিয়াছে। সে একদিন ছিল যখন অসংখ্য পরিচারিকা আমার সেবায় নিযুক্ত থাকিত, সে একদিন ছিল যখন আমার এই কঙ্কালাবশিষ্ট দেহে রূপ-লাবণ্য ফাটিয়া পড়িত, সে একদিন ছিল যখন আমার চোখের চাহনিতে কত রাজা চরণে লুটাইয়া পড়িতে চাহিত,—কিন্তু আজ সে সব কোথায় ভাসিয়া গেছে। আজ আর কিছুই নাই,—কিছুই নাই,—কিছুই নাই!

আছে কেবল দগ্ধহৃদয়ের অফুরন্ত হাহাকার, আছে কেবল তৃষিত প্রাণের অতৃপ্ত বাসনা, আছে কেবল এই বুকের অসহনীয় জ্বালা—আর আছে কেবল সামনের ঐ বিশাল বারি!

ওঃ বড় জ্বালা—বুকের জ্বালা—কি করিয়া এজ্বালা জুড়াইবে—কবে জুড়াইবে? আরো কতকাল এ আকুল যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতে হইবে? আমার বুকের এ সর্ব্বগ্রাসী বহ্নির লেলিহান শিখা আরো কতকাল বুকের মাঝে বহিয়া এমনি করিয়া জ্বলিয়া মরিব।

সে কোথায়—ওগো আমার সে কোথায়? সেই যে চলিয়া গেল, কৈ আর ত আসিল না! আর কি কখনো আসিবে না?—আমি কি তবে শুধুই বসিয়া থাকিব? সেইদিন হইতেই তো বুকের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি—সেইদিন হইতেই তো এ বুকের জ্বালা লইয়া তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি! ঐ দেখ, সামনের জল কি গরম—ঐ দেখ, আগুনের তাপে কেমন ফুটিয়া উঠিতেছে... ... কবে সে আসিবে······কবে এ বুকের জ্বালা নিভিবে বলিতে পার? এমনভাবে কতদিন আর এ ভাঙ্গা-প্রাসাদে অবস্থান করিব বলিতে পার—উঃ বড় জ্বালা!"

মূর্ত্তি নিস্তব্ধ হইল। হস্ত দুইটী আবার তাহার বক্ষোবদ্ধ হইয়া গেল। মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু না, কোথাও নাই—সে অদৃশ্য হইয়া গেছে!

আমার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না!

দুঃখিনী লালবিবি—সে আজ অনেকদিন হইল ছুরির আঘাতে মরিয়াছে কিন্তু তাহার অতৃপ্ত আত্মা আজও বুকের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া ছুটিয়া মরিতেছে!

আমি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া মন্দিরের চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া রহিলাম।

নরেন এবং আরো কয়েকটী ছেলে নীচ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"এ কি! মাষ্টার মশাই, এদিকে কেন একা এসেছেন? আমরা আপনাকে বাসায় না দেখতে পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে এদিকে চলে এসেছি। যাক্, আজ এসেছেন, এসেছেন—কিন্তু আর যেন কখনো এদিকে আসবেন না! এখানে একা এসে, আজ পর্য্যন্ত কেও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারে নি!"

নরেনের কথায় ভয়ঙ্কর নূতনত্ব থাকিলেও তাহাতে আমি অভিভূত হইলাম না। অদূরে মৃণ্ময়ী দেবীর সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, লালবাঁধের অগাধ বারি অসহ-আবেগে উছলিয়া উঠিতেছে আর তরঙ্গের পর তরঙ্গ ঘাতপ্রতিঘাতে ধ্বনিত হইতেছে। "বড় জ্বালা বুকের জ্বালা!"

তর্পণ

[শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়]

বর্ষ এক পূর্ণ হল আজ,
তুমি গেছ সাঙ্গ করি, এখানের কাজ।
আজি তাই বিয়োগের ব্যথা,
জাগায় মোদের প্রাণে গাঢ় ব্যাকুলতা,
গণ্ড বাহি ঝরে নেত্রনীর ;
স্মৃতিপটে জাগে শুধু,—সে প্রশান্ত মূর্ত্তি তব বীর !
কি বিষাদ কাহিনী সে ;—সুদূর প্রবাস হতে, স্থির, প্রাণহীন
দেহ তব এল যবে ;—কি ঘোর দুর্দ্দিন
ছেয়েছিল সেইদিন বঙ্গের আকাশ,—
বাতাসে উঠিল ভরি, বক্ষভরা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস !
তপ্ত পথে, নগ্ন পদে, তব দেহ সাথে
চলেছিল, তব ভক্ত প্রিয় পৌরজন,—(দীপ্ত রবি মাথে
ঢেলেছিল রৌদ্রের অনল,)
তবু অচঞ্চল
শোকভারে নতশির,—ধনী দীন, সবে ম্লানমুখে
দারুণ বিয়োগ ব্যথা সহেছিল বুকে।

আজি তুমি নাহি আর আমাদের মাঝে
তব ছবি দীপ্ত শুধু, সবাকার চিত্তপটে রাজে,—
হে বীর কেশরী
চারিদিকে স্মৃতিচিহ্ন জাগে শুধু আজ ;—কেমনে পাসরি,
প্রাণ ঢালা অকাতর তব দেশপ্রীতি ;—
পারে নি শাসক দণ্ড, জাগাইতে তব প্রাণে ভীতি !
কীর্ত্তির বিরাট তাজ
গড়ি রেখে গেছ, তুমি আমাদের মাঝ,
—প্রিয় তব বিশ্ববিদ্যালয় ;
বিশ্ব জুড়ি' উঠে আজি, তারি জয় জয় !
তব প্রিয়, বঙ্গভাষারাণী - কনক রতনে
সাজালে যাহারে তুমি, কত বিধ মণি আহরণে,
তব তরে মুছে আঁখি নীর !
যেথা রহ,—হোক সে অমরাপুরী,—বহুদূরে এই পৃথিবীর,
সেথা হতে ধ্রুব জানি, নেহারিছ তব কর্ম্মভূমি ;—
হেরিছ কি সেথা হতে, অভ্ররাশি চুমি'
কীর্ত্তি সৌধ বিরাজে তোমার,
বিরাট আকার !

আজি তুমি কর্ম্মী গুরু নেছ অবসর ;—
তাই নিরন্তর
জাগিতেছ আমাদের স্মৃতিপট মাঝে ;—
রেখে যাওয়া, তব সব কাজে।
তুমি আজি করেছ গ্রহণ
সম্মানের উচ্চ হতে উচ্চতর রাজ সিংহাসন ;
সেথা হতে পূর্ণ প্রাণে, কর আশীর্ব্বাদ
চিত্ত হতে সব পরমাদ
যাক্ ঘুচি ; কর্ম্মস্রোতে ভেসে যাক্ দেশবাসী সব
দীন অক্ষমতা প্রাণে, পাক্ পরাভব।
—মুছে যাক্ হিয়া হতে, ক্ষুদ্রহীন, স্বার্থ গ্লানি দ্বেষ
নাহি জাগে কোন কাজে অসত্যের লেশ ;
নিষ্পাপ সকলে হোক,—হো'ক মহাপ্রাণ
আদর্শ তোমার প্রাণে, নাহি যেন হয় কভু ক্ষুণ্ণ পরিম্লান।

২৫শে মে ১৯২৫
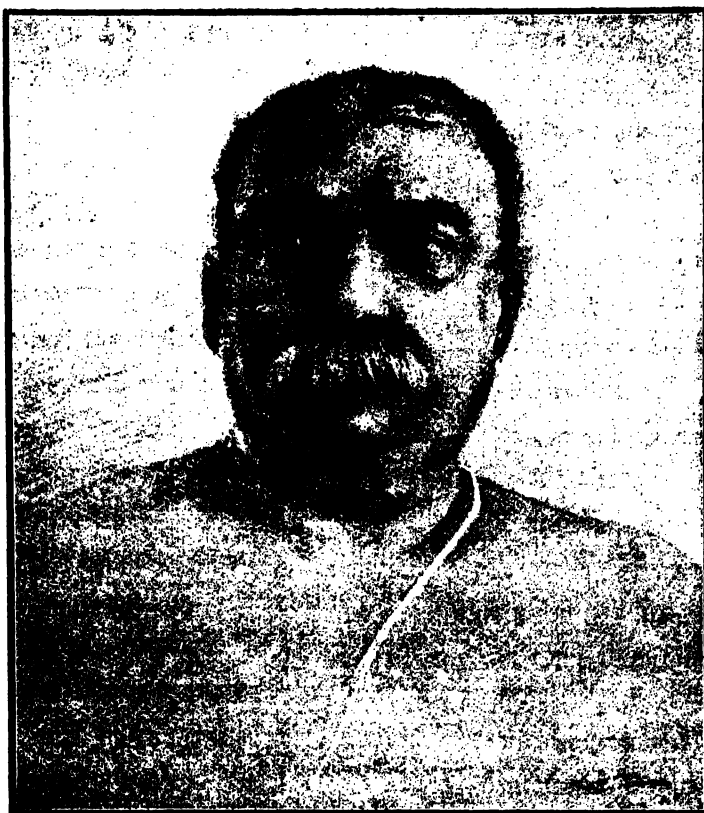
বঙ্গ-গৌরব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জন্ম—১৮৬৪, ২৯শে জুন

তিরোধান—১৯২৪, ২৫শে মে

বাঙ্গালা প্রবাদ রহস্য

[অধ্যাপক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম্ এ পি-এচ্ ডি]

কার ভাগ্যে কে খায় ?

এদেশে "কার ভাগ্যে কে খায়," এইরূপ একটী প্রবাদ আছে। ইহার অর্থ এই যে, কেহ অপর কাহারও ভাগ্যে খায় না। সকলেই নিজ নিজ ভাগ্যে খাইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে একটী গল্প আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

কোনও নগরে এক ধনবান্ বণিক্ বাস করিতেন। তাঁহার সাতটি কন্যা ছিল। একদিন তিনি কন্যাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমরা প্রত্যেকে কার ভাগ্যে সুখভোগ করিতেছ ?" জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিল, "বাবা, আমি আপনারই ভাগ্যে সুখভোগ করিতেছি।" বণিক্ তাহার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অন্যান্য কন্যাগুলিও জ্যেষ্ঠার ন্যায় প্রত্যুত্তর করিল। কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠা তদ্রূপ উত্তর না দিয়া বলিল, "বাবা, আমি নিজের ভাগ্যেই সুখভোগ করিতেছি।" বণিক্ কন্যার প্রত্যুত্তর শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "তুই এত বড় অকৃতজ্ঞ যে বলিতেছিস্ নিজেরই ভাগ্যে নিজে সুখভোগ করিস্ ? আচ্ছা তুই নিজের ভাগ্যেই যদি সুখভোগ করিতেছিস্, তাহা হইলে তাহাই কর্। আজই আমি তোর সঙ্গে একটী কাণাকড়িও না দিয়া তোকে বনবাস দিব। দেখি, সেখানে নিজের ভাগ্যে কিরূপ সুখে থাকিস্।" এই বলিয়া ক্রুদ্ধ বণিক্ কাহার-পাল্কী * ডাকাইয়া কন্যাকে তৎক্ষণাৎ তাহাতে আরোহণ করিতে বলিলেন এবং এক পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত তাহাকে একটী কপর্দ্দকও দিলেন না। কন্যাটি সূচীশিল্পে অভ্যস্তা ছিল। সে ক্রুদ্ধ পিতাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কেবল তাহার সূচীশিল্পের পেটিকাটি সঙ্গে লইল।

রুষ্ট বণিকের আজ্ঞার বিরুদ্ধে কন্যার জননী ও ভগিনীগণ বা অপর কেহ একটী কথাও বলিতে সাহস করিল না। নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে সকলে তাহাকে বিদায় দিল। বালিকা নিজের অদৃষ্টকে ধ্যান করিতে করিতে পাল্কীতে আরোহণ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বাহকেরা শিবিকাটি নগরের বহির্ভাগে লইয়া উপস্থিত হইল।

এই স্থানে একটী বৃদ্ধা বাস করিত। পাল্কীতে কে যাইতেছে, তাহা বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিতে পারিল যে শৈশবে তাহারই দ্বারা লালিতা পালিতা বণিকের কনিষ্ঠা কন্যা পিতার আদেশে বনবাসে যাইতেছে। বৃদ্ধা বালিকার ধাত্রী ছিল। সে স্নেহবশে রোদন করিতে করিতে পাল্কীর অনুগমন করিতে লাগিল। বাহকেরা তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পাল্কীর পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল। একে সে বৃদ্ধা, তাহাতে সে চলিতে অসমর্থা। পাল্কী তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া বাহকদের হৃদয় বিগলিত হইল। তাহারা পাল্কী নামাইল, এবং বৃদ্ধা তাহাদের নিকটে আসিলে, তাহাকেও তাহাতে তুলিয়া লইল। বৈকালে তাহারা এক গভীর বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী বৃহৎ বৃক্ষের তলে বণিক্-কন্যা ও তাহার ধাত্রীকে নামাইয়া দিয়া নগরাভিমুখে ফিরিয়া গেল।

নিবিড় বন; চারিদিকেই উচ্চ বৃক্ষাবলী। দিনের বেলাতেই তাহার অভ্যন্তর অন্ধকারময় থাকে। এখন সন্ধ্যাকালে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল। অরণ্যের মধ্যে কত হিংস্র জন্তু আছে; তাহারা রাত্রিতে আহারান্বেষণে বাহির হইবে। ইহা চিন্তা করিয়া বণিককন্যার হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার বয়ঃক্রম সবেমাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর। বাল্যকাল হইতে সে সুখ ও ভোগবিলাসের মধ্যেই লালিতা পালিতা ও বর্দ্ধিতা। সে কখনও গৃহের বাহির হয় নাই। একাকিনী সে কখনও কোথাও যায় নাই। আজ সে এই নিবিড় অরণ্যে

* পাল্কীবাহী বেহারাকে পূর্ব্বে "কাহার" বলিত।

নির্বাসিতা। সঙ্গে তাহার বৃদ্ধা ধাত্রীমাতা ব্যতীত আর কেহ রক্ষক নাই। কোথাও লোকালয় বা নিরাপদ আশ্রয়-স্থলও নাই। হায় আজ কোথায় তাহারা রাত্রিযাপন করিবে? কে তাহাদিগকে বিপদে রক্ষা করিবে? বালিকার চক্ষুতে জল আসিল। ধাত্রীও কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের দুঃখে অরণ্যের বৃক্ষরাজিও যেন দুঃখিত হইল। সেই বৃহৎ বৃক্ষটি তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বালিকাকে বলিল, "বাছা, তোমাদের দুরবস্থা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। এই অরণ্যটি হিংস্রজন্তু সমাকুল। এখনি তাহারা আহারান্বেষণে বাহির হইবে। তাহাদের সম্মুখে পড়িলে তোমাদের আর রক্ষা নাই। এই কারণে, আমি আমার এই বৃহৎ কাণ্ডের মধ্যে তোমাদের আশ্রয় স্থান করিয়া দিব। কাণ্ড ফাঁক হইয়া গেলেই তোমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। তোমরা প্রবিষ্ট হইলেই ফাঁক আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন হিংস্রজন্তুগণ তোমাদের আর কোনও অপকার করিতে পারিবে না।" বৃক্ষের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কাণ্ডের মধ্যে ফাঁক দেখা গেল। বণিক্‌কন্যা ও ধাত্রী তৎক্ষণাৎ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, ফাঁক আবার বন্ধ হইয়া গেল। *

অল্পক্ষণ পরেই সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার ও বন্য হস্তী প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ মানুষের গন্ধ পাইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে বৃক্ষকাণ্ডের চারিদিকে ছুটাপুটী করিতে লাগিল। কেহ ক্রোধে বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিল এবং কেহ কেহ লম্ফ ঝম্প দিয়া বৃক্ষকাণ্ড বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বৃক্ষ ক্ষতবিক্ষত হইয়া বিলক্ষণ যন্ত্রণা অনুভব করিল বটে, কিন্তু বালিকা ও বৃদ্ধা বৃক্ষকাণ্ড মধ্যে থাকিয়া নিরাপদে রাত্রি যাপন করিল। প্রভাত হইতে না হইতে বন্যজন্তুগণ সেই স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল। তখন বৃক্ষ বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার কাণ্ড এখন ফাঁক করিয়া দিতেছি। তোমরা বাহিরে এস।" তাহারা বাহিরে আসিয়া বৃক্ষের দুর্দ্দশা-দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইল। বালিকা বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনি হিংস্র জন্তুদের ভয়ানক পীড়ন সহ্য করিয়াছেন। দেখিতেছি তাহারা আপনার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে।" এই বলিয়া বালিকা নিকটবর্ত্তী এক জলাশয় হইতে কিছু পাঁকমাটী আনিয়া তদ্দ্বারা বৃক্ষের ক্ষতস্থানসমূহ লেপিতে লাগিল। তাহাতে বৃক্ষের যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হইল, সে বালিকাকে বলিল, "আমি নিজের কষ্টের কথা ভাবিতেছি না; কিরূপে তোমাদের প্রাণ-রক্ষা হইবে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছি। আমার বৃক্ষে কোনও ফল নাই যে, তোমাদিগকে খাইতে দিব। এক্ষণে এক কাজ কর। কিছু অর্থ লইয়া নিকটবর্ত্তী নগরে গিয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া আন।" বালিকা সাশ্রুনয়নে বলিল, "আমার কাছে একটীও মুদ্রা নাই।" পরে তাহার পেটিকার মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে পাঁচ কড়া কড়ি দেখিতে পাইল। বৃক্ষ বলিল, "ঐ পাঁচ কড়া কড়ি দিয়াই বৃদ্ধাকে নগরে পাঠাইয়া দাও; সে পাঁচ কড়ার খই কিনিয়া আনুক।" বৃদ্ধা নগরে গিয়া এক ময়রার দোকানে পাঁচ কড়ার খই চাহিল। ময়রা তো হাসিয়াই খুন, বলিল, "দূর হ, বেটী পাগ্‌লি। পাঁচকড়ার আবার খই হয়?" বৃদ্ধা আর এক দোকানে গেল, সেখানেও দোকানদার তাহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। তারপর আর একটী দোকানে গিয়া পাঁচ কড়ার খই চাহিলে, দোকানদার ভাবিল, "আহা, বৃদ্ধার কিছুই নাই, তাই সে পাঁচ কড়ার খই চাহিতেছে।" তাহার মনে দয়া হইল, এবং সে তাহাকে পাঁচ কড়ায় প্রচুর খই দিল।

বৃদ্ধা খই লইয়া অরণ্যে প্রত্যাগত হইলে বৃক্ষ বলিল, "তোমরা অর্দ্ধেক খই রাখিয়া দিয়া, অল্প কিছু খাও ও অবশিষ্ট খই পুকুরের ধারে ছড়াইয়া দাও।" বালিকা বৃক্ষের

---

* এই গল্পটি অন্য আকারেও শুনিতে পাওয়া যায়। বণিক্ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বাক্য শুনিয়া ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করেন যে পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি যে পুরুষের মুখ সর্ব্বপ্রথমে দেখিবেন তাহারই সহিত তাহার বিবাহ দিয়া উভয়কে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিবেন। তদনুসারে তিনি পরদিন একটী দরিদ্র বালককে দেখিয়া তাহারই সহিত কন্যার বিবাহ দেন ও উভয়কে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করেন। গল্পের বর্ত্তমান আকারটি লালবিহারী দে প্রণীত Folk Tales of Bengal নামক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। দে মহাশয়ের লিখিত গল্প অবলম্বন করিয়া এই গল্পটি লিখিত হইল।

পরামর্শমত তাহাই করিল, এবং সমস্ত দিন বৃদ্ধা ধাত্রীমাতার সহিত নিজ দুরদৃষ্টের কথা আলোচনা করিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগমে বৃক্ষকাণ্ড আবার ফাঁক হইল, উভয়ে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। বন্যজন্তুগণ পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় আসিয়া বৃক্ষের চারিদিকে গর্জ্জন ও উৎপাত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইল না।

পুকুরের চারিধারে খই পড়িয়া থাকায় রাত্রিতে অসংখ্য ময়ূর ময়ূরী তথায় উপস্থিত হইয়া খই খাইল। পরস্পরে কাড়াকাড়ি করিয়া খই খাওয়ার সময়ে তাহাদের পুচ্ছ হইতে বহু পালক খসিয়া পড়িল। প্রভাতে বালিকা ও তাহার ধাত্রী বৃক্ষকাণ্ডের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে, বৃক্ষ বলিল "পুকুরের ধারে গিয়া ময়ূরের পালকগুলি সংগ্রহ কর এবং তদ্দ্বারা একটী পাখা প্রস্তুত করিয়া নগরে বিক্রয় করিতে পাঠাও।" বালিকা শিল্পকার্য্যে সুনিপুণা ছিল। তাহার পেটিকার মধ্যে সূচী ও সূত্র ছিল। সে তাহাদের সাহায্যে একটী মনোহর পাখা প্রস্তুত করিল। বৃদ্ধা তাহা নগরে বিক্রয় করিতে গেলে, এক রাজপুত্র পাখার শিল্পকার্য্যে চমৎকৃত হইয়া বহু অর্থ দিয়া তাহা ক্রয় করিলেন। বৃদ্ধা সেই অর্থের কিয়দংশে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর খই কিনিয়া আনিল, এবং পূর্ব্বদিনের ন্যায় পুকুরের চারিদিকে আবার খই ছড়াইয়া দিল। এইরূপ প্রত্যহ অসংখ্য ময়ূর-পালক সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং বণিক্-কন্যা প্রত্যহ তদ্দ্বারা বিচিত্র পাখাসমূহ প্রস্তুত করিয়া নগরে বেচিতে পাঠাইত। পাখা এরূপ সুন্দর হইতে লাগিল যে নগরের প্রত্যেক অর্থবান্ ব্যক্তিই প্রচুর মূল্য দিয়া তাহা কিনিতে লাগিল। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের বহু অর্থ সঞ্চিত হইল।

তখন বৃক্ষ তাহাদিগকে সেই অর্থের কিয়দংশে একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিল। তদনুসারে বৃদ্ধা নগর হইতে বহু জনমজুর লইয়া আসিয়া তাহাদিগকে ইষ্টক প্রস্তুত করিতে ও অরণ্যের বৃক্ষ কাটিয়া খানিকটা স্থান পরিষ্কৃত করিতে নিযুক্ত করিল। যথাসময়ে ইষ্টক নির্ম্মিত হইল, অট্টালিকার জন্য কড়ি, বরগা, দরজা, জানালা প্রভৃতি প্রস্তুত হইল, ঘুটিং বা চূণের পাথর পোড়াইয়া রাশীকৃত চূণ সংগৃহীত হইল, এবং রাজমিস্ত্রীগণকে অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত হইতে অধিক দিন লাগিল না। বণিক্-তনয়া আপনাদের পরিচর্য্যার জন্য দাসদাসী এবং গৃহরক্ষার জন্য বহু ভৃত্য নিযুক্ত করিল। তৎপরে বাটীর সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও উদ্যান রচনা করিতে বহু খনক ও শ্রমিক নিযুক্ত করিল।

চিরদিন কখনও কাহারও সমান যায় না। নির্ব্বাসিতা বালিকা তাহার ধাত্রীমাতার সাহায্যে যখন অরণ্যমধ্যে বাটী প্রস্তুত করিতেছিল, সেই সময়ে তাহার পিতার ব্যবসায়ে প্রভূত ক্ষতি হওয়ায় তিনি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঋণের দায়ে উত্তমর্ণেরা তাঁহার ঘরবাড়ী, ও যাবতীয় ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইয়াছিল। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী ও ছয়টী কন্যা একেবারে পথের ভিখারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশত্যাগ করিয়া উদরান্নের জন্য তাঁহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত অরণ্যের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের জীবিকার কোনও উপায় ছিল না। বণিক্ কাহারও গৃহে বা মাঠে দিনমজুরী করিয়া যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা অতিকষ্টে সকলে একবেলা অর্দ্ধাশনে কাটাইতেন। সর্বদিন আবার মজুরীও জুটিত না। এই স্থানে থাকিতে থাকিতে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন যে, অদূরে অরণ্যমধ্যে কোথা হইতে এক ধনবতী যুবতী আসিয়া এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়াছেন; এবং একটী পুষ্করিণী খনন করাইতে বহু খনক ও জনমজুর নিযুক্ত করিয়াছেন। বণিক্ সেই স্থানে গিয়া মজুর খাটিতে ইচ্ছুক হইলেন। স্বামীর কষ্ট দেখিয়া তাঁহার পত্নীও তথায় গিয়া তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। পরদিন খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য তাঁহারা উভয়েই ছিন্নবস্ত্রে ও দীনবেশে প্রাসাদ সমীপে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, পুষ্করিণী খননকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এবং উদ্যান রচিত হইতেছে। বণিক্-কন্যা দ্বিতলের বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া জনমজুরদের কার্য্য দেখিতেছিল, এমন সময়ে প্রাসাদাভিমুখে তাহার মাতাপিতাকে দীনবেশে আসিতে

দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে আনয়নের জন্ম ভৃত্য পাঠাইল। ভৃত্য তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে যাইবার জন্য বলিবামাত্র তাঁহাদের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা মনে করিলেন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার সময় নরবলি নেওয়ার যে প্রথা আছে, সেই প্রথানুসারে তাঁহাদিগকে বলি দিবার জন্যই হয়ত ভিতরে যাইতে বলিতেছে। ভয়ে ভয়ে তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। আবার যখন গৃহস্বামিনীর আদেশক্রমে ভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে বলিল, তখন তাহাদের ভয়ের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা মনে করিলেন, সত্য সত্যই আজ তাঁহাদের প্রাণ যাইবে। উভয়ে যখন ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে গৃহস্বামিনী দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের পাদবন্দনা করিলেন। সেই তরুণী যুবতীকে প্রণাম করিতে দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তখন যুবতী বলিল, "মা, বাবা, আপনারা কি আপনাদের সেই নির্ব্বাসিতা অভাগিনী কন্যাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আমিই আপনাদের সেই স্নেহবঞ্চিতা দুহিতা। হায়, আজ আপনাদের এই দীনবেশ দেখিতেছি কেন? আপনাদের এই বেশ দেখিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।" এই বলিয়া যুবতী কাঁদিতে লাগিল।

বণিক্ এবং তাঁহার পত্নীও কন্যাকে দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর কন্যার মুখে অরণ্যমধ্যে তাহার জীবন-যাত্রার কাহিনী শুনিয়া বণিক চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "মা, তুমি যথার্থই বলিয়াছিলে যে তুমি নিজের ভাগ্যেই সুখভোগ কর। কেহ কাহারও ভাগ্যে খায় না। সকলেই আপন আপন কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখভোগ করিয়া থাকে। আমি ভুল বুঝিয়াই মনে করিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার ভাগ্যেই সুখভোগ করিতেছিলে। আজ আমার সে ভ্রম দূর হইল।"

বণিক্‌কন্যা মাতাপিতাকে ও ভগ্নীদিগকে বাটিতে রাখিয়া ও তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিয়া পরম আনন্দে কালহরণ করিতে লাগিল। সে পিতাকে বহুধন দিয়া আবার ব্যবসা বাণিজ্য করিতে অনুরোধ করিল। পিতা কন্যার অর্থ দ্বারা বাণিজ্য করিয়া লাভবান্ হইলেন এবং দেশে প্রত্যাগত হইয়া আপনার বিষয় সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করিলেন। নির্ব্বাসিতা কন্যা সেই বনপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে চাহিল না। পরে তাঁহার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া এক রাজপুত্র তাঁহাকে বিবাহ করিলে তিনি রাজরাণী হইয়া সেই বনপ্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। *

* রাজপুত্রের সহিত বণিক্ কন্যার কিরূপে বিবাহ হয়, তাহার বিস্তৃত কাহিনী আছে; কিন্তু তাহা আমাদের এই প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

The monthly Messenger

তুলসী মঞ্চ

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]   ২০শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৩২ ।   [৪৩শ সপ্তাহ

মিনার্ভায় আত্মদর্শন

বিবেক।

বিবেক—শ্রীমতী আঙুরবালা।

ভ্রমর, ফুল ও প্রজাপতি

মোহ ও মন।

মোহ—শ্রীমতী অমিয়া। মন—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)

সুমতি ও মন।

সুমতি—শ্রীমতী আশমানতারা। মন—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)

বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য—শ্রীমতী রেণুবালা (২)।

চরকা ও খদ্দর

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

বেশী দিনের কথা নয়, কয়বছর আগে এ দেশে একটা ঢেউ এসেছিল। সেটা ঢেউ বই আর কি। নদীর বুকে যেমন ঢেউ আসে, সেও তেমনি একটা ঢেউ, জলের বুকেই কাঁপন দিয়ে চলে গেছে, জানি নে তেমন ঢেউ আবার আসবে কি না।

তারপর আরও ঢেউ আসছে গড়িয়ে যাচ্ছে, এগুলো ছোট—একে আংশিক ঢেউ বলা যেতে পারে, কেন না প্রথমটার মত কেউই বড় নয়। এর কোনটাই স্থায়ী হতে পারে নি, লোকের মনে কেবল একটা দাগ রেখে যেতে পারছে মাত্র, কিন্তু সেটা আঁকাই সার হচ্ছে যেহেতু যথার্থ কাজ তাতে একটাও হতে পারছে না।

এই যে চরকা ও খদ্দর এরই কথা বলতে আজ এসেছি। জানি নে এই কথাগুলি - যা একঘেয়েই হয়ে গেছে তা আজ নূতন করে কেউ শুনবেন কি না।

মনে পড়ছে কিছুকাল আগে আমি "খদ্দর" নামে একটী প্রবন্ধ "সোনার বাংলায়" লিখেছিলুম। এই প্রবন্ধটী অনেকেই পড়েছিলেন এবং এ নিয়ে আমার অনেক আত্মীয় বন্ধু অনেক কথাও বলেছিলেন। অর্থাৎ প্রবন্ধটীতে আমি যে তাঁদের কথাই উল্লেখ করেছি এই ধারণাই তাঁদের মনে জেগেছিল এবং তা নিয়ে তাঁরা না কি অনেক আলোচনাও করেছিলেন। যথার্থ কথা বলতে কি—আমি কোনও ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে লিখি নি, সমস্ত দেশবাসীর পানে তাকিয়ে কথাটা বলেছিলুম, এতেও যে এত কথা শুনতে হবে, ঠাট্টা বিদ্রূপ সইতে হবে তার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। অনুযোগগুলো শুনে বুকফাটা দুঃখেও আমার মুখে হাসি এসেছিল। তারপর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথাগুলো যখন বিভিন্ন পত্রিকায় পড়ি, তখন মনে ভাবি আচার্য্য বেনাবনে মুক্তা ছড়িয়ে যাচ্ছেন। দুর্ভাগ্য যে এ দেশের লোক সভাসমিতি সকল জায়গাতেই গিয়ে জোটে, কাণ দিয়ে শোনে কিন্তু মনে রাখতে পারে না। যদি মনে রাখতে পারত তা হলে ঘরে ঘরে চরকাও চলতো, খদ্দরও সবাই পরত।

সাময়িক উত্তেজনায়—বেশীর ভাগ নাম করবার জন্যেই তখন অনেকে খদ্দর নিয়েছিলেন, এ কথা বলা কি অযথার্থ হবে? বছর দুই তিন আগে একটী মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন ঢেউটা সবে বইতে সুরু করেছিল। তাঁর পরণে আগাগোড়া সবই খদ্দর। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বড় দুঃখ করছিলেন—দেশের মেয়েরা এখনও কেউ খদ্দর পরলে না। যদিও আমাদের পরণে বিলাতি কাপড় কারও ছিল না, সকলেরই মিলের কাপড় ছিল, তবু তাঁর মুখখানা দেখে আর কথাগুলো শুনে লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা করছিল। তারপর আমরা খদ্দর পরলুম, আর এটা বেশ ভাল করে জেনে নিলুম যে বিলাতি আর কখনই পরব না, যেমন করেই হোক দেশীই পরব। অনেকদিন সেই মহিলাটীর সঙ্গে আর দেখা হয় নি, কিছুদিন আগে এক উৎসবস্থলে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রথমটায় তাঁর সাজসজ্জা দেখে চিনতে পারি নি, কেন না দু' বছর আগে তাঁর যে মূর্ত্তি দেখেছিলুম তার সঙ্গে এ মূর্ত্তির অনেক পার্থক্য আছে। দেখলুম—কোথায় সে মহামহিমময়ী মূর্ত্তি—যা দেখে স্বতঃই মাথা নুইয়ে পড়ত। আজ তিনি বিলাসীতার পরিচয় দিচ্ছেন, স্পষ্টই জানা যাচ্ছে তাঁর মধ্যে যে বিলাসিনী নারী ছিল সে ফুটে বার হয়ে পড়েছে। পায়ের হিল তোলা জুতো হতে মাথায় যে ফিতাটী তিনি পিন দিয়ে আটকে রেখেছেন সে সবই খাঁটি বিলাতি।

এমনি অনেককেই দেখছি। কয়েকটী মেয়েকে বিশেষ করে জানি—এঁরাই তখন খদ্দর পরে মাথায় খদ্দরের মোট নিয়ে পথে বার হয়েছিলেন, কষ্টকে কষ্ট বলে গ্রাহ্য করতে

চান নি, এখন দেখছি তাঁদের প্রকৃত মূর্ত্তি যা—তা ছদ্মবেশের আরবণ ফেলে বার হয়ে পড়েছে, পায়ে বিলাতী জুতাও আছে, পরণে বিলাতী কাপড়ও আছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইঁহারা একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, "কি করি, যা কেনা রয়েছে তা ফেলতে তো পারি নে। এমন অবস্থা তো আমাদের নেই যে একটা ফেলে আবার পয়সা দিয়ে কিনব। প্রতিজ্ঞা করেছি বিলাতি আর কিনে পরব না, সে প্রতিজ্ঞা ঠিক পালন করে যাব।"

একদিন সংবাদ পত্রে পড়েছিলুম মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করেছিলেন নেতারা সকলেই যেন একঘণ্টা করে চরকায় সূতা কাটেন, কারণ নেতাদের উৎসাহে উৎসাহিত জনসাধারণের কাজ তা হলে অনেকটা এগিয়ে যাবে। এই প্রস্তাবে না কি নেতারা নিজেদের অপমানিত জ্ঞান করেছিলেন, গোলমাল দেখে মহাত্মা গান্ধী এ ব্যাপার আপোষে মিটিয়ে ফেলেছিলেন।

চরকায় সূতা কাটা প্রস্তাব নিয়ে এই যে দলাদলি সাধারণে এইটেই ধরে রাখবে। একঘেয়ে চরকা ঘুরিয়ে কোমল হাতে ব্যথা ধরিয়ে কে বাপু সূতা তৈরী করে, কাপড় বুনায়, পয়সা ফেললে কাপড় যখন কিনতেই পাওয়া যায়?

যে ছেলেরা এগিয়েছিল তাদের অনেক আত্মীয়ের ভয় উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। সবাই তো সি, আর. দাস বা নেহেরু নয়; ছেলেরা জেলে যাবে, বাছাদের কত কষ্ট সইতে হবে; দুর্ভাবনাটা তো কম নয়। একটী ছেলে এগিয়ে ঢের কথা শুনতে পেয়েছে, এমনি সকল ছেলেই তো শুনেছে। ভগবানের ইচ্ছায় গোলমালটা কমেছে, খাঁটী স্বদেশী যারা—চাকরী ছেড়ে দেশের দুঃখে কেঁদে পথে ছুটাছুটী করছিল, তারা যে আবার আস্তে আস্তে চোখের জল মুছে ঘরে ফিরে এসেছে আবার চাকরীতে লেগেছে—বাপ মায়ের সকল ভয় ভাবনা দূরে গেছে, তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে দু' বেলা খেতে পারছেন, একটু ঘুমিয়ে বাঁচছেন।

তখনকার সাময়িক উত্তেজনার ফলে অনেক গাছ নির্ম্মূল হয়ে চরকার রূপ ধরেছিল, হু হু করে অনেক চরকা বিক্রিও হয়ে গিয়েছিল, সকল চরকাতেই অল্প বিস্তর সূতা কাটা হয়েছিল। এখন সেই চরকা ঘরে ঘরে কাঁদছে। অতীতের সাক্ষীরূপে সে এখন ঘরের মধ্যে কোনও উঁচু জায়গায় তোলা আছে, কারও বা রান্নাঘরে কাঠের মধ্যে স্থান হয়েছে।

তখন খেয়ালের ঝোঁকে অনেক বাগানে কাপাসের গাছ বোনা হয়েছিল, বছর না ঘুরতেই তার শেষ হয়ে গেছে। গাছে ফল ফেটে কত তুলা বাতাসে উড়ে গেছে, কে তুলা সংগ্রহ করে, কে চরকা কাটে! আচার্য্যের কথা, গান্ধীর কথা আজ লোকে শুনে যাচ্ছে মাত্র, নূতন কোনও অনুভূতি জাগাতে সমর্থ হচ্ছে না। সংসারের গতিই যে এই, একটা ডুবছে, আর একটা উঠছে। খদ্দর উঠেছিল দুদিনের জন্যে তারপর আবার যা তাই।

বিলাতির চলন আজকাল একটু কমে এসেছে, দেশী মিলের কাপড় প্রচুর উৎপন্ন হচ্চে সেই জন্যে। তবু অনেকে এমন বিলাতিভক্ত আছেন যাঁরা দেশী কাপড় মোটে পরতে পারেন না।

খদ্দরের যতটা প্রচলন হওয়ার আশা করা গিয়েছিল তার দুই আনাও হয়েছে কিনা সন্দেহ, কেননা বড় মোটা—ভিজলে বড় ভারি হয়, গায়ে বড় বেঁধে, ইত্যাদি কথা প্রায় অনেকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়।

এ জগতে প্রত্যেক জাতির একটা নির্দ্দিষ্ট পোষাক থাকে, ভারতবাসীর পোষাক নাই। ভারতীয় বোঝা যাবে খদ্দরে—গান্ধি তাই বলেছিলেন। ভারতবাসী নিয়েছে অপরের পোষাক, জাতীয় বিশিষ্টতা জাগিয়ে রাখতে একমাত্র খদ্দর বই আর কিছু নেই, এটা শুধু দৈহিক আরামের জন্যে মনে জেনেও জানতে চায় না।

এখনও খদ্দর ও চরকা নিয়ে মাঝে মাঝে আন্দোলন চলছে কিন্তু এ আন্দোলন একেবারেই নিষ্ফল কেন না যাঁরা মুখে এক কথা বলেন অন্তরে তাঁদের অন্য রকম রয়েছে। কাজেই এটা যে সুধু মুখস্থ বলা মাত্র তা বেশ বলতে পারা যায়। দেশবাসী হু হু করে অধঃপতনের পথে নেমে চলছিল, এত অধিক পরিমাণে এরা আত্মসুখী হয়ে পড়েছিল মনে করত—জীবনটা যেমন তেমন করে কাটিয়ে দিয়ে যেতে পারলেই হল, যেন জীবনকালের মধ্যে কষ্ট স্বীকার না করতে হয়। আমাদেরই দেশে আমাদেরই চোখের সামনে অন্যে

এসে ব্যবসা বাণিজ্য-শিল্প সব কেড়ে নিয়ে ভোগ করছে আর আমরা সব হারিয়ে নির্ব্বাক, শুধু তাদের পানে তাকিয়ে রয়েছি। তারা আমাদের ওপর অবাধ প্রভুত্ব খাটিয়ে নিচ্ছে, তা খাটাক আমরা মুখ বুজিয়ে থাকব—চাকরী করে যাব কাপড় একখানা পরতে পেলেই হল. আর কিছু চাইনে।

সুখপ্রিয় ভারতীয়,এর মধ্যে অপদার্থ বাঙ্গালী, বাঙ্গালীকে আর চলতে হয় না, একদেশ হতে আর একদেশে যেতে হলে পরের রেলষ্টীমার চাই, এক পাড়া হ'তে অন্য পাড়ায় যেতে পরের তৈরী বাহক মোটর চাই, ফলে দেশবাসী এখন দু'পা হাঁটলে হাঁফিয়ে পড়ে। পয়সা হলে কি না মেলে। অত কষ্ট করে সুতো কেটে কাপড় তৈয়ারী করতে হতো না, ম্যাঞ্চেষ্টার কাপড় যুগিয়েছে। সেদিন একটী অর্দ্ধবয়স্ক ভদ্রলোককে আক্ষেপ করতে শুনেছি—"দেশের লোকগুলোর ঘাড়ে ভূত চেপেছে নইলে এ রকম করতে সাহস করে কখনও? দিব্য আছিস বাপু, চাকরী করছিস--মেহনত এতে কিছু নেই, মাসটা পড়তে পড়তে মাইনেটা পকেটে পান, এতটুকু মাথা ঘামাতে হয় না। পয়সা ফেল—কাপড় পাবে, পয়সা ফেল—সাতদিনের পথ একদিনে চলে যাবে! এসব কি বাপু, ছেলেগুলোকে অনর্থক ক্ষেপিয়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ মাটি করে দেওয়া। যদি ওরা চাকরী না দেয়, রেল বন্ধ করে, কাপড় না আমদানী করে, তখন শুকিয়ে মরতে হবে যে।

কথাটা সত্য, দেশের লোক এতটা নির্ভরশীল হয়েই পড়েছে বটে। এরা কি সেকালের লোক যে অনায়াসে দশ বিশ ক্রোশ হেঁটে যাবে? এরা যে বাবু, রেল বন্ধ হলে এরাই আগে মরবে। চাকরী না হলেই সত্যই এদের শুকিয়ে মরতে হবে কারণ জমী জমার কাজ এরা কিছুই জানে না। সহরবাসী অনেকে ধানের গাছ বলতে অবাক হয়ে যান এমনও দেখা যায়।

কিছুদিন আগে যা শুধু কল্পনার বিষয়ই ছিল আজ তা সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। বস্ত্রের অনটন জানা গেছে সেই দিন, যেদিন বস্ত্রাভাবে অনেক লোক ঘরের বার হতে পারে নি। চাকরীর বাজারে আগুন লেগেছে, দলে দলে ছেলেরা চাকরীর আশায় ছুটছে, কিন্তু কোথায় চাকরী? চাকরী আর মিলছে না। কত বি-এ, এম-এ, উপাধিধারী ছেলে চাকরীর জন্যে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ বছর দুইয়ের কথা সংবাদ পত্রে পড়েছিলুম এম-এ, উপাধিধারী জনৈক শিক্ষিত যুবক চাকরীর অভাবে আত্মহত্যা করেছেন। আর একবার পড়লুম জনৈক বি-এ, ডিগ্রিধারী ছেলেটী সামান্য কুড়ি টাকা বেতনে পুলিসের কনেষ্টবল হয়েছে, এর চেয়ে যে বি-এ, ডিগ্রিধারী ছেলেটী পানের দোকান করে বসেছেন তিনিই ভাল কাজ করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এতে তিনি কুড়ি টাকায় ঢের বেশী উপার্জ্জন করতে পারবেন আর এ স্বাধীন ব্যবসা।

দেশের লোকের চোখ ফুটেছে অধঃপতনের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে, সে দেখছে কেমন করে সর্ব্বস্ব পরের হাতে তুলে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েও তারা বেঁচে রয়েছে। ঘুম ভাঙ্গলেও ঘোরটা এখনও কাটে নি, সে তাই শুধু দেখেই যাচ্ছে, শুধু শুনেই যাচ্ছে।

দেশবাসী আজ শিক্ষিত তাই তারা আজ শিক্ষার গর্ব্ব দূর করে অসভ্য চাষাদের সঙ্গে মিশে ক্ষেত খামারের কাজ করতে পারে না, এতে অত অত্যন্ত নত হয়ে পড়তে হয়, চাষার সঙ্গে মিশে চাষা হতে হয়। সে যে শিক্ষিত. সে জ্ঞানটুকু যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কিছুতেই সে চাষার সঙ্গে মিশে কাজ করতে পারবে না এইটুকুই তার শিক্ষার বৈচিত্র্যতা।

অনেককে জানি—বছর তিন চার আগে রোখের বশে জমি জমা করে ফেলেছেন, দুচার দিন যে খাটেন নি সেকথা বলতে পারিনে, তারপরে আবার যে নিরুদ্যমভাব আগেও ছিল—পরেও তাই কারণ ওসব কাজ চাষাদেরই মানায় ভদ্র-লোকের শোভা পায় না, রোদে পোড়া, জলে ভেজা, এর উপযুক্ত ধাতু ভদ্রসন্তানের নয় বলেই এঁরা মনে করেন। এই সব শিক্ষিত লোক সেই সব জমি অনাবাদিত অবস্থাতে ফেলে রেখেছেন নয় তো অর্দ্ধদামে আবার বিক্রী করে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। কোথায় গেল তখন পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল সেই দৃঢ়তা।

কয়েকবার এদেশে কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক মিলে ব্যবসা খুলে বসেছিলেন। প্রথম উদ্যমের ফলে কিছু লাভও হল, তার ফলে বাঙ্গালীর চিরালস্যতা আবার ফিরে এল। এই

অলসতার ফলে ব্যবসায় দিন দিন ক্ষতি হতে লাগল, বাধ্য হয়েই তখন তাদের ব'বসা ত্যাগ করতে হল, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলে বাঙ্গালীর ব্যবসা করা পোষাবে না। সুখের কথা আজকাল ভারতীয় অন্য দেশবাসীদের একাগ্রতার দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়েছে, বাঙ্গালী বুঝছে ব্যবসা লক্ষ্মী, তাই অনেক বাঙ্গালী ব্যবসায় নেমেছেন।

এদেশে যত বেকার লোকের সংখ্যা দেখা যায় অন্য কোন দেশে তত নেই। সকলেই নিজের জীবিকা অর্জ্জন করছে, বসে খায় না, কিন্তু এদেশবাসীর ঘরে অন্ন না থাকলেও সে ঘর ছেড়ে বড় একটা বার হতে চায় না। চাকরী হল তো খুবই ভাল, অন্যথায় বসে থাকবে, হয় তো এক আধদিন উপবাসেও কেটে যায় এমনিই তো অবস্থা।

এতটুকু একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর—"খোকা তুমি কি করবে," সে না ভেবে-চিন্তে উত্তর দেবে চাকরী করব। এই চাকরী কথাটা সে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায় ও এই কথাটাই সে মনের মধ্যে গেঁথে রাখে। মায়েরা ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াবার গান করেন, সে গানে বলেন খোকা বড় হয়ে চাকরী করে টাকা আনবে, চাকরী করবে। এদেশ মা বাপ ছেলেকে লেখাপড়া শেখান, সকলেরই উদ্দেশ্য ঐ এক—সেই চাকরী, চাকরী ছাড়া যেন অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না। চাকরী না করতে পারলে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল, ছেলেরাও তাই মনে করে রাখে। খুব উচ্চ আশা আর উচ্চ লক্ষ্য নিয়েই তারা লেখাপড়া শেখে, তারপর? তারপর চাকরীর বাজারের অবস্থাতো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

বইতে সেকালের অর্থাৎ ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগের ইতিহাস পড়ে জানতে পারি তখনকার দিনে কোনওমতে দুই একটী ইংরাজি শব্দ বলতে পারলেই বেশ ভাল চাকরী পাওয়া যেত। দেশের রাজার অনুগ্রহে চাকরী যথেষ্ট পাওয়া যেত, সম্মান অনিবার্য্য, আর ঘর ভর্ত্তি টাকা, কাজেই লোকে ঝুঁকেছিল ইংরাজির দিকে।

এই দেশকে মুগ্ধ করে, গায়ে হাত বুলিয়ে এমনি করেই দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করেছে। এ দেশবাসীও একটা জাতি বলে একদিন গণ্য ছিল, এ দেশের নিজস্ব জিনিষ অনেকই ছিল, এ দেশবাসীও ব্যবসা বাণিজ্য করত, কিন্তু আজ আর তার কিছু নেই। এর নিজস্ব যা তা সব বিসর্জ্জন দিয়েছে।

এ বিষয়ে ভারতীয় মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি যে বেশী চালাক এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কখনও দেখা যায় নি একজন মাড়োয়ারী নিজেদের জাতীয়তা ভুলে গিয়ে বাঙ্গালীর মত পরের ধনে পোদ্দারী করছে। এরা কয়জন নিজেদের ধর্ম্ম ত্যাগ করেছে, কয়জন তাদের সংস্কার ত্যাগ করেছে? কিন্তু আড়ালে ঘৃণা করলেও কয়জন ইংরাজ প্রকাশ্যে তাদের পোষাকের নিন্দা করতে পারেন, তাদের মুখের উপরে তাদের সংস্কার দোষের কথা উল্লেখ করতে পারেন? এ যে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করা, ব্যবসা স্থলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ কাউকে হারাতে পারবে না।

চাকরীকে এরা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে নি, ব্যবসাকেই এরা জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছে। কাজ চালানোর মত লেখাপড়া হলেই হ'ল, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময় যৌবনের উদ্যমকে তারা পড়ার চাপে ধ্বংস করতে পারে নি, ইউভার্সিটীর ডিগ্রীকে তারা শ্রেষ্ঠ মান বলে গ্রহণ করে নি। এই যথার্থ মানুষের কাজ। এ দেশবাসী এটা শেখে নি বলে ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে, তাদের লেখাপড়া সার্থকতা লাভ করতে পারছে না। এই লেখাপড়া সার্থক হতে পারত—যদি ব্যবসায় লাগাতে পারত। ঘরে তার হাহাকার উঠছে—ভাত চাই, কাপড় চাই বাঙ্গালী ছুটোছুটি করছে কোথায় চাকরী খালি আছে। একটী পনের টাকার চাকরীর জন্যে দেড়শতটী দরখাস্ত পড়ে দেখা গেছে। যার কপালে জুটল তার বড় কপাল জোর, তার মানতের পুজো অমনি দেওয়া হয়। শুষ্কমুখ বাঙ্গালীর ছেলে পিঠে তার ডিগ্রীর বোঝা নিয়ে পথে পথে ঘোরে, ঘরে তার হাহাকার—লাঞ্ছনা, গঞ্জনা।

বাঙ্গালী একমাত্র উচ্চ শিক্ষাকেই জীবনের সার বলে মনে করেছে। উদরে দু'দিন অন্ন না যাক, ক্ষুধায় দেহ ঝুঁকে পড়ছে, তবু সে শুষ্কমুখে জানাবে সে উপাধিধারী। চাকরীর লাইন পূর্ণ হয়ে গেছে, দেশে আর চাকরী নাই। স্বাধীন ব্যবস্থা উকীল, ডাক্তার, কিন্তু সেও আর চলছে না; উকীল ডাক্তারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বাঙ্গালীকে এখন কাজ শিখতে হচ্ছে, শেখাও দরকার। কিছু না জেনে হঠাৎ একটা ব্যবসা ক্ষেত্র তৈয়ারী করা ভাল নয়, আগে সব শিখে নিয়ে তারপর ব্যবসা ফেঁদে বসা ভাল। যত ধনী ব্যবসায়ী দেখা যায় তাদের অনেকেই হয় তো পথে পথে রোদে পুড়ে জলে ভিজে ঘুরেছে, হয় তো সারাদিন খেতেও পায় নি। অধ্যবসায়ের ফলে লক্ষ্মী আজ তাদের ঘরে অচলা।

বাঙ্গালীকে আজ শিক্ষানবিশী করতে হবে, আর করতে হবে ক্ষেত খামারের কাজ। জমী সব অনুর্বর হয়ে পড়ে আছে এতে সার দেওয়া চাই, নচেৎ উর্ব্বরতা শক্তি লাভ করবে কি করে? যদি জীবন পথ সহজ সরল করবার ইচ্ছা থাকে দেশের ছেলে মান অপমান ভুলে যাক, শিক্ষা তাদের যথার্থ জ্ঞান দিক, তাদের দুর্ব্বার মত নত করে দিক।

খদ্দরের জন্যে আবার তেমনি প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। দু' দিনের জন্যে খদ্দর নয়, লোক দেখানোর জন্যে খদ্দর নয়, খদ্দর চিরকালের জন্যে। খদ্দর মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে যাক।

দেশবাসী আজ সব বুঝেও কি খদ্দরকে ঠেকিয়ে রাখবে, চরকাকে দূরে রাখবে? এখনও এ ধ্বংসোন্মুখ জাতির উঠবার সময় আছে। এই দেশের লোক নিজের হাতের বোনা মোটা কাপড় পরে গৌরব অনুভব করবে, এ দেশের মাটীতে প্রচুর শস্য জন্মাবে, টাকায় আটমণ চাল না হোক একমণ চাল কি হতে পারে না? এ দেশের বাণিজ্য বাইরে প্রসারতা লাভ করবে, দেশের মেয়েরা চরকা কেটে সূতো তৈরী করবে। সে দিন আসবে কি?

চায়ের দোকান

[প্রভাত কিরণ বসু বি-এ]

বাজারটাকে ছাড়িয়ে এসে, ইষ্টিশানের পথের ধারে,
ছোট্ট একটী চায়ের দোকান ছোট্ট একটী পুকুর পাড়ে।
সকাল বিকেল তারই মধ্যে বেশ আমাদের আড্‌ডা জমে
এক পেয়ালা চায়ের নেশার গল্প চলে গাঁজার দমে।

গল্প চলে গয়লাপাড়ার জার্ম্মেণী আর আমেরিকার,
কয়লাখনির, কণ্যাদায়ের, বন্যা এবং ম্যালেরিয়ার।

চা ছাড়া পান তামাক চুরুট্ তাও পাওয়া যায় এখান থেকে
তিনপুরুষের সোডার বোতল জন্মাবধিই আস্‌ছি দেখে।

সাবান আছে কাগজ আছে জলছবি আর লজঞ্জুস ও;
দোয়াত আছে কলম আছে কালী-বোধহয় আলোর ভুষো।
বিস্কুট আর পাঁউরুটিটার রোজই খরচ রোজই চলে।
ডাবও বেচে আলুও বেচে—চায়ের দোকান তবুও বলে!

বাদ্‌লাদিনের দুপুর বেলায় দোকান ঘরটা খোলাই থাকে,
বাতাস এসে কাঁপিয়ে তোলে তলতা বাঁসের দরজাটাকে!
চায়ের হুকুম তখন আবার তাসজোড়াটা ফেঁটিয়ে নিয়ে,
ধানের ক্ষেতের ঢেউ দেখা যায় পুবের দিকের জানালাদিয়ে।
কলাবাগান দুলিয়ে যখন ঝড় ওঠে আর বৃষ্টি পড়ে,
ভিড়টা তখন বড্‌ড বাড়ে চায়ের দোকান আড্‌ডা-ঘরে।

শক্তি-সাধনা

[শ্রীযতীন্দ্র মোহন সিংহ]

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগের দুইটি প্রধান মনীষী আমাদের জাতীয় উন্নতির দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, নবীন যুবকের দল ("নবযৌবনের দল" অথবা "সবুজ সৈন্যের দল") নবীন উদ্যমে, উদ্দাম সাহসের সহিত, সর্ব্ব প্রকার বিধি নিষেধের প্রাকার ভাঙ্গিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বাহির হউক। ইহারাই ভারতের ভরসাস্থল, ইহাদের দ্বারাই ভবিষ্যতে দেশের উদ্ধার হইবে।

মহাত্মা গান্ধী বলেন, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। কেবল ভাঙ্গিলেই গড়ে না। নবযৌবনের দল তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দ্বারা দেশে একটা বিপ্লব ঘটাইতে পারে, সন্দেহ নাই, তাহার প্রমাণ বিগত পঞ্চদশ বৎসরের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পাইতেছি। কিন্তু একবার প্রবৃত্তির রাশ ছাড়িয়া দিলে, তাহাকে সামলাইবে কে? এই জন্য তাঁহার মতে কর্ম্মীদিগের চরিত্র গঠনের জন্য সংযম শিক্ষা আবশ্যক, নব্য যুবকদিগকে অহিংসারূপ ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, তাহাদিগকে তীব্র সাধনা দ্বারা আত্মার শক্তি (soul force) সঞ্চয় করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে হয়ত বলিবেন,—ঐ সকল অহিংসা, সংযম, আত্মার শক্তি ইত্যাদির বিভীষিকাই আমাদের নব্যযুবকদিগকে আড়ষ্ট, অলস ও নিষ্কর্ম্মা করিয়া রাখিয়াছে। জলে না নামিলে কেহ সাঁতার শিখিতে পারে না। বাধা বিঘ্নের মধ্যে না পড়িলে কেহ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার শক্তিলাভ করিতে পারে না। ঐ দেখ পাশ্চাত্য দেশের লোকের যে আজ আকাশপথে ভ্রমণ সহজসাধ্য হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে কত শত সাহসী যুবকের কর্ম্মযজ্ঞে নিঃসঙ্কোচে জীবনাহুতি দেওয়ার সঙ্কল্প রহিয়াছে। এখনও উত্তরকুমেরু আবিষ্কার অথবা হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে আরোহণের জন্য কত কর্ম্মবীর মৃত্যু মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কত উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার শক্তি সঞ্চয় করা কেবল অর্ব্বাচীনের rashness অর্থাৎ গোঁয়ারতমির উপর নির্ভর করে না। সে জন্য একটা দীর্ঘকাল ব্যাপী শিক্ষা দরকার। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের নভোযান আবিষ্কার বহুদিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল। সেই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য তাঁহাদিগকে কত কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছে এবং নবাবিষ্কৃত যন্ত্রসকল পরীক্ষার জন্য জীবনকে তুচ্ছ করিয়া আকাশে উঠিতে হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যে soul forceএর কথা বলেন তাহাও এইরূপ কঠোর সাধনার ফল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার যাহা patient research (গভীর গবেষণা), জাতীয় জীবন গঠনে তাহাই আত্মশক্তি সাধনা। একজন উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র যুবক যেমন বৈজ্ঞানিক সাধনা করিতে অক্ষম, তাহার কার্য্য দ্বারা সমাজের বা জাতির উন্নতিও সুদূরপরাহত। যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে কিরূপে জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে? রবীন্দ্রনাথ কথায় কথায় নবীন যুবকদিগকে সমাজদ্রোহী হইতে বলেন, তাহার ফলাফল কি হইবে তাহা তিনি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় সবুজ সৈন্যগণের শিক্ষার জন্য যে উদ্দাম নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফল আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। উপন্যাসের পাত্রপাত্রিগণের মধ্যে "মন্ত্রপড়া বিবাহ"টা ভীষণ সামাজিক অত্যাচার বলিয়া গণ্য। বালিগঞ্জের চায়ের টেবিলে, পুরীর সমুদ্রতীরে অথবা দার্জ্জিলিঙের স্বাস্থ্য নিবাসে পরস্ত্রীর সহিত প্রেম করিয়া তাহাকে অতি সুসভ্য উপায়ে ঘরের বাহির করিয়া আনাই হইতেছে অধিকাংশ গল্প বা উপন্যাসের আর্ট। বৃদ্ধ পিতা-

মাতা বা গুরুজনের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া শিক্ষা-ব্যপদেশে বিলাত গমন এবং তথায় কোন শ্বেতাঙ্গীর সহিত স্বাধীন প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সন্তানোৎপাদন এবং স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া আপন সমাজের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করাই পরম-পুরুষার্থ। দেশোদ্ধারের মোহে আত্মপ্রতারণা পূর্ব্বক পঠদ্দশায় স্কুল কলেজ ত্যাগ এবং ধনী গৃহস্থদিগের গৃহে রিভলবার বোমা সাহায্যে নরহত্যা ও লুণ্ঠন দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া তাহা বিলাসব্যসনে ব্যয় করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

আমি একথা বলিতেছি না যে আধুনিক উপন্যাসাদিতে যে সকল বীভৎস সমাজ চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, আমাদের নব্যসমাজ ততদূর গভীর পাপপঙ্কে সত্যই কি নিমগ্ন হইয়াছে?

অথবা নব্যসমাজে যে সকল বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহা সবুজ পত্রের শিক্ষার ফল। আমার বক্তব্য এই, নব্যযুবকগণের উদ্দাম প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ বিধি নিষেধ মানিতে চাহে না; তাহাকে উৎসাহ দিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথে পরিচালিত করিলে তাহার ফল কখনও শুভ হইতে পারে না। ইংরেজীতে একটা প্রবচন আছে "One who sows wind will reap whirl wind",—ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

তাই আমার মনে হয়, মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে উদ্দামপ্রবৃত্তি সংযম করিয়া আত্মশক্তি লাভ করিবার জন্য হিংসা প্রবৃত্তি দমন করিয়া অহিংসা অভ্যাস করিবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত কল্যাণের পথ। এখন সমাজের যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের শক্তিসাধনার একান্ত আবশ্যক। সমাজের এই ঘোর দুর্দ্দিন দেখিয়া বঙ্গের আর একজন মনীষী বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর দুঃখের সহিত লিখিয়াছিলেন,—

"অমানিশার ঘোর অন্ধকার। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। শ্মশানক্ষেত্রের উপর দিয়া অট্টহাস সহকারে চপলা চমকিয়া যাইতেছে। ফেরুপাল বিকট চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। বীভৎসের সহিত ভয়ানকের মিশ্রণ হইয়াছে। গুরুদেব! কে এমন সময়ে শবসাধনে নিযুক্ত হইবে।

আমি বলিতেছি, তাঁহার নাম মহাত্মা গান্ধী।

—শক্তি—

অবুঝ্

(গল্প)

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

(১)

শশাঙ্ক যেদিন বলেছিল "মেয়ে মানুষের ভালবাসাকে যা'রা আগুনের সঙ্গে তুলনা করে থাকে, তা'রাই একে ঠিক বুঝেছে ; আগুনকে জ্বালিয়ে রাখ্‌তে হ'লে যেমন তা'র ইন্ধন চাই তেমনি মেয়ে মানুষের বুকে ভালবাসাকে জাগিয়ে রাখ্‌তে হ'লে নানা অবস্থায় তা'র নানা রকমের ইন্ধনের জোগান্ চাই, তা' না হ'লে সে যে নিবে যা'বে তা' নিশ্চয়ই।" তপন কিন্তু সেদিন শশাঙ্কের একথায় সায় দিতে পারেনি, বরং সে উল্টে বলেছিল "মেয়ে মানুষের ভালবাসা সম্বন্ধে তোমার কোন idiaই নেই, শশাঙ্ক। মেয়েমানুষ একবার যা'কে ভালবাসে, সমস্ত জীবন ভরেই সে তা'কে ভালবাসে ; —ইন্ধনের জোগান্ না পেলেও।" শশাঙ্ক কিন্তু সেদিন আর একথার প্রত্যুত্তরে বিশেষ কোন তর্ক করেনি শুধু মৃদু একটু হেসেছিল মাত্র।

মেয়েমানুষের বুকের ভালবাসা নিয়ে যে'দিন এই আলোচনা উভয় বন্ধুর মধ্যে হয়েছিল সেদিন কিন্তু তা'রা দু'জনেই ছিল অবিবাহিত। মেয়ে মানুষ সম্বন্ধে শশাঙ্কের ধারণা কিন্তু কোনদিনই উঁচু ধরণের ছিল না। সে যখন তখন বল্‌ত "Maidens like moths are caught by glare" তপন কিন্তু কোন দিনই এ কথাটাকে প্রশ্রয় দেয়নি! অমিয়ার কুমারী হৃদয়ের ভালবাসায় যেদিন তা'র তরুণ অন্তর স্নান করে উঠেছিল সেদিন থেকেই তা'র নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অন্ত ছিল না।

(২)

অমিয়ার সম্মতি নিয়ে সেদিন তপন যখন তা'র পিতা মাতার কাছে প্রস্তাব করলে তখন নিতান্তই দুঃখের সহিত তাঁ'রা জানালেন যে এ বিয়ে হ'লে বাস্তবিকই তাঁ'রা খুব খুশী হ'তেন কিন্তু কি করবেন উপায় নেই। তাঁ'দের কোন এক মৃত বন্ধুর ছেলের সঙ্গে অমিয়ার বিয়ে দেবেন বলে তাঁ'রা তাঁ'র কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে এখন বিলাতে কিন্তু ফিরে এলেই সব ঠিক হয়ে যা'বে।

তপন সেই যে সেদিন অমিয়ার সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছিল আর কোনও দিন সেখানে যায় নি। শরীরের গতিটাকে প্রতিহত করে রাখলেও সে মনের গতিটাকে কিন্তু কিছুতেই সংযত করে উঠ্‌তে পারছিল না। আপনার বিরুদ্ধে আপনি লড়াই করে এই যে মনে মনে নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত হওয়া এযে কত বড় অস্বস্তিকর তা' যে নিজে এ অবস্থায় না পড়েছে সে কিছুতেই এ বুঝতে পারবে না। তপন তা'র নিতান্ত অস্থির মনটাকে বায়স্কোপ দেখার আনন্দের মধ্যে ডুবিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল।

সেদিন পিক্‌চার হাউসের বাইরে বেরিয়েই তপন দেখলে সামনেই অমিয়াদের মোটর। মোটরটাকে অতিক্রম করে যাবে ব'লে যেমনি সে পা বাড়িয়েছে অমনি পিছন থেকে কে একজন তার কোমল হাত দুখানি দিয়ে তার একখানা হাত আস্তে চেপে ধরলে। তপন ফিরে চেয়ে দেখলে অমিয়া।

"আমি কি করব তুমি বলে দাও তপুদা"

পথের উজ্জ্বল আলোতে তপন বেশ স্পষ্টভাবেই দেখতে পেলে অমিয়ার ডাগর চক্ষুদুটী অশ্রুজলে টল্ টল্ করছে। তপন যে কি বলবে তা' সে ভেবেই পেলেনা; শুধু বিস্মিত কণ্ঠে উত্তর দিলে "আমি বলব!"

"হ্যাঁ; তুমি—তুমিই বল্‌বে।"

তপনের বুকের রক্ত তখন এক উন্মাদ রাগিনীতে বেজে উঠছিল। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে "আজ আর তোমাকে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই অমু। তুমি শুধু এইটুকু জেনে রেখ যে তুমি যা করা উচিত বলে মনে করবে তাতে আমার আপত্তি কোন কালেই

থাকবে না। বলেই সে অমিয়ার মুখ থেকে একটা কথাও শোনবার অপেক্ষা না করেই হন্ হন্ করে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল।

(৩)

মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শরীর কোনদিন জয়ী হতে পারে নি। তপনেরও তাই হ'ল। শরীর ক্রমশঃই ভেঙে পড়তে লাগল। শেষে বছর চারেক পরে ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টায় সে মুসৌরী চলে গেল। সেখানে সে যে বাড়ীটায় থাকত তার ঠিক সামনেই খুব খানিকটা খোলা মাঠ। অদূরের পাহাড়টা তার বারান্দা থেকে বেশ স্পষ্ট ভাবেই দেখা যেত। স্থানটা খুব নির্জ্জন; তপনের বাড়ীর পাশেই যে আর একটা প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল সেটাও জনপ্রাণী শূন্য।

সেদিন যখন কি একটা কাজে সে বারান্দা পার হয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল পাশের বাড়ীটার একটা জানালার উপর। সেখানে একটী মেয়ে ছোট্ট একটী খোকা কোলে করে দাঁড়িয়েছিল। তপনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই মেয়েটীর গোলাপ ফুলের মত সুন্দর মুখখানা একেবারে পাংশু বিবর্ণ হয়ে উঠল। সে ঝনাৎ করে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে সরে গেল।

তপন বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। অমিয়া এখানে এ বাড়ীটায় এত কাছে কবে এল! এ যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সে এসেছে বটে কিন্তু ব্যবহারে তার একি পরিবর্ত্তন! কতদিনের পরে দেখা...অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেও তার প্রবৃত্তি হ'ল না!......

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল রাত্রি ক্রমশঃই বেড়ে চলছিল। তপনের ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্তই যেন একটা তিক্ত বিতৃষ্ণায় শুষ্ক হয়ে গেল। মাথার ভিতর একটা উগ্র উত্তেজনা ক্রমশঃই তাকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল। শেষে সে আর চুপ করে বসে থাকতে না পেরে বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল।

ঘরের ভিতরের ঘড়িটায় যখন টং টং করে দশটা বেজে গেল তপন তখন শ্রান্ত হয়ে তার বারান্দার কোণের ইজি চেয়ারটায় শুয়ে পড়ল। চাঁদের আলোয় চারিদিক তখন ভেসে যাচ্ছিল। কি একটা নাম না জানা পাখী অদূরস্থ কোন একটা ঝোপের বুক থেকে চাঁদের আলোর বন্দনা গাইছিল।

হঠাৎ দৃষ্টিটা সেই পাশের বাড়ীটার জানালার উপর পড়তেই তপন দেখতে পেলে জানালাটা একেবারেই খোলা। সেই খোলা জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলোয় সমস্ত ঘরখানা একেবারে ভরে গিয়েছিল। তপন দেখতে পেলে জানালার ধারেই যে বিছানাটা ছিল তারই উপরে একটী ছেলে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। ছেলেটীর পাশেই সেই নবজাত শিশুটী। আর মেয়েটী সেই ঘুমন্ত ছেলেটীর পা দু'টী তার বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে তার উপরে তার মুখখানি রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছে। কান্নার ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দটাও সেই নিস্তব্ধ রাত্রে তপন বেশ স্পষ্টভাবেই শুনতে পেলে।

অমনি করেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। তপনের ঘরের ভিতরের ঘড়িটায় টং টং করে এগারটা বাজল। হঠাৎ ছেলেটীর ঘুম ভেঙে গেল। তার পায়ের তলায় মাথা গুঁজে মেয়েটীকে অমনি করে কাঁদতে দেখে সে তাড়াতাড়ি তাকে আদর করে তার বুকের উপর তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কাঁদছ কেন অমু?"

মেয়েটী কোন উত্তর না দিয়ে ছেলেটীর বুকের ভিতরে মুখখানাকে চেপে ধরে তেমনি করেই ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। শেষে অনেকক্ষণ পরে ছেলেটীর কথার উত্তরে মেয়েটী বললে "আমার বড় ভয় করছে। চল এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাই।"

ছেলেটী বল্লে "ভয় কি? আমি রয়েছি।"

মেয়েটী বল্লে "না, তা' হোক। তবু চল এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাই আমরা। এ বাড়ীতে থাকলে আমি আর বাঁচবো না গো।"

ছেলেটী হেসে বল্লে "এই রাত্রেই কি এ বাড়ী ছাড়তে হ'বে?"

মেয়েটী জেদ করে বল্লে "হ্যাঁ।"

ছেলেটী তেমনি হেসে আদর করে মেয়েটীর মাথাটা

বুকের প'রে আস্তে একটু চেপে ধরে বল্লে—"পাগল আর কি!"

মেয়েটী অভিমানভরে ছেলেটীর বুক থেকে মাথা তুলে নিয়ে বল্লে "এ বাড়ী ছাড়বে না তুমি তা হ'লে?"

ছেলেটী বল্লে "ছাড়ব বই কি। কিন্তু আজই এই রাত্রে কি তা সম্ভব? কাল সকালেই ছাড়ব।"

মেয়েটী অবসন্নের মত ছেলেটীর বুকে আবার ঢুলে পড়ল।

তপনের আর বেশীক্ষণ তা' দেখতে প্রবৃত্তি হ'ল না। সে ধীরে ধীরে তার ঘরে এসে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল।

(৪)

পরদিন প্রাতে ঘুম থেকে উঠেই তপন বারান্দায় এসে দেখলে পাশের বাড়ীর ভাড়াটেরা বাসা বদল করে কোথায় উঠে যাচ্ছে। সে স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার কেবলই মনে পড়তে লাগল কলকাতায় থাকার সময়ে বছর চারেক আগে শশাঙ্ক একদিন যে কথাটা তাকে বলেছিল "মেয়েমানুষের ভালবাসাকে যারা আগুনের সঙ্গে তুলনা করে থাকে তারাই একে ঠিক বুঝেছে; আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে হ'লে যেমন তার ইন্ধন চাই তেমনি মেয়েমানুষের বুকে ভালবাসাকে জাগিয়ে রাখতে হলে তার নানা অবস্থায় নানা রকমের ইন্ধনের জোগান চাই তা' না হলে সে যে নিবে যাবে তা নিশ্চয়ই।"

তপনের মনে হ'ল আজ যেন তার সকল ভ্রান্তির শেষ হয়ে গেল।

নিদ্রা

[শ্রীজগদীশচন্দ্র মজুমদার এম্‌·এ বি-এল্‌]

জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাল আমরা নিদ্রায় অতিবাহিত করি। সুতরাং নিদ্রা সম্পর্কে একটু আলোচনা করা খুব অন্যায় হইবে না। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের শরীর সর্ব্বদা ক্ষয় পাইতেছে। শরীরের ক্ষয় পূরণ ও পেষনের নিমিত্ত, ও মস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্য নিদ্রার দরকার। দৈনিক কয় ঘণ্টা নিদ্রা অবশ্যক তাহা আমাদের জানিতে হইবে। ডাক্তারগণ কত বয়সে কয়ঘণ্টা নিদ্রা আবশ্যক, তাহা মোটামুটী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ মোটামুটী সত্য, কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ঠিক খাটিবে কি না বলা যায় না। দেখা যায়, শিশু ও দুর্ব্বল লোকদের অধিক নিদ্রার দরকার। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যথেষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপর তাহার নিদ্রার পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। সমবয়স্ক দুই জনের মধ্যে এক জনের একঘণ্টা নিদ্রা কম হইলেও চলিতে পারে, অপর জনের একঘণ্টা বেশীও লাগিতে পারে। তারপর পূর্ব্বদিনের কৃত কাজের দরুণও নিদ্রা বেশী বা কম দরকার হইতে পারে। পূর্ব্বদিনে অধিক ও কঠোর কাজ করিলে রাত্রে ক্ষয় পূরণের জন্য অধিক নিদ্রা আবশ্যক হইবে। ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে কত ঘণ্টার নিদ্রা আবশ্যক তাহা তাহার বয়স, শারীরিক অবস্থা ও দৈনিক কৃত কার্য্যাদির উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বুঝিতে পারিবে।

এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা যাইতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, শরীর যতটুকু নিদ্রা চায় তাহাতে কার্পণ্য করা সঙ্গত নয়। কোন রাত্রিতে ঘুম না হইলে তৎপর দিবস কাজে কোনই উৎসাহ থাকে না,

দিনটাই এক প্রকার বৃথা নষ্ট হয়। সুতরাং রাত্রিতে যাহাতে সুনিদ্রা হয় তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

কি প্রকারে সুনিদ্রা হইতে পারে? সুনিদ্রার জন্য শয়নকক্ষ স্বাস্থ্যকর হওয়া দরকার, বিছানাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত ও নিদ্রা সম্পর্কেও কতকগুলি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলা আবশ্যক। এই বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নিম্নে আমরা এক একটী করিয়া সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

(১) বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কুঠুরীতে বা ঘরে বিছানা রাখিতে হইবে। দুবেলা ঘরটাকে পরিষ্কার করিতে হইবে। আসবাব প্রভৃতি জিনিষ দ্বারা ঘরটীকে পূর্ণ করা সঙ্গত নহে। যত কম জিনিষ শয়ন গৃহে রাখা যায় ততই মঙ্গল। মৎস্য যেমন জলের জীব, মানুষও সেইরূপ বায়ুর জীব, সর্ব্বদা এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। বায়ুই মানুষের জীবন, বায়ু ব্যতীত মানুষ এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা মানুষ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ বায়ু চায়। সুতরাং যাহাতে শয়ন কক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে পারে এইরূপ বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। দিনের বেলা সমস্ত দরজা ও জানালা খোলা রাখিবে ও রাত্রিতে দুই একটা জানালা খোলা রাখিবে, যেন প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বদা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে পারে। দিনের বেলা সূর্য্যের আলো যাহাতে শয়ন গৃহে প্রবেশ করে, তাহার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। উক্ত আলো জীবাণু নষ্ট করে।

(২) আমাদের বিছানা এমন হওয়া চাই যেন সহজে তাহা ধৌত করা যায়। সর্ব্বদা ত্বক্ দ্বারা ময়লা বাহির হইয়া থাকে। ঘুমের সময় মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হয় ও রক্ত ত্বকের নিম্নে অধিকতর সঞ্চালিত হওয়ায় ময়লা অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া থাকে। সহজেই শরীরের ময়লায় বিছানা দূষিত হয়। মাঝে মাঝে বিছানা ধৌত না করিলে তাহা শীঘ্রই অস্বাস্থ্যকর হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যহ বিছানা গুলি রৌদ্রে দেওয়া উচিত, ইহাতে অনেক জীবাণু নষ্ট হয়।

(৩) রাত্রিতে বাতাস শীতল থাকে, শারীরিক যন্ত্রগুলিও তখন বিশ্রাম করে। এই অবস্থায় শরীর কিছু গরম রাখার জন্য একখানা বস্ত্র শরীরের উপর রাখা উচিত। বস্ত্রখানা এইরূপ হওয়া উচিত যেন বাতাস সহজে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। আমরা বায়ুর জীব—সর্ব্বদা বায়ু আমাদের সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ করা আবশ্যক।

(৪) রাত্রিতে ভোজনের অব্যবহিত পরেই শয়ন করিতে যাইবে না। খাবার দুই তিন ঘণ্টা পরে শয়ন করিবে, তাহা না হইলে হজম করিতে অসুবিধা হইবে। অধিকন্তু রাত্রিতে স্বপ্নাদি দেখিতে হইতে পারে। স্বপ্ন সুনিদ্রার ব্যাঘাতকারী।

(৫) ঘুমানোর সময় এক গ্লাস জল খাইয়া শয়ন করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ইহাতে সহজে ঘুম আসে, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস প্রভৃতির কাজ ভাল চলে ও শরীরস্থ ময়লা বাহির করিবার পক্ষে সাহায্য করে। জল খাওয়ারও একটি নিয়ম আছে; একেবারে এক চুমুকে খাওয়া খুব উপকারী নহে, একটু একটু করিয়া চা খাওয়ার মতন গ্লাসের জল খাইতে হইবে।

(৬) নিদ্রায় কখন যাইবে ও ঘুম হইতে কয়টায় উঠিবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবে। অভ্যাস থাকিলে কিছুতেই কষ্ট লাগিবে না। রাত্রে দশটা কি সাড়ে দশটায় শয়ন করিবে।

দুপুর রাত্রের পূর্ব্বের একঘণ্টা ঘুম, পরের দুইঘণ্টা ঘুমের চেয়ে বেশী উপকারী ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

(৭) পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, ঘুমের প্রথম তিন ঘণ্টা খুব ভাল ঘুম হয়, তারপর পাতলা ঘুম হয়। সুতরাং ঘুমের প্রথম অবস্থায় কাহাকেও বিশেষ আবশ্যক না থাকিলে জাগ্রত:করা উচিত নয়।

(৮) রাত্রিতে চিৎ হইয়া শয়ন করা অনেকের মতে ভাল। ইহাতে খুব শীঘ্র ঘুম আসে। এত সহজে অন্য কোন অবস্থায় ঘুম আসে না। এইরূপ শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাসে ও রক্তসঞ্চালনে কোন অসুবিধা হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন চিৎ হইয়া শয়ন করিলে

রাত্রিতে স্বপ্ন হয়। তাঁহারা দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করিতে উপদেশ দেন। কখনও বাম পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করিবে না। ইহাতে হৃৎপিণ্ডের কাজ ভাল হয় না, এবং পাকস্থলীর উপর যকৃতের চাপ পড়িয়া পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

(৯) বালিশ খুব উঁচু করিবে না, উঁচু বালিশে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলে রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়।

আমরা এই পর্য্যন্ত কি প্রকারে ঘুমাইলে সুনিদ্রা হয় তাহা বলিয়াছি। কিন্তু অনেকে মাঝে মাঝে অনিদ্রায় খুব কষ্ট পান। আহার না করিয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, কিন্তু নিদ্রা না হইলে অল্প কয়দিনের মধ্যেই মানুষ মারা যায়। এক দিন কোন কারণে নিদ্রা না হইলে তৎপর দিন শরীর ও মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। দু'চার দিন একাদিক্রমে ঘুম না হইলে, শরীর ও মন এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ; শরীর কিছুতেই ভাল লাগে না, মন কিছুই ঠিক করিতে পারে না ; বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি হ্রাস হয়। এইরূপ কয়দিন চলিলে মৃত্যু অনিবার্য্য ! সুতরাং অনিদ্রার উপদ্রব উপস্থিত হইলে কিরূপে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। নিম্নে কয়েকটি কথা এই সম্পর্কে বলা যাইতেছে। আশা করা যায়, অনেক অনিদ্রাগ্রস্ত ব্যক্তি তাহা হইতে উপকার পাইবেন।

(১) যদি সহজে ঘুম না আসে তাহা হইলে মনকে খালি রাখিতে চেষ্টা করিবে ; মন হইতে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা তাড়াইবে, কোন চিন্তা মনে উদয় হইলেই তাহাকে ভিতরে অবস্থান করিতে বাধা দিবে। অভ্যাস করিলে ইহা সহজ-সাধ্য। আবার শয়ন করিয়া পুনঃ পুনঃ একটী বিষয় চিন্তা করিলেও সহজে ঘুম আসে। এই উভয় উপায় দ্বারাই মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত বা দুর্ব্বল হয়। তখন সহজে ঘুম আসে।

(২) ঘুমের সময় মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হয়। অতএব যাহাদের ঘুম হয় না, তাহারা যাহাতে শয়ন করিলে মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। যে সকল কাজে মন চঞ্চল বা উদ্বিগ্ন হইতে পারে, এইরূপ কোন কাজ করিবে না ; সর্ব্বদা শান্ত ও ধীর থাকিতে চেষ্টা করিবে।

(৩) রাত্রে হালকা (লঘু) আহার করিয়া ঘুমাইবে। ইহাতে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত পাকস্থলীতে আসিবে ও মস্তিষ্কে রক্তাল্পতার দরুণ সহজেই ঘুম আসিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে ঘুমের পূর্ব্বে পূর্ণ (গুরু) আহার করিলে অপাক হইবে ও স্বপ্নাদির দ্বারা নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে।

(৪) শরীর গরম কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া শয়ন করিলেও সহজে ঘুম আসিবে, কারণ ইহাতেও মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হইবে।

(৫) আলোর ঘুম ভাঙ্গার শক্তি আছে। সুতরাং যাঁহারা অনিদ্রায় কষ্ট পান, তাঁহারা রাত্রে ঘুমানোর সময় জানালা ভালরূপ বন্ধ করিয়া ঘুমাইলে কতক উপকার পাইতে পারেন। ঘরে আলো প্রবেশ করিতে না পারিলে তাঁহাদের ঘুম অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে।

(৬) রীতিমত ব্যায়াম করিবে, ইহাতেও ঘুমের সহায়তা করে। যাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা কোন-রূপ ব্যায়াম করা অসুবিধাজনক মনে করিলে, অন্ততঃ দুই বেলা কিছু সময় হাঁটিয়া বেড়াইবেন। যুবকগণও ব্যায়ামের পরিবর্ত্তে রীতিমত দুইবেলা হাঁটার অভ্যাস করিতে পারেন।

"স্বাস্থ্য-সমাচার"

আমরা কি বিদেশী

[৺পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়]

আমরা বিদেশী। ভারতবাসী আর্য্য ভারতের সন্তান নহে, ভারত তাঁহাদের মাতৃভূমি নহে। মধ্য আসিয়ার ভ্রমণশীল অসভ্য বর্ব্বর হিন্দুকুশ শিখর হইতে অবতরণ করিয়া পঙ্গপালের ন্যায় ভারতে আপতিত হইয়াছিল। ইহারাই আদিম আর্য্য। পরস্বাপহারক, পররাষ্ট্রলুণ্ঠনপটু তাহারা ভারতীয় কোল, ভিল সাঁওতালগণকে দেশছাড়া, রাজ্যছাড়া' এবং ভিটাছাড়া, করিয়া এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে স্বায়ত্বাধীন করিল। এই পরাজিত, প্রপীড়িত আদিম নিবাসীগণ বিজেতার দৌরাত্ম্যে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল; যাহারা পলাইতে পারে নাই তাহারা দাসত্ব স্বীকার করিয়া আর্য্যগণের সেবায় রত রহিল। ইহারাই শূদ্রগণের পূর্ব্বপুরুষ। আর বর্ব্বর বিজেতা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতির পূর্ব্বপুরুষ। "পাশ্চাত্য' নবাবিষ্কৃত' শিশু ভাষা-শাস্ত্র হইতে আমরা আমাদের এই পরিচয় পাইলাম। কেবল আমাদেরই নহে; ইংরাজ জার্ম্মণ, পারসীকাদি সকল সুসভ্য জাতিরই এই জন্মবৃত্তান্ত। পরিচয়টি নব্যগণমান্য হইলেও, আমাদের মধ্যে অনেয়কই বোধ হয়, সংসারে এ পরিচয় দিতে নারাজ হইবেন! বাস্তবিক কথাটা যেন কানে ঠেকে। দেখা যাউক, এ জন্ম-কোষ্ঠী পাশ্চাত্যগণ কোথা হইতে পাইলেন।

যে দিন হইতে য়ুরোপবাসী সংস্কৃতভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন- উইলসন, কোলব্রুক সার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি মহোদয়গণ যখন অর্য্যাশাস্ত্র মন্থন করিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহারা য়ুরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতভাষায় আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিয়া চমকিত হন। মন্থন-ব্যাপার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া চলিতেছিল। শেষে গ্রিম বপ গোল্ডষ্টকর অধ্যাপকগণ এই নবীন বিজ্ঞান আবিষ্কৃত করেন। আমাদের ম্যাক্সমলারও আরও কত হলাহল উত্থিত করিয়াছেন। আধুনা এই বিজ্ঞান শাস্ত্র বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংসারের ঘটক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সকল জাতিরই বংশের খবর বলিতে পারে। এই অভিনব শাস্ত্র বলেন যে:—যেহেতু পৃথিবীর অনেক গুলি ভাষার মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, বৈয়াকরণ প্রথায়, বাক্য বিন্যাস প্রণালীতে, শাব্দিক আকারে এবং অর্থে অনেক সাদৃশ্য আছে; অতএব যে কয়টি ভাষার মধ্যে অধিক ঘনিষ্ঠতা তাহারা একজাতীয়। এবং যাঁহারা এই সব সদৃশ ভাষা বলিয়া থাকেন, তাহারা অবশ্য আত্মীয় এবং একজাতিয়। সেই জন্য তাঁহাদের জন্মভূমিও পূর্ব্বে একস্থানে ছিল, এখন ছড়াইয়া পড়িয়াছেন! এই হিসাবে মানুষ আর্য্য' তুরাণী, সেমিতি এবং হাবসী জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। সকল মানুষই এই চারি জাতির মধ্যে একজাতীয়। হিন্দু, ইংরাজ, ফরাসিস, পারস্য দেশীয় মুসলমান, কাবুলীরা একজাতি—আর্য্য! এই আর্য্যগণ বহুপূর্ব্বে মধ্য আসিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুদিন তথায় বাস করেন; পরে সংসারে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

কথাটা মহা মহা পণ্ডিতের উক্তি, সুতরাং তাহা কাটিতে ভয় হয়। কিন্তু একজাতি না হইলে, একস্থানে বাস না করিলে যে এক প্রকার ব্যবহার-সাদৃশ্য বা ভাষা-সাদৃশ্য হয় হয় না, এমন কিছু কথা নহে। অন্য কারণও থাকিতে পারে। আমরা সেই সব কারণের উদ্ভাবনা এবং আলোচনা করিবার জন্য আজ এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

দেখা গিয়াছে যে সমভাবে এবং একাবস্থায় যদি দুইটি জীব উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রকৃতি, গতি ও স্থিতি প্রায় এক প্রকার হইয়া থাকে। কারণ, জীব উৎপন্ন কালেই একটি প্রকৃতিকে অবলম্বন করে, ঐ প্রকৃতিই উহার গতি ও স্থিতিকে নিয়মিত করে এবং সৃষ্ট জগতে উহার জাতি ও স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় ভ্রূণ জরায়ুতে মানবী প্রকৃতি অবলম্বন করিলে পর, তাহার মনুষ্যোপযোগী শরীর সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। যদি দুইটি ভ্রূণ এক জরায়ুতে, এক প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া তদনুযায়ী পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রায় সকল

বিষয়েই এক হয়। মানুষের এক প্রকৃতি, সকলেই একভাবে উৎপন্ন হয় ; তাই মনুষ্য মৌলিকতায় এক। গতি ও স্থিতি সকল মানুষ্যেরই প্রায় এক রকমের। শব্দ গতির একটি শারীরস্ফুরণ মাত্র। ভাষা ঐ শব্দ-সমবায়ের একটি যান্ত্রিক ক্রিয়া। সুতরাং মানব মাত্রেরই এক ভাষা হওয়া উচিত। তবে কেন ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মনুষ্য মধ্যে ভাষার পার্থক্য দেখি ? বিচিত্রতাময়ী প্রকৃতিই (বাহ্য প্রকৃতি) এই বৈষম্যের মূলীভূত কারণ। সত্য বটে জাতীয়ত্বের নিয়মানুযায়ী সকল মনুষ্যই সকল বিষয়ে এক হওয়া উচিত ; সিংহ ভারতেও যেমন, আফ্রিকাতেও তাই। কিন্তু মনুষ্য-সৃষ্টি-কৌশলের এইটুকু বাহাদুরী, মানুষ সৃষ্ট জীব হইয়া যেন স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত। কথাটা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল, একটু সরলভাবে বুঝা যাউক। দেশের জলবায়ু, শীতোষ্ণতা এবং স্বাভাবিক স্থিতি ও ঋতু দ্বারায় মানুষের অনেক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটে। বস্তুতঃ মানুষের (সকল জীবেরই) দুইটি প্রকৃতি আছে। প্রথম জরায়ুজ অর্থাৎ মৌলিক প্রকৃতি—মানবী ধর্ম্ম, যাহা না থাকিলে মানুষ হওয়া যায় না ; দ্বিতীয় হৈতুকী প্রকৃতি—অর্থাৎ দেশোপযোগী যে আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে, যদ্দারায় হিন্দুর হিন্দুত্ব, ইংরাজের ইংরাজত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে, যাহা না থাকিলে বৈষম্য থাকে না, বিচিত্রতার মুল, তাহাই হৈতুকী প্রকৃতি। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারায় এ কথাটা আর একটু সহজ ভাবে বুঝা যাউক। ইংরাজ ও কাফ্রি দুইজনেই মানুষ। ইংরাজের মধ্যে মৌলিক মানবী প্রকৃতি যতখানি বিকসিত, কাফ্রিতেও প্রায় ততখানি। ইংরাজও যেমন আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন, কাফ্রিও তদ্রূপ। কিন্তু তত্রাচ হাবসী ও ইংরাজ আকাশ পাতাল তফাৎ। শিশু জন্মগ্রহণ করিবার সময়ে সকল শিশুই এক, কিন্তু তাহার পরেই বৈষম্য স্থাপিত হয়। মৌলিক প্রকৃতির পার্শ্বেই বৈষম্যের আকর হৈতুকী প্রকৃতি জড় হইতে থাকে – অর্থাৎ জন্মভূমির জল বায়ু, আচার ব্যবহার, শিক্ষাদির সমষ্টি ভাব মাত্র তাহাতে সঞ্চিত হয়। ইংরাজ ইংলণ্ডে জন্মিয়াছে, তাই সে ইংরাজ, হাবসি আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাই সে মনুষ্যাধম নিগর্। আফ্রিকার জন্মিয়াছে তাই বালিকা কদর্য্য কাফ্রিনী, ইংলণ্ড জন্মভূমি তাই সে ধরাসুন্দরী মেরি ষ্টুয়ার্ট। দোষ দেশের, দোষ জলবায়ুর। মৌলিক প্রকৃতিতে ছাঁচটি ঠিক করিয়া দেয়, হৈতুকী তাহা চাঁচিয়া ছুলিয়া মনের মত করে, তাহার উপর রসান দিয়া, মনোমুগ্ধকরী করিয়া দেয়। মৌলিক প্রকৃতিতে মনুষ্যের মনুষ্যত্বকে পশুত্ব হইতে পৃথক করে, হৈতুকী তাহার আভরণ যোগায়। মৌলিক প্রকৃতি খড়, মাটি, জল ও একমেটে মূর্ত্তি ; হৈতুকী তাহার দো-মেটে, তাহার রং—পুতুলের ডাকের সাজ-সজ্জা! ইংরাজীতে হৈতুকী প্রকৃতিকে কখনও accident বলিয়া থাকে। ইংরাজ ভারতে অনেক দিন থাকিলে ক্রমে তাহার রং কালো হয়, একটু একটু করিয়া আচার ব্যবহার ও বিকৃত হইয়া পড়ে—এমন কি দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাহার ইংরাজত্ব ঘুচিয়া যায়। তখন ইংরাজের হৈতুকী প্রকৃতি ভারতীয় হইয়া পড়ে, ভাষা উল্টাইয়া যায়, ভাব বিকৃত হয়। তখন ইংরাজের জিহ্বা 'ত' 'ট' র বিভিন্নতা বুঝিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ভাষা একটি যান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র। ভাষা, ছোট ছোট, সামান্য সামান্য শব্দ ক্রিয়াগুলির সমষ্টি বৃহৎ ক্রিয়া—শব্দ সমবায়ে বাক্যন্ত্রে ভাবের সমুদ্ভাবনা। অতএব যান্ত্রিক বিভিন্নতানুযায়ী শব্দোচ্চারণ প্রণালীও বিভিন্ন হইয়া পড়ে। হিন্দুর নাদ, স্বর ও রব যতটুকু পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া যে ভাবে ধ্বনিত হইবে, ইংরাজের ঠিক সেই ভাবে সকল ক্রিয়া হইলেও যান্ত্রিক পার্থক্য বশতঃ সব উল্টাইয়া যাইবে। মনে করুন দুইজন ইংরাজ ও হিন্দু পথিক মরুপ্রান্তে ভ্রমণ করিতেছে। দুইজনেই তৃষ্ণার্ত্ত—দুইজনই জলের জন্য কাতর ; কিন্তু ইংরাজ প্রাণের জ্বালায় বলিয়া উঠিল 'ওয়াটার' (water). হিন্দু যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া বলিল 'উদক'। দুই জনেরই মনোগত ভাব এক, এক আবেগেই দুইজন শব্দোচ্চারণ করিয়াছে, তবে একজনের জিহ্বা 'ওয়াটার' শব্দিত করিল, আর একজন 'উদক' বলিল কেন ? একটি শব্দ উচ্চারণ করিতে অনেকগুলি ক্রিয়া হয়। মানসিক ইচ্ছা স্নায়ুমণ্ডলে গিয়া আঘাত করে—মস্তিষ্ককে কেমন যেন একটু উদ্রিক্ত করে—স্নায়ুপর্ব্বগুলিকে যেন একটু কাঁপাইয়া দেয়। এই কম্পনে বা উদ্রেকে একটি যন্ত্রের (Energy) উৎপত্তি হয়—যাহাকে ভগবান্ পাণিনি আভ্যন্তর প্রযত্ন বলিয়াছেন।

আভ্যন্তর প্রযত্ন যে আবেগে (Intensity) বাক্‌যন্ত্রকে উদ্বেলিত করিবে, ঠিক ততখানি পরিমাণে উহার বিবৃতি (expansion) এবং সংবৃতি (contraction) হইবে। এই বিবার, সম্বার অনুযায়ী বায়ু কণ্ঠনালী হইয়া, তালু, মূর্দ্ধণ্য অথবা অন্য কোন উচ্চারণ স্থানে আঘাত করিবে। এই আঘাতে জিহ্বা যে ভাবে নিপীড়িত বা সঙ্কুচিত হইবে, শব্দ ঠিক সেই ভাবে উচ্চারিত হইবে। শিশুকে যখন'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে বলা যায়, তখন সে যতটুকু প্রযত্ন করিয়া কথাটি উচ্চায়ণ করিবার উদ্যোগ করিবে, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই প্রায় ততখানি যত্ন করিয়া থাকেন; সমান যত্ন সকলেরই ব্যয়িত হয়। তবে যান্ত্রিক সংশ্রবের ব্যাপার কিছু বিভিন্ন হইয়া পড়ে। বালক 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে যেটুকু চেষ্টা করাতে তাহার ফুলটির মতন কচি বাক্‌যন্ত্রখানি মুকুলিত (সংবৃত) বা প্রস্ফুটিত (বিবৃত) হইল, হয় ত তাহার চেয়ে আর একটু সংবৃতি ও বিবৃতি অধিক না হইলে 'রাম' উচ্চারণ হয় না। তা ছাড়া রসনা দেবী যে রীতিতে বায়ু বেগাঘাত বারণ করিবেন সেই প্রকারেই শব্দের জ্যোতি বিকশিত হইবে। অথবা জিহ্বার ক্রিয়া দোষে এক বর্ণ উচ্চারণ করিতে তাহার সবর্ণ উচ্চারিত হইবে; যেমন বালকের কাছে 'রাম' 'লাম' হইয়া গেল। এইরূপেই 'রামের' 'লামত্ব' হইতে, 'পিতৃ' শব্দের 'ফাদারত্ব,' 'দুহিতৃ'র 'ডটারত্ব' এবম্বিধ ভাষার পার্থক্য সংস্থাপিত হয়। কি নিয়ম প্রণালীতে এই বিভেদ ঘটে তাহা বাক্‌বিজ্ঞান অন্তর্গত কথা। যে দেশের লোকের জিহ্বা বেশী মোটা, তালু স্থূলতর, তাহাদের ভাষা পৃথক্ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? তত্রাচ এই বৈষম্যের মধ্যে একটু ভাবের, একটু উচ্চারণ প্রণালীর সাদৃশ্য দেখা যায়। দুই জাতির মধ্যে যতখানি সাদৃশ্য তাহাদের মধ্যে শারীর, হাস্ত্রিক ও ব্যবহারিক ঐক্য বা আত্মীয়তা ততখানি থাকিবে। মূলে সকলেই এক হইলেও হৈতুকী প্রকৃতির জন্য এত বৈষম্য ঘটে। যেমন জলপ্রপাত হইতে জল পড়িবার সময়ে সকল জলই সমান; কিন্তু ভূমি সংস্পর্শে উহা বিক্ষিপ্ত হইয়া নানা দিগদশে প্রধাবিত হয়, এবং ভূমি গুণে নানাভাবে সরল, বক্র হইয়া, মধুর বা ক্ষারস্বাদযুক্ত হইয়া ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন নদী হইয়া প্রবাহ হয়, পরে সকলই মহাসমুদ্রে একভাবে পতিত হইয়া মিশিয়া যায়, তেমনি মানুষও যখন শুক্র, কৃমি এবং রক্তাণু সংযুক্ত হইয়া মানবী প্রকৃতি অবলম্বন করে তখন সকল মানুষই এক। কিন্তু মাতৃ-গর্ভানুযায়ী, ঔরস গুণে সাদা, কালো বা তাম্র রঙের হইয়া, শান্ত দুষ্ট বা উদ্ধত হইয়া, অথবা মাতৃভূমির গুণে তেজস্বী, অধ্যবসায়শীল বা সুসভ্য হইয়া, নানা জাতি হইয়া, নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকম লীলাখেলায় প্রবৃত্ত থাকিয়া পরে সকলেই সেই এক মহাকালসমুদ্রে নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দেয়। জলবিম্ব জলে উঠিল, দিনকর-কররঞ্জিত হইয়া, কত ভঙ্গে, কত রঙ্গে, হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া মন ভুলাইয়া শেষে সেই মহাসমুদ্রে আবার গলিয়া গেল।

আমরা একরকম করিয়া দেখাইলাম কেন ভাষার পার্থক্য হয়। এখন আর একটি কথা আলোচনা করিতে বাকি রহিল। ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন যে আর্য্যগণ পূর্ব্বে মধ্য আসিয়ায় বাস করিতেন—সেইটিই তাঁহাদের আদিম জন্মভূমি। তথায় তাঁহারা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেই মৌলিকভাষার ছেলেপুলে আধুনিক ইংরাজী, বাঙ্গালা, ফ্রেঞ্চ, পৌরাণিক, সংস্কৃত, লাতিন, গ্রীক ইত্যাদি। আমরা ভাষা-পার্থক্যের যে কারণ দেখাইলাম তাহাতে মানুষকে যে একস্থানে জন্মিতে হইবে এমন কিছু বাধ্য বাধকতা নাই। ভাষা ভাবের যান্ত্রিক সমুদ্ভাবনা। যে দেশের লোকের বাক্‌যন্ত্রের গঠনপ্রণালী যেমন হইবে তথাকার ভাষা তেমনি হইবে! ইংরাজ ইংলণ্ডে থাকে, তাই তাহার ইংরাজী ভাষা। ইংরাজী ভাষায় ইংলণ্ডীয় প্রকৃতি গাঁথা আছে। তবে এটা মান্য বটে যে, বৈদেশিক সংশ্রবে ভাষা অনেক বিকৃত হয়—যেমন আমাদের বাঙ্গালা ভাষা আজকাল দাঁড়াইয়াছে। রেশম-কীট যেমন ভারতে অণ্ড ছিন্ন করিয়া সুন্দর প্রজাপতি হয়, চীন দেশেও তাই হইবে। যেখানকার জলবায়ু তাহার প্রকৃতির পরিপোষক, সেইখানেই মনোহর প্রজাপতিত্বে পরিণত হইবে। মানুষ ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির নিয়মানুযায়ী, ভারতেও যেমন পশুত্ব ত্যাগ করিয়া মানবী-প্রকৃতি অবলম্বন করে, আমেরিকায়ও তাই, আফেরিকায়ও তেমনি। যেখানে যেখানে তাহার জন্মগ্রহণ-উপযোগী

জলবায়ু, তথায়ই তাহার বিকাশ। অধ্যাপক ডারবিন বেশ সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে কেমন সামান্য জড় শক্তি বিকশিত হইতে হইতে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব অবলম্বন করে, এবং পরে আত্মবিকাশ হয়। ক্রমোন্নতি প্রণালী বুঝিলে আমরা বেশ বুঝিব যে "There is no cradle-bed of human existence"—মানুষের একটী সাধারণ জন্মস্থান নাই। মানুষ প্রকৃতির দাস—একটি ফুটন্ত ফুল। যেখানে হুকুম হইবে, সেইখানেই তেমনি ভাবে ফুটিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট শুনিয়াছি যে, মনুষ্য শরীর যে ভাবে ও যে উপাদানে গঠিত তাহাতে শীতপ্রধান দেশ তাহার জন্মভূমি কখনই হইতে পারে না। শীতোষ্ণ আবর্ত্ত (Temperate zone)ই তাহার বিকাশভূমি। বাস্তবিক সাধারণ বুদ্ধিতে দেখিতে গেলে ইহাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্যগণ যে কি দেখিয়া বলিলেন যে মানুষ এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আবার সোণার সংসারের কত স্বর্গোপম স্থান গেল, মধ্য আসিয়াই (আধুনিক মতে বাল্টিক উপকূল) তাঁহাদের আদি মাতা। কথাটায় আমরা যেন একটু বাইবেলী গন্ধ পাই। প্রেভ্না-বীর স্কবেলেফ যখন মধ্য আসিয়া জয় করিতে আইসেন তখন তাঁহার সমভিব্যাহারী কতিপয় ইঞ্জিনিয়ার কাস্পিয়ান উপকূল হইতে তাতার দেশ পর্য্যন্ত জরীপ করেন। তাঁহারা বলেন, যে মধ্য আসিয়া বড়ই আধুনিক। কিছু পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। ভূতত্ত্ব (geology) ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যেখানকার ভৌতিক প্রকৃতি এখনও পরিপুষ্ট হয় নাই, যেখানকার ভূমি এখনও লবণাক্ত ; মানুষ সেখানে প্রথম উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা বুঝি, মানুষ একেবারে মানুষ হইয়া টিপ করিয়া সংসারে পড়ে নাই। ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী, ফুলের মতন একটু একটু ফুটিতে ফুটিতে যেন কত সন্তর্পণে, যেন কত সাবধানে, যেন কত ভয়ে ভয়ে মানুষের অস্তিত্ব সংসারে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। সমগ্র সৃষ্ট সংসার তিল তিল করিয়া, গণিয়া বাছিয়া, সকল শক্তির, সকল জৈবীভাব সমষ্টি করিয়া মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব যেখানকার ভৌতিক, স্বাভাবিক, আকৃতি, প্রকৃতি পরিপুষ্ট এবং সর্ব্বায়বসম্পন্ন তথায়ই মানুষের প্রথম আবাস স্থান। শুনিলে হাসি পায় যে, মরুপ্রদেশ মধ্য আসিয়া অথবা তুষারাবৃত (Sweden) সুইডেন ও বাল্টিক উপকূল মানুষের প্রথম জন্মভূমি। মিষ্টার পেঙ্কা ও লেথাম এই দ্বিতীয় মতের সমর্থক। অনাবশ্যক বোধে উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সকল কথার সমালোচনা করিব না। তবে মোট কথা এই বলিতে চাই যে, যাহা এক মন্বন্তরার (geological age) পূর্ব্বে তুষার নদীতে আবৃত ছিল, এখন যেখানে তুষার-রেখা ভূমি স্পর্শ করিতেছে, সেইটি কি মানুষের আবাসভূমি হইতে পারে? মানুষ সকল স্থানেই নিজ বুদ্ধির সাহায্যে থাকিতে পারে, তবে তাহার আদি ও প্রাকৃতিক উৎপত্তি শীতোষ্ণ প্রদেশ—স্বভাবের লীলা ভূমিতে হইয়াছে।

তাহার পর জাতি নির্ণয়। পাশ্চাত্যগণ, মানুষকে চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছে আর্য্য, তুরাণী, সেমিতি ও হাবসি। সার্ব্বভৌম সম্রাট নেপোলিয়ান যেমন একদিন য়ুরোপ খণ্ডকে বিলাইয়া, ছড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছেলেখেলা করিয়াছিলেন, আজকাল আমাদের শিক্ষক মহোদয়গণ বিজ্ঞানের খাতিরে, মানব মণ্ডলীকে ভাঙ্গিতেছেন গড়িতেছেন—জাতি নির্ম্মাণ করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়গণের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্যের তারতম্য দেখিয়া তাঁহারা এই চারিটি থাক্ করিয়াছেন। সমগ্র য়ুরোপবাসী (কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ভিন্ন), হিন্দু, পারসী, কাবুলী সকলেই আর্য্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মৌলিকতায় মানুষ এক ; তবে হৈতুকী প্রকৃতির জন্য যত বৈষম্য ঘটে। অন্তর্জাতিক ব্যবহারে ও বাণিজ্যে ভিন্ন জাতিগণের মধ্যে সাদৃশ্যটা বজায় থাকে। কথিত আর্য্যজাতির মধ্যে এত অধিক সাদৃশ্য থাকার কারণ আছে। মাননীয় ব্লানফোর্ড সাহেব একস্থানে লিখিয়াছেন "India, south of the Ganges, is peculiarly deficient in this respect ; and the chief reason is that the greater part of this region has been chiefly in the condition of dry land from very early times," মোটামুটি কথা এই যে, আর্য্যাবর্ত্ত অন্যান্য দেশের বহুপূর্ব্বে সমুদ্র গর্ভোত্থিত

হইয়া জীবের আবাসভূমি হইয়াছে। যে সব স্থল জীব নিবাসভূমি ছিল, অধুনা কালের বিচিত্র গতিতে সে সব প্রদেশ পয়োধিগর্ভে নিহিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল প্রাচীন দেশ নিচয়ের সমসাময়িক আর্য্যাবর্ত্ত এখনও মানব নিবাসস্থল থাকিয়া কল্পকল্পান্তরিক বিদ্যাবৃদ্ধির, যশ সমৃদ্ধির ভূষণ অঙ্গে রাখিয়া এখনও সংসার-শীর্ষে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ভারত সংসারকে অন্নপূর্ণার ন্যায় জ্ঞান বণ্টন করিয়াছেন—আজিও সে সদাব্রত, সে অন্নছত্রের ধূম কমে নাই। ভারতের জ্যোতিষ, ভারতের রসায়ণ, ভারতের শিল্প, ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতের মণিমুক্তা, হীরা, চুনি, সমগ্র পৃথিবীকে শোভিত, ধন্য, মান্য, গণ্য, জ্ঞানী করিয়াছে। গ্রীকগণ আমাদের খাইয়া মানুষ, রোমীয় আমাদের ধনে ঐশ্বর্য্যশালী, আবার সেই গ্রীক ও রোমের খোলায় বর্ত্তমান য়ুরোপ নির্ম্মিত। পারস্যের জেন্দাবেস্তা ভারতের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের আভাস লইয়া প্রণীত। সেই পূর্ব্বতন অগ্নিহোত্রী পারসীগণের রক্তে বর্ত্তমান পারস্য গঠিত। তাই এই সকল জাতিগণের মধ্যে এত বেশী সাদৃশ্য। আবার পুরাণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, কত ক্ষত্রিয় শবরত্ব, যবনত্ব, বা ম্লেচ্ছতাপ্রাপ্ত হইয়া কত স্থান নিবসিত করিয়াছিলেন। এততেও যদি সাম্য না থাকিবে তবে কিসে থাকিবে?

বিচিত্র বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির রাজ্যে সব যেন ছড়াইয়া পড়ে। এই বিচিত্রতা কেমনে সংসাধিত হয় পাশ্চাত্যগণ যে দিন ইহা জানিতে পারিবেন, সেই দিনই আর্য্যঋষিগণের বাক্‌বিজ্ঞানের গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। বুঝিবেন, কি রকম রাসায়ণিক, কি রকম ভৌতিক ক্রিয়া হইলে সাদা চামড়া কালো হয়, কি খাইলে কি করিলে খঞ্জনগঞ্জন নয়ন কটা হয়, কতদিন কি ভাবে বিলাতে থাকিলে বাঙ্গালী পুরা সাহেব হইবে। তখন বুঝিবেন, আহার ব্যবহারে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি কতখানি পরিবর্ত্তিত হয়। তখন বুঝিবেন. সামান্য শাক সব্‌জী খাইলেও ধীরে ধীরে প্রকৃতির গতি কত উল্টাইয়া যায়। তখন বুঝিবেন, নবমীতে নারিকেল খাইলে অথবা ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু খাইলেও কি অনিষ্ট সংঘটিত হয়—যে সব শাস্ত্রীয় অনুশাসন বাক্য লইয়া আজকাল এই অধম বাঙ্গালীর ছোট বড় প্রায় সব রকমের লেখকগণই হিন্দুশাস্ত্রকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। সামান্য কথায়, সামান্য সংস্পর্শেও একজাতির হৈতুকী প্রকৃতি বিকৃত হয়। যেমন তড়িত গতি একটু বাধা পাইলে অমনি বাঁকিয়া চুরিয়া, নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়, প্রকৃতিও এমনি চপল, এমনি নরম যে ভিন্ন প্রকৃতির একটু সংস্রবে ভিন্ন দেশীয় একটু বাত্যাঘাতে যেন টলিয়া যায়—বাঁকিয়া যায়—সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাই শাস্ত্রকারগণের এত অনুশাসন—এত সাবধানতা!

তবে কি আমরা বিদেশী নহি? ভারতবর্ষ কি সত্য সত্যই আমাদের আদি নিবাসভূমি? ভারতবর্ষ প্রকৃতির লীলাভূমি, যতপ্রকারের বিচিত্রতা থাকিতে পারে, যতবিধ বৈষম্য সম্ভবে, ভারতে তাহা সবই বর্ত্তমান। মানবী প্রকৃতি যে এখানে বহুপূর্ব্বে বিকশিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? হইতে পারে সোণার ভারত দস্যুর আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ হইয়া লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইয়াছে। বিদেশী স্বর্গোপম স্থান দেখিয়া বাস করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের আর্য্য ভারতেরই। ভারতের ব্রাহ্মণের, ভারতের বৈশ্যের, ভারতের ক্ষত্রিয়ের পূর্ব্বপুরুষ কোন বিদেশী লুঠেরা নহে। ভারতের শূদ্র রাক্ষস বংশাবতংস নহে। আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ভারতীয় প্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দুর্ম্মতি হইয়াছে, তাই পাশ্চাত্য মথিত, এই হলাহল পান করিতে প্রস্তুত। পাশ্চাত্য আমাদের শাস্ত্র মথিত করিয়া বলিল, ঋষিগণ গোখাদক ছিলেন, আমরা অমনি মস্তকাবনমন করিয়া তাহাই স্বীকার করিলাম। অমনি জাতিভেদ উড়িয়া গেল, শাস্ত্র ডুবিল, মনুস্মৃতি কর্ম্মনাশায় ভাসিল। না জানি, আরও কি কপালে আছে!

মাননীয় "সচিত্র শিশির" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আশা করি আমার নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার সচিত্র শিশিরে একটু স্থান পাইবে। ইহা একটি ইংরাজী পত্রের অনুকরণে রচিত।

শ্রীপ্রসাদকুমার রায় বি-এ

পত্রখানি পাঠ করুন

[পত্রখানি সমুদয় পাঠ করুন। তাহার পর কেবলমাত্র ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫ চিহ্নিত লাইনগুলি পাঠ করুন। দেখিবেন, সম্পূর্ণরূপ বিপরীত অর্থ বুঝাইবে।]

প্রিয়বরেষু—

(১) যে একান্ত প্রেম তোমা এতদিন দেখায়েছি তাহা
নহে মোর আন্তরিক। মনে হয় তব প্রতি ঘৃণা
(৩) বাড়িতেছে দিন দিন। পত্র তব পাই যতবার
ততই হ'তেছে মনে যেন তুমি ঘৃণার্হ আমার —
(৫) ততই হ'তেছে ইচ্ছা—হয় মোর ততই আগ্রহ—
ঘৃণা করিবারে তোমা। জেনো মোর ইচ্ছা নহে কভু
(৭) দিতে তোমা সমাদর। পত্র তব ছত্রে ছত্রে শুধু
ঘৃণার উদ্রেক করে। নাহি হেন কোন স্থান যাহা
(৯) এঁকে দেয় চিত্ত-পটে তব উচ্চ চরিত্রের ছবি।
আমার সংস্পর্শ ত্যাগ কর যদি তুষ্ট হব আমি।
(১১) যদি কভু হয় দেখা প্রাণে মোর সঞ্চারিবে শুধু
দারুণ ঘৃণার ভার। বিরক্তিতে রবে কোথা হায়!
(১৩) বিমল মিলনানন্দ! জেনো স্থির এ কথা আমার—
চির-শত্রু তব আমি—জেনো মনে অসম্ভব ইহা—
(১৫) প্রাণ-সম প্রিয় বন্ধু আমি তব রব আজীবন!

ইতি—

তোমারই বন্ধুপিপাসু।—

পাকস্থলীর ডায়ারী

[শ্রীবিপিনবিহারী রায় এম·এ]

একটি বার বৎসর বয়স্ক বালকের পাকস্থলী (Stomach) যদি সজীব হইয়া ডায়ারি লিখিতে পারিত, তাহাই কল্পনা করিয়া লিপিবদ্ধ হইল—ডায়ারির মাত্র এক পাতা উদ্ধৃত করা হইল।

সকাল ৭টা—

কাল প্রায় রাত দশটার সময়ে আমার "বাবু" নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। সেই গুরু আহার হজম করতে সারারাত ধরে চেষ্টা করে, সবে একটু বিশ্রাম করবো মনে করেছি, এমন সময়ে গরম গরম আধসেরটাক্ দুধ, তার সঙ্গে খান চার পাঁচ বিস্কুট এসে হাজির হ'ল। বিশ্রাম আর হ'ল না, আবার কাজে লাগলুম।

সকাল ৮টা—

আঃ দুধটাকে অতিকষ্টে ঠেলে ঠুলে নামিয়ে দিয়েছি, আবার খানকয়েক আধ চিবানো গরম মটর ডালের বড়া এসে উপস্থিত। জ্বালাতন করলে! দেখি চেষ্টা করে। "বাবুর" মায়ের বিবেচনাটা খুব। ছেলে রান্নাঘরে গিয়ে মা বড়া ভাজছেন দেখে চাইলেন, আর মাও আদর করে দিলেন। অমনি খানকতক গেলা হ'ল।

সকাল ১০টা—

বাবুর ইস্কুলের সময় হয়েছে, আর কি—ভাত, ডাল আলুভাজা, ইলিশ মাছ, দুধ, আরো কত কি! পোড়া অদৃষ্টে কি আর বিশ্রাম আছে। অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো দেখ্‌ছি। এমন করে আর পারা যায় না। কি করি, যতক্ষণ বইবে ততক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টা করতেই হবে।

বেলা ১টা—

বাবুর বাড়ী থেকে মা "টিফিন পাঠিয়েছেন—চারখানা লুচি, তিনটা আলুর দম, দুইটা সন্দেশ। বাঃ বাঃ, বেশ চলছে যাহোক। আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানি না, অদৃষ্টে কত কষ্টভোগ যে আছে!

বেলা ২টা—

বাবু ক্লাস পালিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ইস্কুলের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে অনুগ্রহ করে আমার জন্যে কতকগুলো আধ ভাজা আধ কাঁচা ছোলা মটর কলাই ইত্যাদি পাঠালেন। এর নাম শুনছি "অবাক জলপান"—অবাক্ই বটে! তার ওপরেই আবার খানিকটে ভীষণ ঠাণ্ডা, কাদার মত, পচা দুধেতে চিনিতে মেশান "কুলপী বরফ্" এসে হাজির। আমি আর ত পারি না। ওঃ, অসহ্য হয়ে উঠেছে, এইবারে মোচড় দিতে আরম্ভ করলুম।

বেলা ৩॥টা—

আমার মোচড়ানিতে বাবু ত গ্যাঙ্গাতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে মাষ্টার মশায় তাড়াতাড়ি পাড়ার একটি ছেলে সঙ্গে দিয়ে আমার বাবুকে বাড়ী পাঠালেন। আমি চুপচাপ করে থাকলে আরো কত আমার ওপর চাপাতেন জানি না। এইবার বোধ হয় বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম পাবো। দেখা যাক্!

বেলা ৪॥টা—

ও বাবা, বিশ্রাম কোথায়! বাবু ত বাড়ী গিয়ে উঃ আঃ করতে করতে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমি আরো ২।৪টা মোচড় দিলাম—বাছাধন ভাল করে বুঝুন,

আমার ওপর কি অত্যাচার করছেন, তাহ'লে যদি পোড়া অদৃষ্টে একটু বিশ্রাম লাভ হয়। কিন্তু হ'ল না, বাবুর মা এসে "তাইত, কি হয়েছে আহা উহু" সুরু করলেন। তার পরেই দেখি, একগ্লাস ঘোল এসে হাজির। আমি এবারে ধর্ম্মঘট করেছি, হাত গুটিয়ে বসে রইলুম,- বাবা, আমার দ্বারা আর কিছু হচ্ছে না। দে মোচড়, দে মোচড়! ওমা, একি? আধ গেলাস জল মেশান পাতিলেবুর রস। নাঃ, কোমর বেঁধে লাগতে হ'ল—আর শুধু মোচড়ে চলবে না। প্রাণপণে উপর দিকে এক ঠেলা লাগালুম,—বাপ্, তবু খানিকটে হালকা হয়ে গেল।

বেলা ৩টা—

বাবুর বাপ আপিস থেকে আসতেই বাবুর মা তাঁকে বল্লেন "ছেলের কি হয়েছে, খুব বমি করছে, পেট কামড়াচ্ছে ভয়ানক, কেন এমন হ'ল কিছুই ত বুঝতে পারছি না।" তা পারবেন কেন? যাই হোক, বাপ ত ছুটলেন ডাক্তারের বাড়ী।

বেলা ৬টা—

যাক্, বাঁচলুম বাবা! ডাক্তার বাবু এসে বলে গেলেন যে, ওষুধ কিছু দেবেন না, "একবারে উপোস্। রাত্রে কিছু খেতে দেবেন না"—উঃ তাহলে আশা আছে! আজ রাত্রে এই সমস্ত আবর্জ্জনা সাফ করে উঠতে পারি ত কিছু বিশ্রাম পাওয়া যেতে পারে।

স্বাস্থ্য-সমাচার
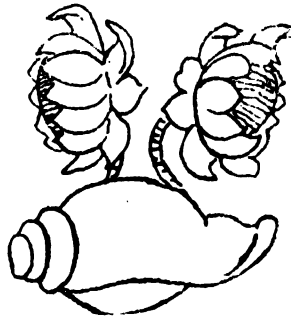
শ্রীশ্রীদশভুজা

মেসার্স সি, কে, সেন এণ্ড কোংর সৌজন্যে

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] শারদীয়া সখ্যা [৪৪—৪৭শ সং

শারদীয়-সঙ্গীত।

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সঙ্কলিত]

আগমনী—

(১)

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবার মায়-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়।
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

রামপ্রসাদ।

(২)

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, যাবে দুঃখ-রাশি, ও চাঁদ মুখের হাসি,
সুধা রাশি
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে, পাছে করি গিরি
অমনি কাঁদে প্রা

পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে, জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী, তোমা হেন
সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরিগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে
ধরে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেমে কোথা থুলে, কথা
কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে।
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে, ভাসে মহা
আনন্দ-সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে, দিবানিশি নাহি জানে,
আনন্দে পাশরে॥
রামপ্রসাদ।

(৩)

ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল, নন্দিনী নিকটে
তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো॥
জয়া! কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি
শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে, প্রাণ দিয়ে শুধি
ধার গো॥
রাণী ভাসে প্রেম-জলে, দ্রুত গতি চলে, খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যা'রে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে
আর গো॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার।
বলে—মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে, মা বলে
একি কথা মার গো॥
রথ হ'তে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি, সান্ত্বনা
করে বারবার॥
দাস কবিরঞ্জনে, সকরুণে ভনে, এমন শুভদিন কার গো॥
রামপ্রসাদ।

(৪)

কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার।
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু বদন উমার॥
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে, আধ আধ মা বলে
বচন সুধাধার।
জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার, গিরিরাজ॥
ভিখারী সে শূলপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী; আর না কখন মনে
কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার॥
কমলাকান্তের বাণী, শুনহে শিখরমণি, বিলম্ব না কর আর হে
গৌরী আনিবার।
দূরে যাবে সব দুঃখ—মনেরি আঁধার গিরিরাজ॥
কমলাকান্ত।

(৫)

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে॥
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে—
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু বদনে॥
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি, বিতরে অমৃত রাশি,
সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে!
ধৈর্য্য না ধরে মম জীবনে॥
আর শুন অসম্ভব, চারিদিগে শিবা রব হে!
তার মাঝে আমার উমা, একাকিনী শ্মশানে।
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার হে!
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে॥
কমলাকান্তের বাণী, পুণ্যবতী গিরিরাণি গো!
যেরূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে।
ও পদ-পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হয়েছে যোগী গো!
হর হৃদি-মাঝে রাখে অতি যতনে॥
কমলাকান্ত।

(৬)

যাও গিরিবর হে, আন গিয়ে নন্দিনী ভবনে আমার।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রয়েছ' ঘরে, কি কঠিন
হৃদয় তোমার হে॥
জান ত জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত, পরিধান বাঘাম্বর
শিরে জটাভার

আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লয়ে যায় তাঁরে,
কত আছে কপালে উমার ॥
শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাখে চিতা ছাই, ভূষণ ভীষণ
আর গলে ফণী-হার।
এ কথা কহিব কায়, সুধা ত্যজি বিষ খায়, কহ দেখি
এ কোন বিচার।
কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈল-শিরমণি, শিবের যেমন রীত,
বুঝিতে অপার।
চরণে তুষিয়ে হর, যদি আনিবারে পার, এলে উমা
না পাঠাব আর ॥
কমলাকান্ত।

(৭)

গিরি, প্রাণ-গৌরী আন আমার।
উমা বিধুমুখ, না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার ॥
আজি কালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে ;
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে, একি তব অবিচার ॥
সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রোয়েছি পরাণ ধরে ;
ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর ॥
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত, কেঁদ নাকো রাণি হও গো শান্ত ;
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি কি ভাব আসার ॥
কমলাকান্ত।

(৮)

ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে।
মনো দুঃখ নারদে কত না কয়েছে ॥
দেব দিগম্বরে, সঁপিয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে ॥
হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড় মাল, জটায় কাল ফণী দুলিছে।
শিবের সম্বল, ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারি মন ভুলেছে ॥
একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।
তাহে সুরধুনী, স্বামী সোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে।
কমলাকান্তের নিবেদন ধর, একথা মোর মনে লয়েছে ;
তুমি শিখর মণি, তোমার নন্দিনী ভিখারীর ভিখারিণী হ'য়েছে ॥
কমলাকান্ত।

(৯)

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে !
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ, উমারে দেখিতে হে ॥
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছো ঘরে ;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ তাহে, না কর মনেতে।
কমলা কান্তের বাণী, শুনহে শিখর-মণি,
কেমনে সহিবে এত, মায়ের প্রাণেতে ॥
কমলাকান্ত।

(১০)

বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে।
জানত জামাতার রীত, অশেষ প্রকারে ॥
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি, ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণি ;
ততোধিক শূলপাণি, ভাবে উমা মারে।
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি পরে ;
সে কেন পাঠাবে তাঁরে, সরল অন্তরে ॥
রাখি অমরের মান, হরের গরল পান ;
দারুণ বিষের জ্বালা, না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া, শীতল শঙ্কর-কায়া ;
সে অবধি শিব, জায়া বিচ্ছেদ না করে॥
অবলা অল্প মতি, না জান কার্য্যের গতি,
যাব কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ ;
তার মা বটে মানায়ে যদি আনিবারে পারে ॥
কমলাকান্ত।

(১১)

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে,
ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে ॥

মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব,
আজি তনু জুড়াইব, আনন্দ সমীরে।
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি,
ঘরে আসি কি কব রাণীরে ॥
দূরে থাকি শৈল রাজা, দেখি শ্রীমন্দির ধ্বজা,
পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেম-নীরে।
মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়,
উমারে আনিতে হবে ঘরে ॥
প্রবেশি কৈলাস পুরী, না ভেটিয়ে ত্রিপুরারি,
গমন করিল গিরি শয়ন-মন্দিরে।
হেরিয়ে তনয়া-মুখ, বাড়িল পরম সুখ,
মনের তিমির গেল দূরে ॥
জগত-জননী তায়, প্রণাম করিতে চায়,
নিষেধ করয়ে গিরি, ধরি দুটি করে।
কমলাকান্ত সেবিত তব শ্রীচরণ, মা,
আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে ॥
কমলাকান্ত।

(১২)

গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর। কর অনুমতি হর,
যাইতে জনক-ভবনে।
ক্ষণে ক্ষণে মম মন, হইতেছে উচাটন,
ধারা বহে তিন নয়নে ॥
সুরাসুর নাগ নরে, আমারে স্মরণ করে;
কত না দেখিছি স্বপনে যোগ-নিদ্রা ঘোরে।
বিশেষ জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
মা দুর্গা ডাকে সঘনে ॥
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি,
কত না চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনোদুঃখ কব কায়,
বল প্রাণ ধরি কেমনে ॥
হউক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান;
নিবেদন করি চরণে।
কমলাকান্তেরে দেহ নাথ, অনুচর বলে যাই, আসিব ত্রিদিনে।
কমলাকান্ত।

(১৩)

ওহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার,
যাই আমি জনক-ভবনে।
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ লেখনে,
হয় নয় প্রকাশ বদনে ॥
জনক আমার গিরিবর, আসি উপনীত,
আমারে লইতে আর তব দরশনে।
অনেক দিবস পর, যাইব জনক-ঘর,
জননীরে দেখিব নয়নে ॥
দিবানিশি অবিরত, কাঁদিছে জননী কত হে,
তৃষিত চাতকীর মত রাণী চেয়ে পথ-পানে।
না দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের দুঃখ,
না কহিলে যাইব কেমনে ॥
নাথ, পুর মম আশ, না করহ উপহাস,
বিদায় করহ হর, সরল বচনে হে।
কমলাকান্তেরে দেহ নাথ, অনুচর বলে যাই,
আসিব তিন দিনে হে।
কমলাকান্ত।

[১৪]

গিরি-রাণী যন্ত্র সাধন মন্ত্র পড়ে, নানা তন্ত্র করিয়ে বিচার।
বলে আজ আসিবে, আমার গৌরী-গজানন, কি শুভদিন গো আমার ॥
কনক নির্মিত কুম্ভ দিছে তাহে কুসুম চন্দন আর,
আমন্ত্রি সুর-গুরু, পূজয়ে নব তরু, যেমন আছে কুলাচার।
মৃদঙ্গ মোহিনী, দুন্দুভি দরপিনী, বাজিছে বিবিধ প্রকার গো গিরিপুরে।
নগরে রমণী, উলু উলু ধ্বনি, আনন্দে দিছে বারে বার ॥
বিজয়া হেনকালে, আসি রাণীরে বলে,
বিলম্ব কেন কর আর গো রাণি!
কমলাকান্তের জননী ঘরে এলো, প্রাণের গৌরী তোমার ॥
কমলাকান্ত।

[১৫]

ওগো হিম-শৈল-গেহিনী গো রাণী, শুন মঙ্গল বচন,
এলো গিরি লয়ে প্রাণ-উমারে।

কি কর কি কর রাণি, শুন গো জয় জয় ধ্বনি,
আজি কি আনন্দ গিরিপুরে ॥
দেখে এলাম রাজপথে, তোমার তনয়া দাঁড়ায়ে রথে গো।
শ্রম-বিন্দু মুখোপরে, বারেক সে মুখ চেয়ে,
অমনি আইলাম ধেয়ে, পুণ্যবতী লইতে তোমারে ॥
জয়া, কি বলিলে আরবার বল, আমার গৌরী কি
ভবনে এলো গো!
মরে ছিলাম না দেখিয়ে তারে।
কহিতে কহিতে রাণী, ধাইল যেন পাগলিনী,
কেশ পাশ বাস না সম্বরে গো ॥
দেখিয়ে সে চাঁদ মুখ, রাণী পাশরিল সব দুঃখ,
কোলে নিল ধোরে দুটি করে।
কমলাকান্তের বাণী,— বিলম্ব না কর রাণি!
বরণ করিয়ে লহ ঘরে ॥

কমলাকান্ত।

(১৬)

এখনি আসিবে গো গিরিরাজ আনন্দে অভয়া লয়ে।
আজি জুড়াইব আঁখি, চল সখি দেখি গিয়ে ॥
মেনকা-রাণীর দাসী, প্রীতি ঘরে ঘরে আসি,
মনের তিমির নাশি, মঙ্গল গিয়েছে কয়ে।
তোমরা যতেক এয়ো, রাজার ভবনে যেয়ো,
চরণ বরিয়ে রাণী লবে গো আপনার মেয়ে ॥
নগর নিকটে শুনি, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি;
আইল যত রমণী সবে উন্মত্তা হৈয়ে।
সম্মুখে শঙ্করী-রক্ষ, হেরিয়ে যুবতী যত,
পাশরিল মনোদুঃখ, বিধুমুখ নিরখিয়ে ॥
হেনকালে শৈল-রাণী, এলো যেন পাগলিনী,
মুখে নাহি সরে বাণী,—রৈল ও চাঁদমুখ চেয়ে।
কমলাকান্তের ভাষা, পূরিল মনের আশা;
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত নিধি বিধি দিল মিলাইয়ে ॥

কমলাকান্ত।

(১৭)

জয় জয় মঙ্গল বাজন, বাজে ঘনে ঘন;
ওগো রাণি ঐ এলো গিরি, রাণি গো! গৌরীরে লয়ে।
কি কর শিখর-রমণি! গৃহ অন্তরে মা,
তনয়া দেখ না আসিয়ে ॥
শুনিয়ে জয়ার বাণী, অমনি ধাইল রাণী,
পুলকে পূর্ণিত হইয়ে।
ক্ষণে অচেতনা, ক্ষণে স্থগিত-নয়না,
রাণী ক্ষণে ক্ষণে ডাকে উমা বলিয়ে ॥
বাহির প্রাঙ্গণে আসি, দূরে গেল দুঃখরাশি,
উমা-শশী মুখ হেরিয়ে।
ত্রিগুণ-জননী, অনায়াসে গিরি গেহিনী,
কোলে নিল করে ধরিয়ে ॥
সারি সারি নারী ধায়, সবে সুমঙ্গল গায়,
কোলাহল রব করিয়ে।
কমলাকান্ত, হেরি শ্রীমুখ মণ্ডল, নাচে করতালি দিয়ে ॥

কমলাকান্ত।

(১৮)

এলো গিরিরাজ, রাণি! উমারে লইয়ে গো।
কি কর কি কর গৃহে, দেখ না আসিয়ে গো ॥
লম্বোদর কোলে করি, আগে আগে ধায় গিরি,
ষড়ানন অঙ্গুলি ধরিয়ে।
তার পাছে উমা ধায়, তোমার মুখ চেয়ে গো ॥
সখীর বচন শুনি, ধায় যেন চকোরিণী,
শশীরে ষোড়শী নিরখিয়ে।
তেমতি ধাইল রাণী, উন্মত্তা হয়ে গো ॥
আঙ্গিনার বাহিরে আসি, হেরি গৌরী-মুখ-শশী,
কোলে নিল বরণ করিয়ে।
পুলকে কমলাকান্ত গিরিপুরে আনন্দে দেখিয়ে ॥

কমলাকান্ত।

(১৯)

এলো গিরি নন্দিনী, লয়ে সুমঙ্গল ধ্বনি, ঐ শুন গো রাণী,
চল বরণ করিয়ে, উমা আনি যেয়ে, কি কর পাষাণ-রমণী গো।

অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী,
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী।
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে,
দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি, উমা-মুখ-শশী,
চুম্বয়ে যেন চকোরিণী।
গৌরী কোলে করি, মেনকা সুন্দরী,
ভবনে আনিলা ভবানী।
কমলাকান্তের, পুলকে অন্তর, হেরি ও বিধুমুখ খানি ॥
কমলাকান্ত।

(২০)

আমার উমা এলো বলে, রাণী এলোকেশে ধায়,
যত নগর-নাগরী, সারি সারি সারি,
দৌড়ী গৌরী মুখপানে চায়।
কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু বালক বক্ষে,
কার আধ শিরসি বেণী, কার অলকা শ্রেণী,
বলে চল চল চল, অচল-তনয়া হেরি উমা, দৌড়ে আয় ॥
আসি নগর প্রান্ত ভাগে, তনু পুলকিত অনুরাগে ;
কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধর-বারি ;
তখন গৌরী কোলে করি, গিরি-নারী প্রেমানন্দে তনু
ভেসে যায় ॥
কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুর কিন্নরীগণ সাজে ;
কেহ নাচত কত রঙ্গে, গিরি পুর সহচরী সঙ্গে ;
আজ কমলাকান্ত গো, হেরি নিতান্ত মগ্ন দুটি রঙ্গালয়ে ॥
কমলাকান্ত।

(২১)

গিরি রাণী, এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবন ধন ॥
কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূল ধারি,
প্রাণ উমা আনিলাম নিজ পুরে।
দেখো মনে রেখ ভয়, সামান্য তনয়া নয়
যাঁরে সেবে বিধি বিষ্ণু পুরে।
ও রাঙ্গা চরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জটি,
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাহি করে ॥
তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া
ছায়া মাত্র জীব নাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, কালী তারা নাম ধরি,
কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে ॥
অসংখ্য তপের ফলে, কপট তনয়া-ছলে,
ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে।
কমলাকান্তের বাণী ধন্য ধন্য গিরি রাণি!
তব পুণ্য কে কহিতে পারে ॥
কমলাকান্ত।

(২২)

শরত-কমল-মুখে, আধ আধ বাণী।
মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখে ঈষৎ হাসি,
ভবের ভবন-সুখ তনয়ে ভবানী ॥
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর মা!
জিনি কত সুধাকর, শত দিনমণি।
বিবাহ অবধি আর, কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী ॥
শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয় মা!
তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী।
মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে,
কার কে এমন আছে সুখের সতিনী ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজ রাণি!
কৈলাস-ভূধর ধরাধর চূড়ামণি।
তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও,
ভুলে থাক ভব-গৃহে, ভূধর-রমণি ॥
কমলাকান্ত।

(২৩)

তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে!
গিরিরাজ! ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে ॥
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে,
এসে বলতে—মেনকা, তোমার দুঃখের কথা,
উমা সব শুনেছে।

তোমায় দেখ্‌তে পাষাণী, আপনি ঈষাণী,

আস্‌তে চেয়েছে।

তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,

আমি আপনি এসেছি জননী বোলে।

রাম বসু।

(২৪)

তারা হারা হোয়ে, নয়নের তারা হারা হোয়ে রই।

সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই ॥

আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা,

বিধি এনে মিলালে।

উমা চন্দ্র-বদনে, ডাক্‌ছে সঘনে, মা মা মা বলে।

উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে,

যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে।

রাম বসু।

(২৫)

ভাল হোক্‌ হোক্‌ ওহে গিরি,

যাই আমি নারী—তাই ভুলি বচনে।

তোমারো কি মনে, হোতো না হে সাধ,

হেরিতে উমার চন্দ্রাননে।

রাম বসু।

(২৬)

আশা-বাক্যে মোর পাপ-প্রাণ,

রহে বল কত দিন!

দিনের দিন, তনুক্ষীণ, বারি-হীন, যেন মীন ॥

যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসর তাকে,

আনতে তো যেতে হয়।

যেন মা-হীনা কন্যা, তিন দিনের জন্যে,

এলো হে হিমালয় ॥

মুখে করি হাহারব, ছিলেম যেন শব হে,

গৌরী মৃত-দেহে এসে জীবন দিলে ॥

রাম বসু।

(২৭)

হোক্‌ হোক্‌ হোক্‌, উমা সুখে রোক্‌,

সদাই হোতো মনে।

ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে,

তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে ॥

দুহিতার সুখ শুনিলে গিরি,

যে সুখ হয় আমার।

আছে যার কন্যা, সেই জানে,

অন্যে কি জানিবে আর।

যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা,

উমা ভাল আছে তোর;

যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই,

আনন্দে হয়ে বিভোর ॥

শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ-সংবাদ,

আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই ॥

রাম বসু।

(২৮)

এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়,

শ্মশান-বাসী মৃত্যুঞ্জয়।

যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে,

সে দুর্গার দুর্গতি একি প্রাণে সয় ॥

রাম বসু।

(২৯)

তুমি যে কয়েছ আমায় গিরিরাজ,

কত দিন কত কথা।

সে কথা, আছে শেল সম মম হৃদয়ে গাঁথা।

আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়,

কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।

হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক,

ধূলায় পড়ে লুটাতো ॥

গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা,

আমি এখন অন্ন অনেককে বিলাই ॥

রাম বসু।

(৩০)

কও দেখি উঁমা, কেমন ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে ;
জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল,
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা কোরে ॥
শুনে জামাতার দুঃখ, খেদে বুক বিদরে।
তুমি ইন্দু-বদনী, কুরঙ্গ-নয়নী,
কনক বরনী তারা জানি জামাতার গুণ,
কপালে আগুণ,
শিরে জটা বাকল পরা।
আমি লোক-মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি,
ফণি ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে ॥

রাম বসু।

(৩১)

গৌরী কোলে কোরে নগেন্দ্র-রাণী,
করুণ বচনে কয়।
উঁমা মা আমার, সুবর্ণ-লতা,
শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
মরি জামাতার খেদে, তোমারো বিচ্ছেদে,
প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল-নারী, চলিতে নারি,
ছিনু জীবন্মৃত হোয়ে, আশা-পথ চেয়ে,
তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে ॥

রাম বসু।

(৩২)

ওহে গিরি গা তোল হে, উঁমা এলেন হিমালয়,
উঠ দুর্গা দুর্গা বোলে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল, জয় জয় দুর্গা জয়।
কন্যা-পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তায়, তাচ্ছল্য করা নয়।
আঁচল ধোরে তারা, বলে ছি মা,
মা-বাপের কি এমনি ধারা।
গিরি তুমি যে অগতি, বুঝে না পার্ব্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময় ॥

রাম বসু।

(৩৩)

গত নিশি-যোগে আমি হে,
দেখেছি যে সুস্বপন।
এলো হে, আমার সেই তারা ধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে ;
বলে মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার,
দেও দেখা দুঃখিনীরে ॥
অমনি দু বাহু পশারি, উঁমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি—আমি নয় ॥

রাম বসু।

(৩৪)

মা হওয়া যত জ্বালা,
যাদের মা বল্‌বার আছে, তারাই জানে,
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্ম-ব্যথা পাই,
বর্ম্ম-সূত্রে সদা স্নেহে টানে ॥
তোমারে কেউ কিছু বল্‌বে না,
দেখে দারুণ পাষাণ।
আমার লোক-গঞ্জনায় যায় প্রাণ ॥
তোমার তো নাই স্নেহ,
একবার ধরো ধরো, কোলে করো,
পবিত্র হোক পাষাণ দেহ।
আহা এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,
তিন দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয় ॥

রাম বসু।

(৩৫)

গিরি, কি অচল হলে আনিতে উমারে।
না হেরি তনয়া-মুখ হৃদয় বিদরে ॥
ত্বরান্বিত হও গিরি, তোমার করেতে ধরি,
উঁমা ওমা বলে দেখ ডাকিছে আমারে ॥

নিধু গুপ্ত।

(৩৬)

গা তোলো গা তোল গিরি, কোলে লওহে তনয়ারে।
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে ॥

মঙ্গল আরতি করে, গৃহে তোল মঙ্গলারে।
অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধনে সম্বোধন করে॥
তারা পূজে পেলেম তারা, ত্রিপুরা সুন্দরী তারা।
আঁখি-তারা দুঃখহরা, নয়ন জুড়াল হেরে॥

অজ্ঞাত।

(৩৭)

নন্দি গিরি নন্দিনী—ত্রিনয়নের নয়ন-তারা
তারা হারা হ'য়ে আমি, হয়ে আছিরে তারা হারা॥
যে দিন তিন দিন ব'লে, গেছেরে সেই দিন তারা,
সেই দিনে তখনি আমি, দেখেছিরে দিনে তারা—
তারা-শোকে বহিছে আমার, তারায় তারাকারা ধারা॥
বসে যোগাসনে সেই তারা রূপে যারা আছেরে তারা স'পে,
ওরে নন্দি, তারা কি ধন, জেনেছে তারা ;—
তোরা যে এতকাল মিথ্যা, কাল ভয়ে কাল হরিলি,
জ্ঞান হয়রে জ্ঞান-চক্ষে, মোর তারারে না হেরিলি।
জলাভাবে যেমন আকুল, ঐ সিন্ধু-কূলে থেকে তোরা॥

দাশরথি।

(৩৮)

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
সে যে স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল॥
দেখা দিয়ে কেন এত দয়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নাহি মহামায়ার
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পাষাণের মেয়ে পাষাণী হোল॥

(৩৯)

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী,
উমা কেমন রয়েছে।
আমি শুনেছি শ্রবণে, নারদ-বচনে,
মা, মা, ব'লে উমা কেন্দেছে॥
ভাঙ্গেতে ভাঙ্গড় পীরিতি বড়,
ত্রিভুবনের ভাঙ্গ করেছে জড়,
ভাঙ্গ খেয়ে ভোলা হয়ে দিগম্বর,
উমারে কত কি কয়েছে॥
উমার বসন ভূষণ, যত আভরণ,
তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে॥

দাশরথি।

[৪০]

শরৎকালে রাণী বলে বিনয়-বচন।
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশির স্বপন॥
মায়া করি গৌরী মোর আঙ্গিনায় আসি।
মা বলিয়া কাঁদলো কত মোর নিকটে বসি॥
*　　*　　*　　*
বৎসর কত হলো গত করছে হরের ঘর।
চল গিরি আনতে গৌরী কৈলাস-শিখর॥

[৪১]

ভবনে ভবানী,　　　　পাইয়া পাষাণী ;
পুলকে হয়ে মগনা।
ঈষানী সম্বোধনেতে রাণী কয় করুণা।
মা তোমায় নয়ন-পথে হারিয়ে ত্রিনয়না,
কেঁদে কেঁদে তারা চক্ষের তারা ছিল না।
আজি সে দিন ঘুচিল,
সুদিন হইল, এ দিন হইবে মনে না জানি,
একবার আয় মা করি কোলে দুঃখ পাসর রঙ্গিনী।
চন্দ্রাস্যে প্রাণ উমা, ডাক মা বলে'
শুনে মা জুড়াই তাপিত প্রাণী।
যদি সুধাই তাই ওগো ঈষাণী।
যার উমা জগতের মা,
তার কি মা এমন হয় ;
হাঁগো প্রাণের তারা, সেও কি উমা-হারা রয়!
মা তোর শ্রীমুখ না হেরে,
যে দুঃখ অন্তরে, ছিলাম মণিহীন ফণী, দিবা-যামিনী।
ভাল মা গো মা তোর মুখখানি,
তুই ত জগৎ-জননী,
ভাল তা ব'লে একবার, মায়ে তোমার,
মনে কর কৈ গো তারিণী।

কৈলাস শিখরে, শঙ্করের ঘরে,
গিয়ে মা ভুলে থাক মায়।
মা ব'লে করিস্ না মনেতে
এ দুঃখ বলি গো মা কাকে,
বালিকা কালিকায়, না হেরে মা নয়নে,
গেছে অশ্রু জলে দিন উমা হর-অঙ্গনে।
আমি একে মা অবলা,
তাতে গো অচলা শক্তিহীন শক্তি-তত্ত্বে ঈশানী।

জয়নারায়ণ।

[৪২]

পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই।
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
বলে কই উমা কই।
কেঁদে রাণী বলে, একবার আয় মা
একবার আয় মা, একবার আয় মা করি কোলে।
অমনি দু-বাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কেঁদে রাণীরে বলে।
কৈ মেয়ে বলে আন্‌তে গিয়েছিলে!
তোমার পাষাণ প্রাণ,
আমার পিতাও পাষাণ
জেনে এলাম আপনা হ'তে,
গেলে না গো নিতে,
রব নাগো, যাব দুদিন গেলে।

গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়।

(৪৩)

পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা মায়া কি পাসরি
কৈলাসেতে বলে আমায় সবাই,
তোর কি মা নাই তোর কি মা নাই,
অমনি সরমে ম'রে যাই।
তাদের বলি আমার পিতে এসেছিলেন নিতে
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।
আমার মনের ব্যথা আছে মনে গাঁথা,
মা কি বলিবে অন্তে পিতৃদত্তা কন্তে
চক্ষে দেখে দিলে পাগল স্বামী, সকলি জান তুমি,
এ কি কবার কথা—
ঘরেতে সতীনের জ্বালা গো তাও ত শুনেছ সব
শিব-সোহাগিনীর প্রায় রেখেছেন মাথায়
সদাই কলকল রব।
তরঙ্গিণীর অভিমানের কথা,
আমার সয় না আমার সয় না
আমার হয় না সহ্য তা।
আমি ভাব কোথা যাব কোথায় গে জুড়াব,
কাঁদি ব'সে বিল্ববৃক্ষমূলে॥
হিমালয় আর কৈলাস শিখর
নহে দূর যাতায়াতে,
মনে হ'লে মা দিনে শতবার
তত্ত্ব নিলে ত পার মা নিতে,
বাৎসল্যভাবেতে তাচ্ছল্য কিসে শুনি কহ মা।
আমি হতেম তোমার মা জানাইতাম মা
মায়ের কত স্নেহ মা।
তোমার কঠিন হৃদয়, পিতাও নিদয়,
হোক মা ও হোক মা।
একবার তত্ত্ব ত নিতে হয়,
আমি এ দুখ শারদে মরি মনের খেদে,
কথায় কথায় কোন্ বা ব'লে পাঠালে॥

গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়।

(৪৪)

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
নিলে তার নাম, পূর্ণ মনস্কাম, সে আইলে গৃহে
আসেন শঙ্কর।
বিল্ববৃক্ষ মূলে করিব বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে এলে চণ্ডী, শুনবো আমরা চণ্ডী,
আস্‌বে কত দণ্ডী যোগী জটাধারী॥

অজ্ঞাত।

(৪৫)

গিরিরাজকে ডেকে দে গো,
আমার গৃহে গৌরী এল।
নাশিতে আঁধার-রাশি, উমা-শশী প্রকাশিল ॥
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে
না ডাকিতে আমার ঘরে,
কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ-মনে
গিরিপুরবাসিগণে, গিরিপুর আজ পুরে গেল।
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ,
ভক্তিভাবে ঘটস্থাপন, চণ্ডীপড়া সফল হ'ল ॥

শ্রীধর কথক।

(৪৬)

ওগো তারা আয় মা দুঃখ-পাসরা —
বল্ দেখি মা আমারে।
কন্যে দিয়ে দৈন্যের ঘরে ;
সদাই ভাবতেম তোমার তরে,
দুঃখে মন পোড়ে—
জামাই ভিক্ষা কোরে খায়,
শ্মশানে বেড়ায়, কোথা ছিলে
তুমি ভিখারীর ঘরে।
শুনে তোমার দুঃখের কথা হৃদয় বিদরে।
তোমার কথা শুনে, ভাবতেম মনে,
ফেটে যেত বক্ষস্থল।
মনের কথা বল আমায় বল গো বল
আমি শুনে লোক-মুখে, কাঁদতেম মনদুঃখে.
চক্ষে না রহিত জল ॥
এখন সে সব দুঃখ গেলো,
তাপিত প্রাণ জুড়ালো.
এখন হ'য়েছে আনন্দ তব মুখ হেরে ॥

হরু ঠাকুর।

(৪৭)

শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে
উমা এলেন হিমালয়।
কোরে নিরীক্ষণ, চক্ষে হেরে চাঁদ-বদন,
অভয়ায় গিরি-রাণী কয়।
আয় মা পূর্ণ শশী, স্বর্ণ-শশী বিধি আমায় দিয়েছে,
কপাল ফিরেছে,
একবার আয় গো মা কোলে, ডাকো মা বলে,
পাষাণেতে পদ্ম ফুটেছে।
গেলো মন-দুঃখ দূরে,
তোমার বিধুমুখ হেরে,
এলে করুণাময়ী মা করুণা কোরে ॥
বল্ মা আমার কাছে,
জামাই শিব এখন কেমন আছে।
শিবের সুমঙ্গল, শুনিলে সকল
শুন্‌লে পরে আমার জীবন বাঁচে।
মনে কর্ত্তেম আমি সদাই বাসনা,
উমা-ধনে আন্‌তে যাই।
ভাবতেম মনেতে, কাঁদ্‌তেম নিশি-দিনেতে.
চলিবার কিছু শক্তি নাই।
গিরি প্রাণ বাঁচালে তোমায় এনে,
পূর্ণ হলো বাসনা, ঘুচ্‌লো বেদনা সকল যন্ত্রণা।
তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন,
মায়ে-ঝিয়ে দেখা হতো না।
এখন জুড়ালো হৃদয়, দুঃখ গেলো সমুদয়,
হোলো কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরি পুরে ॥

হরু ঠাকুর।

(৪৮)

উমা গো যদি দয়া কোরে হিম-পুরে এলি।
আয় মা করি কোলে।
বর্ষাবধি হারায়ে তোরে, শোকের পাষাণ বক্ষে
ধোরে, আছি শূন্য ঘরে।
কেবল মরি নাই মা, বেঁচে আছি
দুর্গা দুর্গা দুর্গা নাম কোরে ॥
একবার আয় মা বক্ষে ধরি, পুত্র-শোক নিবারি,
চাঁদ-মুখে শঙ্করী ডাক মা বোলে ॥

শোকের অনল ছিল প্রবল, এসে নিবালে।
আমি অচলা নারী, অচলের নারী,
যেতে নারি কৈলাস-পুরে আনতে তোমারে।
আমার বন্ধু-বান্ধব নাই, কারে আর পাঠাই,
এলে,—দেখ্‌লাম মা তোমারে।
তুমি আস্‌বে বোলে সজীব বিল্বমূলে,
কল্লেম বোধন তার, সুফল আজ ফল্‌লো কপালে।

উদয়চাঁদ।

(৪৯)

সপ্তমী সুদিনে, গিরির ভবনে,
গৌরীর আগমন।
হোলো মঙ্গল-উৎসব, মহা মহোৎসব,
দুর্গা স্তব করে মহৎগণ।
এলো এলো ঈষাণী, শুনে পাষাণী,
গজ-গমনে যায় ধেয়ে, দৈবাৎ দরিদ্র যেমন,
পায় অমূল্য ধন, মেনকা পায় তেমন মেয়ে।

উদয়চাঁদ।

(৫০)

বল গিরি এ দেহে, কি প্রাণ রহে আর
মঙ্গলার না পেয়ে, মঙ্গল সমাচার ॥
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণতারা,
বৃথা এই আঁখি তারা, সব অন্ধকার।
খেদে ভেদ হয় মর্ম্ম, মিছে করি গৃহে কর্ম্ম,
মিছে এ সংসারধর্ম্ম সকলি অসার ॥
তুমি ত অচল পতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী কুমারী আমার।
বাঁচি বল কার বলে, দুখানলে মন জ্বলে,
ডুবিল জলধি-জলে, প্রাণের কুমার ॥
ত্রিজগতে নাহি অন্তে, একমাত্র সেই কন্তে,
না ভাব তাহার জন্তে তুমি একবার ॥

ঈশ্বর গুপ্ত।

(৫১)

ওহে গিরি কেমন কেমন যে মন করে প্রাণ।
এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছ পাষাণ ॥
ননীর পুতুলী তারা, রবিকরে হয় সারা,
নিয়ত নয়নে ধারা মলিন বয়ান।
ঘরেতে সতিনীজ্বালা, সদা করে ঝালাপালা,
লয়ে উমা রাজবালা, কিসে পারে ত্রাণ ॥
শিরে সুরতরঙ্গিণী, হয়ে শিব সোহাগিনী;
করি কল কল ধ্বনি করে অপমান ॥
সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলা নাথ ভিক্ষা করে,
যথাকালে খায় হ'লে, দিবা অবসান ॥
তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে,
সন্ধ্যাকালে ব'সে করে, সিদ্ধিরস পান।
ভালমন্দ নাহি চায়, সুখ-দুখ ঠেলে পায়,
ধুতুরার ফল খায় অমৃত সমান ॥
শ্রীফল পাইলে তায়, আর তারে কেবা পায়
মহানন্দে নাচে গায়, বাজায়ে বিষাণ।
ভৈরব ভৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেসে গেয়ে,
আছে কি না ছেলে মেয়ে, রাখে না সন্ধান ॥
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি করে কোন কর্ম্ম,
নিজ ভাবে নিজ-মর্ম্ম, নিজে করে গান।
লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী,
সমভাবে যোগভোগ. করে সমাধান ॥
বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন,
কর কর নৃপন, কৈলাসে প্রয়াণ।
দুর্গা নামে যাবে ভয়, তাহে কি বিপদ হয়,
আন আন হিমালয়, ঈষান ঈশানী ॥

ঈশ্বর গুপ্ত।

(৫২)

কি কর অচল-রাজ চঞ্চলায় আনিবার।
সম্বৎসর গত হ'ল তবু নাহি মনে কর ॥
তুমি তো পাষাণ রায়, কিছু দুঃখ নাহি তায়,
আমি যে অবলা নারী, কেমনে থাকিব আর ॥

অজ্ঞাত।

(৫৩)

আর কেন কাঁদ রাণি, উমারে আনিতে যাই,
গেলে যদি কৃত্তিবাস না পাঠান ভাবি তাই।
উমার আমার অঙ্গ-ছায়া, করে শীতল হরের কায়া,
পাঠায়ে কি ভব-জায়া, পাগল হবেন ভাবি তাই।

অজ্ঞাত।

(৫৪)

কি শুনালে গিরিবর উমা কি ভবনে এল।
ভবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলো।
উমা-শশী না হেরিয়ে, ছিল নয়ন অন্ধ হ'য়ে,
এবে, নয়ন-তারা নিরখিয়ে, আঁখি মম জুড়াইল।

অজ্ঞাত।

(৫৫)

আমার দুঃখ-পাশরা নয়ন-তারা আয় মা একবার
করি কোলে।
অভাগিনী জননীরে ডাক্ মা একবার মা বোলে।
কতদিন না দেখি তোমায়, ছিলেম আমি মৃত প্রায়,
জীবনের জীবন তুই আমার, জীবন দিলি এত কালে॥

অজ্ঞাত।

(৫৬)

উমা এলি মা, আয় মা, বাঁচি না তোমা ভিন্ন।
তুই মা উমা, প্রাণ-প্রতিমা,
তো বিনে মা পুরী শূন্য॥
এ দুঃখিনী, তোর জননী, অভাগিনী মা তোর জন্য।
হারা হ'য়ে তোমা ধনে, বারি বহে দু-নয়নে,
যে দুঃখ মা মায়ের মনে,
কি জানে অন্যে,
ভেবে তোমার চাঁদের আকার, দেহ আমার অবসন্ন।
হেরে তারা, নয়ন তারা,
নয়ন-তারা হলো ধন্য॥
দেখা হলো শুভক্ষণে, মা বলে' ডাক চাঁদ-বদনে,
পেলাম যদি এত দিনে,
অঞ্চলের স্বর্ণ।
আর ছাড়বো না, আর ভুলবো না,
আর দিব না, চাইলে অন্ন,
রসিক বলে অন্তকালে, একবার দিও অন্নপূর্ণ।

রসিক রায়।

(৫৭)

গিরি, কার কণ্ঠ-হার, আনিলে গিরিপুরে।
এতো সে উমা নয়
ভয়ঙ্করী হে দশভুজা মেয়ে,
উমা কোন্ কালে ত্রিশূলে অসুরে সংহারে॥
হায়, আমার সেই বিমলা, অতি শান্তশীলা,
রণ-বেশে কেন আস্‌বে ঘরে,
মুখে মৃদু হাসি, সুধা রাশি হে,
আমার উমাশশীর, এ যে মেদিনী কাঁপায় হুঙ্কারে ঝঙ্কারে॥
হায় হেন রণ-বেশ এল এলোকেশে,
এ নারীরে কেবা চিন্তে পারে,—
রসিকচন্দ্র বলে, চিন্তে পারিলে, চিন্তা থাকে না গো
যেন এই বেশে মা আমার কাল-ভয় নিবারে॥

রসিক রায়।

(৫৮)

এলি গো কৈলাসেশ্বরী আমার অন্নপূর্ণা।
তুই নাকি না কাশী-ধামে জীবকে বিলাস্ অন্ন॥
গিরি বলছেন আসি,
মোক্ষময়ী শিবের কাশী,
কাশীর গতি উমা-শশী, নাই নাকি মা তোমা ভিন্ন॥
আমি জান্‌তাম শিব ভিখারী,
ভিখারিণী তুই শঙ্করী;
শুনিলাম রাজ-রাজেশ্বরী, লোকে কয় ধন্য॥
শুনে মনে ভাবনা এই,
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রসবে যেই
আমার কন্যা তুই কি মা সেই,
জীবে যিনি দেন চৈতন্য।

জগতের মা, মা বলিস্ মা,
এর চেয়ে কি ভাগ্য উমা,
আমার মত কার আছে মা, কপাল প্রসন্ন।
জগৎ ভুলে যার মায়ায়,
ভুলেছে সে আমার মায়ায়,
একবার কোলে মা আয় মা আয়, মনোবাঞ্ছা করি পূর্ণ॥

রসিক রায়।

(৫৯)

যাও গিরি আনিতে নন্দিনী।
জলে প্রাণ না হয় হে ক্ষান্ত,
জলে প্রাণ দিব এখ'ন॥
নাই কি ধর্ম্ম পাষাণ হ'য়ে, আছ তুমি পাশরিয়ে,
শুনেছি কৈলাসে গিয়ে কন্যা আমার সন্ন্যাসিনী।
স্বপনে গত শর্ব্বরী, দেখা দিলেন সর্ব্বেশ্বরী,
উমা যে সর্ব্বমঙ্গলে সর্ব্ব-দুঃখ-বিনাশিনী॥

ব্রজ রায়।

(৬০)

প্রাণ থাকিতে আর তারারে,
পাঠাব না হে হিমগিরি।
যে দুঃখ দিয়াছে দক্ষ মনে হ'লে গুমরে মরি।
নয়ন-তারা হ'য়ে হারা ক'রে কত আরাধন,
সে দুঃখের হইয়ে শান্তি পুনঃ পেলাম তারাধন॥
সেই দিন হ'তে রাখি যে দিয়ে নয়ন প্রহরী।
তুমি ল'য়ে যাবে কেমনে বল,
তারা আমার অন্ধের বল,
শঙ্করের সম্বল কি বল শঙ্করি!
আমি বটে দরিদ্র, নহে অন্য ধনের অভিলাষ,
ঐ ধনে হইতে ধনী সন্ন্যাসী শ্মশানে বাস,
যত্নে তারা-রত্ন হৃদি-ভাণ্ডারে ধরি॥

ব্রজ রায়।

(৬১)

কে রণ-রঙ্গিনী কে নারী অঙ্গনে,
এলো চিনিতে না পারি।
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে এ নয় আমার প্রাণ-কুমারী।
দশ দিক দীপ্ত করা, এ রমণী দশ-করা,
বিবিধ আয়ুধ-ধরা, দনুজ-দলনী হেরি।
নহে মম কন্যে এ যে, এ সমর সাজে সাজে
মানসে অমর পূজে এ নারী-চরণ গিরি।
কি সুরী অসুরী হবে, দানবী মানবী কিবে,
যদি আমার উমা হবে, তবে কেন ভয়ঙ্করী॥

ব্রজ রায়।

(৬২)

নিশীথে শয়নে, দেখিয়ে স্বপনে,
নগেন্দ্র-রাণী খেদে কয়,
কৈ কৈ উমা কৈ, কোলেতে দেখ্লাম এই,
কোথায় মা উমা হ'লে নিদয়।
শয়ে ক্ষীর নবনী করে, উমা মায়ের অধরে,
দিতেছিলাম এই-ক্ষণ।
গিরি যাও যাও, উমা এনে দাও,
চঞ্চল হ'য়েছে মন।
ভিখারীর করে, সঁপিয়ে উমারে,
কেমন কোরে ধৈর্য্য ধরিব এখন।
ভাবি বছরাবধি, কবে উমা-নিধি,
আস্বেন আমার এ শূন্য ভবনে।
প্রাণের কার্ত্তিক গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী,
বিস্মৃত কি হ'য়েছ রাজন্॥

নীলকণ্ঠ।

(৬৩)

গা তোলো গা তোলো উমা, রজনী প্রভাত হ'লো;
মঙ্গল আরতি হবে উঠ মা সর্ব্বমঙ্গলে॥
যামিনী হইল গত; উদয় মা দিন-নাথ;
অলসে ঘুমাবে কত,
চাঁদ-বদনে মা মা বল।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করিছেন আগমন,
পূজিতে ও শ্রীচরণ, করে জবা, বিল্বদল।
তিনদিন রাখিয়ে বুকে, করি মা জনম সফল।
তুমি মা যাবে কৈলাসে, কি উপায় এ দাসের দাসে,
নীলকণ্ঠের বারমাসে বার রিপু প্রবল হলো॥

নীলকণ্ঠ।

[৬৪]

আমার মনে আছে এই বাসনা—
জামাতা সহিতে আনিয়ে দুহিতে গিরিপুরে
করিব শিব-স্থাপনা—
ঘর-জামাতা করে রাখ্‌বো কৃত্তিবাস, গিরিপুরে
করিব দ্বিতীয় কৈলাস।
হর গৌরী চক্ষে হেরবো বার মাস,
বৎসরান্তে আন্‌তে যেতে হবে না।
সপ্তমী, অষ্টমী, পরে নবমীতে মা যদি আসে,
হর আস্‌বে দশমীতে।
বিল্বপত্র দিয়ে পূজবো ভোলানাথে,
ভুলে রবে ভোলা—যেতে চাইবে না।

অজ্ঞাত।

[৬৫]

শারদ সপ্তমী উষা গগণেতে প্রকাশিল,
দশদিক্ আলো করে আমার দশভুজা মা আসিল।
কখন্ আসবে মেয়ে, ছিলাম তার পথ চেয়ে,
এবে যাই আমি ধেয়ে হৃদি-কমল বিকাশিল।
সিংহপৃষ্ঠে ভবরাণী গুহ গজানন বাণী,
সঙ্গে লয়ে নারায়ণী জয়া বিজয়া আসিল।
পুলকে পূরিল হিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া,
চল সখি উলু দিয়া বরণ ক'রে মাকে আনি গো!

অজ্ঞাত।

(৬৬)

উমার কারণে প্রাণে, যে যাতনা নিশি দিনে;
মা হ'তে বুঝিতে চিতে, ছলিতে না—দিতে এনে!
প্রাণ্ কাঁদে তাই সদাই কাঁদি　　কৈলাসে তাই যেতে সাধি,
রেখেছ তো বছরাবধি, প্রবোধি ছল-বচনে!
উমা ভাবে মা পাষাণী,　　লোকেও কয় পাষাণী রাণী,
আমি এ পাষাণ-অধিনী, এ কাহিনী কেউ না জানে!
কায়া তব পাষাণ্ ব'লে,　　অন্তরেও কি পাষাণ্ হ'লে?
অমন্ মেয়ের মায়া ভুলে, র'হলে গিরি কেমনে?
কৈলাসে যাই ব'লে যেতে,　　শিবের দোষ এসে শুনাতে,
"শরতে আস্‌বেন পুরেতে"—ব'লে ভুলাতে!
(ভাল!) আমি যেন অবোধ নারী, যা বুঝাও তাই বুঝি গিরি,
আনিতে গৃহে কুমারী, তোমার কি সাধ হয় না মনে?

মনোমোহন।

(৬৭)

ওহে গিরি! ত্বরা করি, আন গিয়ে প্রাণের গৌরী।
না হেরে সে মুখ-শশী, ধৈরয ধরিতে নারী॥
কি ছার মিছার গেহে,　　রব কার মুখ চেয়ে?
সবে মাত্র উমা মেয়ে—তাহে জামাতা ভিখারী!
ঘরে আমার নানা রতন,　　যার আমার বিভূতি ভূষণ,
অম্বর বিহনে বসন্, বাঘাম্বর হয়েছে শুনি!
তুমি তো পাষাণ রাজ,　　লোকে মোরে দেয় লাজ—
বলে "সম্বৎসরে আজো, তত্ত্ব না নিলে শেখরি!"

মনোমোহন॥

(৬৮)

মহিষি! দেখ আসি—এই তোমার সেই উমা-শশী!
ষষ্ঠীতেই আজ উদয় পুরে,রাকা পূর্ণ (আঙ্গিনায়) রাকা পূর্ণ-মাসী!
মরি কি মাধুরী, আঁখি জুড়ায় হেরি
আলো করে গিরিপুরী, নাশি তমঃ (ঘুচে গেল) মনের তমঃ রাশি
সম্বৎসর যার বিচ্ছেদ-খেদে,　　কাল কেটেছে কেঁদে কেঁদে,
সেই সাধের ধন লও মা হৃদে, আজ মনোসাধে।
"মা মা" ব'লে ডা'কছে উমা, গণাই ডাকছে "আয় না আই মা!"
ডা'কছে গুহ, বাণী,রমা—মুখে মধুর (মৃদু মৃদু) কিবা মধুর হাসি
আয় গো তোরা করি ত্বরা, বরণ করি নয়ন-তারা,
ঘরে নে যাই দিয়ে ধারা—সঙ্গে পুর (মিলে আমরা)
যত পুরবাসী!

মনোমোহন।

(৬৯)

হারানিধি উমা আমার, আয় মা একবার করি কোলে!
তাপিত প্রাণ জুড়াও মা আমার, শ্রীমুখে ডেকে মা ব'লে!
অভাগী মেনকা আমি, অচল আমার স্বামী,
সবে মাত্র কন্যা তুমি—　　বৎসরান্তে দেখা দিলে!
কত লোকের কত কথা, শুনে পাই মরমে ব্যথা,

সত্যি ক'রে বল মা তথা— শিবের ঘরে কেমন ছিলে ?
জামাই নাকি শ্মশানবাসী, ভস্ম মাখেন দিবানিশি,
গৃহে তুমি উপবাসী, সদা ভাস নয়ন-জলে ?

মনোমোহন।

(৭০)

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী।
অসিত বরণা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমা শ বাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী।
যোগিনীদল-সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহ-বাহিনী,
হেরিয়া রণ-রঙ্গিনী, মনে বড় ভয় বাসি।
উঠ হে উঠ অচল, পরান হ'ল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা সুধারাশি॥

গিরিশ।

(৭১)

আমার উমা এলো রে দেখ গো রাণী নয়ন ভরে,
দশভুজ ধরি, আহা মরি মরি, বিহরে সিংহোপরে॥
কিবা হেমোজ্জ্বল বরণে, লোটে চাঁচর চিকুর চরণে,
কিবা রক্তোৎপল আভা, হেম-জড়িত বিজলী-প্রভা,
মরি ঢল ঢল ঢল, সুধা চল চল, বিমল মধুর অধরে॥

গিরিশ।

(৭২)

ওমা কেমন করে পরের ঘরে,
ছিলি উমা, বল মা তাই।
কত লোকে, কত বলে, শুনে ভেবে ম'রে যাই॥
ম'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে বলবো হরে,
উমা আমার ঘরে নাই।

গিরিশ।

(৭৩)

বোঝাব মায়ের ব্যথা,
গণেশকে তোর আটকে রেখে
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন,
জান্‌বি তখন আপনি ঠেকে
তো বিনা কে আছে আমার,
গিরিপুরী ছিল আঁধার,
পাঠাব না তোরে তো আর,
নিতে এলে কৈলাস থেকে॥
জামাই সে তো পেটের ছেলে,
দোষ কি হবে হেথা এলে,
বেড়ান তিনি নেচে খেলে,
রাজা গিয়ে আন্‌বে ডেকে॥
বেড়ায় তো সে যেথায় সেথায়,
যে ডাকে সে তার কাছে যায়,
রাজার জামাই থাক্‌বে হেথাই,
প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে॥

গিরিশ।

(৭৪)

দেখে আয় তোরা হিমাচলে
ওকি আলো ভাসেরে।
উমা আমার আসে বুঝি,
উমা আমার আসেরে।
এ নহে অরুণ আভা,
নহে শশধর বিভা,
হিম-মাঝে বুঝি গৌরীর
গৌর আভা হাসেরে।
শারদ-শশী বঙ্কিম, করি ঐ আভাহীন,
পশ্চিম গগনে ঐ উমা-মুখ ভাসেরে।
বাজায়ে আরতি, আসিছে আমার পার্ব্বতী,
জুড়াতে মায়েরই প্রাণ
উমা আমার আসেরে।
বৎসর অন্তর আজ উমা আমার আসেরে।

নবীন সেন।

(৭৫)

কেন আজি হেরিলাম এরূপ স্বপনাবেশে,
একা দ্বারে ভবদারা দাঁড়ায়ে দুঃখিনী বেশে !
দেখিলাম ভবানীর　　নয়নে ঝরিছে নীর,
পশিয়াছে মুখ-শশী বিষাদ-রাহুর গ্রাসে !
সুবর্ণ জিনিয়া কায়,　　বিবর্ণ হ'য়েছে হায়,
বিমলার দেহে মলা তা'ও দেখিলাম ;
পরিহিত বাঘছাল,　　গলায় কপাল-মাল,
ভূতল-লম্বিত জটা হ'য়েছে চিকণ কেশে !
বগলে ভিক্ষার ঝুলি,　　হেরিনু র'য়েছে ঝুলি,
ক্ষুধায় আকুলা, কথা সরে না মুখে ;—
শুধু আধ আধ বোলে,
"ওমা, ভিক্ষা দে মা," বোলে,
প্রাণ-উমা কোথা গেল ভাসায়ে শোক-সরসে

রাজকৃষ্ণ ।

(৭৬)

ওহে গিরিরাজ,　　হেরিলাম আজ,
প্রাণের পুতুলী উমারে স্বপনে !
নাহি সেই কেশ,　　নাহি সেই বেশ,
সলিলের ধারা ঝরিছে নয়নে।
আহা, উমা মোর রাজবালা হ'য়ে,
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে কত দুখ সয়ে,
একি প্রাণে সয়,　　ওহে হিমালয়,
দহে প্রাণ উমা-বিরহ-দহনে !
যাও, হে ভূধর, আনিয়ে উমায়,
এ বিপদে ত্বরা বাঁচাও আমায়,
আমি জেতে নারী,　　তাই যেতে নারি,
নতুবা যেতেম উমা-আনয়নে।

রাজকৃষ্ণ ।

(৭৭)

কেমনে মা ভুলেছিলি এ দুখিনী মায় ?
পাষাণনন্দিনী তুইও কি পাষাণীর প্রায় ?
সম্বৎসর হল গত,　　তো বিরহে অবিরত,
কেঁদেছি, কহিব কত, আমি মা তোমায়।
শয়নে ছিল না সুখ,　　সদাই বিষণ্ণ মুখ,
পেয়েছি কতই দুখ, দিবা যামিনী ;—
আকাশে, হেরিলে শশী,　　ভাবি তব মুখ-শশী,
যাপিতাম সারানিশি, কাঁদিতাম, হায় !
কখন স্বপনে তোমা,　　হেরিতাম ওমা উমা,
পড়েছে মুখে কালিমা, কাতরা ক্ষুধায় ;—
অমনি জাগিয়া উঠি,　　যাইতাম পথে ছুটি,
বলিতাম যারে তারে—"এনে দে উমায়।"

রাজকৃষ্ণ ।

বিজয়া

(১)

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল, বেরোও গণেশ—
মাতা, ডাকে বারবার। তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ
প্রাণ, এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন, হায় হায় একি
বিড়ম্বনা বিধাতার। প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি,
রাজা রাণী, প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥

রামপ্রসাদ।

(২)

ওরে নবমী নিশি! না হৈওরে অবসাদ।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত, আপনি হইয়ে
হত, বধয়ে পরেরই প্রাণ।
প্রফুল্ল কুমুদ বরে, সচন্দন লয়ে করে; কৃতাঞ্জলি হৈয়ে
তোমার, চরণে করিব দান। মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ
দিনমাণ ভয়, যেন না সহিতে হয়, রে শিবের বচন বান।
হেরিয়ে তনয়া মুখ, পাশরিলাম সব দুঃখ; আজি
সে কেমন সুখ, হতেছে স্বপন জ্ঞান। কমলাকান্তের বাণী,
শুন ওগো গিরিরাণি! লুকায়ে রাখ না মারে, হৃদয়ে দিয়ে
স্থান ॥

কমলাকান্ত।

(৩)

কি হলো নবমী নিশি, হৈলো অবসান, গো!
বিশাল ডমরু, ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো ॥
কি কহিব মনো দুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ, মায়ের
মলিন হয়েছে অতি, ও বিধু বয়ান ॥
ভিখারী ত্রিশূল ধারী, যা চাহে তা দিতে পারি; বরঞ্চ
জীবন চাহে, তাহা করি দান। কে জানে কেমন মত, না
শুনে গো হিতাহিত; আমি ভাবিয়ে ভবের রীত, হয়েছি
পাষাণ, গো ॥
পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠান যায়;
মিছে আকিঞ্চন কেন, ক'রে ত্রিলোচন। কমলাকান্তেরে
লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে; হর, আপনি রাখিলে রহে,
আপনার মান, গো! ॥

কমলাকান্ত।

(৪)

ওগো উমা! আজু কি কারণে পোহাল যামিনী।
এত অনুচিত কেন গো করে শূলপাণি;
আমি উমার লাগিয়ে অনেক কেলেশ পেয়ে
এ তনু সফল করি মানি।
হেরিয়ে ও চাঁদ মুখ, পাশরিলাম সব দুঃখ,
আজু কেন কাঁদিছে পরাণি ॥
আমি তোমারে পাইয়ে, সকল দুঃখ বিস্মরিয়ে,
নাহি জানি দিবস রজনী।
আজু বিধি বিড়ম্বিল, মনের আশা না পুরিল,
এখন আমি কি করি না জানি ॥
সতত আমার মনে, তম সম তোমা বিনে,
জল বিনে যেন চাতকিনী!

অতি নিদারুণ হর, পাগল সে দিগম্বর,
কেনে দিলাম তাহারে নন্দিনী ॥
আমার মনের আগুণ, দ্বিগুণ উথলে কেন, মা !
বুঝি গিরি পাঠাবে এখনি।
কমলাকান্তের, নিষেধ না মানে প্রাণ,
না ছাড়িব চরণ দুখানি ॥

কমলাকান্ত।

(৫)

জয়া বল গো ! পাঠান হবে না,
হর মায়ের বেদন কেমন জানে না ॥
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার,
ও কথা আমারে বোলো না ॥
ওগো ! হৃদয় মাঝারে, রাখিব বাছারে,
প্রহরী এ দুটী নয়ন।
যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া !
তখনি ত্যজিব জীবন।
সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ,
তিন দিন যদি রয় না।
তবে কি সুখ আমার, এ ছার ভবনে,
এ দুঃখে প্রাণ আমার রবে না ॥
যাতনা কেমন, না জানে কখন,
বিশেষে রাজার কুমারী !
আর কত দুঃখ পাবে সেখানে জয়া !
হর যে জনম ভিখারী।
ওগো ! শ্মশানে মশানে, লৈয়ে যায় সে ধনে,
আপনার গুণ কিছু জানে না।
আবার কোন লাজে হর, এসেছেন লইতে,
জানে না যে বিদায় দেবে না ॥
তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণী !
উপদেশ কহি তোমারে।
কত বিরিঞ্চি— বাঞ্ছিত ওই পদ,
তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে।
কমলাকান্তের, নিবেদন ধর,
শিব বিনা শিবা পাবে না।
যদি জামাতা শঙ্করে, পার রাখিবারে,
তবে তোমার গৌরী যাবে না ॥

কমলাকান্ত।

(৬)

আমার গৌরীরে লয়ে যায়, হর আসিয়ে।
কি কর হে গিরিবর ! রঙ্গ দেখ বসিয়ে ॥
বিনয় বচনে কত, বুঝাইলাম নানামত,
শুনিয়া না শুনে কাণে, ঢোলে পড়ে হাসিয়ে ॥
একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার,
পরিধান বাঘছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।
আমি হে রাজার রাণী, ইহা কি সহিতে পারি,
সোণার পুতুলি দিলে পাথারে ভাসায়ে ॥

কমলাকান্ত।

শুনি গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়,
অণিমাদি আছে যার, চরণে লোটায়ে ;
কমলাকান্তের বাণী কি ভাব শিখর রাণী !
পরম আনন্দে গো ! তনয়া দেহ পাঠায়ে ॥

কমলাকান্ত।

(৭)

ফিরে চাও, গো উমা ! তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে, কোথা যাও গো ॥
রতন ভবন মোর, আজি হৈলো অন্ধকার,
ইথে কি রহিবে দেহে এ-ছার জীবন।
এই খানে দাঁড়াও উমা ! বারেক দাঁড়াও মা।
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো

দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ পানে।
বোলে যাও আসিবে আর, কতদিনে এ ভবনে।
কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও।
বিধুমুখে মা বলিয়ে মায়েরে বুঝাও, গো ॥

কমলাকান্ত।

(৮)

রজনী জননী তুমি পোহাও না ধরি পায়।
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়।
সপ্তমী, অষ্টমী গেল, নিঠুর নবমী এল,
শঙ্করী যাইবে কাল, ছাড়িয়ে দুখিনী মায়।
তুমি হ'লে অবসান, আমি হ'ব গতপ্রাণ,
বিজয়া-গরল পান, করিয়ে ত্যজিব কায়।

অজ্ঞাত।

(৯)

কি কর হে গিরিবর গেল যে নবমী-নিশি।
শত চন্দ্রনিভাননী মলিন হ'ল উমা-শশী।
মঙ্গলারি আগমনে, আনন্দিত সর্ব্বজনে,
আজ, উমা-শূন্য এ ভবনে, থাক্‌বো কি শ্মশানে বসি।

অজ্ঞাত।

(১০)

ঐ দ্বারে বাজে ডম্বুর, হর বুঝি নিতে এল।
নবমী না পোহাইতে অম্‌নি এসে দেখা দিল।
শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়,
আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল।
এই জগত মাঝারে, কন্যা গেলে বাপের ঘরে,
কার মেয়ে এমন করে, তিনদিনের বেশী চারদিন্ না রয়;
হর এবার যান ফিরে, উমারে রাখিব ঘরে,
এতে যদি কৃত্তিবাসের মনেতে রাগ হয় হ'ল ॥

অজ্ঞাত।

(১১)

শীঘ্র ক'রে উমা-ধনে সাজাইয়া দেও রাণি।
বিলম্ব হইলে পরে রুষিবেন শূলপাণি।
আসি দ্বারে বহুক্ষণ, বসে আছেন ত্রিলোচন,
না দেখিলে উমাধন, প্রলয় হবে এখনি।

অজ্ঞাত।

(১২)

ঐ নিতে এসেছেন হর, উমা তোমার বিদায় হ'ল।
আসিব বৎসর পরে, কি হবে ভাবিলে বল।
কেন মা কর রোদন, কর দুঃখ সম্বরণ,
ভাবিয়ে দেখ না মনে, তুমি কর কার ঘর।
বড় সাধ ছিল অন্তরে, থাকিব কিছুদিন তরে,
মা বলিব বদনভরে, রব কোলে কিছুকাল।
না পূরিল সব সাধ, কর মাতঃ আশীর্ব্বাদ,
ওই শুন শৃঙ্গনাদ, ডাকিছে মোরে কেবল।

অজ্ঞাত।

(১৩)

'যদি' একান্ত মন-বাসনা যাইতে পতি-ভবনে।
দেখ মোরে দুঃখিনী জননী বলে থাকে যেন মনে ॥
আমি তোর আসার আশা পেয়ে, রহিব বৎসরেক চেয়ে,
পুনঃ আসি দেখা দিও অভাগীর এ ভবনে।
আয় মা দি কনকাঞ্জলি, বিজয়া জয়া সকলি,
চুম্বি চন্দ্র-বদন, মুছে অশ্রু দুনয়নে।

অজ্ঞাত।

(১৪)

গিরি হবে হে নিতান্ত পাঠাইতে তব কন্যে।
নাই সুখ বাসে, সে কৈলাসে, নয়ন-তারা ভিন্নে ॥
তিন দিন বলে এলো চলে,
ত্রিনয়নী ত্রিলোক মান্যে,

হয় যে মম তিন যুগ সম,
দুঃখ কি বলিব অন্তে ॥
পেলেম করে আরাধন, তারা মোর সর্ব্বস্ব ধন,
তারা বিনে মম সম বাসে বাস অরণ্যে,
ত্রিভুবন, জ্ঞানশূন্য, সে কৈলাস ধাম অরণ্য
আমি যোগী, সর্ব্বত্যাগী।
হলেম তারা ধনের জন্তে ॥

ব্রজ রায়।

(১৫)

ত্বরা কর গিরিবর! দিবাকরে কর মানা!
তাহার উদয়ে আমার উমাশশী রহিবে না!
তুমি ত অচলপতি, উদয়াচলের প্রতি,
আজ্ঞা দেও যেন সম্প্রতি, দিনপতিকে ছাড়ে না!
তোমার শেখরোপরি; জলধর আছে গিরি,
তারা যদি রহে ঘেরি, তাহ'লেও পুরে বাসনা!
আমি তো অবলা নারী, বল কি করিতে পারি?
কর যাহে রহে গৌরী—গৌরী গেলে বাঁচিব না!

মনোমোহন।

(১৬)

আমার প্রাণ উমা,
আজ কি তুই যাবি গো মা, কৈলাস পুরে।
আমি চিরদিন দুঃখিত পুত্রশোকে,
তিনদিন সুখে ছিলেম তোর চাঁদ মুখে দেখে,
আজ কি মা যাবি ছেড়ে, হিমালয় শূন্য করে,
দিব, মা হয়ে বিদায় তোরে কেমন করে ॥

তোমার 'যাই' কথা সহে না আমার অন্তরে।
আমি ইচ্ছা করি মা তোমায়,
রাখি এই হিমালয় করিরে স্থাপন ॥
সদা সর্ব্বক্ষণ হায় হায় গো,
শিবকে পূজবো বিল্বদলে,
তোমায় পূজবো গঙ্গাজলে,
এই কালে পরকালে হবে কাল বরণ।

আমার এমন সুখের দিন,
বল আর কবে হবে,
জীবন জুড়াবে,
যেও না হরিষে বিষাদ করে ॥

কৃষ্ণলাল।

(১৭)

বিজয়া দশমী কাল হ'লো উদয়।
নিতে উমা-ধনে বৃষ আরোহণে,
গঙ্গাধর এলেন হিমালয় ॥

উমা গঙ্গাধরকে হেরিয়ে মনোদুঃখেতে
মায়ের কাছে যায়।

কেঁদে কেঁদে কয় হায় গো,
দেমা আমায় সজ্জা কোরে; করবী-বেঁধে
দাও শিরে,
যাই মা আমি কৈলাস পুরে,
প্রণাম হই তোর পায় ॥

এই কথা শুনে রাণী,
উমার মুখে, মরি দুঃখে,
বক্ষেতে ভাসে দুটী চক্ষের নীরে ॥

কৃষ্ণলাল।

(১৮)

দিও না আজ উমায় যেতে,
ওগো মা মেনকা রাণী।
আশুতোষে আশু তুষে,
বিদায় কর গো এখনি।

হাসি হাসি উমা এলো,
কেঁদে হ'লো খেলোখেলো,
কেন আজি পোহাইল নবমী রজনী ॥
ভেবে চিত্তে উমাশশী, যেন রাহুগ্রস্ত শশী,
হানিল হৃদয়ে আসি, কি শূল ত্রিশূলপাণি।

রসিক রায়।

(১৯)

নবমী-নিশি গো তুমি আর পোহায়ো না।
তুমি গেলে আমার উমা যাবে,
আমার নয়ন-জল আর শুখাবে না ॥
সপ্তমী আর অষ্টমীতে, আমি সুখে ছিলাম
দিনে রেতে,
আজি আমার মাথা খেতে, কাল কি দশমী
এল বল না ॥

অজ্ঞাত।

(২০)

যেও না যেও না নবমী রজনী,
সন্তাপহারিণী লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ী, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান,
যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন জলে।
প্রভাত কাকলী গান,
কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
ঊষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে।
হৃদয়েতে মেনকার,
উমা হেন পুষ্পহার,
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ অনলে।

নবীন সেন।

(২১)

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে!
মরি ত্রাসে কৈলাসে গে কেমনে মা দিন কাটাবে ॥
রবি শশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
ভূত দানা তার সদাই ফেরে,
মুখপানে তার কেবা চাবে ॥
ভিক্ষে করে আনলে পরে, তবে হাঁড়ি চড়বে ঘরে,
মন বোঝাব কেমন ক'রে,
কপাল পোড়া কে ঘোচাবে ॥
আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে,
মানুষ নয় বোঝাব কাকে,
সে দেখবে কি দেখবি তাকে,—
নিত্যি ভাংধুতুরা খাবে ॥

গিরিশ।

(২১)

কালকে ভোলা এলে বলবো,—
উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন করে।
বলে বলুক যে যা বলে, মানবো না আর
জামাই বলে;
যায় যাবে সে, গেলে চলে—
যা হয় তখন দেখবো পরে ॥
কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে, রব আর পরাণ ধরে ॥
আঁচল ধ'রে পাছে ছোটে,
ঘুমিয়ে উমা চমকে উঠে,
শশুর ঘর কি জানে মোটে, কত বাঁকি তারি তরে ॥

গিরিশ।

(২৩)

ডিমি ডমরু ধ্বনি,		শুনি চমকে রাণী,
বৃষভ ঘন ঘন গরজে।
(বলে) ঐ ভোলা আসে,		পরাণ কাঁপে ত্রাসে,
নিয়ে যেতে কনক সরোজে॥

পুরী করে আলো দেখা মা উমা,
নিয়ে যাবে তবে কি হবে ওমা—উমা,
কি কব কত বাজে বেদনা;—
মা হ'য়ে কত সব,		কেমনে গৃহে রব,
বল, ভোলারে—যাতে বোঝে॥

ক্ষেপারে ভুলায়ে,		বুঝায়ে রাখ ঘরে,
কি কব ওহে গিরি!		প্রাণ কেমন করে,
উমারে নিয়ে যাবে পরে,—
কি হ'লো বল বল,		উমারে নিয়ে চল,
ভোলা যেথা নাহি খোঁজে॥

গিরিশ।

শারদীয় সাহিত্য

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

[অক্ষয়চন্দ্র সরকার]

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব বড়ই বৃহদ্ ব্যাপার। বালক কাল হইতে বর্ষে বর্ষে নিত্য ক্রিয়ার মত, দিবাকরের উদয়াস্তের মত এই দুর্গোৎসব আমরা দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতেই দুর্গোৎসবের প্রকৃত গৌরব আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না।

শারদীয়া মহাপূজার প্রতিমায় সর্ব্বকালিক উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি-সমষ্টি আছে, পদ্ধতিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রণালী অন্তর্নিবিষ্ট আছে, এবং মানব কালে কালে যতপ্রকার উপকরণের আয়োজনে দেবভক্তি পরিপোষণের চেষ্টা করিয়াছে,—দুর্গোৎসবের উপকরণে তাহার সকল গুলিরই প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব সকল কালের সকল প্রকার পূজার সঙ্কলন বা Synthesis. শারদীয়া পূজা প্রকৃতই মহা পূজা। এরূপ পূজা আর কোন দেশে নাই। ইহা পূজার কল্পদ্রুম বা Encyclopaedia. স্বার্থ-চালিত জুর্বট সাহেবের প্ররোচনায় যেমন জনকতক সাহেব-সুভো কলিকাতার গড়ের মাঠে নানা দেশের শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেরূপ ভাবে জনকতক মুনি-ঋষির খেয়ালে বা জনকতক স্বার্থপর পুরোহিতের প্ররোচনায় এক সময়ে একেবারে এই মহানুষ্ঠান সংগৃহীত হয় নাই। যেভাবে মহাকাল এই বিশাল ধরণী-বক্ষে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন,যে ভাবে কাল মাহাত্ম্যে ভূপৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর উঠিয়াছে,—সেইভাবে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবে নানারূপ উপাসনা এবং নানারূপ উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে; অতীত ভক্ত বঙ্গবাসী অতীত সাক্ষীর পরামর্শমত সেই সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। যে বিবর্ত্তন-বিকাশ জড় জীব জগতের মূল নিয়ম, সেই নিয়ম বলেই সেই বৈদিক-কালের শক্তিরূপা অতসীবর্ণময়ী উজ্জ্বলা অনল শিখা আজি এই অধঃপতনের দুর্দ্দিনে সর্ব্বদেব পরিবেষ্টিতা মহা শক্তিতে চণ্ডীমণ্ডপ মণ্ডিত করিতেছেন। বেদের সেই দীপ্তি-শক্তি, উপনিষদের শব্দ-শক্তি, পুরাণের দেব-শক্তি, কাব্যের শোভা-শক্তি, তন্ত্রের মাতৃ-শক্তি, বাঙ্গালীর কন্যা-শক্তি, আর কত কালের কতরূপ শক্তি আজি ইতিহাসের মহা রাসায়নিক সংযোগে দ্রবীভূত অথচ বিবর্ত্তনে বিকশিত হইয়া দুর্গোৎসবের কেন্দ্রীভূতা মহা শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ধন-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি—গণ-শক্তি, রণ-শক্তি—পাশব-শক্তি, দানব-শক্তি—বৃক্ষ-শক্তি, শিলা-শক্তি অগণিত দেব-শক্তি সেই মহা কেন্দ্রের মহা বৃত্তভাবে মহা শক্তির শক্তি পোষণ এবং শোভাময়ীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এমন দালান ভরা ঠাকুর, এমন হৃদয় ভরা প্রতিমা, এমন কালভরা পদ্ধতি, এমন জগৎভরা উপকরণ, এমন মানসভরা পূজা, এমন প্রবৃত্তিভরা উৎসব আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব মানবের হৃদয়োৎসবের চরমোৎকর্ষ এবং বাঙ্গালীর পরম গৌরবের পরিচয়।

দিবা-স্বপ্ন ।

শিল্পী—শ্রী ভুবনমোহন দে

শারদীয় উৎসব

[কেশবচন্দ্র সেন]

হে প্রেমসিন্ধু, শারদীয় দেবতা, গ্রীষ্ম তোমার, বর্ষা তোমারি, শরৎ তোমারি, শীত তোমারি; পর্য্যায়ক্রমে ঋতু পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রত্যেক সময়ে তোমার নূতন করুণা বর্ষণ হইতেছে। বেদীতে যেমন আচার্য্য নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন সত্য প্রকাশ করেন, এই সকল ঋতু-আচার্য্য তেমনি নূতন ভাবে নূতন ভাষায় নূতন রূপে তোমার প্রেমতত্ত্ব প্রচার করে। বসন্তের কাছে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা কেবল তারই কাছে পাওয়া যায়। শরৎ যখন বেদী গ্রহণ করেন, তখন যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা শারদীয়। লোকে বলে চিরকাল কেন ঋতু একভাবে থাকে না? যে ফুল ফুটিল শীতে কেন তাহা শুকাইল? মূঢ় মনুষ্য বিচিত্রতা বুঝে না তাই বলে। ভাবুকের হৃদয় বলে, আমার প্রভুর বিচিত্রতা না থাকিলে শোভা বিহীন পৃথিবী মনোহর থাকিতে পারিত না। হে পিতা, তুমি কখন মাতা, কখন রাজা, কখন দুঃখীর বন্ধু, কখন পতিতপাবন, কখন পুরুষ প্রকৃতি, কখন বাল্যপ্রকৃতি, কখন নারীপ্রকৃতি। তোমার সৃষ্টির তত্ত্ব অতীব মনোহর এবং বিচিত্র। যখন জলে সরোবর পূর্ণ, জল উচ্ছ্বাসে তোমার খেলা দেখিতে কেমন। যখন জল শুষ্ক ছিল, যখন আকাশ হইতে সূর্য্য আগুন ফেলেন, পাহাড় হইতে উত্তাপের আগুন গড়াইয়া আসে, পৃথিবী হইতে উত্তাপ উঠে, শীতল জল পর্য্যন্ত গরম হইল, সেই ব্যপ্ত উত্তাপের মধ্যে জীব ক্রমে ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল। তখন শুষ্ককণ্ঠ জীব বলিল, "জল দেবতা এস, বারি বর্ষণে শীতল কর।" যেমন মেদিনীর প্রার্থনা, অমনি স্বর্গ হইতে জল আসিল. পৃথিবী জল চায়, মনও তেমনি ধর্ম্ম চায়। মনের ভিতর হইতে যত ব্যাধির রস, অপবিত্রতার রস শুকাইতে উৎসাহের অগ্নি, বিবেকের উত্তাপ উপকার করে বটে, কিন্তু অবশেষে মন বলে, এখন ভক্তি করি এস, নতুবা সুফল হবে না, প্রাণ শুষ্ক হইতেছে। অতএব প্রেমদা, প্রেম দান কর; ভক্তি দায়িনি, ভক্তি দাও; এই বলে ব্যাকুল প্রাণ যখন স্বর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তখন স্বর্গ কি চুপ করে থাকে? গ্রাম নগর জলে পূর্ণ হয়ে আনন্দে হাসিল। উদ্যান ক্ষেত্র যেন স্নান করিয়া উঠিল। গাছগুলির শোভা হইল। মলিন পত্রগুলি ধৌত হইয়া নূতন শ্রী ধরিল, এবং পাখী আসিয়া বসিল। যেমন মানুষের বাড়ীতে বৎসরান্তে দরজায় কাঠে রং দেওয়া হয়, তেমনি হইল। যেন প্রকৃতির বিশ্বকর্ম্মা নূতন রং দিলেন। গাছগুলি হাসিল। জীব যেমন আশা করিল তেমনি সাধ পুরিল। কে বড় বড় গাছ ঝাড়িবে, কে গিয়া তাদের পাতা পরিষ্কার করিবে? আর এত জল কে ঢালিবে? মা, তোমার দৃষ্টি সব জিনিষের উপর। তাই বৃষ্টিকে বলিলে, উদ্ভিদ্ রাজ্যে জল ঢেলে ধৌত করে দাও। মা যেমন ছেলেকে গঙ্গার ধারে বসিয়ে পা পরিষ্কার করে দেয়, তেমনি তোমার তরুলতা বালক বালিকাদিগকে স্নান করাইয়া দিল। গাছগুলি উত্তাপে ক্লিষ্ট হইয়াছিল, প্রকৃতি কেবল তাহাদের স্নান করায়। সেই বৃষ্টিতে কত ধান হবে। শরৎকালে ক্ষেত্রে বসে মাকে কত ধন্যবাদ দেব। শরৎ কালের বেদী থেকে বড় শিক্ষা হয়। খুব জল আকাশ ভেঙ্গে পড়ে পৃথিবীকে স্নান করাইল। এখন ধান্যবৃদ্ধি, লোকের কুশল শান্তি বৃদ্ধি। হে পরমেশ্বর তোমার প্রেরিত শরৎ গুরু অনেক দিতেছেন। তোমার নিকট এই প্রার্থনা, তোমার প্রেরিত শরতের নিকট কেবল প্রকৃতি আর গাছগুলি যেন উপকৃত না হয়; জীবও যেন উপকৃত হয়। বর্ষার পর শারদীয়-শ্রী কেমন। একটা বর্ষা এসে হৃদয়কে ঠাণ্ডা করে দিক্, আমরা শারদীয় উৎসব সম্ভোগ করি। বর্ষার শেষ, শীতের আরম্ভ। বর্ষার ঠাণ্ডা এ দিকে, শীতের শীতলতা ওদিকে। মাঝখানে বসে মা আনন্দময়ীর স্নিগ্ধকিরণ সম্ভোগ করি। পাপের গরম আর সয় না। আমাদের মনে যদি প্রত্যাদেশের বৃষ্টিধারা ক্রমাগত না পড়ে, স্বর্গের আনন্দ ধারা

না বর্ষণ হয়, তবে আমরা মরিব। আমরা জলজীব, আমরা ত স্থলজীব নই। শাস্ত্রে বলেছে, তোমার ভক্তেরা মীন স্বরূপ। তোমার ভিতর আমরা মীন স্বরূপ। শরৎ না হলে মন ত জেগে উঠে না। আছে হৃদয়ে ভক্তির মীন। পাঁকের পুকুরে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া জল শুকাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজে ডোবার ভাব হয়েছে। হে দীননাথ, করজোড়ে প্রার্থনা করি, ভক্তিবারি বর্ষণ করিয়া অন্তরের অন্তরে শারদীয় উৎসব আনয়ন কর। মরুভূমি তুল্য প্রাণ লইয়া বল আর কতদিন বাঁচিব? আমরা প্রেম ভিন্ন বাঁচি না। এখন বৃন্দাবন স্পৃহা মনে অত্যন্ত বলবতী হয়েছে। সেই প্রেমধাম, যেখানে প্রেম বর্ষণ, প্রেমনদী, যেখানে শারদীয় উৎসব। সেই মৎস্যেরা ধন্য আর তৃষ্ণায় কাতর হইতেছে না। হে দয়াময়, শরতের শোভার প্রতিরূপ অন্তরের অন্তরে কৃপা করে প্রকাশ কর। এ সময় আনন্দময়ী দুর্গে, তোমার ভক্ত ব্রাহ্মদের হৃদয় অধিকার কর। তুমিও শরতের দেবী, নতুবা এ সময় দুর্গা পূজা হয় কেন? পুতুল দুর্গা পূজা হইল, এখন শরৎ কালের আত্মার দুর্গা কোথায় রহিলে? বাহিরের ফাঁকি দুর্গা হাজার হাজার লোকের কাছে পূজা লইলে, খাঁটি দুর্গা কোথায়? এস মা, আমরা একবার দুর্গোৎসব করি। বাহিরের মৃণ্ময়ী দেবী পূজা অসার। চিন্ময়ী দেবী কৈলাস হইতে অন্তরে আসিতেছেন, আমরা একবার সপরিবারে সবান্ধবে আনন্দময়ীর পূজা করি, পুড়িয়া গিয়াছে মন স্নিগ্ধ করি। জলে পৃথিবী অভিষিক্ত হইয়াছে, হৃদয় অভিষিক্ত হউক। হে দয়াময়ী, তোমার প্রসাদ বর্ষণে হৃদয়ের যত শুষ্ক ভক্তিলতা প্রেমলতা সরস হউক। বাহিরের মাধবী লতা ধৌত ও সজীব হয়েছে, মনের মাধবী লতাকে সরস কর। মন শারদীয় হও, শারদীয় শোভায় শোভান্বিত হও! এস মা জননী, তোমার রাজ্য পরিষ্কার করে তুমি এসে বোস। তোমার জলে পরিষ্কৃত করে তোমার আসনে তুমি এসে বোস। আমরা শারদীয় উৎসব সম্ভোগ করিয়া স্নিগ্ধ হই। হে দয়াময়ি, হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন যত প্রকার পাপের উত্তাপ, অপবিত্র তার উত্তাপ, মনের মালিন্য প্রক্ষালন করে, হৃদয় স্নিগ্ধ করে, শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

আশ্বিন-উৎসব

[ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়]

এ অন্ধকার আলয়ে আনন্দময়ী আসিবেন কি? এই নিরানন্দনগরে নিস্তারিনী কি আসিবেন? মায়ের কি আর মনে আছে এই মৃত্যুভূমি? মৃত্যুভূমে মা আসিবেন কি? মহামায়ার মনে পড়িবে কি, আবার এই সুদূর সাহারার নক্ষ! মা আবার কি মুখ তুলে চাহিবেন, আত্মদ্রোহী মাতৃদ্রোহী সন্তানদিগের উপর? ওমা! তোমার মনে আছে, আমার যে নাই। আমি মায়ের মুখ ভুলিয়া গিয়াছি! ওমা! সেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আর হইল না! সেই কি স্বপ্নের মত দেখা হয়েছিল গো! জননী হইতে হায় আমি পৃথক হইয়াছি! মৃত্যুভূমে মাতৃমুখ বিস্মৃত হইয়াছি। চিত্তবিকারে মাতৃচরণ ভুলে গিয়াছি। যে চরণ-রেণু হইতে বিশ্ব-চরাচরের চলৎ-শক্তি, যে চরণে ব্রহ্মাণ্ড বাঁধা,—হায়! আমি তাহা বিস্মৃত! ধন্য স্মরণ-শক্তি! মায়ের চরণ ভুলিয়াছি, সেই স্নেহ-বিস্ফারিত নয়নও ভুলিয়াছি। মায়ের সে মুখ আর আমার মনে নাই! সেই করুণাময় করুণ কোমলতাময় মুখখানি তোমরা কি কেহ দেখেছ? আমরা দেখেছিলাম, পাপে পড়ে পাশরিয়াছি।

মহামায়া মৃত সন্তানেরও মুখচুম্বন করেন। মা কতদিন আদর করে মুখচুম্বন করিতে আসেন। হায় তখন চোখ

বুঝি! সে মুখ দেখি না, নয়ন মেলিতে সাহস হয় না! * * তোমরা মায়ের মুখ দেখ, জননীকে দেখিয়া জন্ম সার্থক কর, জীবনের সব জ্বালা জুড়াও। তোমরা মাকে দেখ! আমি—আমি আর এ জনমে বুঝি দেখিলাম না!

জগৎবাসী! জগদ্ধাত্রী দর্শন কর! বঙ্গবাসী! তুমি যে মায়ের বিশেষ অনুগৃহীত; অনুগৃহীত বলিয়া কি হায় এই অধঃপতন! এই আত্ম-বিড়ম্বনা! এই আত্মহত্যা! রে অকৃতজ্ঞ! এই আশ্বিন-উৎসব আর কোথায় আছে? আনন্দময়ীর আশ্বিন-উৎসব যে বঙ্গভূমির নিজস্ব সম্পত্তি! শরৎচন্দ্র এমনতর আর কোথায় ফোটে। শারদীয়া শোভা এমন শোভনীয়া আর কোথায় হয়! আব্রহ্মাণ্ডেও আর্য্যাবর্ত্ত অগ্রগণ্য;—আর্য্যাবর্ত্তের উচ্চ আসন আজ কার! হায় এই বিকলাঙ্গ বঙ্গভূমির! আনন্দময়ীর অতুল আনন্দ-বৈভবের আজ বিশেষ অধিকারী তোমরা বাঙ্গালী! দাও, লও, বিলাও, সব দিকে ছড়াও, লুট, লুটি, আনন্দের আজ মহা হরিলুঠ!! আনন্দের এমনতর অতি-বর্ষণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আর কবে কোথায় হইয়াছিল? কোন্ উৎসবে, কার উৎসবে, কবে কোথায় হয় বল দেখি। সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছি উত্তর দাও!

এ যে আদ্যাশক্তি আনন্দময়ীর বড় আনন্দের উৎসব। এ যে অকাল বোধনের উৎসব! এটী যে সর্ব্বমঙ্গলার সোহাগের শারদোৎসব! সর্ব্বশক্তিময়ী শরৎকালে সোহাগ করিয়া "পিতৃ-গৃহে" আসেন! করুণাময়ীর এটী কন্যা-ভাব। কন্যা-ভাবের মত কোমল ভাব কি আর আছে! কৃপাময়ী কন্যা-ভাবে আশ্বিনে আগমন করেন। বঙ্গবাসী আদর দ্বারা তাঁর উপাসনা করে। আশ্বিনের উৎসব যে আমাদের আদরের উপসনা! এ যে মেয়ের আবদারের আসা! তাই না এত আনন্দ! আদর-আবদারে যত আনন্দ এত আর কিসে? মা মেয়ে হ'য়ে আসেন! মেয়ের এত আনন্দদায়িনী, আনন্দময়ী, আনন্দ-সুখী আর কে? ঐ দেখ রে দেখ। করুণাময়, করুণ, কোমলতাময়, সেই মোলায়েম মুখখানি! সেই মোলায়েম, সেই মধুর, সেই মহিমাময়, সেই মৃদু হাস্যময় সেই সুস্নিগ্ধ শারদ-জ্যোৎস্নাময় মুখখানি! দয়ার দুগ্ধধারা ঝরিতেছে, সন্তানার সর্ব্বক্লেশসংহর শীতল সমীরণ বহিতেছে মায়ের মুখারবিন্দ হইতে! ঐ দেখ শান্তি! ঐ দেখ সৌন্দর্য্য! ঐ দেখ আনন্দ! ঐ দেখ আদর! ঐ দেখ স্বর্গ! ঐ দেখ সুখ! ঐ দেখ অনন্তের দিব্য আলোক,—মায়ের ওষ্ঠদুখানিতে ফুটিয়াছে! সব দিকে সমান ছুটিয়াছে! পৃথিবী পুলকিত, দিক্ প্রসন্ন, প্রকৃতি প্রফুল্ল, সেফালিকার সরস নিশ্বাস লইয়া শরতের চাঁদ হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে! ওমা! তুমি কি আসিলে! দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, লজ্জা-নিবারিনী ভয়হারিনী কি এলেন! শরদা সর্ব্বমঙ্গলা কি সম্বৎসর পরে এ ভগ্নপুরে দেখা দিলেন! ওমা! ওমা! মা! জগজ্জননী! তুমি কি এলে মা!!

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

মৃত্যুভূমে আজ মঙ্গল বাজনা বাজিতেছে! ওমা! এ তোমারই মহিমা। অঙ্গনে আনন্দ-আল্পনা! বোধন ঘরে আনন্দ-দীপ! বালক যুবক আনন্দ-মঙ্গল গাইতেছে! গৃহে গৃহে আনন্দ বাজার। রাজপথে আনন্দ রোল! পূজার বসনের প্রতি সূত্র হইতে আনন্দ উছ্‌লে পড়ছে। বঙ্গের বক্ষ, বঙ্গীয় হৃদয়, আনন্দে আজ উদ্বেলিত! আমোদে যথার্থই আজ "আটখানা"। নিত্য নিরানন্দের সংসারে এ আনন্দ, এত আনন্দ—ওমা! এ কেবল তোমারই মহিমা!

মা গো! ভবসাগরে পড়িয়া বড় ভয় পাইতেছি। অসংখ্য শঙ্কা, অসংখ্য সঙ্কট সদাই কিন্তু চঞ্চল করে। হে সঙ্কট-নিবারিণি! এই মহাসঙ্কটময় মর্ত্তজীবন হইতে মুক্ত কর।

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি, দুর্গেদেবি নমোঽস্তুতে॥

আগমনী

[পূর্ণচন্দ্র বসু]

বেদান্তবাদী যথার্থ বলিয়াছেন, এ সংসার মায়াময়। মায়াময় হিন্দুর সংসার ও পরিবারমণ্ডলী। যে পরিবার-পতি সংসার পাতিয়াছেন, চারিদিকেই তাঁহার মায়া—পিতা মাতা ভাই-ভগিনী, পুত্র কলত্র, সকলই মায়াময়। বৃদ্ধ পিতাকে হিন্দু চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারেন না; মাতার মধুর বাক্য শুনিলে তাঁহার হৃদয় জুড়াইয়া যায়। হিন্দুর জায়া তাঁহার প্রাণসমা প্রিয়তমা। সবাই তাঁহার হৃদয় বন্ধনে গ্রথিত—পিতামাতা ভক্তি ও প্রেমে গ্রথিত জায়া প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ। যাঁহারা স্নেহসূত্রে গ্রথিত সেই পুত্রগণ মায়ার পুত্তলী। হিন্দুর পুত্র স্নেহরসে মাখা, কিন্তু পুত্র অপেক্ষা কন্যা বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা মায়াবিনী। পুত্র পালনীয়, শাসনীয়; কন্যা কেবল পালনীয়া, শিক্ষনীয়া উভয়েই। পুত্র অপেক্ষা কন্যার হৃদয় আরও কোমল। সেই কোমল হৃদয়ে কন্যা শিশুকালে জনক জননীকে একেবারে মোহিত করিয়া রাখে, কন্যার আচরণ, ব্যবহার তাহাদের একান্ত মনোহরণ করে। তাহারা জানে, কন্যা দুদিন বাদে পরগৃহে যাইবে, তাই সে তত মায়াবিনী হয়।

হিন্দুর সংসার যেমন মায়াময় তেমনি ধর্ম্মময়! সেকালে আর্য্যেরা গৃহী হইতেন, কেবল ধর্ম্ম সাধনার জন্য। তাঁহাদের গৃহ অতিথির আশ্রয়, গুরুজনের সেবাস্থান. দেবতার অর্চ্চনালয় এবং ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র। সেকালে ব্রহ্মচারী সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতেন কেবল ধর্ম্মভাবের পরিণতি সাধনা করিবার নিমিত্ত। গৃহবাসে ধর্ম্মভাবের সম্যক্ পরিপাক না হইলে সংসারী তৃতীয় আশ্রমে যাইবার উপযোগী হইতেন না। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র স্বর্গের দ্বারস্বরূপ ছিল। হিন্দুমতে সংসার-ধর্ম্মে পরিণত না হইলে স্বর্গধাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। তাই সেকালে হিন্দুর গৃহ দেবতার অধিষ্ঠান ভূমি ছিল।

গৃহী কি করিতেন? তিনি পরিবার মধ্যে মায়ায় পরিবৃত হইয়া কি চিরকাল থাকিতেন? তিনি জানিতেন গৃহপুর তাঁহার গন্তব্য স্থলে যাইবার পথ মাত্র। তাঁহার যাইবার স্থান মায়াময় গৃহের অনেক দূরে। সেই স্থানে যাইবার জন্য তিনি গৃহধামে প্রস্তুত হইতেন। যে মায়ায় পুত্র পরিবারগণ আবদ্ধ, সেই মায়াকে তিনি সংসার হইতে অপনীত করিয়া ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে নিয়োজিত করিতেন। তিনি পিতৃভক্তিতে সর্ব্বপালনকর্ত্তাকে সর্ব্বোপরি পিতৃরূপে দেখিতেন। জননীর উপর বিশ্বজননীকে পূজা করিতেন। তদপেক্ষা আরও নিকট ভাবের অধিকারী হইলে, যশোদা যেরূপ ব্রজদুলালকে একবার চক্ষুহারা করিতেন না তদ্রূপ নিকট-ভাবে ইষ্টদেবকে তিনি পুত্রবৎ দেখিতেন। পুত্র বাৎসল্য তখন ঈশ্বরে গিয়া স্থাপিত হইত। যে স্নেহে লোকে পুত্রকে ভালবাসে, সেই স্নেহে আর্য্যঋষি ঈশ্বরকে ভালবাসিতেন। তাঁহার ভালবাসা তদপেক্ষাও ঘনতর হইত। যে বাৎসল্য রসে নিমগ্ন হইয়া ঋষি ঈশ্বরকে আরও ঘনিষ্টভাবে দেখিতেন। তখন তাঁহার যশোদার ভাব গিয়া মেনকার বাৎসল্যোদয় হইয়াছে। যে বাৎসল্যোদয়ে পাষাণীও গলিয়া যায়, সেই বাৎসল্যে ঋষি ইষ্টদেবকে হৃদয়-পুরী মধ্যে স্থাপিত করিতেন। তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন, ক্ষীর ননী খাওয়াইতেন, আদরে হৃদয়ে বসাইতেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না। মাতা যেমন পুত্রকেও লুকাইয়া কন্যার স্নেহ-পাশে বদ্ধ হইয়া তাহার তৃপ্ত্যর্থ নিজ গোপনীয় সমস্ত ধন বিতরণ করেন, আর্য্যঋষি তেমনই ভাবে ঈশ্বরকে হৃদয় খুলিয়া সমস্ত ভালবাসা অর্পণ করিতেন। এই ভালবাসাভাব আগমনীতে প্রকটিত।

কন্যার প্রতি মাতার যতদূর হৃদয়ের টান, ততদূর টানে পূর্ব্বতন ঈশ্বরপরায়ণ আর্য্যগণ ব্রহ্মানুরাগী ছিলেন। সাত্ত্বিক বাৎসল্যরসে নিমগ্ন হইয়া দেবতাকে পুত্রবৎ স্নেহ, পুত্রবৎ কেন, মাতা যেমন কন্যাকে স্নেহ করেন ততই স্নেহে

দেবতাকে হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ এই কথা বলিলেই তাঁহাদের সাত্ত্বিক বাৎসল্যভাবের সম্যক্ পরিচয় হয় না। যদি বল, পুত্র অপেক্ষা কন্যার প্রতি মাতার অধিক টান কেন হয়? তাহার একটি কারণ এই, কন্যা সর্ব্বদা পরগৃহেই থাকেন; চক্ষের অন্তরালে থাকাতে কন্যার জন্য মাতা অধিকতর ব্যাকুলা। তিনি কন্যার নিমিত্ত যেন সতত অন্যমনস্কা। তিনি কন্যার জন্য যখন তখন ভাবিতেছেন। সেই কাতরতায় তিনি মধ্যে মধ্যে কন্যাকে নিজপার্শ্বে আনিয়া বিশেষরূপে যত্ন করেন। যাহাকে এতদিন যত্ন করিতে পারেন নাই, তাহাকে পাইয়া মনের সাধে যত্ন করেন। সেই যত্নে কন্যা মাতার বিশেষ আদরিনী! কন্যারও হৃদয়-ব্যথা উথলিয়া উঠে। তিনি শ্বশুর গৃহের সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট মাতাকে জানান। দুজনে একসঙ্গে বসিয়া অশ্রুজলে চক্ষু ভাসাইয়া দেন। তাহাতে তাহাদের হৃদয়-ব্যথা আরও বর্দ্ধিত হয়; কন্যা, মাতার আরও নিকটবর্ত্তিনী হন। আবার যখন মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন হইয়া সেই কন্যাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাওয়া হয়, তখন মাতার সমুদয় হৃদয় ব্যথা উথলিয়া উঠে। সেই হৃদয় ব্যথায় মাতা কাঁদেন তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া কন্যারও ক্রন্দন আইসে। এইরূপে কন্যার প্রতি মাতার টান চিরদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উমার প্রতি মেনকার টান তদ্রূপ চিরদিনের টান। তাহা চিরদিন বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাঁহারা একান্ত ঈশ্বর-পরায়ণ, তাঁহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা তদ্রূপ চিরদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একবার তাহাদের হৃদয় হইতে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলে তাঁহারা কাতর হন। আবার ব্রহ্মকে লাভ করিয়া দ্বিগুণতর যত্নে তাঁহাকে হৃদয় কন্দরে স্থাপন করেন।

কিন্তু কন্যার প্রতি মাতার টান সর্ব্বস্থলে সমান প্রকটিত হয় না। কন্যার অবস্থানুসারে তাহা প্রকটিত হয়। কন্যার অবস্থা ভাল হইলে মাতার টান কিছু কমে না, তাহা কেবল সকল সময়ে বাহ্য কাতরতায় তত প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যে স্থানে কন্যার অবস্থা তত সুখের নহে, সে স্থলে মাতার কাতরতা দেখে কে? তাঁহার কাতরতা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া বাহিরে দেখা দেয়। কন্যা রাজরাণী হইলে মাতার যে একেবারে কাতরতা নাই এমত নহে, তবে তাঁহার হৃদয়-ব্যথার অনেক দূর শান্তি হয়। কন্যা রাজরাণী হইলে যে পরিমাণে সেই ব্যথর শান্তি হয়, কন্যা ভিখারিণী হইলে তাঁহার ততোধিক অশান্তি ঘটে। কাতরতার আর ইয়ত্তা থাকে না। মাতা অহঃরহ অশ্রুজলে ভাসিতে থাকেন। উমার জন্য মেনকার কাতরতা ততদূর অশান্ত ছিল। সেই কাতরতায় পাষাণও গলিয়া গিয়াছিল। গিরিরাজ গলিয়া গিয়া উমাকে আনিলেন। ব্রহ্মের জন্য মানবহৃদয়ের কাতরতা এইরূপ হওয়া চাই, যে ঈশ্বর-পরায়ণতা ততদূর কাতর নহে, সে ঈশ্বর-পরায়ণতার সম্যক পরিণতি নাই। ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকটস্থ হইলে পাষণ্ডের ভক্তি সঞ্চার হওয়া চাই। তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাওয়া চাই। এই রাগই প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগ। এই রাগের ছবি আগমনীতে দেওয়া আছে।

সেই বসন্তকালে বঙ্গবাসী দেবপরায়ণ একবার দুর্গাপূজার উৎসবে মাতিয়া ছিলেন। সে উৎসব মনে অনেকদিন জাগরিত ছিল। কিন্তু সে উৎসবের তরঙ্গ মনে মনে বিলীন হইতে লাগিল। তখন সাত্ত্বিক বঙ্গবাসীর হৃদয় দেববিরহে কাতর। তিনি ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিরূপ একবার প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে যে ভগবৎ শক্তি জাজ্জ্বল্যমান, তাহা ভগবতীতে আঁকিয়া ছিলেন; ঈশ্বরভক্তের অন্তরে যে ঐশ্বর্য্য, তাহা লক্ষ্মীতে দিয়াছিলেন; ভক্তের যে উজ্জ্বল দিব্যজ্ঞান ও পবিত্রতা, তাহা সরস্বতীতে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, ভক্ত-হৃদয়ের যে অদম্য বীরত্ব, যে বীরত্বে সমস্ত পাপসঙ্করূপ পাপাসুর বিজিত হয়, যে সংযম-বীরত্বে রিপুকুল বশীভূত হয়, ভক্ত হৃদয়ের সেই বীরত্ব, যাহা ভগবৎ শক্তিরই অঙ্গ, তাহা কার্ত্তিকের মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান দেখিয়াছিলেন, তবে ততদূর বীরত্ব নহিলে কি যোগসিদ্ধি লাভ হয়? ভগবৎ-শক্তি-প্রসূত সেই সিদ্ধি গনেশের প্রতিমায় অগ্নিবৎ উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া তিনি যে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখেন, যাঁহাকে কার্য্যে, অনুষ্ঠানে, ধ্যানে, ধারণায় হৃদয়ে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন, সেই দেবার্চ্চনার উৎসবে তিনি একদা যেরূপ মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহরাগে কত যত্নের সহিত পূজা করিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি কখন ভুলিতে পারেন? আবার বঙ্গীয় ভক্ত হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। ভক্ত সেই দেবমূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। মাতা যেরূপ পরগৃহবাসিনী কন্যার

স্বপ্ন দেখেন, বঙ্গীয় ভক্ত সেইরূপ দেবস্বপ্নে কাতর হইলেন। কেন তিনি এতদিন দেবতাকে দূরে রাখিয়াছিলেন? আর কি তিনি সে ঈশ্বরকে ধ্যানে আনিতে পারিবেন?

তিনি যে অনেক কষ্টে ভগবৎ-শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছিলেন। সে সংযম তাঁহার মনে আছে যে সংযম রিপু ও ইন্দ্রিয়দমন হইয়াছিল। সেই অগ্নিতেজ তাঁহার স্মরণ হইল, যে অগ্নিতেজে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার স্মরণ হইল যে তত্ত্বজ্ঞানে তিনি পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন; সেই হৃদয়-পূর্ণতা তাঁহার স্মরণ হইল, যে পূর্ণতায় তিনি সমস্ত ভগবৎ বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন; এই সমস্ত স্মরণ করিয়া তিনি সমগ্র ভগবৎ-শক্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। এই কৈবল্যদায়িনী ভগবৎ শক্তিকে তিনি স্বপ্নে প্রতীয়মান দেখিতে লাগিলেন। অনেক দিনের বিরহে ভক্তি এইরূপে প্রকটিত হইল। বিরহে ভক্তি এইরূপ স্বপ্নময়ী হইয়া উঠে। কৃষ্ণবিরহে রাধিকা শতবৎসর ধরিয়া শ্যামস্বপ্নে জীবিতা ছিলেন। মেনকাও স্বপ্নময়ী ভক্তি। বিরহেই ভক্তির প্রকৃতরূপ প্রকটিত হয়। তাই পরমভক্ত নারদ বলিয়াছেন;—

"তদর্পিতাখিলাকারতাতদ্বিস্মরণে
পরমব্যাকুলতেতি।"

নিজকৃত সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ এবং তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে যে চিত্তের একান্ত ব্যাকুলতা জন্মে তাহারই নাম ভক্তি।

বিরহেই অনুরাগের প্রকোপ। অনুরাগের প্রকোপ মিলনের জন্য। বিরহেই ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন হয়।

ভক্তের কাছে যেমন দেবতার আদর, তেমনি দেবতার কাছে ভক্তির আদর। ভক্তি যেমন দেবতার প্রিয়, ততদূর প্রিয় আর কিছুই নাই। দেবী যে ভক্তের নিকট বসন্তোৎসবে উদয় হইয়াছিলেন, তাহার ভক্তি ছয় মাস পরে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্দ্ধিতা ভক্তির নিকট চির যৌবনা উমা তাই কন্যাভাব ধরিলেন। সন্তান বৃদ্ধ হইলে মাতা কেমন কন্যাস্থানীয় হয়েন, বৃদ্ধা ভক্তির নিকট, উমা সেইরূপ কন্যাভাবে থাকিলেন। সন্তানের পালনীয়া মাতা; সন্তানকে যে ভাবে দেখেন, আজি উমা বৃদ্ধ ভক্তকে সেই ভাবে দেখিতেছেন। ভক্তও সেইজন্য বাৎসল্যরসে দেবীকে গৃহে আনিতেছেন। একদিন মাতৃভক্তিতে উদ্বোধিত হইয়া যাঁহাকে পূজা করিয়াছেন, আজি কন্যা বাৎসল্যে তাঁহাকে আদরে হৃদয় মন্দিরে আহ্বান করিতেছেন। এ আহ্বান অতি মধুর, সঙ্গীতের ন্যায় মধুর। সেই মধুর সঙ্গীত রবে আগমনী ধ্বনিত হয়। আগমনী হৃদয়ের আহ্বান-গীত— দেবীকে ভক্তহৃদয় আহ্বান করিতেছে। দেবীও ভক্তের হৃদয়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই পরস্পর আকর্ষণের মিলন-ছবি দুর্গোৎসব। আগমনী সেই আকর্ষণ শক্তি। বোধনে ভক্তির উদয়, প্রতিষ্ঠা ও ঘটস্থাপনা; আর মিলনের ফল দশভুজা প্রতিমা। ভক্তি-জগতে এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল, যাহা একদিন ঘটিয়াছিল, জগতে তাহা অমূল্য নিধি। সে অমূল্য নিধি কি জগৎ ভুলিতে পারে? তাই তাহা প্রতিবৎসরে ভক্তির উচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করে—পূজা করে। বাস্তবিক এ আদর্শ প্রতিবৎসর নয়ন-ছবি-রূপে জাগরূক রাখা আবশ্যক। এ আদর্শ ভক্তির দেবত্ব। দেবত্বের পূজায় সত্ত্ব-গুণেরই গৌরব বৃদ্ধি করে।

এই উদ্দেশেই কালিকাপুরাণ পৌরাণিক ভাষায় বলিতেছেন;—

"পূর্ব্বকালে সায়ম্ভুব মনুর অন্তরে দেবী ভগবতী, দেবগণের হিতের নিমিত্ত দশভুজা রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। উহা মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে জগতের হিতের নিমিত্ত সংঘটিত হয়। পূর্ব্বকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল, প্রতিকল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রতিকল্পেই দৈত্যদিগের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় এবং রাবণ, রাক্ষস ও রামও প্রতিকল্পে উৎপন্ন হন। প্রতিকল্পে ঐ উভয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হয় এবং পূর্ব্বের মত দেবতাদিগের সহিতও বানের সঙ্গ হয়। এইরূপ হাজার হাজার রাবণ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে; ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও এইরূপ প্রবৃত্তি হইবে। সকল দেবগণ কল্পে কল্পে দেবীর পূজা ও স্বসৈন্যের নীরাজন করেন; অতএব মনুষ্যদিগেরও যথাবিধি দেবীর পূজা করা উচিত।"

দেবী কে? এই দেবী-তত্ত্ব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

"একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দকে বলিতেছেন, দুর্গা আদিভূতা নারায়নী শক্তি। আমার ঐ শক্তি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারিণী। আমার ঐ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মাদি দেবতা সকল বিশ্বসংসার জয় করেন। ঐ শক্তি হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি। আমি জগতের সংহারের নিমিত্ত দেব দেব মহাদেবকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছি। আমার ঐ শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি ও লজ্জাস্বরূপিনী। উনিই গোলকে রাধিকা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, কৈলাসে সতী এবং হিমালয়ে পার্ব্বতী। উনিই সরস্বতী ও সাবিত্রী। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি, ভাস্করে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শৈত্য শক্তি, শস্যে প্রসূতিশক্তি, ধরণীতে ধারণাশক্তি, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ্য শক্তি, দেবগণে দেবশক্তি, তপস্বীতে তপস্যাশক্তি, সকলই উনি। আমার ঐ শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুক্তিরূপা এবং সাংসারিকের মায়া। আমার ভক্তগণের মধ্যে উনিই ভক্তিদেবীরূপে বিরাজিতা। রাজার রাজলক্ষ্মী, বণিকের লভ্যরূপা, সংসার-সাগরোত্তরণে দুস্তর তারিণী দেবরূপা, শাস্ত্রে ব্যাখ্যা-রূপিনী, সাধুগণের সদ্বুদ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধাস্বরূপা, দাতৃগণে দানরূপা, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে বিপ্রভক্তিরূপা, সাধ্বী স্ত্রীতে পতিভক্তিরূপা, সকলই ঐ শক্তি। এক কথায় আমার দুর্গাশক্তি সর্ব্বশক্তি স্বরূপা।"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা সর্ব্বশক্তির শক্তিরূপিনী তাহাই ভগবতী। এই শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করিয়া যখন ভক্ত মস্তক অবনত করেন তখনই তাঁহার পূজা করেন। যখন সেই দেবশক্তিতে জীব অনুপ্রাণিত হন তখনই তাঁহার উদ্বোধন হয়।

এক্ষণে রামতত্ত্ব কিরূপ বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহাই হইতেছে। "রামশব্দে অদ্বৈত পরমাত্মাকেই বুঝায়, যোগিগণ অন্তে যাহাতে রমণ করেন, তিনিই রাম।

"রমন্তে যোগিনোঽন্তে।"

অন্যত্র ,—

প্রণবের আকার জাগ্রদভিমানী লক্ষ্মণ, উকার স্বপ্নাভিমানী শত্রুঘ্ন, মকার সুষুপ্ত্যাভিমানী ভরত, রাম ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ অর্দ্ধ-মাত্রাত্মক আর শ্রীরামের সান্নিধ্য বশতঃ জগতের আনন্দদায়িনী এবং সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূত সীতাকে মূল প্রকৃতিরূপা জানিবে। তিনিই বিন্দু। যখন সীতা প্রণবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রহ্মবাদিরা তাঁহাকে প্রকৃতি বলেন।

অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রি র্বিশ্বভাবনঃ।
উকারাক্ষসসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজ সাত্মকঃ॥
প্রজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষর সম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈক বিগ্রহঃ॥
শ্রীরামসান্নিধ্য বশাজ্জগদানন্দদায়িনী।
উৎপত্তি স্থিতিসংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূল প্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্ম বাদিনঃ॥"
রামতাপনীয়োপনিষদঃ।

বেদে যে যোগতত্ত্ব প্রচারিত, রামায়ণে তাহার কাব্য সৃষ্টি। যোগীর চিত্তাবস্থাই দৈত্য দানব এবং রক্ষঃ পিশাচ। যোগশাস্ত্রে দেখুন রক্ষঃ এবং দৈত্য দানব কি?

"অন্তকরণকে চিত্ত কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আর নিরুদ্ধ ভেদে চিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে অবস্থাতে চিত্ত অস্থির হইয়া সুখ দুঃখাদি জনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা কহে। তাহাই দৈত্যদানবাদির অবস্থা। যে অবস্থায় তমোগুণের উদ্রিক্ততাদি নিবন্ধন কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-বিচার-বিমূঢ় হইয়া ক্রোধাদি বশতঃ চিত্ত সর্ব্বদা বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে। সেই মূঢ়াবস্থাই রক্ষঃ পিশাচের অবস্থা। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে চিত্ত দুঃখকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা সুখ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ঐ কালে চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা জন্মে। এই অবস্থা দেবতাদিগের অবস্থা। সত্ত্বগুণে বিশুদ্ধ হইলে চিত্তের একাগ্রতা ও নিরুদ্ধাবস্থা জন্মে।" *

এই রাক্ষস ও পিশাচের অর্থে আমাদের শাস্ত্রে রাক্ষস ও পৈশাচিক বিবাহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, বোধ হয়।

সুতরাং প্রতীত হইতেছে, যতদিন ইন্দ্রিয়গণ শাসিত না

* শ্রীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।

হয়, ততোদিন তমোগুণের প্রাধান্য আছে। দশেন্দ্রিয়রূপী দশানন রাক্ষস। ইন্দ্রিয়লালসা সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসবৎ। সেই রাক্ষস, প্রকৃতিরূপিণী সীতাকে দেবক্রোড় হইতে হরণ করে। সেই দেবত্বে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করাই রামায়ণ ও যোগ। পরমাত্মরূপী জীব যখন রাক্ষস-বিজয়ী হয় তখন সীতার সহিত রামের মিলন হয়। জীব এই বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া একদা যোগমায়া শক্তির আরাধনা করেন ; যখনই সেইরূপ আরাধনা করেন, তখনই দুর্গাপূজা হয়। দুর্গাপূজা যোগশক্তির সাধনা। যোগসিদ্ধিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যোগী এই সাধনায় প্রবৃত্ত হন সিদ্ধির কারণ। যে সিদ্ধির ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যিনি ভগবতীর আরাধনা করেন, ভগবতী তাঁহাকে সেই ফলই প্রদান করেন। কহেন,

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

যোগী সেই ফলাভিলাষী হইয়া যখন যোগারূঢ় হয়েন, তখনই তিনি শক্তিতে উদ্বোধিত হন। তাহার চিত্তে যোগ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিতে পূর্ণ হইয়া তিনি যোগ সাধনায় দৃঢ়ব্রত হয়েন। এই উদ্বোধনই দুর্গোৎসবের বোধন।

গীতায় কথিত হইয়াছে ফলকামনায় যাঁহারা ঈশ্বরারাধনা করেন, তাঁহারা ফলই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর ফলদাতা মাত্র। যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঈশ্বর পূজা করেন, তাঁহারা আর ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না, ফলই লাভ করেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে কামনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকেই লাভ করেন। কিন্তু ঈশ্বর-কামনা করিতে গেলে অন্য সর্ব্ব-কামনা পরিত্যাগ করিতে হয়। ততদূর ঈশ্বর-পরায়ণতা বড় সহজ কথা নহে। তাহা ঈশ্বরানুরাগের পরি-পূর্ণতা। ঈশ্বরানুরাগ অত্যন্ত প্রবল না হইলে আর জীব সর্ব্বকামনা পরিত্যাগী হইয়া কেবল ঈশ্বরেই অভিলাষী হইতে পারেন না। চিত্তের যখন এই অবস্থা ঘটে, যখন চিত্ত কেবল ঈশ্বরানুরাগী হয়, তখনই চিত্তের একমাত্র স্বপ্ন ঈশ্বর। ঈশ্বর লাভের জন্য তখন চিত্ত একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সেইরূপ ব্যাকুলতা হয়, যেরূপ ব্যাকুলতায় মহারাসে গোপীগণ অচেতন বৃক্ষকেও বলিয়াছিলেন, হে বৃক্ষ, কৃষ্ণ কোথায় গেলেন বলিতে পার? যাহা যাহা সম্মুখে দেখিয়াছিলেন তাহাকেই অধীরতার সহিত সেই প্রশ্ন বারম্বার করিয়াছিলেন, তাহাদের জ্ঞান ছিল না, কাহাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে। বাস্তবিক, অত্যন্ত ব্যাকুলতা হইলে চিত্তের ঠিক ভাব এই রূপই ঘটিয়া থাকে। যখন চিত্ত এই অবস্থায় উপনীত হয়, তখনই তাহা গিরিরাণীর স্বরে কাঁদিয়া উঠে ঈশ্বর লাভের জন্য কাঁদিয়া পাগল হয়।

আগমনীতে এই কাতরতা উচ্ছ্বসিত ঈশ্বরের জন্য চিত্তের এই কাতরতা কিসের সহিত তুলনা হয়? মাতৃভক্তি এ ব্যাকুলতা নয়। বাৎসল্য বুঝি তাহার তুলনীয়। বহুদিন কৃষ্ণকে না দেখিয়া যশোদা যেরূপ কাতরা হইয়া প্রভাসে গিয়াছিলেন, সেই কাতরতা একদিন যোগীর ঈশ্বরলাভ জন্য ব্যাকুলতার সহিত তুলনীয় হইতে পারে, আর তুলনীয় বহুকাল কন্যাহারা মাতার বাৎসল্য। সে বাৎসল্য উথলিয়া উঠে। এক পলকের বিরহ তাহা বুঝি আর সহ্য করিতে পারে না।

"এনে দাও আমার উমারে।"

বলিয়া সে বাৎসল্য একেবারে অধীর হইয়া উঠে। এই প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগের ছবি আগমনীতে প্রতিফলিত। ভক্তির এই ঐকান্তিকতা প্রতি বৎসরে উদ্বোধিত করিবার জন্য আগমনীর গান বঙ্গধামে সঙ্গীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরেই তাহা নূতন হইয়া আইসে। এমত দেবতুল্য ভগবদ্ভক্তি যদি নূতন বলিয়া না বোধ হইবে, তবে ত জীব নিতান্ত অচেতন। বঙ্গদেশ এত অচেতন নয় যে, এই গানে উদ্বোধিত না হইবে। তাই যখনই আগমনীর স্বর হেমন্তাগমনে বঙ্গবাসীর শ্রবণে প্রবেশ লাভ করে, তাঁহার হৃদয় তখনি অমনি উথলিয়া উঠে। দুর্গোৎসবের জন্য বঙ্গবাসী অধীর হইতে থাকেন তাঁহার ভক্তির উৎস উৎসারিত হইবার জন্য যেন উন্মুখী হয়। তাঁহার হৃদয়ে দুর্গোৎসব আইসে। এই ভক্তিভাব কি মধুর।

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

[পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়]

শ্রুতি বলিতেছেন, "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনি রস স্বরূপ। অনভূতিগ্রাহ্য যাহা, তাহাই রস; হৃদ্‌গত আসক্তির দ্বারা যাহা অনুভব যোগ্য হয়, তাহাই রস। ভগবান রস স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি মানুষের অনুভূতিগম্য, আসক্তি গ্রাহ্য। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, রস চতুঃষষ্টি রকমের আছে, এবং মানুষের হৃদয়ে একাদশ প্রকারের আসক্তি আছে। স্নেহ-রসের মধ্যে মাতৃ-ভাবাশক্তি ও পুত্রস্নেহ অতি প্রবল। এই মাতৃ-ভাবাসক্তি ও পুত্র স্নেহের সমবায়ে ভগবানের জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী রূপের উপকল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় যে, ভগবান ভাবের ঠাকুর; অর্থাৎ তিনি ভাবগ্রাহ্য। সেই ভাবজন্য তিনি কখনও বা বনমালী শ্যাম নটবর, কখনও বা মুণ্ডমালা ধারিণী ভীমা ভৈরবী শ্যামা। তিনি যাহা, তাহা আছেনই; চিরদিনই থাকিবেন। তবে সাধকের পরিতৃপ্তির জন্য তিনি মনোময় রাজ্যে নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। সাধক যে ভাব অবলম্বনে সাধনা করিয়া থাকেন, সেই ভাবঘন অবস্থায় ইষ্টদেবতা ভাবানুকূল রূপে সাধকের হৃদয় মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠেন। ইহা ধ্যানগম্য ও জপসিদ্ধ রূপ। সাধক পরে এই রূপ লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া দেন; মৃণ্ময় রূপ গড়িয়া তাহার পূজা করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তনা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজার প্রচলন।

ভারতের কোনও প্রদেশে বাঙ্গালার পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব হয় না তবে নব রাত্রের উৎসব ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্য্যন্ত এই নয় দিনের নয়টা নিশায় মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। এ পূজায় মার্কণ্ডের চণ্ডী পাঠ ও মহালক্ষ্মীর যন্ত্রে মহা বীজের সাহায্যে মাতৃ শক্তির আবাহন হইয়া থাকে। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। কি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে, কি তন্ত্রের জপতপে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যজ্ঞ ও হোমে পরিসমাপ্ত হইত; তন্ত্রোক্ত কর্ম্মে মন্ত্রপূজা ও হোম হইত। ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থানে যত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সকলেরই গোড়ায় একটি করিয়া সিদ্ধ যন্ত্র আছেই। বৌদ্ধ প্রভাবের পরই এ দেশে মূর্ত্তি পূজার প্রচলন হয়। বৌদ্ধতন্ত্রে মূর্ত্তি পূজার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যখন পারস্যে, তাতারে, আরবে ও তুর্কীর দেশে মুসলমান ধর্ম্মের প্রথম প্রচলন হয়, তখন এই সকল দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল। তাই পারস্য ভাষায় মূর্ত্তি পূজাকে "বোধ্ পরস্ত্" বলা হয়। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহাই সিদ্ধান্ত। বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য অতি প্রবল ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, বাঙ্গালা দেশেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া দেব পূজার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের অন্য সকল প্রদেশে এই পদ্ধতি এমন সাধারণ ভাবে প্রচলিত নাই। বাস্তব পক্ষে পুরাতন সকল তন্ত্র আলোড়ন করিলে দেখা যায় যে, তন্ত্র মূর্ত্তি পূজার জন্য তত ব্যস্ত নহে, যত যন্ত্রে ভাবারাধনা, হোম ও জপের জন্য ব্যস্ত। যাহা হউক, এই যন্ত্রোদ্ভূত ভাবকে শরীরী করিয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তনা এ দেশে হইয়াছে, বলিতে হইবে। দুর্গার মূর্ত্তি ভাবময়ী মূর্ত্তি, দুর্গার পূজাও ভাবের পূজা।

এখন বুঝিতে হইবে ভাব কি, জপই বা কেমন, মন্ত্রের শক্তিই বা কতটুকু। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, গৃহ প্রতিষ্ঠিত দেবতা, উদ্বোধিত দেবতা—যে কোনও দেবতার নিত্য বা নৈমিত্তিক হিসাবে পূজা হইয়া থাকে—সকল দেবতাই গৃহস্থের জাতি, বর্ণ, গোত্র, প্রবর,—সকলই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাকে আত্মজের তুল্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তোমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইলে, তোমার বাটীর দুর্গা তোমার জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর, সকলই গ্রহণ করিবেন। তোমার অশৌচ হইলে দেবতার অশৌচ হইবে। তাই ব্রাহ্মণে কায়স্থের বা শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম করেন না। আমরা খৃষ্টানী ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করিয়াছি; ইংরেজী-শিক্ষিত আমাদিগের অনেকের মনে এই ধারণা হইয়া আছে যে, ভগবান আমাদের ছাড়া আকাশের কোনখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ঘটে-পটে আনিতে হয়। সে দেবতা ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেরই দেবতা। তাই কোনও ব্রাহ্মণ শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম না করিলে ইংরেজী-নবীশ মহাশয়গণ ব্রাহ্মণকে ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকেন। কিন্তু দেবারাধনার ইহা মূল তত্ত্ব নহে। আমাদের দেবী ভবানী জগন্ময়ী—জগদম্বিকা, আব্রহ্ম তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বস্বে ও সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃভাবে, দুগ্ধে নবনীতের তুল্য, নিত্য বিরাজিত। আমি জীব, আমিও যাহা, তিনি শিব, তিনিও তাহাই। তবে জীব আমি, অহঙ্কারাদি অবিদ্যাঘোরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় জলে থাকিলেও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানে সদা প্রমত্ত। এই অহং-মমেতি-ভাবের জন্য জীব শিব হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। এই পার্থক্য বা স্বতন্ত্রভাব জন্য জীবের মনে চ্যুতির বা বিরহের ভাব পরিস্ফুট হয়। যে বিরহ কাতর নহে, তাহার ভাগ্যে ভগবৎ আরাধনা ঘটে না। জন্মে জন্মে নানা আঘাত খাইতে খাইতে তবে এই

চ্যুতি-জন্য কাতরতার ভাব মনে মনে জাগিয়া উঠে। এই বিরহের ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যেই আরাধনা বা উপাসনার প্রবর্ত্তনা ;—জীব-শিবে সমন্বয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই সাধনা। এই সাধনা প্রবৃত্তিমূলা ও নিবৃত্তিমূলা। সাধনার তিনটি অঙ্গ আছে ; প্রথম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ভক্তিযোগ, তৃতীয় জ্ঞানযোগ। বিষয়ী গৃহস্থের পক্ষে—নিম্নাধিকারীর পক্ষে, প্রবৃত্তি-মূলা-সকাম সাধনাই প্রশস্ত। নিবৃত্তির আবার সন্ন্যাস-সংযম, সর্ব্বত্যাগে ও বৈরাগ্যে বিন্যস্ত। প্রবৃত্তির আবার সর্ব্বস্ব ইষ্টে বা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণে বিন্যস্ত। নিবৃত্তি মার্গে ভোগ নাই ; প্রবৃত্তিমার্গে ভোগ আছে বটে, কিন্তু নিজের সামগ্রী বলিয়া, নিজের উপার্জ্জিত বিত্ত বলিয়া উপভোগ নহে। আমার যাহা কিছু, সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের। পুত্র, বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, গৃহস্থালী, সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণেরই, আমি তাঁহার দাসানুদাস, আশ্রিত, প্রতিপাল্য, আমি তাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিয়া, তাঁহার কর্ম্মচারীর ন্যায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের মূলে এই সর্ব্বসমর্পণের ভাব নিত্য বিরাজ করিতেছে।

আরও একটু রহস্য আছে। তিনি রসময়—ভাবময়—গুণময়। আমি তাঁহার ভাব সাগরের বুদ্‌বুদ্ মাত্র। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাঁহাতে মিশিতে হইলে, আমার হৃদ্‌গত রসের বা আসক্তির একটি ধারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, তদ্ভাব ভাবুক হইয়া, তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে। তবে আমার জীবন্মুক্তি ঘটিবে। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছিলেন—

> "এবার শ্যামা তোমায় খাব ;
> তুমি খাও কি আমি খাই মা,
> দু'টোর একটা করে যাব !"

অর্থাৎ, হয় আমি মাতৃভাবে ডুবিয়া মা-ময় হইয়া যাইব, নয় মা আমাকে তাঁহাতে মিলাইয়া লইবেন। ভক্তি সূত্রকার বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর তুষ্টেঃ একোঽপি বলী"—ঈশ্বর তুষ্টির জন্য একটা আসক্তিকে প্রবলভাবে ধরিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির উদ্দেশ্যেই সাধনা। অহঙ্কার জন্যই দুঃখ। কেননা, আমার আমিত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিলেই পদে পদে বাধা পাইতে হয়। "বাধনা লক্ষণং দুঃখমিতি।" বাধাই দুঃখ। অতএব বাধা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ দূর হয়। বাধা যখন আমিত্বে, তখন এই আমিত্বের নাশ করিতে পারিলেই সুখ। রসময়, ভাবময়, আনন্দময় শিবে আমিত্বকে ডুবাইতে হইবে। আসক্তিকে ধরিয়া এই নিমজ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। আমার আসক্তি, আমার আত্মজ। আসক্তি জন্যই ইষ্টের রূপ ও আবির্ভাব। তাই আমার ইষ্ট, আমার আত্মজ, আমার গোত্র প্রবরধারী। তিনি আমার ভাবের সন্তান—রসের বিতান। তাঁহাকে পিতা বলি, গুরু বলি, সখা বলি, মাতা বলি, পুত্র বলি—এ সকল সম্বন্ধই ত আমার ভাবজ। আমি ডাকি বলিয়াই ত তিনি আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, গুরু, কর্ত্তা, প্রভু, পরিত্রাতা। ইহ সংসারে আমি যাঁহাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বলিয়া ডাকি, তাঁহারা যেমন আমার গোত্র-প্রবর-জাতি-বর্ণধারী তেমনই আমার দেবতা আমার সম্বন্ধে ভাব সংবদ্ধ হইলে, তিনি আমারই হইয়া থাকেন, আমার ভাবের সন্তান বলিয়া পরিচিত হ'ন। বিগ্রহ পূজার গোড়ায় এই মাধুরীটুকু আছে। আমরা এ মাধুরীর আস্বাদ গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছি বলিয়া, বাঙ্গালায় দেবতার পূজায় আর তেমন ভাবের ফোয়ারা ছুটে না।

দুর্গোৎসবে মা কন্যারূপে বাঙ্গালীর গৃহে আসিয়া থাকেন। ভক্তের মা-ই সর্ব্বস্ব, মাকে লইয়াই তাহার ঘর গৃহস্থলী। কন্যারূপিণী জগন্মাতার তাই শ্বশুরবাড়ী আছে, স্বামী আছেন, বৎসরে বৎসরে এই সময়ে তাঁহাকে বাপের বাড়ীতে আসিতে হয়। মায়ের আমার সাংসারিক সুখ দুঃখ আছে, অভাব অভিযোগ আছে,—জ্বালা-যন্ত্রণা আছে ; তাই তিনি জ্বালা জুড়াইতে বাপের বাড়ী আসেন। কাজেই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছিলেন,—

> "এবার আমার উমা এলে,
> আর আমি পাঠাব না।
> বলে বলুবে লোকে মন্দ,
> কারো কথা শুনব না।
> আমি শুনেছি নারদের মুখে—
> উমা আমার থাকে দুখে,
> শিব শ্মশানে মশানে ঘোরে,
> ঘরের ভাবনা ভাবে না।
> যদি আসেন মৃত্যুঞ্জয়,
> উমা নেবার কথা কয়,
> তবে মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
> জামাই বলে মানবো না॥"

এমন ভাবঘন স্নেহের অভিব্যঞ্জনা বাঙ্গালী ভক্ত ছাড়া আর কেহ করিতে পারে না। জগদম্বা কন্যা ;—যখন কন্যা, তখন ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ে হইয় তাঁহাকে আমার কাছে আসিতেই হইবে। আমার ভুলী, পুটী, বুড়ী যেমন আমার মেয়ে, উমা, গৌরী, পার্ব্বতীও আমার তেমনই মেয়ে। যখন ভাব ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, তেমন ঠিক ভাবের মত রূপই তাঁহাকে ধরিতে হইবে। ভাবের পূজার মহিমাই এইটুকু।

ভগবানকে ভাবময় রূপে পূজা করিতে হইলে, সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যের স্ফুরণ হইয়াই থাকে। এইটুকু জপে বুঝা যায়. যে ভাবের বীজ লইয়া যথোপচার জপ করিতে আরম্ভ কর না; সেই জপের ফলে প্রথমে বিভীষিকা পরে প্রলোভন. শেষে সামীপ্য ঘটাবেই ঘটিবে। শব-সাধনার আদিতে যে বিভীষিকা দেখা যায়, সে সকলই মানস. প্রাকৃত নহে; ইংরেজিতে তাহাকে Halucination বল, আর যাহাই বল না কেন, জপের ফলে, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ডাকিনী, যোগিনী, প্রমথগণের দ্বারা নানা বিভীষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তিও এমনই বিভীষিকা দেখে। বিভীষিকা সাম্‌লাইতে পারিলে, পরে প্রলোভনের উদ্ভব হয়; অপ্সরী কিন্নরী কত আসে কত নাচে, স্তূপে স্তূপে কত মণিমুক্তা দেখিতে পাওয়া যায়, কত ধন-দৌলত পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়ে। ভয় ও ত্রাসের উপর বিভীষিকার প্রভাব, কাম ও লোভের উপর প্রলোভনের বিস্তার। এ সকল কাটাইয়া উঠিতে পারিলে, তবে ঐশ্বর্য্যানুভূতি ঘটে। কি জানি কেন. কোন্ শক্তির প্রভাব ঘটে, তাহা জানি না, কিন্তু শেষে দেখিতে পাই, হেতিপেতি যন্ত্রমন্ত্রধারিণী,সর্ব্বশক্তিময়ী,সর্ব্বভাবময়ী, বরাভয়দায়িনী জগন্ময়ী অপূর্ব্বরূপে হৃদয়-আকাশে স্থিরদামিনীর ন্যায় কোটী সূর্য্যের দ্যুতিতে ফুটিয়া উঠেন। যে যথারীতি জপ করিতে পারিয়াছে জপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার ভাগ্যেই এমন অপূর্ব্ব দর্শন ঘটে। এই ঐশ্বর্য্যদর্শন হইতেই দুর্গোৎসবের দশভুজা মূর্ত্তির পূজা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে গোরক্ষনাথ সর্ব্বপ্রথমে এই রূপ দর্শন করেন। তাঁহার শিষ্য বিরূপাক্ষ এ সমাচার পান। বিরূপাক্ষের শিষ্য সদানন্দ স্বামী সর্ব্বপ্রথমে দুর্গোৎসব করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়েও বাঙ্গালায় কালীপূজা প্রবল ছিল; নবরাত্রের মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘটে ও যন্ত্রেই হইত। সদানন্দের পদানুসরণ করিয়া আগমবাগীশই এই দশভুজার পূজার প্রবর্ত্তন করেন।

তন্ত্রভাবের অক্ষয় খনি। দুর্গোৎসবে ভাবের সকল ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। চালচিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নবপত্রিকা পর্য্যন্ত দশভুজা মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে ভাবের দ্যোতনা আছে। সে ভাব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাব। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত যে মা হ্রী, ধী, লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি তৃষাতৃষ্ণা, নিদ্রা-মায়ারূপে বিরাজমানা, সেই মায়ের অভিব্যঞ্জনা দশভুজা। দুর্গোৎসব ভাবের অশ্বমেধ, রসের রাজসূয়। দুর্গোৎসবে মা মহালক্ষ্মী, মহামেধা, মহাঘোরা, মহামায়া। তুমি এ ভাবের ভাবুক হইলে, তবে ত ইঙ্গিতে বুঝাইতে পারি, এ মা কেমন—এ মা কিসের? কিন্তু মা মুকাস্বাদনবৎ, যে বুঝিয়াছে, সেই মজিয়াছে, তাহা ত ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। একটা কথা বলিয়া রাখি। তন্ত্রে বা কর্ম্মপ্রধান শাস্ত্রে খোস্‌খেয়ালের কথা নাই। কর্ম্ম আছে, কর্ম্মের ফলশ্রুতি আছে। কর্ম্ম কর, ফল পাইবেই। যদি যথারীতি কর্ম্ম করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সাধনা করিয়া ফল না পাও, তবে জানিও, সে কর্ম্ম মিথ্যা, সে গুরু জুয়াচোর। তাই তন্ত্রের ধর্ম্ম বুঝাইবার নহে, করিবার ধর্ম্ম—কর্ম্মীর ধর্ম্ম! যে কর্ম্ম করিয়া ফল পাইয়াছে, সে উহাতে মজিয়া গিয়াছে—পাগল হইয়া গিয়াছে। তাই দশভুজার পূজারও কিছু ব্যাখ্যা করিবার নাই; ব্যাখ্যা করিতে হইলে আগাগোড়া তন্ত্রতত্ত্ব বুঝাইতে হয়। যাহা বুঝান যায় না, তাহা করিয়া কর্ম্মিয়া দেখাইয়া দিতে হয়। বাঙ্গলায় কর্ম্মী লোপ পাইতেছে। কর্ম্ম-ভ্রষ্ট অনেক ভণ্ড বাঙ্গালার কর্ম্ম পণ্ড করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী ইষ্ট দেবতাকে লইয়া একটি অপূর্ব্ব ভাবের হাটবাজার বসাইয়াছিল। কি বৈষ্ণব, কি তান্ত্রিক, সবাই সংসারটাকে ইষ্টের সংসারে পরিণত করিয়াছিল; অহঙ্কারকে ভক্তির দৈন্যে এমনই আপিয়া চুকিয়া মনোময় করিয়া ফেলিয়াছিল, যে সংসার-দাবদাহের জ্বালা বারো আনা কমিয়া গিয়াছিল। একদিকে রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভক্ত তান্ত্রিকগণ "আমি তুয়া দাস—দাসদাসী পুত্র হই" বলিয়া মা-ময় হইয়া থাকিতেন, অন্যদিকে বৈষ্ণব ভক্তগণ সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া মধুরসের অপূর্ব্ব মদিরা-ধারা-পানে নিত্য বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঙ্গরস, ছড়া-কাব্য, গান—সকলই কালী, কৃষ্ণ, শিবকে লইয়া চলিত। তখন বিদ্যাসুন্দরেও মা কালীকে আসিয়া হাজির হইতে হইয়াছে। অচ্যুত গোস্বামী ও রামপ্রসাদ, উভয়েই কালী ও কৃষ্ণ লইয়া পরিহাস উপহাস করিতেন। সবাই যেন ভাবে ডগমগ করিতেন, ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।

বাঙ্গালী ভক্ত ও কবি কখনও এই ভাবের খেলায় তত্ত্বহারা হন নাই। তাই দাশরথি রায় গান করিয়াছেন,—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিনী কোথায় লুকাল!"

তত্ত্বজ্ঞানটা কবির মনে টনটনে রহিয়াছে। তিনি মৃণ্ময়ী রূপশালিনী দেবীকে চিন্ময়ী অরূপিণী বলিয়া বেশ জানিতেন। তাই আর একজন ভক্ত গান করিয়াছেন,—

"জান রে মন, পরম কারণ,
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরই বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়।"

এই একটি ক্ষুদ্র গীতে দর্শন শাস্ত্রে—উপনিষদ্ শাস্ত্রের—উপনিষদ্‌রাশির একটা মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। মা যে মনোময়ী, ভাবময়ী, এ কথা বাঙ্গালীমাত্রেই জানিতেন, তাই ভাবুক কবি গাহিয়াছেন "তুমি দেখ, আর আমি দেখি মন, আর যেন কেউ না দেখে।" এই দেশব্যাপী ভাবমাধুর্য্য এখন আর নাই বলিলেও চলে। ধর্ম্ম-ময়—ভাবময় জীবন ছিল আমাদের, রসপূর্ণ ভক্তিপূর্ণ সমাজ ছিল আমাদের। আমরা আপনহারা হইয়া ইষ্টের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। তাই বাঙ্গালা মর্ত্ত্যের স্বর্গ ছিল—সুখময়, স্নেহময় দেশ ছিল। ভাবের মহত্ত্ব এখনও বাঙ্গালী বুঝিতে পারিলে জীবনের অনেক দুঃখের উপশান্তি ঘটে। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের গোড়ার কয়টা স্থূল কথা বলিয়া রাখিলাম ; যদি কখনও আবার ভাবের উন্মেষ ঘটে, তবে তত্ত্ব-কথা কহিব।

দুর্গা-স্তোত্র

[শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ]

মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি সর্ব্বশক্তিদায়িনি মাতঃ শিবপ্রিয়ে! তোমার শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি, শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।

মাতঃ দুর্গে! যুগে যুগে মানব শরীর অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য্যে ব্রতী আমরা, শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, সহায় হও।

মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি, ত্রিশূলধারিণী, বর্ম্ম-আবৃত-সুন্দর-শরীরে মাতঃ জয়দায়িনি! তোমার প্রতিক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিতে উৎসুক। শুন মাতঃ, উর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও।

মাতঃ দুর্গে! বলদায়িনি, প্রেমদায়িনি, জ্ঞানদায়িনি, শক্তিস্বরূপিণী, ভীমে, সৌম্য-রৌদ্ররূপিণি! জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান।

মাতঃ দুর্গে! জগৎশ্রেষ্ঠ ভারতজাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তুমি মাতঃ গগনপ্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমির-বিনাশী আভায় উষার প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার কর, মাতঃ, তিমির বিনাশ কর।

মাতঃ দুর্গে! শ্যামলা সর্ব্বসৌন্দর্য্য-অলঙ্কৃতা জ্ঞান শক্তির আধার বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি, এতদিন শক্তি সংহরণে আত্মগোপন করিতেছিল। আগত যুগ, আগত দিন, ভারতের ভার স্কন্ধে হইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে,এস, মাতঃ, প্রকাশ হও।

মাতঃ দুর্গে! তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে, তোমার প্রভাবে মহৎ কার্য্যের, মহৎভাবের উপযুক্ত হই। বিনাশ কর ক্ষুদ্রতা, বিনাশ কর স্বার্থ, বিনাশ কর ভয়।

মাতঃ দুর্গে! কালীরূপিণি, নৃমুণ্ডমালিনি, দিগম্বরী, কৃপাণপাণি দেবি অসুর বিনাশিনি! ক্রূর নিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটীও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নির্ম্মল যেন হই, এই প্রার্থনা, মাতঃ, প্রকাশ হও।

মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় মৃয়মান ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎ প্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আর অল্পাশী নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়-ভীত যেন না হই।

মাতঃ দুর্গে! যোগ শক্তি বিস্তার কর। তোমার প্রিয় আর্য্য সন্তান, লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধা শক্তি, ভক্তি-শ্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্যজ্ঞান, আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ কর। মানব সহায়ে দুর্গতিনাশিনি জগদম্বে, প্রকাশ হও।

মাতঃ দুর্গে! অন্তঃস্থ রিপু সংহার করিয়া বাহিরের বাধাবিঘ্ন নির্ম্মূল কর। বলশালী পরাক্রমী উন্নতচেতা জাতি ভারতের পবিত্র কাননে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে, গগন সহচর পর্ব্বত তলে, পূতসলিলা নদী তীরে একতায় প্রেমে সত্যে শক্তিতে, শিল্প সাহিত্যে বিক্রমে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক, মাতৃ চরণে এই প্রার্থনা, প্রকাশ হও।

মাতঃ দুর্গে! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর। যন্ত্র তব, অশুভ বিনাশী তরবারি তব, অজ্ঞান বিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবকগণের এই বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভ হন্ত্রী হইয়া তরবারি ঘুরাও, জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও।

মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জ্জন করিব না, শ্রদ্ধাভক্তি প্রেমের জোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও।

বীরমার্গ প্রদর্শিনি, এস! আর বিসর্জ্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব্বকার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় মাতৃ-সেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।

"ধর্ম্ম" কার্ত্তিক ১৩১৬

আগমনীর গান

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

পূজা আসিতেছে। শরতের প্রভাত। প্রভাত-সূর্যের সোণালী কিরণে চারিদিক প্লাবিত—পুলকিত।—যেন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বিগলিত; স্বর্ণধারা তরঙ্গায়িত হইতেছে; এমন সময় ভিখারী আসিয়া ঘরের দুয়ারে গান ধরিল,

"গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাব না,
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌ব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়-ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না॥"

রামপ্রসাদ।

গান শুনিবামাত্র গৃহস্থের হৃদয়ে কেমন একটু কোমল-করুণ আঘাত লাগিল;—আপন সংসারের ছোট-ছোট মেয়েদের মুখগুলি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। গৃহস্থ আবার ভিখারীকে গায়িতে বলিলেন। ভিখারী আবার গান ধরিল,—

'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিনী কোথায় লুকাল।' ইত্যাদি—

দাশরথি রায়।

প্রতি বৎসর এমনই সময়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই সব গান গাহিয়া ভিখারীরা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এদেশে বৈষ্ণব ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশী বটে; কিন্তু এ সময়টা আগমনীর গান ছাড়া অন্ত কোনও বিষয়ের গান কোনও ভিখারীর মুখে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী গৃহস্থও এ সময়ে সে গান শুনিবার জন্ম সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। বর্ষে বর্ষে তাহারা উহা শুনিয়া আসিতেছে,—তবু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা, শুনিবার আগ্রহ তাহাদের প্রতি বর্ষেই সমান দেখিতে পাই। বাঙ্গালীর নিকট ইহার রস এতই গভীর। এমনই অক্ষয়!

ইতিবৃত্তের কোন্ বৎসরে ইহার জন্ম হইয়াছিল জানি না। কে ইহার আদি-রচয়িতা, তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে আগমনীতে যত গান আমরা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, তাহা হইতে অনুমান করিয়া এই বলা যায় যে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদই এই গানের প্রথম পথ প্রদর্শক। বহু গ্রাম্য-ছড়ার মধ্যেও আগমনীর কথা আছে, স্বীকার করি; কিন্তু সেগুলি গান নহে—ছড়া মাত্র। ভাঙ্গা ছন্দ, অপূর্ণ মিল ও অসংলগ্নভাবে তাহার আগাগোড়া পরিপূর্ণ। তা' ছাড়া সে ছড়াগুলিও যে এদেশে কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা রামপ্রসাদের গানের পূর্ব্বে রচিত, সে সম্বন্ধেও জোর করিয়া কিছু বলা চলে না।

রামপ্রসাদ এক্ষেত্রে শুধু প্রথম নহেন,—সর্ব্বপ্রধানও বটেন। বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে চণ্ডীদাসের যে আসন শাক্ত কবিগণের মধ্যে রামপ্রসাদেরও সেই আসন। চণ্ডীদাসের গানের করুণ-মধুর রস অতুলনীয়; রামপ্রসাদের গানের করুণ বাৎসল্য রস অতুলনীয়। সেকেলে ও একেলে যতগুলি কবি আগমনীর গান রচিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই এ ক্ষেত্রে রামপ্রসাদকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নহে; তাঁহাদের সকলের উপরেই রামপ্রসাদের পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সেকালের ও একালের কত কবি যে আগমনীর গান রচিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। কবিও অসংখ্য, গানও অসংখ্য। সে অগণিত গানের মধ্যে আবর্জ্জনার অংশ যে নিতান্ত অল্প, তাহাও নহে। রামপ্রসাদের উচ্চ-অঙ্গের আগমনীর ব্যর্থ অনুকরণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, প্রণয় সঙ্গীতে সিদ্ধহস্ত নিধুবাবুও এ ব্যর্থ অনুকরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। যে কয়টি আগমনীর গান তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে এক আধটি ছাড়া তেমন উচ্চ দরের নাই। শুধু নিধুবাবু বলিয়া নহে,—ব্রজ রায় ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি অনেক কবিরই আগমনীর গানে অমন অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। সে সব গানে হা-হুতাশের অভাব নাই বটে, কিন্তু আন্তরিকতা ও রচনা-নৈপুণ্যের অভাবে তাহা অন্তঃকরণকে আঘাত করে না,—দুঃখের স্থলে তাহার দুঃখের আড়ম্বরটাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। কিন্তু তাই বলি উৎকৃষ্ট আগমনী সঙ্গীতের সংখ্যাও যে নিতান্ত অল্প, এমন কথা বলি না। সংখ্যায় তাহা স্বল্প নহে, গুণেও তাহা অল্প নহে। গুণের হিসাবে তাহার পাশে দাঁড়াইতে পারে, এমন বাৎসল্য রসের বাঙ্গালা গান বড় একটা দেখিতে পাই না।

তবে বাঙ্গালার সঙ্গীত সাহিত্যে আগমনীর গানই যে প্রথম বাৎসল্যের গান, অবশ্য তাহা বলি না। এ রসটা এ দেশের বৈষ্ণব সঙ্গীতেই প্রথম ফুটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও

যশোদাকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ বহু সঙ্গীতই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর গানও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু তুলনায় সমালোচনা করিলে, আমাদের মনে হয়, কবিত্বে, মাধুর্য্যে ও লালিত্যে আগমনীর গান ঐ সকল বৈষ্ণবগণের অপেক্ষা অনেক স্থলে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে।

আগমনীর গানের উমা আমাদেরই ঘরের কন্যা, মেনকা আমাদেরই ঘরের মাতা, এবং গিরিরাজ আমাদেরই ঘরের পিতা। বালিকা কন্যার বিবাহের পর তাহাকে লইয়া হিন্দু-পরিবারে যে দুশ্চিন্তার আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহাই মেনকা ও গিরিরাজের গানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বৈষ্ণব সঙ্গীতে নাই, এবং থাকা সম্ভবপর নহে। বৈষ্ণব সঙ্গীতে শুধু আছে,—

"অরুণ অধর উরে, নবনী লাগিয়াছে রে
মরি মরি বাছনি কানাই,
হেরি যশোমতি প্রেমেতে পূরিত আঁখি
আয় কোলে বলিহারি যাই।"

অথবা—

"কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীতে মাগে।
রাণী দিল পুরি কর, পাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল রায়—" ইত্যাদি।

কিন্তু এই ছবির পাশে আর একটি ছবি রাখিতেছি,—পাঠক মিলাইয়া দেখুন—উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিক মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী!—

গৌরী এলো এলো শুনি, এলো-থেলো পাগলিনী,
এলোকেশী হ'য়ে রাণী, ধরা-শয়ন ত্যজি অমনি উঠিল।
কৈ কৈ কৈ গো মা! আমার সাধের উমা,
কন্যা হর মনোরমা,
আজি কি শিবের শুভদৃষ্টি ঘটিল॥
নয়ন-জলে দৃষ্টিহারা, বলে—কোলে আয় মা তারা।
জুড়াই দুটি নয়ন-তারা, মুখ দেখিলে দুঃখ খণ্ডে॥"

এ মাতৃত্বের ছবির কাছে বৈষ্ণব কবিগণের মাতৃত্বের ছবি কি দাঁড়াইতে পারে? কেবল বৈষ্ণব কবি কেন, অন্য কোনও কবিরই বাৎসল্য-রসের কোন গান বা কবিতা আগমনীর গানের মত বাঙ্গালীর মনকে ভিজাইতে পারে বলিয়া মনে করি না। বিশ্ব-সাহিত্যের ধ্বজাধারীরা অবশ্য এ কথা শুনিয়া চটিবেন জানি। কিন্তু চটিলেও ইহা সত্য—ইহা স্বাভাবিক। যে সমাজ দূর ও নিকট সম্পর্কীয় সকলকে লইয়া একসঙ্গে বাস করিতে চায়, এবং কেবল কন্যাকেই পরের ঘরে বিলাইয়া দিতে বাধ্য হয়, সেই সমাজের নিকট আগমনীর গানের রস অক্ষয়—অপূর্ব্ব।

আগমনীর গানের আরম্ভটিও বড় স্বাভাবিক—বড় সুন্দর! ইহার গোড়াতেই আছে, মেনকা রাণী গিরিরাজকে বলিতেছেন—

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে॥
এই, এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে!
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু বদনে॥
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃত রাশি, সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে!
ধৈরয না ধরে মম জীবনে॥
আর শুন অসম্ভব, চারিদিকে শিবা রব; হে!
তার মাঝে আমার উমা, একাকিনী শ্মশানে।
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার হে!
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে?" ইত্যাদি।—

কমলাকান্ত

সাধক রামপ্রসাদের আগমনীর গানে এরূপ আরম্ভ নাই। সাধক কমলাকান্তই মনে হয় এ গানে ঐরূপ ভূমিকা প্রথম আমদানী করিয়াছেন। তাঁহার পর হইতে আমরা দাশরথী রায়, রসিক রায়, রাম বসু, নীলকণ্ঠ ও গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলের গানেই এই 'স্বপন' দেখার 'ধর্ত্তা' দেখিতে পাই। তবে সকলের স্বপ্ন যে সমান তাহা নহে। কেহ 'কু-স্বপন দেখেছি গিরি' বলিয়া গান আরম্ভ করিয়াছেন, আবার কেহ বা 'সু-স্বপন' বলিয়া গান ধরিয়াছেন। কমলাকান্তের গানে কু-স্বপ্নেরই আভাষ আছে। তিনি এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হইলেও কবিওয়ালা রাম বসু ঠিক তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ না করিয়া একটু স্বতন্ত্র দিকে গিয়াছেন। সু-স্বপ্ন হইতে কথা আরম্ভ বোধ করি তাঁহার আগমনীর গানেই প্রথম আমদানী হইয়াছে। তাঁহার গানটি এই—

"গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সু-স্বপন—
এলো হে, সেই আমার তারাধন!
দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার,
দেখা দাও দুখিনীরে॥
অমনি দু' বাহু পসারি, উমা কোলে করি,
—আনন্দেতে আমি, আমি নই॥"—রামবসু

এ গানটিও মর্ম্মস্পর্শী। বাৎসল্য-রস ইহাতেও বেশ ফুটিয়াছে। তবে আগমনী গানের সূচনা 'কু স্বপনে' হইলেই বোধ করি যে একটু বেশী স্বাভাবিক ও বেশী মর্ম্মস্পর্শী হয়। কারণ, সচরাচর স্বপ্ন চিন্তার অনুরূপই হইয়া থাকে। কন্যা-বিরহ-জনিত যে দুঃখ পুটপাকের ন্যায় মাতৃ হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা নিদ্রার সময়ও স্বপ্নে দেখা দিল,—ইহা বস্তুতন্ত্রতামূলক। বাঙ্গালী ঘরে ইহা নিত্য দৃষ্টিগোচর হয়। তাই বোধ করি, অধিকাংশ কাবরই আগমনী গান কু-স্বপ্নে সূচিত হইয়াছে।

মেনকা রাণী এতদিন কতকটা স্থির ছিলেন, কিন্তু স্বপ্ন দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন—

"বাহ্যজ্ঞান-শূন্যা রাণী—কন্যার মায়ায়
'দেহ কন্যা' বলে রাণী ধরে গিরির পায়।"

দাশরথি।

মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহকে উদ্দীপিত করিতেছে—ইহাই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণকে বুকে করিয়া বসুদেব যখন ভাবিতে-ছিলেন—কেমন করিয়া এ দুস্তার যমুনা পার হইব, তখন জননী-স্বরূপিনী-শিবা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। এখানেও মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহকে জাগাইয়া তুলিল।

গিরিরাজ কন্যা আনিতে কৈলাসে গমন করিলেন। কিন্তু মেনকা আর কন্যার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার অবস্থা তখন—

"মেনকার ঝুরিছে আঁখি, গিরির বিলম্ব দেখি,
অচল-মোহিনী যেন চঞ্চলা হরিণী।"

এমন সময় তাঁহার কাণে আসিয়া পৌছিল,

"গা-তোল গা-তোল, বাঁধ মা! কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ, মা কৈ ব'লে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধরবদনী।" ইত্যাদি

এমন সময়—

"পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই"

শুধু তাহাই নহে। স্বয়ং জয়া আসিয়া বলিল—

"ওগো রাণী! নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো
চল, বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এসো না সঙ্গে আমার গো।"

এইসব কথা শুনিয়া—

"রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যারে, শুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে
আর গো॥"

এমন সময় গৌরীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া রাণী—

"গদগদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গল ধরে।"

আর কি বাধা মানে? অশ্রুর প্লাবন আসিল! যে অন্তর্বেদনা বৎসর খানেক ধরিয়া হৃদয়ের মধ্যে গুমরিয়া মরিতেছিল, তাহা আজ মিলন-সুখে অশ্রু আকারে চোখ ফাটিয়া বাহির হইল। কন্যাকে ঘরে আনিয়া মেনকা রাণী কোলে করিয়া বসিলেন—মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

কন্যা ঘরে আসিলেন—এইবার 'মায়ে-ঝিয়ে' মান-অভিমানের পালা আরম্ভ হইল। মেনকা গৌরীকে কোলে করিয়াছেন বলিয়া গৌরী বলিতেছেন,—

"আমাকে বসিলে কোলে করি,
আমার গণেশ দাঁড়িয়ে ভূমিতলে।"

মেনকা উত্তর দিবার এ সুযোগ ছাড়িলেন না। একটু খোঁটা দিয়া কন্যাকে তিনি কহিলেন —

"মা! বলা অধিক, প্রাণাধিকের প্রাণাধিক
গণেশ আমার—তাও আমি জানি।
কি করিব মা! বুঝে না মন,
গণেশে মন তোমার যেমন,
তেমনি আমার গণেশ-জননী॥"

কন্যাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য জননীর এই আঘাত অতি মিষ্ট! শ্বশুর বাটীর সহিত দুই চারি দিনের কড়ার করিয়া কন্যাকে যে পিতৃগৃহে আসিতে হইয়াছে, মাতৃ-স্নেহ তাহা বুঝিতে চাহে না। জননী কন্যাকে বলিতেছেন,—

"এসেছিস্ মা থাক্‌না উমা দিন কত।
হোয়েছিস্ ডাগর-ডোগর কিসের এখন ভয় এত॥
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস্, তাই হয়েছি পর,
সঁপে দিছি পরের হাতে
জোর আমার ত নাই তত॥"

কন্যার প্রতি অবুঝ, মাতৃ-স্নেহের আবার আঘাত—

"বোঝাব মায়ের ব্যথা,
গণেশকে তোর আট্‌কে রেখে।
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন,
জান্‌বি তখন আপনি ঠেকে॥
তো বিনা কে আছে আমার,
গিরিপুরী ছিল আঁধার,
পাঠাব না তোরে তো আর,
নিতে এলে কৈলাস থেকে॥"

কিন্তু পাঠাইতে হইল!—মাতার সমস্ত আঘাত ব্যর্থ হইয়া গেল! গৌরীকে লইয়া যাইবার জন্য শিব মেনকার দ্বারে

আসিয়া উপস্থিত। জয়া আসিয়া মেনকাকে ধরিয়া বসিলেন,

দিও না আজ উমায় যেতে
ওগো মা মেনকা রাণী।
আশুতোষে আশু তুষে
বিদায় করগো এখনি।
হাসি হাসি উমা এলো,
কেঁদে হলো এলোথেলো,
কেন আজি পোহাইল নবমী রজনী॥
ভেবে চিত্তে উমাশশী, যেন রাহুগ্রস্ত শশী,
হানিল হৃদয়ে আসি, কি শূল ত্রিশূলপাণি॥"

জয়ার কথা শুনিয়া, শিবকে দুয়ারে দেখিয়া, মেনকার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে বুক-ভাঙ্গা ক্রন্দন রামপ্রসাদের গানের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই। মেনকা বলিতেছেন—

"ওহে প্রাণনাথ, গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বারবার।
এ দেহে পাষাণ প্রাণ, এই হেতু এতক্ষণ না হ'লো বিদায়।"
ইত্যাদি।

সাধক কমলাকান্তেরও এ সময়ের গানটি অতি চমৎকার। তাহার মধ্যেও মাতার বুক-ফাটা ক্রন্দনধ্বনি শুনা যায়। সে গানটি এই ;—

কি হলো, নবমী-নিশি হৈলো অবসান গো!
বিশাল ডমরু, ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে পরাণ গো॥
কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ,
মায়ের মলিন হয়েছে অতি ও বিধু বয়ান।
ভিখারী ত্রিশূলধারী, যা চাহে তা দিতে পারি ;
বরঞ্চ জীবন চাহে তাহা করি দান।
কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত,
আমি ভাবিয়া ভবের রীত, হয়েছি পাষাণ গো॥"

মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠানো—বাঙ্গালী হিন্দু ঘরের একটা বিষম ট্র্যাজিডি। এই ট্র্যাজিডি হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া শাক্ত-কবিগণ তাহারই উপর তাঁহাদের বিজয়া-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাই ইহার প্রত্যেক কথাটিই মর্ম্মস্থানকে কাঁপাইয়া তুলে। গৌরীর পিতৃগৃহে আগমন, পিতৃগৃহে অবস্থান এবং তাঁহার শ্বশুর-বাড়ী যাত্রা—এ তিনটি দৃশ্যেই বাঙ্গালার হিন্দু-সংসার প্রতিফলিত হইয়াছে। বঙ্গ-জননীর মর্ম্মব্যথা ঐ তিনটি দৃশ্যের মধ্যেই নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

শিউলি ও কেয়া, কাশফুল আর শ্বেত পদ্মের সঙ্গে,
আকাশের আলো—ঝরণার সুর মিশাইয়া গেছে রঙ্গে।
ভরাযৌবন। তটিনীর নীর নিস্তরঙ্গ ; মন্দ
পবনের স্রোত বয়ে আনে দূর পুষ্পবনের গন্ধ ;
সন্ধানে তার ভোমরার দল ঘুরে ঘুরে ফেরে কুঞ্জে,
অবিশ্রান্ত গুণ-গান করে গুন-গুন করি গুঞ্জে।
শুধু সেই সুরে মিলিয়ে দে সুর, শরতের এই সুর গা',
আশ্বিনে আজ আবাহন করি, এস দেবী দুর্গা!
মেঘহীন দিন, ঝিকিমিক রোদ, অনুপম ওই সূর্য্য,
দুঃসাহসের পথে যেতে আজ ডাকে কোন্ দূর তূর্য্য!
প্রাণ যেন আর পারে না থাকিতে প্রাচীরের পিছে বন্ধ,
গৌরী-শৃঙ্গে, মেরু সন্ধানে, ছুটে যেতে চায় অন্ধ।
চল-চল-চল বাজে ছল-ছল নির্ঝরিণীর ছন্দে
কোন্ পারাবার ডাকে বার বার—মন দেরে তায় মনদে!
পথে যেতে যেতে যাত্রার মেতে আনন্দে মধুর গা'
এস দুর্জ্জয় অভিলাষে, মোর দুর্লভে এস দুর্গা?
অঞ্জন কালো মুছে গেছে চোখে, নাই অশ্রুর বিন্দু,
প্রকৃতির অতি অপরূপ রূপ, অম্লান অতি ইন্দু।—
অম্বর পথে ছুটে যায় দ্রুত ছায়াচিত্রের চিত্র,
পত্র-নিবিড় ঘন অরণ্য নাহি ছেদ নাহি ছিদ্র ;
তালীবন আর খর্জ্জুরবীথি, পুষ্পতৃণের ক্ষেত্র,
বৃক্ষ বিহীন সমতল-ভূমি,—নির্ণিমেষ এ নেত্র,
কল্পনা কত মাড়াইয়া চলে দুরন্ত মরুর গা,
এস অন্তরে অন্তরি ভয়, দুর্গমে এস দুর্গা!
রূপ মুগ্ধ এ মন ছুটে যায় মৃগতৃষ্ণিকা ভ্রান্ত ;
অমৃতের কিছু সন্ধান পেলে, সন্ধান পেলে শান্ত,
শক্তি এবং সৌন্দর্য্যের সম্মিলনের পন্থা?
জীর্ণ বস্ত্র ছুড়ে ফেলে দাও ছিন্ন মলিন কন্থা ;
অস্ত্র ভীষণ তুলে নাও হাতে, হিংসা হীনের বজ্র
প্রেমের নিষ্ঠা, স্থির প্রতিজ্ঞা, ওগো বীর, ওগো ভদ্র!
তুলি ঝঙ্কার মনের সেতারে, দে তারে নিষ্ঠুর ঘা,
হে মহাশক্তি জাগো মা জীবনে, জাগো জয়া, জাগো দুর্গা?
জাগে প্রচণ্ড, নাচে উন্মাদ ভৈরবে বাজে যন্ত্র,
হল আরম্ভ চণ্ডীর পূজা পুরোহিত পড়ে মন্ত্র।
জাগে গণপতি, উঠে উদাও গম্ভীর বেদী বর্ণ,
জাগে বাগ্ময়ী, জাগো মালক্ষ্মী, খোলে পদ্মের পর্ণ ;
দেবসেনাপতি কোথায়?—মানস হয় না পরিশ্রান্ত,
যায় যতদূর, হিরণ্ময় ও—ধায় মায়ামৃগ কান্ত।
এলি কি পাষাণী, এলি কি মা আজ, বল্—আর কতদূর গা
দুর্ভাগ্যের দুর্গতি দূর কর তুমি আজ দুর্গা!

ভাবের অভিব্যক্তি

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)। *

* শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)র আলোক চিত্রগুলি ফটোগ্রাফার ডি, রতন কোং কর্ত্তৃক গৃহিত হইয়াছে।

দুঃখ।

বিরক্তি।

আহ্লাদে আটখানা।

শয়তানী মৎলব।

চিন্তা।

ভয়।

তোষামোদ।

ক্রোধ।
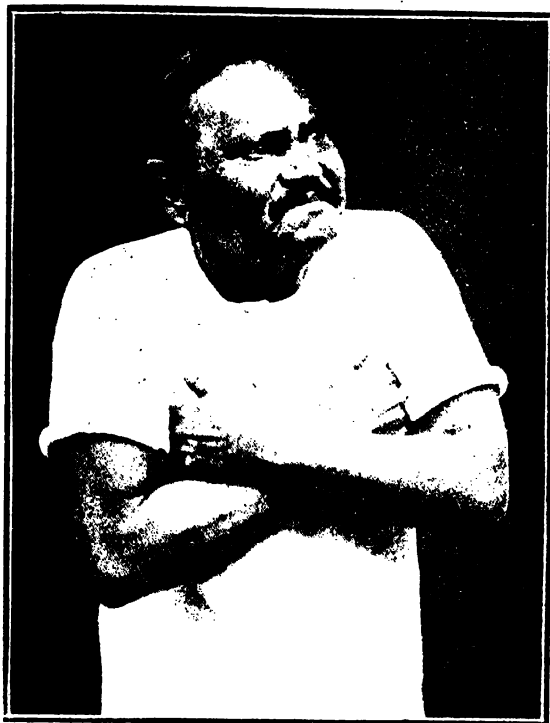
মোহিত।

রোদন।

'আলমগীর'। "আচ্ছা——

আলমগীর—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

'আলমগীর'। "বটে——

আলমগীর—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

'সীতায়'

রাম—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

"তবে তুমি সীতার তনয় !"

'সীতায়' রাম—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

লব—শ্রীযুক্ত জীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

পূজার ছুটী

(গল্প)

[রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর]

গেছে বছরের পূজার সময়ের কথা। সে যে কি কষ্ট হয়েছিল!

আমি থাকি কলিকাতায়। চাকুরী করি মাষ্টারী। মাষ্টারীর বেতন ষাট টাকা. আর একটা ছেলে পড়ানোর দর্শনী কুড়ি টাকা,এ দিয়ে কলিকাতার বাসা করে স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করা একালে একেবারে অসম্ভব। আর সম্ভব হোলেও আমার কলিকাতায় পরিবার নিয়ে বাস করা চলে না। 'পরিবার' কথাটার অভিধান অর্থ যাই থাকুক, এখন কিন্তু ও কথাটার অর্থ হয়েছে স্ত্রী পুত্র কন্যা; বর্ত্তমান অর্থে 'মা বোন পরিবারের বাইরে।' আমিও সেই অর্থেই পরিবার শব্দ ব্যবহার করেছি। কথা এই যে. বাড়ীতে মাকে একেলা ফেলে রেখে আমার স্ত্রী আর খোকাকে কলিকাতায় এনে নিজের কাছে রাখা, এ শিক্ষা, শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টান্ত দেখেও গ্রহণ করতে পারিনি। বাড়ীতে বিধবা মা একেলা থাকবেন, ঘরদোর আগ্‌লাবেন, গরু বাছুরের সেবা করবেন, যা সামান্য জমিজমা আছে, তার তদারক করবেন, আর আমি বেশ আয়াস করে স্ত্রী পুত্র নিয়ে সহরে বাস করব, এ কথা আমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই; সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি বিধাতা পুরুষের এ লিপি মুছে ফেল্‌তে পারে নাই। সেই জন্যই আমি এই দীর্ঘ সাত বছর সীতা রাম ঘোষের ষ্ট্রীটের একটা মেশেই কাটাচ্ছি; দুইটা বড় ছুটীতে বাড়ী যাই, আর বড়দিনের ছোট ছুটীতে একটু বেড়াতে যাই;—সেও দিল্লী, লাহোর নয়; এই নিকটেই বাঁকুড়ায়। সেখানে আমার শ্বশুর বাড়ী' বৎসরের মধ্যে একবার শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম হ'তে যাই। আর গোপন করেও দরকার নেই, বড়দিনের সময় পাঁচ সাত দিন গৃহিণী হীন শ্বশুরালয় থেকে নানা রকমে, নগদে ও জিনিষ পত্রে যা পাওয়া যায়, তাতে এই গরীব স্কুল মাষ্টারের পাথেয় ত কুলিয়েই যায়, সারা বছর কাপড় জামা জুতা কিনতে হয় না। শ্বশুর বড় উকিল, একটী ছেলে আর একটী মেয়ে, আমি সেই মেয়ের স্বামী। তাই, এই ছয় বছর বিয়ে হলেও এবং একটী ছেলে হ'লেও আমি তাদের কাছে নূতন জামাই, যত্ন আদর একই ভাবে পেয়ে আস্‌ছি এবং যতদিন তাঁরা দু'জন বেঁচে আছেন, ততদিন--হয় ত তার পরে শ্যালক রাজত্বেও—আমার পাওনা মারা যাবে না।

যাক্‌ সে কথা। যা বল্‌ছিলাম — সেই গেছে বছরের পূজার সময়ের কথা। আমার শ্বশুর মহাশয়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে শ্রাবণ মাসে আমার স্ত্রী খোকাকে নিয়ে বাঁকুড়ায় গিয়েছিলেন। সুমুখেই ভাদ্র মাস পড়ল,- মেয়েদের যাত্রা নিষেধ। কাজেই তাঁকে বাধ্য হয়ে ভাদ্র মাসটাও বাঁকুড়ায় থাকতে হোল। শ্বশুর মহাশয়ও অনেকটা সুস্থ হ'লেন। পূজার পূর্ব্বেই মা চিঠি লিখ্‌লেন, আমার ছুটী হ'লেই আমি যেন বাঁকুড়ায় গিয়ে আমার স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যেমন করে হোক ষষ্ঠীর দিন বাড়ী যাই!

আমাদের বাড়ী কিন্তু রেলের ধারে নয় যে, ষ্টেসনে গিয়ে টিকিট কিনলাম, আর বাড়ী গিয়ে হাজির। আমাদের বাড়ী যেতে হ'লে বাঙ্গাল দেশ যত রকম যান আছে, তার প্রায় সবগুলিরই আশ্রয় নিতে হয়। এই হিসাবই দিচ্ছি। বাঁকুড়া থেকে আমার স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যেতে হ'লে প্রথমেই ধর বাঁকুড়ায় মোটর গাড়ীতে সওয়ার হয়ে ষ্টেসনে আগমন। সেখান থেকে রেলে চেপে হাবড়ায় উপস্থিত। হাবড়া থেকে শিয়ালদহ ষ্টেসনে যেতে সেই মিউনিসিপ্যালটীর কীর্ত্তিধ্বজা আনন্দ্য সুন্দর তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়াগাড়ী—ষাট টাকা মাই-নের স্কুল মাষ্টারের ট্যাক্‌সিতে চড়া পোষায় না। তারপর আবার রেলে খুলনায় গমন। সেখান থেকে ষ্টীমার যোগে বরিশাল। বরিশালে নেমে নৌকা ভাড়া করে এক দুপুর গিয়ে একটা গ্রামে নৌকা বিদায়। সেখান থেকে ছয় মাইল পথ হয় পাল্‌কী না হয় ডুলি, আর না হয় গো-যান। বর্ষার

সময় নৌকাই বাড়ীর দুয়ারে গিয়া লাগে। কিন্তু যখন বর্ষা শেষ হয়, অথচ পথঘাট শুকায় না, স্থানে স্থানে জল থাকে, তখন যে বাড়ী পৌছান কি আরাম, তা জেলা বোর্ডের মেম্বরেরা কখন অনুভব করেন নাই। নৌকা চলে না, গোযান ও চলে না, এক পাল্‌কী বা ডুলি সম্বল। আর যাঁরা পদব্রজে যান, তাঁদের কখনও জলচর কখন স্থলচর হ'তে হয়। পথের মধ্যে অনেক স্থানেই হাঁটু সমান কাদা ভাঙ্গতে হয়, কোন স্থানে অল্প জল, কাপড় বাঁচে কোন স্থানে বা আশে পাশে লোকজন না থাকিলে কাপড় বাঁচে, কোন স্থানে বা গামছা পরতে হয়, বিনামা মহাশয় সমস্ত পথ সংবাদ পত্রাবৃত হ'য়ে বগলে অধিষ্ঠিত হন। এখন বলুন ত, এই দুর্গম পথে পূজার সময় সেই অসম্ভব যাত্রীর ধাক্কা সামলিয়ে স্ত্রী ও চার বছরের ছেলে নিয়ে বাঁকুড়া থেকে বরিশাল জেলার সুদূর প্রান্তে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার? আমার এই ছয় বৎসরের বিবাহিত জীবনে এমন কর্ম্ম ভোগ কখন করতে হয় নাই, পথে নারী বিবর্জ্জিতা বিশেষতঃ বাঁকুড়া হইতে বরিশাল সীমান্ত পথে তিন শ বার বিবর্জ্জিতা; শ্বশুর মহাশয়ের কৃপায় আর আমার সেই রাঢ় দেশবাসী সবলকায়, ব্যায়ামপুষ্ট দেহ শ্যালক প্রবরের অকুতোভয়তায় আমাকে এ কষ্ট সহ্য করতে হয় নাই, সঙ্গে পর্য্যন্ত কখন যেতে হয় নাই; নানা অছিলায় অব্যাহতি পেয়েছি। এবার কিন্তু তা হবার উপায় নেই! মায়ের পত্রে জানিতে পারিলাম যে, আমার শ্বশুর মহাশয় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিম যাবেন; আমার স্ত্রী ও পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমার মা পূজার সময় খোকাকে না দেখে থাক্‌তে পারবেন না জেনায়, তাঁরা সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন। আমি যে দিন গিয়ে তাদের নিয়ে আস্‌ব, সেই দিনই তাঁরা পশ্চিম যাত্রা করবেন; আমার শ্যালক প্রবর সমস্ত ব্যবস্থা করবার জন্য কয়েক দিন হোলো পশ্চিম চলে গেছেন; সুতরাং এবার আমি ছাড়া আর কেউ সঙ্গী হ'তে পারবেন না। আমার স্ত্রী যখন পশ্চিমে যাওয়া হবে না স্থির হোলো, তখন কি রমেশ তাদের বরিশালে রেখে তারপর পশ্চিম যেতে পারত না? কিন্তু, আমি যে বরিশালের বাঙ্গাল হ'য়েও এমন অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি, এ কথা হয় ত তাঁদের মাথায় প্রবেশ লাভ করে নাই।

একবার মনে হোলো লিখে দিই, ওদের ও পশ্চিম নিয়ে যেতে; কিন্তু তা হ'লে মায়ের মনে কষ্ট হবে। বিশেষ এতকাল মায়ের কোন আদেশ অমান্য করি নি, আর এখন এই সামান্য আদেশ লঙ্ঘন করে তাঁর মনে কষ্ট দিতে যাব। যা হবার হবে আমি একাকীই এবার সবাইকে বাড়ী নিয়ে যাব।

যেদিন আমাদের স্কুল বন্ধ হোলো, সেই রাত্রের গাড়ীতেই আমি বাঁকুড়া যাত্রা করলাম। তখনই গাড়ীতে যাত্রীর সংখ্যাধিক্য দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, আমার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। কিন্তু, উপায় নাই, যত কষ্টই হোক সহ্য করে সবাইকে বাড়ী নিয়ে যেতেই হবে।

যথাসময়ে বাঁকুড়া পৌছিয়া দেখিলাম, উভয় পক্ষেরই যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছে; সেই দিনই আমার শ্বশুর শাশুড়ী পশ্চিমে যাবেন; আমরাও সেই রাত্রির গাড়ীতেই বাড়ী অভিমুখে রওনা হব। আমার শ্বশুর মহাশয় বল্লেন যে, আমাদের হাবড়া পর্য্যন্ত পৌছতে কোন কষ্ট হবে না, কারণ তিনি পূর্ব্বেই আমাদের জন্য তিনটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করে রেখেছেন। যাক্, কতকটা ত আরামে যাওয়া যাবে; তারপর যা হয় হবে।

সেদিন অপরাহ্ণেই আমার শ্বশুর মহাশয় রওনা হ'য়ে গেল; আমরা সন্ধ্যার পর যাত্রা করলাম। খোকার যে দুই তিন দিন থেকে সর্দ্দি হয়েছে, সে কথা আমার স্ত্রী কাউকে বলেন নাই, তারাও যাওয়ার গোলে সে দিকে মনোযোগ দেন নাই। তার ফল এই হলো যে গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা দুই পরেই খোকার ভয়ানক জ্বর এলো। কি করি, তখন আর কোন উপায়ই নেই।

পরদিন প্রাতঃকালে গাড়ী যখন হাবড়ায় পৌছিল, তখনও খোকার জ্বর কমে নাই। এখন কি করা যায়? কলিকাতায় আমি যে মেসে থাকি, সেখানে কি করে এদের নিয়ে উঠি? আমার স্ত্রী বল্লেন, এ বিপদের সময় অত ভাবলে চল্‌বে না। এখন সেখানেই আশ্রয় নেওয়া উচিত।

তাই করা গেল। মেসের কয়েকজন বাড়ী চলে গিয়েছিলেন; তাঁদের ঘর খালি ছিল। তারই একটা ঘরে উঠে তখনই একজনকে ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠালাম। ইতি মধ্যেই খোকার জ্বর ছেড়ে গেল। ডাক্তার এসে বল্লেন, ও কিছু

নয়; গাড়ীতে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছিল। আর জ্বর আস্‌বে না!

তখন স্থির করলাম দ্বিপ্রহরের পর যে গাড়ী শিয়ালদহ ছাড়ে, তাইতেই যাওয়া যাক্; আমার স্ত্রীরও সেই মত হোলো; কিন্তু মেসের বন্ধুরা বললেন, এত কি তাড়াতাড়ি যে আজই না গেলে নয়, বাড়ীতে ত পূজা নেই। দুই একদিন থেকে খোকাকে একটু সুস্থ করে গেলেই হবে; এখানে ত কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

আমার কেমন যেন জেদ পড়ে গেল, ষষ্ঠীর দিন বাড়ী পৌছান চাই; বিশেষ বাড়ীতে খবর দেওয়া হয়েছে, নৌকার ঘাটে লোকজন এসে থাকবে। শেষে যাওয়াই ঠিক হোলো।

আমার শ্বশুর মহাশয় বারবার ব'লে দিয়েছিলেন যে আমরা যেন কষ্ট করে না যাই, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনি। অবশ্য ষাট টাকার স্কুল মাষ্টারের স্ত্রী-পুত্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে যাওয়া নিতান্তই অশোভন দেখায়; কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে,—আমি ত আর সরকারী বড় কর্ম্মচারী বা বড় সভার সদস্য নই যে, প্রথম শ্রেণীর ডবল ভাড়া নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে যাব;—শ্বশুর মহাশয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড় হিসেব করে দিয়েছেন; তাঁর সেই টাকা থেকে কিছু বাঁচাবার মত অবস্থা এখনও আমার হয় নাই; আর যদি কখনও হয়, তা হ'লেও এমন নীচ মন অন্ততঃ আমার হবে না।

পূজার সময় সাতদিন আগে টিকিট কিনে বার্থ রিজার্ভ করতে হয়; আমার যে চারি ঘণ্টা পরেই যেতে হবে। মেসের একটী বন্ধু বললেন, কিছু খরচ করলে রিজার্ভ হয়ে যাবে, তাঁর সঙ্গে ষ্টেশনের কোন্ বাবুর না কি আলাপ আছে।

যথাসময়ে ষ্টেশনে গিয়ে টিকিট করা গেল, বন্ধুর পরিচিত সেই বাবুটীকেও কিছু দেওয়া গেল, কিন্তু বার্থ রিজার্ভ হোলো না; তবে তিনি চেষ্টা করে এমন একটা গাড়ীতে আমাদের বসিয়ে দিলেন, যাতে মাত্র একটী বার্থ রিজার্ভ আছে, আর-গুলি খালি।

গাড়ী ছেড়ে বনগাঁয়েও পৌছে নি, তখন আবার খোকার জ্বর এলো। শিয়ালদহ থেকে আমাদের গাড়ীতে অনেক যাত্রী উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কতক বারাসতে, অবশিষ্ট সবাই গোবরডাঙ্গায় নেমে গেলেন; গাড়ীতে রইলাম আমরা তিনজন, আর রিজার্ভ করা বার্থে একটী যুবক। পরিচয়ে জানতে পারলাম তিনি প্রেসিডেন্সীতে বি-এ পড়েন, বাড়ী বরিশালে ঝালকাঠির নিকট একটী গ্রামে; তিনি সেখানকার জমীদারের একমাত্র পুত্র। যাহোক, একজন স্বদেশী সঙ্গী পেয়ে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়েছিল, বরিশাল পর্য্যন্ত ত একজন সঙ্গী মিলল!

বলেছি ত, বনগাঁয়ে পৌছাবার আগেই খোকার জ্বর এলো। ছেলে একেবারে অধীর হয়ে পড়ল। কি করি; সঙ্গী যুবক বল্‌লেন, এখন আর উপায় কি, খুলনা পর্য্যন্ত যেতেই হবে। রাস্তায় অপরিচিত স্থানে নেমে কোন লাভই নেই।

আমি বল্‌লাম যে, কলিকাতায় ফিরে যাই। কিন্তু তাতেও অসুবিধা। সারারাত কোন একটা ষ্টেশনে আর গাড়ীতে থাকতে হবে; তাতে ঠাণ্ডা লেগে হিতে বিপরীত হ'তে পারে। তার চাইতে গাড়ীর জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে খুলনা পর্য্যন্ত যাওয়া যাক্। যুবকটীও সেই কথাতেই মত দিলেন।

খুলনায় গাড়ী পৌছানো পর্য্যন্ত সবাই জেগে রইলাম। যুবকটী এক একবার ছেলেটীকে আমার স্ত্রীর কোল থেকে নিয়ে নিজেই কোলে করে গাড়ীর মধ্যে ঘুরতে লাগল। এই একটু সময়ের মধ্যেই সে যেন আমাদের কত কালের বন্ধু হয়ে গেল। তার নাম বিমানবিহারী রায়, আমারই স্বজাতি ব্রাহ্মণ। তাঁর সঙ্গে একটা থারমোমিটার ছিল; তাই দিয়ে সে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খোকার জ্বর পরীক্ষা করছিল।

আমরা রাত দুপুরে যখন খুলনায় পৌছিলাম, তখন খোকার জ্বর ১০৫ ডিগ্রী। আমি বড়ই ভীত হয়ে পড়লাম। বিমানকে বল্‌লাম, আজ আর গিয়ে কাজ নেই। এখানে ত ডাকবাংলা আছে। আমি খোকাকে নিয়ে তাইতে গিয়ে উঠি।

বিমান বলল "আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন সুকুমারবাবু, ম্যালেরিয়া জ্বরে ওর সেকেণ্ড বেশী টেম্পারেচার ওঠে। কাজ নেই এখানে অপেক্ষা করে। যেমন করে হোক বরিশালে যেতেই হবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। ষ্টীমারে

আমার একটা কেবিন রিজার্ভ আছে; খোকাদের সেখানে রাখলে ঠাণ্ডা লাগবে না। তারপর সকলে বরিশাল পৌঁছে যা করতে হয় সব করা যাবে। আপনি চুপ করে থাকুন।"

খোকাকে কোলে নিয়ে তার আলোয়ান দিয়ে বেশ করে ঢেকে ষ্টীমারে নিয়ে গিয়ে একটা কেবিনে বিছানা পেতে শুইয়ে দিল, আমার স্ত্রী খোকার কাছে বসল। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে রেখে ঘড়ি দেখে বিমান বলল "এখনও পনর মিনিট দেরী আছে ষ্টীমার ছাড়বার। আপনি এখান থেকে নড়বেন না সুকুমারবাবু, অনেক জিনিষপত্র রয়েছে। আমি একবার উপর থেকে আসি।"

আমি বললাম "সময় বেশী নেই, এমন কি দরকার যে উপরে না গেলেই নয়।"

বিমান আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া উপরে চলে গেল। পাঁচ সাত মিনিট পরেই ফিরে এলো। আমি জিজ্ঞাসা করতে বলল, একটু দরকার ছিল। তাহার পরই ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

আমরা তিনজন সারারাত খোকাকে নিয়ে বসে রইলাম। জ্বর একই ভাবে আছে; মধ্যে মধ্যে প্রলাপও বক্‌ছে। এই বিপদে তাহার মুখে এক ফোঁটা ঔষধও দিতে পারিলাম না। তবুও ভগবান পথের মধ্যে এই যুবকটীকে মিলাইয়া দিয়াছেন, তাই আমি এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে আছি। পথের আলাপ, কিন্তু বিমানের ব্যবহারে মনে হতে লাগল যেন তার সঙ্গে কতদিনের পরিচয়; সে যেন আমার সহোদর ভাই। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাকে 'তুমি' বলিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করেছি!

আমি এক সময় বললাব "ভাই বিমান, রাত বুঝি কাটবে না, ষ্টীমারের মধ্যেই খোকাকে হারাতে হবে!"

বিমান আমাকে ধমক দিয়ে বলল, "আপনি কি যে বলেন! হয়েছে কি? ম্যালেরিয়া জ্বর, একটু বেড়েছে, তাই খোকা অমন করছে। বরিশাল পৌঁছে একটু ঔষধের ব্যবস্থা করলেই ভাল হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "বরিশালে এখন আমার পরিচিত বা বন্ধু কেউ আছেন কি না জানিনে। সেখানে কোথায় গিয়ে উঠব। সেই প্রায় বার বছর আগে বরিশালে পড়েছি। তারপর বরিশাল দিয়ে প্রায়ই যায় আসি বটে, কিন্তু সহরের মধ্যে কখন যাওয়া হয় না, বন্ধুবান্ধব কে আছে না আছে, তারও খোঁজ নেওয়া হয় না। এখন এই রোগী নিয়ে কার আশ্রয়ে যাব।"

বিমান বললে "সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। সে সব আমি ঠিক করে ফেলেছি। বরিশালে আমাদের বাসা আছে; সেখানে চাকর লোকজন আছে, একজন কর্ম্মচারীও আছে! তা ছাড়া সহরে আমার অনেক বন্ধু আছে। আমি খুলনা থেকে দু'তিনখানা তার করে দিয়েছি। আমার বন্ধুরা ঘাটে এসে থাকবে! আমাদের কর্ম্মচারী বাসার সব ঠিক করে একেবারে ডাক্তার সঙ্গে করে ষ্টীমার ঘাটে উপস্থিত থাকবে। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। একবার নামতে পারলে হয়। আগে আমাদের ডাক্তার দেখুন, তারপর না হয় সিবিল সার্জ্জনকে আনা যাবে। আপনি কিছু ভাববেন না।"

আমি যে কি বলব ভেবে পেলাম না। কে এ যুবক? কে আমার বিপদের সময় এমন মহাপ্রাণ যুবককে আমার সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন? আমার স্ত্রীও কেমন হয়ে গেলেন! বিমানের সঙ্গে যে কয়ঘণ্টার মাত্র পরিচয় তা তিনিও ভুলে গেলেন। তিনিও কথা বলতে পারলেন না, কাতরভাবে বিমানের হাতখানি চেপে ধরলেন।

বিমানও যেন বিহ্বল হয়ে গেল; সে অতি ধীরে বলল "আপনারা কাতর হবেন না; খোকাকে আমি বাঁচাবই, এ ব'লে দিচ্ছি!"

এ যেন ভবিষ্যদ্‌বাণী ব'লে আমার মনে হোলো। আমি তাকে বললাম "বিমান, ভাই, তোমাকে যে কা'লই বাড়ী যেতে হবে বলেছিলে। তোমাদের বাড়ীতে পূজো। তোমার মা-বাবা তোমার পথ চেয়ে আছেন; তুমি যে তাঁদের একমাত্র ছেলে। তুমি কি করে থাকবে।"

বিমান বলল "আপনাদের সেবা করা কি মায়ের পূজা নয় সুকুমার বাবু? আপনাদের এমন বিপন্ন অবস্থায় নৌকায় তুলে ভাসিয়ে দিয়ে বাড়ী গেলে—আমার মা, আমার বাবা যখন এই কথা শুনবেন, তখন কি তাঁরা আমাকে তাঁদের

ছেলে বলে গ্রহণ করতে পারবেন? আমার মা-বাবাকে আপনি চেনেন না, তাই অমন কথা বলছেন?"

আমি তার হাত দুখানি ধ'রে বললাম "বিমান, তোমার মা-বাবাকে এতক্ষণ চিনি নাই, কিন্তু এইমাত্র চিনলাম। দেবতার মত মা বাবা না হলে কি তোমার মত ছেলে তাঁদের হয়!"

বিমান ঘাড় হেঁট করে আমায় পায়ের ধূলা নিল; আমার স্ত্রীরও পায়ের ধূলা নিতে গেল! তিনি তার দুই হাত চেপে ধরলেন,—মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

ক্রমে রাত্রি কেটে গেল। প্রাতঃকালে আমরা বরিশালে পৌঁছিলাম। দেখি একদল স্কুল-কলেজের ছেলে আমাদের নিতে এসেছেন। দুইজন ডাক্তার এসেছেন। সে কি দৃশ্য! এই ছেলেদের আগ্রহ দেখে, আমার প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।

ষ্টেশনে সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল। আমরা বিমানদের বাসা বাড়ীতে গেলাম। তখনই বিমানের অনুরোধে একটী যুবক একখানি নৌকা নিয়ে আমার মাকে বরিশালে নিয়ে আস্‌বার জন্য চ'লে গেল—ডাক্তারেরা যে খোকার ডবল নিউমোনিয়ার সম্ভাবনা ব'লেছিল। তাহার পরই সিবিল সার্জ্জনকে ডেকে আনা হোলো। তিনিও সেই কথা বললেন।

সেদিন ষষ্ঠী! কিন্তু, সে কথা কারও মনে হোলো না। বিমান বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া দিল। পূজা যে কোন্ দিক দিয়া চলে গেল, জানতেও পারলাম না। সেই বিমান, আর বরিশালের যুবকগণ আহার নিদ্রা ভুলে, পূজার কথা ভুলে দিনরাত আমার খোকার সেবা করতে লাগল! কত টাকা যে ব্যয় হ'তে লাগল, তা চক্ষের সুমুখে দেখ্‌তে লাগলাম; কথা বলতে গেলেই ছেলেরা সবাই হাঁ, হাঁ করে ওঠে। পূজার অব্যবহিত পরেই বিমানের মা বাবা এসে উপস্থিত হ'লেন; তখন খোকা অনেকটা সুস্থ হয়েছে। আমি বিমানের পিতাকে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্ব্বাদ করে বললেন, "আমি যে তিনদিন মায়ের কাছে তোমার ছেলের আরোগ্যের জন্য কতবার প্রার্থনা করেছি। তা কি বিফল হ'তে পারে বাবা! মা যে আমার সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী!"

বাইশ দিন পরে খোকার পথ্য হোলো। বিমানের যে কি আনন্দ! সে সুধু ব'লে, "দাদা, এইবার সত্যি সত্যি আমরা পূজা করেছি!"

পূজার ছুটী এইভাবে কেটে গেল; কিন্তু মায়ের কৃপায় সেই পূজার ছুটীতে আমি যে সব অমূল্যরত্ন লাভ করেছি, যে সব ভাই পেয়েছি, চিরজীবন তাদের কথা মনে রাখ্‌ব!

আনন্দময়ীর আগমনে

(গল্প)

[শ্রীপূর্ণিমা দেবী বি-এ]

(১)

মহাষষ্ঠীর দিন—অপরাহ্ণ। গ্রামের উপান্তে খোলা মাঠের মাঝখানে এক জীর্ণ কুটীর। পার্ব্বতী বিমর্ষমুখে ঘরের কোণটীতে বসিয়া আপন দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিলেন। অদূরে পূজাবাড়ীতে বোধনের বাজনা বাজিতেছিল। মালতী প্রতিমা দেখিতে গিয়াছিল, সেখান হতে মুখভার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

পার্ব্বতী ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে মা? কাঁদছিস্ কেন? ঠাকুর দেখেছিস্ ত? এর মধ্যে ফিরে এলি যে—?

মালতী রুদ্ধ স্বরে বলিল "আমায় যেতে দিলে না মা—! তাড়িয়ে দিলে—!"

"তাড়িয়ে দিলে—? কে? কেন? কি বললে তারা?"

"আমরা গরীব! আমার নতুন জামা কিম্বা কাপড় কিছু নেই ত!……তা ছাড়া—বাবার নাম করে কত কি বলতে লাগল—! সবাই বললে, যার বাপ খুন করে ফাঁসি গেছে তাকে দূর করে দাও—বাড়ীতে ঢুকতে দিও না। হাঁ মা, গরীব বলে কি পূজা দেখতে পাব না? বাবা খুন করেছিলেন—এই মিথ্যে কথাটা ওরা বিশ্বাস করলেই বা কি করে? তোমার চেয়ে ত আর একথা কেউ বেশী জানে না! তুমিই ত বলেছ, পুরীতে বেড়াতে গিয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছেন, সমুদ্রের ঢেউ এসে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। একথা ওরা বিশ্বাস করে না কেন?"

মেয়ের কথা শুনিয়া পার্ব্বতী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাহাকে আরও নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "দুঃখ করিস্ নি মা! তোকে বড়লোকদের বাড়ী পূজা দেখতে যেতে না দেওয়াই আমার উচিত ছিল!"

মালতী বলিল "তুমি কেঁদ না মা! ওরা হয়ত সত্যি খবর জানে না, তাই ভুল বুঝে আমাদের নিন্দে করে। ভগবানের চোখে আমরা পবিত্র থাকলেই হল! আমরা গরীব হলেও তাঁর দয়া হারাব না। নতুন কাপড়ের জন্য আমার একটুও দুঃখ নেই মা। বাবার নামে মিথ্যে নিন্দে করছিল তাই বড্ড কষ্ট হয়েছিল। তা ওরা ত সত্যি খবর জানে না—!"

আট বছরের মেয়ের মুখে এই সান্ত্বনার কথা শুনিয়া মায়ের বুক ফাটিয়া যাচ্ছিল। মালতীর প্রতি চাহিয়া তিনি অশ্রুসংবরণ করিলেন।

সন্ধ্যা হইলে প্রদীপ জালিয়া পার্ব্বতী মেয়েকে বলিলেন "ঠাকুর এসেছেন এসময় নিরানন্দ থাকতে নেই কা'কেও! আমার পেঁড়াটার ভেতর তোর দিদির বিয়ের আগে কেনা জামা কাপড় দু খানা এখনো নতুন অবস্থায় তোলা আছে। মাত্র এক রাত্রি সে পরেছিল। দেনা পাওনা নিয়ে গোলমাল হওয়াতে জামাই রাগ করে, আমাদের দেওয়া সব জিনিষ ফেরত দিয়ে এক বস্ত্র পরিয়ে তাকে নিয়ে গেছে।……স্মৃতির জিনিষ বলে তোকে আমি তা বার করে দিই নি কখনো। আমার আজ অন্য জিনিষ কিনে দেবার ক্ষমতা নেই, তাই, এইতেই তোকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আয় বার করে দিইগে—!"

মালতী বলিল "থাক না মা! আমি সত্যি বলছি, কাপড়ের দুঃখে আমি কাঁদিনি। দিদি কখনো ফিরে এল না, তবু তারই স্মৃতি আমাদের ঘরে ওইটুকু রয়েছেত! পরলেই নষ্ট হয়ে যাবে! ঘোষাল'দা পাঠাবে না বলেছিল, তার কথাটাই সত্যি রয়ে গেল। দিদিকে জন্মের মতই আমরা হারালুম।"

কথায় কথায় কেবলি দুঃখের স্মৃতি জাগিতেছিল। অন্য

প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার জন্য পার্ব্বতী তাহাকে বলিলেন "তবে আয় এক কাজ কর। আজকের দিনে কত লোকের বাড়ীতে কতরকম ভাল খাবার তৈরী হচ্ছে। চার আনার পয়সা দিচ্ছি কিছু ময়দা আর গুড়, মোড়ের দোকান থেকে নিয়ে আয় গে, ঘরে দুধ আছে, তোর পিঠে খাবার সাধ অনেক দিন থেকে, দুখানা গড়ে দেব। একটা আলো নিয়ে যাস্ সঙ্গে করে—।"

মালতী এক হাতে একটী চুবড়ীতে ময়দা ও গুড়ের বাটি আনিতেছিল আর অপর হাতে এক লণ্ঠন ছিল। পাড়ার কয়েকটী অল্প বয়স্ক ছেলে ও মেয়ে পূজা বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিল। মালতীর আজকের লাঞ্ছনা তাহারা দেখিয়াছিল। একটী ছেলে বলিল তোর বাপ খুন করে ফাঁসী গিয়ে ভূত হয়েছে, একলা এই মাঠের পথ দিয়ে যাচ্ছিস্, এখুনি ঘাড় মট্‌কাবে।"

মালতী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল "দূর হয়ে যাও তুমি! দুষ্টু, গোঁয়ার সব আমার সঙ্গে এ রকম কথা কইতে তোমাদের লজ্জা হয় না?"

দ্বিতীয় একটী বালক বলিল "সত্যি কথা বলব না? কে না জানে? যারা ফাঁসী যায়, মরেও তারা স্বর্গে যেতে পায় না! কোনও পুরোহিত তাদের কল্যাণে মন্ত্র পড়ে না। তাদের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত হয় না। প্রেতযোনী পেয়ে তারা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়।"

অসহ্য রাগে মালতী বলিল "নিশ্চয় আমার বাবা ফাঁসী যান নি। তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। তোমরা যে রকম দুষ্টু। মলে তোমরাই ভূত হবে। ভাল লোকে কখনো ভূত হয় না। যারা মন্দ, যারা মিছামিছি ঝগড়া করে,—"

বালকেরা মালতীকে কথা শেষ করিতে দিল না। ধাক্কা দিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল। তার হাতের আলো ভাঙ্গিয়া গেল। ময়দা ও গুড় ছড়াইয়া পড়িল। হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে সকলে চলিয়া গেল। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে আলো, ঝুড়ি ও গুড়ের বাটী কুড়াইয়া লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

সেই সময় একটী প্রৌঢ় পিছন হইতে আসিয়া মালতীর প্রতি সস্নেহকণ্ঠে বলিলেন "কাঁদছ কেন খুকী? তোমার নাম কি? ছেলেরা সব ফেলে দিয়েছে, তা ভয় কি, এস আমি আবার কিনে দিচ্ছি!"

বালিকা বলিল "আমার নাম মালতী! তুমি কে?"

"তুমি মালতী, তা আমি জানি—দেখেই চিনতে পেরেছিলুম আমি—আমি কে জিজ্ঞাসা করছ? আমায় দেখে তোমার ভয় করছে না ত? আমি একটা ভূত—কিন্তু কারুর কোন অনিষ্ট করি না।"

মালতী বলিল "যারা মন্দ লোক তারা ভূতের ভয় করে। আমি কাকেও ভয় করি না।"

"সত্যি? তাহলে তুমিত খুব লক্ষ্মী মেয়ে! ওই ছেলেগুলা কিন্তু বড় দুষ্টু। বলে তোমার বাবা ভূত হয়েছে, আর অন্ধকারে তোমার ঘাড় মটকাবে। সব মিথ্যে কথা -এস বাজারে আমার সঙ্গে। পূজার দিনে নতুন কি জিনিষ চাও বলত?"

"আমার বাবা থাকলে যা দিতেন—"

"তা ত নিশ্চয়ই—। আমিও তোমার সব দেব। যা চাইবে সব দেব—কি পেলে তোমার আনন্দ হয় বল!"

"আমার মা বড় দুঃখী। তার মুখে কখনো আমি হাসি দেখতে পাই না। তুমি এমন যদি কিছু দিতে পার যাতে আনন্দ হয়, তাই পেলে আমি সন্তুষ্ট হব।"

"তোমার মা কি চান?"

"আমার মা কিছুই চান না, কেবল একটী জিনিষ ছাড়া।"

"বল—বল—কি সে জিনিষ—?"

"মা যা চান—জগতের ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে কিনতে পাওয়া যাবে না। রাজার ঐশ্বর্য্যও তাঁকে আনন্দ দেবে না। মা যাঁকে ফিরে পেলে সন্তুষ্ট হবেন, তিনি মৃত্যুর যবনিকার আড়ালে হারিয়ে গেছেন। বাবাকে যদি ফিরে পেতুম আমরা!"

মালতীর কথায় প্রৌঢ়ের নেত্র সজল হইয়া উঠিল।

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বাজারে আসিয়াছিলেন। মালতীর পছন্দ মত অনেকগুলা জিনিষ কিনে, প্রৌঢ় বলিলেন, "চল তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।"

মালতী বলিল "তোমার নাম আমাকে বললে না!

তোমার কথা শুনে আজ আমার কেবলই বাবার কথা মনে পড়ছে!"

প্রৌঢ় আদ্রকণ্ঠে বলিলেন "বাড়ীতে চল। তোমার মা আমাকে চেনেন!"

(৩)

মালতীর ফিরিতে বিলম্ব হইতেছিল দেখিয়া পার্ব্বতী উৎকণ্ঠিত হইতেছিলেন।

আট দশমাস আগে পার্ব্বতীর স্বামী গোবিন্দ একটা খুনের মামলায় আসামী বলিয়া ধরা পড়েন। কি একটা কাজে তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেখানে যাবার পরের দিনই খবর আসিল তাঁকে পুলিশে ধরিয়াছে। দেশের বাড়ীতে তদন্তের জন্ম দু পাঁচ দিন অনেকগুলি কর্ত্তার পদধূলি পড়িয়াছিল। অনেক দিন ধরিয়া বিচার চলিল। শেষে একদিন খবর আসিল তিনি দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছেন শীঘ্রই ফাঁসী হবে। পার্ব্বতীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পুলিশ ভুল করিয়াছে, তাঁহার স্বামী নির্দ্দোষ গ্রহের ফেরে কষ্ট পাইতেছেন —বিচারে নিশ্চয়ই মুক্তি পাইবেন। ভগবান দুঃখিনীর প্রার্থনা শুনিলেন না! ফাঁসির কথা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে নাই। যাহারা সংবাদ দিয়াছিল, তাহারা সঠিক কেহ কিছু জানে না! কেহ বলিত ফাঁসী হইয়া গিয়াছে, আবার কেহ বলিত পূজার ছুটীর পর হইবে। পার্ব্বতী মেয়ের কাছে মিথ্যা করিয়া বলিতেন "পুরীতে গিয়া সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছেন।" কেহ নিশ্চয় জানিত না। এই সব গুজবের কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে আজ তাঁর মেয়েকে অপমান করিয়াছে। ইহার দুঃখ মনে নিরন্তর বাজিতেছিল।

মালতী আসিয়াই বলিল "কে এয়েছে মা চিনতে পার?"

নূতন আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া পার্ব্বতী চমকিয়া উঠিলেন। আনন্দময়ী মায়ের আগমনে দেশময় নূতন প্রাণের সাড়া জাগিয়াছিল। শুধু তাঁহারা দুটী ভাগ্যহীনা এক কোণে নির্জ্জনে বসিয়া আপনাদের অদৃষ্টের কশাঘাত সহিতেছিলেন। তাঁহাদের মর্ম্মবেদনায় কেহ সান্ত্বনাও দেয় নাই। দুঃখের ক্রন্দন কি তবে মায়ের কানে বাজিয়াছে? অথবা এ স্বপ্ন!

আনন্দের আবেগ পার্ব্বতী সহিতে পারিতেছিলেন না। গোবিন্দের চেহারা প্রায় এক বৎসরের কষ্টে ও ভাবনায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। নিরন্তর ফাঁসী হইবে এ চিন্তায় মাথার চুল শাদা হইয়া গিয়াছে। সহসা দেখিলে মনে হয় যেন মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এত বিকৃতি সত্ত্বেও তাহাকে চিনিতে পার্ব্বতীর একটী মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় নাই।

গোবিন্দ মালতীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন "কেমন বলেছিলুম তোমার মায়ের আনন্দ ফিরিয়ে এনে দেব।"

মালতী তখনো কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না। একবার মায়ের প্রতি চাহিল। আর একবার গোবিন্দের প্রতি চাহিল। তাহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

গোবিন্দ আবার বলিলেন "চিনতে পারছ না মালতী! সত্যিই চেহারাটা একদম বদলে গেছে। ফাঁসীর আদেশ যে দিন প্রত্যাহার হল, পুলিস তাদের ভুল বুঝতে পারলে, আমি একবার একটা আশার সামনে দাঁড়িয়েছিলুম, নিজেই আপনাকে চিনতে পারি নি।"

পার্ব্বতী বলিলেন "কিন্তু আমার ভুল হয়নি! জগন্ময়ী মা মুখ রেখেছেন! প্রাণে বাঁচিয়ে ফিরে দিয়েছেন, এ কি কম আনন্দের কথা? চেহারা আবার ভাল হয়ে যাবে! মায়ের আশীর্ব্বাদ আমরা পেয়েছি!"

গভীর বিস্ময়ে মালতী বলিল "বাবা! ফিরে এসেছ তুমি? তোমার কথা শুনে কেবলি আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু বুঝতে পারি নি। তুমি নিজে পরিচয় দিলে না কেন? প্রতিমা না দেখতে পেয়ে আমার অভিমান হয়েছিল—কিন্তু তিনি কারুর অপরাধ নেন না। তোমরা এস সঙ্গে, আমরা সবাই তাঁর পায়ে প্রণাম করে আসি।"

---

৬০ খণ্ডে সম্পূর্ণ

পৃথিবীর ইতিহাস

চিত্রে ও গল্পে

অগ্রিম মূল্য ৫০ সম্পূর্ণ সেট

১০ খণ্ড-সৃষ্টি রহস্য ও ১০ খণ্ড দেশের ইতিহাস ও ৩০ খণ্ড-বিদেশের ইতিহাস

প্রতি খণ্ড ১

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

২৲ টাকা জমা দিয়া গ্রাহক হইলে গ্রাহকদের যেমন যেমন বই প্রকাশিত হইবে ভিঃ পি ডাকে পাঠান হইবে —পুস্তক মূল্যেই— উহারা বই পাইবেন, পোষ্টেজ বাবদ কিছু অতিরিক্ত লাগিবে না। প্রতি সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইতে হইলে প্রায় ।৶০ অতিরিক্ত লাগে, সে ছয় আনা আমরাই দিয়া দিব। মাত্র দুই টাকা পোষ্টেজ বাবদ পাঠাইয়া (ছয়মাস বহির পোষ্টেজেই তাহা কাটিয়া যাইবে) গ্রাহকেরা ৬০ খানি বই পোষ্টেজ ফ্রি পাইবেন।

এইরূপ ৬০ খণ্ড বই বাহির হইবে।
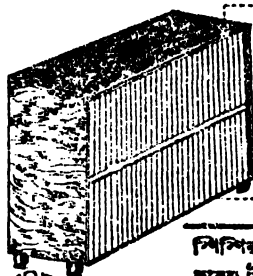
গ্রাহকদের বিশেষ সুবিধা
এই বুক-সেল্‌ফটী গ্রাহকদের বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

প্রকাশিত হইয়াছে

বৈদিক ভারত, ইংলণ্ড, গ্রীস, জাপান, ব্রহ্মদেশ, রোম, পারস্য, চীন, জার্ম্মেনী, মিশর, ইহুদি, মহাভারত, রাশিয়া, ইটালি, অষ্ট্রিয়া, আরব, রাজস্থান, আফ্রিকা, সোনার বাঙ্‌লা, বাঙলায় বিদেশী, আমেরিকা, তুর্কী ভারত।

শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ∴ কলিকাতা।

৪৩। মুকুন্দ রায়। ৪৪। পাপীর অনুতাপ। ৪৫। স্বামী বিবেকানন্দ।

কারাগারে কোমলতা

[রায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর]

(১)

করিমপুর জেলার সদর জেলখানার উত্তরদিকে জেলের বাগান। সেই বাগানে অনেক কলাগাছ, পেঁপেগাছ, বেল-গাছ আছে এবং নানা প্রকার তরি তরকারির চাষ হয়। এই বাগানের মধ্য দিয়া উত্তরে জেলের ইটখোলায় যাইতে হয়। অনেক কয়েদী ইটখোলায় কাজ করে ও ইট প্রস্তুত করিয়া "থামাল" সাজায় এবং পাঁজা দেয়। ইটখোলা হইতে অল্প দূরে কয়েক ঘর মুসলমান কৃষকের বাড়ী।

মেহের খাঁ কয়েদী একটা হাঙ্গামা মোকর্দ্দমায় দু বৎসরের জন্য জেল খাটিতেছে, তাহার দেড় বৎসর অতীত হইয়াছে। সে একদিন প্রাতঃকালে ইঠ সাজাইতেছে, এরূপ সময়ে একটি ছাগলের বাচ্চা লাফাইতে লাফাইতে তাহার কাছে আসিল। তাহার পিছনে নাচিতে নাচিতে একটী মুসলমান বালক আসিয়া দূরে দাঁড়াইয়া ছাগ শিশুকে দেখিতে লাগিল। কয়েদীর কাছে আসিয়া তাহাকে ধরিবার সাহস হইল না। মেহের ছেলেটাকে দেখিয়া কাছে ডাকিল, সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ছাগল ধরিবার লোভে নিকটে আসিয়া কয়েদীর দিকে এক চক্ষু স্থাপন করিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার ধারণা ছিল, জেলের কয়েদী সব ডাকাত, খুনী, তাহাদের কাছে যাইতে নাই! কিন্তু মেহেরের হাসিখুসী ভাব দেখিয়া তাহার সাহস হইল। নিকটে আর কোন কয়েদী বা ওয়ার্ডার ছিল না। মেহের তাহাকে বলিল—

"পোলা, তোমার নাম কি?"

সে বলিল—"রমজান।"

এই নাম শুনিয়া মেহেরের চক্ষু সজল হইল। তাহার এই রকম সাত বৎসরের একটী ছেলে আছে,—তাহার নামও রমজান। প্রথম দর্শনেই মেহেরের তাহার উপর স্নেহ হইল। সে তাহাকে আরও নিকটে আসিতে বলিল, এবং সে আসিলে তাহাকে কোলে করিয়া সেই ইটের থামালের আড়ালে বসিল। ছাগলটিকে সেখানেই ধরিয়াছিল, রমজান ছাগল পাইয়া খুসী হইল। এই সময়ে কাজ বন্ধ করিবার ঘণ্টা পড়িল। মেহের রমজানকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"ঐ ত তোমাগো বারী—কাল আবার আইস।" শিশুটি ছাগ-শিশু লইয়া দৌড়াইয়া গেল।

(২)

পরদিন সকালে কাজ করিতে আসিয়া মেহেরের চক্ষু ঐ কৃষক পল্লীর দিকে, সেই বালকটিকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে ইট গড়িতে গড়িতে কাজ করিয়া বসিয়া থাকে, আর তাহার বাটীর রমজানের কথা ভাবে। সে তাহাকে কতদিন দেখে নাই—এই দেড় বছরে সে কত বড়টি হইয়াছে—সেও কি এই রকম ছাগল লইয়া খেলা করিতে ভালবাসে—ইত্যাদি। সে কতক্ষণে দেখিতে পাইল রমজান এদিকে আসিতেছিল, কিন্তু একটি স্ত্রীলোক—সম্ভবতঃ রমজানের মা, তাহাকে কি বলিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেল। মেহেরের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল; ঠিক এই সময়ে সে ওয়ার্ডারের হুঙ্কার শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার রক্তচক্ষু মেহেরর দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া আছে—"বৈঠে বৈঠে ক্যা করতা হায়; শালা। কাম করো।" মেহের অমনি ভীত হয়া ইটের ফর্ম্মা লইয়া বসিল।

ইহার পরের দিন আবার মেহের সেখানে কাজে আসিল। আজ তাহার সুপ্রভাত, সে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, রমজান ধীরে ধীরে তাহার দিকে আসিতেছে, মেহের তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাক দিল, এবং সে কাছে আসিলে ইটের থামালের আড়ালে তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখে চুমা খাইয়া বলিল—

"বাপজান, তুই কাল আসেস্ নাই ক্যানরে?"

রমজান বলিল—"কাল আসতেছিলাম, মা আসবার দিল না। এখানে একজন সেপাই দাঁড়ায়ে ছিল যে।"

মেহের সজল নয়নে বলিল—"ঠিক কথা। না আইয়া ভালো করছোস্। কাল আবার আস্‌পিতো? তোরে কেলা খাইতে দিমু।"

রমজান "আসব" বলিয়া এক ছুট দিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

পরদিন প্রাতঃকালে মেহের ইটখোলায় যাইবার সময় কলা বাগানের মধ্যে প্রস্রাব করিবার ছল করিয়া বসিয়া রহিল, এবং অন্ত কয়েদীগণ ওয়ার্ডারের সঙ্গে অগ্রসর হইলে, সে উঠিয়া একটা কলাগাছ হইতে কয়েকটা কলা ছিঁড়িয়া তাহার কাপড়ের মধ্যে লুকাইল। পূর্ব্বদিন সে লক্ষ্য করিয়াছিল এই কলাগুলি একটু লাল হইয়াছে, সেজন্ত রমজানকে কলা দিবে বলিয়াছিল।

সে ইটখোলায় গিয়া এই কলা কয়টি ইটের বনে লুকাইয়া রাখিল এবং রমজানের আসিবার অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিল। প্রায় একঘণ্টা পরে রমজান এদিক ওদিক তাকাইয়া যখন দেখিল, ওয়ার্ডার অনেক দূরে আছে, তখন সে এক দৌড়ে মেহেরের নিকটে আসিয়া তাহার কোলে বসিল। মেহের হাসিমুখে তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে সেই কলা খাইতে দিল। রমজান সেখানে বসিয়া কলা কয়টি খাইয়া আবার একদৌড়ে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, সে কাল আবার আসিবে। তাহার কলা খাইয়া লোভ বাড়িয়াছে।

(৪)

ঐ দিন বেলা বারটার সময় জেলার বাবু আফিস হইতে বাসায় গিয়া স্নানান্তে ভাত খাইতে বসিলেন, তাহার গৃহিণী সম্মুখে ভাতের থালা দিয়া বলিলেন,—

"তুমি যে সব জিনিষ বাসায় পাঠাও, পথে তার অর্দ্ধেক চুরি যায়।"

জেলার বাবু একগ্রাস ভাত মুখে দিয়া বলিলেন—"সে কেমন? বাঘের ঘরে ঘোঁগের বাসা? আমার পাঠানো জিনিষ চুরি গিয়াছে? কি জিনিষ বল'ত?"

"আজ যে জেলখানার বাগান থেকে এক কাঁদি মর্ত্তমান কলা এসেছে তার গোড়ার ভাল চারটা কলা নেই।

"বটে এ নিশ্চয়ই যে ব্যাটা কয়েদী এনেছিল তার কাজ আমি তাকে কলা খাওয়ার মজা দেখাচ্ছি।"

বোধহয় সকলেই জানেন জেলখানার বাগানের ভাল ভাল জিনিষই জেলখানার বাবুদের (কখন কখন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের) উপভোগ্য। কয়েদিরা খায় কেবল খোসাভুষি। জেলার বাবু যে কয়েদীর কথা বলিলেন সে তাঁহার বাড়ীতে পালাক্রমে বেগার খাটিতে আসিয়াছিল, তাহা বে-আইনী নহে।

জেলার বাবু বৈকালিক নিদ্রার পর জেল আফিসে যাইয়া প্রথমেই সেই কয়েদিকে তলব করিলেন। সে বলিল অন্ত কয়েদী যখন তাহার হাতে ঐ কলার কাঁদি দিয়াছিল, তখন ঐ কয়টি কলা তাহার মধ্যে ছিল না সে এই কথা সেই কয়েদী দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিল। তখন যে কয়েদী গাছ হইতে কলা কাটিয়াছিল তাহার তলব হইল। সে আসিয়া বলিল—"হুজুর, আমি যখন কলাকাটি তখন ওয়াটার সাহেব আমার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি জানেন ঐ কয়টা কলা ছিল না।" ওয়াটার সাহেব আসিয়া তাহাকে সমর্থন করিলেন।

তখন খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ—কে জেলার ও তস্ত গৃহিণী-ভোগ্য সুপক্ক রম্ভা চুরি করিল। হেড ওয়ার্ডার অনেক লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ইটখোলার এক জন কয়েদিকে হাজির করিল। সে বলিল ইটখোলা হইতে আসিবার সময় সে আজ মেহের যেখানে কাজ করে সেখানে পাকাকলার খোসা দেখিয়া আসিয়াছে। জেলর তখন সেই কয়েদীও মেহেরকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ং ইটখোলায় তদন্ত করিতে গেলেন। সেখানে গিয়া প্রকৃতই পাকাকলার খোসা দেখিতে পাইলেন, এবং রক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মোহরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুই বাগানের পাকা কলা চুরি করিয়া খাইয়াছিস?"

মোহর বলিল—"হুকুর আমি কলা খাই নাই।"

"তবে এখানে কলা আনিয়া কে খাইল?"

মোহর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তখন সেই ইটখোলার ওয়ার্ডার প্রমাণ করিল, সেদিন সকালে ইটখোলায় আসিবার সময় মেহের প্রস্রাব করিবার ছল করিয়া সকলের পেছনে দেরী করিয়াছিল।

এই সকল অবস্থা ঘটিত প্রমাণ দ্বারা জেলার বাবু সাব্যস্থ করিলেন, মেহেরই কলা চুরি করিয়া খাইয়াছে। জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ পরদিন বেলা ৯টার সময় মেহেরের বিচার করিয়া দণ্ড দিবেন।

(৫)

পরদিন বেলা নয়টার সময় জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ কুলহেড্ (Mr Cool-head) সাহেব জেল পরিদর্শনে আসিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দ্বার রক্ষক ঘণ্টায় বাড়ি মারিয়া সকলকে হুসিয়ার করিয়া দিল। ওয়ার্ডারগণ তাঁহাকে সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া সম্ভাষণ (Salute) করিল। তিনি জেলখানায় ঢুকিয়াই আফিস ঘরে অধিষ্ঠান করিলেন। তখন জেলার ও নায়েব জেলার তাঁহাকে সেলাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রয়োজনীয় কাগজ ও খাতাপত্র হুকুমের জন্ম পেশ করিলেন। তিনি সেগুলি দেখিয়া যথাযোগ্য হুকুম দেওয়ার পর অপরাধী কয়েদীদিগের বিচার আরম্ভ হইল।

১নং অপরাধী—তেলের কল ঘুরায়। তাহার তেলের পরিমাণ কম হইয়াছে (Short work)—প্রথম অপরাধ বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া (warning) দেওয়া হইল।

২নং অপরাধীর নিকট তামাক পাওয়া গিয়াছে। হুকুম হইল, তাহার mark (নম্বর) কাটা যাইবে।

৩নং অপরাধী—অন্ম কয়েদিকে রাগ করিয়া চড় মারিয়াছিল। উভয়ের কৈফিয়ৎ ও প্রমাণাদি লইয়া সাহেব হুকুম দিলেন, অপরাধীকে তিনদিন পায়ে বেড়ি পরিয়া কাজ করিতে হইবে।

৪নং অপরাধী মেহের খাঁর তলব হইল। জেলার তাহার কলা চুরি করার প্রমাণ উপস্থিত করিলেন। তখন সাহেব তাহার জবাব কি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"টুমি কেলা চুরি করিয়া খাইয়াছে ?"

মেহের।—হুজুর, আমি চারিটা পাকা কেলা গাছথন ছিঁড়ছিলাম খাই নাই।

"টুমি খায় নাই ?"

"না, হুজুর।"

জেলর বলিলেন--"মিথ্যা কথা—সেখানে কলার খোসা আমি দেখিয়াছি, আর সকলেও দেখিয়াছে।"

"ব্যস্—টোমার ডস্ বেত হোবে।"

মেহের অমনি তাঁহাকে সেলাম করিল।

সাহেব জেলরের Suggestion (পরামর্শ) অনুসারে এই হুকুম দিয়া মেহেরের রেকর্ড ভাল করিয়া দেখিতে-ছিলেন,—সে পূর্ব্বে কখনও সাজা পায় নাই, বরং এই দেড় বৎসরের মধ্যে ভাল কাজ করিয়া যথেষ্ট good mark (ভাল নম্বর) পাইয়াছে, সেজন্ম তাহার খুব সাজাও কমিয়াছে। আবার এখনও সে সোজাসুজি চুরি স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু খাওয়া স্বীকার করিল না কেন ? তাঁহার মনে খট্‌কা হওয়ায় তিনি জেলারকে বলিলেন, ইহার বেতের হুকুম না দিয়া তিনি ইহাকে গম ভাঙ্গিবার কাজে বদলী করিতে চান। জেলার মেহেরকে সাহেবের কথা বুঝাইয়া বলিলেন—

"দেখ তোমার উপর সাহেব দয়া করিয়া দশ বেতের হুকুম রহিত করিয়া জেলখানার ভিতরে গম ভাঙ্গার কাজে দিতে চান।"

মেহের জোড়হাতে বলিল—"হুজুর, আমার ব্যাতের সাজাই বজায় থাক, আমারে বদলী করবেন না। ইটখোলায়ই আমার থাকোনের ইচ্ছা।"

সাহেব কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"টোমার ইটখোলামে কি আছে ? তুমি হুয়া বইঠে বইঠে কেলা খাইবেন ?"

"হুজুর, ধর্ম্ম অবতার, আমি কেলা খাই নাই। আমারে ব্যাতের হুকুম দ্যান্, ইটখোলাতন বদলী করবেন না।"

"টবে কেলা কে খাইয়াছেন, বলিটে পার ? সাচ্চা বাট্ বোলো।"

"হুজুর! আপনি যখন বারে বারে জিগাইতেছেন, তখন না বইল্যা পারি না। ও কেলা আমি খাই নাই—আমি গাছের থন ছিরা্যা নিয়া একগো পোলারে খাওনের জন্ম দিছিলাম। তার নাম রমজান—ঐ ইটখোলার উত্তরে তারগো বারি। সেই ছেড়া কেলা খাইছিল।"

সাহেব একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"টুমি সেই লেকড়ার ওয়াস্তে কেলা চুরি করিয়া বেট খাইটে কেন ইচ্ছা করিয়াছ ?"

এই কথায় মেহের কাঁদিয়া ফেলিল। সে বলিল—

"হুজুর, আমার বেয়াদপি মাপ করবেন। হুজুরের সাদি হয় নাই, পোলার মায়া কি ট্যার পান নাই। সেই রমজানের মত আমার একগো পোলা বারিতে আছে। আজ দ্যাড় বছর তারে দেখি নাই। ঐ রমজান একদিন এট্টা ছাগলের বাচ্ছার জন্তে আমার কাছে আইছিল। তারে দেখ্যা আমার পোলার কথা মনে পরল। তারে আর একদিন আইতে কইয়া তার মাতনের জন্ত কেলা নিছিলাম। এই আমার অপরাধ।"

"তুমি ইটখোলা ছাড়িতে চাও না কেন ?"

"হুজুর, ইটখোলা তন বদলী হইলে সেই ছেরাডারে দেখতে পারমু না। সেইজন্ত ইটখোলায় থাকোনের ইচ্ছা। হুজুর দোহাই আপনার আমারে ইটখোলায় রাখ্যা ব্যাতের হুকুম দ্যান্।"

মেহেরের এই কাতরোক্তি শুনিয়া সাহেবের চোখে জল আসিল। তিনি রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—

"আচ্ছা, আমি টোমার কসুর মাপ করিলাম। Jailor, I excnse him. Bring up another.

মেহের সাহেবকে সেলাম করিয়া সজল নয়নে সরিয়া গেল।

আনন্দময়ী মা

[শ্রীশিবরতন মিত্র]

কার গো আনন্দময়ী, কার তরে এত
উল্লাসের সুখ উৎস দিয়াছ খুলিয়া ;
কার তরে বল দেবি, শরদিন্দু সহ
শরদিন্দু নিভানন, জননীর সমর
করুণ সস্নেহ ভাবে দেখাও আসিয়া ;
কেই বা সে ভাগ্যবান, কহ তা অধীনে
সংসার সমরাঙ্গনে অক্ষত শরীরে
না বুঝি শোকের জ্বালা, বিয়োগ-প্রদাহ—
ভ্রমিতেছে, ভাবিতেছে সর্ব্বভাব মাখা
অপরূপ এ মূরতি আনন্দের শুধু ?

তুমি ত আনন্দময়ী,—মূরতি তোমার
সদানন্দ মাখা, কিন্তু মাগো, কৃপা করি
কহ ত দাসেরে, এ বিশাল সংসারেতে
রহে কয়জন, যারা হেরিয়া তোমার
সুন্দর মূরতি খানি স্মরিয়া আপন,
বিগত সংসার-সুখ হৃদি বিদারিয়া
ফেলে না শোকের অশ্রু রক্তধারা সম ?

তুমি ত আনন্দময়ী, চিরানন্দ তব—
পতি পুত্রকন্তা আদি সর্ব্ব পরিজন
একত্র মিলিয়া সুখে দেখা দাও সবে
তেমনি আনন্দ মুখে প্রতি বর্ষ আসি ;
কিন্তু মাগো জগন্ময়ি, জগৎ জননী,
নহ কি বিদিত তুমি, লক্ষ লক্ষ জন
এসেছিল কল্য যারা তব সন্নিধানে
সর্ব্ব পরিজন মেলি, লুটাইছে তারা
ছিন্ন-শাখ তরুসম, কান্দিতে কান্দিতে
বিদরি গগন তল,—হারায়েছে কেহ
জীবন-সর্ব্বস্ব তার প্রিয় স্বামী ধনে,
হারায়েছে কেহ প্রাণের পুতুল সেই
অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিনী—জনক জননী তরে
পুত্র কন্তা কান্দে, জনক জননী পুনঃ
পুত্রকন্তা তরে জরাজীর্ণ নেত্র হ'তে
কঠিন দু' এক বিন্দু নেত্রবারি ফেলে ;
কেহ লুটাইছে আহা, বিচ্ছিন্ন হইয়ে

সহজ-রতন হতে, জন্ম জন্ম তরে,—
জনপূর্ণ এ সংসার জনশূন্য ভাবি।

একি লীলা মায়াময়ী, কেমনে বুঝিব ?—
কেমনে বুঝিব, সর্ব্বসুখে সুখী হয়ে
আস এ জগতে, বাড়াইতে শুধু আহা,
শোকের অনন্ত স্রোত দুঃখীর হৃদয়ে,—
কি মহান্ বার্ত্তা মাগো, শিখাও এমনে ?—
ভ্রান্ত মোরা জ্ঞানশূন্য, সাধ্য কিবা বুঝি ?

জগত জননী তুমি, সবার আপন,—
শোকের প্রবাহ তাই সবার হৃদয়ে
তোমায় হেরিলে মাগো উঠে উছলিয়া ;
কে জানে কোথায় আছে হেন দিব্য জন
জানে না শোকের বার্ত্তা, তোমা হেরি তাই
বিমল আনন্দে মাতি উল্লাসে নাচিবে ?
সমুৎসুক রহে লোক সমগ্র বৎসর
তব দরশন তরে কিসের লাগিয়া ?—
সেত শুধু কান্দিবার তরে, দেখাইতে শুধু
সঞ্চিত শোকের বোঝা, সদা বহি যাহা -
শরীরের রক্তটুকু জলে পরিণত।
দীন যারা কান্দে মাগো, কিসে ধনী হবে,
ধনী যারা ভাবে কিসে হবে পৃথ্বীপতি,
পাষণ্ড নারকী যারা কাঁপে তব ডরে,
স্থির-চিত্ত সাধুজন তাহারাও কান্দে
তারস্বরে মা মা বলি হৃদয় ভরিয়া—
কেমনে লভিবে তব কৃপা এ ভাবনা ;
দুঃখী যারা কি আশ্চর্য্য, দুঃখের নিরয়ে
গড়াগড়ি যায় সদা, তবু সে ভাবনা
কেমনে হেরিবে তোমা' যথাযোগ্য ভাবে
সম্ভ্রমের সহ, দীন হীন প্রজা যথা
পিতা মাতা সম সেই রাজ দরশনে।

দুঃখ-প্রপীড়িত যদি সবার হৃদয়
চৌদিকে উঠিছে যদি ক্রন্দনের রোল
এই ছিল, কোথা গেল, হায় হায় বলি
সকলে ফেলিবে যদি তপত নিঃশ্বাস,
কেমনে বলিব মাগো, সদানন্দময়ি,
আনন্দ প্রবাহ এক সংসার মাঝারে
আপনি বহিতে রহে তব আগমনে ?

শীতের যাতনা তীব্র, বসন্ত বিরহ
নিদাঘের খরতাপ, প্রাবৃট্ অশনী,
দূরে দূরে কে কোথায় গেছে পলাইয়া—
প্রকৃতির প্রিয় কন্যা শরৎ সুন্দরী
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা, হরিৎ শ্যামল
ক্রোড়ে করি আসিয়াছে, জগৎ ভরসা,
ধনী দীন মনে মনে কত সুখ আশা
করিছে কল্পনা ; কিন্তু মাগো, বল দেখি
হেরিয়া তোমায়, আপনার জন তুমি—
চির-বিয়োগের কথা, এ হেন সময়ে
কার নাহি পড়ে মনে ?—কার নাহি পুড়ে
স্তরে স্তরে হিয়াখানি, ভাবিয়া বিরলে—
সে যদি রহিত মোর, কত না উল্লাসে,
অন্তরে এ আশা ধরি, মাতিতাম মোরা।

তবে মা আনন্দময়ি, আনন্দ কোথায় ?
সকলি ত দুঃখময় উছলিয়া উঠে
তোমা হেরি ততোধিক শোকের যাতনা।
রঘুকুল চূড়ামণি বলী রাঘবের
অকাল বোধনে পূজা, কমল হরণ
এই না পুরাণ বার্ত্তা ?—সেও ত সকলি
মর্ম্মন্তুদ শোকময় বিষাদ-আখ্যান !
সত্যকথা, পরিশেষে কমল-লোচনে
আনন্দ অমৃত ধারা ঢালি অকাতরে
দূরে ফেলিয়াছ তার পূর্ব্ব দুঃখ কথা ;
কিন্তু মাগো, সেত কই নহেক মানব—
দেবতায় দেবতার অনুকম্পা, আহা,

একি গৌরবের কথা ?- যেবা দেখি তব
আপনার জন, তারে কৃপা কর সদা
দূরে ফেলি অন্য জনে দুঃখের নিরয়ে,
এও কিগো বনদেবি, গৌরবের কথা !

নষ্ট-বুদ্ধি, হীনচেতা ভক্তিতত্ত্বহীন
পড়ে আছি চিরদিন দুঃখের নিরয়ে
পারি না বুঝিতে এই মায়াময়ী লীলা,
দুঃখ মাঝে কিবা সুখ পারি না ভাবিতে,
কেমনে হেরিব তবে সবে আপনার
দুঃখের অনলে পুড়ি কান্দি দিবা রাতি ?

মূঢ়, অযথা প্রলাপ ! কেমনে বুঝিবে
কত শত ভক্ত জন মনোরাজ্য হ'তে
বিদূরিত করি দুঃখ জন্ম জন্ম তরে
রচিয়া অপূর্ব্ব কিবা রাজ্য আনন্দের
কত সুখ উল্লাসেতে সম্ভাষি মায়েরে
চিরানন্দ সহ নিজ আনন্দ মিশায়ে
চিদানন্দে বিরাজিত দিবস রজনী।

আপনার জন ভিন্ন কে কবে কোথায়
বিতরিছে কৃপা-কণা ?—দীন হীন জনে
কৃপা করে দয়াবান, জান না কি তুমি,
অন্তরের অন্তরঙ্গ আপনার ভাবি।

বহুদূরে চিরকাল রয়েছে মায়ের
নাহিক ভক্তির লেশ হৃদয়ে তোমার
কিবা গুণে তবে তুমি হইবে মায়ের
আপনার জন, লভিবে অপার কৃপা—
ভুলি যাবে যার বলে সংসার-যাতনা,
লভিবে বিমলানন্দ, স্বর্গীয় দুর্লভ—
ডাকিবে মায়েরে সদা প্রাণ পূর্ণ করি,
চিরানন্দময়ী ব'লে, ডাকিয়াছে যথা
ভক্তগণ সবে মেলি লভি দিব্যজ্ঞান।

ভাব তুমি এ জীবনে সব দুঃখময় ?—
কান্দিতেছ হায় হায়, দিবস যামিনী !—
কেন, বুঝ না কি তুমি, কি বিমল সুখ
রয়েছে নিহিত এই ক্রন্দনের মাঝে ?
কেন বুঝ না কি তুমি, কে শুনিবে তব
বৎসর বৎসর আসি দুঃখের কাহিনী ?—
আনন্দের হাসি হাসি' জানায়ে তোমায়—
এ জীবনে যত দুঃখ নিতান্ত অলীক,
হাসিয়া খেলিবে সবে অতি তুচ্ছ ভাবি
রহিবে আনন্দে সদা,'—মায়াময়ী যথা
রয়েছে আনন্দে মাতি রণ ক্ষেত্র মাঝে
দশ করে দশ দিক্ ভীম প্রহরণে
নামিয়া অসুর-কুল শত্রু দেবতার।

শিল্পী যতীন্দ্রকুমার

[রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর]

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমার সেনের শিল্প-প্রতিভা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখ্‌বার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। দেশে এত লোক থাক্‌তে, যতীন্দ্রকুমারের গুণগ্রাহী, চিত্র-শিল্পে অভিজ্ঞ অনেক মনস্বী ব্যক্তি থাক্‌তে আমার মত আনাড়ির উপর এ ভার অর্পণ করা কোন প্রকারেই সঙ্গত হয় নাই। এ হেতুবাদ প্রদর্শন সত্ত্বেও আমি অব্যাহতি লাভ করতে পারিনি।

তবে, আমার একটা বড় রকম নজীর আছে। যাঁরা যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, আজকাল বাঙ্গালা দেশে তাঁরাই সে বিষয়ে খুব জোরের সঙ্গে প্রবন্ধ লেখেন, বক্তৃতা করেন, গবেষণা করেন, আর কৃতী ব্যক্তিগণ এই অর্বাচীনতা দেখে মুখ টিপে হাসেন। আমি মহাজনের পন্থা অনুসরণ করছি, বিশেষজ্ঞগণের আমোদের খোরাক যোগাচ্ছি।

আমরা ছেলেবেলায় কালীঘাটের চিরস্মরণীয় 'পটুয়া'দের শ্রীকরাঙ্কিত মা কালীর চিত্র, আর উড়িষ্যা-গৌরব চিত্রকরগণের অঙ্কিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তির আলেখ্যই চিত্রবিদ্যার চরম বলে মনে করতাম, এবং সেই আদর্শ সম্মুখে রেখেই কালীর আঁচড় কাট্‌তাম। তারপর এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে চিত্র শিল্পের কি অভাবনীয় উন্নতিই আমাদের দেশে দেখ্‌তে পেলাম। যে শিল্প আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে নিম্ন শ্রেণীর পটুয়াদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, যার আভিজাত্য গৌরব মোটেই ছিল না, এখন তা রাজোচিত গৌরব লাভ করেছে; এখন চিত্র শিল্প আমাদের দেশে একটা বরণীয় আসন লাভ করেছে। আর তারই ফলে আজ আমার মত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও যশস্বী শিল্পী শ্রীমান যতীন্দ্রকুমার সেনের পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়েছে।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশে যাঁরা চিত্র বিদ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, যতীন্দ্রকুমার তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু, এ প্রসিদ্ধি তাঁহার অনেকদিন পূর্ব্বে লাভ করা উচিত ছিল। তা হয় নি এইজন্য যে, শ্রীমান যতীন্দ্রকুমার কোনদিন আত্মপ্রতিষ্ঠা জাহির করবার জন্য একটুও চেষ্টা করেন নাই,—না দিয়াছেন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন—না হয়েছেন ধীমান সম্পাদকগণের দ্বারস্থ—না বাজিয়েছেন নিজের ঢাক নিজে। নিপুণ শিল্পী গৃহকোণে ব'সে তন্ময় হয়ে ছবি এঁকেছেন, যে দুই দশজন কোন রকমে জানতে পেরেছেন, তাঁরা ছবিগুলি দেখে তারিফ করেছেন, বাহোবা দিয়েছেন। আর যতীন্দ্রকুমার নিজেকে বিশেষ বিপন্ন মনে করেও আত্মগোপনের চেষ্টা করেছেন; এইটী হচ্ছে যতীন্দ্রকুমারের স্ব-রূপ। এমন আত্ম-সমাহিত, যশোলিপ্সাহীন চিত্রকর, এমন অতুল মনীষার অধিকারী, যতীন্দ্রকুমারের প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর কাছে যে অনুযোগ লাভ করব তা জানি। তবুও, তাঁর পরিচয় না দিয়ে পারলাম না।

আমরাই শ্রীমান যতীন্দ্রকুমারকে তাঁর নিভৃত গৃহকোণ থেকে টেনে বার করে মাসিক সাহিত্যের আসরে নামিয়েছিলাম; আর তারই জন্যে যে কত হায়রাণ হ'তে হয়েছে, তাও কোনদিন ভুলব না। যতীন্দ্রকুমার অনেকদিন পর্য্যন্ত কি করতেন জানেন? যত সব ব্যবসায়ীদের নানা জিনিষের পরিকল্পনা আঁকতেন, সুশোভিত প্রচ্ছদ পটের ডিজাইন করতেন, মনোহর বিজ্ঞাপনাদির ছবি আঁকতেন, আর অবসর সময়ে খেয়ালমত নিজের মনো-মন্দিরে যে কলা-লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর পূজা করতেন। সেই পূজার নৈবেদ্যই আমাদের চেষ্টায়, আমাদের অনতিক্রমনীয় জুলুমে দেশের মাসিক পত্রাদির শোভা বর্দ্ধন করেছে এবং এখনও করছে। ব্যবসার হিসাবে যা করতেন এবং এখনও করেন, তার পুরস্কার হাতে হাতেই পেয়ে থাকেন, যথেষ্ট অর্থাগমও হয়। অবিবাহিত থাকার দরুণ অর্থের দিকেও তেমন টান নেই। এই হোলো যতীন্দ্রকুমারের বৈষয়িক পরিচয়। এইখানে আর একটা কথার উল্লেখ করছি; ব্যবসায়ী

চিত্র বিভাগে তাঁর যে কতখানি প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার একটা প্রমাণ এই যে, কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার ইডেন-উদ্যানে যে প্রদর্শনী হয়েছিল, সেই প্রদর্শনীর চিত্র বিভাগের পুরস্কার নির্ব্বাচনে শ্রীমান যতীন্দ্রকুমার 'বসুমতী' কর্ত্তৃপক্ষের প্রদত্ত Commercial Art-এর সর্ব্বপ্রধান পুরস্কার লাভ করেছিলেন ; আমরাই জোর করে তাঁকে এই প্রদর্শনীতে চিত্র পাঠাতে সম্মত করেছিলাম। এবং তার কিছুদিন আগে কি করে ঠিক মনে নেই, যে চিত্র প্রদর্শনী হয়, তাতেও যতীন্দ্রকুমারকে ছবি পাঠাতে বাধ্য করেছিলাম ; তার পূর্ব্বে তিনি কখনও ওদিকে অগ্রসরই হ'ন নাই।

যতীন্দ্র কুমারের যে সকল ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্র, রেখাচিত্র এতদিন আত্ম-প্রকাশ করেছে, তার কোন খানিরই বিরুদ্ধে কাহারও মুখে কোনদিন বিরুদ্ধ কথা শোনা যায় নাই। যেখানে যেটি যেমন হ'লে সাজে, যতীন্দ্র কুমারের হৃদয়স্থিত কলালক্ষ্মী তাঁকে তাই করতে অনুপ্রাণিত করে থাকেন, আর যতীন্দ্র কুমার অনায়াসে তাঁর মনোরম প্রতিভার বিকাশ করেন। তাঁর অসংখ্য ছবির মধ্যে কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টার নাম করব ;—এটা ভাল হয় নি, এমন কথা বল্‌বার অবকাশ তিনি কোন দিন দেন নাই। এর একটা গুপ্ত কারণ আছে ; ছবি আঁকবার জন্যই যতীন্দ্র কুমার ছবি আঁকেন না ; তিনি প্রেরণার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেন। যখন সেই ভাব —ইংরাজীতে যাকে inspiration বলে, তাই আসে, তখন তার তুলিকা অবিরাম গতিতে চলে ; তখন জন-কোলাহলের মধ্যে ব'সেও তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে অনিন্দ্যসুন্দর চিত্র অঙ্কিত করে ফেলেন, এ আমরা অনেক সময় দেখেছি।

আর একটা কথা এই খানে বলে রাখি। শ্রীমান যতীন্দ্র কুমারের প্রথম জীবন কেটেছে দারভাঙ্গায়—সেই কাঠ খোট্টার দেশে ; তার পর এসেছেন এই কলিকাতায়—পোড়া মাটী আর ইঁট কাঠের সহরে, যেখানে সব কৃত্রিম, সব মানুষের কারিগরী। পাহাড় পর্ব্বত ও সমুদ্র, অরণ্য নির্ঝর, প্রকৃতির অনুপম শোভা - এ সকল কিছুই দেখ্‌বার তাঁর সুযোগ হয় নাই ;—এই ত সবে বিগত বৎসর পূজার সময় তিনি দারজিলিংয়ে প্রথম গেলেন ;—অজন্তা ইলোরা, উত্তর পশ্চিম-অঞ্চলের সুন্দর দৃশ্যাবলী, এ সব কিছুই তিনি চর্ম্মচক্ষে দেখেন নাই। অথচ তার মানস নয়নের সম্মুখে এ সকলই যেন চির উদ্‌ঘাটিত, চির উদ্ভাসিত! এই মহনীয় শক্তি, এই প্রদীপ্ত প্রতিভাই যতীন্দ্র কুমারকে চিত্র-ক্ষেত্রে বরণীয় করেছে।

যতীন্দ্র কুমারের একটা নিজস্ব ধরণ আছে। তিনিই বলিতে গেলে commercial আর্টের পথ প্রদর্শক। তাহারই অনুকরণে অনেকে এ পথে আসিয়াছেন। তিনি কোনদিন অনুকারী নন ; তিনি সর্ব্বদা নিজের পথে চলেন, প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কিছুরই বিচার তাঁহার কাছে নাই ; তিনি সুন্দরের উপাসক। তাই, তিনি যা আঁকেন তা এমন সুন্দর হয়, এমন সজীব হয়, এমন প্রাণস্পর্শী হয়, এমন মনোমোহন হয়।

এইত একদিক। যতীন্দ্র কুমারের আর একটা দিক আছে ; সেটা রঙ্গ ও ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে অসাধারণ দক্ষতা। আমি ত ভেবে পাইনে sublime ও rediculous এমন একাধারে থাকে কি করে! অনেকে বলেন, রঙ্গ ও ব্যঙ্গ-চিত্রেই যতীন্দ্র কুমারের কল্পনা খোলে ভাল। আমরা কিন্তু বলি, দুই দিকেই তাঁর সমান হাত ; তিনি হাসাইতেও পারেন, কাঁদাইতেও পারেন। আর এরই জন্য যতীন্দ্র কুমারকে আমরা এত ভালবাসি।
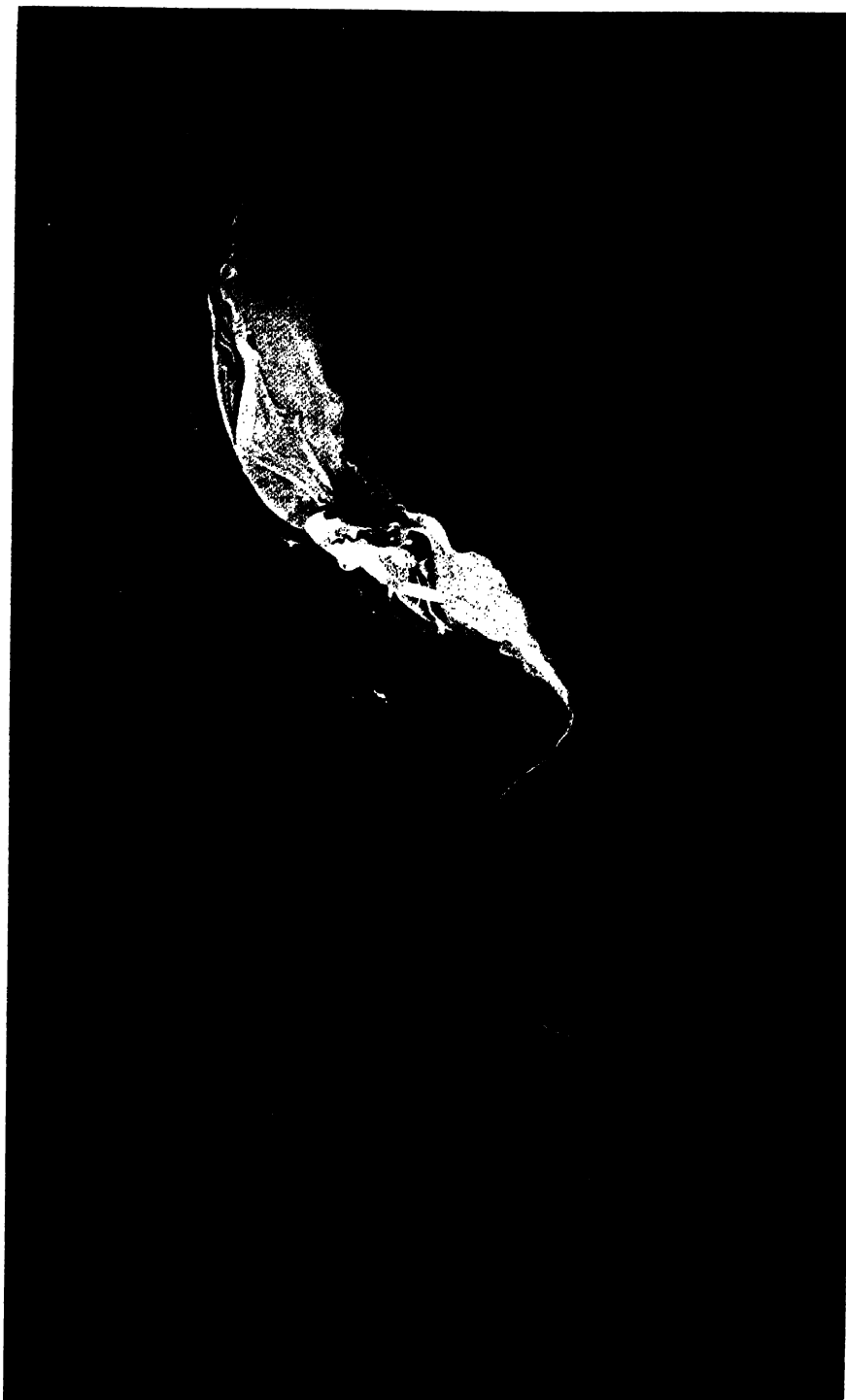
বিদ্যুৎ

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

"সাথী"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রকুমার সেন।

কুহকিনী—

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

সমস্যা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন।

পরেশচন্দ্রের বোধোদয়

[নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত]

পরেশচন্দ্র কেমন করে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে হঠাৎ এমন ধারা মাতাল হয়ে উঠ্‌লো—পাড়ার লোক কেন, বাড়ীর লোকেও কেউ ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাল্লে না। দু'বছর আগে যারা পরেশচন্দ্রকে দেখেছে—তারা সকলেই বলে যে পরেশকে সিগারেট কি বিড়ি পর্য্যন্ত কেউ কখনো খেতে দেখেনি। গো-বেচারী পরেশ,—কারুর সঙ্গে চড়া কথা কয় না,—শান্তপ্রকৃতি, নম্র, ধীর, গম্ভীর। মুখখানি সদাই হাসিমাখা,—সকলের সঙ্গে বেশ সদ্ভাব। সেই পরেশ এমন মাতাল হ'ল কি করে?

বি-এ, এম্‌-এ পাশ না ক'ল্লেও পরেশ লেখাপড়া বেশ ভালরকম জানে। কাজে কর্ম্মে খুব চটপটে, চালাক, চতুর। দশ বছরের ভেতর সাহেবদের খুসী করে আড়াই শো টাকা আফিসে মাইনে করে নিয়েছে। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব মহলে পরেশের পসার যথেষ্ট। কারণ, পরেশ সুকণ্ঠ, সুগায়ক। গলাখানি তা'র মধুমাখা।

"গাইয়ে-বাজিয়ে" সৌখীন লোক হ'লেই দু'পাঁচ জায়গায়, দু' দশটা আড্‌ডায় যেতেই হয়। পরেশ অনেক আড্‌ডায় যাওয়া আসা কর্ত্ত বটে, কিন্তু অনেক ধরাধরি মারামারি করেও কখনো কেউ একফোঁটা মদ পরেশের ঠোঁটে স্পর্শ করাতে পারেনি। যেখানে বেশী পীড়াপীড়ি হ'ত, সুবোধ বালকের মত পরেশ সেখান থেকে সরে পোড়তো।

পাড়ায় মিত্তিরদের বৈঠকখানায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ছোটবাবুর কাছে পরেশ বসতো—গল্প ক'র্ত্ত, গানবাজনা ক'র্ত্ত। ছোটকর্ত্তা ছিলেন daily passenger—অর্থাৎ প্রত্যহ সন্ধ্যার পর—আধখানা (Three Star Hennesie) থ্রি ষ্টার হেনিসি তিনি জলযোগ ক'র্ত্তেন। ছোট কর্ত্তার "সাঙ্গ-পাঙ্গ" বড় কেউ ছিল না। আর তিনি বেশী ঝামেলাও ভালবাসতেন না। পরেশই তাঁর প্রাণের বন্ধু। ছোটকর্ত্তা নিজে "ঢুকু-ঢাকু" ক'র্ত্তেন, দুটী লবঙ্গ কি ছোট এলাচ মুখে পুর্ত্তেন,—ভিজে তোয়ালে দিয়ে মাঝে মাঝে গোঁফটা মুছতেন,—আর পরেশের গানের সঙ্গে সঙ্গত কর্ত্তেন। ছোট কর্ত্তার বাঁয়াতবলায় হাত বেশ মিষ্টি। রাত্রি দশটা বাজ্‌তো, পরেশ বাড়ী চলে আসতো,—আর ছোটকর্ত্তা ওরই মধ্যে একটু আধটু টাল খেতে খেতে অন্দরে ঢুকে আহারাদি সেরে খাটে "চোদ্দপোয়া" হতেন। মাঝে মাঝে পরেশকে ব'ল্‌তেন—"ভায়া! একটু চলবে নাকি?" পরেশ যুক্তহস্ত কপালে ঠেকিয়ে জিব বার করে এবং সেটাকে দাঁতে কামড়ে ধরে বলতো—"আমায় ঐটেতে মাপ কর দাদা!"

ছোটকর্ত্তা এক নিঃশ্বাসে পাত্রস্থিত "রাঙ্গা জলটুকু" নিঃশেষ করে বিজ্ঞের মত গম্ভীর হয়ে বলতেন—"এ জিনিষ যত না খাওয়া যায় ততই ভাল। বুঝলে ভায়া! এ অতি বদ জিনিষ। শরীর নষ্ট - মনোকষ্ট,—যাকে বলে—বিষ! ঐ জন্যেই তো আমি কখনো কাকেও পীড়াপীড়ি করি না!"

পরেশ। "তা এতই যদি বদ্‌ জিনিষ বলে জানো, তবে খাও কেন? ছেড়ে দিলেই তো পারো!"

ছোট-ক। এই দোবো—দোবো—ভায়া। মকর সংক্রান্তির দিন, তোমার বৌদি আর আমি দুজনে একসঙ্গে মন্ত্র নোবো। ব্যস—সেইদিন থেকে এ দ্রব্য আর এ জীবনে—" বলেই ডোজ্‌টা (Doze) বড় করে নিয়ে গলাধঃকরণ কল্লেন। তারপর ছ'টা মকর সংক্রান্তি কোনখান দিয়ে চলে গেল। ছোটকর্ত্তার উদরের মধ্যে "ও দ্রব্য" সমভাবেই যাতায়াত কর্ত্তে লাগলো,—মন্ত্র আর নেবার সুবিধেই হ'ল না।

পরেশ তার সুরাপানাশক্ত বন্ধুদের মাঝে মাঝে বলতো—"মদ খেলে তো জ্ঞানশূন্য হ'তে হয়। সজ্ঞানে আমোদ উপভোগ করাতেই তো যথার্থ আমোদ! অজ্ঞানে আমোদ করে লাফালাফি করে সুখটা যে কি,—তা তো বুঝতে পারি না।"

দাসু বিশ্বেস্ তখন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা কয়ে মদের গেলাস পরেশের মুখের কাছে ধরে বল্লে—"খেয়ে কি সুখ, কি আমোদ,—এই যিনি সর্ব্বসুখ আমোদ-দাত্রী,—তিনিই বুঝিয়ে দেবেন। পরের মুখে ঝাল খেলে কি বাবা ঝালের taste কেউ বুঝ্‌তে পারে! বড় দরের লোক বলে গেছেন—Practical wisdom acts in the mind as gravitation does in this material world!"

*   *   *   *

পরেশের স্ত্রী একদিন পরেশকে বল্লে—"যেখানে মদ খাওয়া হয়—তুমি সেখানে না হয় নাই গেলে বাবু!"

পরেশ বল্লে—"যা বলেছ। আমিও ঠিক তাই মনে মনে ঠাওরাচ্ছিলুম। তবে হয়েছে কি জান—ও রকম বিচার করে যেতে হলে শতকরা আশী পচাশীজন বন্ধুর সঙ্গে আমার কাটান্ ছিঁড়েন কর্ত্তে হয়। বিস্তর বন্ধুবাড়ীতে নেমন্তন্ন আমন্ত্রন খাওয়া রহিত কর্ত্তে হয়!"

স্ত্রী বল্লেন—"তা না হয় কোথাও নাই গেলে!"

পরেশ বুঝিল—সেটা সম্ভবপর হবে না। ছোটকর্ত্তা পরেশকে বেশ স্পষ্টাক্ষরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—"মদ খাওয়া আজকাল—বিশেষতঃ এই সুসভ্য ইংরাজ রাজত্বে সভ্যতার পরিচয়। তুমি খুব কম—অতি কমই বড়লোক,—বড় লেখক,—বড় সাহিত্যিক, বড় কবি, বড় বীর দেখতে পাবে,—যিনি মদ জিনিষটীকে "মাতৃবৎ" পরিত্যাগ করেছিলেন বা করেছেন। আমাদের দেশের একজন মস্ত বড় বিদ্বান—মস্ত বড় বক্তা—দেশের একটা মাথা বল্লেই চলে,—তিনি কোন একটা মিটিংএ হাজার হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে বলেছিলেন—"Woman and wine are created not for "chanachoor wallas," but for gentlemen, great men and rich men! বুঝলে ভায়া,—ভগবান মদ মেয়েমানুষ সৃষ্টি করেছেন বড় বড় লোকের জন্যে—ভদ্রলোকের জন্ত! অধম চানাচুরওয়ালার জন্তে নয়! বুঝলে?" পরেশ কি বুঝিল জানি না। তবে এ রকম কথা শুনে সেদিন প্রতিবাদ করলে না।

*   *   *   *

হঠাৎ পরেশের বুকে একদিন একটা নির্ঘাৎ চোট লাগলো! পরেশের বড় মেয়ে নলিনী তিনদিনের জ্বরে মারা পড়লো! মেয়েটীকে পরেশ প্রাণের চেয়েও, তার সকল ছেলের চেয়েও ভালবাসতো! নলিনী রূপেগুণে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিল! বয়েস হয়েছিল বছর এগারো; বিয়ের সম্বন্ধ অনেক ভাল ভাল জায়গা থেকে আপনা-আপনিই আস্‌ছিল; পরেশ এত শীগ্‌গি বিয়ে দিতে চায় নি! বেচারা ভাবতো—"বিয়ে দিলেই তো 'নলি' আমার পর হয়ে—পরের বাড়ী চলে যাবে। থাক্ যে কটা দিন নিজের কাছে রাখতে পারি!" কিন্তু কালাকাল বিচার-শূন্য মহাকালের তর সইলো না। নলিনী বাপ মার বুকে ভীষণ শক্তিশেল হেনে অজানা লোকে চলে গেল। পরেশ তিনদিন ধরে শয্যাশায়ী। কেঁদে কেঁদে হতভাগ্য পরেশের দম্ আট্‌কাবার জোগাড়! ছোট কর্ত্তা এসে পরেশকে জোর করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন!

*   *   *   *

পাঁচ বছর কেটে গেল। পরেশচন্দ্র এখন মস্ত উপাধিধারী হয়েছেন—"পরেশ মাতাল!" প্রত্যহ ৫টার পর অফিস থেকে বেরিয়ে সটান "বেণ্টিংসজে" গিয়ে ওঠেন,—পাঁচ সাত ইয়ার মিলে দেড়টা কোনদিন দুটো—কোন কোন দিন তিনটে চারটে বোতল ফিনিস্ করেন! "অপার মহিমা—সুরা পাপ সহচরী!" নিরীহ ভালমানুষ পরেশচন্দ্র লজ্জামান সম্ভ্রমের কোন ধার ধারেন না! রাত্রে বাড়ী ফেরেন যখন তখন আর তাকে মানুষ বলে চেনবার জো নেই! প্রত্যহ একটা না একটা জিনিষ পরেশচন্দ্র হারাতে আরম্ভ কল্লেন। দশটার সময় দিব্যি ভদ্রলোকটী সেজে ধুতি, চাপ্‌কান, উড়ানি, মোজা এঁটে অফিসে বেরুলেন। রাত্রে যখন বাড়ী আসেন কোনদিন চাদর নেই,—কোন দিন গায়ের চাপ্‌কান ছিঁড়ে কুটি কুটি,—কোনদিন এক পায়ে জুতো অন্য পায়ে মোজা; একদিন হয় তো পরবার কাপড়খানা পর্য্যন্ত খুইয়ে কোমরে খবরের কাগজ জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করে বাড়ীতে হাজীর! ফেরবার সময় ট্যাঁকে একটী আধলা থাকে না; বাড়ী পৌঁছে তবে গাড়ীভাড়া বা ট্যাক্সিভাড়া কিম্বা রিক্স ভাড়া

দিতে হয়। মাসের মধ্যে ৫।৭টা "মনিব্যাগ" হারিয়ে শেষে "মনিব্যাগ" ব্যবহার করা ছেড়েই দিলেন।

সহজ অবস্থায় পরেশচন্দ্র যাকে বলে একেবারে "সদাশিব।" দু'পাত্র পেটে পড়লেই আর এক মূর্ত্তি। মাতাল তো আর এক রকমের নয়—হরেক রকমের। কেউ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠে, মারধোর, গালমন্দ করে—ঝগড়া ঝাটি করে, কেউ ভীষণ "বক্তার" হয়, ক্রমাগত তার মুখে ইংরাজি ভাষা বেরুচ্ছে—(তা তিনি "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" স্কলার হোন বা ফিফ্থো ক্লাস পর্য্যন্ত ইংরিজিতে "লায়েক হোন"); কেউ ক্রমাগত কাঁদতে থাকে,—হঠাৎ তার প্রাণের ভেতর করুণ রসটা বেজায় রকমের পাক মার্ত্তে সুরু করে;—কেউ একেবারে দিলদরিয়া দাতাকর্ণ হয়ে পড়ে; কেউ নাচে, কেউ ক্রমাগত রাসভবিনিন্দিতস্বরে গান লাগিয়ে দেয়—সে গানের আর বিরাম নেই। সবাই যত বলে—"ওরে বাবা, থাম থাম"—তার বয়ে গেছে থামতে,—সে ততই জোরে গাইতে থাকে—"ধনধান্য পুষ্পভরা, ওরে আমার প্রাণ ভোমরা"—ইত্যাদি। কেউ অ্যাক্‌টো কর্ত্তে থাকে, কখনো বীররস, কখনো বীভৎস রস—(কারণ এ অবস্থায় এই দুটো রসই স্বভাবতঃ বেরিয়ে পড়ে)। কেউ হঠাৎ প্রেমিক হ'য়ে ক্রমাগত প্রেমের "কবিতে" আওড়াতে থাকে, কেউ বলে "আমি পাখীর মত উড়বো," কেউ বলে, "আমি মাছ হয়ে জলে সাঁতার দোবো";—কেউ বলে "তালগাছে উঠে আমি আমার বাড়ী দেখবো।" পরেশচন্দ্রের ভেতরে উক্ত সমস্ত রসগুলিরই ছিটেফোঁটা বিদ্যমান ছিল।

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই বল্লেই চলে। আসবে কখন? আর থাকেই বা কেমন করে? অভাগিনী মনোরমা ইদানীং স্বামীকে তো সজ্ঞানে বড় দেখ্‌তে পান না। অজ্ঞান অবস্থায় পরেশচন্দ্র রাত্রে বাড়ী ফেরেন; কোনদিন ঘরের মেঝেতে,—কোনদিন বারান্দায়, কোনদিন সমস্ত রাত বাড়ীর উঠোনে পড়েই নিশা যাপন করেন। প্রথম প্রথম মনোরমা চাকর-বাকরদের খোসামোদ করে—কোন রকমে ঘরে তুলিয়ে নে মাথায় পায়ে জল টল দিয়ে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা কর্ত্তেন। রোজ রোজ এ রকম কি কেউ পেরে থাকে? না, বরদাস্ত হয়? বেলা নটা পর্য্যন্ত নিদ্রা দিয়ে পরেশচন্দ্র ধড়মড়িয়ে উঠলেন, তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে স্নান করে—কোন রকমে দুটো গরাস মুখে পুরে অফিস রওনা হ'লেন। ব্যস্—স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত তার সম্পর্ক।

প্রথম প্রথম মনোরমা অনেক কান্নাকাটি করে স্বামীকে বোঝাতেন। পরেশ চন্দ্র তেত্রিশ কোটী দেবতার নাম করে শপথ করে বল্‌তো "আর কখনো খাবনা। আজ থেকে ছেড়ে দিলুম।" যথার্থই খুব অনুতপ্ত হয়েই পরেশ এরকম প্রতিজ্ঞা কর্ত্ত। মনে মনে খুবই বুঝতো—"কি অন্যায় কচ্ছি, কি মহাপাপই কচ্ছি!" সময় সময় নিজের ওপোর যথেষ্ট ঘৃণাও হ'ত। আপনাকে আপনি শত সহস্র ধিক্কার দিত। দুঃখে-ক্ষোভে-অনুতাপে কখনো কখনো দারুণ আত্মগ্লানিতে চোখের কোণে তার জল দেখা দিত! কিন্তু তো "হলে কি হবে? হাম্ তো কম্লি ছোড়নে মাংতা বা কি কম্‌লি তো হাম্‌কো ছোড়তা নেই বাবা! ৫ টার পর বাড়ী ফিরবো ব'লে পরেশ চন্দ্র বুকে চাদর বেঁধে—সেই সঙ্গে মনকেও বেশ করে বেঁধে আফিস থেকে যেই বেরিয়ে ফটকের সিঁড়ির ধাপে পা দিয়েছেন,—অম্‌নি হরিচরণ আড্যি সাম্‌নে হাজির হয়েই একেবারে পরেশচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে বস্‌লেন—একগাল হেসে আড্যির-পো পরেশকে ধরে বস্‌লো "চল চাটুয্যে—গরীবের বৈঠকখানায়, অনেক দিন তোমার গান শুনিনি। চল—একটু মাংস টাংস রান্না-হচ্ছে বাড়ীতে—একটা ভাল জিনিষ"—বলেই গাড়ীতে ব্রাণ্ডির কেস্‌টা দেখিয়ে দিলে! বোতল দেখে পরেশ একেবারে আঁতকে উঠে বল্লে—"না না ওসব আমি একেবারেই ছেড়ে দিইছি—বাপরে আর ও জিনিষ—বলেই—পরেশচন্দ্র পাশ কাটাবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগলেন, আড্যি কিন্তু নাছোড়বান্দা! বল্লে—"আরে দাদা মাল না হয় নাই খেলে ভদ্রলোকের বাড়ীতে ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোটা দিতে দোষ কি! মাইরি বাড়ীর মেয়েরা আজ ছমাস ধরে তোমার গান শোন্‌বার জন্যে লালায়িত! আধ ঘণ্টা বসে—দু এক খানা গান গাইতে কি দোষ দাদা?"

পরম সাত্ত্বিক ভাবে পরেশচন্দ্র আধ ঘণ্টার জন্যে দু এক খানা গান গাইতে আড্যির বৈঠকখানায় চল্লেন—দেখতে দেখতে আড্যির বৈঠকখানায় পরেশের গান শুনতে মজলিসি

রসিকরাজেদের দল সারি সারি বসে গেল ; "ঠুন ঠুন পেয়ালা কেয়া রং বেদম্!" পরেশ "না না—আমি ছেড়ে দিইছি—খাবনা—একি তোমাদের অন্যায়—ইত্যাদি যত বলে ইয়ারের দল—" আরে তাও কি হয়! এতটা চেঁচিয়ে মেহন্নৎ কল্লে একটু গলা ভিজিয়ে নাও—বেশী খাবার দরকার কি—এই দেখ Two finger a doze কতটুকুই বা দিইছি—সবটাই সোডা, চোঁৎ করে গিলে ফেলোনা—কেন জ্বালাও বাবা—ইত্যাদি নানা রকমের বাক্য ছটায় পরেশ চন্দ্রকে একেবারে হাড়িকাঠে কায়দা করে ফেলে—তারপরেই ঝেড়ে কোপ! ব্যস্ পরেশ চন্দ্র কাৎ!

মনোরমা খাবার নিয়ে ঘরে বসে আছেন। আজ যখন অমন করে দিব্যি গেলে গেলেন, আজ কি আর বেতরিবৎ হয়ে বাড়ী ফির্ব্বেন!" মনে মনে বেচারা এই কথাই ভাবছে আর মা দুর্গা, মা কালীকে ডাকছে আর সকাতরে প্রর্থনা কচ্ছে "আজ যেন ঠিক হয়ে সহজ অবস্থায় ভদ্রলোকের মত বাড়ী ফেরেন!"

রাত্রি ৮টা বাজলো—দশটা বাজলো—ক্রমে দুপুর হল, পরেশের ফেরবার নাম নেই! পরেশ তখন—মাথা চেলে জড়ানো কথায় গ্যাদ্দানো স্বরে আড্ডির বৈঠকখানায় তান ধরেছে—"ছবি দেখেলা যা বাঁকে সামেরিয়া ধ্যান লাগাওয়ে"—আর আড্ডির বৈটকখানা-বিহারী মদোন্মত্ত ইয়ারের দল ফেরুপালের ন্যায় চীৎকার করে উঠছে—"বহুৎ আচ্ছা—বাহোবা বাহোবা—জিতা রহ বাবা চাটুর্য্যে—হায়—হায়!" এক এক কলি পরেশচন্দ্র গান গায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিকট চীৎকার! কেই বা গায়—আর কেই বা গান শোনে! মাতালদের গানবাজনার মজলিসে এই রকম আমোদই হয়ে থাকে! দেখতে দেখতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর কাবার! আড্ডির চাকর বাকরেরা বহু চেষ্টায়—বহু যত্নে—বহু পরিশ্রমে "বাবুর দলকে" আহার স্থানে নিয়ে গেল।

হরিচরণ আড্ডি পয়সা-ওলা লোক। বন্ধুবান্ধব নিয়ে এ রকম "অপ্রীতিভোজ" সপ্তাহে দুতিন দিন রাত্রে তাঁর বাড়ীতে হয়ে থাকে। খাবারের আয়োজন যথেষ্ট হয় বটে,—কিন্তু খায় কে? বাবুরা গড়াতে গড়াতে আহারস্থানে কোন রকমে পৌছুলেন, বটে, কিন্তু আসনে কেউ ভদ্রভাবে বসবার সুবিধে কর্ত্তে পাল্লেন না। কেউ থালার ওপোর হুমড়ি খেয়ে পোড়লো—কারও পা লেগে জলের গেলাস উল্টে খাবার দাবার জলে ভেসে গেল; কেউ আসনের উল্টো দিকে ব'সে দুহাতেই খেতে সুরু কল্লে; কেউ আসনে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিলে—আর সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-সমেত থালাটি দশহাত তফাতে সরে পোড়লো! কেউবা আসনের ওপোর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পাশের লোকের ঘাড়ে পা তুলে নিদ্রা দেবার উদ্যোগ কর্ত্তে লাগলো। ওরই মধ্যে যিনি একটু "পাক্কা" গোছের—অর্থাৎ "এক আধ বোতলেও" কাৎ হন না, ঠিক থাকেন,—তিনিই সবাইকে ধরে ধরে তুলে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। যাহোক কোন রকমে ভোজন কার্য্যটা সমাপ্ত হ'ল। লুচিতে পোলাওতে একত্র করে—তাতে খানিকটা জল ঢেলে কেউ খেলে, কেউ রাবড়ীতে পাঁঠার "কারি" মিশিয়ে চর্ব্বণ কর্ত্তে লাগলো, কেউ বেগুণ ভাজার সঙ্গে রসগোল্লা চটকে খামচা খামচা তাতে লবণ মেখে মুখে পূর্ত্তে আরম্ভ কর্লে,—এই রকম যার যা খেয়াল হ'ল, সে অবস্থায় চোখের সামনে যে যেটা স্পষ্ট দেখতে পেলে—একটা বিতিকিচ্ছি উদ্ভট রকম করে সে সেই রকমই আহার কর্ত্তে লেগে গেল!

মনোরমা খাবার কোলে করে বসে বসে—ক্রমে অবসন্ন হয়ে ঘরের মেঝেতেই শুয়ে ঘুমিয়ে পোড়লো। সকাল হয়ে গেল,—তবু পরেশচন্দ্রের বাড়ী ফেরবার নাম নেই। মনোরমা মনে মনে বড়ই চটলো।

তিনদিন কেটে গেল—পরেশচন্দ্র বাড়ী এল না। বাড়ীর সকলেই ভেবে অস্থির। ও বাড়ীর বিশ্বম্ভর কাকা (পরেশ-চন্দ্রের জ্ঞাতি খুড়ো) আফসে খবর নিয়েছিলেন—পরেশ তিনদিন আফিস যায় নি! সন্ধান পাওয়া গেল—হরিচরণ আড্ডির বৈঠকখানায় "সেসন্ বসেছে!" পাড়ার একজন ফক্কড় ছেলে ধাপ্পা দিয়ে "পরেশদাকে" বাড়ী ফেরাবার জন্যে আড্ডির বৈঠকখানায় গিয়ে পরেশকে বলে এল—"পরেশদা,—তুমি এখানে স্ফূর্ত্তি মারছ,—তোমার "সিধু" যে মরো মরো! কাল থেকে কলেরা হয়েছে,—এতক্ষণে বোধ হয় মারা গেছে!"

"সিধু" পরেশের ছোট ছেলে,—বছর দেড়েক বয়েস।

পরেশ তাকে বড্ড ভালবাসে। ক্রমাগত তিনদিন ধরে মদ খেয়ে—(স্নান নেই, আহার নেই, শয়ন নেই নিদ্রা তো নেই-ই) পরেশের যথার্থই মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল। তবু "সিধু" মারা গেছে শুনে একটু চমকে উঠলো। পরেশ মদের খেয়ালে কাঁদতে লাগলো। মাতালের দলও কারুণ্য রসে গলে গিয়ে পরেশকে বোঝাতে, সান্ত্বনা করতে আরম্ভ করলে। যত বোঝায় তত "পেগ্" খাওয়ায় আর নিজেরা খায়। পরেশ একটু মাথা ঠিক করে যেই একবার বলে "বাড়ী যাই—" সকলে অম্নি বলে—"তা বাড়ী যেতে হবে বই কি! আহা—হাজার হোক্ পেটের ছেলে তো বটে গা!"

বাড়ী "যাই যাই" কর্ত্তে কর্ত্তে রাত্রি ভোর হয়ে গেল। পরেশ কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠলো,—টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এল! ভোরাই হাওয়া লেগে ধাতটা কতকটা ঠাণ্ডা হলেই পরেশ সটান বাড়ী চলে এল। মনে মনে ঠিক কল্লে—"ছেলে যদি মারা গিয়ে থাকে, মিছে কেঁদে কি ফল!"

জ্যৈষ্ঠ মাস। ঘরের ভেতর বেজায় গরম, মনোরমা বারান্দায় ছোট ছেলেকে নিয়ে শুয়েছিল। স্বামীকে দেখে মনোরমা কাঁদতে কাঁদতে উপুড় হয়ে এক পাশে শুয়ে রইল, কোন কথা কইলো না। "সিধু" একপাশে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। পরেশ ভাবল—"যাই, আমিই দাহ কর্ত্তে নিয়ে যাই; এত সকালে লোক আর কাকে ডাকি?" পরেশের মাথায় খেয়াল আছে "সিধু" মারা গেছে, পুত্রশোকে মনোরমা পড়ে পড়ে কাঁদছে! মরেছে—আর উপায় কি? দাহ তো কর্ত্তেই হবে! বিকৃত মস্তিষ্ক পরেশ "মাতালের খেয়ালে" সিধুকে যত্ন করে তুলে তার মাথাটা কাঁধে ফেলে দেহটাকে বুকের ওপোর ঝুলিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে শ্মশানের দিকে কাঁদতে কাঁদতে চললো। ঘুমন্ত শিশু বেশ আরামেই রইল। পরেশ খেয়ালের চোটে কাঁদে আর বলে—"আহা বাবা আমার—মর্ব্বার সময় নিশ্চয়ই একবার আমাকে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল তোর! একটু আগে খবর পেলেই আমি ছুটে চলে আসতুম। আহা—সিধু বাবা,—তোকে একবার শেষ দেখাও দেহতে পেলুম না।"

পথে তখনও লোক চলাচল বেশী সুরু হয় নি। পরেশ নিমতলার ঘাটের দিকে চলেছে। দু' একজন পথিক পরেশের কান্না দেখে থম্‌কে দাঁড়ায়—কিন্তু কেউ ঠিক কিছু বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা কি! পরেশ আপন মনে বক্‌তে বক্‌তে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে!

আহিরীটোলার রাস্তার কাছ বরাবর হঠাৎ বাড়ীর ধোপা নন্দরামের সঙ্গে পরেশের সাক্ষাৎ! দাদাবাবুকে ছেলে কাঁধে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে যেতে দেখে নন্দ জিজ্ঞাসা কল্লে—"যাওরা কি বাবু? খোকাবাবুকে কোলে নিয়ে এত ভোরে কোথায়? গঙ্গাচ্যানে যাচ্ছ না কি?"

পরেশের শোকাসিন্ধু উথলে উঠলো! ভীষণ রকম কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—"আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে রে নন্দা—সিধু আমার নেই!"

নন্দ। "এঁ্যা সে কি? কি হয়েছিল?"

প। "কলেরা হয়েছিল বাবা! বাছা আমার একদিনেই কাবার!"

নন্দ। "আরে সে কি কথা? বাড়ীতে কি লোকজন কেউ নেই? তুমি একা চলেছ—"

"লোকজন আর কাকে কষ্ট দোবো বাবা? আমার ছেলে আমিই নিয়ে যাই!" বলে পরেশচন্দ্র চলতে আরম্ভ করলে।

নন্দরাম অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলো। এদিকে খোকা "সিধু" সকাল হলেই জেগে উঠেছে। সকাল বেলা দিব্যি বাপের কোলে চড়ে আরামে বেড়াতে চলেছে। পরেশ অগ্রসর হতেই বাপের কাঁধে মাথা রেখে চোক চেয়ে নন্দরামকে দেখে "সিধু" ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো।

নন্দ দাদাবাবুর খোকাকে হাসতে দেখে কেমন হক্‌চকিয়ে গেল! এই তো খোকাবাবু দিব্যি বেঁচে রয়েছে,—তবে দাদাবাবু কাকে পোড়াতে নিয়ে শ্মশানে চলেছে? নন্দ ঠিক বুঝে নিলে—এ সব মাতালের খেয়াল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে পরেশের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বল্লে—"আরে রও রও দাদাবাবু! ঠাণ্ডা হয়ে একটুকু দাঁড়িয়ে যাও!"

পরেশ একটু পেছিয়ে এসে বল্লে "ছুঁস্‌নে বাবা নন্দ!

জাতে ধোবা তুই,—বামুনের মড়া ছুঁস নি ! সিধুর আমার গতি হবে না !"

নন্দ কোমর বেঁধে আরও যেন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, "আরে বাবু কোথায় তোমার মড়া ? কাকে মড়া বলে নিমতলার ঘাটে নিয়ে যাচ্ছ—আগে তাই বল দিকি !"

নন্দর ভাব দেখে পরেশ একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পোড়লো ! হাজার হোক নন্দরাম তার বাড়ীর পুরাণো ধোবা,—তিন পুরুষ ধরে পরেশদের বাড়ীতে কাপড় কাচছে ! কাজেই পরেশ তাকে "ধমক-ধামক" দিতে তো পারে না। একটু বুঝিয়ে নরম হয়ে বল্লে—"পথ ছেড়ে দে বাবা নন্দ ! যা, তোর ময়লা কাপড় চোপড় নিয়ে বাগানে যাচ্ছিস, যা ! আমার শোকের ওপোর আর যন্ত্রণা দিস্ নি। আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল বুঝতে তো পাচ্ছিস ? এই ছেলেটি আমার পাঁজরার হাড় ছিল,—আমার কল্‌জে ছিলো রে নন্দ,—তাও তো তুই জানস্ ?"

নন্দ বল্লে—"হেঁ,—সে তো জানিই ! তা ওনার কি হয়েছে ?"

"হবে আর কি ! কাল রাত্রে বেচারা মারা গেছে ! বাড়ীতে লোকজন তো কাকেও দেখলুম না,—তোর বৌদি ঠাক্‌রুণ শোকে অচৈতন্ত হয়ে একপাশে পড়ে পড়ে কাঁদছে ; আমি সেই তকে মড়া বের করে—"

"বলি দাদাবাবু—মাথাটা একটুকু ঠাণ্ডা কর, একটুকু বোধোদয় কর ! অত মদ খেলে কি আর জ্ঞান গাম্যি থাকে ? বলি—তুমি কি ক্ষেপেছ ? খোকাবাবু মরেছে বলে তাকে পোড়াতে নিয়ে চল্লে ? আর ঐ দেখ—সোণার চাঁদ ছেলে তোমার মিট্ মিট্ করে চোক চাইছে,—ফিক্ ফিক্ করে হাসতেছে—"

পরেশ এ অবস্থায় যুক্তি দেখাতে পিছ্‌পাও নয় ; বড় দুঃখেই বল্লে—"আহা নন্দ রে ! সিধু যে আমার দুধের বালক ! বাছার আমার কি সে জ্ঞান আছে যে ম'লে হাসতে নেই—চোক চাইতে নেই !"

* * * *

জলজ্যান্ত ছেলে নিয়ে নন্দর সঙ্গে পরেশের যে কাণ্ড হ'ল—রীতিমত সেটা একটা নাটকের গর্ভাঙ্ক ! নন্দ তখন দাদাবাবুর অবস্থা বুঝে আপনার সঙ্গীকে বাগানে পাঠিয়ে দিয়ে, দু' চারজন ভদ্রলোকের সাহায্যে একখানা গাড়ীতে পরেশকে এবং খোকা বাবুকে তুলে—নিজে সঙ্গে করে পরেশের বাড়ীতে এল।

এদিকে রাস্তায় ভীড় জমে গেল। পরেশকে নিয়ে নন্দ চলে যাবার পর সেইখানে দাঁড়িয়ে পথিকেরা এই ব্যাপার নিয়ে "পর্‌শা মাতালের" কাণ্ড শুনে নানা রকমের মন্তব্য প্রকাশ কর্ত্তে লেগে গেল। কেউ বলে—মদ খেয়ে একেবারে ঘোর উম্মাদ হয়ে গেছে !" কেউ বলে—"শ্মশানে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে রীতিমত চিতা সাজিয়ে তাতে শুইয়েছিল !" কেউ বলে—"চিতায় আগুন দেওয়া হয়েছিল !" ব্যাপারটা ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সহরে প্রচার হয়ে পোড়লো। পরদিন সকালে এক পয়সার একটা দৈনিক বাংলা কাগজে বেরুলো—

"মাতালের কাণ্ড"

"গতকল্য কলিকাতা সহরে নিমতলা ঘাটের শ্মশানে এক লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অত্যধিক সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সাত বৎসরের একমাত্র পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় মৃত ভাবিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাহাকে শোয়াইয়া চিতায় অগ্নি প্রদান করিয়া দাহ করিতেছিলেন। অগ্নির উত্তাপে হঠাৎ পুত্রটীর নিদ্রাভঙ্গ হয়,—এবং সে চিতায় উঠিয়া বসিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে থাকে। চীৎকার শুনিয়া—আমাদের পূজ্যপাদ ডেপুটী কমিশনার মহাশয় তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অদ্ভুত বীরত্ব সহকারে বালকটীকে প্রজ্জ্বলিত চিতানল হইতে উদ্ধার করেন এবং অতি যত্নপূর্ব্বক সেই অর্দ্ধদগ্ধ বালকটীকে আপনার মোটরে করিয়া হাসপাতালে লইয়া যান। বালকটীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। অপরাধী মাতাল তাহার সহচর মাতালবর্গের সহিত শ্মশানে ধৃত হইয়া হাজতে চালিত হইয়াছে। শীঘ্র পুলিশ কোর্টে তাহাদের বিচার হইবে। মাতালদিগের পুত্রগণ সাবধান হউন।"

* * * *

এক রকম অজ্ঞান অবস্থায় পরেশ নন্দর সঙ্গে ছেলে নিয়ে বাড়ী ফিরেছিল। রজকের পো—কোন কথা না বলে দাদাবাবুকে টেনে চৌবাচ্চার ধারে গিয়ে, জোর করে তাকে মাটীতে বসিয়ে একা নিজের হাতে বাহান্ন বাল্‌তি জল পরেশের মাথায় ঢাল্‌লে। এক এক বাল্‌তি জল ঢালে আর নন্দ বলে—"একটুকু বোধোদয় কর—দাদাবাবু—একটুকু বোধোদয় কর!" আবার জল ঢালে—আর বলে—"বড় ঘরের ছেলে—দেবতা বামুনের ছেলে—লেকাপড়া জানা মস্ত বিদ্বেওলা লোক,—একটুকু বোধোদয় নেই!" আবার উপরো উপরি জল ঢালে। লজ্জিত পরেশের তখন নেশা কেটে বাস্তবিক "বোধোদয়" ছেড়ে "কথামালা" "আখ্যান মঞ্জুরী" "উপক্রমণিকা ব্যাকরণ" পর্য্যন্ত হবার উপক্রম হয়েছে! বেচারা ঘাড় তুলে কথাটী পর্য্যন্ত কইছে না। তিনদিন এক রকম অনাহারেই কেটে গেছে। শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। তার ওপোর এই রকম মাথায় নন্দরাম কর্ত্তৃক জল-প্রপাত কাণ্ড!

পরেশের দস্তুরমত শীত কর্ত্তে লাগলো। অত্যন্ত কাতর-ভাবে হাত তুলে বল্লে—"নন্দ—থাক্—থাক্ বাবা—আর না, আমার শীত কচ্ছে! বড় কষ্ট হচ্ছে!"

উত্তেজিত নন্দ তবু কি ছাড়ে? কাছে বাড়ীর লোক, ছেলেপুলে, চাকর-বাকর অনেকে দাঁড়িয়েছিল; নন্দ কারও কথা শোনে না! গুণে বাহান্ন বাল্‌তি জল ঢেলে নিজের হাতে গা মুছিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে—মনোরমা প্রেরিত এক গেলাস মিছরির পানা খাইয়ে পরেশকে পাঁজাকোলা করে তুলে বৈঠকখানার ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ব'ল্লে—"একটুকু বোধোদয় নেই? এই সব চাঁদের পারা ছেলেপুলে,—ভগবতী ঠাকুরোণের মত গিন্নী বৌ-ঠাক্‌রোন্‌—এমন ঘর বাড়ী,—বাপপিতেমোর এত বড় নাম, আর ঐ শোরের ময়লা খেয়ে এমন ঢলাঢল কর্ত্তে হয়? একটুকু বোধোদয় নেই গা? ভাগ্যিস না আমি দেখতে পেয়েছিনু——"

পরেশের চোখের জলে তাকিয়া ভিজতে লাগ্‌লো। নন্দ পায়ের তলায় বসে দাদাবাবুর পা টিপ্‌তে টিপ্‌তে বল্‌তে লাগ্‌লো—"সরাপ্‌-মদ-নেশা-এসমস্ত পাপ কি বমুন কায়েৎ ভদ্রলোকের সহ্যি হয়? এ শোরের বিষ্ঠে আমাদের মত ছোট লোকদেরই খাওয়া পোষায়! ভদ্রলোক,—দেবতা বামুণ—তারা ক্ষির খাবে,—ছ্যানা খাবে,—মাখম খাবে,—ননি খাবে, এ শোর গরু তেনারা খেয়ে হজম কর্ত্তে পার্ব্বে কেনে? তোমার পায়ে এই হাজার গড় কচ্ছি দাদাবাবু—একটুকু বোধোদয় কর, একটুকু বোধোদয় কর,—একটুকু বোধোদয় কর! নইলে লোকের কাছে আমরা মুখ দেখাতে পার্ব্বনি!

* * * * * *

সত্যিই এই ঘটনার পর পরেশচন্দ্রের বোধোদয় হয়েছিল! প্রতিজ্ঞা কল্লে হয়না,—ঠাকুরের পা ছুঁয়ে দিব্য কল্লে হয় না,—লোকে সমস্বরে ধিক্কার দিলে হয় না,—দেহ নষ্ট অর্থ নষ্ট হ'লে হয় না,—গুরুজনের উপদেশে হয় না! যথার্থ যদি প্রাণে ঘৃণার উদয় হয়—তাহ'লেই "বোধোদয়" হওয়া সম্ভব! পরেশচন্দ্রের সেই কারণেই "বোধোদয়" হয়েছিল!

নষ্টচন্দ্র

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

(১)

নষ্টচন্দ্র দেখতে তোমায়
করে না কেউ পছন্দ,
কলঙ্কী হে কলঙ্ককে
কর ত খুব সাজস্ত।
শুনি তোমায় যেজন দেখে
কলঙ্কে তায় দাও হে ঢেকে,
কলঙ্ক ত দুদিন থাকে
আলোক যে তার অনন্ত।

(২)

দেখেছিলেন তোমার সীতা
পঞ্চবটীর বনে কি ?
অযোধ্যার রাজ হর্ম্যাচূড়ে
আজ পড়ে তা মনে কি ?
কিম্বা আহা অশোক বনে
হঠাৎ দেখা তোমার সনে
অপবাদের দারুণ ব্যথা
পেলেন সতী অনেকই।

(৩)

তোমার মত এমন প্রলয়
আর কে বল বাধাবে ?
সমন্তকের অপবাদে
ডুবাও ব্রজ-মাধবে।
অমল ধবল মরাল গায়ে
পঙ্করাশি দাও ছিটায়ে
তুমিই কর কণ্টকিত
নন্দনেরি পাদপে।

(৪)

তুমি চৌর পঞ্চাশিকা
সুন্দরে দাও উজলি,
আলো কালো মেঘের মাঝে
পুণ্যপ্রভায় বিজলি।
শক্তি এমন কাহার আছে
কমল ফুটাও কদম গাছে,
তোমার সুরার কলসেতে
সুধাই পড়ে উথলি।

(৫)

এসো আমার সুহৃদ এসো
এসো রাধার কানুহে,
কালা পবিবাদের কসে
ডুবাও মন আর তনুহে।
কলঙ্কের ওই কালিন্দিতে
দাও হে কলস ভরে নিতে,
অপবাদের আনন্দ যা
তুমিই শুধু আনো হে।

(৬)

এসো চণ্ডীদাসের সোহাগ,
এসো রামীর প্রীতি হে,
এসো বৃন্দাবনের মধু
কুঞ্জবনের স্মৃতি হে।
এসো গোপীচন্দন এসো,
এসো ফাগ্ আর কুঙ্কুম এসো,
অভিমানের গৈরিক এসো
অহঙ্কারের ভীতি হে।

“বাবু”—বঙ্কিমচন্দ্র

(১)
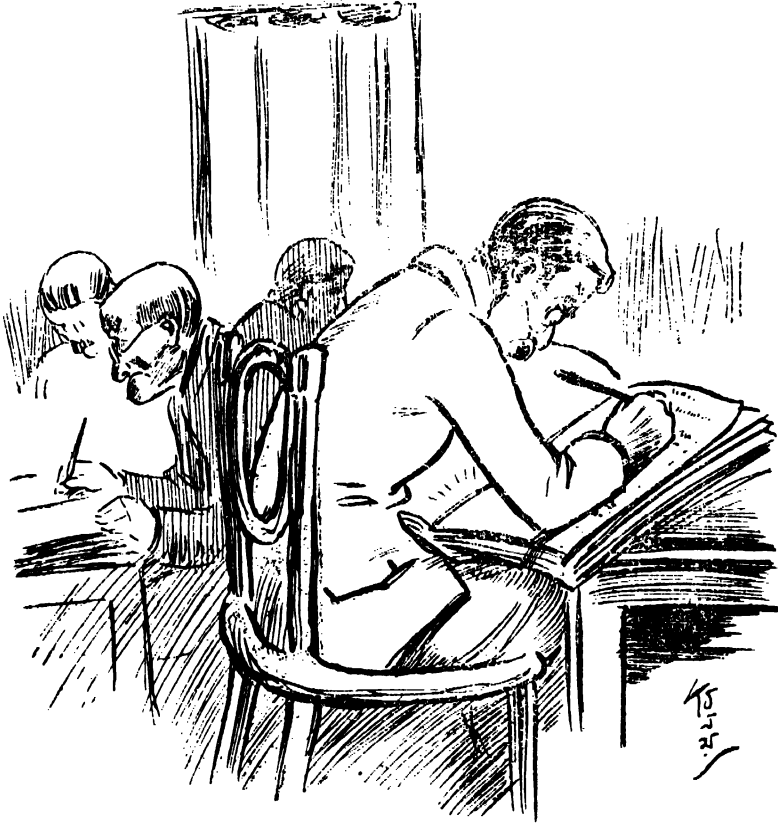
তিনিই বাবু—

যাঁহার বাম হস্তে এক গুণ !!

(২)

"মুখে দশ গুণ"

(৩)

"পৃষ্ঠে শত গুণ"

(৪)
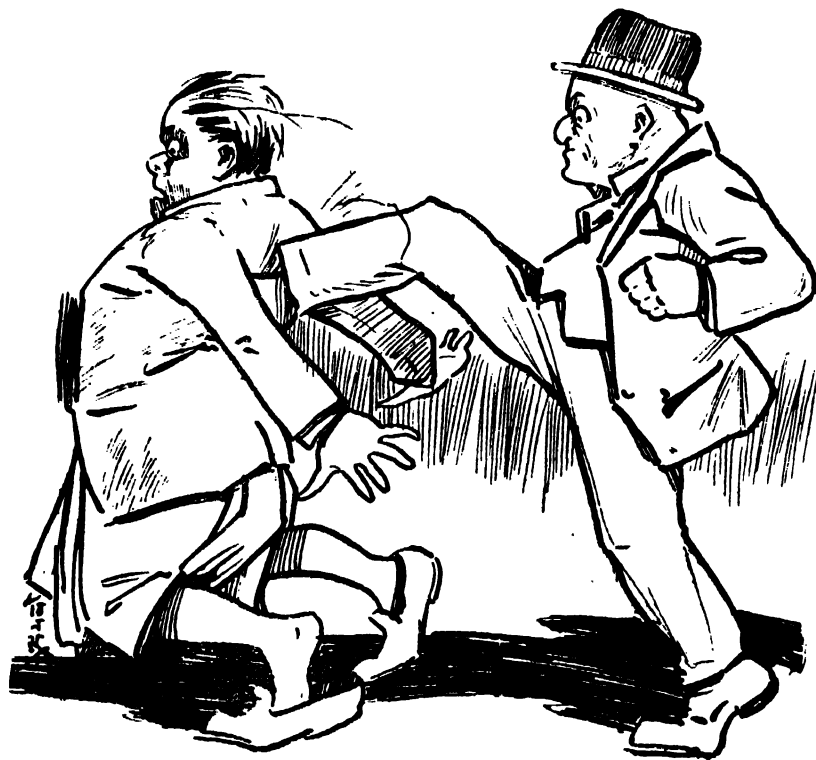
কার্য্যকালে অদৃশ্য

(৫)

“যাহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে”

(৬)

"যৌবনে বোতল মধ্যে"

(৭)

"বার্দ্ধক্যে গৃহিণী অঞ্চলে"

(৮)

"যাঁহার ইষ্ট দেবতা ইংরাজ"

(৯)

"গুরু ব্রাহ্ম ধর্ম্মবেত্তা"

(১০)

"যিনি নিজগৃহে জল খান"

(১১)

"বন্ধু গৃহে মদ খান"

(১২)

“বেশ্যা গৃহে গালি খান”

(১৩)

"যাহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে"

(১৪)

"তৎপরতা কেবল উমেদারীতে"
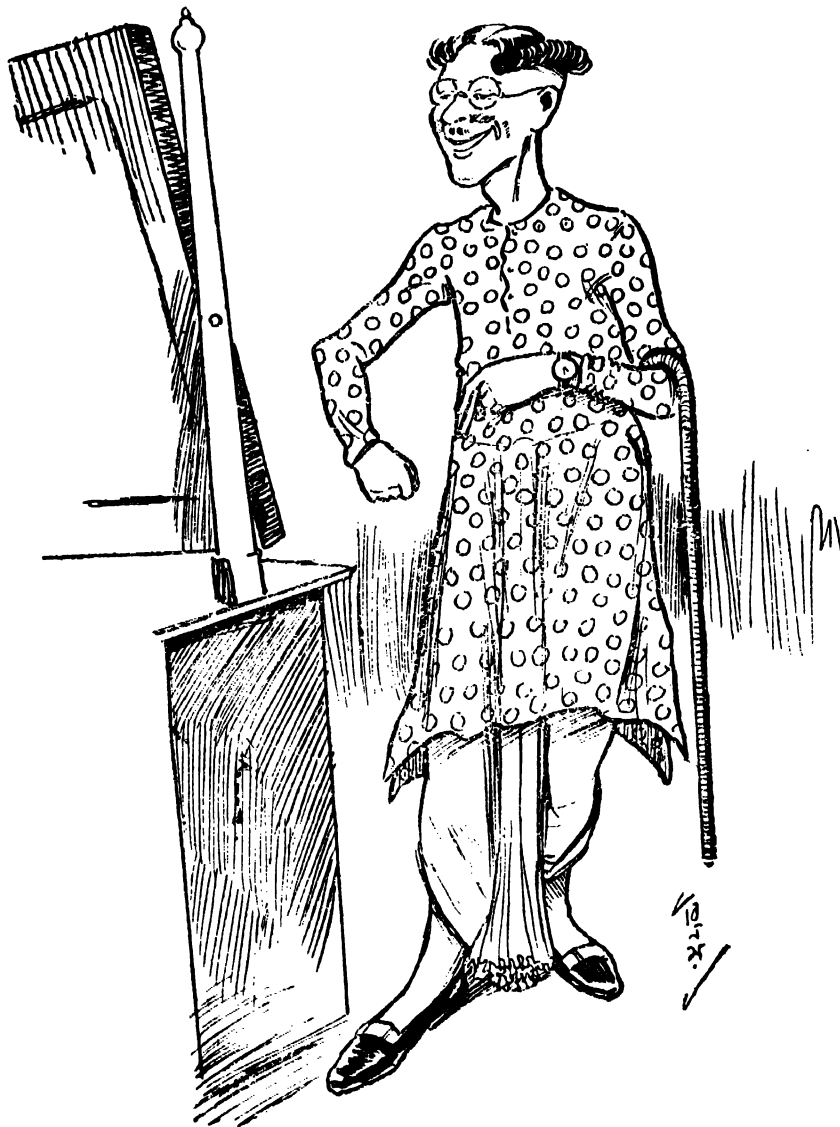
(১৫)

"ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিনীতে"

ব্যবসা-নমুনা

[শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক]

যদি, ধরিয়া লইবে মৎস্য   এসো ওগো এসো মোর,
পুকুর ধারে।
খলবল খলবল   নাড়িছে মাছেরা জল
ফাতনাটি দেবে তল ফেলিতে চারে।
আজি কাৎলা মোটাতম   নদীর কুম্ভীর সম
খাবি খাইতেছে মম দুটী কিনারে,
ওই যে শবদ চিনি   পকেটে রিনিকি ঝিনি,
লও পাশ একা কিনি দু'টাকা হারে।
যদি ধরিয়া লইবে মৎস্য   এস ওগো এস মোর
পুকুর পাড়ে।

যদি কেতাব ছাপায়ে ঘরে   বসিয়া থাকিতে চাও
পায়ে পা তুলে,
হেথা ড্যাম সস্তাদর—   ছাপা কালি কি সুন্দর
প্রেসম্যান ধনুর্দ্ধর, যেও না ভুলে;
দুটী চোতা বহি দিয়া   নাম যাবে বহিরিয়া
চঞ্চল পাঠক গিয়া পড়িবে খুলে।
চাহিয়া 'কভার' পানে   কিনিবে ছবির টানে
সারগর্ভ অনুমানে নগদ মূলে;
যদি কেতাব ছাপায়ে ঘরে   বসিয়া থাকিতে চাও
পায়ে পা' তুলে।

যদি, কাহন করিতে চাও   এস ছুটে এস মোর—
আফিস ঘরে,
আড়ম্বরে কিবা কাজ   পরে' এস মোটা সাজ
টুটে যাবে সব লাজ দু'দিন পরে।
দালালি ভড়ং রাশি   কণ্ঠস্থ কর, বঙ্গবাসী
উল্লাসি পড়িবে আসি বীমা খর্পরে।
পুরো কমিশন পাবে   সুখে তব দিন যাবে
ঢ্‌লু ঢ্‌লু ঢল চোখে নেশার ভরে;
যদি, কাহন করিতে চাও   এস ছুটে এস মোর
আফিস ঘরে।

যদি বরণ লভিতে চাও   এসো তবে পাবে তাও
আমার কাছে।
স্নিগ্ধ কান্ত মনোহর   রূপে হবে বিম্বাধর
ভ্যাসেলিন চেয়ে ভালো প্রলেপ আছে।
যাও 'পাউডারে' ভুলে   'ব্লুম' 'রোজ' রাখ তুলে
এ রং যাবে না ধুলে, ঘষিলে গাছে।
যদি বরণ লভিতে চাও   এস তবে পাবে তাও
আমার কাছে।

নারী

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(১)

সেদিন ছিল রবিবার। কাগজ বাহির করিবার তাড়া ছিল না। সম্পাদক মহাশয়ও আপিসে ছিলেন না। আমরা কয়জন সহকারী সম্পাদক মিলিয়া আমাদের ঘরে বসিয়া পরম উৎসাহে তর্ক জুড়িয়া দিয়াছিলাম। তর্কের বিষয় ছিল—নারীর সাহচর্য্য ভিন্ন পুরুষ জীবন ধারণ করিতে পারে কি না।

আমাদের মধ্যে রমেশ সবচেয়ে বয়সে ছোট। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ up to date, চেহারাটী কবি-ভাবাপন্ন, চুলটী একটু বিশেষভাবে ফিরান। কেহ কেহ এমনও বলিত যে তাহার ঐ চুল ফিরানোর ভিতর এমন একটু আর্টিষ্টিক (Artistic) টাচ্ (touch) ছিল যাহা দর্শন মাত্র নারী জাতির চক্ষের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া বিদ্ধ হইত। শুনিয়াছি ইংরাজদের দেশে না কি Lady masher নামে একপ্রকার জীব আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার স্বরূপ কখনো দেখি নাই। তথাপি অনুমান করি রমেশকে সে পর্য্যায়ে ফেলিলে নিতান্ত অশোভন হইত না। রমেশ অবিবাহিত এবং বিশেষভাবে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। যেখানে নারী জাতির অধিকার লইয়া তর্ক হয় সেখানে সে অবলা-বান্ধব—মা-লক্ষ্মীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহাদের উত্তমাঙ্গের কেশাগ্রভাগ হইতে শ্রীচরণের অলক্তকরাগ পর্য্যন্ত সকলই তাহার কাছে পরম পবিত্র, উপাদেয় এবং উপভোগ্য। তাহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি একবার না কি সে কলিকাতা হইতে বারাকপুর যাত্রা করিয়া ট্রেণে কতিপয় সহযাত্রীর সহিত নারী জাতি সম্বন্ধে তর্ক করিতে করিতে গোয়ালন্দ যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই তাঁহাদের প্রতি তাহার মনোভাব সহজে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

রমেশ যেমন ছিল নারী জাতির স্বপক্ষে, হরেন দা' তেমনি ছিল তাহাদের বিপক্ষে। হরেন দা'র আকৃতি প্রকৃতিও ছিল রমেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। একখানি মোটা খদ্দরের আধ-ময়লা ধুতি, কাছার অর্দ্ধেকটা খুলিয়া ঝুলিতেছে, কোঁচার খানিকটা মাটীতে লুটাইতেছে, ততোধিক ময়লা একখানি মোটা খদ্দরের চাদর—ইহাই ছিল তাহার চিরন্তন বেশভুষা। তাহার চুল কখনও আঁচড়ান দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, তাহাও আবার কাঁচাপাকা মিশান এবং অসম্ভব রকম লম্বা—কাণে চোখে মুখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সে বিবাহিত—শুনিয়াছি দেশে তাহার স্ত্রী আছে, কিন্তু কেহ কখনও তাহাকে দেশে যাইতে দেখে নাই,—কাজেই আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম যে তাহার স্ত্রী অত্যন্ত কুরূপা অথবা মুখরা কিম্বা উভয়ই। অবশ্য যাহাকে কখনও দেখি নাই তাহার সম্বন্ধে এরূপ অভিমত পোষণ করা নিতান্তই সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক—বিশেষ সে যখন একটী ভদ্রমহিলা। এ বিষয়ে ত্রুটী স্বীকার করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। নারী-জাতির বিপক্ষে হরেন দা'র অভিমত অত্যন্ত তীব্র—এত তীব্র যে তাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার সাহস আমাদের নাই। আমরা জানি আমাদের সহৃদয়া পাঠিকা মহাশয়ারা তাহা পাঠ করিলে এইখানেই পুঁথি বন্ধ করিবেন—আমাদের গল্পটাই মাঠে মারা যাইবে।

তর্কটা চলিতেছিল বাস্তবিক রমেশ এবং হরেন দা'র মধ্যে আমরা এক একজন থাকিয়া থাকিয়া এক একবার ফোড়ন দিতেছিলাম মাত্র। রমেশ বলিতেছিল—নারী জাতিই সংসার মরুভূমে একমাত্র ছায়া। হরেন দা' বলিতেছিল—তাহারা সংসার মরুভূমের ছায়া নয়, মরীচিকা। হরেন দা' থাকিয়া থাকিয়া প্রচণ্ড জোরে টেবিলের উপর চপেটাঘাত করিতেছিল—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল টেবিল কিম্বা হাত দুইটার একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে সে বিরত হইবে না। রমেশ ক্রমাগত একটার পর একটা হাতী

সিগারেট ধরাইয়া শেষ করিতেছিল এবং এক একবার খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছিল—অথচ তাহার থামিবার কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। তাহার পকেটে যে এত হাতী কোথা হইতে আসিল আমরা ভাবিয়া পাইলাম না, তথাপি স্থির বুঝিলাম যে উক্ত জীবের বংশকে সমূলে নির্ব্বংশ না করিয়া সে কাশি এবং তর্ক কোনটাই বন্ধ করিবে না।

তর্কটা বেশ পাকিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘরটা প্রায় অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। কেটলী পাঁচ ছয় চা লাভ করিয়াও আমাদের উদর-সাহারার তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছিল না, থাকিয়া থাকিয়া আমার গায়ের রোঁয়াগুলি কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল; আমার পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধু গণেশ তাহার নাসিকা সংলগ্ন স্বল্পায়তন গোঁফটুকুর অগ্রভাগ পাকাইয়া পাকাইয়া ছুঁচের চেয়েও ছুঁচালো করিয়া তুলিয়াছিল। রমেশ এবং হরেন উভয়েই আসন ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহাদের কাশি এবং চপেটাঘাত অপর্য্যাপ্ত রকম বাড়িয়া গিয়াছিল,—অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল—"কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয়।" এমন সময় কি জানি কোথা হইতে একটা বিড়াল অতি করুণকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল "মিঁ-আঁও!" সহসা রসভঙ্গ হওয়ায় আমরা হাসিয়া উঠিলাম কিন্তু রমেশ ও হরেন হাসিল না। তাহাদের তর্কানল যেন ইন্ধন পাইয়া আরও প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিল, উভয়েই ভাবিল প্রতিপক্ষ তাহাকে তর্কে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ঐরূপ অমানুষিক শব্দ উচ্চারণ করতঃ তাহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়াছে—নতুবা বিড়াল এমন সময় এমন স্থানে ওরূপ করুণকণ্ঠে ডাকিতেই পারে না। রমেশ আস্তিন গুটাইয়া, রিষ্টওয়াচ্‌টা খুলিয়া আমার হাতে দিল, হরেন দা' খদ্দরের চাদরখানা কোমরে জড়াইয়া মাথাটাকে একটা ঝাঁকানী দিয়া মুখের উপরকার চুলগুলাকে সরাইয়া দিল। আমরা প্রস্তুত রহিলাম ঠিক সময়ে উভয়কে ধরিয়া ফেলিতে হইবে।

এমন সময় মস্ মস্ মস্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিলাম, বুঝিলাম সম্পাদক মহাশয় আসিতেছেন। এমন সময় যে তাঁহার আসা উচিত হয় নাই সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না। এখন তাঁহার আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না তাঁহার উপর আমাদের বেশ একটু রাগই হইল।

রাগ হইল বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ তর্কটার মীমাংসা হইয়া গেল এবং রমেশের কাশি ও হরেনের চপেটাঘাত রূপ ঘটনা যে কখনো ঘটিয়াছিল তাহার কোন চিহ্নই রহিল না। বিড়ালটারও আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা যে যাহার স্থানে বসিয়া পড়িয়া নিজ নিজ ফাইলে মনোনিবেশ করিলাম। যেখানে একমুহূর্ত্ত আগে ভীষণ চীৎকার হইতেছিল সেখানে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

(২)

সম্পাদক মহাশয় প্রবেশ করিলেন। আমাদের কক্ষ পার হইয়া তাঁহার কক্ষে যাইতে হয়। আমরা আশা করিতেছিলাম তিনি মস্ মস্ ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে নিজ কক্ষে চলিয়া যাইবেন। তাহা যখন তিনি করিলেন না তখন কাজেই তাঁহার দাঁড়াইবার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য আমরা মাথা না তুলিয়া আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম। ও হরি! সম্পাদক মহাশয় তো ন'ন। এ যে একজন মহিলা। মহিলার পাদুকার এমন শব্দ আগে কখনো আমাদের শ্রুতি-গোচর হয় নাই।

মহিলা বটে—কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতেছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, চক্ষু হইতে (চশমার ভিতর দিয়া) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, বক্ষে যেন বিশুবিয়সের অগ্ন্যুৎ-পাত। আমরা যে তাঁহাকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব, কি জিজ্ঞাসা করিব সহসা খুঁজিয়া পাইলাম না। কিছুদিন আগে একখানি বিশিষ্ট দৈনিক কাগজের সম্পাদককে এবম্প্রকার একটী মহিলার রোষানলে পড়িয়া দস্তুর মত নাকানি চুবানি খাইতে হইয়াছিল তাহা আমরা জানিতাম,তাই ভয়ে আমাদের বুক কাঁপিতেছিল—কি জানি কি হইতে কি হইবে, বিশেষ সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত নাই। ফলে আমরা যে যেমন বসিয়াছিলাম তেমনি রহিলাম, এক একবার আড়চোখে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। তিনি পূর্ণ এক মিনিট কাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বোধ হয় আমাদের

মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই ভূমিতলে সজোরে পদাঘাত করিলেন।

রমেশের বসিবার স্থান দরজার ঠিক পাশেই, মহিলাটি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেখান হইতে প্রায় দেড়ফুট দূরে। দেখিলাম সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে একটা কিছু বলিবার উদ্যোগ করিতেছে অথচ কি বলিবে তাহা যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। হরেন দা'র দিকে তাকাইয়া দেখিলাম তাহার অবস্থা শোচনীয়তর,—তাহার খদ্দরের চাদরটা ক্রমাগত কাঁধের উপর হইতে পড়িয়া যাইতেছে, সে কিছুতেই উহাকে বাগ মানাইতে পারিতেছে না, তাহার মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, কলম সহ হাতখানি কাঁপিতেছে। বুঝিলাম হরেন দা' নিশ্চয়ই নারীজাতি সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য স্পষ্ট ভাষায় কোথাও ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছে, তাহারই ফলে আজ আমাদের এই বিপদ। ওঃ পাপিষ্ঠের উপর কি রাগই যে হইতেছিল আমার!

মহিলাটী আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধ-বিকম্পিত বাজখাঁই আওয়াজে কহিলেন—

"তোমাদের মধ্যে সম্পাদক কে? উত্তর দাও, তোমাদের মধ্যে কে সম্পাদক? আমি তাহাকে একবার দেখিতে চাই।"

রমেশ বোধ হয় ভাবিল—একজন চশমা-ধারিণী শিক্ষিতা সুসভ্যা মহিলাকে উপযুক্ত সম্মান না দেখাইলে আমাদের মধ্যে তাহার পসার আর থাকে না। কাঁপিতে কাঁপিতে আমতা আমতা করিয়া বলিল—

"আজ্ঞে আমি—আমি—আপনি—"

মহিলা। তুমি সম্পাদক? আমি তা আগেই কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম।

রমেশ স্বভাবতঃই একটু চালবাজ। এমন সুযোগ সে হেলায় হারাইল না। একখানি চেয়ার আগাইয়া দিয়া সভয়ে কহিল—

"আপনার কি প্রয়োজন?"

মহিলাটী এক পদাঘাতে চেয়ার খানিকে ভূতলশায়ী করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন—

"ওঃ! কি প্রয়োজন! কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লজ্জা করে না? আমার মুখের দিকে তাকাও দেখি।"

রমেশ হতভম্ব হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মহিলা। আমার বয়স কত অনুমান কর?

রমেশ। আজ্ঞে তা—তা—ত্রিশ চল্লিশ হবে।

মহিলা। ওঃ! ওঃ! (বিষম খাইলেন) যাক বয়সের কথায় দরকার নাই; তুমি দেখতেছ আমি নারী?

রমেশ ভাবিল বুঝি বয়সটা ঠিক অনুমান করা শিষ্টাচার সঙ্গত হয় নাই। সে ভুল সংশোধন করিবার জন্য বলিল—"আজ্ঞে বালিকা—"

মহিলা। কি! বালিকা! ওঃ তোমার স্পর্দ্ধাও তো কম নয়? অথবা তুমি অন্ধ। শোন, আমি নারী—নারী—জগতের সারভূতা মহাশক্তিরূপিণী নারী। কণ্ঠে আমার বিকট হুঙ্কার, বক্ষে আমার দুর্দ্দমনীয় তেজ; চক্ষে আমার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন, চরণতলে আমার নারীরূপিণী পৃথিবী স্বর্গীয় মহিমায় শোভিতা। আমি নারী—নারী—স্বাধীনা নারী।

রমেশ। আজ্ঞে আজ্ঞে তা বটে!

মহিলা। কি! 'তা বটে'! মূর্খ! আমার মুখে চোখে কি দেখতে পাচ্ছ?

রমেশ। আজ্ঞে ভ্রূকুটী।

মহিলা। না না না—তুমি নিশ্চয় অন্ধ। দেখতে পাচ্ছ না—দীপ্ত দীপ্ত—নারী জাগরণের যুগ এসেছে, তারই আভা আমার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে। নারীরা এখন থেকে স্বাধীন—স্বাধীন—আর তারা পুরুষের দাসত্ব করবে না। এইবার দেখব দাম্ভিক পুরুষ কেমন করে তোমরা জীবন ধারণ কর। তুমি—তুমি—তুমি বোধ হয় বিবাহিত?

রমেশ। আজ্ঞে না এখনো বিবাহ করিনি—তবে শীঘ্রই করব ভরসা রাখি। দিব্বি সুন্দরী মেয়ে—শিক্ষিতা—খুব বড়লোকের মেয়ে—বাপের একমাত্র মেয়ে—"

রমেশের ওই একটা ভারি দুর্ব্বলতা ছিল সে তার ভাবী সহধর্ম্মিণীর কথা একবার বলিতে আরম্ভ করিলে স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হইয়া যাইত।

মহিলা। তুমি বোধ হয় আশা করছ যে কোনকালে তুমি তার বাপের বিষয় ভোগদখল করবে?

রমেশ। আজ্ঞে তা একটু একটু আশা কর্চ্ছি বইকি!

মহিলা। তবে জেনে রাখ—তা হবে না, হবে না, হবে না। তার পিতার মৃত্যুর পর সে বিষয় যাতে নারীমুক্তি-আশ্রমের হাতে যায় তার ব্যবস্থা আমি করব। তোমার ভাবী শ্বশুরের ঠিকানাটা আমাকে দাও। বিবাহ! ফুঃ! নারীরা আর বিবাহই করবে না। বিবাহ মানে তো পুরুষের দাসীত্ব।

রমেশ। আজ্ঞে না দাসীত্ব নয়—তবে—

মহিলা। তবে? what তবে? জাননা তোমাদের প্রত্যেকটী কাজ নারীকে করে দিতে হয় না? বল দেখি কে তোমাকে রান্না করে দেয়?

রমেশ। আজ্ঞে সে এক উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণ নাম গোবর্দ্ধন ঠাকুর—ভয়ানক পান দোক্তা খায়—বৃহৎ টিকী এবং সুবৃহৎ ভুঁড়ি, যার পরিধি বোধ হয় ফুট দশেক হবে—সর্ব্বাঙ্গে ছাপ—

মহিলা। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে। বল দেখি কে তোমার ঘর পরিষ্কার করে দেয়? বিছানা করে দেয়?

দেখিলাম রমেশ অনেকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে। কথা কহিবার সময় আর ভয়ে কাঁপিতেছে না, বরঞ্চ মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

রমেশ। আমি মেসে থাকি। মেসের চাকর দাসু হপ্তায়-দু'একবার দয়া হলে ঘরে একবার ঝাঁটা গাছটা বুলিয়ে যায়। নইলে অম্নি পড়ে থাকে। বিছানা আমি নিজেই করে নি।

মহিলাটীর উষ্মা দেখিলাম অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

মহিলা। হুঁ। আচ্ছা বল দেখি তোমার জামার বোতাম ছিঁড়ে গেলে কে সেলাই করে দেয়?

রমেশ। (বোতাম দেখাইয়া)—আজ্ঞে সোনার বোতাম—সেলাই করবার দরকার হয় না। গত তিন বছরের মধ্যে একবারও আমার বোতাম সেলাই করবার দরকার হয় নি।

মহিলা। তুমি—তুমি—তোমার মত পরমুখাপেক্ষীর মরণই মঙ্গল—পদে পদে নারীর অধীন তুমি তবু তবু—নাঃ আমি চল্লাম—তোমার সংসর্গ আমার অসহ্য বোধ হচ্চে।

আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। মহিলাটী আসিলেনই বা কেন, এত আস্ফালনই বা করিলেন কেন, আবার খামখা খামখা চলিলেনই বা কেন? মাথা খারাপ নাকি?

মহিলাটী বাহিরে যাইবার জন্য একটী পা বাড়াইয়াছিলেন, এমন সময় সহসা হরেন দা' বিষম খাইল। মহিলাটী চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—তার পর যাহা ঘটিল তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার মুখভাব অদ্ভুতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তিনি বার দুই তিন—"তুমি! ওঃ! ওঃ! ওঃ!" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

হরেন দা' তাড়াতাড়ি ছাতাটী লইয়া বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিল—"আমার কাজ আছে, আমি যাই।" রমেশ তো চটিয়াই কাঁই—বলিল—"তোমার কি বিবেচনা হরেন দা'! মহিলাটী আমাদের এখানে এসে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন—সবাই বিব্রত কি করে এঁকে সুস্থ করবে, আর তোমার কিনা ঠিক এই সময়ই যত কাজ পড়ল!" আমরাও রমেশের কথায় সায় দিলাম কেন না, মহিলাটী যে হরেন দা'কে দেখিয়া "তুমি! তুমি!" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন তাহাতে আমাদের মনের মধ্যে নানারূপ জল্পনা কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। হরেন দা'কে আমরা যাইতে দিলাম না।

একটু বাদে মহিলাটী সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার মুখ চোখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত না হইয়া—তথায় দুই ফোঁটা জল চক্ চক্ করিতেছে, চারিদিক অনুসন্ধান করিলেন—পরে হরেন দা'র দিকে দৃষ্টি পড়ায় একটু স্থির হইয়া থাকিয়া উঠিয়া গিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন হরেন দা' আঁৎকিয়া উঠিয়া বলিল—"আহা কি করেন! কি করেন!" মহিলাটী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি হরেন দা'কে চিনেন? তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"আপনারাই জিজ্ঞাসা করুন না উনি আমাকে চিনেন কি না।"

হরেনদা'। আমি কেমন করে—আমি—

মহিলা। আমার বরাবর ধারণা ছিল তুমি সত্যবাদী—সে ধারণা কি ভুল?

হরেন দা'র মাথায় যেন ধূলাপড়া পড়িল—সে একটীও কথা কহিল না—মুখ তুলিল না, ছাতার বাঁট দিয়া মেঝের উপর কাল্পনিক লতাপাতা অঙ্কিত করিতে লাগিল।

জেরায় যাহা প্রকাশ পাইল তাহা এই—মহিলাটী সম্পর্কে হরেন দা'র স্ত্রী। ইনিই হরেন দা'র দেশে থাকিতেন। ইঁহার বাপের বাড়ী কলিকাতায়। ইঁহার পিতা উচ্চশিক্ষিত, স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী—ছেলেবেলায় ইঁহাকে দস্তুরমত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। বিবাহের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত ইঁহাদের সুখে কাটিয়াছিল। তারপর হরেন দা' দুই একজন সাধু সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়িয়া নানাস্থানে বেড়াইতে আরম্ভ করে এবং "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" আওড়াইতে সুরু করে। নারীর প্রধান অস্ত্র অশ্রুজল যখন হরেন দা'র প্রতি প্রযুক্ত হইয়া বিফল হইল তখন ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্ত্র ঝগড়া, অভিমান, অনাহার প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে থাকেন। তাহাও নিষ্ফল হয় পরে হরেন দা' শিকল কাটিয়া একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। আজ তিন বৎসর স্বামী-স্ত্রীতে দেখাশুনা নাই। এখন হরেন দা' গঙ্গার ধারে একটা বাড়ীতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করেন, নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশে হরেন দা'র একটী ছোট ভাই আছে—হরেন দা'র অনুপস্থিতিতে সেই ভ্রাতৃজায়ার তত্ত্বাবধান করিত, যাহাতে তাঁহার কোনরূপ কষ্ট না হয় তাহা দেখিত। বলা বাহুল্য দেশে জমীজমা যাহা ছিল তাহাতে স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। হরেন দা' নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন।

আমি। আচ্ছা হরেন দা' তুমি এ কাজ করিলে কেন?

হরেনদা। কি করব ভাই। উচ্চশিক্ষিতা নারীর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির মত আমার একেবারেই অসহ্য। বিশেষ আমি নিজে উচ্চ-শিক্ষিত নই।

রমেশ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল। আমি তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলাম—মহিলাটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আচ্ছা আপনার মনটা যদি হরেন দা'র বিষয়ে এতই করুণার্দ্র, তবে আপনি স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে ওরূপ অসম্ভব কথাগুলো বল্লেন কি করে?

তিনি একটু ইতঃস্তত করিয়া কহিলেন—"উনি চলে আসবার পর দু'টী বচ্ছর ওঁর ফেরবার আশায় আমি সেই ভিটে আগলে পড়েছিলাম। তবু যখন উনি ফিরলেন না, তখন একবার সন্ধান নেবার জন্য কলকাতায় এলুম। আমার বাপের বাড়ীর পাশেই মিষ্টার বজ্রপাণির বাড়ী। তিনি ভয়ানক স্ত্রী-স্বাধীনতাওয়ালা। তিনি বাবার সমবয়সী, বাবার সঙ্গে খুব ভাব,—রোজই সকালে বিকালে আমাদের বাড়ী এসে চা খান। তিনি আমার অবস্থা শুনে প্রমাণ কর্ত্তে সচেষ্ট হলেন যে নারী জাতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত একেবারেই অকাট্য। ক্রমশঃ লেকচার দিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে মাস তিনেকের মধ্যেই গড়ে তুল্লেন এবং জন দুই তিন মহিলা কর্ম্মীর সঙ্গে জুটিয়ে দিলেন—তার ফল এই। আমাদের সঙ্ঘের বিশ্বাস যে খবরের কাগজগুলিকে আমাদের স্বমতে আনয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন তাই আমরা ক'জনে খবরের কাগজের আপিসে ঘুরে ঘুরে সম্পাদকদের স্বমতে আনয়ন করবার চেষ্টা করি। আর আমার রাগটা ছেলেবেলা থেকেই একটু বেশী—উনি তা জানেনও—ওঁকে যখন কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না তখন রাগটা একটু বেশীই হয়েছিল—তাই—"

আমরা দেখিলাম স্বামী-স্ত্রীর ভিতরের কথা আর বেশী খোঁচাইয়া বাহির করা ঠিক নয়। আমরা ব্যাপারটাকে এইখানেই ধামা চাপা দিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া যথারীতি স্বামী-স্ত্রীর মিলন করিয়া দিয়া সন্দেশ ভোজন করিতে ছাড়িলাম না। রমেশটা আর একমাত্রা উর্দ্ধে উঠিল—সে ঝাঁ করিয়া মিসেস্ হরেন দা'র সহিত দিদি পাতাইয়া বসিল এবং তাহার নূতন পাতান বোনাইয়ের প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবার অঙ্গীকার করিয়া প্রত্যহ তাহার গৃহে যাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী পরপারে প্রেরণ করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য শেষটা হরেন দা'কেও চুল কাটিতে, টেড়ি বাগাইতে, জামা গায়ে দিতে হইয়াছিল। "—অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।"

হিমানী

[শ্রীশিশিরকুমার বসু]

"ওলো হিমি, ও হিমি, মুখপুড়ী, হতচ্ছাড়া, গতরখাকী—কোন চুলোয় গেছ, কাণে শুনতে পাচ্চ না"—

"কি মা?" বলিতে বলিতে একটি ষোড়শী ছুটিয়া আসিয়া নতমুখে আঁচলের খুটটা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে মাতার সন্নিকটে দাঁড়াইল। রামবাগানের নিকৃষ্ট পল্লীর একটি দ্বিতল বাড়ীতে একটি প্রকোষ্ঠে—মাতাপুত্রীর এইরূপ স্নেহ-সম্ভাষণ হইতেছিল। মাতা তখন পা ছড়াইয়া, বসিয়া পায়ের আঙুলের সঙ্গে কাপড়ের পাড় বাঁধিয়া তাহা হইতে সুতো বাহির করিতে করিতে মুখখানা যতদূর সম্ভব বিকৃত করিয়া বলিল "নেকী হারামজাদী,—বেলা পাঁচটা বাজতে চলল, এখনও গা, হাত, পা ধোয়া হ'ল না—কার শ্রাদ্ধ হচ্ছিল?"

এমনি সময় একখানা শুকনো খড়খড়ে গামছা মাত্র পরিধানে এক স্থূলকায়া প্রৌঢ়া মন্থরগতিতে হস্তিনীর ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিয়া খনখনে আওয়াজে বলিয়া উঠিলেন "বলি নবাবনন্দিনীরা, এখনও মা বেটীতে সোহাগ হচ্চে—সন্ধ্যের সময়ই যে আজ নবর আসবার কথা আছে; ২০০৲ টাকা ত আগাম গভ্যে দিয়ে ব'সে আছ; আজ যদি আবার ঢঙাম হয় তা'হলে—আমি মা, বেটী দুটোকেই ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে বা'র করে দোব বলে রাখচি; বলিতে বলিতে বেগে প্রৌঢ়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মাতাও তখন রুক্ষ মেজাজে কন্যার উপর ঝাল ঝাড়িয়া বলিল "দাঁড়িয়ে রইলি কেন রে নবাবের বেটী—যা না গা ধুয়ে আয় না।"

বালিকা অতি মৃদুস্বরে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল; "বলেচিত মা—আমি ও সব পারবো না; আজ ছমাস ধরে তুমি আমার ওপর এই অত্যাচার"—বালিকার কথা শেষ হইতে না হইতেই সিংহিনির ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া নারী বালিকার চুলের মুঠি ধরিয়া জোরে নাড়িয়া দিয়া বলিল; "বেরো ঢঙি বেরো—কোথায় তোর কোন নাগর আছে—ওসব সতীপনা ঢের দেখেছি—কাঁড়ী কাঁড়ী গেলা আসবে কোথথেকে—সতী হয়েচেন? তবে খানকির ঘরে এয়েছিলি কেন? ভদ্রলোকের ঘরে জন্মাতে পার নি?"

এবার বালিকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; মাতা আরও সপ্তমে চাড়লেন—বিকট চীৎকার করিয়া অশ্রাব্য ভাষায় কটুক্তি করিতে করিতে পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; চীৎকারে—বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ছুটিয়া আসিয়া কক্ষদ্বারে জটলা পাকাইল—সকলেই ব্যাপার বুঝিয়া বালিকাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল—"এই তাহাদের ধর্ম্ম" "এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইত্যবসরে সেই পূর্ব্বোক্ত নারী খড়খড়ে গামছা পরা অবস্থায়ই পুনরায় গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "আবার বুঝি হারামজাদীর সতীগিরী ফলান হচ্চে। দেখি একখানা কাঁচি নিয়ে আয়ত মা আশা—হারামজাদীর চুলগুলো কেটে দিই; আর তুই যা ত নিরো একটা কলকে পুড়িয়ে নিয়ে আয় ত—ওর সমস্ত গায় কলকে পুড়িয়ে ছাঁকা দিয়ে দোব; হারামজাদী সতীগিরি ফলানর সুখটা একবার টের পাক্।"

বালিকা এইরূপ শাস্তির কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল—একবার ক্ষণিকের তরে কাতর দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু কোথায়ও এক ফোঁটা সহানুভূতি বা করুণার এতটুকু চিহ্নমাত্র দেখিতে না পাইয়া তাহার মাতার মুখের পানে কাতর নয়নে তাকাইয়া রহিল—মাতা বলিয়া উঠিলেন—"আঃ আবার প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছেন, হারামজাদি—আজ যদি আবার সেদিনকার মত কেলেঙ্কারী করিস, ভদ্রলোকের ছেলেকে অপমান করিস ত ছিঁচকে দিয়ে তোর ঐ ড্যাবডেবে চোখ দুটো গেলে দেবো—তারপর ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দোব—যা—তোর কোথায় কোন নাগর আছে তার কাছে যা—

এখানে আর তোর ঠাঁই হবে না। বালিকা হতাশ-করুণ দৃষ্টিতে একবার সকলের মুখের পানে তাকাইয়া বুঝিল, এখানে কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে এই দুই রণচণ্ডিকার কবল হইতে রক্ষা করে—সুতরাং নির্ব্বাক হইয়া সে মাটির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; স্থূলকায়া প্রৌঢ়া কিয়ৎক্ষণ বিফল গর্জ্জন করিয়া বুঝিল—বালিকাও বাঘিনীর বাচ্চা, সহজে পোষ মানিবে না; এবং সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত নারী মণ্ডলীর ব্যঙ্গসূচক মন্তব্য প্রৌঢ়াকে ধৈর্য্যহারা করিয়া তুলিল—গর্জ্জিয়া ছুটিয়া আসিয়া ভীমবেগে বালিকার পৃষ্ঠদেশে প্রচণ্ড পদাঘাত করিল—বালিকা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল, একবার যেন ক্ষীণকণ্ঠে "মাগো" বলিয়া উঠিল· রণচণ্ডিকা তখনও নিবৃত্ত হইতে পারিল না—উপর্য্যুপরি পদাঘাতে সঙ্গে সঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজে নরককুণ্ড গুলজার করিয়া তুলিল। বালিকার মাতারূপ রাক্ষসী আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—সেও ঐ দানবীর সঙ্গে এই পৈশাচিক কার্য্যে যোগ দিয়া বালিকার আগুল্‌ফ লম্বিত কেশের রাশি নির্দ্দয় ভাবে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বালিকাকে লইয়া কলতলায় গিয়া বসাইয়া দিল। কলতলায় কলের মুখে বালতি পাতিয়া নিকটে একটি বিংশতি বর্ষিয়া যুবতী মুখে একমুখ সাবানের ফেনা মাখিয়া গামছা দিয়া গা রগড়াইতে ছিল—সে একটু স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"আহা কি করেছে গা? ওকে অমন করে মাচ্ছ কেন মাসী?"

"আর বলিস্‌নে বাবু—শরীর ঝালাপালা হয়ে গেল—শাপভ্রষ্টা দেবী এসেছেন যেন, সতীগিরি ফলান—দূ-স্তোর খ্যাংরা মারি—"

"আচ্ছা মাসী তুমি যাও, আমি হিমিকে গা ধুইয়ে দিচ্চি।"

"দে ত মা পদ্ম—দে ত নেকা হারামজাদীর গাটা ধুইয়ে।" বলিতে বলিতে স্থান ত্যাগ করিল—

পদ্ম হিমির হাত দুইটী ধরিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—"নে ভাই হিমি উঠে আয়, কেন ভাই কথার অবাধ্য হোস—আর এই রকম চোরের ঠ্যাঙ্গানি খাস্—"

এতক্ষণ ধরিয়া অমানুষিক অত্যাচার যাহার কাছে হার মানিয়া গিয়াছে, স্নেহের পরশ এক মূহূর্ত্তে তাহাকে জয় করিল, দরদর ধারে হিমির দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পদ্ম হিমিকে টানিয়া আনিয়া বালতি শুদ্ধ জল তাহার গায়ে ঢালিয়া দিল ও তাহার হাতে মুখে সাবান ঘসিতে বসিল—

(২)

তখন রাত্রি প্রায় ৮টা—চওড়া জরিপেড়ে শান্তিপুরে সাড়ী পরাইয়া—পায়ে আলতা পরাইয়া—কপালে টিপ পরাইয়া মুখে একটি মিঠে খিলি গুঁজিয়া দিয়া পদ্ম যখন হিমির গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া বলিল—"নে এখন একবার আর্শির দিকে তাকিয়ে দেখ দিখি—বাবুর আজ মুণ্ড ঘুরে যাবে'খন।" হিমানীর দৃষ্টি গৃহস্থিত প্রকাণ্ড আর্শিতে পড়িতেই তাহার মনে মুহূর্ত্তের জন্য উদয় হইল—"কি সুন্দর"—পর মূহূর্ত্তেই মনে আসিল এই রূপ—এই রূপ বেচে তাকে জীবনপাত কর্ত্তে হ'বে। এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ হবে তার পণ্যদ্রব্য—ব্যবসার সামগ্রী—এই রূপ দিয়ে সকলের মন ভুলাতে হবে—সকলের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় কর্ত্তে হবে। মাত্র তুচ্ছ কাঞ্চন বিনিময়ে এই দেহ—ফোটা শিউলি ফুলের মত এই দেহ—এই রূপের ডালি যার তার হাতে অর্পণ কর্ত্তে হবে—আর ঘৃণ্য কামুক পশুরূপি মানুষ এই দেহটীর উপর যথেচ্ছাচার কর্ব্বে কয়েকটী মুদ্রার বিনিময়—উঃ ভগবান, কেন আমায় সৃষ্টি করেছিলে—সৃষ্টি করেছিলে ত কেন এই নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলে—পতিতার গৃহে—বেশ্যার গৃহে—হৃদয়ে তার তুমুল ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল—কিন্তু বাহিরটা তার স্থির অবিকম্প, নিশ্চল; চক্ষে তার বিন্দুমাত্র অশ্রু নাই—মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে; ভিতরটা যেন পুড়িয়া খা খা করিতেছিল—পদ্ম কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া বলিল"হিমি—হিমানী—বোন আমার—মন দৃঢ় কর—যখন এ ঘরে জন্মেছিস তখন ত এই কাজ কর্ত্তেই হবে; যার যা কর্ম্মফল, নইলে তুই ত কোন ভদ্র গেরস্ত ঘরেও জন্মাতে পারতিস্—ঠিক এমনি সময় বাহির হইতে হিমির মাতার কণ্ঠস্বর শুনা গেল কাহাকে বলিতেছে—"ঢিট্ হবে না—ঝেঁটিয়ে ঢিট কর্ব্বো না?—কুমুদিনী অমন ২৫৲ টাকায় কেনা ৭টা মেয়েকে একদিনে ঢিট্ করে দিতে পারে——

পদ্মর কথা আর শেষ হইল না—মুখের কথা মুখেই

আটকাইয়া গেল—হিমানী একবার পদ্মর মুখের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কার ঘরে জন্মেছিলুম—কে বলতে পারে? তবে কর্ম্মফল মানতেই হ'বে—নইলে এই বাঘিনীর খর্পরে এসে পড়বো কেন?"

পদ্ম "চুপ চুপ" বলিয়া হাত দিয়া হিমানীর মুখ চাপিয়া ধরিল।

এমনি সময় ভৃত্য মঙ্গুয়া আসিয়া খবর দিল "নববাবুর সাথ একটা বড় বাবু আসথিছে; মায়ি খবর দিতে বললে।"

পদ্ম আদরে হিমানীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল "মাথা খাস ভাই, আর গোঁয়ারতুমি করিস নে—কি কর্ব্বি এই কর্ম্মেই ত জন্ম। পেট ত চলা চাই!"

হিমানী কাট হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল "হ্যাঁ, পেট ত চলা চাই—পেট চলবার কি অন্য কোন উপায় নাই? একটা পেট—সে ত ভিক্ষা করিলেই চলিয়া যায়; আরও ত শত সহস্র উপায় আছে—যাহাতে এই পোড়া পেট চালান যায়। তবে সত্যই কি পেট চালাইবার জন্য এই হীন, জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। না—এত পেট চালাইবার জন্য নয় এ বৃত্তি ত তাহাকে অবলম্বন করিতে হইবে তাহার মাতৃরূপী রাক্ষসীর পেট ভরাইবার জন্য—তার পেট চালাইবার জন্য নয়। তাহার মাতৃরূপী রাক্ষসীর সিন্দুক ভরাইবার জন্য, তাহার এই রূপ বাজারের পণ্যদ্রব্যের মত ফিরি করিতে হইবে—তাহার শরীরের সুবিধা অসুবিধা বুঝিবে না—মনের শান্তি অশান্তি দেখিবে না—তাহার দেহ বিক্রয় করিতেই হইবে। সেই দেহ-বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহার পালনকর্ত্রীর সিন্দুক ভরাইতেই হইবে নইলে উপায় নাই—তাহাকে অসহ্য যন্ত্রণা সহিতে হইবে। ভগবান!" হিমানীর গণ্ড বহিয়া অজস্রধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পদ্ম কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহারও চক্ষুদ্বয় শুষ্ক নহে পরে সামলাইয়া লইয়া আদরে হিমানীর গালদুটি নিজের অঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া বলিল "বোন, হিমানী—ছিঃ বলিতে না বলিতে জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাংস্যকণ্ঠ-বিনিন্দিত তাহার মাতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—পদ্ম তাড়াতাড়ি হিমানীকে বিছানার এক পার্শ্বে জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। হিমানীর মাতা দুইটি সুবেশধারী যুবক সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিয়া কণ্ঠস্বরে বৃথা কোমলতা আনিবার চেষ্টা করিয়া সুবেশধারী যুবকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আসুন বাবু আজ থেকে এ ত আপনারই ঘর—নিন্ বসুন—তাকিয়া ঠেস দিয়া ভাল হইয়া বসুন"—তাহার মুখের কথা কাড়িয়া পশ্চাৎবর্ত্তী নব নামধারী জীবটি বলিয়া উঠিল "হেঃ হেঃ বসুন বাবু—আপনার ঘর দোর আপনার পছন্দমত পরে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবেন"; পরে বাবুর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল "দেখছেন ত বাবু একেবারে যেন ডানাকাটা পরী—দেখুন দেখুন একবার রংটা দেখুন, একেবারে দুধে আলতা দেখুন আমি যা বলেছিলুম একেবারে অক্ষরে অক্ষরে তা সত্যি কি না?" বাবুটি মৃদু হাস্য করিয়া একপার্শ্বে একটি তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িলেন সঙ্গে সঙ্গে নবও একপাশে বসিয়া হিমানীর মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "কি গো মাসী তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও পানটান সেজে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত কর গে—এদিকে আর দেখতে হবে না বাবু আমাদের মহাদেব তুল্যি লোক—সব ঠিক করে নেবেনখ'ন—" হিমানীর মাতার মুখে একটু উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা গেল, ঘন ঘন হিমানীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিল, "দেখিস নব, বাবুর আদর যত্নের যেন ত্রুটি না হয়, বাছা আমার ছেলেমানুষ তায় বড় ভীতু; একটু সইয়ে নিতে হ'বে, কিছুতে যেন ত্রুটি না নেন' পরে নবর কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল "দেখিস নব, জানিস ত সব—আবার যেন সেদিনকার মত না হয়, আমি এই পাশের ঘরেই আছি।" বলিয়া একবার বাবুর দিকে একবার হিমানীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

* * * *

রাত্র প্রায় একটা—হিমানীর গৃহে সবে গান বাজনা থামিয়া গিয়াছে—মদও ফুরাইয়া গিয়াছে। হিমানী নবকে বলিল, "যাও নবদা মদ নিয়ে এস—বাবুর আরও চাই।"

নব উৎসাহিত হইয়া বলিল—"এই ত চাই—যাচ্চি এক্ষুণি যাব আর আসব—" বলিয়া নব বেগে গৃহ হইতে বাহির

হইয়া গেল। বাবুর নেশা তখন একেবারে ভরপুর। এতক্ষণ কেবল গান বাজনা ও মদ সমান চলিয়াছে। মদও ফুরাইয়াছে, গান বাজনাও থামিয়াছে—নির্জ্জন গৃহে কেবলমাত্র বাবু ও হিমানী ছাড়া আর কেহ নাই। নেশার আমেজে বাবু হাত বাড়াইয়া বলিলেন "হিমানী, কই কাছে এস—"

হিমানী কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া আসিতেছিল। মুখমণ্ডল মরা মানুষের মত সাদা—এলোচুল—তাহাকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। বাবু হাত বাড়াইয়া উঠিয়া হিমানীর কাছে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। হিমানী হঠাৎ ক্ষিপ্তা ব্যাঘ্রীর ন্যায় বাবুটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সজোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। বাবু আর শব্দমাত্র না করিয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। হিমানী মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া বেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া একেবারে সদর দরজা খুলিয়া রাস্তায় পড়িয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে এ রাস্তা সে রাস্তা দিয়া কত পথ ঘুরিয়া সে কত দূরে কোথায় আসিল কিছু বুঝিতে পারিল না। আর পা চলে না—"মাগো" বলিয়া রাস্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইল। সেই সময় দূর হইতে একটা প্রকাণ্ড মটরকারের তীব্র আলোক রশ্মি আসিয়া তাহার উপর পড়িল। দেখিতে দেখিতে মোটরখানা তাহার সম্মুখে আসিয়া থামিয়া পড়িল—তন্মধ্য হইতে একটি বহুমূল্য সাজসজ্জায় সজ্জিত দিব্যকান্তি প্রিয়দর্শন যুবক নামিয়া পড়িয়া হিমানীকে দেখিয়া অতি সন্তর্পণে কোলে করিয়া তাহাকে নিজ মোটরে তুলিয়া লইয়া সোফেয়ারকে হুকুম করিল—"চালাও টালীগঞ্জ বাগান।"

(৩)

টালীগঞ্জের সুসজ্জিত বাগান বাটির একটি সুসজ্জিত কক্ষে একটি সোফার উপরে সুপুরুষ দেবেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট। তাহার বক্ষের উপর মস্তক রাখিয়া হিমানী সোফায় দেহভার এলাইয়া দেবেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিয়া আছে;—দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিও হিমানীর দৃষ্টিতে নিবদ্ধ; ধীরে ধীরে দেবেন্দ্র মুখ নত করিয়া হিমানীর ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলাইল—হিমানীর গোলাপী গালদুটি আরও গোলাপী হইয়া উঠিল,—মুখে মধুর হাসি ফুটিল। দেবেন্দ্রর মুখখানিও উজ্জ্বল হইল; আস্তে আস্তে হিমানী উঠিয়া বসিয়া এলাইত কেশরাশি বাঁধিতে বাঁধিতে দেবেন্দ্রের পানে কটাক্ষ করিল। দেবেন্দ্র—বিহ্বল দেবেন্দ্র আবার হিমানীকে বুকে টানিয়া লইয়া অজস্র চুম্বনে তাহার গালদুটি রাঙা করিয়া দিল।

হিমানী তাহার সুকোমল বাহুদুটি দিয়া দেবেন্দ্রর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "ওগো এমনি সুখ কি আমার বরাতে চিরকাল সইবে?"

আদরে হিমানীর গালদু'টি টিপিয়া দিয়া দেবেন্দ্র বলিল—"কেন সইবে না? ছিঃ হিমু অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনতে হয় কি?"

হিমানী সোহাগে গলিয়া গিয়া বলিল, "ওগো আমি বড় দুঃখী—জান ত আমার কাহিনী—তুমি দেবতা, তাই আমার মত হতভাগিনীকে রাণী সাজিয়েছ। তাই মাঝে মাঝে বড় ভয় হয় আমার পোড়া বরাতে কি এত সইবে?"

"আচ্ছা তুমি কি ছেলেমানুষ—এ সময় কি অত ভাবতে আছে? মন খারাপ হ'লে অসুখ কর্ব্বে যে।" বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে হিমানীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

হিমানী করুণ নেত্রে দেবেন্দ্রের পানে চাহিয়া রহিল।

"আবার অমন করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ? আচ্ছা হিমু, কেন তুমি অমন কোরে কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাও; আজ প্রায় এক বছর হ'তে চললো, তোমাকে কখনও অনাদর করেছি? এখনও আমার চিনলে না? ছিঃ।"

হিমানীর প্রশস্ত করুণ নেত্রদু'টি হইতে টপ্ টপ্ করিয়া দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। দেবেন্দ্রর মুখে উদ্বেগের একটা চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

ব্যস্তভাবে দেবেন্দ্র উঠিয়া হিমানীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া হিমানীর মাথাটি বুকে করিয়া আঙুল দিয়া হিমানীর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল "আচ্ছা—একি ছেলেমানুষি হচ্ছে?"

হিমানী আড়ষ্টভাবে দেবেন্দ্রর বুকের উপর পড়িয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ নিস্তব্ধ থাকার পর ধীরে ধীরে হিমানী

উঠিল। দেবেন্দ্র আবার তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার গোলাপী গালে একটি চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া বলিল—"ওগো এইবার ছেড়ে দাও, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে বাড়ী যাই।"

হিমানী কোন উত্তর না করিয়া কেবল মাত্র তাহার ডাগর ডাগর চোখদু'টী দেবেন্দ্রনাথের মুখের উপর স্থাপিত করিল।

দেবেন্দ্র আবার তাহার মুখে একটি চুমু খাইয়া বলিল—"ওগো"—

"চল," বলিয়া হিমানী উঠিয়া একটু সামলাইয়া লইয়া আগে আগে চলিল, দেবেন্দ্রও তাহার পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া হিমানীর কাঁধে একখানি হাত রাখিয়া বলিল—"যাও কাপড় কেচে নাও গে—এক্ষুণি তোমার গভর্ণেস এসে পড়বে।"

হিমানী সে কথায় বাধা দিয়া বলিল—"ওবেলা তুমি কখন আসবে? ঠিক সময়ে আসবে তো?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ"—বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাহিরে গিয়া গাড়ী বারান্দার নিম্নে অবস্থিত মোটরে চড়িয়া বসিল। আস্তে আস্তে বাগানের মধ্য দিয়া গাড়ী বাহির হইয়া গেল।

হিমানী দ্বিতলে গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াইয়া রেলিংটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। হিমানী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কই, এত দেরী ত কোনও দিন হয় না; তবে কি কোনও বিপদ হইল? না, না, তাহা হইলে ত নিশ্চয়ই তাহাকে খবর দিত; এই সেদিন আসিতে পারিল না—বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া থিয়েটার যাইতে হইয়াছিল; নিজেই সন্ধ্যার সময় আসিয়া সে কথা বলিয়া গেল; আরও কতদিন কত কাজের জন্য রাত্রিতে থাকিতে পারে নাই; কিন্তু প্রত্যেক বারই নিজে আসিয়া খবর দিয়া গিয়াছে। আজ এখনও আসিল ত না—একটা খবর পর্য্যন্ত দিলও না। হিমানীর মনটা আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। তাই ত কি হইল, তাহার ভয় হয় এত সুখ কি তাহার কপালে সহ্য হবে? কি হবে—যদি সত্যই কোনও অসুখ বিসুখ করে থাকে—আচ্ছা দরওয়ানকে একবার পাঠালে হয় না? নানা চিন্তায় মাথাটা যেন ঘুরিতে লাগিল; এই সময় সিঁড়িতে কাহার জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। হিমানীর প্রাণটা যেন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল—ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল; জুতার শব্দ নিকটতর হইল—একি এত নয়, তাহার জুতার শব্দ যে মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা; এ ত সে নয়, এ তবে কে? এ যে অচেনা শব্দ; হিমানীর বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল। এমন সময় দেবেন্দ্রনাথের ভৃত্য ধীরে ধীরে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া কহিল "রাণীমা,—বাবুর আজ শরীরটা বেশ ভাল নেই, বড় অসুখ কচ্চে—সেইজন্য আসতে পারবেন না আমাকে খবর দিতে বললেন।" প্রভুভক্ত ভৃত্য নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। হিমানী অগাধ চিন্তায় মগ্ন; টেরও পাইল না যে কখন ভৃত্য চলিয়া গেছে। হিমানীর ভাবনার অন্ত নাই, অসুখ, কি অসুখ? তা ত জিজ্ঞাসা করা হ'ল না! হিমানী উঠিল, দৌড়াইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দরওয়ানদের চাকরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল সে চলিয়া গিয়াছে। হিমানী ভাবিয়া কুলকিনারা পাইল না—কি করিবে সে? দেবেন্দ্রনাথ তাহার দেবেন্দ্রনাথ তাহার?—হিমানী মনে মনে ভাবিতে লাগিল ময়মনসিংএর জমিদার সম্ভ্রান্ত বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ রায় কি তাহার মত একটা পথে কুড়িয়ে পাওয়া বেশ্যা নিয়ে চিরকার কাটাবে? একি দুরাশা—সে বেশ্যা—ঘৃণিত পতিতা—আজই না হয় তার রূপ আছে, যৌবন আছে, চিরদিনই তার এমনি রূপ যৌবন থাকবে না; দেবেন্দ্রনাথ কি বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে না? এমনি ছন্নছাড়া হইয়া একটা বেশ্যার সঙ্গে জীবনটা কাটাইবে—এ কি হয়? হিমানী আর ভাবিতে পারিল না। চাপা কান্না তার কণ্ঠনালী ভেদ করিয়া যেন ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। আবার মনে পড়িল দেবেন্দ্রনাথের প্রেমপূর্ণ বাণী—দেবেন্দ্র যে তাহারই চিরদিন থাকিবে তাহাকে স্পর্শ করিয়া দিব্য করিয়াছে। আর সে হতভাগী কিনা যা তা ভাবিয়া দেবেন্দ্রের ভালবাসায় সন্দেহ করিতেছে! সে হয়ত এতক্ষণ অসুখে ছট্‌ফট্ করিতেছে—

আর—আর ভাবিতে পারিল না। ছুটিয়া দরওয়ানকে গিয়া বলিল—"দরওয়ান একঠো ট্যাক্সি বোলাও হাম ভবানীপুর যায়েগা।"

দরওয়ান "যো হুকুম রাণীমা" বলিয়া সেলাম ঠুকিয়া বাহির হইয়া গেল। হিমানীও নিজ প্রকোষ্ঠে আসিয়া একটী সিল্কের চাদর দিয়া সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আবার চিন্তা—আট মাস গর্ভবতী সে, এই রাত্রে একাকী দু'জন দরওয়ান একজন ঝি সঙ্গে করিয়া যাওয়া উচিত কি না? আবার দেবেন্দ্রের অসুখের কথা মনে পড়িল—উচিত অনুচিত সব ভাসিয়া গেল। এমন সময় দরওয়ান ট্যাক্সি লইয়া হাজির হইল। হিমানী ঝি সঙ্গে গিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল; ট্যাক্সি দ্রুতবেগে ভবানীপুর অভিমুখে ছুটিল; ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা পেচক বিকট শব্দে চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল; হিমানী দেবেন্দ্রের চিন্তায় বিভোর; তাহা লক্ষ্যও করিল না।

(৪)

ট্যাক্সি ভবানীপুরে দেবেন্দ্রনাথের বৃহৎ প্রাসাদোপম গৃহের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। দু'তিন জন ঝি আসিয়া দরজায় হিমানীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। বলা বাহুল্য অতবড় বাড়ী, ভিতরটা কেবল ঝি চাকর ছাড়া আর কেহ থাকে না। হিমানীর ঘর দ্বার সমস্তই পরিচিত—আরও কতবার সে এ বাটিতে আসিয়াছে। হিমানী ঝিদের জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু কেমন আছেন"; "ভালই আছেন" উত্তর শুনিয়া হিমানীর উদ্বেগ দূর হইল। সে দেবেন্দ্রকে চমৎকৃত করিবার অভিপ্রায়ে নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া দেবেন্দ্রর কক্ষের দরজায় দাঁড়াইল—খড়খড়ির পাখী তুলিয়া নিঃশব্দে দেখিতে লাগিল দেবেন্দ্র কি করিতেছে; দেখিল দেবেন্দ্র পালঙ্কে দুগ্ধফেনোনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে—দেখিয়া হিমানীর মন-প্রাণ সব ভরিয়া গেল—কি সুন্দর—যেন একরাশ ফুটন্ত গোলাপ বিছানায় ছড়ান আছে দেখিয়া যেন আশ মেটে না; দূর হইতে খড়খড়ির পাখী তুলিয়া হিমানী চুরি করিয়া মনচোরকে দেখিতে লাগিল, হঠাৎ প্রকোষ্ঠের অন্য দরজা একটি সুন্দরী যুবতী গৃহে প্রবেশ করিয়া শায়িত দেবেন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল; দেবেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া সাদরে যুবতীকে বুকে টানিয়া লইল। হিমানীর মাথাটা যেন ঘুরিয়া গেল; সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল; হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—এ কি—একি দেখিল—এই দেখিতে কি সে ছুটিয়া আসিয়াছে, দেবেন্দ্র ত অবিবাহিত—তবে এ যুবতী কে? হিমানীর চক্ষের সম্মুখে যেন সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; আজ এক লহমায় তাহার সমস্ত সাধ চূর্ণ হইয়া গেল—বুকের ভিতর রক্ত যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল আর দেখিতে পারিল না—চক্ষে সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিল—আপনিই হাত হইতে খড়খড়ির পাখীটা সশব্দে পড়িয়া গেল—হিমানী ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া নিচে আসিতে আসিতে মাথা ঘুরিয়া সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইল।

* * * *

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিল হিমানী দেবেন্দ্রর বাটীরই বৈঠকখানায় একখানি সোফার উপর শায়িতা, দেবেন্দ্র উদ্বিগ্নভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে—হিমানী চক্ষু চাহিতেই দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ হিমু?"

হিমানীর চট্ করিয়া পূর্ব্বঘটনা মনে পড়িল—লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিল—তীব্রস্বরে বলিল "এক্ষুনি, এই মুহূর্ত্তে আমাকে একটা গাড়ী ডেকে দাও।"

দেবেন্দ্র হতভম্ব ভাবে বলিল—"কি বলচ হিমানী?"

দেবেন্দ্রের কথা কয়টা যেন সপাং করিয়া হিমানীর পৃষ্ঠদেশে চাবুকের ন্যায় পড়িল—হিমানী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"এক্ষুনি একটা গাড়ী ডেকে দিতে বল নইলে আমি হেঁটে বেরিয়ে যাব।"

দেবেন্দ্র আবার বলিল "কি বলছ, এই রাত্রে কোথায় যাবে।"

হিমানীর আর সহ্য হইল না, বলিল—"দেবে না আমি হেঁটেই চল্লুম।"

দেবেন্দ্র ব্যস্তভাবে—ঘরের বাহিরে গিয়া দরয়ানকে একটা ট্যাক্সি ডাকিতে বলিল। হিমানী ভাবিতে লাগিল—কোথায় যাইবে? ভাবিয়া কূল পাইল না—এই রাত্রে কোথায় কাহার কাছে যাইবে—তাহার আর কে আছে! মনে পড়িল

প্রায় বৎসর খানেক পূর্ব্বেকার কথা—দেবেন্দ্রর ভালবাসা পাইবার পূর্ব্বে তাহার কি অবস্থা ছিল—মনে পড়িয়া তাহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তারপর দেবেন্দ্রর ভালবাসা—উঃ আর সে সামলাইতে পারিল না—দরদর ধারে তাহার গণ্ডদ্বয় বাহিয়া অশ্রুরাশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দেবেন্দ্র—অপরাধী দেবেন্দ্র কি বলিয়া হিমানীকে সান্ত্বনা দিবে—তাহা ভাবিয়া পাইল না—শুষ্কমুখে নিস্তব্ধভাবে পার্শ্বে একখানা আরাম কেদারায় আড় হইয়া পড়িয়া রহিল। উভয়ে নিস্তব্ধ—উভয়ে যেন উভয়ের উপস্থিতির বিষয় সম্পূর্ণ অনবগত। ঠিক এই সময় দরওয়ান দরজার বাহির হইতে উচ্চকণ্ঠে কহিল—"মহারাজ ট্যাক্সি আয়া"—হিমানী সেই শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—ছুটিয়া বাহির হইতে গেল, দেবেন্দ্র করুণস্বরে ক্ষীণকণ্ঠে একবার ডাকিল—"হিমানী—হিমু একবার শোন"—হিমানি দেবেন্দ্রর দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিল—চাহনীতে যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল—দেবেন্দ্র সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না—মাথা নত করিয়া বসিয়া পড়িল;—হিমানী ছুটিয়া গিয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল।

দেবেন্দ্র ছুটিয়া বাহিরে আসিল, একজন দরওয়ানকে ডাকিয়া কি বলিল—পরে পুনরায় বৈঠকখানায় আসিয়া আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িল।

হিমানীর সঙ্গে সঙ্গে একজন দরওয়ান ও একজন ঝি গিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল—ট্যাক্সি পূর্ণবেগে টালীগঞ্জ বাগান বাড়ীর দিকে ছুটিল—হিমানি ট্যাক্সির মধ্যে আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

(৫)

নিস্তব্ধ রাত্রি; চতুর্দ্দিক অন্ধকার; হিমানী ধীরে ধীরে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, টং টং করিয়া রাত্রি ৩টা বাজিল; একে একে হিমানীর সমস্ত কথা মনে পড়িল; রাজ্যের চিন্তা আসিয়া তাহার মাথায় চাপিয়া বসিল; সে কি করিবে? কেন এমন হ'ল? সে ত সত্যই দেবেন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষকে নিমেষের তরেও হৃদয়ে স্থান দেয় নাই—তবে—তবে যা কখনও সে কল্পনাও করে নাই আজ তাহাই হইয়া গেল কেন? ওগো—সে কি করিবে? তাহার বুকের উপর কে যেন ঢেঁকির পাড় ফেলিতেছিল; সে যে তাহার সমস্ত মন প্রাণ দিয়া দেবেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল—সেই দেবেন্দ্র যে এমনি ভাবে নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের মত তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর। দেবেন্দ্র—দেবেন্দ্রের ভালবাসা? মনে হইতেই তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন তীব্রতেজে জ্বলিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার অঙ্গে আগুন ধরিয়া উঠিল—সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল; বিছানা হইতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া ছুটিয়া গাড়ী বারান্দায় কিয়ৎক্ষণ খোলা বাতাসে বেড়াইবার জন্য আসিল, ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে করিতে পায় লাগিয়া একটা ফার্ণের টব্ উল্টাইয়া পড়িল; বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় মনে হইল—এত দেবেন্দ্ররই বাগান বাটী; এখনও সে দেবেন্দ্ররই আশ্রিতা—আর সহ্য হইল না; ছুটিয়া ঘরে আসিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল—দেখিল টিপয়ের উপর ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, কাল যেমন ভাবে দেবেন্দ্র রাখিয়া গিয়াছিল আজও তেমনি ভাবে আছে—মাত্র ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। দেওয়ালে বৃহৎ ফ্রেমে আঁটা তাহার ও দেবেন্দ্রর যুগলমূর্ত্তি—চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—আশে পাশে যে দিকে তাকাইল দেবেন্দ্রর কোনও না কোন নিদর্শন যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া তাড়া করিয়া আসিল—হিমানী উন্মাদ হইয়া উঠিল; গৃহের প্রতি বায়ুকণা যেন তাহার শ্বাসরোধ করিতে লাগিল—দেবেন্দ্র বিশ্বাসঘাতক, ভণ্ড দেবেন্দ্রর সম্পর্ক ত্যাগ করিতেই হইবে—আর যেন দেবেন্দ্রর ছায়া মাড়াইতে না হয়। হিমানী কোমরে কাপড় জড়াইল, ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িয়া যেদিকে দু'চক্ষু যায় চলিতে আরম্ভ করিল—

* * * *

হিমানী আজ প্রায় একুশ দিন হইল হাঁসপাতালে আছে—একটি মৃতকন্যা প্রসব করিয়া যমে মানুষে টানাটানির পর আজ একুশ দিন পরে সে বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া কয়েকটি পথচারী ভদ্রব্যক্তি কর্ত্তৃক সে হাঁসপাতালে নীত হয় ও সেখানে কেমন করিয়া মৃতকন্যা প্রসব করান হয়—এ কাহিনী নার্শদের মুখে সে একবার শুনিয়াও তৃপ্ত হয় নাই; বার বার শুনিয়াছে। হিমানীর এখন চিন্তা—হাঁসপাতালে

ত আর বেশীদিন থাকিতে দিবে না, তারপর? তারপর কোথায় যাইবে—ভাবিয়া কূল পায় না।

তাহাকে পুনরায় ভাবিতে দেখিয়া নার্শ তাহার নিকট আসিয়া তাহার মাথায় সাদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আবার মন খারাপ কচ্চ, এখনও ভাল করে সার নি; এর মধ্যে এমন করে ভাবলে আবার অসুখে পড়বে? এস ত আস্তে আস্তে এই বারান্দায়, আমার কাঁধে ভর দিয়ে; ওখানে আরও দু'চারজন রোগিনী আছে তাদের সঙ্গে চলনা, একটু গল্পসল্প করি, তা'হলেই মনটা বেশ হাল্কা হ'বে।"

এই বলিয়া হিমানীকে তুলিয়া লইয়া বারান্দাস্থিত একখানি আরাম কেদারায় শয়ন করাইয়া দিল; হিমানী আরাম কেদারায় শুইয়া ইতস্তত: চাহিয়া কিছুদূরে একটি রমণীকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রমণীও হিমানীকে দেখিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া ছুটিয়া আসিয়া হিমানীকে জড়াইয়া ধরিল।

হিমানী "মা, মা তোমার এই দশা" বলিয়া রমণীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

রমণী ধীরে ধীরে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, "মা, চল মা ঘরে ফিরে চল, আর আমি তোকে পাপের পথে নিয়ে যেতে চাইব না। দেখ মা আমার শরীরের অবস্থা, কি কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে আজ তিনমাস হাঁসপাতালে পড়ে থেকেও এখনও ভাল করে সারতে পারি নি। পাপের কি শোচনীয় পরিণাম?" বলিয়া রমণী বালিকার ন্যায় উচ্ছ্বসিতস্বরে কাঁদিতে লাগিল। হিমানী তাহার অশ্রু মুছাইয়া একে একে নিজের সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিল। তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "মা হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে আর শঠ পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কর্ব্ব না। পুরুষ অতি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন।" আর কথা বলিতে পারিল না কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল; অতিকষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হিমানী পুনরায় বলিল,—"নাচতে গাইতে শিখেছি, লেখাপড়াও কিছু কিছু শিখেছি—কোন থিয়েটারে চাকরী ক'রে দু'জনের দু'মুঠো বেশ চালাতে পারব; তাও যদি না পাই ঝিগিরি ক'রে মা-বেটীর পেট চালাব।"

মাতা কন্যার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিল "তাই হ'বে মা—তাই হ'বে।"
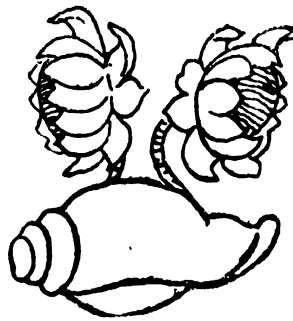
তিন রাত্রি

[শ্রীকালীকৃষ্ণ বিশ্বাস]

(১)

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রবি অর্দ্ধঘণ্টার উপর Eden Gardenএ একটা বেঞ্চের উপর বসিয়াছিল। সন্ধ্যা দেবীর সেই গম্ভীর শান্তিময়ী প্রকৃতি তাহার বড়ই ভাল লাগিতেছিল। নানাবিধ গাছের ছায়া সম্মুখের পুষ্করিণীর উপর পড়িয়া তরঙ্গের সহিত নানাভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছিল। একাগ্রমনে রবি সেই নৃত্যক্রীড়া দেখিতেছিল।

হঠাৎ সেই সময়ে একজন ১৭।১৮ বৎসরের তরুণী তাহার নিকট দৌড়াইয়া আসিল। তাহার পরিচ্ছদে বুঝা গেল, তরুণী European কিন্তু বড় গরীব।

তরুণীটি একেবারে রবির হাতখানি ধরিয়া কহিয়া উঠিল "একটা সাপ আমাকে তাড়া করেছে—করছে—এস না।"

রবি তাহার পার্শ্বে চাহিতেই দেখিতে পাইল, একটা বেশ বড় সাপ তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। চকিতে একবার তরুণীর দিকে চাহিয়া নিকট হইতে একটি ইট কুড়াইয়া লইয়া রবি অতি সন্তর্পণে সাপটির মস্তকের উপর আঘাত করিল। সাপটি একবার ছোবল মারিবার উপক্রম করিয়াই পড়িয়া গেল; উপর্য্যুপরি ছয় সাতবার আঘাত করিবার পর যখন দেখিল, যে সাপটি একেবারে মরিয়া গিয়াছে, তখন সে ইটটি ফেলিয়া দিয়া তরুণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল সে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তরুণী একটু হাসিয়া কহিল—"ভাগ্যে তুমি ছিলে, নইলে কি বিপদেই পড়তে হ'ত।"

প্রত্যুত্তরে কিছু না বলিয়া রবি তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর তরুণী কহিল—"তোমার যদি কোনও আপত্তি না থাকে ত' এস ঐ বেঞ্চটায় বসি গে।"

"না আপত্তি আর কি, চল না" এই বলিয়া রবি তাহার অনুসরণ করিল।

পার্শ্বস্থিত একটি বেঞ্চে তাহারা বসিয়া পড়িল। তরুণী রুমালে মুখ মুছিয়া প্রশ্ন করিল—"তোমার নাম কি? তুমি কি কর?"

নিজের নাম বলিয়া রবি কহিল—যে সে City Collegeএ Fourth yearএ পড়ে; উত্তর দিয়া সে বক্র-দৃষ্টিতে তরুণীকে দেখিতে লাগিল। তরুণী মুখ ঘুরাইবামাত্রই সেদৃষ্টি নামাইয়া লইল। তরুণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি দেখছিলে?" রবি কিছুই বলিল না লজ্জিত দৃষ্টি আর একবার তুলিল মাত্র। তরুণী কিছুকালের নিমিত্ত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল তৎপরে হাতঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিয়া উঠিল,—"৭টা বাজে আজ চল্লুম কাল আসবে কি?" তরুণীর মুখে আগ্রহের ছাপ পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিল।

রবি উত্তর দিল "আসব।"

"আচ্ছা তবে Good Night"

বলা বাহুল্য সেদিন রাত্রে যতক্ষণ না রবির চক্ষে নিদ্রা আসিল, ততক্ষণ তাহার সম্মুখে Eden Gardenএর সেই ঘটনাটি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

(২)

তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় রবি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তরুণী সেই বেঞ্চে একাকিনী বসিয়া আছে। তাহার মুখ আজ যেন কিঞ্চিৎ ম্লান। রবি যাইবামাত্রই তরুণী হাত বাড়াইয়া hand shake করিয়া কহিল "বস।"

রবি তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াই প্রশ্ন করিল—"তোমার নাম ত' আমায় বল নি।"

সে কিয়ৎক্ষণের তরে নীরব থাকিয়া বলিল—"ওঃ ভুলে গিয়েছিলাম, আমার নাম Lucy.

তখন সবে মাত্র আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে, তাহারই সাদা চক্‌চকে কিরণগুলি গাছের পাতার ভিতর দিয়া লুসির

মুখের উপর পড়িয়া, তাহার ম্লান মুখখানি আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল।

রবি প্রশ্ন করিল—"তোমার কি আজ শরীর ভাল নাই ?"

"শরীর !" এই বলিয়া লুসি তাহার মুখে জোর করিয়া একটু হাসি টানিয়া আনিল, কহিল "শরীর ত' আমার কোনও দিনই ভাল থাকে না।"

আগ্রহ সহকারে রবি প্রশ্ন করিল "কেন ?"

"সে অনেক কথা।"

রবীর কৌতূহল বাড়িয়া গেল, সে বলিয়া উঠিল"তবু বলই না।"

"শুনবে ? তবে শোন, এই বলিয়া লুসি একেবারে রবির পার্শ্বে ঘেঁসিয়া বসিল, তারপর বলিতে আরম্ভ করিল—"আজ পর্য্যন্ত আমার অনেক কষ্টেই দিন গেছে, কিন্তু কেউ কোনও দিন আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসাও করে নি ; বা সহানুভূতিও প্রকাশ করে নি। তুমিই আমায় প্রথম জিজ্ঞাসা করলে ; যাই হোক, শোন—আমার মা প্রায় আজ দশ বৎসর হ'ল মারা গেছেন। মা মারা যাবার পর, বছর দুই বাবা বেশ ভাল ছিলেন, তারপর থেকে রোজ তিনি সন্ধ্যা বেলা কোথায় বেরিয়ে দেতেন,—আর আস্‌তেন সেই রাত ১১।১২ টায় ; তাও আবার বেশ সহজ অবস্থায় নয়, তখন তাঁর মুখ থেকে ভর্ ভর্ করে মদের গন্ধ বেরুত। প্রথম ২।৩ বছর এই ভাবেই যায়–তারপর বাবা যে Electric Companyতে কাজ কর্ত্তেন, সে কাজটাও গেল। সেই থেকে মদের টাকাও বন্ধ হয়ে গেল। আমার কাছ থেকে মদের টাকা চাইতেন, আমি না দিতে পারলে আমাকে ভয়ানক মারতেন। যেদিন কিছু দিতে পারতুম, সেদিন কিছু বলতেন না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে চুপ করিল, তাহার চক্ষে অশ্রুবিন্দু টল্‌টল্ করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল "বাবার চাকরী যেতে আমি একজনকে উলের কাজ শেখাতুম, তার কাছে যে ২০৲ টাকা পেতাম তাইতেই কোনও রকমে সংসার চালাতুম। যেদিন আমাকে খুব মারতেন, সেদিন হয় ত' যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে চার পাঁচ টাকা দিতুম, যেদিন দিতে পারতুম না, সেদিন আমার অবস্থা যা হত——উঃ ! তার কথা আর কি বল্‌বো তোমায় ? শুধু কি তাই ? যেদিন বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হ'ত সেদিন আমায় কি মারই মারতেন।"

তারপর রুদ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল—"এই দেখনা কাল বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল ব'লে আমায় কি রকম মেরেছে" এই বলিয়া সে তাহার পায়ের মোজা খানিক উন্মোচন করিল।

রবি এতক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এইবার সে লুসির হাতখানা ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তাহ'লে আমার জন্যেই তুমি কাল মার খেয়েছ—আমায় ক্ষমা কর।"

লুসি তাহার হাত না ছাড়াইয়া লইয়াই তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল "তোমার জন্য ত' আমি মার খাইনি, তোমার জন্যই বরং আমি কাল বেঁচে গেছি—কিন্তু তোমার জন্য যদি মার খেতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত।'

কিঞ্চিৎ পরে আবার রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল "আমি গরীব ব'লে আমার সঙ্গে কেউ মেশে না, কেউ আমার কাছে আসে না, কেউ দুটো কথা কয় না ভগবানকে ধন্যবাদ, যে তিনি তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।" এই বলিয়া সে অকস্মাৎ রবির হাত দুখানা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"কিন্তু তুমিও যেন আমায় ছেড়ে যেয়ো না, তাহ'লে আমার আর কেউ থাকবে না, বড়ই কষ্ট হবে আমার তাহ'লে—বল – বল, আমায় ছেড়ে যাবে না।" এই বলিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে রবির মুখের দিকে চাহিয়া কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রবি এমুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইল, তারপর—"না তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।" এই বলিয়া লুসির ওষ্ঠদ্বয় হইতে তাহার প্রণয়ের প্রথম পুষ্প চয়ন করিয়া লইল।

লুসি কিছু না বলিয়া তাহার অবশ মস্তকটি রবির স্কন্ধের উপর স্থাপন করিল।

অল্পক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া সে রবিকে প্রশ্ন করিল—"কাল একবার আমার বাড়ী যাবে ? বাবা কাল রাত্রে বাড়ী থাক্‌বে না ; যাবে ? সন্ধ্যার সময়ে ?"

রবি উত্তর দিল "যাব"—তারপর তাহাকে আরও একটু

নিকটে টানিয়া লইয়া তাহার হাতটি নিজের মুঠার ভিতর লইয়া বলিল—"কিন্তু কাল তোমার জন্ম আমি একটা জিনিষ নিয়ে যাব—নিতেই হবে।"

লুসি বিহ্বলভাবে উত্তর দিল—তোমার দান আমি অবহেলা করতে পারব না।" কিন্তু তুমি যেয়ো……নং বাড়ী।

(৩)

রবির এ সংসারে আপনার বলিতে এক বৃদ্ধ পিতা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। পিতা কাঞ্চনপুরের জমিদার। গ্রামের স্কুলে Matriculation পাশ করিবার পর যখন রবি কলিকাতায় I. A. পড়িবার জন্ম নাছোড় বান্দা হইয়া বসিল, তখন যতীনবাবু বাধ্য হইয়া একমাত্র নয়নের মণিকে বহুকালের এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং মাসিক ২৫০৲ টাকার বন্দোবস্ত করিলেন। সে প্রায় আজ চার বৎসরের কথা।

চতুর্থ বৎসরের কথা।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে লুসীর বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে সে দোকান হইতে একখানি মূল্যবান সাড়ী কিনিয়া লইল।

লুসীর বাড়ীর ঠিকানা মিলাইয়া যখন সে তালতলায় তাহার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বাস্তবিকই সে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না, যে এ বাড়ীতে কি করিয়া মনুষ্য বাস করিতে পারে। একটা অতি জীর্ণ, বোধ করি দেড়শত বৎসরের পুরাতন বাড়ী! হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন ভূতের বাড়ী! বাড়ীর সমস্ত চুণকাম খসিয়া গিয়াছে, এবং দেওয়াল হইতে নানারূপ গাছ আত্মপ্রকাশ করিয়া বাড়ীর সৌন্দর্য্য আরও একটু বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

চারিদিকে আর একবার উত্তমরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া রবি একটি খোলা জানালার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। লুসী তখন একটি মোড়ার উপর বসিয়া নিবিষ্ট মনে কি চিন্তা করিতেছিল—বোধ হয় তাহার কথাই ভাবিতেছিল। দূর হইতে তাহার শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তিটি রবির বড়ই ভাল লাগিল।…

"লুসী।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে লুসীর সমস্ত মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে দৌড়াইয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

রবি গৃহের ভিতর পা বাড়াইতে না বাড়াইতেই লুসী তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া পূর্ব্বদিনকার দেনার শোধ তুলিয়া লইল।

রবি একটু হাসিয়া কহিল "এই দেখ তোমার জন্ম কি এনেছি।"

কাপড়খানি দেখিয়া লুসী রবির হাত দু'খানা ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল "বেশ ত' তোমাদের সাড়ী! দাম কত?"

"আশী টাকা।"

মূল্য শুনিয়া লুসীর মুখ একেবারে রক্তশূন্য হইয়া গেল, কহিল "আ—শী টা—কা" কিঞ্চিৎ পরে কাতরকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "কেন তুমি আমার জন্ম এত টাকা খরচ করলে?"

রবি সস্নেহে লুসীর মস্তকটি নিজের বুকের উপর রাখিয়া কহিল "কেন করলুম তা কি জান না লুসী!"

লুসী চক্ষু বুজিয়া নিস্পন্দের ন্যায় সেইভাবেই পড়িয়া রহিল। রবি তাহার মস্তকের ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালনা করিতে করিতে বলিল "ঐ কাপড়টা তুমি এক্ষুণি পরে এস, যাও লক্ষ্মীটি, দেখি কেমন মানায়।"

লুসী কাপড় লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

রবি তাহার নিকটস্থিত টেবিল হইতে ডায়েরী লইয়া দেখিল, লুসী গতকল্যকার ঘটনাটি যত্নের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তাহার ওষ্ঠের কোণে একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লুসী কোনও রকমে সাড়ীখানি জড়াইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

রবি তাহার দিকে ফিরিয়াই বলিয়া উঠিল "কি সুন্দর দেখতে হয়েছে তোমায়!"

লজ্জিতভাবে লুসী কহিল "তুমি মিছে কথা বলছ, আমায় বুঝি সুন্দর দেখতে?"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই দ্বারের নিকট কাহার পদশব্দ হইল। লুসী সেইদিকে চাহিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল "বাবা।"

একটি বৃদ্ধ টলিতে টলিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল ; রবির দিকে কিয়ৎক্ষণ রক্তচক্ষে চাহিয়া থাকিয়া জড়িতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল "কে—এ, তু- উ—মি- ই ?"

রবির নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া বৃদ্ধটি লুসীর নিকট যাইয়া প্রশ্ন করিল "কে ও লোকটা ?"

লুসীকেও নীরব দেখিয়া বৃদ্ধ তাহার হাতখানি ধরিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল "বল্ ও লোকটা কে ? আর তুই এ সাড়ীই বা পেলি কোথা থেকে ? তবে না তোর কাছে টাকা নেই ?" এই বলিয়া সে এরূপ ভাবে লুসীর গলা চাপিয়া ধরিল—যে, সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

রবি ক্ষিপ্রহস্তে যাইয়া লুসীর পিতাকে সরাইয়া দিল। তাহার সে ধাক্কা বৃদ্ধ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল এবং একটি অকথ্য ভাষা উচ্চারণ করিয়া Revolber ছুড়িল।

একটি অস্ফুট ধ্বনি রবির মুখ দিয়া বাহির হইল মাত্র আর কিছু না—

লুসী "পুলিস", "পুলিস" করিয়া রবির দিকে অগ্রসর হইবামাত্রই বৃদ্ধ জড়িতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল Sh—u—t u—p এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই "দুড়ুম" "দুড়ুম" করিয়া শব্দ হইল এবং লুসীর মৃতদেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

* * * *

পিস্তলের শব্দ শুনিতে পাইয়া পুলিশ এবং কয়েকজন লোক গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল যে, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় লুসীর মৃতদেহের পার্শ্বে আর একজন যুবকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে, এবং তাহাদেরই পার্শ্বে বসিয়া এক বুড়া মাতাল তাহাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর-ই-এস্‌]

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত-পাঠকগণ অবগত আছেন যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর স্বদেশবাসীর নিকট সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়া মধুসূদন ২৪ বৎসর বয়সে (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে) মাদ্রাজে নূতন কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া তথায় গমন করেন। এই স্থানে কয়েক বৎসর তাঁহাকে ভীষণ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে বাস করিতে হয়। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য তিনি এই সময়ে Madras Circular and General Chronicle, Athæneum এবং Madras Spectator নামক সাময়িক পত্রে ইংরাজী প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে এবং য়ুরোপীয় অনাথ বালক বালিকাদের আশ্রম সংশ্লিষ্ট বালকবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। শিক্ষকতা কালে আশ্রম সংশ্লিষ্ট বালিকা বিদ্যালয়ের অন্যতমা ছাত্রী রেবেকা ম্যাক্‌টাভিসের সহিত মাইকেলের পরিচয় হয়, এবং রেবেকার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া মাইকেল তাঁহার পাণিপ্রার্থী হ'ন। রেবেকার ধর্ম্মপিতা মাদ্রাজের তাৎকালিক অ্যাডভোকেট জেনারাল জর্জ্জ নর্টন মাইকেলের গুণপক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় নির্ব্বিঘ্নে মাইকেল ও রেবেকার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তখনও কবি "মাতৃকোষে রতনের রাজি"র সন্ধান পান নাই, "পরধন লোভে মত্ত" কবি বিদেশীয় ভাষায় বিদেশীয় ভঙ্গীতে তাঁহার কাব্য রচনা করিতেছিলেন। তাঁহার দুই সর্গে সম্পূর্ণ প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ক্যাপটিভ্ লেডি' ইংরাজী ভাষাতে লিখিত হয় এবং 'Madras Circular and General Chronicle'এ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে অ্যাডভার্টাইজার প্রেসে মুদ্রিত হইয়া 'Visions of the Past' নামক একটি অসম্পূর্ণ কাব্যের সহিত 'ক্যাপটিভ্ লেডি' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি গুণগ্রাহী জর্জ্জ নর্টনের নামে উৎসৃষ্ট হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে রেবেকাকে উদ্দেশ করিয়া কবি যাহা লিখিয়াছিলেন একনিষ্ঠ প্রেম সহকারে যদি তিনি জীবনে সেই ভাবকে স্থায়ী করিয়া রাখিতে পারিতেন তাহা হইলে মধুসূদনের জীবন যথার্থই মধুময় হইত, অশান্তির দুর্ব্বিসহ জ্বালায় তাঁহাকে জ্বলিয়া মরিতে হইত না।

'ক্যাপটিভ লেডি'র বর্ণনীয় বিষয় রাজকুমারী সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের সর্ব্বজনবিদিত প্রণয় কাহিনী। কবিজনোচিত স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া মাইকেল এই কাব্যের সর্ব্বত্র ইতিহাসের অনুসরণ করে নাই। তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"যে মূল ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তকের আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে, তাহা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পরিচিত। বোধ হয় কোন কোন য়ুরোপীয় লেখকও উহার উল্লেখ করিয়াছেন। গিজ্‌নির অধিপতি মামুদের ভারত আক্রমণের কিছুকাল পূর্ব্বে কনোজের রাজা 'রাজসূয় যজ্ঞে'র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমি উহা এই গ্রন্থে 'বিজয়োৎসব' নামে অভিহিত করিয়াছি। তৎসময়ের রাজাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই কনোজের রাজার পরাক্রম প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া উক্ত যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেবল দিল্লীর রাজা উপস্থিত হ'ন নাই। তিনি ব্যাসবিরচিত সুবিখ্যাত মহাভারতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ পাণ্ডব বীরগণের সাক্ষাৎ বংশধর। সুতরাং তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া কণোজের রাজাকে মানিয়া লইতে অসম্মত হ'ন। এরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অর্থই এই যে যজ্ঞানুষ্ঠাতা আপনাকে সমগ্র দেশের একাধিপতি বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন। কিন্তু বংশপরম্পরাগত প্রথানুসারে এরূপ সম্মান পাণ্ডবকুলেরই প্রাপ্য। কনোজের রাজা দিল্লীর রাজার এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানে ক্রোধ পরবশ হইয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার একটি স্বর্ণময় মূর্ত্তি গঠিত করাইয়া যজ্ঞস্থলে স্থাপিত

করেন। উৎসবের শেষ দিনে, দিল্লীর রাজা কতিপয় সুনির্ব্বাচিত অনুচর সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেন এবং উক্ত স্বর্ণময় মূর্ত্তিটি অপহরণ করেন। কেহ কেহ বলেন তিনি উক্ত মূর্ত্তির সহিত কনোজের এক রাজকন্যাকেও অপহরণ করেন। কারণ তিনি পূর্ব্বে উক্ত রাজকন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ বংশ-পরম্পরাগত অধিকার সকল বিসর্জ্জন দিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, বিফল মনোরথ হ'ন। যাহা হউক, রাজকন্যাকে তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া এক বিজন দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, পাছে এই দুর্দ্দান্ত প্রণয়াভিলাষী রাজকন্যার সন্ধান জানিতে পারেন। কিন্তু অবশেষে তিনিই 'ভাট' বা গায়ক বেশে আসিয়া রাজকন্যাকে অবরোধ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। কনোজের রাজা এ অপমান কখনও বিস্মৃত হইতে বা ক্ষমা করিতে পারেন নাই, এবং যখন মামুদ আসিয়া দিল্লী আক্রমণ করেন, তখন অতি কঠোরতার সহিত জামাতাকে শত্রু-নিরাকরণে সহায়তা করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনিও সেই শত্রু দ্বারা বিজিত ও বিধ্বস্ত হ'ন। আমি গল্পটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। নায়িকাকে 'বিজয়োৎসবে'র পূর্ব্বেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছি।

এই কবিতায় যে সকল ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া আশঙ্কা করি। ইহা প্রথমতঃ "The Madras Circular and General Chronicle" নামক স্থানীয় পত্রের জন্য অতি দ্রুত লিখিত হয়। যে অবস্থায় ইহা রচিত হয়, সে অবস্থায় বাস্তব জীবনের কঠোরতর ব্যাপারগুলি হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করা সাধারণ আয়াস সাধ্য ছিল না। অভাব ও দারিদ্র্য ও তাহার আনুসঙ্গিক অসংখ্য বিপদের উৎপীড়নে প্রতিভার স্ফূর্ত্তি অসম্ভব।"

'ক্যাপটিভ্ লেডি' বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় রচিত কাব্য সমূহের মধ্যে অতি উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। 'এথিনিয়ম' পত্রের একজন ইংরাজ সমালোচক মাইকেলের কাব্যের কোনও কোনও অংশ বায়রণ ও স্কটের লেখনীর অনুপযুক্ত নহে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের একজন সমালোচক বাঙ্গালার অন্যান্য লেখকগণের সহিত তুলনায় মাইকেলকে রচনা কৌশল এবং ছন্দোমাধুরীর জন্য উচ্চ আসন প্রদান করিয়া-ছিলেন। ইংরাজীতে সুলেখক মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র ইংরাজী সাহিত্য ক্ষেত্রে কবিযশঃপ্রার্থী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মাইকেলকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন—'ক্যাপটিভ লেডি' দারিদ্র্য ও অভাবের অন্ধকার হইতে উদ্ভূত মেরুর উষালোকের সহিত তুলনীয়।" 'ক্যাপটিভ লেডি' ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইলেও উহার বিষয় এতদ্দেশীয় এবং উহার স্থানে স্থানে 'মেঘনাদ বধ' এবং 'ব্রজাঙ্গনা'র ভবিষ্যৎ কবির আবির্ভাবের সূচনা পরিদৃষ্ট হয় এবং উহার কোন কোন স্থলের ভাব বার বৎসর পরে প্রকাশিত 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' অবিকল সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্য গ্রন্থখানি এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য। অতি অল্প ব্যক্তিই উহা পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। বিশেষতঃ ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠকগণ মহাকবি মধুসূদনের এই প্রথম কাব্য গ্রন্থখানির কোনও পরিচয়ই পান নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে মধুসূদনের কাব্যের পরমানুরাগী আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে উক্ত কাব্য গ্রন্থখানির ভাব, রস ও সুরের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাব্যখানি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করা সম্ভব কি না। উত্তরে, তিনি অত্যল্প কালের মধ্যে উহার একটি অনুবাদ করিয়া দেন। আমার পক্ষে এই অনুবাদের গুণকীর্ত্তন করা সঙ্গত নহে, কিন্তু আমি উহা পাঠ করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি, বাঙ্গালার পাঠক সাধারণকে সেই আনন্দের অংশী না করিলে আমাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে বলিয়া মনে করি। সেইজন্য 'সচিত্র শিশিরে'র সাহায্যে এই অনুবাদটি প্রকাশিত করিতেছি। যে সকল কৌতূহলী পাঠক মূলের সহিত মিলাইয়া উহা পাঠ করিবেন, আমার বিশ্বাস তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন অনুবাদের ভাব ও ছন্দ কতদূর মূলানুযায়ী হইয়াছে।

এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ রচনা কালে কবিবরের বাণী বহু রত্নখচিত মহামূল্য অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে দশদিক্ উদ্ভাসিত

করিয়া সভাস্থলে দণ্ডায়মানা হইয়া অপূর্ব্ব রূপগরিমা প্রকাশ করিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু কিশোরবয়স্কা স্বল্পাভরণা লজ্জাবনতা স্বভাবসুন্দরীর ন্যায় নিজ নৈসর্গিকী শোভায় অধিকতর চিত্তহারিণী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কেবল বিদেশী পরিচ্ছদে আবৃত থাকায় তাঁহাকে দেশবাসিগণ আদর করিবার অবকাশ পান নাই। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা কখনই পূরণ হইবে না। তথাপি আশা করি, এই অনুবাদ হইতে পাঠকগণ কল্পনাবলে তাঁহার প্রকৃত রূপের ছায়াময় আভাস দেখিতে পাইবেন। প্রায়ই দেখা যায়, কবির প্রতিভা অপরিস্ফুট অবস্থায় যে সৌরভের সম্বাদ প্রদান করে, তাহা পূর্ণ বিকাশ কালে অন্যরূপে বিবর্ত্তিত হয়, এবং বহুদূর ব্যাপী হইলেও সেই সৌরভের মাদকতা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হয়। সেইজন্য আমার মনে হয়, মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ কাব্যানুরাগী মহোদয়গণের নিকট যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইবে এবং কবিবরের পরিণত বয়সের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহা হইতেও তাঁহার স্বদেশবাসিগণ—

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

অবরুদ্ধা *

[শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ]

উপক্রমণিকা

১

এস কান্তে! বীণার ঝঙ্কার শুন মম, মৃদুতর তানে
তুলিয়া লহরী যাহা, প্রিয়ে, তোমাতরে মরে মূর্চ্ছনায়;
কোমল নয়ন দুটি তব নিরখিয়া উঠে মম প্রাণে,
কল্পনার কিরণে রঞ্জিত যে সকল ভাব স্বপ্নপ্রায়,
তাই গাঁথি অর্পিব তোমারে, প্রেম অর্ঘ্য সৌন্দর্য্যের পায়!

২

ওই দুটী নয়ন আগারে, কি অমূল্য রতনের রাশি
সঞ্চিত রেখেছে প্রেম, আহা, কি কোমল-দীপ্তি-সমুজ্জ্বল;
কি মধুর তব হাসি! মনে হয় যেন কোন স্বর্গবাসী
চেয়ে আছে কুতূহলে, নেত্র বিস্ফারিয়া করুণা-কোমল,
অথবা স্বপনদৃষ্ট তারা-অধিবাসী, পবিত্র-নির্ম্মল!

৩

নিরজনে হৃদয় আমার চাহে সদা খুলিতে দুয়ার,
অবাধে ছুটাতে ভাবনার শত ধারা, দুঃখ শোক ভরা,
কিন্তু তুমি থাকিলে নিকটে, দুঃখ শোক হয় অপসার;
তোমার উজ্জ্বল হাসি দেখি' হই আমি যেন আত্মহারা;
হ'য়ে থাকি আনন্দে বিভোর, হাস্যময়ী দেখি বসুন্ধরা!

৪

শৈশবের আবাস আমার—দূরে—অতি দূরে অবস্থিত;
শৈশবের আশা একে একে পলায়িত সবে, কিছু নাই;
রেখে গেছে শুধু অশ্রুজল; বন্ধুগণ কোথায় প্রস্থিত?
জানে শুধু স্মৃতি ও স্বপন—নিদ্রা মাঝে সদা যার ঠাঁই,
দুই দূত, অতীত! তোমার, চিরদিন আমার আদৃত!

৫

কিন্তু কেন আর বৃথা ফেলি অশ্রুজল, স্মরি পূর্ব্বকথা?
কাঁদিতাম যথা অলক্ষিতে, সংসারের মত্ত কোলাহলে,
সাথী-হারা ফিরিতাম যবে, স্মরিয়া আপন মর্ম্মব্যথা,
পরাণের বেদনা সাগর মথি' ভাসিতাম আঁখিজলে;
শান্তিময় স্বর্গ তব হাসি বরষিছে এবে মর্ম্মস্থলে!

৬

অসীম জলধিবক্ষে যথা, নাবিকের উদ্বিগ্ন নয়ন
আশার আলোকে দীপ্ত করে, ধ্রুবতারা গগনের ভালে
দেখাইয়া নিজ রূপ জ্যোতিঃ, ভয় তার করে পলায়ন;—
হেলায় চালায় পোত হেসে, উপেক্ষিয়া মহা উর্ম্মিজালে;
তেমনি ঢালিছ তুমি জ্যোতিঃ আমার এ চিত্তে অয়ি বালে!

* মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'ক্যাপটিভ লেডি' নামক ইংরাজী কাব্য হইতে ভাবান্তরিত ও অনুবাদক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
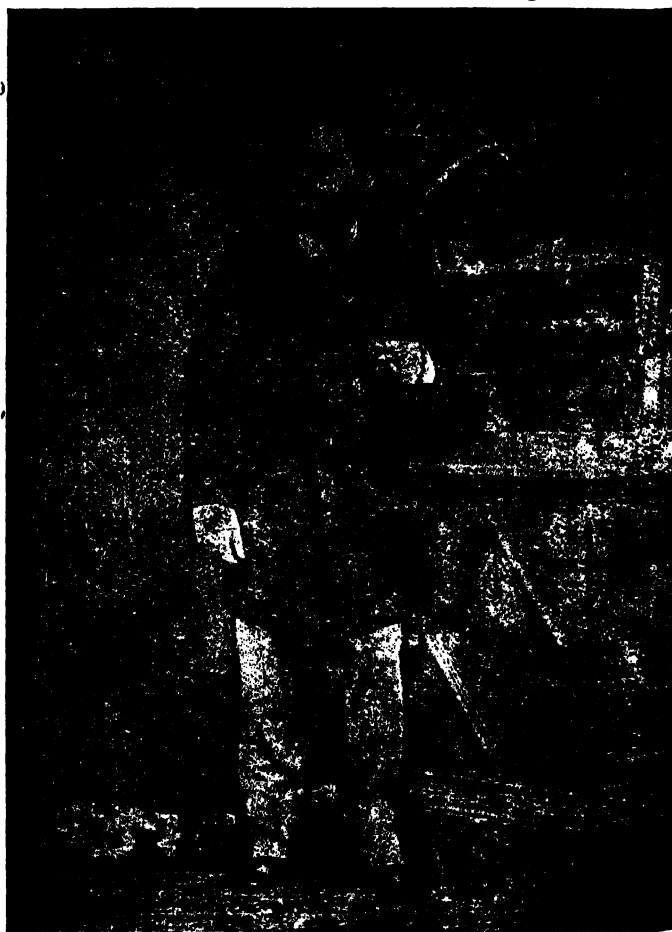
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
—প্যারিসে

৭

বাণীর চরণ ছায়া যবে পূর্ণ করে কবি-চিত্ত-ভূমি,—
মধুর সঙ্গীতে তার হ'য়ে আনন্দিত,—আলোকে উদ্ভাসি
চারি দিক্,—কি সুন্দর সেই আলো! তেমনি সুন্দর তুমি;
হে সুন্দরি! আমার এ দীন গৃহে থাক চির তম নাশি;—
দৈন্যে নাহি ডরি, তুমি মোর মহামূল্য রতনের রাশি!

৮

কত মনোরম স্বপ্ন শোভে এই জীবনের রঙ্গালয়;—
মরুভূমি রবিকরে হয় আলোকিত; কিন্তু প্রেম সম
কোমল উজ্জ্বল আর আছে কি সংসারে স্বপ্ন মধুময়?—
জুড়ায় নয়ন যার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ—তুমি সেই স্বপ্ন মম;
অয়ি প্রাণাধিকে! ঢাল হৃদে মম নিত্য হর্ষ অনুপম!

৯

কৈশোরের কাহিনী আমার দুঃখভরা শুষ্ক মরু প্রায়;—
স্মৃতি তার তিক্ত অতি; তবু নাহি এবে তার তরে খেদ;
তরুশাখা হতে যবে মধু সমীরণ মুছে লয়ে যায়
শুষ্ক পত্রগুলি সব, আসি অকস্মাৎ, করিয়া উচ্ছেদ
নব শ্যাম কিসলয়, করে কি সে তরু কাতর নির্বেদ?

১০

এস তবে, প্রিয়ে! শুন মম বল্লকীঝঙ্কার সহ গীত,—
জনম ভূমির মম অতি পুরাতন ইতিহাস কথা;
কেমনে প্রথমে সেই আর, রাক্ষস সদৃশ দুর্বিনীত
সহসা সে স্বর্ণদেশে আসি উতরিল, ধূমকেতু যথা,
মহামূল্য রত্নরাজি নিল হরি, পায়ে বিদলিয়া প্রথা!

১১

সংসারের কুটিল ভ্রূকুটি বিশুষ্ক করুক মম হিয়া,—
পাতিয়াছি যথা চিরতরে তোমারে পূজিতে সিংহাসন,—
তুমি তথা বসি' প্রেমপূত হাসির শিশির বরষিয়া,
রবিতাপে শুষ্ক পুষ্প সম ম্রিয়মাণ আমার এ মনঃ
পুনরায় কর উজ্জীবিত, সর্ব্ব অবসাদ বিনাশিয়া!

———

অবরুদ্ধা

প্রথম সর্গ

অম্বরে উদিতা সাঁঝের তারা
কাঁপি ঢালে ম্লান কিরণ ধারা
একাকিনী সে যে গগন তলে,
অসীম অনন্ত শূন্য মণ্ডলে।
কুমারী সুলভ ত্রাসে কি হিয়া,
কাঁপিছে তাহার থাকি' থাকিয়া?
এখনি-আসিবে সঙ্গিনী দল,
নয়নে উজলি' আকাশ তল;
এখনি উদিবে রোহিণীপতি,
ছড়ায়ে মধুর রজত ভাতি,—
ভূলোকে দ্যুলোকে জোছনা রাতি।

পত্রে পুষ্পে ঝরে শিশির চয়,
লতা কুঞ্জে মৃদু সমীর বয়;
রতন খচিত মুকুট ধারী,
চরিছে চৌদিকে খদ্যোত সারি;—
যেন পাখাযুত তারকাচয়,
ঘন হিমাচ্ছন্ন গগন গায়;
প্রতি বৃক্ষ পত্র করেছে আলা
খুলিয়া দিয়াছে রূপের ডালা।
স্ফীত নদী বক্ষে পড়েছে আলো,
কত তারা সেথা শেজ বিছালো;
কি মধুর গীত শ্রবণে পশে,
যেন শুনিতেছি স্বপন বশে;
অদূরে রজত আসনে বসি,
গুণ্ঠনে আবরি' বদনশশী,
বিষাদ মলিনা নমিতাননী,
নীরবে কাঁদিছে কমল রাণী;—
হিমকর কর তারে কি সয়?
সতত রবির ধ্যানে সে রয়;
বিরহিণী ব্রত করিয়া সার,
অপর কিছুর ধারে না ধার;

চাহিয়া না দেখে গগন পানে,
কেন সে হাসিছে নাহক জানে ;
উচ্চতা নীলিমা বিস্তার তার,
নয়নে তাহার পড়ে না আর ;
নাহি তুলে আঁখি হেরিতে তারা,—
কাঁপে যে প্রেমিক-হৃদয় পারা ;—
মলয়ের মৃদু পরশ হাসি,
না পারে ঘুচাতে বিষাদ রাশি ;—
বৃথা সে নাচায় উরমিমালা,
নাহি জাগে তাহে কমলবালা !

ওই যে ভীষণ পাষাণ স্তূপ,
সুদূরে দেখায় বিকট রূপ ;—
অভ্রভেদী তার গৃহনিচয়,
নিস্তব্ধ নির্জ্জন আঁধারময় ;
হরিয়াছে বুঝি চাঁদের হাসি,
তাই ম্লান সেথা জ্যোছনা রাশি ।

সাধে কি শশাঙ্ক হরষ-হারা ?
সাধে কি সমীর কাঁদিয়া সারা ?
হোথা যে দুখের বিলাপ-ঘর,
শোকের নিভৃত নিশি-জাগর ;
ওযে পীড়কের কঠিন কারা,
অন্ধকারময় কবর পারা ;
উহার ভিতরে যে জন যায়,
আলোর স্মৃতিও ক্রমে হারায় ।

তথাপি শশাঙ্ক প্রাসাদ শিরে,
মলিন জ্যোছনা ঢালিছে ধীরে ;—
যথা কোন জন করুণাবশে,
শোক বিহ্বলের ভবনে পশে,—
যদিও না পারে সান্ত্বনা দিতে,
তবু চাহে তার সাথে কাঁদিতে ;—
দেখাইতে শুধু সমবেদনা,
হরিতে নারিয়া দুখের কণা ।

থাক' ক্ষণকাল, হে নিশামণি !
একটি সুখের স্বপন আনি',
দেহ একাকিনী বালিকাটিরে,
যে ভাসিছে হোথা নয়ন-নীরে ;—
কারা-কবরের তিমির ছায়ে,
তব অনুরূপ রূপ লুকায়ে ;
বসি' আছে তথা একা যুবতি,
নৈরাশ্য-নীরব দুখ-মুরতি ;
আঁধারে রূপের প্রদীপ জ্বলে ,
ফোটে যেন ফুল সমাধিতলে ;
দুখের জীবন মেঘের গায়,
ক্ষণিক সুখের স্বপন প্রায় ;
অতীত উদ্ঘাটি' সহসা, হায়,
ক্ষণপ্রভা যেন চমকি' ধায় !

শৈলময় দ্বীপ নির্জ্জন অতি,
কঠোর তথায় প্রকৃতি রীতি ;—
ভীষণ ভ্রুকুটি, নাহক হাসি,
শুষ্ক মরু শুধু আনন্দ-নাশী ;
নয়ন জুড়াতে কিছুই নাই,
ওই দুর্গ মাত্র আছে সদাই,
উচ্চশিরঃ গর্ব্বে করি উন্নত,
নির্ব্বাক্ উদ্ধত জনের মত ।

পাগলের মত নদী তথায়,
উদ্দাম গতিতে বহিয়া যায় ;—
মৃদু সমীরণ, আলোক ধারা,
চাহে না, ছুটে সে আপনহারা ;
দোষ কি তাহার ? এমন কূল—
পাষাণ কঠোর নয়ন-শূল—
কভু কি কোথাও দেখেছে কেহ,
প্রসারিতে মুখ ক্ষালন ছলে,
গর্জ্জননিরত স্রোতের জলে,
কলুষি' গঙ্গার পবিত্র দেহ ?

মৃদু সমীরণ কভু না তথা'
জুড়ায় স্রোতের মরম-ব্যথা ;
গর্জ্জন শুনিয়া তরাসে সারা,
ছুটিয়া পলায় সাহস-হারা ;—
সে যে শুধু গায় ফুলের কানে,
শিশিরাশ্রু তার হরিতে গানে ;—
তারা নাহি নীরে শেজ বিছায়,
উর্ম্মিঘাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় !

"রজনী আইল, হায়, চন্দ্রমার হাসি,
কিছুমাত্র ভাল নাহি লাগে মোর কাছে ;—
সে হাসি দেখায় শুধু আবরণ নাশি'
কি বিকট দৃশ্যাবলী এই দ্বীপে আছে।

মরু মাঝে বন্দী সম আমাদের দশা,—
অলস পড়িয়া আছে আয়ুধ সকল ;
কোথা রণে মৃত্যু কিম্বা বিজয়ের আশা ?
হা হুতাশ হেথা শুধু মোদের সম্বল।

আনন্দ-উৎসব কোথা চিন্তা-বিনাশন,
নিশীথে প্রেমের গীত বাতায়ন তলে ;
রমণীর চুপি চুপি আসা, পলায়ন,
অল ক্ষতে পুষ্প বৃষ্টি প্রেম-চিহ্ন ছলে ?

বলেছ তোমরা মোরে ও বন্দিনী বালা,
উজ্জ্বল করিত হেসে রাজ সিংহাসন ;
উচ্চ নৃপ-বংশের সে শিরোরত্নমালা
রাজপুরী হ'তে হেথা হ'ল নির্ব্বাসন ;—

ভাল বেসে এক দৃপ্ত বীর পুরুষেরে ;—
উচ্চকুলোদ্ভব যুবা জলন্ত কৃশানু ;
স্বীকার না করিল সে লভিবারে তারে,
বশ্যতা পিতার তার নত করি জানু।

বালার বৃত্তান্ত শুনি' বড়ই কাতর
হইলাম মনে, আহা কি অদৃষ্ট তার !
কাঁদিতেছে অবিরত, নিরাশ অন্তর,
দীপ্তিহীন করি দুটি নেত্র গণ্ড আর।

কিন্তু আমি ভাবি কেন এত যোদ্ধা বীর
বন্দী সম রহে এই আঁধার ভবনে ?
কেন বা আরোহি' অশ্বে, সাহায্যে অসির
দলিবারে নাহি যায় দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জনে ?
রক্ষিতে দুর্ব্বলে মাতি শত্রু সহ রণে।

শুনিতেছি বহুদূর পশ্চিম হইতে,
সমর প্রবাহ অতি ভীষণ আকারে,
আসিতেছে বন্যা সম এদেশ গ্রাসিতে,—
যবন দলিছে পদে হিন্দু-দেবতারে।

আমরা কি ভীরু সম রহিব বসিয়া,
বীরের উচিত ধর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন,
মলিন শশাঙ্ক পানে রহিব চাহিয়া,
না করিব রণক্ষেত্রে যশ উপার্জ্জন ?

ম্লান বুঝি নিশা দেখে' এদেশের দশা,
স্বাধীনতা পায় দেখি' লোপ চিরতরে ;
অথবা বীরের চিতা হেরিয়া বিবশা,
শোণিতাক্ত দেহ যার জলে ধূ ধূ করে' !"

থামিল যুবক বীর এত কথা বলে',
চাহিল ফিরিয়া যথা তার সঙ্গিগণ,
বসিয়া আছিল দুর্গ-প্রাচীরের তলে
চন্দ্রালোকে, সুগভীর চিন্তায় মগন।

কারাবদ্ধ যোদ্ধা যথা, হেরিয়া কৃপাণ
কলঙ্ক-মলিন তার পড়ে' অনাদৃত,
অন্তরে জ্বলিতে থাকে রোষরুদ্ধ প্রাণ,
তেমান জ্বলিছে আজ তাহাদের চিত।

যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে তারা এ বিজন দ্বীপে,
দুর্গপ্রহরীর কাজে হয়েছে প্রেরিত ;
এ কাজ বিরক্তিকর তাদের সমীপে,
সাগরোর্ম্মি সম যারা উদ্দাম-চরিত।

"কহ কি কারণে তব বিষণ্ণ বদন,—
বন্দিনীর দুখ শুনি এত কি বেদনা ?
অথবা পাষাণময় এ দ্বীপ বিজন,
চুরি করিয়াছে তব হর্ষ-উন্মাদনা ?

উঠ হে গায়কবর, তুলে' লও বীণ,—
বহুক্ষণ পড়ে আছে, নিদ্রায় অলস,—
জাগাও সুরের ঢেউ, সঙ্গীত-প্রবীণ !
সিঞ্চহ মোদের কাণে অমৃতের রস।

সত্য বটে, নাহি হেথা উৎসব আস্থান,
নাহি হেথা রমণীর উদ্দীপ্ত নয়ন,—
উজ্জ্বলিতে সভা, যবে গায়কের গান,
বর্ণয়ে মিলন আর বিরহ-শয়ন ;—

তথাপি আমরা বসি' নদীর সৈকতে,
যেখানে চন্দ্রিকালোক হয়েছে পতিত,
বীণাধ্বনি সহ তব মধুর সঙ্গীতে,
শীতল করিব প্রাণ, হব পুলকিত ;

জলের গর্জ্জন আর গীত-প্রতিধ্বনি,
মিশিয়া পশিবে কাণে অতীব সুন্দর,
ঊর্ম্মি-অঙ্গে পড়ি রঙ্গে জ্যোছনা রঙ্গিনী,
আলিঙ্গিত সঙ্কুচিত হবে নিরন্তর।"

উঠিল সে,—কিন্তু কে সে ?—"শুন তবে বলি ;
গায়ক সে, পথে পথে গান গাহি ফিরে,
মুগ্ধ করি শ্রোতৃগণে, দূরে যায় চলি,
সমান আদরে তোষি' দরিদ্র ধনীরে।

এই দুর্গদ্বার যবে হ'ল উদ্ঘাটিত,
লইতে ভিতরে ওই রাজকুমারীরে,
তখনি আসিল ভাসি,' তটিনীর স্ফীত
বক্ষোপরি, গায়কের তরীখানি ধীরে।

কি সুন্দর তরী, আহা, কি সুন্দর গীত,—
স্বপ্নশ্রুত গীতি সম কোমল মধুর,—
অনিল আনিল এই দ্বীপে আচম্বিত ;
দর্শনে শ্রবণে হ'ল বিস্ময় প্রচুর।

ক্ষণেক তটিনী, স্নাতা মৃদু জ্যোছনায়,
শুনিয়া সে গীত হ'ল হাসিরাশি ভরা ;
বারির গর্জ্জন ক্ষণ শুনা নাহি যায়,
নিস্তব্ধ হইল নদী, যেন আত্মহারা !

ডাকিনু গায়কে মোরা, আসিল সে হেসে,
হইল মোদের প্রিয়, রহিল এ দেশে।

কত কীর্ত্তিগাথা সে যে গাহে অপূরব,
কত যে অদ্ভুত গল্প আছে তার জানা ;
কি মোহন আহা তার বীণার সুরব,
কিবা বিচিত্রতাময়ী তাহার কল্পনা !

সুন্দর সঙ্গীত তার বড় ভালবাসে,
দুর্গের বন্দিনী বালা, জান আমি ভাল ;—
যখনি গাহে সে গান, বাতায়ন পাশে,
দেখা দেয় ম্লান দুটি নয়ন বিশাল।"

উঠিল গায়ক সেই, সাক্ষাৎ মদন,
ঝঙ্কারিল বীণা, তার করাগ্র কম্পনে ;
কি ধ্বনি উঠিল বাজি মরম-স্পন্দন,
শুনিয়া তাহার গীতি শ্রোতৃদের মনে !—

বিজয়োৎসব

"মণ্ডিত মণ্ডপ মাঝে, রত্ন সিংহাসন রাজে,
তাহে নরপতি সমাসীন ;
অতুল মহিমা তাঁর, বর্ণিবারে সাধ্য কার,
কত রাজা তাঁহার অধীন ;
তাঁহাকে বেষ্টন করি, বসে সবে সারি সারি,
নত জানু অবনত শির ;
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তাঁর, ধরামাঝে দুর্নিবার,
তাঁর তুল্য আছে কোন্ বীর ?

পদতলে ভরি সাজি, ধরার রতন রাজি,
আলোকে চমকে চারিধার;
উত্তর দক্ষিণ আর, পুরব পশ্চিম চার,
দিক্ হ'তে এল উপহার।
অধিকৃত সর্ব্বদেশ, রাজ্যের নাহিক শেষ,
ভূতলে সাগরে সর্ব্ব ঠাঁই,—
বিজয় কেতন উড়ে, সসাগরা ধরা জুড়ে,
এক ছত্র ছিদ্র কোথা নাই;—
হিমাবৃত হিমালয়, হ'তে দেশ সমুদয়,
যথা হয় সাগরে বিলীন;—
না ছাড়ি সে লঙ্কাদ্বীপ, জ্বালি যে রূপের দীপ,
রাজকন্যা সম সমাসীন;—
সাগর উরমি মাঝে, যেন স্বয়ম্বর সাজে,
পুষ্পমাল্যে আবরি শরীর;
ঘন ঘন শ্বাস বয়, দেয় তার পরিচয়,
গন্ধবহ সৌরভে অধীর।
রবিকরে স্বরঞ্জিত, উজ্জ্বল মেঘের মত,
অসংখ্য সৈনিক অস্ত্রধারী;
দাঁড়াইয়া ঝলমলে, মধ্যাহ্ন অম্বরতলে,
সুবেশে সজ্জিত সারি সারি;
সহস্র পতাকা দুলে, আকাশে মস্তক তুলে,
বিচিত্র বিহঙ্গ সারি প্রায়;
সহস্র বর্শার ফলা, রবিকরে করে খেলা,
দেখি' আঁখি ঝলসিয়া যায়;
যোদ্ধ্দের অশ্বচয়, গ্রীবা বক্র করি রয়,
হ্রেষারবে বধিরি' শ্রবণ;
রতনে ভূষিত কায়, করি-দল শোভা পায়,
গিরিসম গাম্ভীর্য্য-সদন;
উজ্জ্বল কবচধারী, রম্য বিমানবিহারী,
শোভে কত শত মহাবীর;
বহুদূর দেশান্তর, হতে যত নৃপবর,
উপস্থিত হেথা সশরীর;
এ মহা বিজয়োৎসবে, আসিয়া মিলেছে সবে,
উর্ব্বীতলে যত জাতি আছে;
মহান গৌরবময়, এ যে রাজসূয় হয়,
সর্ব্ব যজ্ঞ হীন এর কাছে।

চারিদিকে যথা, আঁখি ধায় তথা,
উৎসবের হেরি মেলা:—
চন্দ্রাতপ তলে, হেথা দলে দলে,
বামাগণ করে খেলা;
চারিদিকে ফুল, গোলাপ বকুল,
ছড়ায় সৌরভ ভার;
বামাদের গীত, করে পুলকিত,
ঢালিয়া সুস্বর ধার;
গাহিতেছে তারা, হয়ে আত্মহারা,
প্রেমের পুরাণ গান;—
বসন্ত সমীরে, যমুনার তীরে,
উঠিত কি কলতান;
নিশা আগমনে, খেলিত কেমনে,
কৃষ্ণ ল'য়ে নারী দল;
জ্যোছনা আলোকে, নাচিত পুলকে,
প্রণয় রসে বিহ্বল;
যমুনার জলে, কভু কুতূহলে,
ভাসায়ে সুখের তরি;
ফুঁ দিত বাঁশীতে, হাসিতে হাসিতে,
মরমের শ্বাস ভরি;
কি গান গাহিত, পরাণ মোহিত,
প্রেমের লহর তুলি';
শুনিয়া সে গান, যমুনা উজান,
বহিত স্ব-পথ ভুলি'।—
হোথা উচ্চৈঃস্বরে, যশোগান করে,
বন্দী মৃত বীরদের;—
কোন্ যুদ্ধে কত, কে বা হ'ল হত
তলে কার কৃপাণের;
কে করিল খর্ব্ব, নিশুম্ভের গর্ব্ব
সাগর উরমি সম;
স্বর্গ হ'তে যবে, তাড়ায়ে বাসবে,
হ'ল সে অতি দুর্দ্দম;

মাতা বসুন্ধরা, হয়ে ধৈর্য্যহারা,
দিল যবে তারে শাপ ;
ব্রহ্ম তেজঃ নাশি, বিষ্ণুরে কুভাষি,
ভরিল যখন পাপ ;—
কিরূপে তখন, ত্যজি সিংহাসন,
নামিলেন দুর্গা ধরা ;
কুমারীর বেশে, কাননেতে পশে,
কুসুম-চয়ন-পরা ;
বাতায়ন দিয়া, সেরূপ হেরিয়া,
নিশুম্ভ মোহিত অতি ;
অনুচরে কহে, ধরিবারে তাহে,
মদন-বিমূঢ়-মতি ;
সহসা তখন, বাধে মহা রণ,
হ'ল মহা শঙ্খধ্বনি ;
বাঘিনীর সমা, মহা তেজে বামা,
যুঝিল অরি-দলনী ;
নিশুম্ভের বংশ, সমূলে বিধ্বংস
অবনী হ'ল শীতল ;
জগৎ হাসিল, আনন্দে ভাসিল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।—
অথবা কেমনে, কুটীর প্রাঙ্গনে,
ছলে পশি' নিশাচর ;
দিবা দ্বিপ্রহরে, সীতা অপহরে',
ল'য়ে গেল নিজ ঘর ;
বনে বনে ঘুরে, এল যবে ফিরে,
কুটীরে অভাগা রাম ;
না পেয়ে সীতারে, আপনার ঘরে,
কাঁদিয়া ত্যজিল ধাম ;
পর্ব্বতে গহ্বরে, নির্ঝর প্রান্তরে,
বৃথা করে অন্বেষণ ;
হরিয়াছে কে সে, শুনি অবশেষে,
করিল ভীষণ পণ ;
ক্রোধে চক্ষু জলে, হুঙ্কারিয়া বলে,—
"প্রতিশোধ লব আমি ;
তরি' পারাবার, লঙ্কা ছারখার,
করিব শ্মশান ভূমি ;
জ্বালিব অনল, চিতা জ্বল জ্বল,
জ্বলিবে সে চিরকাল ;
রক্তে রাঙ্গা হবে, ভীষণ আহবে,
অব্ধির তরঙ্গজাল ;"
মহা সেনাদল, যেন দাবানল,
লইয়া চলিল বীর ;
পাষাণ নিগড়ে, বাঁধিয়া সাগরে
উতরে অপর তীর ;
মহা হুলস্থুল,, রাক্ষস নির্ম্মূল,
লঙ্কা সে হ'ল শ্মশান ;
ছিল যোদ্ধা যত, মৃত্যু ক্রোড়গত ;
রহিল না হেন জন ;—
যে পারে জ্বালিতে, সন্ধ্যায় সলিতে ;
অন্ধকার প্রেতভূমি ;
দুঃখে বীচিচয়, কেঁদে কেঁদে বয়,
হা লঙ্কা কি হ'লে তুমি !—

অথবা কেমনে, কুরুক্ষেত্র রণে,
হ'ল কুরুকুল নাশ ;—
সমরে দুর্ব্বার, যেন পারাবার,
বসুধা করিতে গ্রাস ;
প্রমত্ত গরবে, মহা ঘোর রবে,
কৌরব বাহিনী এল ;
যোদ্ধা লক্ষ লক্ষ, বিস্ফারিত বক্ষ,
কোথায় তলায়ে গেল !
রুধিরে ধরণী, লোহিত বরণী,
মহাকালী করে নৃত্য ;
একই শয্যায়, গড়াগড়ি যায়,
রাজা প্রজা প্রভু ভৃত্য !
শূন্য সিংহাসন, কুটীর নির্জ্জন,
শোকের ক্রন্দন রোল ;

নগরে নগরে,　　　হাহাকার করে.
বিধবা ভিক্ষায়ে চাল।
রাজার প্রাসাদে,　　　রাজবধূ কাঁদে,
কুটীরে কৃষক নারী ;
কোন ভেদ নাই,　　　দুঃখ সব ঠাঁই,
যম নহে অবিচারী।

নবীন পল্লবস্তরে,　　　জ্বালি পুত বৈশ্বানরে,
ব্রহ্মনাম করি উচ্চারণ ;
অনুসরি' বেদতন্ত্র,　　　ঋষি পড়িতেছে মন্ত্র,
ঘৃত ঢালি' হোমের কারণ ;
মন্দিরে মন্দিরে আর,　　　কুঞ্জে কুঞ্জে অনিবার,
ঘণ্টার নিক্কণ শুনা যায় ;
হতেছে আরতি গান,　　　আহা কি গম্ভীর তান,
গর্জ্জি উঠি নিঃশ্বাসে মিলায়।

এমনি সুন্দর শোভা,　　　ধরেছিল যজ্ঞসভা,
হস্তিনায় শুধু একবার ;
যখন বিখ্যাত বীর,　　　মহারাজা যুধিষ্টির
করেছিল যজ্ঞ চমৎকার ;
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে,　　　নিমন্ত্রিয়া যজ্ঞস্থলে,
একত্রিত করেছিল যবে ;
সুর নর নাগ আদি,　　　নহে কেহ প্রতিবাদী,
নমিল মস্তক পদে সবে ;
গৌরবের দিন সেই,　　　ফিরে কি আসিল এই,
মনে ভ্রম হয় সেইরূপ ;
দেখ দেখি গণি তবে,　　　এসেছে কি এ উৎসবে,
সকল প্রদেশ হতে ভূপ ?

সকলেই সমাগত,　　　শুধু নহে উপস্থিত,
একজন যুবক ভূপতি ;
লোকে বলে সেই বীর,　　　মহারাজকুমারীর,
পাণির প্রয়াসী ছিল অতি ;
বিফল হ'য়ে সে আশে,　　　ফিরে যায় নিজবাসে,
তদবধি করিছে পোষণ ;

মনে মনে মহা ক্রোধ,　　　লইবারে প্রতিশোধ,
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা ভীষণ ;
কিন্তু এই জনরব,　　　হ'তে পারে মিথ্যা সব,
কে জানে কি আছে কার মনে ;
বলাবলি করে সবে,　　　কেন আসি' এ উৎসবে.
না বসে সে অন্য ভূপ সনে ?
পূর্ব্বে সে যে কতবার,　　　শোভিত এ দরবার,
আদরে বসা'ত নরপতি ;—
সম্ভ্রমে আপন পাশে,　　　কত যে মধুর ভাষে,
সম্ভাষিত লইয়া প্রণতি ;
আজি দৃষ্টি সুগম্ভীর,　　　কঠোরতাযুক্ত স্থির,
কে জানে কি ভাবে নৃপ মনে ;
নিষ্কম্প সাগর প্রায়,　　　বিতর্ক বিফল হয়,
নৃপতির চিত্ত উদ্‌ঘাটনে।

সৌধচূড়া হ'তে এবে,　　　উদ্দেবাষিল উচ্চ রবে,
নৃপের প্রতাপ বন্দিগণ ;
বজ্র সম ঘোর নাদে,　　　হুঙ্কারিয়া নানা ছাঁদে,
কহে তারা—"শুন সর্ব্বজন ;—
যে যেখানে আছ নর,　　　সবে শীর্ষ নত কর,
অধীনতা স্বীকারি' রাজার ;
উদয়াস্তে দিবাকর,　　　প্রসারিয়া নিজ কর,
সূচে যাঁর রাজ্যের বিস্তার ;
সীমাহীন রাজ্য তাঁর,　　　যেন মহা পারাবার,
তিনি এই ধরার ঈশ্বর ;
কেবা তাঁর সমকক্ষ,　　　অরির কাঁপিছে বক্ষ,
যশঃ সূর্য্য সতত ভাস্বর।"
বাজিয়া উঠিল তূরী,　　　মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, ভেরী,
অট্টে অট্টে উঠে উচ্চ রব ;
জাগি প্রতিধ্বনি তার,　　　পূরিল বন কান্তার,
শিরঃ নত করে যোদ্ধা সব ;
ঋষি মালা জপে রত,　　　সহসা হ'ল বিরত,
সুপ্তা বালা চমকি উঠিল ;

শিশু মাতৃ-অঙ্কে শুয়ে, ক্রন্দনে বিরত ভয়ে,
নৃপতির প্রভুত্ব মানিল।
চারণ রাখিল বীণ, নৃপতির আজ্ঞাধীন,
কোটি কোটি শীর্ষ হ'ল নত ;
রাজ সিংহাসন ঘিরি, চতুর্দ্দিকে সারি সারি,
দণ্ডবৎ হ'ল লোক যত।

সহসা কি পরমাদ, শুনা গেল শঙ্খনাদ,
স্বর্গ মর্ত্তভেদী ঘোর রব ;
যেন সুরগণ ক্রোধে, মানবের যজ্ঞ রোধে,
চূর্ণিবারে মানব গরব ;
তার তারতর শব্দ, বিস্ময়ে সকলে স্তব্ধ,
সমুত্থিত মহা কোলাহল ;
প্রাসাদ কানন ভরি, উঠে নাদ দুর্গ'পরি,
কম্পিত করিয়া যজ্ঞস্থল ;
এ যে রণাহ্বান ধ্বনি, দূর হতে আসে শুনি,
শঙ্খ তুরী আদি বাদ্য বাজে ;
যে যেখানে ছিল বীর, ছুটিল হ'য়ে অধীর,
অসি করে ধায় রণমাঝে ;
প্রিয়তম অঙ্কগতা, বালা প্রেমালাপ রতা,
সহসা উঠিল শিহরিয়া ;
বদন হইল ম্লান, সুখ হ'ল অবসান,
নারে প্রিয়ে রাখিতে ধরিয়া ;
উৎসব মন্দির ত্যজি, শত শত বীর আজি,
উন্মত্ত হইয়া রণে ছুটে ;
ঝটিকার বেগে ধায়, রণমত্ত হয়চয়,
কত হতাহত পদে লুটে ;
ভীষণ সমরাঙ্গন, সহস্র সরিৎ যেন,
হিমাদ্রির জঠরে মিলিয়া ;—
মহা গরজন সঙ্গে, আছাড়ি তরঙ্গ রঙ্গে,
কারাগৃহ ভাঙ্গে আস্ফালিয়া।

দূরে কৃষ্ণ অশ্ব' পরি, করে তীক্ষ্ণ অসি ধরি',
দেখা দিল ভীমাকায় বীর ;

কার সাধ্য অগ্রে তার, ক্ষণতরে দাঁড়াবার,
হেরিয়া সে কৃপাণ অধীর ;
শত শত বীর তারে, হেরি পলায়ন করে,
শত শত মৃত পদতলে ;
আঁখিতে বিজলী খেলে, করে করবাল দোলে,
মহাবেগে ধায় যজ্ঞস্থলে।

স্বর্ণ-সিংহাসন পাশে, রাণী কাঁপে মহা ত্রাসে,
রাজা স্তব্ধ আকুল চিন্তায় ;
রাণীর ক্রন্দন ধ্বনি, তুলে হৃদে প্রতিধ্বনি,
ছাড়ি তারে কেমনে বা যায় ?
ও'দিকে যুদ্ধের ডাক, কাণে বাজে শঙ্খ ঢাক,
শুনি স্থির কেমনে বা রয় ?
আবদ্ধ সিংহের মত, আছে নৃপ বুদ্ধিহত,
কেমনে সমস্যা পূর্ণ হয় ?
কাঁদিয়া কহিছে রাণী, 'শুন নৃপ মোর বাণী,
যেওনা হে আমাদের ফেলে ;
সিংহের গহ্বরে মোরা, যেন গো হরিণী পোরা,
রক্ষা কে করিবে তুমি গেলে ?
শুন কি ভীষণ রোল, যেন সাগর কল্লোল,
আসিতেছে রণভূমি হ'তে ;
যেও না যেও না নাথ, থাক আমাদের সাথ,
দিব না দিব না তোমা যেতে' ;
এত বলি দুই করে, আলিঙ্গিল নৃপবরে,
নিগড়ে বাঁধিল যেন তাঁরে ;
সে কোমল বাহুপাশ, ছেদিবারে বৃথা আশ,
অশ্রুসিক্ত ম্লান মুখ হেরে।

সমরের কলরব, ছাপায়ে উঠিল রব,
"জয় জয় ! অরাতি পলায় ;"
প্রতিধ্বনি চারিদিকে, সেই বার্ত্তা কহে ডেকে,
ছত্রভঙ্গ সেনাদল ধায় ;
'কার পরাজয় হ'ল ? কার সৈন্য পলাইল ?
ছাড় মোরে', কহে নৃপবর ;

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

চিন্তায় আকুল হ'য়ে, দেখে চারিদিকে চেয়ে,
ললাটে রাখিয়া নিজ কর ;
'সমরের রব শান্ত, কিন্তু আসে কে দুর্দ্দান্ত,
পদ শব্দে কাঁপায়ে ধরণী ?'
সম্মুখে দাঁড়াল আসি, করে রক্তমাখা অসি,
সেই যুবা, বীরের অগ্রণী ;
'আসিয়াছি হে রাজন, লভিতে ঈপ্সিত ধন,
কন্যা তব কাঙ্ক্ষিত আমার ;
এই বাহুবলে হত, তব সেনা শত শত,
শোণিতের বহে পারাবার ;
উৎসবের এই দিন, শোকে স্মরো চিরদিন,
কোথা কন্যা ? শীঘ্র দেহ আনি' ;—
'আছে দূরতর স্থানে, না যাইবে তার কাণে,
আর তোর প্রবঞ্চনা বাণী ;
পলায়ন কর এবে, নতুবা পরাণ যাবে,'
কহি' তুলে সকৃপাণ পাণি ;
কিন্তু চাহি চারিদিকে, দেখিতে না পায় কা'কে,
বীর যুবা চকিতে প্রাস্থত ;
যথা সাগরের ঢেউ, চেয়ে না দেখিতে কেউ,
অলক্ষিতে হয় অপসৃত !
গিয়াছে বটে সে যুবা, উৎসবের র'ল কিবা,
চারিদিকে হাহাকার রব ;
এত লোক সমাগম, সকলি গ্রাসিল যম,
চিরলুপ্ত ঐশ্বর্য্য বিভব !"

থামিল গায়ক তবে, নীরবিল বীণা,
উচ্চ করতালি দিক্‌ মুখরিত করে ;
কিন্তু দৃষ্টি তার সেই গবাক্ষে আসীনা
বিরহিনী বালা প্রতি ধায় সকাতরে ;
বিশুষ্ক কুসুম এক পড়িল ভূতলে,
বুঝি সরস্বতী দেবী করিল বর্ষণ ;
সযতনে তুলে লয়ে চাপি' বক্ষঃস্থলে,
রাখিল গায়কবর সুখে বহুক্ষণ !

দ্বিপ্রহর নিশা, জ্যোছনা মলিন,
ক্ষণে ক্ষণে মেঘে শশী হয় লীন ;
প্রহরী একক, চাহে শূন্যপানে,
আঁধার অম্বর, মেঘ স্থানে স্থানে ;
আছে আনমনে ; অতীতের স্মৃতি,
অতীতের সুখ, অতীতের প্রীতি ;
একে একে হয় মানসে উদয়,
অশ্রুভরা মৃদু ভাবনা নিচয় ;—
নিশীথের বায়ু সম ব'য়ে যায়,
সুরভি নিঃশ্বাসে হৃদয় কাঁপায় ;
আপন চিন্তায় আপনি মগন,
লুপ্ত তার নেত্রে অবনী গগন।

সুদূরে আঁধারে তটিনী বেয়ে,
কে যেন ভাসিয়া গেল যে ধেয়ে ;
ছায়ার আকৃতি যেন সে কেহ,
চেয়ে না দেখিতে লুকাল দেহ ;
বুঝি সে প্রেতিনী জলমগনা,
আপঘাতিনী কুল-ললনা ;
বিফল প্রেমের স্মৃতি বহিয়া,
নিতি নিতি আসে দুখ সহিয়া ;
দেখিবারে কোথা আশার বাতি,
নিবেছিল তার ভাঙ্গিয়া ছাতি !
প্রহরীর চিতে দ্বিধা না হ'ল,
সপন যেন সে মিলায়ে গেল ;
দেখিতে দেখিতে উষার আলো,
অন্ধকার জাল ধীরে সরালো ;
গিরি, নদী, ভূমি, গগনতল,
নব বেশে পুনঃ প্রকট হ'ল ;
ক্ষণেক পাষাণময় সে মরু,
প্রভাত আলোকে দেখা'ল চারু ;
কিন্তু সে আলোক প্রাসাদ শিরে,
বাতায়ন পথে পশিয়া ধীরে,

বন্দিনী বালারে জাগাতে গিয়া,
ম্লানমুখে যেন এল ফিরিয়া ;
কোথা সে বন্দিনী, ভাবিছে তাই,—
শূন্য যে পিঞ্জর, পাখীটি নাই !
মহাচিন্তাকুল প্রহরী যত,
ছোটে চারি দিকে, খোঁজে নিয়ত ;
পর্ব্বত, প্রান্তর, নদীর কূল,
খোঁজে সর্ব্বস্থান, না হয় ভুল ;
কোথা রাজকন্যা ? গায়ক কই ?
অদৃশ্য উভয়ে, চিহ্নটি নাই !
কে সেই গায়ক ? কি তার নাম ?
কেবা জানে তার কোথায় ধাম ?
সুরলোক হ'তে আসিয়া কি সে,
বালা ল'য়ে গেল ত্রিদিব দেশে ?
বাদ অনুবাদ কত যে হ'ল,
তর্ক প্রতিবাদ সব বিফল ;
শেষে জানা গেল তত্ত্বে এই,
হাস্তিনাধিপতি গায়ক সেই ;
পিতৃক্রোধ বশে বন্দিনী বালা,
বিজন কারায় সহিছে জ্বালা,—
শুনি' সে আসিয়া গায়ক বেশে,
হরে' লয়ে গেল আপন দেশে !

অবরুদ্ধা

দ্বিতীয় সর্গ

গর্ব্বোন্নত হস্তিনার অভ্রচূড় প্রাচীর ঘিরি,'
ভীষণ অরাতি দল রহিয়াছে দুর্গরোধ করি ;'
যমুনার জলরাশি উজলিয়া রক্তিম ছটায়,
বাল-শশী-চিহ্ন-যুত কেতু উড়ে গগনের গায় ;
বিরহি-নিঃশ্বাস সম ধীরে বহে সান্ধ্য সমীরণ,
মৃদু আন্দোলনে যেন পতাকায় করিছে ব্যজন ;
জল, স্থল, দেবালয়, উপবন, মণ্ডপ, চত্বর,
সর্ব্বত্রই বিদ্যমান নর-রক্ত-চিহ্ন ভয়ঙ্কর ;
কত মৃতদেহ তথা আছে পড়ি' অকৃতসংকার,
বহুদিন ব্যাপী তথা মহারণ করিছে প্রচার ;
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা মহাযুদ্ধে হয়েছে সূচিত,—
জয় কিম্বা মৃত্যু রণে, বীরধর্ম্মে ইহাই উচিত ;—
মরণে অক্ষয় যশঃ, জয়ে স্বাধীনতা সুরক্ষিত ;
পরাজয়ে কিবা ভয়, যদি জিত না রহে জীবিত ?

মহার্ঘ শাল নির্ম্মিত সমুন্নত মণ্ডপের মাঝে,
সভা করি ম্লেচ্ছরাজ সিংহাসনে গৌরবে বিরাজে ;
চারিদিকে অগণিত বস্ত্রগৃহ সমুজ্জ্বল ভায়,
অস্তগামি-রবি-করে মেঘমালা যথা শোভা পায় ;
বিধর্ম্মি-শাসন হেতু যে ললাট সতত কুঞ্চিত,
আজি তাহা সুপ্রসন্ন, ক্রোধচিহ্ন আজি তিরোহিত ;
নহে আজি উপবাস, নাহি রুচি কোরাণ শ্রবণে,
হাস্যভরা আস্য আজি, গীতবাদ্যে অভিলাষ মনে ;
মধুর, মধুরতর, উঠিতেছে সেতারের তান,
দূরশ্রুত প্রিয়াহ্বান যেন কিম্বা ফর্দ্দুসীর গান,—
প্রাণ-মন মত্তকারী,—বীর রসে আলোড়ে যা' প্রাণ ।
অবিরাম আরাধনা, উপবাস আদি অনুষ্ঠানে,
কৃপানেত্রে চেয়েছেন ভগবান ম্লেচ্ছরাজ পানে ;—
কালি সূর্য্যোদয়ে হবে হস্তিনার দুর্গের নিপাত,
যবনের জয়কেতু বিরাজিবে তথা দিবারাত ।

সহস্র প্রদীপ জ্বলে উজলিয়া বিস্তৃত শিবির ;
উচ্চ হাস্য, বাহ্বাস্ফোট, স্পর্দ্ধাদৃপ্ত বচন গম্ভীর,
অগণিত ম্লেচ্ছ কণ্ঠ হ'তে উঠে বিজয়ের ধ্বনি,
দেবস্তুতি সহ মিশে শ্রুতিকটু প্রতিহিংসা বাণী :—
"একবার পূর্ব্বাকাশে দিবাকর দেখা দাও হাসি,'
খর অসি সঞ্চালনে হত্যা করি যত অবিশ্বাসী ;
ভাঙ্গিয়া করিব চূর্ণ অভ্রভেদী বিশাল এ পুরী,
বুঝিবে কাফেরগণ মছলেমের হস্তের চাতুরী ;
লক্ষ পৌত্তলিক যবে যন্ত্রণায় হইয়া অধীর,
মিথ্যা দেবদেবী স্মরি' ঊর্দ্ধনেত্রে ত্যজিবে শরীর ;—

আনন্দে দেখিব সবে তাহাদের যন্ত্রণা ভীষণ,
ভূলুণ্ঠিত কলেবর, স্থির দৃষ্টি, বিবৃত দশন ;
উপযুক্ত যাত্রী তারা ইব্‌লিসের তমোময় দেশে,
পচিবে নরকে নিত্য, মোরা যাব স্বর্গলোকে হেসে।
হে রজনি ! কেন বৃথা রাখ ঢাকি' দিবসের আলো ?
শশী তারা ম্লান আজি, আমাদের নাহি লাগে ভাল ;
হিমবিন্দু কণামাত্র নাহি দেয় মানসে উল্লাস,
শুধু রক্তে সুরঞ্জিত কৃপাণের জ্যোতিঃ করে হ্রাস ;
মৃদু নৈশ সমীরণ বিষাদে নিঃশ্বাস ফেলি যায়,
যেন কাঁদি কাণে কাণে প্রণয়িনী মাগিছে বিদায় !
যাও নিশে রুক্ষবাদে, যথা মত্ত নদী খরতর,
আমন্ত্রিছে তারাদলে, স্ফীতবক্ষে বিছায়ে সংস্তর।
কিম্বা যাও মোসেলের পুষ্পময়ী উপবন পুরী,
যথা নিত্য চন্দ্রোদয়ে ফুটে উঠে বিচিত্র মাধুরী ;—
গুম্বজ, মিনার আদি সৌধশীর্ষ হয় উদ্ভাসিত,
উজ্জ্বল বরণে যেন স্বপ্নলোক সদ্যঃ প্রকাশিত ;—
প্রণয় সঙ্গীত যথা ঘরে ঘরে উচ্চহাস্য সনে,
প্রণয়ীর কণ্ঠ হ'তে উঠে নিত্য সন্ধ্যা আগমনে।
আমাদের প্রয়োজন, হে রজনি, নাহিক তোমায়,
চাহি মোরা তপনের চণ্ডতর কিরণ ধারায় ;—
যুঝিবারে শত্রুসনে মরণান্ত সমর প্রাঙ্গনে,
চিনিবারে রুধিরের ধারাস্নাত শত্রু মিত্রগণে !

সত্যই কি তবে ওই দীপ্তিমতী নগরীর রাণী,—
কালক্রোড়ে চিরাসীনা আদরিনী বধূ স্বরূপিনী,—
পড়িবে কালের গ্রাসে ? রত্নগর্ভা বীরপ্রসবিনী,
যার নামে ভয়ঙ্কর—বজ্রবাহী বাতাবর্ত্ত জিনি—
প্রকম্পিত মহা ভয়ে কত শত রাজ সিংহাসন,
বিবর্ণ হইত কত মহাদৃপ্ত অরাতি বদন ?
হায় ! আজি অনশনে প্রপীড়িতা বুভুক্ষা তৃষ্ণায়,
বেদনায়, গৃধ্র চঞ্চু নখাঘাতে ছিন্ন শব প্রায়,
শোচনীয়া মহাপুরী ; কে করিবে নগরী রক্ষণ ?
বালবৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবা যমে সবে করেছে ভক্ষণ !

চাহিলে এ রণক্ষেত্র পানে, আহা, পড়িয়া যথায়,
কত বীর দেশ তরে প্রাণ বলি দিয়াছে হেলায় ;
নিরখিলে তাহাদের স্থিরনেত্র রোষ কষায়িত,
স্পর্দ্ধাদৃপ্ত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর তীব্র অবজ্ঞা কুঞ্চিত,—
কার মনে নাহি ভায়, কি ভীষণ তেজঃ অগ্নিময়,
বীরনেত্রে জ্বেলেছিল প্রস্থানের অগ্রে শিখাচয় ;
চিহ্ন যার এখনও নহে লুপ্ত— যথা সন্ধ্যাকালে,
অস্তমিত ভাস্করতেজঃ বিরশ্মি উজলে অভ্রভালে ;—
কার রক্ত নাহি হয় বাত্যাক্ষুব্ধ অর্ণবের প্রায়,
স্ফীত, মত্ত, আন্দোলিত ধমনীর মাঝে ; যেন চায়,
লঙ্ঘিয়া বন্ধন যত বন্যাসম হ'য়ে প্রবাহিত,
ভাসাইয়া ল'য়ে যায় স্বাধীনতা-পরিপন্থী যত ;—
কার না বাসনা জাগে, রাখিবারে নিজদেশ ধায়,
ঢালিয়া হৃদয়-রক্ত, গৌরবের অঙ্কে নিদ্রা যায় ?

এই ভাবে প্রণোদিত হাস্তিনার বীর যোদ্ধৃদল,
বীরগর্ব্বে যুঝেছিল রুধিরে ভাসায়ে ধরাতল ;
কিন্তু হায়, ভাগ্য-চক্র-রথাসীনা জয়লক্ষ্মী আজি,
যবনের কণ্ঠে দিল জয়মাল্য রক্তাংশুকে সাজি ;
নরহত্যা, রক্তপাত, যার ধর্ম্মে স্বর্গের সোপান,
নগরী বেষ্টিয়া আছে দাঁড়াইয়া যমের সমান ;
দিন দিন তিলে তিলে বলক্ষয় হয় হাস্তিনার,
কত মাস কেটে গেল, কে সাধিবে তাহার উদ্ধার ?
অসংখ্য অরাতি মাঝে দাঁড়াইয়া যেন একাকিনী ;
চারিদিকে হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস, বিলাপের ধ্বনি !
পিতৃহীন শিশু আর পতিহীনা নারীর ক্রন্দন ;
মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, আহতের কাতর রোদন ;
ক্ষণে ক্ষণে পশিতেছে চমকিয়া শ্রবণ-বিবর ;—
শুনিলে বীরের হিয়া কাঁপি' উঠে, বিদরে অন্তর ;—
আশা পলায়িত এবে ; নৈরাশ্যের তিমিরে আবৃত
উন্নত ললাটে তার গৌরবের চিহ্ন অপসৃত !

হস্তিনার অভ্রচূড় প্রাচীরে বেষ্টিত পুরী মাঝে,
সুপ্রশস্ত সভাগৃহে মণিময় সিংহাসন রাজে,—

কালি যাহা যবনের হস্তগত হইবে নিশ্চিত ;—
হস্তিনার অধিপতি উপবিষ্ট পার্ষদবেষ্টিত ;
বিষাদ-মলিন মুখে এ উহার মুখপানে চায়,
একচিন্তা সকলের, বাক্য কিন্তু নাহি বাহিরায় ;
"সখাগণ !"—কহে নৃপ ; "সমাগত বিদায়ের কাল ;
কাল সাগরের পারে আছে এক রাজ্য সুবিশাল,—
সুখ যথা নিত্যভোগ্য,—সেই স্থানে মিলিব আবার ;
বিচ্ছেদ সেখানে নাই, ফেলিও না নয়ন-আসার ;
বীরের বদনে অশ্রু শোভা নাহি পায়, হও স্থির ;—
বিদায় ! হে সখাগণ ! দাসত্ব না চাহে কভু বীর ;
অতএব হুতাশনে বিসর্জ্জন দিব এ জীবন ;
আর যা করিতে হবে জান সব, বিদায় এখন !"
বলিতে বলিতে কথা মেঘাচ্ছন্ন ললাট রাজার ;
দ্রুত সিংহাসন ত্যজি গেল নৃপ ছাড়ি সে আগার !

নির্জ্জন মরুর মাঝে বালুগর্ভজাতা মরীচিকা,—
রবিকরে পুষ্টা সেই মায়াবিনী রূপসী বালিকা,—
তৃষ্ণার্ত্ত পথিক জনে ভুলাইয়া ওষ্ঠ-সুধা আশে,
ইঙ্গিতে লইয়া যায় কাল্পনিক সুদূর আবাসে ;
শেষে বৃদ্ধ গোধূলির ভ্রূকুটীর কঠোর শাসনে,
মায়াদেহ হয় তার অন্তর্হিত সূর্য্যাস্তের সনে ;
শিশির সিঞ্চিত ছায়া বিছাইয়া গোধূলি তখন,
মায়ামুক্ত পথিকেরে ধীরে ধীরে করিয়া ব্যজন,
প্রকৃতিস্থ করি' তারে, মৃদুভাষে বলে কাণে কাণে,—
সুন্দরী সে মায়াবিনী পথিকেরে মৃত্যুমুখে টানে।
তখন বুঝিতে পারে সে পথিকজন কোন্ ছলে,
হেসে দিতেছিল তারে মায়াবিনী মৃত্যুর কবলে।

সেইরূপ জীবনের অন্ধকার উপত্যকা দেশে,
আশা কুহকিনী ঢালি' কাল্পনিক রশ্মিরাশি হেসে,
বিপথে লইয়া যায় মুগ্ধ নরে দেখাইয়া দীপ,
দূর ভবিষ্যৎ ভালে পরাইয়া চিত্রবর্ণ টিপ ;
অবশেষে সত্য আসি প্রকাশিয়া উজ্জ্বল আলোক
নিশার স্বপন সম দূর করে আশার কুহক ;

সবলে গুণ্ঠন তার করিয়া মোচন ডাকে কাছে,
চিত্রিত রূপের তার মুছে দিতে বাকী যাহা আছে ;
তখন মানব হৃদে যে অশান্তি আসি' করে বাস,
কেহ নাহি পারে তাহা ক্ষণতরে করিতে বিনাশ
উচ্চ-স্তম্ভ সমুদ্ধৃত সুবিশাল গৃহপরম্পরা,
চিত্রিত প্রাঙ্গণ কত, মধ্যে যার খেলিছে ফোয়ারা,
অতিক্রমি' যায় নৃপ ; নাহি জ্বলে প্রদীপ কোথায় ;
যেন সে শ্মশান ভূমি কাঁদে পড়ি' ম্লান জ্যোছনায় ;
সে নীরব অন্ধকার পূর্ব্ব হ'তে করিছে সূচনা,—
শ্রী, সৌন্দর্য্য, কীর্ত্তিরাশি, ঐশ্বর্য্যের সগর্ব্ব রচনা,
শীঘ্র মিলাইবে আহা অতীতের মলিন ছায়ায় ;
চিহ্ন নাহি রবে কিছু, সে গৌরব বিলীন কোথায় ;—
এ সব না ভাবে নৃপ, আজি তার হৃদয় উদাস ;—
ধায় বায়ু উপেক্ষিয়া গোলাপের অশ্রু দীর্ঘশ্বাস ;—
কিন্তু উপনীত যবে অন্তঃপুরে,—উদ্ঘাটিত-দ্বার,
বিজন, নীরব সেই সৌন্দর্য্যের মন্দির পূজার,—
সহসা থামিল নৃপ ; যথা আত্মনাশোদ্যতা নারী,
ক্ষণেক স্তম্ভিত রহে আবর্ত্তসঙ্কুল নদী হেরি,'
শান্ত করিবারে চাহে চিত্ত নিজ ঝম্পদান আগে,
কাঁদি কহে, "হে ঈশ্বর ! এখনো কি হিয়া মাঝে জাগে,
স্নেহ-মায়া, সুখ-আশা, গুপ্ত উৎস বাসনার হায়,
যাহে দৃঢ় সঙ্কল্পের বাঁধ ভাঙ্গি' ভাসি' চলে যায় ?
নিশ্চয় মরিব আমি !"—অতিক্রমি দ্বার প্রবেশিয়া,
চলে নৃপ শ্বেতোপলবিনির্ম্মিত কুট্টিম দলিয়া ;
পদশব্দ প্রতিধ্বনি না জাগিতে গৃহের প্রাচীরে,
সুন্দরীর রাণী আসি' নৃপবক্ষে পড়িল অচিরে !

"এলে কি হে হ'য়ে রণে জয়ী,
শত্রুদলে করি' ধরাশায়ী ?
কেন তব বিষণ্ণ বদন ?
মুখে কেন না সরে বচন ?
শঙ্কায় পরাণ মম কাঁপে,
মিষ্ট বাক্য না শুনি কি পাপে ?

এসেছ যখন ফিরি' ঘরে,
ভাসিতেছি আনন্দ সাগরে ;
শুভবার্ত্তা শুনিব নিশ্চয়,
সূর্য্যোদয়ে আঁধার কি রয় ?

শুন প্রিয়, স্বপন ভীষণ
নিদ্রাবশে করেছি দর্শন ;
ভয়ে কেঁদে করেছি চীৎকার,
হৃদয় কাঁপিছে বারবার ;
বহু জাগরণে ক্লান্ত হ'য়ে,
নিদ্রিত শয্যায় ছিনু শুয়ে ;
সহসা দেখিনু এক নারী,
কাছে এল যোদ্ধৃবেশ ধরি ;
রক্তমাখা ভামিনীর ভাল,
করে কোষমুক্ত করবাল ;
বর্ণ কৃষ্ণ মেঘের সমান,—
ঢাকে যবে শশীর বয়ান ;—
কটিতে কর্ত্তিত-কর হার,
তাহে রক্ত ঝরে অনিবার ;
কণ্ঠে দুলে নৃমুণ্ডের মালা,
তাহে রক্তধারা অবিরলা ;
মুণ্ডের কি চাহনি ভীষণ,
কৃতান্ত করেছে উদ্ঘাটন !

চিনিলাম তাঁহারে তখনি,—
মহাকালী করাল-বদনী !
যাঁর পূজা-বেদিকার তলে,
বলি-রক্ত-ধারা সদা চলে ;—
কম্পিত হইল মোর হিয়া,
অগ্নিসম নয়ন হেরিয়া।

কহিলেন,—"কাল পূর্ণ এবে,
অন্ত রাত্রে চলে যেতে হবে,
ছাড়ি তোরে, তনয়ে আমার,
দে বিদায় !" এই কথা বলি,'
চকিতে কোথায় গেল চলি' !

যেন মেঘে বিজলীর আলো,
চমকিয়া সহসা লুকাল !"

কাঁদিলাম আতঙ্কে শিহরি,'
হেনকালে চমকি' নেহারি,—
তালবৃক্ষ সম দীর্ঘকায়,
দেখা দিল কে যেন আমায় ;
জড়ায়ে রয়েছে সর্ব্ব অঙ্গ,
ফণাধর ভীষণ ভুজঙ্গ ;
বর্ণ পাণ্ডু, বিকট নয়ন,
উল্কা যেন করে উদ্গিরণ ;
করে ধরে প্রকাণ্ড ত্রিশূল,
রুধিরাক্ত অগ্নি সমতুল ;
জটা হ'তে ঝরে মৃদুধ্বনি,
যেন ধীরে নামে মন্দাকিনী ;
কহিল সে—"বিদায় তনয়ে !
চলিলাম, কিন্তু শুন অয়ে,
মহা দুঃখ আছে তব ভালে !"
অন্তর্হিত হইবার কালে,
বাক্য ও কটাক্ষ মম প্রাণে,
বিদ্ধ হল অব্যর্থ সন্ধানে।

বেদনায় করিনু চিৎকার,
চাহিয়া হেরিনু চারিধার ;
বুঝিলাম স্বপন সে নয়,
সমাধির দশা সম হয় ;
যাহে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় অলস,
কিন্তু আত্মা রহে নিজ বশ ;
দেখিলাম চারিদিকে চাহি,
কি সৌরভ এল বায়ু বাহি !
মৃদুধ্বনি পশিল শ্রবণে,
অলি যেন গুঞ্জরে কাননে ;

কোথা হ'তে আলোকের রেখা,
উজ্জ্বল কোমল দিল দেখা ;
চাহিয়া দেখিনু সবিস্ময়ে,
শয্যাপার্শ্বে রয়েছে দাঁড়ায়ে ;—
জ্যোতির্ম্ময়ী ত্রিদিব-কুমারী,
কি সুন্দর বর্ণিতে না পারি!
শিরে মণি-মুকুট উজ্জ্বল,
তারা সম করে জল জল ;
কিন্তু তার নয়নের জ্যোতি,
করে ম্লান মুকুটের ভাতি ;
স্বরগের পারিজাত মালা,
বেষ্টিয়া রয়েছে তার গলা ;
চারিদিকে মণ্ডল আকারে,
সুধাংশুর প্রভা ঘিরে তারে ;
কি মধুর বীণাধ্বনি আসে,
স্বর্গ হ'তে ধীরে ধীরে ভেসে!
বাক্য যবে উচ্চারিল বালা,
মন্ত্রে যেন হইনু বিহ্বলা ;
"শুন বালে," কহিল কুমারী,
"রহে মাত্র দিন দুই চারি,
মানবের ঐশ্বর্য্য গৌরব,
তার পর সকলি নীরব ;
সাগরের বুদ্বুদের প্রায়,
ক্ষণে সব মিলাইয়া যায় ;
বিজলী চমকি যথা চায়,
ক্ষণে পুন আঁধারে মিশায়।
অতএব হয়োনা কাতর,
যদিও বিপদ অতি ঘোর
অন্ধকারে ঘিরেছে তোমায়,
আর যারা তব প্রিয় হয় ;
চলিলাম ছাড়িয়া তোমায়,
সাধিতে বিধির অভিপ্রায় ;
জানিও বালিকে, স্বর্গদ্বার,
সাধু তরে মুক্ত অনিবার ;
শীঘ্র খুলে যাবে তব তরে,
গৃহীত হইবে সমাদরে।"
এত বলি হ'ল তিরোহিত,
অন্য স্বপ্ন হইল উদিত :—

জনহীন তুঙ্গ প্রাসাদের
শূন্য কক্ষে, যেন বিষাদের
ভারে আমি হয়ে অবনত,
দাঁড়ায়ে রয়েছি আশাহত ;
শশিপ্রভা ম্লানতর ভায় ;
নিম্নে স্রোতস্বতী বয়ে যায় ;
হিমসিক্ত মৃদু সমীরণ,
আনে কানে বারির গর্জ্জন ;
জালমার্গে দেখিনু চাহিয়া,
চারিদিকে পক্ষ বিস্তারিয়া,
অসীম অম্বর সহ মিশি
রহিয়াছে, শূন্য দশদিশি ;
পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী প্রায়,
প্রাণ চাহে উড়িয়া পলায় ;
সহসা কি সঙ্গীতের তান
উঠিয়া ভরিল মম কান ;—
কোন্ মহা যুদ্ধ বিবরণ,
গাহি মন করিল হরণ ;
বীর যুঝে বীর শত্রু সনে
রুধিরের ধারা বহে রণে ;
স্পন্দিত-হৃদয়ে শুনি গান,
বিশুষ্ক বদন, কাঁপে প্রাণ ;
স্মৃতি কানে কি যেন বলিল
হিয়া মাঝে অনল জ্বলিল ;
আর্ত্তস্বরে করিনু চিৎকার
সংজ্ঞা লুপ্ত হইল আমার ;
স্রস্ত হ'ল হস্ত হ'তে মম
শুষ্ক এক পুষ্প মনোরম :—

তুলেছিনু লতাকুঞ্জবনে,
যবে শেষ দেখা দুই জনে ;—
তারপর পড়িনু তথায়,
রহিলাম হয়ে মৃতপ্রায়।
সংজ্ঞা যবে লভিলাম পুনঃ,
শুনিলাম স্রোতের গর্জ্জন ;
দেখিলাম পার্শ্বে মম তুমি,
তরীমাঝে ; ছাড়ি বেলাভূমি,
তীরবেগে যাইতেছি ভাসি
কাটি দুইধারে জলরাশি ;—
শূন্যপথে যথা ধায় বাজ,
অথবা অরণ্যে পশুরাজ ;
শুনিনু কহিছ—"নাহি ভয়,
পাবে ওই সুসজ্জিত হয় ;—

লয়ে যাবে তোমারে নিমেষে,
অন্ধকারা হ'তে রাজাবাসে ;—
নিত্য উৎসবের নিকেতনে,
পুষ্পভরা কুসুম কাননে।'

পুনঃ এক হেরিনু স্বপন,—
চিতায় জ্বলিছে হুতাশন ;
তথা যেন একজন এসে,
দাঁড়াইল বীর যোদ্ধৃবেশে ;
ক্লান্ত-দেহ, নির্ভীক পরাণ;
চিতায় করিল ঝম্পদান ;
ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস সম উঠি,
অগ্নি তারে ধরিল সাপটি' ;
আবরিল সর্ব্ব অঙ্গ তার,
মহা ভয়ে করিনু চীৎকার।—
কিন্তু কেন উঠিলে চমকি ?
মলিন বদন কেন ? একি ?
বক্ষ তব কেন উচ্ছ্বসিত ?
বল মোরে করিয়া নিশ্চিত।

পিতা মম ভুলি পূর্ব্ব রোষ,
ক্ষমা কি করিয়া সর্ব্ব দোষ,
সৈন্য সহ আপনি আসিয়া,
গিয়াছেন শত্রু বিনাশিয়া ?"

"না প্রিয়ে! তোমার পিতৃরোষে,
চিতা-মৃত্যু মোর ভাগ্যে শেষে ;
কাতর হ'য়ো না, কিবা ভয় ?
বীরের রমণী যেই হয়,
উচিত তাহার দৃঢ় করা,
গর্ব্বে হৃদি পাষাণের পারা।
পত্রের উত্তরে তব পিতা,
ব্যঙ্গ-বিষে ভরেছেন পাতা ;
তাহে অতি ভীরুরও প্রাণে,
মহারোষ উন্মাদনা আনে ;
কেন তুমি বলেছিলে মোরে, —
সজল নয়নে সকাতরে,—
ভিক্ষা-লিপি লিখিতে তাঁহারে,—
অপমান লাঞ্ছনার তরে ?
লিখেছিনু বিহিত বিনয়ে,
উত্তর তাঁহার শুন প্রিয়ে ;—
'গর্ব্বিত সে বন্দীবান বীর,
কেন চাহে নত করি শির,
সাহায্য আমার ? সে ত পারে,
অনায়াসে চুরি করিবারে,
শিশুমতি বালিকার হিয়া,
সুকৌশলে বীণা বাজাইয়া ;
অসি তার যদি ভালবাসে,
রহিতে বসিয়া নিজ কোষে ;—
পাছে নর-রুধির-পরশে,
দীপ্তি তার কালিমায় গ্রাসে ;—
কেন না সে শত্রু মাঝে গিয়া,
প্রণয়ের সঙ্গীত গাহিয়া,

বল্লকীর কোমল ঝঙ্কারে,
অরিদলে বিমোহিত করে' ?—
তারপর কি ঘৃণার বাণী,
কলুষিত করেছে লেখনী ;—
'যবনের পদে নিষ্পিষিত
হোক তার শিরঃ, সে ঘৃণিত,
হরে ল'য়ে গেল, চোর সম,
সর্ব্বোত্তম কুসুমটি মম ;—
উদ্যানের গৌরব আমার,
হৃদয়ের আনন্দ আধার !'

সিংহ যথা গুহা গৃহে থা'ক',
ভীষণ গর্জ্জনে উঠে ডাকি ;—
শুনি দূরে ব্যাধের হুঙ্কার,
কুকুরের সোল্লাস চীৎকার ;—
ক্রোধবশে তেমনি আমায়,
ধূর্ত্ত, ভীরু, পাষণ্ড আখ্যায়,
রূঢ়ভাষে করিয়া ধিক্কার,
করেছেন বাক্যবিষোদ্গার ;—
বিস্মৃত হলেন বুঝি এবে,
কি বিপদ বিজয়-উৎসবে,
সভামাঝে হ'য়েছিল তাঁর ;—
রুধিরের নদীতে সাঁতার,
দিয়াছিল কত শত বীর,
কত শত ত্যজিল শরীর ?—
আর কেন যাউক সে কথা ; -
অতীত স্মরণে শুধু ব্যথা।
আছে নিম্নে সজ্জিত দাঁড়ায়ে,
বাত্যাগতি তুরঙ্গম, প্রিয়ে !
আরোহিয়া যাও পিত্রালয়ে ;—
সকলি বিনষ্ট এ প্রলয়ে ;
গতকল্য সূর্য্যাস্তের কালে,
শেষ রশ্মি গগনের ভালে,

হাসিয়া চলিয়া গেছে হেরি',
মৃত্যুক্রোড়ে, এই দুর্গ ঘেরি,
যত ছিল মোর মহাবল,
পুরী রক্ষা তরে, যোদ্ধৃদল !
পলায়ন কর, প্রিয়তমে !
রক্ষ মম সম্মান সম্ভ্রমে ;
নতুবা, যে কালিমা পড়িবে
মম নামে, কভু না উঠিবে।
হায় অবশেষে গেল চলে,
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলে ;—
জানিলাম অন্ত রাত্রে, যবে
মন্দিরে দেখিতে গেনু সবে,—
শেষ দেখা,—হায় তথা দেখি, -
প্রত্যেক মূরতি ধূলা মাখি,
ভূমিতলে রয়েছে পতিত ;—
বায়ু বাহি কাতর সঙ্গীত,
প্রাণ মম পূরিল বিষাদে,
যেন সুরবালাগণ কাঁদে !

পলাও, পলাও শীঘ্র প্রিয়ে,
সুখে থেকো পিত্রালয়ে গিয়ে ;
সম্পদের ক্রোড়ে বসি' যবে,
অতীত স্বপন মনে হবে ;
কদাচিৎ পূর্ব্ব কথা স্মরি,
ফেলো দুই বিন্দু অশ্রুবারি,
কিম্বা মৃদু নীরব নিঃশ্বাস।"—
শুনি' বাক্য, হৃদয়-উচ্ছ্বাস
রোধিল বচন সে বালার,
অন্তরে উঠিল হাহাকার ;
পথহারা ভাবের বন্যায়,
বাক্য তার কোথা ভেসে যায় !
মুক্তাসম অশ্রুবিন্দু চয়,
আবরিল নেত্রোৎপলদ্বয় ;

অবশেষে সরিল বচন :—
"কভু না করিব পলায়ন ;
প্রিয়তম ! তব সহচরী
রব আমি, বাঁচি কিম্বা মরি ;—
পিতার প্রাসাদ ত্যজি' দূরে,
একাকিনী যবে ঘুরে ঘুরে,
ভ্রমিয়াছিলাম দেশে দেশে ;
অবরুদ্ধা যবে অবশেষে,
মরুমাঝে অন্ধ কারাগারে ;—
কাঁদি নাই ; স্মরিয়া তোমারে,
রচি' কত সুখের স্বপন,
করেছিনু সময় যাপন !—
এবে, যবে বিপদের দল,
ঘিরি যেন মহা দাবানল,
বিনাশিতে এসেছে তোমারে ;—
হৃদয় আমার নাহি পারে,
তিলেকের বিচ্ছেদ সহিতে ;
হেসে প্রাণ পারি আমি দিতে ;
তোমারে করিয়া আলিঙ্গন,
নাহি ডরি শমনে ভীষণ ;—
অরণ্যের নিভৃত আলয়ে,
আবৃত শ্যামল কিসলয়ে ;
তরুশ্রেণী যথা দাঁড়াইয়া,
শাখায় শাখায় জড়াইয়া ;
অনল গর্জ্জিয়া যদি আসে,
গ্রাসিতে সে অটবী নিবাসে ;
হরিণী কি যায় পলাইয়া,
মৃত্যুমুখে পতিরে ফেলিয়া ?—
কিন্তু কহ, কহ নাথ মোরে,
সত্যই কি জানু নত ক'রে,
যবনের বশ্যতা স্বীকার,
ভিন্ন গতি নাহি কোন আর ?
বংশগত রাজ সিংহাসন,
অধিকার করিবে যবন ?"

সহসা বিদ্যুৎসম জ্বালা,
বীরনেত্রে করে গেল খেলা ;—
"দেখ প্রিয়ে বাতায়ন দিয়া,
চিতা ওই উঠেছে জ্বলিয়া,
মোর তরে ; উঠ ত্বরা করি,
পলাও আরোহি অশ্ব' পরি।"
আর্ত্তনাদ করিয়া অমনি,
ভূমিতলে পড়িল রমণী ;
কিন্তু নৃপ নাহি সেথা আর,
না শুনিল তাহার চীৎকার,
না দেখিল পতন তাহার !

চিতায় পাবক, জ্বলে ধক্‌ধক্,
রুদ্রের ক্রোধাগ্নি সম ;
স্ফুলিঙ্গ নিচয়, উড়ে শূন্যময়,
যেন ক্ষুদ্র বিহঙ্গম ;
বিগ্রহ অন্তিক, বসিয়া ঋত্বিক্
মন্ত্র করে উচ্চারণ ;
কিন্তু অশ্রুজল, প্লাবি গণ্ডস্থল,
ঝরিতেছে অনুক্ষণ ;
বেড়ি' হুতাশন, আছে যতজন,
শোকে সবে মুহ্যমান ;
চিতার আলোক, ললাট ফলক,
দেখায় বিষাদ-ম্লান ;
বিলাপের স্বর, অস্ফুট মধুর,
হৃদয় করে উদাস ;—
গভীর নিশায়, যথা শুনা যায়,
বায়ুর আকুল শ্বাস ;—
"হেন বীর যে সে, এ নব বয়সে,
যাবে কি যমের ঘরে ?
নাহি কিরে হায়, দেব অমরায়,
রক্ষিতে এ নরবরে ?"

নীরব সকলে, যবে চিতাস্থলে,
দাঁড়াল আসিয়া বীর ;—
ভঙ্গী বীরোচিত, নির্ভীক গর্ব্বিত,
নেত্র নিস্পলক, ধীর ;
করে জ্বল জ্বল, চিতার অনল,
অগ্নির তরঙ্গ ধায় ;
ক্ষণে ক্ষণে শিখা, ঊর্দ্ধে দেয় দেখা,
বিদ্যুতের ঝলা প্রায় ;—
দাঁড়াইল বীর, উন্নত শরীর,
কিরীট জ্বলিছে শিরে ;
ভগ্ন করবাল, রক্তস্নানে লাল,
শোভিছে দক্ষিণ করে ;
নেত্রে নাহি ভয়, ইতস্ততঃ চায়,
মরণে নাহি সে ডরে ;
কহিল গরবে, সম্বোধিয়া সবে,
জলদ-গম্ভীর স্বরে :—
"বিদায় এখন, দেহ সখাগণ,
ক্ষণিক মরণ জ্বালা ;
বন্দীর শৃঙ্খলে, কভু শত্রুদলে,
বাঁধিতে দিব না গলা ;
হে দেবতাগণ, বলে সর্ব্বজন,
ভালবাস বীর জনে ;
সস্মিত নয়নে, চাহ মোর পানে,
দিনু প্রাণ হুতাশনে।"
হইল নীরব ; কহে লোক সব;
"সমাধা বীরের কাজ ;
সকল আশার, প্রদীপ তোমার,
নিবিল, হস্তিনা, আজ !"

কিন্তু এ কি শুনি, ক্রন্দনের ধ্বনি,
চীৎকারে ফাটায় কান ;
কে আসিল ধেয়ে, জনতা ভেদিয়ে,
চিতায় সঁপিতে প্রাণ ?
অগ্নিশুভ্র চীর, পাশ' অগ্নিপুরী,
কে পড়িল চিতা মাঝে ?
চিনিল সকলে, চাহি কুতুহলে,
বীরবধূ তথা রাজে !

দাও, খুলে দাও এবে নগরীর দ্বার ;—
পশুক অরাতি দল, বন্যার আকার,
সিন্ধু সম মহাবেগে ; কি করিবে আর ?—
শব-হৃদ-কোষে তার পশুক কৃপাণ ;
শ্মশানের মাঝে তার উড়ুক নিশান ;
বিজয়-নিনাদ কেবা শুনিবে এখন ?
দৃপ্ত পদক্ষেপে ভীত হবে কোন্ জন ?

হইল প্রভাত ; ওই দিবাকর গগনে,
উদিল উজলি' দিক্ হাসি ভাসে নয়নে ;
সৃষ্টির জনমদিনে ওই দীপ জ্বলেছে,
অনন্তকালের পথে হেসে হেসে চলেছে ;
মরতের বস্তু সম ক্ষণস্থায়ী নহে সে ;
অম্লানচ্ছটায় নিত্য নভোভালে শোভে সে ;
কত শত সাম্রাজ্যের জন্ম লয় হেরেছে,
এ ভবের ছায়াবাজি কত লক্ষ্য করেছে ;
স্বল্পায়ু গর্ব্বিত নর ! কীর্ত্তি তব রহে না,
দু'দিনে বিলুপ্ত হয়, কালস্পর্শ সহে না ;
শকতি, গৌরব তব, ক্ষণে হয় বিলীন ;
রবির গৌরব কভু নাহি হয় মলিন ;—
হাসিয়াছে জগতের জনমের দিবসে,—
প্রলয়ের ভস্মস্তূপে আলোক ঢালিবে সে ;—
সময় যখন গিয়া মহাকালে মিলিবে,
অসীম অনন্ত যবে এ জগতে গিলিবে !

হইল প্রভাত ; ওই যবন শিবিরে,
অযুত শাণিত শল্য ঝক্‌মক্ করে ;

কত শত কৃপাণের ফলা নিষ্কাসিত,
বিজয়-নিনাদ উচ্চকণ্ঠে উদেবাষিত ;
দলে দলে সৈন্যগণ হয় অগ্রসর,
প্রতিহিংসা লোভে গতি অতি দ্রুততর ;
ধাবিত হইল বেগে ভেটিতে অরাতি,
আর কেবা বাধা দেয়, পোহায়েছে রাতি।
হায় হায়, ব্যর্থ সব, আস্ফালন বৃথা,
উন্মুক্ত গোপুর-দ্বার, শত্রু নাহি সেথা ;
শূন্য পুরী, কেহ নাই যুদ্ধ করিবারে,
সংগ্রামের চিহ্ন কোথা নাহি চারিধারে !

মধ্যাহ্ন আইল ; উর্দ্ধে সুনীল গগনে,
রথ হ'তে সূর্য্যদেব জ্বলন্ত নয়নে,
চাহিলেন ধরাপানে ; দেখিলেন ভাসে,
শশিকলাচিহ্ন রক্ত কেতন আকাশে ;—
পরাভূত হস্তিনার শ্মশান উপরে ;—
মহানিদ্রা যায় যথা সুখে চিতা'পরে,
প্রীতির প্রতিমা আর শৌর্য্যের মূরতি,
লভিয়া মরণ-অঙ্কে পরম বিরতি !
যবনের জয়োল্লাস নাহি যায় কানে,
শোক, দুঃখ, পরিতাপ কিছুই না জানে !

বসন্ত-না-শরৎ ?

[শ্রীকালীদাস রায়]

বসন্ত কি শরৎ হয়ে
আসলে ফিরে মোদের ঘরে ?
স্পর্শে তোমার সেই শিহরণ
তেম্নি আবার মধু ক্ষরে।
তেম্নি কানন পুষ্প মদির,
সেই বারতাই বইছে সমীর,
তেম্নি সুরে ভ্রমর অধীর
গুঞ্জরে ফের কুসুম'পরে।

তবু তোমায় চেনাও কঠিন
বদ্‌লে গেছে বেবাক ঢং,
বদ্‌লে গেছে গায়ের, গালের
হাতের পায়ের ঠোঁটের রঙ,

পরাগ ভূষার তলায়, দেখা
যাচ্ছে শিথিল বলির রেখা।
ব্যথার পরুষ কণ্ঠ তোমার
শুন্‌ছি সারস হাঁসের স্বরে।

উত্তরীয়ে শুভ্র দেখে
চিন্‌বে নাক হঠাৎ কেউ,
চাঁচর চিকুর ধবল হয়ে
খেলছে শিরে কাশের ঢেউ।
নাই সে বিলাস চটুলতা
নাই সে চপল কল কথা
ভক্ত তুমি মন্দিরে আজ
কমলকুমুদ — অর্ঘ্য করে।

ভগ্ন মুকুরের কাহিনী

[শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী]

আমি ভগ্ন মুকুর—অপরিচ্ছন্ন ঘরের কোণে ধুলোয় মলিন হয়ে পড়ে আছি। কিন্তু চিরদিন আমি এমনি অনাদৃত ভাবে পড়েছিলুম না—রমার সেই পুষ্প-শুভ্র মুখখানির স্মৃতি আজও যেন আমার দীর্ণ বুকটাতে আঁকা আছে!… যে গভীর মর্ম্মবেদনায় আমার বুক ভেঙে গেছে, সেই কাহিনী আজ বলব।

সে এক শরতের নির্ম্মল শেফালি-সুরভি প্রভাত। সেদিন অমল আমাকে রমার হাতে দিয়ে বলেছিল—"এই মুকুরের মত স্বচ্ছ হোক্ আমাদের প্রেম—"

অমল ছিল তরুণ যুবক আর রমা ছিল তারই স্ত্রী—ঠিক যেন একটী নির্ম্মাল্যের ফুল। তাদের প্রাণে তখন নব-বসন্তের রঙিন পরশ লেগেছে। অমল থাকত কলকাতায়, সে কোন একটা আফিসের কেরাণী, আর রমা থাকত সেই পল্লীগ্রামের পৈতৃক বাড়ীতে। তাই প্রতি বছর পূজোর ছুটীর সময় অমল পিয়াসী মন নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে ছুটত—রমার মিলনাকাঙ্খায়।

সেবার বড় আগ্রহে সে আমাকে কিনে নিয়েছিল রমাকে উপহার দেবার জন্তে!

ঘরের দাওয়ায় বসে রমা ঘোমটা মাথায় দিয়ে কুটনো কুটছিল। পিছন থেকে অমল অধর-কোণে হাসির রেখা ফুটায়ে আমাকে রমার মুখের সামনে ধরে বলল—"দেখ দিকি কেমন দেখাচ্ছে?"

রমা সচকিত হয়ে সলজ্জ হাস্তে বলল—"বাঃ বেশ চমৎকার আয়নাটী তো!" অমল বললে—"এবার এটাই তোমার পূজোর উপহার দিলুম—বুঝলে রমা?" তারপর হেসে বললে "এই মুকুরের মত স্বচ্ছ হোক্ আমাদের উভয়ের প্রেম—" লজ্জার আভাবে তরুণীর সারা মুখে যেন উষার অরুণ রাগ ছড়িয়ে গেল।

আমাকে ভারী আদরের সঙ্গে নিয়ে রমা তার চুল বাঁধবার সরঞ্জামের পাশে সাজিয়ে রেখে দিল।

প্রতিদিন বিকেল বেলায় আমাকে সামনে রেখে সে তার শ্রাবণ মেঘের মত নিবিড় কেশভার বেণী করে বাঁধতে বসত।

কি মিষ্টি লাগত তার মুখখানি! দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ছোট শুভ্র কপাল খানির তলে হরিণীর মত ডাগর স্নিগ্ধ দুটী চোখ, পানের রসে রঙিন অধর দু'খানি যেন রক্তপদ্মের পাপড়ি! চুল বাঁধা হয়ে গেলে রমা সীমন্তে সযত্নে সিঁদুর-রেখা উজ্জ্বল করে এঁকে দিত—সৌভাগ্য-গর্ব্বে তার মুখখানি যেন দীপ্ত হয়ে উঠত।

*   *   *   *

সেবার পূজোর ছুটীতে অমল বাড়ী এল না। রমার মুখের হাসি মেঘলা দিনের মত ম্লান হয়ে এল। সে আনমনে চুল বাঁধতে বসে অজানা আশঙ্কায় শিউরে ওঠে। সেদিন রমা দিগন্তের পানে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল—আঁখির কোলে দু' ফোঁটা অশ্রু শিশির বিন্দুর মত টলমল করে উঠল।

তাদের স্বচ্ছ শান্ত সুখের আকাশে যেন কাল-বৈশাখীর মেঘ গর্জ্জে এল। তারপর অনেকদিন তার দেখা পেলুম না।

সেদিন যখন রক্ত-রাঙা পশ্চিমাকাশের কোলে বেলা অবসান হচ্ছিল, তখন রমা ধীরপদে ঘরে এল। তারপর কম্পিত হাতে আমায় তুলে নিল—উঃ একি দেখ্‌লুম—অভাগিনীর সিঁথির সিঁদুর চিরতরে মুছে গেছে—পরণে শুভ্র বেশ, বাসি ফুলের মত মুখখানি পাণ্ডুর! নিজের এ রিক্ত, সর্ব্বহারা মূর্ত্তি রমা আর সইতে পারল না; প্রিয়তমের শেষস্মৃতি স্মরণ করে তার দুটী গাল বেয়ে তপ্ত অশ্রুর নির্ঝর ঝরতে লাগল—হাতের মুঠি তার শিথিল হয়ে এল—আমার মর্ম্মাহত বুকখানা দুঃসহ জ্বালায় বিদীর্ণ হয়ে গেল……

মুক্তি

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(১)

ডাক্তার আসিয়া যেদিন তাঁহার শেষ কথা বলিয়া, সকলের সন্দেহটীকে সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন, সেদিন একটা আতঙ্ক ও আশঙ্কার ভাব নীরবেই ধুমায়িত হইয়া সমস্ত বাড়ীখানিকে আঁধার করিয়া তুলিল ; আর ক্ষুদ্র গৃহকোণটীর ছোট্ট শয্যাখানিতে পাশ ফিরিয়া শুইয়া মণিকা ক্লান্তভাবে চক্ষুদুটি মুদিল,—ষোল বছরের মেয়ে থাইসিস্ যে কি রোগ তাহার ত তা অজানা নাই। এ জীবনটায় যে তার কত বড় লোভ, কতখানি কামনা, কিন্তু হায় এর সীমানা আর কতটুকু দূরে! সত্য জিনিষটা নিজের মনে জানিয়াও, যতদিন না স্পষ্ট কথাটি ডাক্তার নিজের মুখে বলিয়া গেলেন, মনে ততদিনও জোর ছিল,—আর আজ?—দেহ ও মন কোনটা যে কার চেয়ে বেশী শক্তিহীন, কে তা বলিবে?

(২)

'বল তুমি কি করা আমার উচিত!'—

'ছাখ, পুরুষ মানুষের স্থাকামো সহ্য হয় না, তোমার নিজের মেয়ে, কি করা উচিত, সে কি তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি?'

মেয়ে বটে আমার, কিন্তু আজ তিন বছর, যেদিন তুমি এ বাড়ীতে এসেছ, কোন্ কাজটি তোমায় আমি না বলে করেছি, তুমিই তা বল। কেন তুমি অন্যায় রাগ কর, সুধা?

'কিন্তু, তোমার মতের সঙ্গে আমার সব মত মেলে কই? ওর দিদিমা ওকে নিতে চাইলেন, তুমি ইচ্ছে করে তখন দিলে না, আমি ত বার বার করেই বলেছিলুম, তুমি কি আমার কথা শুনেছিলে?'

"তখন দিই নি, কিন্তু কেন দিই নি সে ত তুমি জান সুধা,—রোজ রোজ জ্বর হচ্ছে, দিনকে দিন কেবল দুর্ব্বল হয়েই পড়ছে, কি করে তখন একেবারে চিকিৎসা না করিয়ে সে পাড়াগাঁয় পাঠাই বল,—লোকেই কি তাহলে আমায় ভাল বলত।"

"তা বেশ, এখন ত রোগ কি তা জানলে, এখনই বা কি করে সেখানে পাঠাবে, এখন চিকিৎসা করাও,—"

"তাই ত, তারই জন্যেই ত তোমায় জিজ্ঞেস কর্ত্তে এলাম, রোগটা ভাল নয়, ছোঁয়াচে, অন্যরকম বিধিব্যবস্থা করার দরকার, কি করা যেতে পারে ভেবে দ্যাখ। খুকীটা অত ছোট।"

শায়িতা কন্যার পাশে পাশ ফিরিয়া শুইয়া সুধাদেবী ধীরে ধীরে বলিলেন, সে ব্যবস্থার কথা আমি কি বলবো, দাদা বলে গেছেন খুকুকে নিয়ে আমায় তার কাছে চলে যেতে,—থাইসিস রোগ—হাওয়াতেও এর বিষ। বিপন্ন শরৎবাবু চুপ করিয়া চেয়ারটীতে বসিয়া রহিলেন।

তরুণী পত্নী সুধাদেবীর কাছে অপরাধের তার আর অন্ত ছিল না, পূর্ব্বপক্ষের পুত্র-কন্যা দুইটীর—স্বামীর কোন প্রকার ভাবনাকেই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তাঁহার সুখের সংসারে, স্বামীর অগাধ ভালবাসার মধ্যে, তাঁহার দুই বছরের শিশু কল্যাণীর হাসি-কান্নার কুহেলীজালের মধ্যে উহারা যেন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে!—উহাদের কাপড় চাই, স্কুলের মাহিনা, মাষ্টারের মাহিনা—কত কি ইহাদের দরকার, শুধু কি তাই, আজ এক বৎসর এই যে মণিকার ডাক্তার, ওষুধের নিত্যি নূতন ব্যবস্থা, এ সব যেন সুধাদেবীর কাছে সমস্ত সুখের মাঝে বিষের ন্যায় জ্বালা দিত এবং এই সমস্ত-কিছুর একমাত্র দায়ী স্বামীর উপর, ক্রোধ তাঁহার জমিয়া জমিয়া মনটাকে তাঁহার দিনে দিনে কেবল তিক্ত করিয়াই তুলিতেছিল।

পত্নীর এই ভাব শরৎবাবুর কাছে যে কিছু অজ্ঞাত ছিল, তাহা নয়, কিন্তু বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হইলে যাহা হয়,—রূপসী পত্নীকে অগ্রাহ্য করিবার কথা—শরৎবাবু কল্পনাতেও তাহা

আনিতে পারিতেন না, এবং এই জন্যই মণিকা ও বাদলের উপর তাঁহার যথেষ্ট টান থাকাতেও, তাহার কিছুমাত্র প্রকাশেও তাঁহার কম ভীতির সঞ্চার হইত না। তাই দীর্ঘ একটী বৎসর রোগে রোগে ভুগিবার পর ডাক্তার আসিয়া যখন মণিকার রোগকে থাইসিস বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গেলেন তখন কন্যার রোগ এবং পত্নীর রাগ এই উভয়ের ভাবনায় তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন।

(৩)

সে আজ কতদিনের কথা, এগার বছর এবং নয় বছরের দুইটী কন্যা রাখিয়া গেলেন, মাতৃহীন শিশু দুইটী তখন পিতাকেই তাহাদের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, পিতাও তখন এই শিশু দুইটীর মধ্যে—ইহাদের হাসিতে খুসিতে, গল্পে-স্বল্পে, ইহাদের প্রত্যেক কিছুতেই পত্নীর সুস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাইয়া তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতেন। সুখে দুঃখে রোগে ভোগে তাঁহার অক্ষম হস্তের অক্লান্ত যত্ন পাইয়া ছেলেমেয়ে দুটী নির্ভাবনায় মানুষ হইয়া উঠিতেছিল,—কিন্তু গ্রহের ফের,—কেমন করিয়া কি যে হইয়া গেল কে তা বলিবে, নববধূ সুধাময়ী আসিয়া কবে একদিন সংসারের সকল কিছুর ওলট পালট করিয়া দিয়া নিজে একেবারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া বসিলেন, এবং সেইদিন হইতেই পিতার সঙ্গে পুত্র-কন্যাদিগের সম্পর্ক মনের ভিতরে যাহাই থাক্—বাহিরে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; খুব কম কিছু নয়, সেও আজ দীর্ঘ তিন বৎসরের কথা!

পুত্র-কন্যা সম্বন্ধে পত্নীর সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা করিতে গিয়া এমনই ভাবে তিক্ত ব্যবহার পাওয়া শরৎবাবুর কাছে এ কিছু নূতন নহে। কিন্তু আসন্ন মরনোন্মুখ কন্যা সম্বন্ধে আজিকার এ কথাগুলি বুকে তাঁহার বোধ হয় একটু বেশী পরিমাণেই বিঁধিয়াছিল, তাই প্রতিদিনকার মত অভিমানিনীর মান আজ আর ভাঙ্গিতে না গিয়া, নীরবেই চেয়ারখানিতে বসিয়া রহিলেন। আজ অবসর পাইয়া মনটাও তাই, পুরাতন বহু স্মৃতির সঙ্গে সমানভাবে তুলনা করিয়া বর্ত্তমানের কত কথা, কত কাজ নিষ্ঠুর পিতৃ হৃদয়ের সাক্ষীস্বরূপ ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু মোহ বলিয়া মানুষের হৃদয়ে যে একটা দুর্ব্বলতা আছে, মানুষের নিজস্বটুকু তাহাতে সর্ব্বদা ঢাকা পড়িয়াই থাকে। কিছুক্ষণের জন্য শরৎবাবুর পিতৃ-হৃদয়ের উপর অনুতাপের যে চিহ্নটুকু জন্মিয়াছিল, তরুণী পত্নীর অভিমানের অশ্রুজলে তাহা ধৌত হইয়া কোথায় মিশিয়া গেল। কিন্তু এই যে একটা অপবিত্র দারুণ বোঝার মত কন্যাটী ঘাড়ে চাপিয়া রহিল, ইহার সম্বন্ধে কোন কিছুর ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত পতি-পত্নীর ভিতর হাসি-খুসিটা খুব তেমন জমিয়া উঠিল না।

সুধাময়ীর ব্যবস্থা অনুসারে তেতলার ঘরখানি মণিকার জন্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়া "নার্সে'র" উপর তার সমুদয় ভার অর্পণ করা হইল। কিন্তু তথাপি সংসারের সকল কিছু হইতে একেবারে পৃথক করা, এই ঘরখানিতে মাতৃহীনা রোগা মেয়েটাকে চির নির্ব্বাসন দিয়াও সুধাময়ীর খুঁৎ-খুঁৎ করা তবু ঘুচিল না,—প্রতিদিন কত ভাবে কত প্রকারে তীব্র একটা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তিনি জানাইতেন, বাড়ীর বিষাক্ত হাওয়ায় তাঁহার শিশু কন্যাটি দিনে দিনে শুকাইয়া উঠিতেছে।

তেতালার এই ক্ষুদ্র গৃহখানিতে বাড়ীর ঝি-চাকরের যাওয়াও নিষিদ্ধ হইয়া উঠিল, মণিকার পথ্য যাহা কিছু দরকার, বারাণ্ডায় ষ্টোভ জ্বালিয়া নার্সই তাহা প্রস্তুত করিয়া লইতেন। শারীরিক সেবা-শুশ্রূষা যাহা কিছু প্রয়োজন নার্সের স্নেহপ্রবণ মন এবং নিপুণ হস্তের যত্নে মণিকার সে সকলই যথাসম্ভব সম্পন্ন হইত, কিন্তু শুধু শরীরের যত্নে মনের ক্ষুধা কি মেটে?—মণিকার স্বাস্থ্যেরও তাই কোন উন্নতিই দেখা গেল না। সন্ধ্যার পর আফিস হইতে ফিরিয়া পিতা দশ পনর মিনিটের জন্য কন্যার কাছে একবার আসিতেন সত্য, কিন্তু সে আশায় মণিকার মনে সুখের চেয়ে দুঃখই উছলিয়া উঠিত বেশী; কোন দিন কোন কারণে পিতার আসিতে দেরী হইলে সেটাও যেমনি তাহার অসহ্য হইত; আবার পিতা সম্মুখে আসিলেও তেমনি সে সহজভাবে তাঁহার পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিত না, তাঁহার প্রতি এমনি একটা অভিমান, একেবারে তাহার রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছিল, যে তাহা হইতে

মনটাকে মুক্ত করিয়া আনা, কিছুতেই তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে,—পিতা আসিয়া প্রতিদিনকার মত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া গেলে মণিকা শয্যা ছাড়িয়া বাহিরে খোলা ছাদটীতে একটা ইজি চেয়ারে আসিয়া বসিল। এই সময়টায় ঘণ্টা দুই তিনের জন্ম, প্রতি-দিন সে নার্সের শুশ্রূষাধীন ক্লান্ত মনটাকে, বাহিরে মুক্ত হাওয়ায় আনিয়া অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যও নিজেকে তৃপ্তি দিতে চাহে। এই সময়টুকুর জন্য শুধু ঔষধ পথ্যাদির সকল কিছুর দৃঢ় বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন হইতে চাহে; নার্সের সঙ্গ, কিংবা তাঁহার কোন কথাবার্ত্তাও এই সময়টায় কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। পাশে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা ছোট তেপায়া খানিতে গোটা চার পাঁচ চাঁপা ফুলের তোড়া। ফুলগুলি হাতে তুলিয়া, মণিকার চোখদুটী জলে ভরিয়া উঠিল,—ছোট ভাই বাদল গড়ের মাঠে খেলিয়া ফিরিবার পথে, নিজের জলপানির পয়সা দিয়া প্রতিদিন দিদির জন্য ফুল কিনিয়া আনে; এবং গোপনে আসিয়া নিজের হাতে ফুলগুলি দিদিকে দিয়া যায়। আজ ঘরে বাবা ছিলেন, সাহস করিয়া ভাইটী তাই ঘরে ঢুকিতে পায় নাই—ছাদের উপর দরজাখানির এপাশে ওপাশে বার কয়েক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, ঘরে থাকিয়াও দিদির চোখ দুটীতে সেটুকু এড়ায় নাই,—দিদির হাতে ফুলক'টি দিতে না পারিয়া টেবিলখানিতে রাখিয়া গিয়াছে,—জানে বাবা চলিয়া গেলে দিদি ছাদে আসিবে।

তোড়াদুটী সযত্নে, সস্নেহে এ পাশে ও পাশে হাতে ঘুরাইয়া দেখিতে দেখিতে হু হু করিয়া মণিকার চোখে জলধারা ছুটিয়া চলিল। পেছন হইতে কে আসিয়া সহসা চোখ টিপিয়া ধরিল; এবং তৎক্ষণাৎ সিক্ত হাতখানি তুলিয়া সামনে আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিল "মণুরাণী, কাঁদছ? কেন? হঠাৎ আবার এ কি হ'ল মণি, মাথা ধরেছে? শরীর খারাপ হয়েছে?"

শীর্ণ হাতখানিতে চোখদুটী মুছিয়া কণিকা বলিল "হয় নি কিছু, আপনি এত দেরি করলেন!"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীলকুমার বসিয়া বলিলেন, "তাই!—পাগলী মেয়ে, তাই কান্না? আমার কি আর বাজে কাজ আছে কিছু? খালি এখানে বসে থাকলে চলে না? লোকেই তা হলে বলবে কি?"

অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া সিক্ত জড়িতস্বরে কিশোরী উত্তর করিল "বলুক গে যা খুসী। আপনার ত আর বাবা মা নেই, আপনাকে বকবে কে? আর আপনি নিজে জমিদার, আপনার আবার কাজ কি? কাজ কর্ব্বার কত লোক ত আপনার আছে!"

"জমিদার বলেই ত কাজ বেশী আরো। অত লোকের কাজ দেখতে হবে না? পাগলু; খালি রাগ আর রাগ!"

সুশীল হাসিয়া মণিকার শীর্ণ হাতখানি হাতে তুলিয়া লইলেন। সোণার চুড়ি দু'গাছি হাতের মণিবন্ধ ছাড়িয়া ক্রমে বাহু অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া সুশীলের মন করুণায় ভরিয়া উঠিল।

মা-হারা বেচারী, কে বা এমন করিয়া চাহিয়া দেখে! সস্নেহে হাত দু'খানি এদিক ওদিক ঘুরাইয়া দেখিয়া সুশীল প্রশ্ন করিলেন—"আজ ওষুধ খেয়েছিলে মণিকা? ডাক্তার এসে কি বলে গেল?"

"নিত্যি নিত্যি ত সেই একই কথা,—ও আর কি বলবো!"

গভীর ক্লান্তিতে মণিকা তাহার ক্ষুদ্র দেহখানি ইজি চেয়ারটীতে এলাইয়া দিল। সুশীল ব্যথাভরা চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। উর্দ্ধে অনন্ত শূন্যে চাঁদে মেঘে তখন লুকোচুরি খেলা,—কপালখানির উপর হাত দু'খানি পাতিয়া রাখিয়া মণিকা শূন্যদৃষ্টিতে সে অনন্ত শূন্যে তাকাইয়া রহিল। ধীর শান্তগতিতে নার্স শিশি হাতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—মণিকার মুখে আবার গভীর বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। এই দীর্ঘ এক বছর দেড় বছরে তাহার প্রতিবাদ করিবার শক্তিও বুঝি ক্রমে লোপ পাইয়াছিল। নীরবে ওষুধ খাইয়া আবার শুইয়া পড়িল।

নার্স চলিয়া গেলে সুশীল নিজের চেয়ারখানা মণিকার মাথার কাছে আর একটু টানিয়া সরিয়া বসিলেন এবং রুক্ষ চুলগুলি হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ঘুম পেয়েছে মণিকা? ঘরে যাবে?"

"না আপনি যখন যাবেন, তখন যাব।"

"থাকবে আর একটু ? বেশী রাত হলে পরে যদি ঠাণ্ডা লাগে ? তার চেয়ে চল এখনি ঘরে রেখে আমি যাই।"

মণিকা শশব্যস্তে সুশীলের হাতদুটী চাপিয়া ধরিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "না, না, না। থাকুন আপনি আর একটু,—আবার ত সেই কালকের সন্ধ্যে !"

সুশীল মৃদু হাসিয়া আর একটু সরিয়া বসিলেন। অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারা তখন ঝিকিঝিকি চিকিমিকি করিতেছিল। বৈশাখী দিনের গভীর উত্তাপের পর রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাস তখন সহরের উপর শান্তির একটা প্রলেপ বুলাইয়া বহিতেছিল—রাস্তার উপর একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাণ্ড চাঁদটা দুই হাতে তার অজস্র কিরণ বর্ষণ করিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল। সুশীল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া রহিলেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল,—সুশীল সচকিত হইয়া ফিরিয়া বসিলেন, এবং একটু নত হইয়া মণিকার হাত দু'খানি কোলের উপর তুলিয়া ধীর শান্তস্বরে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, একটা কথা বলত মণিকা ; আমি কাছে থাকলে তোমার ভালো লাগে খুব ?"

নীরবে মণিকা ঘাড় নাড়িল !

"খুব, খুব ভাল লাগে ? থাকবে আমার কাছে সব সময় ?"

সবিস্ময়ে মণিকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—

সব সময়ে কি করে হবে ?

সে যদি আমি সম্ভব করে নিই !—কিন্তু বল তুমি, তোমার কি ভালো লাগে খুব ? তুমি সুখী হবে তাতে ?

কতকটা না বুঝিয়া, কতকটা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া মণিকা চোখ বুজিল, সুশীল দাঁড়াইয়া দুইহাতে তাহার মাথাটি বুকে তুলিয়া ধরিলেন, এবং নত হইয়া সস্নেহে কপোলখানির উপর ভালবাসার একটী চিহ্ন আঁকিয়া দিলেন।

(৪)

পাগলের মত কথা বল কেন বাপু ? এও কি সম্ভব ?

কুণ্ঠিত নতমস্তকে সুশীলকুমার উত্তর করিলেন,—আমি নিজে থেকেই ত বলছি, তবে কেন সম্ভব হবে না ?

আমার রোগা মেয়ে, তারপর রোগটীও কিছু কম নয়,—জানত তা ? সব জেনেও এ কি পাগল তুমি ! আর লোকে আমায় ছিঃ ছিঃ করবে যে, না না, এ চিন্তা তুমি মনেও এনো না ; শরৎকুমার গম্ভীর ভাবে আবার খবরের কাগজে মন দিলেন, সুশীল উঠিল না, নড়িল না, সেখানেই নতমস্তকে বসিয়া রহিল !

সুশীলদা, আজ যে বলেছিলেন আমাকে বায়স্কোপে—

ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বালক বাদল পিতাকে দেখিয়া সসঙ্কোচে ফিরিয়া গেল,—শরৎবাবু মুখ তুলিয়া দেখিলেন,—পুত্রকন্যার অন্তর হইতে তিনি যে কতখানি—কত বেশী দূরে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া অন্তর তাঁহার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পিতার প্রতি ভালবাসা, ভক্তি মনে তাহাদের কতখানি আছে বিধাতাই তাহা জানেন, কিন্তু শঙ্কা এবং সঙ্কোচ তাঁহার প্রতি কতখানি তাহাদের, তার প্রমাণ তিনি মাঝে মাঝে আরো অনেকবার পাইয়াছেন। একটা ক্ষুব্ধ ভাব, একটা বেদনা মনটাকে তাঁহার কেবলই খোঁচাইয়া পীড়ণ করিতে লাগিল। কিন্তু সে দোষ কাহার ? পিতার না পুত্রকন্যার ? পিতা হইয়া পুত্রকন্যার মনের পানে কবে তিনি চাহিয়াছেন, এই দূরত্ব তিল তিল করিয়া এখন উহাদের কতদূরে লইয়া গিয়াছে ! পুত্র আসিয়া বায়স্কোপে যাবার আব্দার করে প্রতিবেশী যুবক সুশীলের কাছে—কন্যা তাহার রোগের যন্ত্রণা ফলফুলের তৃষ্ণা, তাহার ছোটখাটো ক্ষুদ্র অভাবের কথা বলে সুশীলকে ! এই যে মৃত্যুশয্যা শায়িতা, তাঁহার রুগ্না কন্যার সমুদয় ভার নিতে চাহিতেছে, এই নিতান্তই পর অনাত্মীয় যুবক, এও কি তাঁহারই নিকট হইতে কন্যার মুক্তি প্রার্থনায় ? বিক্ষিপ্ত চিত্তে কাগজ হইতে মাথা তুলিয়া সুশীলের শান্ত মুখখানির পানে তিনি তাকাইলেন,—শান্ত বটে, কিন্তু কি গভীর দৃঢ়তা মাখা,—আজ যে করিয়াই হোক, সম্মতি গ্রহণ না করিয়া এ কিছুতেই যেন উঠিবে না এই উহার প্রতিজ্ঞা !—মনের ভাব গোপন করিয়া শরৎবাবু স্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, তোমার কাজকর্ম্ম চলছে কেমন ? নসিপুরের ও তালুকটাও কিনে নিয়েছ ত ? মাথা তুলিয়া সুশীল কহিল, "হ্যাঁ ওদিককার গোলমালগুলো একরকম মিটিয়েই নিয়েছি, এখন একবার সুন্দর বনের

ওদিকটায় নিজে ক'দিন নৌকো করে ঘুরে দেখব, ভাবছিলুম তার আগে,—আপনার যদি—মত হোত—

না, না, না ও পাগলামো তুমি ছেড়ে দাও,—ওকে নিয়ে কি ভাবনা আমার জান ত? কেন তুমি নিজে মাথা পেতে বিপদটা তুলে নেবে বাপু? বেশ আছ, বিষয় সম্পত্তি এত রয়েছে, কত বড়লোকের শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে পায়ে তোমার সেধে এনে ফেলে দেবে,—কেন বাবা মিছে এ জঞ্জাল ঘাড়ে নেওয়া! তারপর ক'দিন আর বাঁচবে বল, এমন যদি হোত, ভুগে টুগে আবার ভাল হবার আশাও থাকত, তবু সে এক কথা হ'ত, তা ত নয়,—আর ক'দিন? ডাক্তার কেন সেদিন যা বলে গেলেন,—তাতে ত আমি আর ছ' মাসও আশা করি না! এখানে যাহোক তবু একভাবে কেটে যাচ্ছে। নার্স রেখে দিয়েছি,—সেবা শুশ্রূষা হচ্চে—ডাক্তার দেখছে,—তারপর যেদিন যাবার চলে যাবে।

বাপের কর্ত্তব্য বাপ হয়ে কতটা করলুম জানি না, তবে মায়ের জিনিষ এখন মায়ের কাছেই যাক, আমিও নিশ্চিন্ত হই।—শেষের দিকে গলার স্বর তাঁহার কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল।

কিন্তু কাকীমারও কি ইচ্ছে সর্ব্বদা ছিল, তা ত আপনি জানতেন।

হ্যাঁ, তা জানতুম বৈকি! কিন্তু সে ইচ্ছা মিটিয়ে তিনি নিজেও যেতে পারলেন না, আর ওরও এমন ভাগ্য নয়, তা নইলে কেন এ দুরন্ত রোগে ওকেই ধরলে বল! যাক্, তুমি ও পাগলামো ছেড়ে দাও,—যে কটা দিন ওর আর আছে এখানেই নিশ্চিন্তে থেকে শেষ হয়ে যাক্, ওর মাথায়ই বা কেন আর ও নূতন চিন্তা ঢুকোবে বাবা? বেশ আছে, নার্স রয়েছেন, ডাক্তার প্রতিদিন দেখছেন!

কিন্তু নার্সের যত্নই কি খুব যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন?

জান ত, তোমার নূতন কাকীমার কোলে ওইটুকু ত কচি মেয়ে, তিনি ত আর এ নিয়ে এ রোগে বেশী দেখাশোনা কর্ত্তে পারেন না,—আর এ সব শিক্ষিতা নার্সের চেয়ে উনি কি আর ওসব কাজ ভাল জানেন? আফিসের ঝঞ্ঝাটে আমিও তেমন একটা দেখাশোনা কর্ত্তে পারি নে।

নতমস্তক উত্তোলন করিয়া সুশীল বলিল,—"তাইত বলি, আমার হাতে একবার ওর সেবার ভার দিন কাকাবাবু, ভাল করা না করা সে ভগবানের হাত, কিন্তু বাকি দিন ক'টা আমার কাছে ও এর চেয়ে আরামে কাটিয়ে যাক। মনে করুন কাকীমা যদি বেঁচে থাকতেন, আর বিয়ের পর যদি ওর এই রোগ হোত, আমি কি ওকে ত্যাগ করতুম তখন?"

শরৎবাবু স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসিতেছিল। চাকর আসিয়া ঘরে আলো দিয়া গেল, এবং একজন দুজন করিয়া পাড়ার ভদ্রলোকরা আসিয়া শরৎবাবুর বৈঠকখানায় চাএর আশায় বসিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া সুশীল ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

(৫)

বৈশাখী শুক্লাসপ্তমী,—আকাশে বাতাসে জলে স্থলে; জ্যোৎস্নার এক স্বপ্নরাজ্য নড়িয়া উঠিয়াছে—তাহারই ভিতর দিয়া, স্বল্প জল রাশি কাটিয়া কাটিয়া, মায়া তরীর মত সুশীলের সুন্দর ছোট্ট পানসী খানি হেলিয়া দুলিয়া পারে পারে চলিয়াছে—ছাদের উপর সুন্দর শুভ্র বিছানায় বসিয়া তন্ময় চিত্তে সুশীল এস্‌রাজে ছড়ি চালাইয়া মৃদু মৃদু গান গাইতেছিল। আর তাহারই গায় হেলান দিয়া ইতস্ততঃ মুগ্ধ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া জলের উপর জ্যোৎস্নার অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখিতেছিল—মণিকা।

সুশীল ছড় তুলিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিলেন, "মণিকা, মণি, তোমার সে গানটী একবার খুব আস্তে আস্তে পার্ব্বে গাইতে? বাজাব আমি?"

"কোন্ গান্‌টা সুশীল দা?"

—সুশীলদা,—ফের সুশীলদা?

লজ্জায় মুখখানি সুশীলের কোলে লুকাইয়া স্মিত প্রফুল্ল কণ্ঠে মণিকা কহিল, "বাঃ রে ভুলে যাই যে!"

"ভুলে গেলে কি শাস্তি তা জাননা বুঝি দুষ্টু মেয়ে? দুই হাতে সে অপরূপ সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি সুশীল চাঁদের আলোয় তুলিয়া ধরিলেন। দুইটী মাত্র মাসে কি আশাতীত পরিবর্ত্তন! কে বলিবে সেই মরণ শয্যা শায়িতা, রুগ্না, দুর্ব্বলা, মাতৃহারা অভাগা মণিকা—এই সেই! দীর্ঘ দিন

ব্যাপী ডাক্তারের ওষুদে যাহা হয় নাই, বেতন ভোগী নার্সের শুশ্রূষায় যাহা হয় নাই, সুশীলের একনিষ্ঠ গভীর প্রেমে তাহাই কি সম্ভব করিয়াছে ! দুটী হাতে সুশীলা সেই সুন্দর পরম সুন্দর মুখখানি বুকের উপর তুলিয়া ধরিলেন। সাদা পাতলা ব্লাউসের সঙ্গে জরি পাড় মাদ্রাজী পাতলা শাড়িখানি মনিকার ক্ষুদ্র দেহ বেষ্টন করিয়া গলার কাছে ঘুরিয়া গিয়া শয্যার উপর এলাইয়াছে। সুশীল বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সে ক্ষুদ্র দেহের রূপমাধুরীর পানে তাকাইয়া রহিলেন। সে তন্ময় দৃষ্টিতে লজ্জিত হইয়া, মণিকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাসিয়া কহিল "যাও তুমি ভারি দুষ্টু।"

সুশীলাও হাসিয়া নিবিড় ভাবে সে মুখখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে পানসীখানি যখন আরো খানিক এদিকে ওদিক ঘুরিয়া রন্ধন রত চাকদের বড় বজরাটীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, নীরব জলভূমিতে এস্রাজের সুরে গলা মিশাইয়া মণিকার ক্ষীণ কণ্ঠের কম্পিত সুর তখনও চারিদিকে ভাসিয়া যাইতেছিল—

"অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া ;
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি আমারা দুজনে যাত্রী"—

(৬)

জল বায়ুর গুণেই হোক, অথবা সুশীলার আত্ম-বিস্মৃত গভীর প্রেমেই হোক যে রোগ এই দীর্ঘ একটা বৎসর চাপা পড়িয়াছিল শীতের শেষে আবার তাহার চিহ্ন মণিকার ক্ষুদ্র দেহ খানির উপরে প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল; একদিনে, দুইদিনে, মনিকা ক্রমে পুর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল চিন্তিত হইয়া সুশীল তাহার গৃহবাস ছাড়িয়া দিয়া আবার জলের উপর পানসীর ব্যবস্থা করিলেন, এবং অন্য সকল কাজ, সব কিছু ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া পত্নীর সেবায় নিজেকে নিয়োগ করিলেন।

একদিন দুদিন করিয়া একমাস কাটিল, দুমাস কাটিল সুশীলের সে প্রাণান্তক সেবা দেখিয়া চিকিৎসক পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু রোগের আর উপশম কিছু হইল না। সকল সেবা সর্ব্বোপরি সকল ভালবাসা ব্যর্থ করিয়া দিয়া মণিকা তিলে তিলে পলে পলে মরণের পথে অগ্রসর হইয়া চলিল—সুশীল সকল কিছু বোধ্য এবং অবোধ্যের অতীতে গিয়া তন্ময় দৃষ্টিতে কেবল সেই প্রিয় অতি প্রিয় মুখখানির বর্ণ পরিবর্ত্তন ভাব পরিবর্ত্তনের পানে চাহিয়া থাকিতেন ; আকাশের চাঁদ জলের জ্যোৎস্না জল পশির কাকলি,—তাঁহার চোখে তীব্র দাহকর হইয়া জ্বলিত। কচিৎ কখনও যদি মণিকা তাহার অবস চক্ষু দুটী মেলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিত, সুশীল তাহাকেই তাঁহার পরম পুরস্কার বলিয়া জ্ঞান করিতেন।—কিন্তু তবু—তবু সুশীল পুরুষ মানুষ চার মাসে, পাঁচমাসে কবে কখন কে জানে,—মনের মাঝে চেতনার সঞ্চার হইয়া, হতাশার অবসাদে সুশীলের সর্ব্ব দেহ মন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, মৃত্যু যাহার নামে পরোয়ানা পাঠাইয়াছে, তাহার শিয়রে বসিয়া দিন গোণা যায় আর কত দীর্ঘ দিন ?

জল, জল, জল,—অসহ্য হইয়া উঠিল, সুশীল ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, জমিদারীর কাজ কর্ম্ম এই দীর্ঘ ক'মাসে কিছুই যে হয় নাই, রাশিকৃত চিঠি পত্র নিয়া একে একে তার জবাব লিখিতে সেদিন সন্ধ্যায় সুশীল বাহিরে আসিয়া বসিলেন।

সংসারে এক রকম লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কোন বিষয় নিয়ে বেশীক্ষণ ভাবিয়া দেখিতে পারেনা এবং কাজটি মনে হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কাজে তাহার সূচনা না করিয়াও তাহারা সোয়াস্তি পায় না—সুশীল ছিলেন এই শ্রেণীর লোক।

রাতের আঁধারে আকাশের তারা তখন কালো জলে ঝিকিমিকি করিতেছিল, শয্যার উপর জাগিয়া বসিয়া মণিকা ঝিকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই এখনো যাস্ নি গোলাপ ? উনি বুঝি খেতে গেছেন ?

—ওমা, দাদাবাবুর খাওয়া ত কখন হয়ে গেছে বৌদি ! দাদাবাবু যে আজ বাইরে ঘুমুলেন, আমিই আজ এখানে শোব। দুঃখিত চিত্তে মণিকা জানালায় মুখ রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিল, স্থির শান্ত নিশ্চল জল,—বাতাসে জোর লাগিলে ধীরে ধীরে এক একবার শুধু কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, চাহিতে চাহিতে মণিকার চোখে জল আসিল। এমন ত কখন হয় না, বিবাহের এই দুইটী বৎসর কাটিয়াছে, এমন ত কখন আর হয় নাই, আজ কেন এমন হইল ; আর বুঝি

তাঁর ভাল লাগে না। দুটী চক্ষু দিয়া মণিকার অজস্র-ধারে জল ঝরিয়া ঝরিয়া নদীর জলে মিশিতে লাগিল। ভোরের দিকে চোখে মুখে রোদ পড়িয়া ঘুম ভাঙ্গিতেই সুশীল উঠিয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—কাছে বসিয়া মাথাটী বুকের মধ্যে টানিয়া নিয়া সস্নেহে ডাকিলেন—"মণিকা, মণি, আঃ এ কি, সারারাত কি এইভাবেই জানালায় ঘুমুলে?—ওকি, ছিঃ ছি ছি, চোখে জল? কান্না কিসের?"

বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে মণিকা কহিল, "কেন তুমি আমাকে জাগালে না? কেন তুমি আমাকে ঝির কাছে একলা রেখে বাইরে শুলে?"

—"ও তাই! পাগলু আমার, আমার যে কাল অসুখ ক'রেছিল! তাই না বুঝে এত কান্না?"

মণিকা শিহরিয়া উঠিয়া এক নিমেষে স্বামীর সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া ফেলিল, আর অনুতাপে ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া আদরে আদরে পত্নীকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া মনে মনে সুশীল বারবার বলিতে লাগিলেন, "আর নয়, আর এমন নয়, বেচারী আমার বেচারী!"

কিন্তু জোড়া তালি দিয়া ক'দিন আর চলে? দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে সুশীলের কত পরিবর্ত্তনই মণিকার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, আর আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া মণিকা শুধু অবাক্ হইয়া রহিল।

(৭)

স্বামীর ভাব দেখিয়া মণিকা ক্রমে নিজের সমুদয় ইচ্ছার বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়া, সকল কিছুতেই আপনাকে নির্ব্বিকার করিয়া তুলিল এবং এইভাবে প্রত্যেকটী শান্তিহীন দিন ও নিদ্রাহীন রাত তিলে তিলে তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিল।

সেদিন রাত্ত তখন অনেকটা,—পর্দ্দার ওপাশে ডাক্তারের সহিত স্বামীর যে কথোপকথন হইতেছিল তাহাতে তাঁহার ব্যবসা এবং অন্যান্য সকল বিষয়েই অপরিমিত ক্ষতি এবং তাঁহার যে বিরক্তি স্বরের মাঝেই ফুটিয়া উঠিতেছিল, সহসা তন্দ্রাভঙ্গ মণিকার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বোধ হইল। ডাক্তার বলিতেছিল, তাইত, আপনার শ্বশুর বাড়ীতেও কি এমন কেউ নাই যিনি এঁর সঙ্গে থাকতে পারেন! একলা মানুষ আপনি, আপনাকে এই দিকে শুধু দেখতে গেলে ও দিকের ক্ষতি ত হবেই, অত বড় তালুকটা নিলাম হয়ে গেল! এ কি কম আপশোষ!—

স্বামী উত্তেজিত স্বরে কি একটা কথা বলিয়া চুপ করিলেন, মণিকা স্পষ্ট তা শুনিতে পাইল না। তারপর আরো কতক্ষণ কাটিল কে জানে, মণিকা তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। গোলাপ খাবার নিয়া দুই চারিবার ডাকাডাকি করাতে মণিকা বিরক্ত হইয়া খাবার শুদ্ধ তাহাকে ফিরাইয়া দিতেই সুশীল পরদা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন—না খেয়ে ফিরিয়ে দিলে কেন? ক'বার করে ওরা যাওয়া আসা কর্ব্বে? মানুষের পা ত ওদেরও, না কি ঝি চাকর বলে—

তীব্র অভিযোগ! মণিকা উঠিয়া বসিয়া গোলাপের হাত হইতে দুধের বাটিটা নামাইয়া এক নিঃশ্বাসে খানিকটা খাইয়া আবার নিঃশব্দে বাটিটা ফিরাইয়া দিল, আহত মনে তাহার কথা কাটাকাটি করিবার আর শক্তি ছিলনা।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে নদীর ভিতর হইতে একটা তীব্র হাওয়া উঠিয়া ক্ষুদ্র পানসীখানি তাহাদের কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া ওপারে বনভূমিতে মিশিতে লাগিল। স্বামী ওপাশে পাশ ফিরিয়া আরামে ঘুমাইতেছিলেন। একবার তাঁহার পানে চাহিয়া চাদরখানি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঢাকা দিয়া মণিকা জানালার শার্সি খুলিয়া বসিল! বড় বজরাখানিতে চাকরদের কাজকর্ম্ম ততক্ষণে শেষ করিয়া কেহ কেহ শুইয়াছে, কেহ কেহ জলে পা দিয়া আরামে বসিয়া গল্প করিতেছে। রসিক মাঝি একাকী চিৎ হইয়া শুইয়া দুই হাত কপালে রাখিয়া আকাশের পানে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে গানে সুর তুলিয়াছে—

বধূ মন কেন বা কর ভা—রী,
সহর থা'ক্যা আ'ন্যা দিব টাক্যা দামের শাঁঠরী—
আইজের পাওনা একটী টাকা তোমার তরেই করমু
আমি ব্যয়
ভারী মুখে হাসি ফুটাও ধরি বধূ পায়।

মণিকার হাসি পাইল, দরিদ্র স্বামীর দরিদ্র বধূর

কতটুকুতেই সন্তুষ্টি! একটাকার অধিকারী তাহার যথা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বধূর ভারী মুখে হাসি ফুটাইতে ব্যস্ত!

রাত্রি বাড়িতে লাগিল,—শেষ রাত্রির শীতল বাতাসে মণিকা তাহার সকল ভাবনা চিন্তা অন্ধকারে ডুবাইয়া ক্লান্ত মাথাখানি জানালায় রাখিয়াই গভীর অবসাদে ঘুমাইয়া পড়িল। ভোর বেলা সুশীল জাগিয়া দারুণ বিরক্তিতে হাত ধরিয়া টানিয়া মণিকাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন, কঠিন করস্পর্শে মণিকা জাগিয়া চমকিয়া চাহিল, সুশীল তীব্রস্বরে বলিলেন, 'দুর্ভোগ ত কম কিছু হচ্চে না, কেন আর নতুন করে ভোগাবে বল।

সারা দিনটা কাটিয়া গেল, স্বামী গভীর বিরক্তির সঙ্গে সারা দিনটাই বিষয়-কর্ম্মের খাতা পত্র দেখিলেন, চিঠিপত্র লিখিলেন, মণিকা চাহিয়া চাহিয়া দেখিল।

দুপুর কাটিল, সন্ধ্যা কাটিল, রাত্রি আসিল, মণিকা জানালায় বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বাহিরে তাকাইয়া রহিল,— , শুধু জল যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু জল, এ জলের, এ অফুরন্ত জল রাশির কোথায় যাইয়া বিলীন হইয়াছে, কে তা জানে! স্রোতের পর স্রোত; তাহার পর স্রোত; এ স্রোতোরাশি কোথায় চলিয়াছে কে তাহার খবর রাখে!

সারাদিনের মৃদু স্রোতোধারা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রম-বর্দ্ধমান হইয়া নদীটাকে ফুলাইয়া তুলিতেছে, পশ্চিম গগণে একপ্রান্তে একটী কালো মেঘ দেখা দিয়াছে, আহারাদির পর সেদিকে তাকাইয়া সুশীল কহিলেন, "তোমার দয়ায় দেখচি জলের উপর অপঘাতে মরণ লেখা রয়েছে কপালে! এবার আর বাড়ী ফিরে যেতে হবে না!"

একটা বালিশ সামনে টানিয়া নিয়া, সুশীল কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

মণিকা নির্নিমেষ নয়নে নদীর ওপ্রান্তে গাছগুলির কালো ছায়ায় ঘেরা জায়গাটীর পানে চাহিয়া রহিল।—কতকাল আর কতকাল—এমনি করিয়া এ আঁধারে চাহিয়া থাকা যায়! মাগো মা, আর যে পারি না! দুটি চক্ষু ছলছল করিয়া ফোটা ফোটা জল মণিকার গাল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। আচ্ছা, ঐ ওধারে নদীর ঐ অনেক দূরে নীল রেখার কি ও দেখা যায়? ও কি স্বর্গে যাবার পথ! ওখানের ঐ উপরের তারাটিতে কি আমার মা আছেন?......মাগো মা, এই এত কাছে তবু এতদিন দেখা দাও নাই কেন? মা, মাগো, মা,—মণিকার বুক ভরিয়া উঠিল। এই মা ছাড়া কে আর তার সংসারে আছে? কৈশোরে ছিল সে পিতার গলগ্রহ, আজ সে গলগ্রহ স্বামীর! এত কষ্ট কি সওয়া যায়? এ বুকটা ভরিয়া কত কষ্ট সে খবর কি কেউ রাখে,—আজ স্বর্গের পথ যদি এত কাছে, আজ মা যদি এত কাছে, এত কষ্ট সহ্য সে আর করিবে কেন!......বাদল.........আহা থাক বাদল, পুরুষ মানুষ তার আবার ভাবনা কি!

বাহিরে তখন নদীর উপর বাতাসের তাণ্ডব নৃত্য পড়িয়া গিয়াছে, পানসীখানি বার বার এপাশে ওপাশে দুলিয়া দুলিয়া সুশীলের কাণে ঘুমপাড়ানি গাহিতে লাগিল, মণিকা একবার স্বামীর সেই নিশ্চিন্ত আরামের পানে তাকাইয়া দেখিল, সেই তালুক হারানো চিঠিখানা এবং তাহার প্রত্যুত্তর লেখা কাগজখানি কাছেই ছিল, মণিকা একবার সে কাগজ দুখানি হাতে নিয়া দেখিল,—মনে পড়িল, স্বামীর বিরক্তি স্বামীর ক্রোধ! আকাশে সেই তারাটি ক্রমে ম্লান হইয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে,—মণিকা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেদিকে তাকাইল,—তারপর—তারপর?

* * * *

সকাল বেলা যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ঝি চাকরদের সম্মুখে জেলের জালে জলে-বিকৃত মণিকার দেহ উপরে তোলা হইল, তখন তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া সুশীল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—

মণিকা, মণি আমার, এত রাগ! এত অভিমান মণি?

অন্ধের দৃষ্টি

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

পুত্র তখন প্রেসীডেন্সী কলেজে বি, এস-সি পড়িতেছিল। পিতা সগর্ব্বে লোকের কাছে পুত্রের কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রণব যে সে ছেলে নয়, লেখাপড়ায় সে না কি ভারতবর্ষের সকল ছেলের অগ্রগণ্য, স্বয়ং লাটসাহেব নিজের মুখে বলিয়াছেন প্রণব যেদিন পাস করিবে সেইদিনই তাহাকে ডেপুটি করিয়া দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

লাটসাহেব নিজের মুখে না বলুন, লাটের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট যে এ কথা বলিয়াছিলেন ইহা সত্য কথা। জমীদার রাখালবাবু সাহেবদের মনোরঞ্জন নীতিটা বেশ শিখিয়াছিলেন, এবং শুধু ভেট দিয়া, ডিনার পার্টি দিয়া, মেমসাহেবদের নানাপ্রকার উপহার দিয়া অতি সহজেই সাহেবদের বশ করিয়া লইতেন। তিনি বেশ জানিতেন মেমসাহেবদের কোনরূপে হাত করিতে পারিলেই সাহেবদের পাইবেন। ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়াটসন সাহেবের স্ত্রীকে তিনি মা বলিয়া মেমসাহেবের মন ভিজাইয়া দিয়াছিলেন, উপহারে মেম সাহেবের ঘর ভরিয়া গিয়াছিল, সুতরাং সাহেবও অল্পকালের মধ্যে বশীভূত হইয়া পড়িলেন। এখন মিঃ ওয়াটসন কমিশনার হইয়াছেন, সুতরাং রাখালবাবুর পাথরে পাঁচ কিল।

বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্ডি একটু কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার মেমটী আবার তাঁহার অপেক্ষাও কঠোর ছিলেন। বাঙ্গালীদের সাহেব ও মেম উভয়েই দেখিতে পারিতেন না সুতরাং প্রথমটায় এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করা রাখাল বাবুর পক্ষে বড় শক্ত হইয়া পড়িল। চতুর রাখালবাবু কৌশলে সাহেবের ছেলে মেয়ের সহিত আলাপ করিয়া লইলেন, এই দুইটী বালক বালিকা পিতা মাতার সহিত রাখাল বাবুর আলাপ করাইয়া দিল। মিঃ ও মিসেস হার্ডির ভুল ঘুচিল, তাঁহারা জানিলেন বাঙ্গালীদের মধ্যেও রাখাল বাবুর মত একান্ত সাহেব-ভক্ত কচিৎ কখনও মেলে। ক্রমে উপহারের পর উপহারে সাহেবের ঘর ছাইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য সাহেব দম্পতী প্রীত হইয়া উঠিলেন।

সাহেব মহলে রাখাল বাবুর বড় মান, সভায় সমিতিতে সাহেবদের আসনের পাশে তাঁহার আসন পড়ে, সাহেব ও মেম সাহেবরা সকলের সম্মুখেই রাখাল বাবুর করমর্দ্দন করেন, রাখালবাবু সগর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া উজ্জ্বল চোখে চারিদিকে দেখেন।

নিত্যই তিনি সাহেবদের ডিনার দেন। চাঁদার খাতায় কত দান করেন তাহার ঠিক নাই। এ হেন সাহেব-ভক্ত লোক পাইয়া সাহেবরা ভারী খুস, শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করেন। মিঃ হার্ডি—সেদিন চাঁদার খাতায় রাখালবাবু যখন বিনা দ্বিধায় একেবারে তিনহাজার টাকার সই করিয়া দিলেন তখন সানন্দে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"ধন্য রাখালবাবু, বাঙ্গালীর মুখ আপনিই রাখিয়াছেন।" গর্ব্বে রাখাল বাবুর বুকটা দশহাত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি সসম্মানে সেলাম ঠুকিয়া বলিয়াছিলেন, "হুজুর, আমার ছেলের কথা মনে রাখবেন, সে বি-এ পাস করতে পারলেই তাকে হাকিম করে দিতে হবে।"

মিসেস হার্ডি কয়েকদিন আগে রাখাল বাবুর নিকট হইতে কয়েক সহস্র মুদ্রা মূল্যের একছড়া মুক্তার মালা উপহার পাইয়াছিলেন মালাটী মেম সাহেবের বড় মনের মত হইয়াছিল, তিনি এখন সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই, আপনার ছেলে নিশ্চয়ই ডেপুটি হবে রাখালবাবু, আমার স্বামীর যদি নাও মনে থাকে আমি মনে করিয়ে দোব। গভর্ণরের স্ত্রী আমার মামার মেয়ে সে কথা জানেন বোধ হয়, আমি একবার অনুরোধ করলেই আপনার ছেলেকে কাজ তিনি দেবেন।"

সাহেবরা মুখের কথা খসাইতে না খসাইতে রাখালবাবু অকাতরে টাকা দিতেন, ইহাতে তাঁহার কষ্টবোধ আদতেই হইত না, কিন্তু দেশের লোক যখন জলকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নিবারণ জন্য সামান্য অর্থও সাহায্য চাহিত, তিনি তাঁহাদের হাঁকাইয়া দিতেন, স্পষ্ট বলিতেন, "আমার অত টাকা নেই হে, জমীদার হলেই যে সে কোটিপতি হবে এমন কোন মানে তো নেই। দেশের অভাব চিরকালই, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উপুড় করে দিলেও এ দেশের অভাব কোনকালে ঘুচবে না।"

নিজে বাঙ্গালী হইয়া তিনি বাঙ্গালী জাতটাকে বড় ঘৃণার চোখে দেখিতেন, স্পষ্টই বাঙ্গালীকে তিনি ভিক্ষুকের জাতি বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। চাঁদার খাতায় সই করিয়া দেওয়া দূরে থাক, কোন ভিখারী কখনও তাঁহার দুয়ারে একমুষ্টি ভিক্ষা বা একটা পয়সা পাইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। জমীদারের দুয়ার অতিথি বা ভিক্ষুকের কাছে চিররুদ্ধ।

প্রজার বুক বাঁশ দিয়া ডলিয়া তিনি খাজনা আদায় করিতেন। তাঁহার সাতখুন মাপ হইত—কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী যিনিই আসুন তিনি তাঁহার মা, যে কোন সাহেব তাঁহার কাছে দেবতা। এ হেন ভক্তের বিরুদ্ধে কেহ যদিও অভিযোগ করিতে আসিত, তাড়া খাইয়া অবিলম্বে তাহাকে পলাইতে হইত।

ইহাতে তাঁহাদেরও বেশী দোষ দেওয়া যায় না, রাখাল বাবুর অনেকগুলি হিতৈষী ছিল তাহারা রাখাল বাবুর দোষ দেখিতে পাইত না, ইহারাই জানাইত শত্রুরা দুষ্টামী করিয়া সাহেবদের মন ভাঙ্গাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টা করিতেছে। এমনি ভাবে সাহেবদের মনোরঞ্জন করিয়াই রাখালবাবু গত বৎসরে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন।

ইহারই মধ্যে পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধও ঠিক হইয়া গিয়াছিল। সাহেব মহলে তাঁহার মান প্রতিপত্তি দেখিয়া একটী ধনী ভদ্রলোক তাঁহার একমাত্র সুন্দরী কন্যাকে তাঁহার পুত্রবধূ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন, সঙ্গে তাঁহার বিশাল সম্পত্তি যৌতুক দিবেন। রায় বাহাদুর নিজের কপালখানায় একবার হাত বুলাইয়া দেখিয়াছিলেন, হাসি তাঁহার মুখে আর ধরিতেছিল না।

(২)

একজামিনের কয়টা দিন পূর্ব্ব হইতে বাড়ীতে খুব পূজা সস্ত্যয়নের ধুম লাগিয়া গেল। পুত্র যে পাস করিবেই, সে জানা কথা—তথাপি যদি পাশের পথে কোন বিঘ্ন থাকে তাহাই কাটাইবার জন্য এই পূজা সস্ত্যয়ন। রায় বাহাদুর-গৃহিণী প্রত্যহ সকাল হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া থাকেন, একান্ত মনে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন একমাত্র পুত্র যেন একজামিনে পাস করিতে পারে।

শেষদিনে রাখালবাবুও উপবাস করিয়া রহিলেন, এ দিনে হোম সস্ত্যয়ন শেষ হইতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। পুরোহিত যদুপতি ভট্টাচার্য্য হোমের শেষে দেবতাকে একটী অর্ঘ্য দিয়া তাহা হইতে একটী ত্রিপত্র বেলপাতা তুলিয়া লইয়া কর্ত্তার হাতে দিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "এই বেলপাতাটা আজই শ্রীমানের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কাল সোমবার হতে তার একজামিন আরম্ভ হবে, সেই সময় এটা চাই।"

রাখালবাবু যুক্তকরে ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "এ বেলপাতা দিয়ে কি কাজ হবে পুরুতঠাকুর মশাই ?"

যদুপতি ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এই বেলপাতা নিয়ে সে যেন প্রত্যহ কলেজে যায়, তা হলে দেখবেন সে সব বিষয়েই ফাষ্টো হয়ে পাশ করবে। এটা হচ্ছে কি জানেন—দেবতার নির্ম্মাল্য, যার কাছে থাকবে তার সব তাইতেই জয় হবে। আপনি আর দেরী করবেন না, আজই কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন।"

রাখালবাবু তখনই তাড়াতাড়ি করিয়া সরকারকে দিয়া কলিকাতায় পুত্রের কাছে বেলপাতাটী পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন দুপুরে সরকার হুগলী ফিরিয়া আসিল, তাহার মুখখানা বড় মলিন।

আহারাদি সমাপ্তে রাখালবাবু নিশ্চিন্তমনে তামাক টানিতেছিলেন আর নিমিলীত নেত্রে ভাবিতেছিলেন এতক্ষণ সে কলেজে গিয়াছে, এতক্ষণ কাগজ লিখিতেছে। বেল-পাতাটা নিশ্চয়ই সে তাহার ঠিক পকেটে ফেলিয়া রাখিয়াছে,

তাহার অপূর্ব্ব শক্তি তাহাকে পাস করিবার জন্ত যথেষ্ট ক্ষমতা দান করিবে।

সরকার সম্মুখে আসিতেই তিনি সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "দিয়ে এসেছ বেলপাতা, সে নিশ্চয়ই প্রণাম করলে, খুব যত্ন করে মাথায় বুকে ছুঁইয়ে রাখলে ?"

সরকার উত্তর না দিয়া পকেট হইতে কাগজে জড়ানো সেই বেলপাতাটী বাহির করিয়া অতি সন্তর্পণে কর্ত্তার সম্মুখে ধরিল। রাখালবাবু সম্মুখে পাসের মহাস্ত্র দেখিয়া যতটা অবাক হইয়া গেলেন, ততটা রাগও বাড়িয়া গেল ; বিকটস্বরে চেঁচাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "তবে তুমি বুঝি যাও নি তার বাসায় ? হ্যাঁ, তুমি আমার কথা শুনলে না, তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে বটে ?"

সরকার ধীরকণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে গিয়েছিলুম।"

"গিয়েছিলে, তার দেখা পাও নি বুঝি ? তবে আজকের দিনটা থেকে এলেই পারতে। যার জন্তে তোমায় কাল তখনই তাড়াতাড়ি কলকাতায় পাঠানো হ'ল—"

বিনিতকণ্ঠে সরকার বলিল, "আজ্ঞে দেখাও পেয়েছিলুম। খোকাবাবু বাসায় একা তো নেই, অনেক ছেলে জুটিয়েছেন দেখলুম। সবাই মিলে মহা হৈ চৈ কাণ্ড করছে দেখলুম।"

কর্ত্তা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "অনেক ছেলে জুটিয়েছে। পাছে সে বোর্ডিং বা মেসে থাকলে কষ্ট পায়, সেইজন্তে তাকে একা থাকবার জন্তেই অতবড় বাড়ীখানা ভাড়া করে দিলুম, সে তার ভাল লাগল না, আবার কতগুলো ছেলে জুটিয়ে নেছে ? আচ্ছা যাক, একা থাকতে পারছে না হয় তো, তাই কলেজের কয়েকটী ছেলেকে নিয়ে এসেছে। যাক—ভালই, বেলপাতা নিলেনা কেন ?"

কাঁদ কাঁদ সুরে সরকার বলিল, "সে কথা আর বলব কি হুজুর, খোকাবাবুকে এ কথা বলতেই খোকাবাবু হেসেই খুন, সঙ্গে সঙ্গে সব ছেলেগুলো হাসতে লাগল। শেষটায় খোকাবাবু হাসি সামলে বেলপাতা আমার হাতে ফেলে দিয়ে বললেন, "সরকার মশাই, মিথ্যে বাবা এই হোম সস্ত্যয়ন করতে অনেকগুলো টাকা জলে ফেলে দিলেন। আমি তো এক্‌জামিন দেব না, তবে এ বেলপাতার দরকার কি ?"

"হ্যাঁ, এক্‌জামিন দেবে না, সে কি কথা সরকার, এক্‌জামিন দেবে না কি রকম ? এতকাল পড়ে এল, আমি এত টাকা ঢাললুম, এখন স্পষ্ট বলে বসল—এক্‌জামিন দেবে না ?" রাখালবাবু হাঁ করিয়া সরকারের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সরকার বলিল, "তাই তো হুজুর, শুনলুম খোকাবাবু না কি স্বদেশী হয়েছেন, বন্দে মাতরম, মহাত্মা গান্ধীকি জয়, এইসব কথা হয়েছে তাঁর মূলমন্ত্র। পরণে দেখলুম মোটা কাপড়, সে আবার হাঁটুর ওপর উঠেছে। যে খোকাবাবু পায়ে নরম জুতো না দিয়ে এক পা চলতে পারতেন না, সেই খোকাবাবু এখন খালি পায়ে খালি মাথায় সারা কলিকাতা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। এইসব ছেলেগুলো নাকি মহাত্মার চেলা, এদেরই হুজুগে পড়ে তিনি গান্ধিজীর চেলা হয়েছেন। বলব কি হুজুর, আমার পরণের সেই ভাল পাতলা বিলিতি কাপড়খানা কেড়ে নিয়ে আমার সামনে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। দেখুন না, আমায় কি এক মোটা কাপড় পরিয়ে বিদেয় করেছে—"

বলিতে বলিতে কাপড়ের শোকে সরকারের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। এতক্ষণ পরে তাহার কাপড়ের উপর রাখাল বাবুর চোখ পড়িল কি সর্ব্বনাশ এ যে মহাত্মার সেই খদ্দর।

"আ সর্ব্বনাশ, তুমি করেছ কি সরকার, যাও যাও আগে চটকরে ছেড়ে এসো, কেউ যেন না জানতে পারে। হায় হায়, ছেলেকে কলিকাতায় রেখে এত টাকা ঢেলে পড়ালুম, একজামিন তো দিলেই না, আবাব উল্টে কিনা খদ্দর নিয়ে এই কেলেঙ্কারী ব্যাপার। উঃ, এসব কথা যদি সাহেবদের কাণে ওঠে তা হলে আমারই যে মুখ দেখানো ভার হবে, আমার সাহেব মহলে আমার প্রতিপত্তি সব মাটি হবে।"

রাখালবাবু ললাটে করাঘাত করিলেন, পা লাগিয়া ওদিকে গড়গড়া উল্টাইয়া নিচে পড়িয়া গেল সে দিকে মোটে দৃষ্টিই রহিল না।

অন্তঃপুরে গৃহিণী তখন রোয়াকে পা ছড়াইয়া বসিয়া সম্পর্কীয়া রমণীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সগর্ব্বে গল্প করিতেছিলেন,—আর কি, আজ ছেলের এমজামিন আরম্ভ হইয়াছে দিন দশেক বাদেই সে বাড়ীতে ফিরিবে। সাহেবরা

বলিয়াছেন খোকা পাশ হইলেই হাকিমি করিয়া দিবেন তিনি জমিদারের স্ত্রী হইয়াছেন, রায় বাহাদুরিণী হইয়াছেন, এখন হাকিম বাবুর মা হইতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা হয়।

আত্মীয়েরা কেহ তাঁহার মাথার বিরল প্রায় চুল আঁচাড়াইয়া দিতেছিলেন, কেহ গা টিপিয়া দিতেছিলেন, আর তাঁহার মনরঞ্জনার্থ সানন্দে কথার সমর্থণ করিয়া যাইতেছিলেন।

প্রায় টলিতে টলিতে কর্ত্তা আসিয়া দাঁড়াইলেন, আত্মীয়েরা শশব্যস্ত হইয়া কেহ পলাইল, কেহ থাকিয়া গেল।

তাঁহার মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া গৃহিণী সভয়ে বলিলেন "হ্যাঁগা কি হয়েছে, খবর ভাল তো—সরকার ফিরে এসে খোকা ভাল আছে বললে তো ?"

"আঃ গিন্নি সর্ব্বনাশ হয়েছে— ?"

কর্ত্তা কাঁদ কাঁদ মুখে মাথায় করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

"ওগো, তুমি কি সর্ব্বনেশে খবর আমায় শুনাতে এলে গো, আমার খোকার কি হয়েছে গো—"

বলিতে বলিতে গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে কোঁ কাঁ সুর উঠিল,

রাখাল বাবু বিরক্ত হইয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "আরে গেল যা, এরা যে ধান ভাণতে শিবের গীত আরম্ভ করলে ? কেঁদে মরছো কেন, ব্যাপারটা কি হল ?"

কান্না থামাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে গৃহিণী বলিলেন "ওই যে তুমি বললে খোকার কি হয়েছে—"

রাগিয়া উঠিয়া রাখালবাবু বলিলেন, "তোমার ছেলের কিছু হয় নি গো, কিছু হবেও না। সে গোঁয়ারের কাজের ফলে আমিই মরব, তোমার ছেলের কিছুই হচ্ছে না, সে ভয় নেই।"

গৃহিণী অবাক হইয়া গিয়া বলিলেন, "কেন, সে কি করেছে ? ওগো, তোমার পায়ে পড়ি স্পষ্ট করে সব কথা বল, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।"

গম্ভীর সুরে রাখালবাবু বলিলেন, "করেছে আমার মাথা আর মুণ্ড। তোমার ছেলে হাকিম হবে কি জেলে ঢুকবে তাই আগে দেখ। একজামিন দেওয়া তার চুলোয় গেছে' স্বদেশীর খাতায় নাম লিখিয়ে খদ্দর পরে ভদ্দর হয়ে দিনরাত রাস্তায় রাস্তায় হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে। গান্ধিজী ওকে চতুর্ব্বর্গ ফল দেবেন কিনা তাই তাঁর চেলা হয়েছে।"

গৃহিণী আড়ষ্টভাবে শুধু তাকাইয়া রহিলেন কারণ কথাটা বড়ই মন্দ। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দুঃখপূর্ণ কণ্ঠে রাখালবাবু বলিলেন, "বাড়ীখানা ভাড়া করে দিলুম, মাসে সত্তরটা করে টাকা বাড়ীর পেছনে দিচ্ছি, তা ছাড়া গাড়ী ঘোড়া, চাকর, বামুন, সহিস, সব তাইতে মোট খরচ যে কত যাচ্ছে তার ঠিক নেই, সরকারেরর মুখে শুনলুম, চাকর, বামুন সব বিদেয় করে দেছে, দামী বিলেতী আসবাব পত্তর, ঘোড়া গাড়ী সব নাকি বিক্রি করে, সেই টাকা কোন ফণ্ডে দান করেছে।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরটা বিকৃত হইয়া উঠিল,—"আমি যে রয়েছি তা আমায় একবার কোন কথা বললে না ? কতকগুলো বদছোঁড়া বাড়ীতে আড্ডা করেছে, তাদের কাজই হচ্ছে সেই তাই—কেবল সাহেব ধর আর মার। কোনদিন এ ছোঁড়াও দ্বীপান্তরে যাবে কি ফাঁসীতে ঝুলবে তা দেখতে পাচ্ছি। এ স্বদেশী হ্যাঙ্গামা কি যা তা ব্যাপার ? সাহেবরা পর্য্যন্ত ব্যাপার দেখে হাঁ হয়ে গেছেন, কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না নাঃ, হতচ্ছাড়া ছেলেকে কেন যে আরও পড়তে কলকাতায় রাখলুম, এখানে কলেজে যদি পড়াতুম এমন ভাবে বয়ে যেতে পারত না।"

ব্যাকুলভাবে গৃহিণী বলিলেন, "তবে এখন কি হবে ?"

রাখালবাবু ভারিস্বরে উত্তর দিলেন, "মরবে আর কি হবে ?"

গৃহিণী উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিলেন, "তাকে আসতে এখনি একখানা পত্র লিখে দাওনা কেন ?"

গম্ভীর হাসিয়া রাখালবাবু বলিলেন, "সেকি এখন আসবে বলে মনে কর ? এখন তার বাপ মা বলে কোন কথা কি মনে আছে ? তা যদি মনে থাকৃত তবে আমায় এমন করে মারতে পারত না। উঃ, এই সব কথা যখন সাহেবদের কাণে যাবে, মনে কর দেখি তখন কি হবে।"

তাঁহার সে কথায় কাণ না দিয়া গৃহিণী বলিলেন, তবে

আমিই যাব, তাকে সব কথা বলে বুঝিয়ে আমি যদি হাত ধরে টানি, সে কখনই থাকতে পারবে না। তার মা বড়—না গান্ধিজী বড়, আমি তাই দেখতে চাই।

তাঁহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। রাখালবাবু বলিলেন, "এখনি তোমায় যেতে হবে না। এখনও কেউ জানতে পারে নি, তার নামও কাগজে বার হয় নি, তুমি তাকে আনতে গেলেই লোক জানাজানি হয়ে পড়বে, সে যে আমারই ছেলে হয়ে আমার চিরশত্রু গান্ধিজীর দাসত্ব স্বীকার করেছে এতে লোকে আমায় কি কথাটা বলবে ভাব দেখি। দেশের কাগজগুলো একেই তো আমার নিন্দে না করে জল খায় না, ওদের এ টিটকারি আমি সইতে পারব না, বাধ্য হয়ে আমায় আত্মহত্যা করতে হবে। এক কাজ করা যাক, একখানা পত্রে তাকে বাড়ী আসতে লিখে দে, তাতে সাহেবরাও সন্দেহ করবে না, কাগজগুলোও টের পাবে না। সে বাড়ী এলে তুমি আর আমি দুজনে তার দুই হাত চেপে ধরব। পরীক্ষা না হয় নাই দিলে, সাহেবরা যখন হাতে আছে—ভাবনা কি? সাহেব নিজেই ওকে হাকিমি কাজ শিখিয়ে নেবে বলেছে।"

তখনই একখানা পত্র কলিকাতায় প্রেরিত হইল, পত্র পাঠ মাত্র প্রণব যেন বাড়ী আসে, বিশেষ আবশ্যক।

(৩)

সেবকদলকে তখন পল্লীগ্রামে পাঠানো হইতেছিল, প্রণব দেশে ফিরিব ফিরিব করিয়াও ফিরিতে পারিতেছিল না। তাহার পিতার পরিচয় সে যতটা জানিত এতটা আর কেহ জানিত না। পিতার মত মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া চিনিতে পারে নাই, ইংরাজের নিকট বাহাদুরী লওয়াকেই সে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। বরাবর সে নীরবে পিতার কাজ দেখিয়া আসিয়াছে, অন্যায় জানিয়াও পিতার কাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস তাহার হয় নাই, তাই বুকের ব্যথা সে বুকেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। এতদিন পথ দেখিতে পায় নাই, তাই জানিয়া শুনিয়া—হৃদয়ে দারুণ ঘৃণা সঙ্কোচ লজ্জা বহন করিয়াও সে পিতার সহিত সাহেবদের নিকটে গিয়াছে। সাহেবেরা যখন—উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র সে হইবে বলিয়া—সানন্দে তাহার পিঠ চাপড়াইয়াছেন তখন ঘৃণায় তাহার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিত, তাহার মুখের উপর লাল আভা ফুটিয়া উঠিত।

মহাত্মা তাহার সম্মুখে আলো ধরিয়াছেন, সে সত্যপথ চিনিয়াছে তাই আর পিছনের পানে না চাহিয়া সে সম্মুখের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। হৃদয়ে তাহার বৈরাগ্য ছিল, তাই সে এক কথায় বিলাস ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল। জেদের বশে সে পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই গাড়ী-ঘোড়া, মূল্যবান বিলাতী আসবাবপত্র সব বিক্রয় করিয়া অর্থ, স্বদেশী ফণ্ডে জমা দিয়াছিল।

দেশে ফিরিয়া সেখানে এ প্রবাহ বহাইয়া দিবার উপদেশ সে পাইয়াছে, কিন্তু সে যায় কি করিয়া? পিতার মুখখানার কথা যখন তাহার মনে পড়ে, তখনই তাহার যত সাহস সব উড়িয়া যায়, কি করিয়া সে পিতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে—তাহাই ভাবে।

এমনি সময়ে পিতার পত্রখানা যখন আসিয়া পড়িল তখন আর তাহাকে পায় কে? এইবার সে মহাত্মার আর একটী আদেশ পালন করিবার সুযোগ পাইয়াছে, মহা উৎসাহে সে দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইল এবং একদিন মহাত্মার উপহার চরকা ও একবাণ্ডিল তুলা লইয়া ট্রেণে উঠিয়া বসিল।

ষ্টেশনে বাড়ীর গাড়ী তাহাকে আনিতে গিয়াছিল। সে কিছুতেই গাড়ীতে উঠিল না। হাঁটু পর্য্যন্ত খদ্দর উঠিয়াছে, গায়ে একটা খদ্দরের ঢিলে পাঞ্জাবী, অনাবৃত চরণ, কাঁধের উপর চরকা ও তুলার বাণ্ডিল লইয়া সে একমাইল হাঁটিয়া বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। পথে পরিচিত অপরিচিত যে তাহাকে দেখিল সেই অবাক্ হইয়া গেল। বেশীদিনের কথা নহে, তিনমাস আগে যাহারা বিলাসী প্রণবকে দেখিয়াছে, তাহারা আজ সহজে চিনিতে পারিল না। রাখালবাবু প্রণবকে সাহেবী পোষাকে না সাজাইয়া বেড়াইতে দিতেন না, কদাচিৎ সে যখন ধুতী পরিত সেও বিলাতী ছিল। আজ সেই প্রণবের একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন; প্রণব যে এই মোটা কাপড় পরিতে পারিবে, নগ্ন চরণে হাঁটিতে পারিবে, কখনও একটা ব্যাগ হাতে না করিয়াও—আজকে প্রকাণ্ড একটা চরকা

ঘাড়ে করিয়া এক মাইল হাঁটিয়া বাড়ী যাইবে, ইহা কেহই স্বপ্নেও ভাবে নাই।

পিতা গাড়ী বারাণ্ডার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রণব যে হাঁটিয়া আসিতেছে তাহা অত লক্ষ্য করেন নাই, প্রণবের পিছনে যে গাড়ীখানা আসিতেছিল তাহার পানেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। প্রণব কাছে আসিয়া, চরকাটা নামাইয়া নতজানু হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেই, তিনি অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া উঠিলেন, একবার কঠোর দৃষ্টিতে পুত্রের পানে তাকাইয়া তিনি দ্রুতপদে বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন, আর চাহিলেন না।

ভিতরে গিয়া মাকে সে প্রণাম করিবার আগেই, মা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিল—কেহ সানুনাসিক স্বরে কাঁদিতে লাগিল, কেহ বা অঞ্চলে চোখ ঘসিয়া কাঁদিতে লাগিল, কেহ কান্নার সুরে ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "আহা বাছারে, এই বয়সে কে যোগীর সাজে সাজালে গো? পরে তাই সইতে পারে না, বাপ মায়ে কি সইতে পারে?"

প্রণব যতটা আশা করিয়াছিল ব্যাপারটা তাহার চেয়েও অনেক বেশী হইয়া গিয়াছে দেখিয়া অবাক হইয়া শুধু চাহিয়াই রহিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শ্রান্ত মাতা চোখ মুছিয়া কান্নার সুরে বলিলেন, "যা করেছিস খুব হয়েছে, আর দরকার নেই বাবা, এখন—যা আগে ছিলি তাই আবার হ। আমার কাছে তোর পোষাকের আলমারি রয়েছে, এই নে চাবি, যে পোষাক ইচ্ছে হয়—বার করে পর, শুনেছি তুই খালি পায়ে হেটে বেড়াস, পা দুখানা কি রকম লাল হয়ে উঠেছে তা একবার দেখিছিস কি? অমন ঢেউ খেলানো চুলগুলো, তা পর্য্যন্ত কিনা দূর করে দিয়েছিস্?"

বলিতে বলিতে মা আবার কাঁদিয়া আকুল হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিল সকলেই কাঁদিয়া উঠিল।

প্রণব বিস্ময় সামলাইয়া হাসিল—"বাঃ, এ যে বেশ মজা দেখছি তোমাদের। এমন করে সব কাঁদছো কেন? আমি মরেই গিয়েছি, আমার মরা দেহটা দেখে তোমরা সব আছড়া পিছড়ি করে কাঁদছো।"

"ষাট ষাট, ওকি অলক্ষুণে কথা বলছিস প্রণব, ও কথা বলতে নেই—ছিঃ!"

মা তাড়াতাড়ি তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমো খাইলেন।

প্রণব বলিল, "মন্দটা কি বলছি? বাড়ীতে পা দিতে না দিতে সব তো মড়া কান্না তুলে দিয়েছ। এমনি করে সব কাঁদবে বলেই বুঝি আমায় পত্র লিখে এনেছ, জানছ নইলে আমি আসব না। কোথায় বসতে দেবে, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে একটু জল খাওয়াবে, তা নয়—কেঁদেই সব খুন। অমনি কর যদি—আর যদি কখনও আসি; তবে আমার নামই প্রণব নয়।"

তাহার এই তীব্র কথায় উপকার দর্শিল, মা সন্ত্রস্তভাবে জলখাবারের ভার একজনের উপরে দিয়া পুত্রকে বসাইয়া একজনকে বাতাস দিতে আজ্ঞা করিলেন। পাখা আনিবামাত্র প্রণব তাহার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া নিজেই বাতাস খাইতে লাগিল। মা নির্ব্বাক রহিলেন, ভাবিলেন এও বুঝি স্বদেশীর একটা লক্ষণ।

সে কাপড় জামা ছাড়িল না। মা তাহাকে নিজের হাতে ভাত খাওয়াইতে খাওয়াইতে কতবার যে চোখের জল সামলাইয়া লইলেন তাহা কেহ জানিল না। মহাত্মা গান্ধী যে যাদুকর—মুখ ফুটিয়া কতবার এ কথা বলিবেন ভাবিলেন, আবার গুরুনিন্দা শুনিয়া পুত্র যদি একেবারেই চলিয়া যায় এই ভাবিয়া কথাটা বলিতেও পারিলেন না।

পিতা গুম হইয়া তফাতে তফাতে রহিলেন, প্রণবকে ডাকিলেন না, একটা কথাও বলিলেন না। প্রণব ইহাতে দমিল না, একপক্ষে পিতার বিরাগ তাহার মঙ্গলের হেতু হইল।

প্রণব আসিয়াছে সংবাদটা সহরে ছড়াইয়া পড়িল, কেন না সে এখন একেবারেই নূতন হইয়া আসিয়াছে। কয়েকটী উৎসাহী যুবক আসিয়া প্রণবকে পাইয়া বসিল, পিতার অগোচরে প্রণব এখানেও মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ বিলাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মিঃ হার্ডি রাখাল বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "একি ব্যাপার হচ্ছে মিঃ ব্যানার্জ্জি, আপনি কিছু খোঁজ কি রাখেন না, না খোঁজ পেয়েও উদাসীন আছেন?"

রাখালবাবু অবাক হইয়া গিয়া বলিলেন, "কিসের খবর হুজুর, আমি তো কিছুই জানি নে ?"

(৪)

মিঃ হার্ডি মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "আমিও তাই বিশ্বাস করি মিঃ ব্যানার্জ্জি। আপনি যে জেনে শুনে এদের কাজের প্রশ্রয় দেবেন—তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নে। শুনলুম আমাদের এখানে ছেলের দল ক্ষেপে উঠেছে, অনেক ঘরে চরকা চলছে, গান্ধীকি জয়, বন্দে মাতরম শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি প্রথমটায় বিশ্বাস করি নি, কাল কাউকে না জানিয়ে বাজারে গিয়েছিলুম, দেখলুম সেখানে অনেক খদ্দর বিক্রির জন্যে ভলেন্টিয়ার দাঁড়িয়েছে, এদের মধ্যে—দেখে আশ্চর্য্য হয়েছি—লজ্জা পেয়েছি, আপনার ছেলে প্রণবও রয়েছে। শুনতে পেলুম সেই না কি এখানে এই আন্দোলনটা এনেছে, এবং দেশবাসীকে মাতিয়ে তুলছে। প্রকাশ্য বক্তৃতা সে এখনও দেয় নি, দিতে সাহস করে নি ; কিন্তু যে রকম তার বাড়াবাড়ি দেখছি তাতে কোনদিন প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবে। দেখুন মিঃ ব্যানার্জ্জি, আপনি ইংরাজের একটী বিশেষ অনুরক্ত প্রজা, আপনার ছেলেকে—আমি আর কমিশনার ওয়াটসন সাহেব—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করব বলে ঠিক করে রেখেছি, এ রকম সময়ে সে যদি নিজের ইচ্ছায়, ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করে—হাকিম হওয়া তার অদৃষ্টে তো ঘটবেই না, তা ছাড়া কোনদিন তাকে জেলে ঢুকতে হবে। আপনি বড় ভাল লোক, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে আপনার মত লোক আর একটী দেখতে পাই নে, তাই আপনাকে বড় ভালবাসি। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি যাতে আপনার ছেলে সংযত থাকে তাই করুন, ওসব দিকে যেন না যায়।

সাহেবের কথা শুনিয়া রাখাল বাবুর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, প্রথমটায় তিনি কথা কহিতেই পারিলেন না ; অনেক চেষ্টার পর কম্পিত শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "না হুজুর, সে কর্ত্তা বলে যে কথাটা শুনেছেন সেটা মিথ্যে কথা। জজ কোর্টের উকিল হেরম্ব বোসের ছেলে অমিয় বোধ হয় কাল তাকে টেনে বাজারে নিয়ে গিয়েছিল, তাইতেই আপনি তাকে সেখানে দেখেছিলেন। আপনি তো জানেন হুজুর—হেরম্ব বোসের তিনটে ছেলে কাউকে ভয় করে না, আমায় দেখে কত ঠাট্টা করে। দুঃখের কথা বলব কি হুজুর, সেবার অমিয় যখন আমার পেছনে বড় লেগেছিল তখন আপনিই তাকে দয়া করে ছয় মাসের জন্যে জেলে পাঠিয়েছিলেন ; জেল হতে খালাস পেয়েই সে আবার যা—তাহাই হয়েছে। পথে ঘাটে দেখতে পেলেই দুইটা হাত তুলে কখনও কলা দেখায়, কখনও ডান হাতের কনুইটা বাঁ হাতের তেলোয় দিয়ে হাতখানা বেঁকিয়ে বলে যায়—ফুর—র-র, বক দেখেছ ? বলব কি হুজুর, ছোঁড়ার জ্বালায়—আমি যখন আপনার এখানে আসি, কি অন্য কোন সাহেবের বাড়ী যাই তখন গাড়ীর দরজা জানালা সব বন্ধ করে দেই। আমার প্রণবকে তো দেখেছেন হুজুর, সে তেমন ছেলেই নয় যে, আপনারা যা ভালবাসেন না—তাই করতে যাবে। তবে কি জানেন হুজুর, ছেলেমানুষ, ওই সব বয়াটে দুর্দ্দান্ত ছোঁড়াদের সঙ্গে কি করে মিশে পড়ে—"

"বেশ—বেশ মিঃ ব্যানার্জ্জি, যা হয়ে গেছে তার জন্যে অনর্থক কথা বলা ; ভবিষ্যতের জন্যে সাবধান হবেন বলে রাখছি !"

দুই পকেটে হাত পুরিয়া শিষ দিতে দিতে সাহেব বাহির হইয়া গেলেন।

রাখালবাবু আর মুখ তুলিতে পারিতেছিলেন না, কোন-ক্রমে গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেবের কুঠিতে যাইবার কথা ছিল, সেখানে যাইবার আর সাহস হইল না, কি জানি ক্রোধপরায়ণ সে সাহেবটী আবার কি বলিয়া বসেন তাহার ঠিক নাই। কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইল। আজ তিনি গাড়ীর জানালা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, পথের ধারে তাঁহার চিরশত্রু অমিয় ছেলেটি দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দিকে চোখ পড়িতে, সে আজ শুধু হাসিল।

এ হাসির চেয়ে, সে যদি কলা দেখাইত, অথবা বক দেখাইত—সে ভাল ছিল। এ হাসির মধ্যে এমন দাহিকা শক্তি ছিল যাহা রাখালবাবুর প্রাণের মধ্যে গিয়া জ্বালা দিল, তথাপি তিনি নীরব রহিলেন—কারণ হাসিটা ধরিয়া তাহাকে তো জেলে দেওয়া যায় না।

বাড়ীতে ফিরিয়া টলিতে টলিতে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি বাড়ী আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছেন, খবর পাইয়া গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন, বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, শুয়ে পড়লে, অসুখ বিসুখ করেছে না কি ?"

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে কর্ত্তা শুধু উত্তর দিলেন,—"না,"

গৃহিণী সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, ললাটে হাত দিয়া দেখিতে যাইবামাত্র দারুণ বিরক্তিতে রাখালবাবু তাঁহার হাতখানা টানিয়া ফেলিলেন! অবাক হইয়া গৃহিণী দাঁড়াইয়া রহিলেন, কর্ত্তার ভাবটা বড়ই দুর্ব্বোধ্য ঠেকিতেছিল।

কিছুক্ষণ মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া রাখাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রণব কোথায় ?"

গৃহিণী উত্তর দিলেন, "সে কোথায়, সে খবর আমি কি জানি ? দু' বেলা খাওয়ার সময়ই যা তাকে দেখতে পাই, আর সারাদিন, কোথায় থাকে, কি করে বলব ?"

হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া রাখালবাবু বলিয়া উঠিলেন, "সে খবর আর রাখবে কেন ? আমি আগে মার গলায় দড়ি দিয়ে কি বিষ খেয়ে—তারপর তোমরা মা ছেলে মিলে যা খুসী তাই করো। আমি বেঁচে থাকতে আমায় জ্বালিয়ো না, আমায় রেহাই দাও। এই যে সব নিন্দে গ্লানি সইতে হচ্ছে এ সব আর আমি বরদাস্ত করতে পারছি নে। তোমাদের কি—আমার সুখ দুঃখের পানে তো তোমরা কেউ চাইবে না—কাজেই—"

তাঁহার কণ্ঠ হঠাৎ যেন কান্নায় ভিজিয়া আসিয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল, উদ্বেলিত দুঃখকে তিনি আর ঠেকাইতে পারিতেছিলেন না, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইলেন। গৃহিণী বিস্ময়ে আড়ষ্ট, এ সব যে কি কথা তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার প্রণব আর কি করিয়াছে—তাহাও তিনি জানেন না। খদ্দর পরা, অমার্জ্জনীয় অপরাধ বটে, তা তিনি তো প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, চোখের জল পর্য্যন্ত ফেলিয়াছেন, পুত্র হাসিমুখে বুঝাইয়াছে ইহাতে দোষের কিছুই নাই। সে যে সব কথা বলিয়াছে, তাহাতে তিনি বুঝিয়াছেন—সে যাহা করিতেছে তাহাই সত্য, ইহার মধ্যে মিথ্যা নাই।

নিজেকে একটু সামলাইয়া রাখালবাবু বলিলেন, "আমি সে ষ্টুপিড্ ছেলের সঙ্গে একটা কথাও বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি। যে বাপের মুখে কালি মাখাতে চায়, বাপের সুখ দুঃখের পানে ফিরে চায় না, সে ছেলে—ছেলে নয়, পরমশত্রু। তুমি তাকে বোলো তার জন্যে আমায় সাহেবেরা পর্য্যন্ত অনেক কথা শুনিয়েছেন। সে লেখাপড়া শিখেছে—না আমার শ্রাদ্ধের উদ্যোগ করেছে, তাই বুঝতে পারছি না তার এই সব কাণ্ডে সাহেবেরা আমাকেও দোষী ভাববেন, কোনদিন হয় তো পুলিস এসে আমারই বাড়ী খানাতল্লাসী করবে, আমায় তো ধরবেই, তা ছাড়া তোমাকেও তার মা বলে জেলে পুরবে।"

বিস্ফারিত চোখে গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, সেকি গো, আমায় ধরবে কেন ? তবে যে বলে মেয়েমানুষদের ধরে না ?"

বিকৃতমুখে রাখালবাবু বলিলেন, "না, ধরে না বই কি, তবে দেশবন্ধুর স্ত্রী ভগ্নীকে ধরেছিল কেন ? সাহেবদের চটালে ওরা সব করতে পারে, মেয়েদের ইজ্জতের পানে পর্য্যন্ত তাকায় না। এখনও ছেলেকে সাবধান করে দিয়ো, এতবড় মানী ঘরের মেয়ে হয়ে যেন পুলিসের হাতে তোমায় না পড়তে হয়—তাই দেখো।"

প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া গৃহিণী বাহির হইলেন। প্রণবকে খোঁজ করিয়া জানিলেন, সে কাল রাত্রে সেই যে আহারান্তে বাহির হইয়া গিয়াছে আজ এখনও ফেরে নাই। ভৃত্য অমিয়ের বাড়ী খোঁজ লইয়া আসিয়া জানাইল—আজ সেখানে হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে, স্বেচ্ছাসেবকেরা আজ বৈকালে সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইবে, প্রণব সেই উদ্যোগে মহা ব্যস্ত।

ললাটে করাঘাত করিয়া মা বসিয়া পড়িলেন।

(৫)

দেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল, প্রণব সহরে পল্লীতে দল লইয়া বাহির হইল, বক্তৃতা দিয়া, গান গাহিয়া সকলের হৃদয় গলাইয়া দিল, পারিল না—কেবল নিজের বাপের।

মিঃ এডি গরম হইয়া চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "মিঃ ব্যানার্জ্জি, আপনার ছেলে রাজদ্রোহ প্রচার করে বেড়াচ্ছে, আমার মনে নিচ্ছে আপনি যা বলছেন সবই মিথ্যে কথা কেননা আপনার উৎসাহ না পেলে আপনার ছেলে এতটা বাড়তে পারত না। আচ্ছা, আপনি যান, বাঙ্গালী যে কি রকম বেইমান তা আমি একবার ভাল করে দেখে নেব।"

হায় রে, বেইমান বাঙ্গালী; রাখালবাবুর যেন চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে চায়, বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। সাহেব তাঁহার অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত না করিয়া তখনই চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন, রাখালবাবু তখন চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না।

তাঁহার গাড়ী বাড়ীর দিকে চলিতেছিল, পথে একটা জনতো বাধা দিল। তিন চার বৎসরের শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত একটা সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছে, মাঝখানে তাঁহারই ছেলে প্রণব। পরণে তাহার সেই মোটা খদ্দর হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, সকালে বৃষ্টি হইয়া পথ কর্দ্দমাক্ত, সেই কাদায় হাঁটু পর্য্যন্ত রঞ্জিত, চোখে তাহার জলের ধারা, বিভোর প্রাণে সে গাহিতেছে—

বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
দশদিক সুখে হাসিবে।

পথের দুধারে সারি দিয়া দর্শক দাঁড়াইয়াছে, প্রণবের চোখের জল অনেক চোখেই জলধারা আনিতে সমর্থ হইয়াছে। রুদ্ধ দ্বার গাড়ীর পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া এক জীর্ণকায় বৃদ্ধ অশ্রু-সজল নয়নে গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হরিবোল হরি, এ যে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মেছে। সাহেবের পা পূজো না করে ইষ্ট দেবতার নাম করে না যে রাখাল বাঁড়ুয্যে,—এ কি তারই ছেলে? জয় মহাত্মা গান্ধীর, এ প্রহ্লাদ, তাঁরই হাতে তৈরী যে।"

রাখালবাবু কাণে আঙ্গুল দিলেন, জানালার পাখী নামাইয়া দিলেন, যেন কেহ না জানিতে পারে তিনি এই গাড়ীতে আছেন। সঙ্কীর্ত্তন চলিয়া গেলে তিনি গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিলেন। বাড়ী আসিয়া মহা তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন, "আজ আসুক সে বাড়িতে, যদি তাকে ঢুকতে দেই তবে আমার নামই রাখাল বাড়ুয্যে নয়। যাক সে তার গান্ধিজীর কাছে, আমার কাছে তার স্থান নাই। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়েছে, আমি তা হলে হিরণ্যকশিপু হয়েছি, আর গান্ধিজী হয়েছেন ওর হরি। ভাল, দেখব ওকে ওর গান্ধিজী কি করে রক্ষা করে, আমি এবার বুঝে নেব ব্যাপারখানা।"

চাকর দারোয়ানদের উপর আদেশ হইয়া গেল প্রণব আসিবামাত্র যেন তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে খবর দেওয়া হয়। তিনি আজ কোথাও যাইবেন না, পুত্রের প্রতীক্ষায়—তাহাকে বিশেষ করিয়া জব্দ করিবার জন্যই তিনি আজ বাড়ীতে থাকিবেন।

সমস্ত দিনটা তিনি ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্ধুবান্ধব যে কেহ দেখা করিতে আসিল, সময় নাই বলিয়া সকলকেই বিদায় দিলেন। আজ পুত্রের সহিত একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া লইবেন, রাগ করিয়া কথা না কহিলে তাঁহারই ক্ষতি, প্রণবের তাহাতে লাভ বই ক্ষতি নয়।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, রাত্রি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িয়া যাইতে লাগিল, দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল প্রণব ফিরিল না। পিতার ক্রোধ হঠাৎ উৎকণ্ঠায় পরিণত হইয়া গেল, তাইতো এত রাত তো তাহার কখনও হয় না। সাহেব শাসাইয়াছেন, তবে কি—তবে কি—

নাক কাণ দিয়া আগুনের ঝলক বহিয়া গেল, মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল, রায় বাহাদুর রাখালবাবু একখানা চেয়ারে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন,—না, তাই কি হতে পারে? সাহেব জেলে দিবার ভয় দেখাইয়াছেন, হাঁ, তাহা দেখাইতে পারেন কেন না বন্ধুর পুত্র ও নিজের পুত্র পার্থক্য কি? ধর যদি সাহেবের ছেলেই আজ এমনি গর্হিত কাজ করিত,রাখাল-বাবু তাহাকে ভালকথায় বুঝাইয়া সৎপথে আনিবার জন্যই প্রথমটায় চেষ্টা করিতেন, তাহাতেও যদি না হইত, বড় জোর ভয়ই দেখাইতেন তাহা বলিয়া যথার্থই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন না। সাহেবও ভয় দেখাইয়াছেন, কখনই তাহাকে গ্রেপ্তার করাইতে পারিবেন না। তাহার সঙ্কীর্ত্তনের

জের হয় তো এখনও মিটে নাই, হয় তো আজ অমিয়ের বাড়ীতেই আহারাদি করিবে সেই জন্যই এখনও আসিতেছে না।

নিশ্চিন্তভাবে তিনি একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিলেন, কিন্তু মন তাহাতে কিছুতেই নিবিষ্ট হইতে পারিল না, মনে কেবল সেই একটা কথাই জাগিতে লাগিল সাহেব বড় রাগিয়াছেন,—বলিয়াছেন এবার দলকে দল গ্রেপ্তার করিবেন, প্রধান রাজদ্রোহী যাহারা তাহাদের বিচার স্বতন্ত্র।

"ওহে রাখাল,—শুনেছ আজকের ব্যাপারখানা।"

মনিন্দ্রবাবু একেবারে হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ইহার এ বাড়ীতে অবারিত দ্বার, কোনও বাধা তাঁহার এখানে ছিল না।

এক মুহূর্ত্তে বিবর্ণ পাংশু হইয়া উঠিয়া রাখালবাবু বলিলেন, "কি হয়েছে আজ, ব্যাপারখানা কি?"

ধপ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হতাশ ভাবে মণিন্দ্র বাবু বলিলেন, ছেলের ওপর রাগ করে চুপ চাপ ঘরে বসে রয়েছ, ওদিকে কে তোমার ছেলেকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।"

"পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে, অ্যাঁ—

রাখাল বাবু যেন আকাশ হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, বিস্ফারিত চোখে শুধু বন্ধুর পানে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মন এমন অতর্কিত আঘাত পাইয়াছিল যে কিছু ভাবিবার শক্তি ও তাঁহার কয়েক মুহূর্ত্ত রহিল না!

হঠাৎ সে ভাব সামলাইয়া লইয়া তিনি মণিন্দ্র বাবুর হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "পুলিসে তাকে ধরে নিয়ে গেল, কেন, সে কি করেছিল?"

"সে নাকি রাজদ্রোহকর বক্তৃতা দিচ্ছিল, সাহেব নিজের কাণে তার বক্তৃতা শুনে নিজে এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছেন।

"নিজে এসে—অ্যাঁ, নিজে এসে—?"

রাখাল বাবু নিজের হাত দুখানা কচলাইতে লাগিলেন। এই সেই সাহেব—যাহাকে তিনি কত না উপহার দিয়াছেন, যাহার সাদামুখের একটা প্রশংসা পাইবার জন্য জীবন পণ করিয়াছেন, যাহার তুষ্টি সাধনই জীবনের একমাত্র চরম মোক্ষ বলিয়া জানিয়াছেন? ছিঃ—

তথাপি মুখে কঠোর ভাব দেখাইয়া তিনি বলিলেন,— "যাক হতভাগা ছেলেকে আমি সাবধান করে দিলে ও যেমন সে শোনেনি তেমনি এখন জেলে গিয়ে পচে মরুক। এখন গান্ধিজি এসে তাকে বাঁচাক, মহাত্মার নাম করতে ছেলের চোখ দিয়ে জল পড়েচে কি অবাধ্য ছেলে, যা বারণ করব ঠিক তাই করে বসে থাকবে। বেশ হবে, জেলে গিয়ে আর জারি জুরি করতে হবে না, বৃটিশের জেলে বাস করে গান্ধিজির নাম ভুলতে হবে।"

ঘৃণায় মণিন্দ্র বাবুর মুখখানা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ঠিক তোমারই উপযুক্ত কথা বটে রাখাল, তুমি ভিন্ন আর কোন বাপে এরকম কথা বলতে পারত না। তোমার ছেলে যা করছে এতে তুমি তাকে ঘৃণা করছ, আমার ছেলে যদি আজ এ রকম করত আমি তাকে বুকে তুলে নিতুম। জানো না তুমি—এমন ছেলের বাপ হওয়া অনেক পুণ্যের ফল তা যদি জানতে—আজ এ ব্যাপারে তুমি কতদূর আনন্দিত হয়ে উঠতে। জেনো— তোমার ছেলে যা করছে এই সত্য আর তুমি যা করছ এ মিথ্যে। তোমার ছেলে বুকের রক্ত ঢেলে পাশা ইমারত গঠে তুলছে, সহস্র ঝড়ে ও এ ইমারত পড়বে না কারণ জন-সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা এর মূলে আছে, আর তুমি যা গড়ছো এ তাসের ঘর সাজানোই হচ্ছে, মাত্র—কারণ এর মূলে আছে লোকের ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, তাই যে কোন মুহূর্ত্তে একটী তরল হাওয়ার ঢেউ লাগলেই তোমার ঘর ধ্বংশ পড়বে। তোমার এখন উচিৎ কি জানো? সাহেব তোমার অকৃত্রিম বন্ধু—অথচ তিনি তোমার ছেলের বিরুদ্ধে এত প্রমাণ এর মধ্যে সংগ্রহ করে ফেলেছেন যাতে তাকে কয়েক বছরের জন্যে জেলে যেতে হবে। সে কিছুতেই নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না, আত্মপক্ষ সমর্থন করবে না, তুমি চেষ্টা করলে অবশ্য তার মুক্তি ও হতে পারে, সাহেব তার জন্যে না হোক —তোমার বন্ধুত্বর খাতিরে তোমার অনুরোধে তাকে ছেড়ে ও দিতে পারেন কেন না তুমি তাঁদের পরম বিশ্বাসী আর মেমসাহেবের খেয়াল মিটাতে তোমার মত আর কেউ নেই।

কথা কয়টী বলিয়াই তিনি উঠিয়া গেলেন, আর কথা বলিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না।

কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্য তাই রাখাল বাবুর প্রাণের মধ্যে একটা উৎকট জ্বালা ধরাইয়া দিল। মাতালের মত তিনি ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। রাত তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল নচেৎ তিনি তখনই সাহেবের কাছে যাইতে পারিতেন।

সে রাত্রে তিনি জলস্পর্শ ও করিলেন না, ভিতরে ও গেলেন না। অন্তঃপুরে গৃহিণী কাঁদিয়া সমস্ত রাত বিনিদ্রিত কাটাইয়া দিলেন।

(৬)

প্রভাতে উঠিয়াই রাখাল বাবু মিঃ হার্ডির কাছে ছুটিলেন। সমস্ত রাত দারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, মাথার চুল আজ সযতনে ন্যস্ত ছিল না।

মিঃ হার্ডি তখন সম্মুখের বাগানে পাদচারণা করিতে, ছিলেন, রাখাল বাবুকে দেখিয়াই তাঁহার মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি শিশ দিয়া পোষা কুকুরটাকে ডাকিতে লাগিলেন, রাখাল বাবুর পানে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

পরম বন্ধুর, এই অবহেলা রাখাল বাবুর প্রাণে কঠোর আঘাত করিল যাহাতে তাঁহার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল। কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট মুখখানা একটু বাঁকাইয়া প্রত্যাভিবাদন করিলেন, তাহাতে আন্তরিকতা এতটুকু ছিল না, বিরাগটাই ফুটিয়া উঠিতেছিল।

কোন ভূমিকা না করিয়াই রাখাল বাবু বলিলেন, "হুজুর, আমার ছেলে প্রণবকে কাল পুলিস সাহেব মিঃ হেনরী গ্রেপ্তার করে এনেছেন। সম্পূর্ণ নিরাপরাধী সে, বিনাদোষে তাকে গ্রেপ্তার করা—"

"বিনা দোষে—আপনি বলছেন কি মিঃ ব্যানার্জ্জি ?—"

সাহেব আরক্ত মুখে গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

সে লাল মুখের গর্জ্জন শুনিয়া রাখালবাবু দমিয়া গেলেন। খানিকক্ষণ আমতা আমতা করিলেন, ছেলের মুখখানা মনে পড়িতেই সে ইতঃস্ততঃ ভাবটা কাটিয়া গেল, তিনি একটু দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি দোষে বন্দী হল সেটা শুনতে পাব কি হুজুর ?"

সাহেব প্রথমটা উত্তর দিলেন না, তাহার পর কি ভাবিয়া, বলিলেন, "অপরাধ রাজদ্রোহ।"

কাতরস্বরে রাখাল বাবু বলিলেন, "ছেলে মানুষ সে, না বুঝে যদি একটা দোষই করে থাকে তার কি মার্জ্জনা নেই হুজুর ?"

সাহেব রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু সেই ছেলেমানুষের বুকের মধ্যেই যে আগুণের পাহাড় আছে তা জানেন কি মিঃ ব্যানার্জ্জি ? আপনার ছেলে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহীতার জন্যে গ্রেপ্তার হয়েছে তাকে অনেকবার সতর্ক করে দেওয়া সত্বেও সে শোনে নি, তারপর তাকে বলছি আজ আদালতে যদি সে প্রকাশ্যে তার কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা চায়, আর এরকম রাজদ্রোহ প্রচার করবে না বলে স্বীকার করে তো হলে তাকে মুক্তি দিতে পারি, সেও শুধু আপনারই খাতিরে, কিন্তু আপনার ছেলে স্পষ্ট ঘৃণার সুরে বললে—আমি ইংরাজের দয়ার দান চাইনে, আমি এ মুক্তি চাইনে, আমার ইপ্সীত স্থান জেল, জেল আমার স্বর্গ, সেই স্বর্গে আমি সাধনা করব। সে আমাদের ঘৃণা করে স্পষ্ট সে কথা জানালে আর আপনি সেই ছেলের জন্যে আমার অনুরোধ করতে এসেছেন মিঃ ব্যানার্জ্জি ? কিছুতেই না বরং তার এই জেদী স্বভাবের জন্যে আমি তার দণ্ড আরও বাড়িয়ে দেব, তার গর্ব্ব, তার অহঙ্কারকে ধূলোর সঙ্গে ধূলো করে মিশিয়ে দেব এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

রাখাল বাবুর মুখখানা কালো হইয়া গেল, খানিকক্ষণ নতমুখে তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন তাহার পর হঠাৎ সাহেবের পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমিই আমার অবাধ্য ছেলের দোষ স্বীকার করে মার্জ্জনা চাচ্ছি সাহেব আমার এ ভিক্ষা দিন, আমার প্রার্থনায় আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন।"

"কিছুতেই না মিঃ ব্যানার্জ্জি, আমি অপরাধিকে শাস্তি দেবই, এর জন্যে বন্ধুত্ব যায় সেও ভাল। যান, ঘরে ফিরে যান, আমায় বিরক্ত করবেন না, মনে রাখবেন ইংরাজ নিজের

জাতকে যত ভালবাসে এত কাউকে ভাল বাসতে পারে না। আপনাতে আমাতে বন্ধুত্ব মৌখিক হতে পারে, আন্তরিক হতে পারে না কেন না আপনি পরাধীন কালা বাঙ্গালি, আমি জেতৃ ইংরাজ। পার্থক্যটা ভুলে গেছেন দেখে মনে করিয়ে দিলুম, মাপ করবেন।

বিষের প্রদাহ—, উঃ, আর সহ্য করা যায়না। অপমানের এত জ্বালা? রাখাল বাবুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তীব্র দৃষ্টিতে একবার সাহেবের পানে তাকাইলেন, তীব্র কণ্ঠেই বলিলেন, "সে কথা যথার্থ সাহেব, বড় সত্য কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। নিজের ঘরের পানে তাকাতে ভুলে গিয়ে পরের ঘর দেখছিলুম সে নিজে বন্ধুকে দূর করে দিয়ে অপরকে বন্ধু বলে ভাবছিলুম, সব ভুল ভেঙ্গে গেছে সাহেব। মূর্খ আমি তাই ভুলতে পারি নি, সাদামুখের প্রশংসা পাওয়ার লোভে হাজার হাজার টাকা দান করেছি, নষ্ট করেছি, দেশের লোকে দুয়ারে এসে একটা পয়সা—একমুষ্টি ভিক্ষা পাওয়ার জন্যে কেঁদে পড়েছে, তাদের গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। সাহেবদের ডিনার দিতে কত হাজার টাকা ব্যয় করেছি, দুদিন না খেতে পেয়ে ক্ষুধার্ত্ত আমার দরজায় এসে গলাধাক্কা খেয়ে কেঁদে ফিরে গেছে, উঃ, তখন যদি বুঝতে পারতুম। তোমাদের অনুকরণ করতে এই পোষাকের জন্যে কত টাকাই না ব্যয় করেছি, তোমাদের তৈরি কাপড় কিনিতে টাকা ঢেলে তোমাদেরই সিন্ধুক ভরিয়াছি, নিজের দেশের মোটা কাপড় ঘৃণা করে দূরে ফেলে দিয়েছি। আজ—এই মুহূর্ত্তে স্বীকার করছি প্রণব সত্যকে চিনেছে তাই সে তোমাদের দান উপেক্ষা করছে। সে শুধু দেশের লোকের চোখ ফুটায়নি, তার চির অন্ধ বাপের ও চোখ ফুটিয়েছে। আজ বলছি—তার বাপ, এ নামে পরিচয় দিতে আমি যতটা গৌরব অনুভব করছি তোমাদের বন্ধু হয়ে তার শতাংশের একাংশ ও পাই নি, সাহেব, তোমার পায়ের তলায় মাথা পর্য্যন্ত রাখলুম, উঃ, কি নিদারুণ অপমানই করলে বল দেখি? তোমাদের দত্ত দয়ার উপাধি আমি ফিরিয়ে দিলুম, এ আমি আর চাইনে। আজ হতে আমি সাহেবের বন্ধু নই, চাকর নই, আমি দেশের বন্ধু, দেশবাসির ভাই।"

দ্রুতপদে রাখাল বাবু গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

আদালতে প্রণব দাঁড়াইয়া। আজ আদালতে লোক আর ধরিতেছিল না; চারিদিক নিস্তব্ধ, একটা শব্দ পর্য্যন্ত ছিল না।

পুলিশের এজাহার দেওয়া হইয়া গেল, প্রণব যে রাজদ্রোহী ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইল। প্রণব মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। তাহাকে যখন অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, সে মানিয়া গেল সব কথাই সত্য, একটুও মিথ্যা নয়। ইহাকে যদি রাজদ্রোহীতা বলা যায়, তবে সে নাচার, কেননা সে মাতৃপূজার পুরোহিত মাতৃপূজাই করিতেছে। মাতৃপূজার মন্ত্র, সকলের কাণে দিতেছে, রাজার বিরুদ্ধে কিছু যে বলিয়াছে তাহা তাহার মনে হয় না।

গম্ভীর কণ্ঠে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তা হলে তুমি দোষ স্বীকার করছো?"

ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে প্রণব বলিল, "একে অপরাধ বলে না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "অপরাধ বলে কি না সে আমরা জানি। তবে তুমি যদি মার্জ্জনা চাও আর ভবিষ্যতে বৃটিশের অনুরক্ত প্রজা হয়ে থাকতে প্রতিজ্ঞা কর—"

"অসম্ভব—"

প্রণব সগর্ব্বে বলিল, "আপনারা আমায় ছাড়লেও আমি যা করছি ঠিক এই-ই করব, কোনদিনই এ [illegible] করতে পশ্চাৎপদ হ'ব না এ ঠিক জানবেন।"

জনতার মধ্য হইতে অস্ফুট একটা আনন্দের গুঞ্জন উঠিয়া তখনই নীরব হইয়া গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দিলেন—প্রণবের দুই বৎসর জেলের আদেশ হইল।

"হুজুর—"

জনতার মাঝখান হইতে রাখালবাবু মাথা তুলিলেন, "বড় খুসী হয়েছি—আমার ছেলেকে আপনি ন্যায্য দণ্ডই দিয়েছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি আমার ছেলে যেন আপনার বিচারের মর্য্যাদা রাখতে পারে।

প্রহরীরা প্রণবকে বাহিরে আনিতেই রাখালবাবু অগ্রসর হইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, চোখের জলে তাহার মাথা ভিজাইয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলে, "প্রণব, জেলে যাওয়ার আগে তোর বাপের পরিবর্ত্তন দেখে যা। দেখে যা তোর বাপ আজ খদ্দর পরেছে, শুনে যা—তোর বাপ আর ইংরাজের পদলেহনকারী কুকুর নয়, তোর মহত্ব তোর বাপকেও মানুষ করে তুলেছে। আজ তোকে বুক ভরে আশীর্ব্বাদ করবার দিন আমার এসেছে, আশীর্ব্বাদ করছি তোর কর্ত্তব্যপালনে এমনি দৃঢ়তা যেন বরাবরই থাকে। তোর মা'ও আমার কাছে তার আশীর্ব্বাদ দিয়ে পাঠিয়েছে, দু' বছর বাদে ফিরে আমাদেরই কাছে আসিস, এবার তোর যোগ্য বাড়ী তৈরি করে রাখব।"

"বাবা—"

প্রণব অশ্রুসজল নেত্রে পিতার পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

বাহিরে জনতা তখন চীৎকার করিতেছিল—মহাত্মা গান্ধি মহারাজকি জয়, সি, আর দাস কি জয়। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম।

একা

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(১)

প্রতিদিন সকালে দেখিতাম, একখানি চওড়া লাল পেড়ে তসর কাপড় পরিধান করিয়া, সদ্য-স্নাত-মুক্ত-কাল-কেশদাম, পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত করিয়া, ফুল, বিল্বপত্র পরিপূর্ণ সাজি হস্তে কি প্রগাঢ় ভক্তিভরে একটী সুন্দরী যুবতী বৈদ্যনাথের মন্দির-পথে যাইতেন। পূজার্থিনী কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁর চোখের কাল তারাদুটি বুঝি তাঁর মনের ঘরে আলো জ্বালিয়া চলিয়াছে। বাবার মন্দিরে কত সুন্দরী যুবতী প্রতিদিন যাইতেছেন। পূজান্তে নানাবিধ বাজার করিয়া বাসায় ফিরিতেছেন। একদিন বা দুই দিনের অধিক বড় একটা আর কেহ পূজা করিতে যায় না। কিন্তু, এই যুবতীটির পূজায় কোনদিন আলস্য বা অবসাদ ছিল না। একদিনও তাহার মন্দির যাওয়া কামাই ছিল না। পূজা করিয়া যখন ফিরিয়া যাইতেন তখন তাঁহার মুখের উপর একটা আনন্দ জ্যোতি পরিদৃষ্ট হইত। মনে হইত তাঁহার অন্তরের পুণ্যালোক বাহিরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ছিলেন দেখিতে কাল কিন্তু কালোর উপর এমন আলো করা শ্রী কোনদিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কি ধীর মন্থর পদ বিক্ষেপে তিনি পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে কোনদিন একটীও পুরুষ মানুষ আসিতে দেখি নাই। একএকবার মনে হইত সারা বিশ্বের মধ্যে তিনি যেন একা! কাহারও সঙ্গে তার যেন কোনদিন মিল হয় নাই। বিশ্বের একপ্রান্তে যেন অকারণ প্রস্ফুটিত কুসুমের মত গন্ধ বিলাইয়া সকলের অগোচরে ঝরিয়া পড়িবেন, এমনই একটী মৌনভাব তাহার নয়নের কোনে চকিতে কখন কখন চঞ্চল হইয়া উঠিত।

তাঁ'র কাল হাত দুখানি আলো করিয়াছিল, দুইগাছি লাল রুলী, আর তার কোলে ছিল চার গাছি করিয়া সোনার চুড়ী। কানে দুইটী হীরার ইয়ারিং। গলায় ছিল, একগাছি বিছে হার। তাতেই তাঁকে কি মানিয়াছিল। তাঁর রূপ যেন ধরে না। তাঁর রূপকে বাড়িয়ে তুলে ছিল, তাঁর মৌন নম্র শান্ত প্রকৃতি। আর ছিল, তাঁর অধর প্রান্তে কস্‌টি-পাথরে গিনি সোনার অনুজ্জ্বল রেখার মত একটী স্নিগ্ধ ক্ষীণ নির্ম্মল হাসি।

এমনি করিয়া তিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পূজা করিয়া চলিয়াছিলেন। এই পূজা ব্রতধারিনী সুন্দরীর অন্তরে কি যে গভীর প্রার্থনা ছিল, তাহা বাবা বৈদ্যনাথ জানিতেন, আর তিনি জানিতেন! ভাবিতাম এই ব্রতধারিণীর পূজায় কি আশুতোষ আজও সন্তুষ্ট হয় নাই? না, পূজা করিয়া এই গুপ্তার আকাঙ্ক্ষা মিলাইতেছে না?

এক এক দিন তাঁহার সহিত কথা কহিবার জন্ম আমার যেন কেমন আকুল ইচ্ছা উঠিত। আমাদের বাড়ী, বড় রাস্তার ধারে। মন্দির পথের উপরই ছিল। ঘর হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িতাম। তাঁহার মুখের দিকে আমায় জিজ্ঞাসু নয়ন স্থাপন করিবার মাত্র, তিনি একটুখানি হাসিয়া চলিয়া যাইতেন। কোন কথা বলিতেন না। আর আমার জিজ্ঞাসা করিবার দুঃসাহস পথের মাঝে আমাকে অপদস্ত করিয়া পলায়ন করিত। শেষে আমার দুঃসাহসিকতার নিমিত্ত আমি নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িতাম।

(২)

সে দিন, পূজা করিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ীর সম্মুখে তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। জানি না, কাহার জন্য? একটা অজানা পুলকে আমার সমস্ত শরীরটা পুলকিত হইয়া উঠিল। আমি জানালার কপাট অল্প মুক্ত করিয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। সেদিন কিন্তু তাঁহাকে একটু চঞ্চল দেখিলাম। বলিতে পারি না, তিনি চঞ্চল ছিলেন, কি আমার মন চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি যেন কাহাকে খুঁজিতে ছিলেন। চারিদিকে চাহিয়া কাহার যেন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মনে হইল, আমার লুকাইয়া বসিয়া থাকা আর উচিত নয়। হয়ত বা আমাকেই অনুসন্ধান করিতেছেন! আর কতক্ষণ এমনভাবে পথের মাঝে তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন! তারপর নিজেকে ধিক্কার দিয়া মনে মনে বলিলাম, ভদ্রলোকের মেয়ের প্রতি এইরূপ দেখা বা ভাবা আমার সম্পূর্ণ অনুচিত। আমি ধীরে ধীরে, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি আমার নিকট সরিয়া আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আজ আপনি যে এতক্ষণ বাহিরে বেরুন নি?"

তাঁহার নিকট হইতে যে আমি এমন কথা শুনিব স্বপ্নেও ভাবি নাই। কোন উত্তর আমার আসিল না। আমি বলিলাম, "শরীরটা ভাল নাই।"

"আপনার মুখ চোখের ভাব দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল। রোদটা খুব কড়া লাগছে। এখানে দাঁড়াবেন না। বাড়ী মধ্যে যান, নইলে মাথা ধরবে।"

আমি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "তেমন কিছু নয়। একটু বাতাসে বেড়ালেই সেরে যাবে। মনে মনে ভাবিলাম। আমার মাথা ধরবে, তাতে আপনার কি, দেখ্‌ছি, এই কথা বলে, আমাকে সরিয়ে দিচ্ছেন।

"দেখুন, আপনি যদি আমার একটী উপকার করেন। আমার নাম সুবাসিনী, আমার চাকরকে ঠিক এই জায়গায় অপেক্ষা

করতে বলেছিনু। এখনো সে কেন এলো না, বুঝতে পারছিনা? আমি আর রৌদ্রে অপেক্ষা করতে পাচ্ছিনা। কি জানি, যদি এসে খুঁজে না পেয়ে সে ফিরে গিয়ে থাকে? আমি চলে যাবার পর, সে যদি আসে, তা'কে অনুগ্রহ করে বাড়ী ফিরে যেতে বলো দেবেন।" বলিয়া তিনি মাথার উপর ভিজে গামছা খানি দুই পাট করিয়া দিলেন। তারপর নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। আমাকে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার অবসর পর্য্যন্ত দিলেন না।

আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া দেখিলাম সুন্দরী বোম্পাস্ টাউনের পথ ধরিলেন। মনে হইল, আজ বৈকালে একবার ঐদিকে বেড়াইতে যাইলে হয় না?

(৩)

পরদিন সুবাসিনী পূজা করিতে আসিলেন না। খুব ভোরেই তিনি আসিতেন। বেলা দশটা বাজিল। তবু-ও তিনি আসিলেন না? অকারণ তার জন্য মনটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। কেন তিনি আসিলেন না? কোন অসুখ করে নাই ত? তিনি ত এই দুই মাসের ভিতর একদিন ও পূজা বন্ধ করেন নাই। এমন কি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়াও সুবাসিনী পূজা করিয়া গিয়াছেন। নিশ্চয় তাঁর কোন অসুখ করিয়াছে। কাল সেই যে ভিজা গামছা মাথায় দিয়া রৌদ্রের মধ্যে অতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন—তারপর আবার ভিজা গামছা মাথায় দিয়া সারা পথ গিয়াছেন, নিশ্চয় জ্বর হইয়াছে। বাড়ী জানি না, যে একবার গিয়া দেখিয়া আসি। ছি! ছি! আমি একবারে গোল্লায় গিয়াছি দেখ্ছি। সে পর স্ত্রী, তাঁহার জন্য কি আমি ভাবিতে পারি। আমার এত মাথা ব্যথা কেন? এই কেনর যে মাথা মুণ্ড নেই! নইলে কেনর, মাথাটা ধরিয়া পাথরে আছড়াইয়া গুড়াইয়া দিতাম। ভাবিতে নাই তা কে না জানে? কিন্তু, না ভাবিয়াও থাকা যায় না। মনের দৌরাত্ম্যে দেশ ছাড়া হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

এমন সময়, হাঁসপাপাতালের ডাক্তার বাবু, সেই পথে গাড়ী করিয়া রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন। আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "বিশেষ কাজ আছে কি? আসুন না, একটু বেড়িয়ে আসবেন?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন পথে যাচ্ছেন? বোম্পাস্ টাউন—যাবেন? 'বোম্পাস-টাউন' শুনিবার মাত্র, চলুন বলিয়া তাঁহার গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত নানারূপ গল্প করিতে করিতে চলিলাম। তিনি বলিলেন, "কাল সন্ধ্যার সময় একটা বড় দুর্ঘটনা হ'য়ে গিয়েছে, শুনেছেন কি?"

আমার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। যা ভাবিয়াছি ঠিক তাই হইয়াছে। মন দেখ্ছি সব জানিতে পারে। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ডাক্তার বাবু মনে করিলেন, গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দের মধ্যে হয় ত তার কথা শুনতে প্যাইনি। তিনি পুনরায় বলিলেন, কাল সন্ধ্যার সময় একটী মেয়ে ভয়ানক পুড়ে গেছে?"

"পুড়ে গেছে কি? বলেন কি?" তারপর আর বলিতে পারিলাম না। আমার কণ্ঠ-তালু যেন শুষ্ক হইয়া আসিতেছিল!

"সে দৃশ্য! দেখ্তে পারা যায় না। এমন ব্যাপার যে একজন সেবা করবার লোক পর্য্যন্ত নেই।"

আমি জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ কেমন আছে?" তার সঙ্গে বুঝি কোন লোক ছিল না। "তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম "তিনি যে একা!"

ডাক্তার বাবু কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গাড়ী "নন্দন-কুটীর" সম্মুখে আসিয়া থামিল।

ডাক্তার বাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "আসুন" একবার দেখ্বেন!"

আমার সমস্ত শরীর যেন সোলার মত হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। কেমন করিয়া তাঁহার হাসিভরা, নির্ম্মল দৃষ্টির দিকে আমার কলুষিত মন লইয়া যাইতে পারি! আমার কলুষ দৃষ্টিতে তিনি যে পড়িয়াছেন! কোনরূপ আপত্তি করিলে পাছে ডাক্তাবাবু কিছু মনে করেন, সেজন্য কম্পিত বক্ষে শুষ্ককণ্ঠে তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

গাড়ীর শব্দ পাইয়া একটী যুবক বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই-লেন। তাঁহাকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন?" তিনি বলিলেন এখন বেশ সুস্থ ও ঘুমচ্ছে, বলে মনে হচ্চে। কিন্তু আমার স্ত্রী ত কিছুতে রোগীর কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না!

"বেশ ত তাঁর এখন যাবার দরকার কি?"

"কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটী! সেই যে সন্ধ্যার পর থেকে মেয়ে কোলে করে বসেছে. আর এখন পর্য্যন্ত একবার উঠেন নি—ডাক্তারবাবু এ বয়সে আজ পর্য্যন্ত এমন ধারা দেখিনি! কি ধৈর্য্য! কি সংযম! কেবল বল্‌চেন আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আগে মেয়ে "বাঁচুক" বলিতে বলিতে যুবকের নয়নপ্রান্তে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখা দিল।

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। যন্ত্র চালিতের মত ডাক্তার বাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। ডাক্তার বাবু বলিলেন, আজকাল অনেক বাজে 'ষ্টোভ' বাজারে বাহির হইয়াছে সেগুলি ব্যবহার করিতে গিয়া এই প্রকার বিপদের কথা প্রায়ই সংবাদপত্রে পড়িতেছি। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি

আস্‌পাসের বাড়ীগুলিতেও অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক 'চেঞ্জার' আছেন। তাঁদের বাড়ী মেয়েরা কেউ এসেছিলেন কি ?"

"কেউ না। ভুলে ও জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করে নি। বোধ হয় সাহায্য করবার ভয়ে।"

"বলেন কি ? আমরাই পল্লী সংস্কার করব, আমরাই স্বরাজ চাই। এই যে বিদেশে আপনার সঙ্গে কেহ নাই এত বড় বিপদ, তথাপি তাহাদের অন্তরে একটুখানি আঘাত করিল না ?

"এই মেয়েটি যদি সাক্ষাৎ দেবীর মত নিজে ছুটে এসে উপস্থিত না হতেন। তা হ'লে আমার মেয়ে বাঁচত না। আমাদের জাতির সহানুভূতির কথা ডাক্তার বাবু ভুলে যান।"

ডাক্তার বাবু নিজে নিজে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন "পশুত্ব নিয়ে মনুষ্যত্বে দাবী করতে গেলে তা কোন দিনই সফল হয় না।"

মেয়েটিকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এখন সম্পূর্ণ আশঙ্কার দূর হয় নাই, তবে অনেকটা ভালর দিকে। তারপর যিনি মেয়েটিকে কোলে করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, যদি এ মেয়ের জীবন রক্ষা হয়, তবে সে একমাত্র আপনার অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে, আমার জন্য নয়। কিন্তু আপনি একা। কতক্ষণ পারবেন ? আপনারও শরীরের দিকেত দেখ্‌তে হবে ?"

তিনি অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "ডাক্তার বাবু, মেয়ে বাঁচুক, আমার তুচ্ছ শরীর গেলে ছুনিয়ার কোন ক্ষতি হবে না। আমার শরীর যদি জগতের কোন উপকারে আসে, তা' হ'লে আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করব। আমার জন্য ভাব্‌বেন না।"

আমি এখনি একজন নার্শ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি এলে, আপনি স্নান আহার ও বিশ্রাম করে নেবেন। আপনার শরীর ভাল না থাকলে মেয়ের প্রাণ রক্ষা হবে না। তারপর যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন। আপনার মেয়েটি যে ভগবানের আশীর্ব্বাদে রক্ষা পাইবে সেজন্য হঠাৎ একজন নার্শ পাওয়া গিয়াছে। তিনি একটী পরিবারের সহিত আসিয়াছিলেন। আজই চলিয়া যাইবার কথা। আমি তাঁহাকে আটক করিয়াছি।"

ডাক্তারবাবু যুবকের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, মেয়ে সারুক, তখন আপনি যত পারেন কৃতজ্ঞতা জানাবেন। প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিবেন। এখন যাতে মেয়ে ভাল হয়, আপনার স্ত্রীকে কিছু খাওয়াতে পারেন কি না সেই দিকে দেখুন। মেয়েটি একমনে ডাক্তারবাবুর কথাগুলি শুনিতেছিলেন ও একদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চহিয়াছিলেন। আর নার্শ আসিলে এনাকে ছাড়িয়া দিবেন। বলিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিলেন। আমি অবাক হইয়া তার কথা শুনিতেছিলাম। মনে মনে বলিতেছিলাম, সুবাসিনী তুমি নিত্য পূজা করিবেন না ত কে করিবে। আজ যে পূজা করিতেছে পূজারিণী—এর চেয়ে বড় পূজা যে আর নাই।

পথে ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এই ভদ্রপরিবারটির এখানে স্বামী, স্ত্রী, আর ঐ একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেহ নাই। দাস দাসীর কথা ছাড়িয়া দিন। গতকল্য উহারা ত্রিকূট বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হয়। ঠাকুরের জ্বর হইয়া শুইয়াছিল। উনানে তখন আগুন দেওয়া হয় নাই। প্রশান্তবাবু বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন অত্যন্ত চা খাইবার ইচ্ছা হয় কিন্তু যখন শুনিলেন ঠাকুরের জ্বর উনানে আগুন পর্য্যন্ত চাকর বেটা দেয় নাই। তখন তিনি রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "তুমি কাপড় চোপড় ছাড়। হাত মুখ ধুতে ধুতে আমি চা করে আনচি।"

মাকে তাড়াতাড়ি করিতে নিষেধ করিয়া, মেয়েটি পাশের ঘরে 'ষ্টোভ' জ্বালাইয়া চা করিতে গিয়া কাপড়ে আগুন লাগিয়া যায়। তাড়াতাড়ি কাপড় খুলিয়া ফেলিলেও ভিতরে সেমিজ ছিল, সেটা খুলিতে বিলম্ব হইয়া যায়। মেয়েটি খুব বেশী পুড়িয়াছে।"

"আর যিনি কোলে করিয়া বসিয়া আছেন উনি মেয়েটির কে হন ?" উনি মেয়ের কেউ হন না। নিকটেই একটী বাড়ীতে থাকেন। চেঞ্জে এসেচেন ওর মাসীর মুখে দুর্ঘটনার কথা শুনে ছুটে এসেচেন। উনি না এলে মেয়ে বাঁচাতে পারা যেত না।"

(৪)

ডাক্তারবাবু "আজ আমি যাব। আপনার নিকট বিদায় নিতে এলাম।" আজই যাবেন ? আপনার মত লোককে কি বিদায় দেওয়া যায় বলুন ?" "সমাজের বুকে যে ছুরী মারতে পারে ? তাকে বিদায় দিতেই হবে। উপায় নাই। "উপায় আছে বৈ কি সুবাসিনী ? সমাজের সত্যি করে যদি কেউ উপকার করতে পারে তা আপনার মত নারীই পারে। আপনি যে রকম করে মেয়েটির সেবা করেচেন, আমি এতদিন ডাক্তারী করচি কোন নার্শকেও করতে দেখিনি। এক দিনের ভুলের জন্য সারা জীবনটাকে নষ্ট করার মত পাপ বোধ হয় হ'তে পারে না। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে ? বুঝবার ভুল মানুষ মাত্রেই হয় তার জন্য তাকে চির অপরাধীর কাটগড়ায় ফেলে বিচার করলে সত্যি বড় অন্যায় করা হয়।

সুবাসিনী বলিল "আপনি বোধ হয় শুনবেন, পাশের বাড়ী লোকেরা এখন আর প্রশান্তবাবুর বাড়ী বেড়াতে যান না, যদি কেউ যায় ত দূরে দূরে সরে সরে থাকেন। বলেন আপনাদের একটা প্রয়াশ্চিত্ত করা উচিত। হাজার হোক ওত বেশ্যা! আপনাদের সমস্ত ছোঁয়া লেপা হয়ে গিয়েছে।"

ডাক্তারবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "প্রশান্ত বাবুর স্ত্রী কি উত্তর দিয়েছেন?"

তিনি বলেছেন "আপনারা জানবেন, সুবাসিনী আমার মার পেটের বোনের চেয়ে বড়! প্রয়াশ্চিত্ত করব কি বলুন!"

তাই বলছি, ডাক্তারবাবু আমার জন্য ওদের কি লাঞ্ছনা না পে'তে হচ্ছে। সেদিন, প্রশান্তবাবুর স্ত্রী মনোরমা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমি যাইনি; কেন যাইনি তা আপনি বুঝতে পারছেন অবশ্য।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দেখুন তাঁরা ত এখানে বার মাস থাক্‌বেন না, আপনিও কিন্তু থাক্‌বেন না, আর যারা তাঁদের প্রায়াশ্চিত্ত করার জন্য অনুযোগ করবেন তারাও দু'দিন পরে চলে যাবে। হয় ত এ জীবনে পরস্পরের সহিত আর কোন দিন দেখা হবে কি না, তারও ঠিক নাই—এর জন্য আপনি দুঃখিত হ'বে না।"

"ডাক্তারবাবু আপনি ভুল বুঝ্‌ছেন আমার দুঃখ করবার কোন অধিকার নাই! আমি কি ভরসায় দুঃখ করতে পারি? আপনাকে ত সব কথা খুলে বলেছি। যে দিন, আমার স্বামী, আমার শাশুড়ী, অম্লান বদনে সেবা করবার ভয়ে, আমার অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে হাসপাতালে দিয়ে এলো, তার পর আমি বাঁচব না বলে, একবার তিনি দেখ্‌তে পর্য্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন ভাবলেন না। ওঃ! নার্শ, ডাক্তার হাসপাতালের ঝি, চাকর পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পার্‌লে না, যে আমি কোন ভদ্রপরিবারের কুলবধূ, আমি ভদ্রলোকের বিবাহিত স্ত্রী! তারা কি সন্দেহের চক্ষে আমাকে না দেখ্‌ত। আমার সংসার আছে, স্বামী আছে, শাশুড়ী আছে, আমি যখন এই সব কথা বল্‌তাম, তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যে হাস্‌তেন তা আমার রুগ্ন ক্ষীণ দৃষ্টি কি ফাঁকি দিতে পারত না।

"আর সে পুরাতন কথা তুলে অনর্থক দুঃখ পাবেন না।" আপনার জীবনটা সমাজের চক্ষে যদি কেহ ব্যর্থ করে দিয়ে থাকে তা আপনার স্বামী! প্রায়শ্চিত্ত যদি কর্‌তে হয় তাহ'লে আপনার স্বামীর, আপনার নয়। কিন্তু সমাজ বিচার করে দণ্ড দেয় না, তাই এই সব স্বামীর, নির্ব্বিবাদে নিষ্কৃতি পেয়ে আস্‌চে। আপনি যে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, আপনি যে পথে আপনার জীবনকে চালিয়েছেন, আপনার জীবনকে যে পবিত্র কার্য্যে নিয়োগ করেছেন, এর চেয়ে বড় কাজ আর আমি জানি না।"

ডাক্তারবাবু ভুলে গেলে চলবে না, আমিও মানুষ আমার শরীর রক্ত মাংসে গঠিত। অন্তরটা পাষাণ করে ফেল্‌তে আজও পারি নি; তাই আঘাতটা এখনও সেখানে পৌঁছে ব্যথা দেয় যে, সামলাতে যথেষ্ট চেষ্টা করি, মনকে বোঝাই, কিন্তু মাঝে মাঝে অনুভূতিটা মাথা তুলে ঠেলে উঠে, অমনি আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। ডাক্তারবাবু তাহ'লে আজ আমি আসি!" "এখন কোথায় যাবেন?"

"কলকাতায় গিয়ে সমস্ত বেচে কিনে, মনে করচি বৃন্দাবনে, কিম্বা হরিদ্বারে—বা কোন একটা নির্জ্জন স্থানে থাকব।"

"এটা কিন্তু, আপনার মত রমণীর কথা হ'লো না এ যেন অভিমান করে, আত্মবিসর্জ্জন। নিজেকে কি কোন রকমে ভুলে যেতে পারবে না? পরের সেবায় আপনার জীবনটা উৎসর্গ করে সমাজকে দেখিয়ে দিন, নারী শুধু ভোগের বিলাসের বস্তু নয়—যে মহৎ, সে সত্যই দেবী।"

এই সময় সেখানে প্রশান্তবাবুর কন্যা শান্তি আসিয়া বলিল—এই যে "সই-মা"? আপনি এখানে, মা ঠিক বলেছেন। তারপর দুইখানি ক্ষুদ্র বাহু দিয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় স্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, আপনার বাড়ী গিয়ে ফিরে এলেন। আপনার চাকর বল্‌লে, আপনি আজ নাকি ক'লে যাবেন তা হবে না! আমাদের লুকিয়ে বুঝি পালিয়ে যাবেন—যান দিকি কেমন যেতে পারেন?

সুবাসিনী তার বেদন কাতর পীড়িত বক্ষের মধ্যে শান্তিকে টানিয়া লইলেন এবং সমাজ সংস্কার মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইয়া শান্তির মুখ চুম্বন করিলেন শান্তি বলিলেন, "আজ কিছুতেই ছেড়ে দিব না।" এই পবিত্র দৃশ্যে ডাক্তার-বাবুরও নয়ন বাষ্পরুদ্ধ হইল।

বৈকুণ্ঠের দুর্গোৎসব

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ এম, আর,এ, এস]

(গল্প নহে)

বৈকুণ্ঠ নামের কি বাহার আছে। "বৈকুণ্ঠের উইল", "বৈকুণ্ঠের খাতা" নামক পুস্তক হইয়াছে, সুতরাং আমিও "বৈকুণ্ঠের দুর্গোৎসবের" লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

বৈকুণ্ঠের কি সাহস, এক টাকা পুঁজি নিয়া সে দুর্গোৎসব করিবে। তার কাকা ভোলানাথ, তাকে উপদেশ করিল 'বৈকুণ্ঠ, তুই টাকাটা দাদন দিয়া যখন তিনশত টাকা হবে তখন খুব জাঁকে দুর্গোৎসব করিতে পারিবে! বৈকুণ্ঠ কাকার কথা শুনিল।"

এই এক টাকায় যখন তিন শত টাকা হইয়াছে তখন পাড়ার লোকে বলাবলি করিত "বৈকুণ্ঠ এখন দুর্গোৎসবটা করিয়া ফেল।" সে বলিত "দেখি সময় আসুক " পাড়ার লোকেরা বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল কবে বৈকুণ্ঠের দুর্গোৎসব হইবে। কবে বৈকুণ্ঠের বাড়ী গিয়া এক টুক্‌রা লুচি মণ্ডা খাইবে- আর না হয় একটু করিয়া রাম মঙ্গল গান শুনিবে। গ্রামের রামমঙ্গলের দল একটু করিয়া গানের তালিম দিয়া গলায় শান দিতেছিল, কবে তারা বৈকুণ্ঠের বাড়ীতে দুর্গা পূজায় রাম মঙ্গল পালা গাহিবে। এক টাকায় তিন শত টাকা কম কথা নয়। যত কৃপণতা ছিল তার এই টাকায়। কেহ সুদ কিছু কম দিতে চাহিলে সে কহিত, "মায়ের কাজে কর্ত্তব্য" সুতরাং সকলেই কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিত।

বৈকুণ্ঠের কাকা ভোলানাথ গ্রামের জমিদার বাড়ীতে পাটোয়ারীগিরি কার্য্য করিয়া ও অন্য উপায়ে বিস্তর টাকা করিয়া দোল, দুর্গোৎসব করিয়াছে, আর কি দুতালুক কিনিয়াছে। ভোলানাথ বুড়া হইয়া সে কাজ ছাড়িয়া আসিবার সময় সে তার স্থানে বৈকুণ্ঠকে রাখিয়া জমিদার বাড়ীতে প্রণাম দিয়া বিদায় হইল। বৈকুণ্ঠেরও আশা হইল "কাকা দোল, দুর্গোৎসব করিয়াছেন, জগদ্ধাত্রী পূজা বার্ষিক করিয়াছেন আমিও ভগবৎ প্রসাদাৎ তাই করিব। বৈকুণ্ঠ জমিদার বাড়ীতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে সে তহরির একটি টাকা পাইল তা দিয়াই সে দুর্গোৎসব করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়া রাখিল

বৈকুণ্ঠের একান্তই ইচ্ছা যে দুর্গোৎসব করিবে। এক টাকায় তিন শত টাকাও হইয়াছে—কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণে তা আর হইয়া উঠিতেছে না। বৈকুণ্ঠের বিবাহ হইল, তার বাবা শম্ভুনাথ মারিল, এক বৎসর যাইতে না যাইতেই তার মাও তার বাবার পথ ধরিল,তারপর এক বৎসর পরে তার ভ্রাতুষ্পুত্র মহাসঙ্গের বিবাহ-- সুতরাং দুর্গোৎসবের আর অবসর কই? তারপর কাকা ভোলানাথের দ্বিতীয় পরিবারের আগমন, ভোলানাথের তালুক ক্রয়, ভোলানাথের দুই পুত্রের ক্রমে বিবাহ, ভোলানাথের দুর্গোৎসব, দোল আর জগদ্ধাত্রী —সুতরাং বৈকুণ্ঠের দুর্গাঠাকুরাণী কেমন করিয়া তার বাড়ীতে এইরূপ গড্ডালিকার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিবেন তারই ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন। হায় দুর্গা মায়ের কি পোড়া কপাল! গ্রামের নাম শান্তিপুর হইলেও শান্তিতে থাকিবার কোন কারণ ছিল না। চোরের উপদ্রব, বদমায়েসদের হানা, জমিদারের পীড়ন, সুদখোরের উৎপাত কিছুরই কম ছিল না।

এবার বৎসরের গতি ভাল, বৈকুণ্ঠেরও হাতে টাকা— সুতরাং দুর্গাদেবী যে বৈকুণ্ঠের গৃহ আলো করিবেন সে বিষয় আর কেহ সন্দেহ করিল না। তা করিলে কি হয়, কিন্তু

বৈকুণ্ঠের ইচ্ছা থাকিলেও তার ভাব গতিটা বড় ভাল দেখা যাইতেছিল না। গ্রামের লোকও একরূপ আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল, কেহ কেহ কিন্তু তাহাতেও একেবারে হাল ছাড়া হয় নাই।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। গ্রামে যাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয় তারা সকলেই দুর্গার কাঠাম প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন, তাতেও বৈকুণ্ঠের সাড়া নাই। দশ জনের কথায় ভোলানাথের কিন্তু দুর্গামায়ের প্রতি মন ভিজিল। বৈকুণ্ঠকে ডাকিয়া কহিল "ওরে বৈকুণ্ঠ, তোর দুর্গোৎসবটা এইবারেই করিয়া ফেল।" বৈকুণ্ঠ নানা অজুহাত দিয়া কহিল "এবার একটা দুধের গাই মারা গিয়াছে, হালের বলদও কমিল, এটা আমার পক্ষে দুর্বৎসর।" বৈকুণ্ঠ, বাড়ীর বেলগাছতলায় তিন বেলা ধন্না দিয়াও একটী পুত্র রত্নের সাক্ষাৎ পাইল না এখন তার দুঃখের সীমা নাই। দুর্গাপূজা যে চুলোয় যাইতে বসিয়াছে। দুর্গামায়েরই বা কি বিবেচনা, তাকে নগদ দস্ত বদস্ত একটি পুত্র বুঝাইয়া দিয়া, তার প্রাপ্য পূজাটা নিয়া গেলেই পারেন। তারপর দুর্গা ঠাকুরাণীর কি অবিবেচনা, বৈকুণ্ঠের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাসঙ্গ, এতকাল বালক ও বালিকা পাঠশালায় গুরুগিরি করিয়াও একটি সন্তান রত্ন লাভ করিতে বঞ্চিত রহিল—ইহাও হইল বৈকুণ্ঠের পারিবারিক দুঃখেরকথা। এই সকল চিন্তা করিয়া বৈকুণ্ঠ তার ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ দ্বারা তার গৌরী ঘরে বালিকা পাঠশালা বসাইয়া দিল। দুর্গার ইচ্ছায় দুর্গানামটা ভুলিয়া গেল। বৈকুণ্ঠের স্ত্রীর নাম পরশমণি। তাহার পরশে বৈকুণ্ঠের মণি লাভ হইয়াছিল কি না—তা সে ছাড়া আর কাহারও জানা নাই।

সকল বাড়ীতেই প্রতিপদে দুর্গোৎসবের ঢাক বাজিয়া উঠিল, বৈকুণ্ঠের চেতনা নাই। তারপর একদিন মায়ের ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠের বাড়ীতে একখানি গড়া কাঠাম প্রাতে তার বাড়ীর বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহে দেখিতে পাওয়া গেল। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা কাঠাম দেখিয়া হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল, বাড়ীর সকলে আসিয়া দেখিল "হাঁ, সত্যইত মায়ের আগমন হইয়াছে।" বৈকুণ্ঠ মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে, পাড়ার লোকেরা বলাবুলি করিতে লাগিল "বৈকুণ্ঠ কি ভাগ্যবান, মা, আপন ইচ্ছায় তার বাড়ীতে আগমন করিয়াছেন।" যে বা যাহারা এই কাঠাম ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাদেরও ঐ কথা।

এই অপূর্ব্ব ঘটনায় ভোলানাথও মাতিয়া গিয়াছে। পুত্র ও বাড়ীর যত সব ছেলেপিলেদিগকে পূজায় মাতাইয়া তুলিল কেহ ঘর ঝাট দেয়, কেহ আঙ্গিনা পরিষ্কার করে, কেহ কচুবন কাটে। পাড়ার লোকেরা আসিয়াও বৈকুণ্ঠের দুর্গোৎসবে যোগদান করিল। কেহ হাট বাজার করে, কেহ নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঢাক, শানাইর দলও মহলা দিতে আসিল। রাম মঙ্গলের দলও আসিয়া তারই বাড়ীতে গুপ্তাভিনয় করিতে লাগিল।

তিনশত টাকা কেবল কম নয়। আগেকার দিন হইলে ইহা দিয়া চৌদ্দ গাঁয়ের লোক খাইলেও টাকা ফুরাইত না। এখনকার দিনে এই পঁচাত্তর গণ্ডা টাকায় কি হয়? বৈকুণ্ঠের বাড়ীর কাজ মেসিনের মত চলিতে লাগিল যেন দুর্গামায়েরই ইচ্ছা। তারপর কথা কহিতে না কহিতে ফর্দ্দ লইয়া পুরোহিত ঠাকুর উপস্থিত। শেষে তার অবিবেচনায় নাকি তার ভাগ্যে কিছু কম হয় ভাবিয়া তিনি দুর্গাঠাকুরাণীর আকস্মিক আগমন সংবাদ পাইয়াই বৈকুণ্ঠের বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া হাজির হইলেন। পুরোহিত ঠাকুর কহিলেন—"বৈকুণ্ঠ তোমার মত ধার্ম্মিকপরায়ণ মানুষ আর দেখা যায় না, তাই মা তোমার বাড়ীতে এ বৎসর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এখন তুমি তার অন্তিম সৎকার করিয়া ফেল। তুমি ভাগ্যবান, কোন বিষয়ে ত্রুটি করিও না।" সে "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে আসন প্রদান করিল।

পূজাত পূজাই, এই দিনে পূজার আগেই গড়া কাঠাম দেখিতে শতে শতে লোক আসিয়া বৈকুণ্ঠের বাড়ীতে জটলা করিতে লাগিল। কেহ কেহ "পূজার পাঁঠা দিয়া বৈকুণ্ঠত খাওয়াইবেই, তারপর বড় দুইটা খাসী খাওয়াইয়া সকলকে খুসী করুক।" পরে যখন জানিল বৈকুণ্ঠ "নিরামিষ" পূজা করিবে ছাগ বলি দিবে না, তখন মৎসাশীরা নিতান্ত বিরক্ত ভাবে চলিয়া গেল। পুরোহিত ঠাকুর কিন্তু আপনার পাওনা গণ্ডার হিসাবেই ব্যস্ত ছিলেন।

পুরোহিত ঠাকুর বৈকুণ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "দেখ

বৈকুণ্ঠ তুমি বড় ভাগ্যিমান, যে মাকে আরাধনা করিয়া আনা যায় না, সেই মা তোমার ঘরে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং ভাগ্যির বোঝা বাসুদেব বয়। তুমি কোন বিষয়ে চিন্তা করিওনা,মাই তোমার দুঃখদুর করিবেন। অচিরেই তিনি তোমাকে একটা পুত্র্ দান করিয়া বাধিত হইবেন। পুত্র্ ত ভালর জন্যও আসে, মন্দর জন্যও আসিয়া থাকে। তুমি যেমন ভাগ্যিমান, তোমার ঘরে রাজপুত্র্ই আসিবে। এখন হইতে পুত্রের ষষ্টিপূজা ও অন্নারম্ভের জোগাড় কর, তুমি যেমন ভাগ্যিমান একদিন হয়ত পুত্র্রত্ন পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া হাজির হইবে। আর যদি বধূমাতা বন্ধ্যা হইয়া থাকেন তবে তোমার পুনরায় বিবাহ করাই ভাল। তুমি রত্নগর্ভা অচিরেই তোমার পুত্র্ হইবে।"

এই কথা বলিয়া পুরোহিত ঠাকুর চিন্তিত হইলেন। এই নাকি বৈকুণ্ঠের পত্নী ঝাঁটা লইয়া আসিয়া তাকে তাড়াইয়া দেয়। যেন তেন করিয়া কথাটাকে একটু পালিশ করিয়া বৈকুণ্ঠের পত্নীরও খোসামুদও করিলেন। বৈকুণ্ঠের পুত্রলাভ হইল না দেখিয়া বৈকুণ্ঠের একটু আধটু আলোর দোষও যে না ঘটিয়াছিল এমন নহে। আলো হইতে আঁধারে আনিবার শক্তি তার মসিনিন্দিত স্ত্রীরও ছিল না। লোকে বলিত "স্ত্রী একবারে মসিলিপ্ত— তাতে আর বৈকুণ্ঠের আলোর দোষ হবে না?" এত শুনিয়াও তার স্ত্রী মসিলিপ্ত দাগ তুলিতে পারিত না সুতরাং বৈকুণ্ঠের উপর তার জোর জুলুমের অধিকার মোটেই ছিল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বৈকুণ্ঠের দুর্গোৎসব আরম্ভ হইল, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা উলু ও শাঁক ধ্বনি করিল, ঢাকী ও শানাই-ওয়ালারা বাদ্য বাজাইল। সে বাড়ীখানা এই কয়দিনের আনন্দ, আমোদে মুখরিত হইল। স্ত্রীলোকেরা বৈকুণ্ঠের গৃহিণী নূতন ভাগ্যবতী বলিয়া অভিবাদন করিল। কিন্তু এত করিয়াও বৈকুণ্ঠের মসিলিপ্ত পত্নী তাহার উদরে একটী শিশু সন্তানের স্থান করিতে পারিল না।

বিজয়ার দিন বিদায়ের শানাইতে করুণ সুরে বিজয়ার গীত গাহিল। মায়ের বিদায়ের পর হইতে বৈকুণ্ঠের পত্নীকে আর পাওয়া যাইতেছিল না। সে বুঝি কোথাও কোন দেবতার উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিয়া পৃথিবীর কোন্ কোণে লুকাইয়াছে। বৈকুণ্ঠের যেটুকু বাধা ছিল তা গেল নাকি? তার ত সুবিধাই হইয়াছে, সুতরাং তজ্জ শোচনানাস্তি ভাবিয়া বৈকুণ্ঠ বল্গাহীন অশ্বের ন্যায় উর্দ্ধ পুচ্ছে দৌড়াইতে লাগিল। আবার যদি নূতন মনিব আসিয়া তার পথ আটক করিতে পারে।

দেবদাসী

[শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম, এ, ভাগবৎরত্ন]

বাঙ্গলাদেশে দেবদাসীর বিশেষ প্রচলন নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে আজও অনেক রমণী বাল্যকাল হইতে দেবতার মন্দিরে বসবাস করে ও নৃত্যগীত দ্বারা দেবতার তুষ্টি বিধান করিয়া থাকে। দেবদাসীরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। তাহারা দেবতার চরণে আত্মোৎসর্গ করে, সুতরাং দেবতাই তাহাদের পতিরূপে পরিগণিত হয়েন। কিন্তু যৌবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে মানুষের স্বাভাবিক আসঙ্গলিপ্সা প্রকাশ পায়। তাহাদের নৃত্যগীতে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই তাহাদের সঙ্গ কামনা করিয়া থাকে। তাহারাও তাহাদের গুণমুগ্ধদের প্রতি কৃপাবিতরণে কার্পণ্য করে না। এইরূপে তাহারা দেবতার পবিত্র মন্দিরে নিযুক্ত থাকিলেও বারবণিতার মধ্যে পরিগণিত হয়। তবে সেজন্য তাহারা লোক সমাজে সাধারণ গণিকার ন্যায় হেয় ও ঘৃণিত হয় না।

বাঙ্গলাদেশে একালে দেবদাসীর প্রচলন না থাকিলেও, এক সময়ে যে ছিল তাহার প্রমাণ আমরা "রাজ তরঙ্গিনী" হইতে পাই। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের ইতিহাস লইয়া কহ্লন পণ্ডিত "রাজ তরঙ্গিনী" রচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরের এক রাজকুমার ছদ্মবেশে বঙ্গদেশে উপস্থিত হয়েন। তখন কার্ত্তিকেয় দেবের মন্দিরে তিনি অনেক রূপযৌবনসম্পন্না রমণীর নৃত্যগীত শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কমলা নাম্নী এক রমণীর সেবাসৌকর্য্য দেখিয়া তাহার প্রণয়ে তিনি আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কহ্লনের বিবরণের রাজনৈতিক অংশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও বাঙ্গলাদেশে দেবদাসী না থাকিলে, তিনি কখনই ঐরূপ বর্ণনা করিতেন না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পুরীতে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয়ভক্ত রায় রামানন্দ "জগন্নাথবল্লভ" নামক একখানি নাটক রচনা করেন। ঐ নাটক কয়েকজন দেবদাসীর দ্বারা তিনি অভিনয় করাইয়াছিলেন। তিনি রাজমন্ত্রী ছিলেন—সমাজে তাঁহার অসাধারণ প্রতাপ। অপর দিকে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিও দেবদাসীদিগকে স্বয়ং নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়া নাটকখানিকে অভিনয়োপযোগী করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে দেবদাসীদের বেশভূষা পর্য্যন্ত করিয়া দিতেন। সুতরাং তৎকালে উড়িষ্যায় দেবদাসীরা ঘৃণ্য ছিল না।

মন্দিরে দেবদাসী রাখিবার প্রথার কিরূপে উৎপত্তি হইল, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ফ্রেজার বলেন যে পুরাকালে লোকে শস্য ও সন্তান কামনায় দেবী পূজা করিত। সেই দেবীকে তাহারা উর্ব্বরা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া মনে করিত। দেবীর কৃপা পাইবার জন্য জনসাধারণে মন্দিরে সমবেত হইয়া নারীদের সহিত যৌন সম্মিলনে প্রবৃত্ত হইত। তাহাতে তাহাদের ধনধান্য বৃদ্ধি পাইবে ও সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা জন্মিবে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। সুতরাং সকল শ্রেণীর রমণীই যৌবনের প্রারম্ভে দেবী মন্দিরে সমাগত হইয়া যে কোন ব্যক্তির সহিত যৌন সম্বন্ধে সাময়িক ভাবে আবদ্ধ হইত। এরূপ কার্য্যকে তাহারা পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করিত এবং এ জন্য তাহাদের সতীত্ব নষ্ট হইত না। কিন্তু কালক্রমে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যখন নৈতিক আদর্শের বিকাশ হইল, তখন সকল রমণীর পক্ষে ঐ রূপ কার্য্য করা ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। অথচ সমাজের মঙ্গল বিধানার্থে ও শস্য ও সন্তান কামনায় কতকগুলি রমণীকে দেব মন্দিরে নিযুক্ত রাখা প্রয়োজন বোধ হইল। যাহা সমাজের প্রত্যেক রমণীর কর্ত্তব্য ছিল, তাহা কয়েকটী বিশেষ রমণীর উপর প্রতিনিধি স্বরূপে অর্পণ করা হইল। ইহারাই মন্দিরে দেবদাসী নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষে দেবদাসীর প্রচলন সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা আমাদের নিকট সঙ্গত বোধ হয় না। ভারতবাসীরা ধর্ম্মপ্রাণ জাত। মানুষের যাহাতে আনন্দ হয় তাহা তাহারা দেব-সেবাতেও অর্পণ করিয়া থাকে। তাই গ্রীষ্মের দিনে অনেক মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের জন্য পাখা টানার ব্যবস্থা থাকে সুপেয় সুখাদ্য শ্রীমূর্ত্তিকে ভোগ দেওয়া হয়। নৃত্যগীত যেমন মানুষের প্রীতিকর তেমনি দেবতারাও আনন্দ বিধায়ক হইবে এই বিবেচনাতেই বোধ হয় ভারতবাসীগণ দেবদাসী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যাহাদের মেয়ে বা ছেলে হয়ে বাঁচে না, তাহারা একটি কন্যাকে দেবতার সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকে সুতরাং এখানে দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্যই দেবদাসীর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তবে দেবদাসীরা পুরোহিত গণের বা অপর ব্যক্তিদের সহিত যে ব্যভিচার করিয়া থাকে তাহা তাহাদের প্রবৃত্তির তাড়নায়। এরূপ ব্যভিচার শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

ভারতবর্ষ ব্যতীত ইউরোপে ও এশিয়ার অন্যান্য দেশেও এককালে দেবদাসীর প্রচলন ছিল। হেরো দোতাস্ লিখিয়াছেন যে বাবিলনের প্রণয়ের দেবী মিলিতার মন্দিরে প্রত্যেক রমণী জীবনের মধ্যে একবার আসিতেন। সেখানে প্রথমে যে ব্যক্তি তাঁহার কোলের উপর একটি মুদ্রা ফেলিয়া দিত, তাহারই সহিত তিনি সহবাস করিতেন ঐমুদ্রা রমণীকে ব্যক্তিগত ভাবে দেওয়া হইত না, মন্দিরেই দান করা হইত। সহবাসের পর রমণী মিলিতা দেবীর পূজাকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গৃহে আসিয়া চিরজীবন সতীভাবে জীবন যাপন করিত আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বাবিলনের সাহিত্য পাঠ করিয়া হেরোদোতাসের উক্ত বর্ণনা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। উরুক নগরে ইষ্টার দেবীর মন্দিরে গণিকারা বাস করিত—তাহাদের নামই ছিল "পবিত্র ব্যক্তি"। তাহারাই ইষ্টার দেবীর পুরোহিতের কার্য্য করিত। মিলিতারা ইষ্টার দেবীর পূজা দেশের সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্যই অনুষ্ঠিত হইত।

এইরূপ প্রথা পশ্চিম এসিয়া, উত্তর আফ্রিকা সাইপ্রাস ও গ্রীসেও প্রচলিত ছিল। করিন্থে যখন কোন আকস্মিক বিপদের আবির্ভাব হইত, তখন বেশ্যাদের দ্বারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করান হইত। সেখানেও গণিকারা ভেনাসদেবীর পৌরহিত্য করিত।

হেরোদোতাস্ আরও বলিয়াছেন যে লিডিয়াতে কুমারীগণ মন্দিরে আসিয়া বারবণিতার বৃত্তিদ্বারা বিবাহের পণ সংগ্রহ করিত। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইলে, তাহারা গৃহে যাইয়া বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইত। তাহারা বিবাহের পর সতী ভাবেই জীবন যাপন করিত। এরূপ প্রথাও দেবদাসী প্রথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

মানুষ যখন কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে লাগিল তখন হইতে ইউরোপে দেবদাসীর প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রোমান সম্রাট জাষ্টিনয়ান্ আইনের দ্বারা অনেক স্থলে দেবদাসী-প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপে আর দেবদাসী নাই।

ভারতবর্ষে দেবদাসীরা কখনই সাধারণের কামের ইন্ধন জোগায় নাই। তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের অধঃপতনকে সমাজ কখনই ধর্ম্ম ভাবানুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লয় নাই। দেবতার সেবা করিবার জন্য তাই আজও দেবদাসীগণ দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে নিযুক্ত রহিয়াছে।

বিসর্জ্জন

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

(এক)

উদ্যানের নিভৃত প্রদেশে শ্যামল তৃণ শয্যায় বসিয়া "তৃপ্তির" মনে পড়িতেছিল---সেই তিনবৎসর পূর্ব্বের শেষ দিনটীর কথা, যেদিন তাহাকে অশ্রুর সাগরে ভাসাইয়া রমেশ বিদেশে গমন করিয়াছিল। কত কান্নাই না কাঁদিয়াছিল সে! প্রিয়তমের প্রেমমাখা সান্ত্বনা বাক্য, মধুভরা অধর-চুম্বন ও তাহার উদ্বেলিত অশ্রু বেগকে রোধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। শুধু সে নিজে কাঁদে নাই—রমেশকেও কাঁদাইয়াছিল। রমেশ যখন অশ্রুসজল চোখে তৃপ্তির শোকাশ্রু মাখা মুখখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া স্নেহপূর্ণ অনুযোগের স্বরে বলিল, "তুমি যদি এমনি ক'রে কেঁদে ভাসাও তা'হলে আমি কেমন ক'রে যাই বল দেখি লক্ষীটী? কিন্তু আমায় যেতেই হবে যে!" তখন তৃপ্তি স্বামীর স্পর্শসুখে চক্ষু মুদিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিয়াছিল, "কি করি বল? ভেবেছিলুম তো কাঁদবোনা, তবু পোড়া চোখে জল আসে যে! বিয়ের পর তোমায় ছেড়ে কোনদিন থাকিনি; কি ক'রে যে দিনগুলো কাটাবো তা ঈশ্বর জানেন। ঈশ্বর করুণ—ভালয় ভালয় আবার আমার বুকে ফিরে এসো। কিন্তু আমার মন ব'লছে বুঝি তোমায় আর দেখতে পাবোনা।" স্ত্রীর এই অমূলক ভীতিতে মৃদু হাসিয়া রমেশ বলিল, "ভালবাসার জনের মন্দ ভাবনাটাই আগে আসে মাণিক্। ও সব কিছু নয়; তুমি দেখো, যেখানেই থাকিনে কেন, আবার ঠিক তোমার বুকটীতে ফিরে আসবো। মিছে ভেবে মন খারাপ কোরোনা।"

"হপ্তায় হপ্তায় চিঠি লিখো কিন্তু। কি সোমবারে তোমার চিঠি না পেলে আমি নিশ্চয়ই মরে যাবো সেদিন।"

রমেশ বাধা দিয়া বলিল, "হ্যাঁ লিখবো বৈকি! নৈলে আমিই বা কি নিয়ে থাকব বল?—তা'হলে আসি লক্ষীটী?"

হৃদয়ের সমস্ত শক্তিটুকু দিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে তৃপ্তি বলিল, "হ্যাঁ, এসো!"

(দুই)

রমেশকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিবার পরই তাহার পিতা সহসা মহাপ্রস্থান করিলেন। মাতা বহু পূর্ব্বেই গতায়ু হইয়াছিলেন। কাজেই তাহার বন্ধনের মধ্যে রহিল এক নববধূ তৃপ্তি। স্নেহময় পিতার পরলোক গমনে রমেশ হৃদয়ে যথেষ্ট আঘাত পাইয়াছিল; কিন্তু সময় সকলি সহিয়া যায়। রমেশও শীঘ্রই পিতাকে বিস্মৃত হইয়া গেল এবং তৃপ্তির প্রণয়-মধুপানে বিভোর হইয়া নিত্য নিত্য নূতন সোনালী স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। কিন্তু এরূপে অধিক দিন চলিল না, তাহাদের ক্ষুদ্র সুখের সংসারটীতে শীঘ্রই অর্থের অনটন দেখা দিল। রমেশ বুঝিল, সংসারে সুখ তৃপ্তি আনন্দ প্রভৃতিও অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করিতে হয়; শুধু প্রেম মধু পানে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। পিতৃ পরিত্যক্ত বাক্স পেঁটরা-গুলি অনুসন্ধান করিয়া রমেশ দেখিল, পিতা তাহাকে একটী জীবন সঙ্গিনী জুটাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কোনই ব্যবস্থা করিয়া যান নাই; অধিকন্তু সামান্য বসতবাটীটুকুও বন্ধক রাখিয়া গিয়াছেন। রমেশ মহা বিপদে পড়িল কারণ কিরূপে সরস্বতীর কৃপা আকর্ষণ করিতে হয়, তাহাই সে জীবন ভরিয়া শিখিয়াছিল। লক্ষ্মীর কৃপা আকর্ষণ করিতে কোনদিন শিখে নাই। অনেক চিন্তার পর রমেশ বসতবাটীখানি বিক্রয় করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্তি-লাভ করিল। এবং উদ্বৃত্ত সামান্য অর্থের সহিত নব

পরিনীতা পত্নীকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া একখানি ক্ষুদ্র কুটির ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিল। রমেশ ভাবিয়াছিল, ২।১ দিন চেষ্টা করিলেই একটা চাকুরী জুটাইয়া লইতে পারিবে; কিন্তু তাহা হইল না। ক্রমাগত একমাস পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও সে একটী পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিল না—উপার্জ্জনের কোন পন্থাও খুঁজিয়া পাইল না। এদিকে সংসারে অভাবের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তৃপ্তি যতদিন পারিল, তাহার সামান্ত গহনা কয়খানি বিক্রয় করিয়া সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিল। কিন্তু শেষে যখন তাহাও ফুরাইয়া গেল, তখন স্বামী স্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; কারণ তখন অনশন ব্রত গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোনও উপায় অবশিষ্ট ছিল না।

(তিন)

এই সময় হঠাৎ একদিন একটী সহপাটী বন্ধুর সহিত রমেশের সাক্ষাৎ হইল। বন্ধুটীর নাম বিমল; সে ধনীর সন্তান। পিতা তাহাকে বিলাত পাঠাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু নিতান্ত সঙ্গীহীন হইয়া, বিলাত গমনে তাহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। রমেশের করুণ কাহিনী বন্ধুর হৃদয় স্পর্শ করিল। বিমল প্রস্তাব করিল, তৃপ্তিকে তাহার আবাসে রাখিয়া রমেশ যদি তাহার সহিত বিলাত গমন করে, তাহা হইলে সে খুবই আনন্দিত হইবে। রমেশ সম্মত হইল; কারণ বন্ধুর প্রস্তাবটীকে সে ঈশ্বর প্রদত্ত আশীর্ব্বাদের মতই গ্রহণ করিয়াছিল। তৃপ্তির সহিত বন্ধুর প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইল এবং বন্ধুর সহিত বিলাত যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল

কিন্তু বিলাত প্রবাসের কথা শুনিয়া তৃপ্তি মোটেই শান্তিলাভ করিতে পারিল না। কি একটা অভাবনীয় আশঙ্কায় তাহার তরুণ বুকটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। তৃপ্তি মুখে কিছু না বলিলেও অশ্রু প্রবাহকে কিছুতেই রোধ করিয়া রাখিতে পারিল না। রমেশ পত্নীকে অনেক বুঝাইল, ভবিষ্যতের শত শত সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তৃপ্তি কিছুতেই শান্ত হইল না। অবশেষে সেই চির শঙ্কিত বিদায়ের দিনটী মূর্ত্তিমান দুঃখের মত সত্য সত্যই তৃপ্তির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। উদ্বেলিত অশ্রুরাশীর মধ্য দিয়া তৃপ্তি বদ্ধ নিশ্বাসে স্বামীকে বিদায় দিল।

(চার)

তৃপ্তির দিন গুলি যেন আর কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। প্রতি সোমবারে বিলাতী ডাকে তৃপ্তি একখানি করিয়া রমেশের চিঠি পাইত, এবং তাহা লইয়াই কোনও ক্রমে বাকী সাতটা দিন কাটাইয়া দিত। স্বামীর চিঠি খানি একবারের স্থানে দশবার পড়িয়াও যেন তাহার তৃপ্তি হইত না। রমেশ বিলাতের অনেক কথাই তাহাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া লিখিত তৃপ্তি পড়িয়া আনন্দ পাইত; আবার মাঝে মাঝে দুর্ভাবনাও যে না হইত এমন নহে। কারণ সে শুনিয়াছিল, বিলাতে গেলেই লোকে মেম বিবাহ করিয়া লইয়া আসে। অধিকন্তু বিদেশে কোনরূপ অসুখ বিসুখ হইয়া পড়িলে কে স্বামীর আদর-যত্ন, সেবা-শুশ্রূষা করিবে ভাবিয়া তৃপ্তির বুকখানা কাঁপিয়া উঠিত। প্রতিদিন প্রভাতে ঠাকুর ঘরে গিয়া নতজানু হইয়া তৃপ্তি প্রার্থনা করিত, "হে ঠাকুর! হে দেবতা! দেখো আমার স্বামীর কোন অমঙ্গল না হয়। তাকে ভালয় ভালয় অভাগিনীর বুকে ফিরিয়ে এনে দিয়ো ঠাকুর! কখন বা তৃপ্তি ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিত—কত সুখের চিত্রই না অঙ্কিত করিত সে! স্বামী ফিরিয়া আসিলে তাহাদের আর্থিক দুঃখ কষ্ট আর থাকিবে না; উভয়ে কপোত-মিথুনের মত সহরের কোন নিভৃত প্রদেশে নীড় বাঁধিয়া সুখে বাস করিবে। তখন আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকিবে না, দুঃখ কষ্ট থাকিবে না, শুধু রহিবে সুখ।

এমনি করিয়া তৃপ্তির দিন গুলি কাটিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল রমেশ ও বিমল উভয়েই ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়াছে এবং শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে স্বামীর আশাপথ পানে তৃপ্তি উৎকণ্ঠিত উন্মুখ হইয়া চাহিয়া রহিল।

(পাঁচ)

সেদিন বিজয়া। বৈকালে বাড়ীর সকলে থিয়েটার দেখিতে গমন করিয়াছিল, শুধু যায় নাই তৃপ্তি ; কারণ সেই দিনই সন্ধ্যায় রমেশ ও বিমলের কলিকাতা পৌঁছিবার কথা ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তৃপ্তি বাটী সংলগ্ন উদ্যানের একটী নিভৃত প্রদেশে গিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল ; কারণ রমেশ এই স্থানটী খুবই ভালবাসিত। তৃপ্তি জানিত, স্বামী বাটীতে পৌঁছিয়া এই স্থানেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তৃপ্তির তরুণ বুকখানা আশা আকাঙ্খায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আজ কতদিন পরেই না সে তাহার স্বামীকে দেখিতে পাইবে! তৃপ্তি ভাবিতে লাগিল, না জানি এই দীর্ঘ তিন বৎসরে তিনি দেখিতে কেমনটী হইয়াছেন,—না জানি এই দীর্ঘ বিরহে তাহার বুকভরা ভালবাসা আরও কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে।' প্রতি পত্র-পতন শব্দে স্বামী আসিয়াছেন ভাবিয়া তৃপ্তি চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা একটা মোটর ভেঁপু বাজাইয়া বহির্দ্দেশস্থিত গেট দিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিল। তৃপ্তি বুঝিল, এইবার স্বামী আসিয়াছেন —তাহার বুকখানা আর একবার আলোড়িত হইয়া উঠিল, মুখখানি একটা লজ্জামিশ্রিত আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দ্রুতস্পন্দিত বক্ষে সঙ্কুচিত হৃদয়ে উৎকর্ণ হইয়া তৃপ্তি অদূরে চাহিয়া রহিল। প্রতি মূহূর্ত্তেই সে আশা করিতেছিল এইবার স্বামী আসিয়া তাহার তৃষিত বাহুর মাঝে আলিঙ্গনবদ্ধ করিবেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদূরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। তৃপ্তি বুঝিল স্বামী আসিতেছেন। তাহার বক্ষের স্পন্দন আরও বাড়িয়া গেল। মনের আবেগে তৃপ্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আগন্তুক নিকটস্থ হইলে, তৃপ্তি চিনিল, সে বিমল তাহার স্বামী নয়। কি একটা অজানা আশঙ্কায় তৃপ্তির শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ সহসা শুদ্ধ হইয়া গেল,—বুকটা কেমন যেন কাঁপিয়া উঠিল

রুদ্ধকণ্ঠে বিমল ডাকিল, "বৌদি!"

তৃপ্তি চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, বিমলের চক্ষে অশ্রুবিন্দু-গুলি জ্যোৎস্নার আলোকে ঝকমক করিতেছে। পাগ-লিনীর ন্যায় উন্মাদ আগ্রহে তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তাকে কোথায় রেখে এলে ঠাকুর পো ? সে কই ?"

বিমল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "রমেশকে কিছুতেই তোমার কাছে পৌঁছে দিতে পাল্লুম না বৌদি! পথেই সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে জাহাজে হঠাৎ তার কি যে কাল কলেরা হল "

কিন্তু তৃপ্তির আর অধিক শুনিবার অবকাশ ছিল না। দুইবাহু দিয়া বুকটা চাপিয়া ধরিয়া একটা দারুণ যন্ত্রণা-সূচক অস্ফুট শব্দ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে সেই স্থানেই এলাইয়া পড়িল। ঠিক্ সেই সময় নিকটস্থ গঙ্গায় কাহারা যেন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল দুর্গাপ্রীতে হরি হরি বল—বো- ল।

"নল ও পুষ্করের অক্ষক্রীড়া—"

—"নলদময়ন্তী"

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৭ই কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩২। [৪৮শ সপ্তাহ

বিজয়া

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ,এম, আর, এ, এস্]

বিজয়া অর্থ মায়ের বিদায়। এবার মা আসিলেন বড় জলের ভিতর দিয়া। দেশে কচুরী পানা, মায়ের জলযান কি আসিতে পারে ? এই দিনে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব হইয়াছিল। গৃহে ধান্য নাই, পেটে অন্ন নাই, তরিতরকারী সবতাতেই অগ্নিমূল্য। এইরূপ দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ বাঁচিবে কি লইয়া। এই দুর্ভিক্ষের জন্ম দেশে চুরী, ডাকাতী অনবরত চলিতেছে,—ভারতবর্ষ—সে আপনার জন্ম নহে, কঙ্কালসার দেহ লইয়াও ভারতবর্ষ—পৃথিবীর অন্ন জোগাইতেছে। কোন্ জাতি ভারতে বাণিজ্যর জন্ম বাস না করিতেছে, ভারতবর্ষ বুক পাতিয়া দিয়া পড়িয়া আছে, শকুনী, গৃধিনীর ন্যায় সকল জাতি তাহার অস্থি, চর্ম্ম বাহির করিয়া নিতেছে, বিজয়ার আমোদ, বিজয়োৎসব তাহাদের কোথা হইতে আসিবে ? সে রাম নাই, রামের রাজত্বও নাই, আছে কেবল রামের পতিত জীর্ণ বাস্তুভিটা, সে কি আর চেনা যায় ? পৃথিবীর সমস্ত জাতি একত্র দাঁড়াইলে তাহার মধ্য হইতে ভারতবাসীকে চিনিয়া লওয়া যাইবে ঐ যে তাহার উদ্যমহীন, কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া। ভারতবর্ষ বাঁচিয়া আছে পরকে বাঁচাইবার জন্ম ; জোঁকের ন্যায় সকলে তাহার রক্তশোষণ করিতেছে মাংসটুকু চাঁচিয়া নিয়া অস্থি সার করিয়াছে তথাপি কেহ তাহাকে ছাড়িতেছে না, একি কম বিড়ম্বনা ? দানে এমন উদার জীব পৃথিবীতে আর কেহ আছে কি ? তাই বলিতেছিলাম বিজয়ার আমোদ, উৎসব ভারতবাসীর মনে কোথা হইতে আসিবে ? ভারতের জন্ম কেহই নিমক হালাল নহে, যত নিমকহারাম জাতিরা ভারতের ওপর চড়াও করিয়া লুণ্ঠন করিতেছে, ভারতের কি আছে যে মায়ের বিজয়া উৎসব করিবে ?

যাও মা, এবার ত গেলেই, আরবার আসিবার সময় ভারতের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আসিও তখন দেখিবে ভারতবাসী তোমার বিজয়া উৎসব কেমন করিয়া করে ? একথাও শুনা যায় পরাধীন জাতি বিজয়া করিতে পারে না, পরাধীন জাতিকে পেট পুরিয়া খাইতে দাও, তাহারা সাহ্লাদে তোমার উৎসব করিতে পারিবে। অন্নের জন্ম

বাড়ী বাড়ী, দ্বারস্থার দুয়ারে যাইতে হয়, হা অন্ন, যো অন্ন করিয়া মাথা ঘামাইতে হয় উৎসব করিবার অবসর কই ?

আমাদের কিছু নাই, সবদিকই আমাদের অন্ধকার তাই আমাদের দেহি দেহি রব। আমাদের অন্নভাণ্ডার পুরাইয়া দাও মা, আর আমাদের দেহি দেহি চীৎকার থাকিবে না। আমাদের কি আছে ; দিবসত্রয় তোমার পূজা করিয়াছি, তোমাকে কি পেট পুরিয়া খাইতে দিয়াছি ? আর তোমার চরণে খালি হাতে পুষ্প দিয়া পূজা করিব তারই বা উপায় কি আছে। গাছে যে পুষ্প নাই, বেলপাতা নাই, তুলসি পত্রেরও অভাব, অতি বর্ষায় সব গিয়াছে। মৎস্তও নাই-ই, দুগ্ধেরও অতি অভাব। অন্নের সঙ্গে সঙ্গে সবই যে অগ্নিমূল্য। কি দিয়া মা তোমার পূজা করিব তা-ত দেখিয়াছই। বর্ষে বর্ষে মা তোমার আগমনের যে প্রার্থণা করিয়াছি, আগামী বৎসর হইতে মা প্রস্তুত হইয়া আসিও ইহাই তোমার কাছে প্রার্থনা—সোণার বাঙ্গলাকে ধন ধান্য পরিপূর্ণ করিয়া দাও ইহাই প্রার্থনা। তোমার কাছে আর কিছু চাই না মা।

বিজয়া দিনে আমরা যাহাকে প্রশস্তি বন্দনা বলি রাজার পূজায় বিজয়ার দিন ঋষিরা মঙ্গলের জন্য যাহা পাইয়াছেন হাতের কাছে তাহা দিয়াই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, ধান্য, চাল, ঘৃত, মধু, শর্করা, হস্তি, বরাহদন্ত ইত্যাদি যিনি যাহা পাইয়াছেন তাহা দিয়াই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আমরা তাহাদের সে সকল বৈদিক মন্ত্র পাঠ করি, আমাদের পুরোহিত তাহা দিয়াই আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন কিন্তু আমাদের সে বৈভব, সে সুবর্ণ রত্নাদি কি আছে ? আমাদের কেবলই নাই নাই, কেবলই হাহাকার, কেবলই দেহি দেহি। আমাদের আর শক্তি, সামর্থ্য নাই। দেহে বল নাই, পেটে অন্ন নাই, দেশে জল নাই, আমাদের আছে কি ?

আমরা অন্নের জন্য হাহাকার করি রাজা আমাদিগকে শাস্তি দেন, কারাগারে নিক্ষেপ করেন, রাজা আমাদের অন্নচিন্তা করেন না। রাজা যদি আমাদের সমগ্র দেশবাসীকে কারাগারে পুরিয়া রাখিতেন তবে আমরা চির রাজ অতিথি হইয়া জীবন কাটাইতে পারিতাম, আমাদের আর অন্নচিন্তার ভাবনা ছিল না। রাজা আমাদের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন না, দেবতাও বিমুখ, আমরা কোন্ ভরসায় কি লইয়া দাঁড়াই, কি নিয়াই বা বাঁচিয়া থাকি। রাজা আমাদিগকে স্বায়ত্ব শাসন দিয়াছেন কিন্তু অন্ন সংস্থানের কোন উপায় করেন নাই বরং অন্ন ধ্বংসের উপায় গুলির পথই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, আমরা দাঁড়াই কোথা ?

আমাদের পণ্যদ্রব্যের জন্য সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। রাজা সেদিক প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। যে বা যাহারা বিদেশীর পণ্য ব্যবহার করিবে না বা যাহারা স্বদেশী, স্বদেশজাত দ্রব্যের অনুরাগী তিনি রাজদৃষ্টিতে রাজদ্রোহী। ভারতের প্রজা রাজদ্রোহী নহে, তাহারা রাজা ও দেবতাকে সমচক্ষে দেখিয়া আসিতেছে। তাহার প্রমাণ আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। মা, দেশে পণ্য দেশেই রাখিতে দাও, বিদেশের পণ্য আনিবার পথ বন্ধ করিয়া দাও, মা দেখিতে পাইবে আমাদের অভাব দুর হইয়াছে, রত্ন ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে।

কেবল তাহাই নহে, দেশে মড়কের সীমা নাই। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত কাহারই বা প্রভাব কম। আমরা মরিতেছি, দলে দলে গিয়া তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছি কিন্তু সে মহা কালের পিপাসা মিটিতেছে কই, যে দেশে মহাযুদ্ধ তাহাতেও এত প্রাণীর অভাব হয় নাই। আমরা মরিতেছি, মা আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখ তবেই ত তুমি পূজা পাইবে।

গো মড়কে সর্ব্বনাশ হইতেছে, কি দিয়া আমরা কাজ করিব, কাহার দুগ্ধ খাইয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিব। জল থাকিলেও জলে মাছ না। কচুরী পানা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কচুরী ধ্বংসের উপায় নাই। নদীতে নৌকা চলে না, মৎস্য লোপ পাইয়াছে, দেশে ম্যালেরিয়া অত্যধিক পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে, কচুরী আমাদের একটা মরণাস্ত্র। চারিদিক চাহিয়া দেখি, আমাদের কিছু নাই, যা ছিল সবই গিয়াছে, আছে দেহের কঙ্কাল, আমাদের রক্তমাংস কোথায় গেল। হে ভগবান, আমাদিগকে তিল তিল করিয়া না মারিয়া একদিনে মারিয়া ফেল, আমরাও বাঁচিয়া যাই, তুমিও রক্ষা পাও। আর দিন দিন তোমার কাছে কাতর প্রার্থনা আর করিব না। এই শেষ।

অষ্ট মহাবিদ্যা

প্রথম সর্গ

প্রথম যখন বিয়ে হ'ল ভাবলাম বাহা বাহা রে—

।দ্বতীয় সর্গ

"বঁধু রাখব তোমায় হৃদয় মাঝারে—"

তৃতীয় সর্গ

আহা এই-ই ত স্বর্গ !!
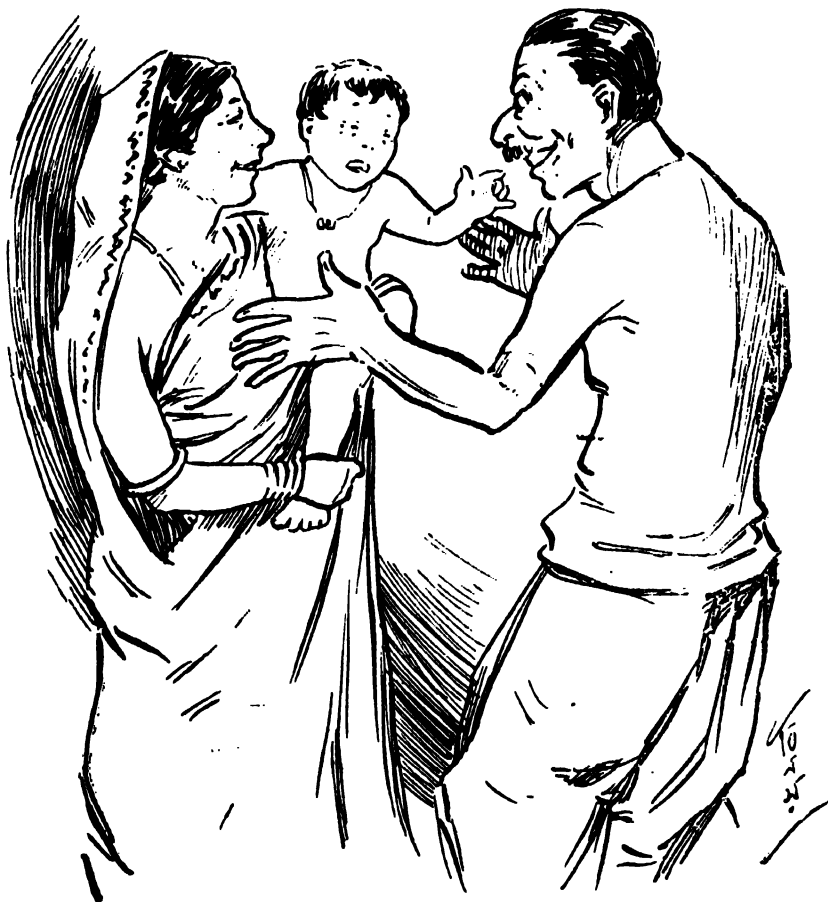
চতুর্থ সর্গ

(গৃহিণীপনার প্রথম অধ্যায়)

গৃহিণী—ওগো গয়লা ফর্দ্দ দিয়ে গেছে—

কর্ত্তা—(চিন্তিতভাবে) তাই-ত !

পঞ্চম সর্গ

(গৃহিণীপনার দ্বিতীয় অধ্যায়)

গৃ—মর্ মর্ হতভাগা, গুচ্ছের এসে জ্বালিয়ে মারলে—

কর্ত্তা—জীবন্মৃত অবস্থায় আফিস হইতে ফিরিয়া নির্ব্বাক—নিস্পন্দ—

ষষ্ঠ সর্গ

(গৃহিণীপনার তৃতীয় অধ্যায়)

গৃ—বেয়াই মিন্‌সের একটুও আক্কেল নেই। এ-রকম ঠ্যালামারা তত্ত্ব জামাই বাড়ী পাঠাতে ছোটলোক মিন্‌সের একটু লজ্জাও করলে না—

সপ্তম সর্গ

(পুরা দস্তুর গৃহিণী)

গৃ—এই কটি টাকায় কি হবে ? গয়লার টাকা দেব, না মুদীর দেনা শুধবো—

কর্ত্তা—(হতভম্ব)

অষ্টম সর্গ

[বাণপ্রস্থ]
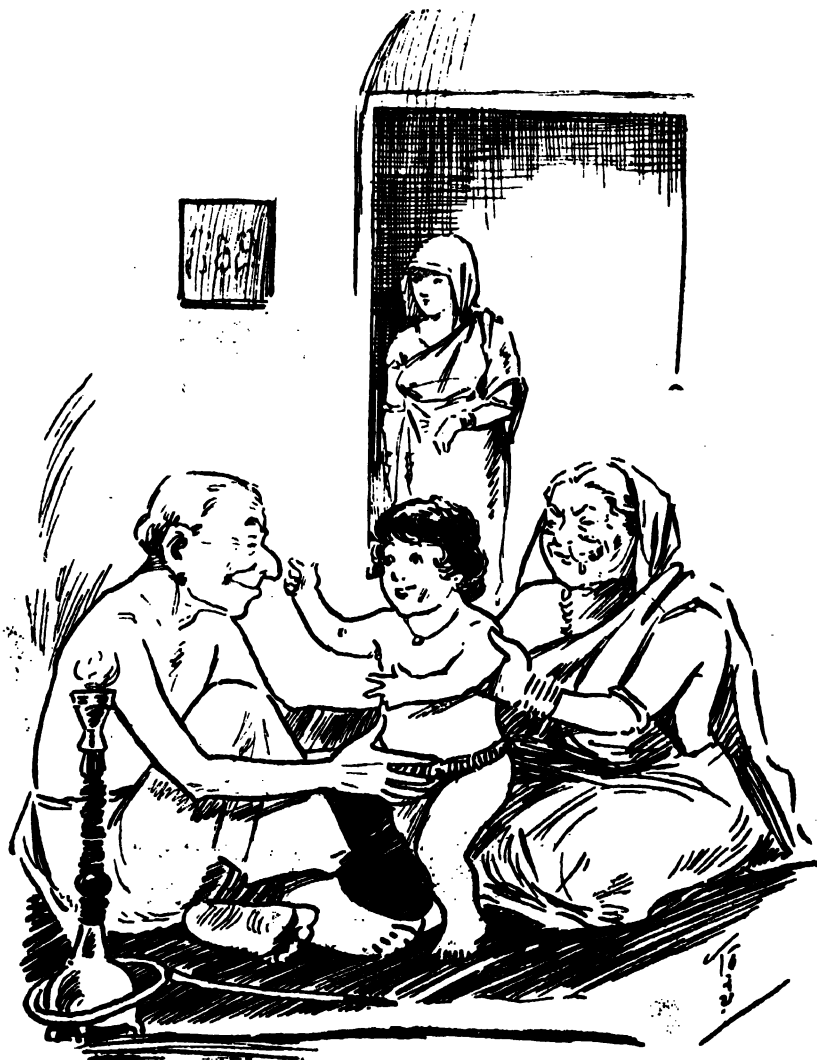
"নাতি—স্বর্গে দেবে বাত্তী"

মিলন-নিশি

[শ্রীমঞ্জরী দেবী]

উদাস গোধূলির ম্লান আলো চারিদিকে একটা বিষাদ-মাখা ভাবের স্বজন করে তুলেছে। জয়পুরের এক সজ্জিত কক্ষের জানালার ধারে এক সুশ্রী তরুণ উন্মনা ভাবে বসে আছে; অন্তরে যে একটা বিষম উৎকণ্ঠা রয়েছে তারই চিহ্ন তার কুঞ্চিত ললাটে পরিস্ফুট। কিছুক্ষণ পরে একজন সৈনিক এসে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়াল। আগ্রহের সঙ্গে যুবক বলে উঠ্‌ল—এসেছ মণিলাল, কি সংবাদ আছে বল তো?

মণিলাল নিরুত্তরে তার হাতে একখানা ছোট্ট লিপি দিল। অস্ত-তপনের স্তিমিত আলোয় লিপিখানি পড়তে পড়তে রুদ্ধ আবেগে তরুণের সুকুমার মুখটী রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌ল, মণিলালকে বল্‌লে—আমি আজ রাত্রে অম্বর রাজ-প্রাসাদে যাত্রা করব—এখুনি সব আয়োজন করে রাখ—যাও .....

মণিলাল চলে যাওয়ার পর লিপিখানি বুকে চেপে শূন্য-দৃষ্টিতে তরুণ সান্ধ্য-আকাশের দিকে চেয়ে রইল—কত সব অসংলগ্ন কথা একসঙ্গে মনের দুয়ারে ভিড় করে দাঁড়াল···

যুদ্ধক্ষেত্রে অমানুষিক হিংসা, মৃত্যুর অবিশ্রাম আর্ত্তনাদের মাঝে সেই তাদের প্রথম দেখা! রাজকুমারী কঙ্কাবতী এসেছিলেন আহত সৈন্যদের দেখতে, আহতদের মধ্যে সেও ছিল। সেইখানে তার দেখা হ'ল কঙ্কাবতীর সাথে—ফুটন্ত জুঁই ফুলের মত মুখখানি মমতা-মাখা, চোখে কোমল দৃষ্টি। সেই আয়ত আঁখির নীরব সহানুভূতি মনে পড়লে তার বুকের রক্ত এখনও দুলে ওঠে!

—তারপর সেই ফাগুন রাতে মাধবী কুঞ্জের তলে আবার দেখা। নিশীথ রাতে সে একলা বাগানের একান্তে বসে বীণার ঝঙ্কারে আকাশ ভরিয়ে দিয়েছিল—এমনি সময় কঙ্কাবতী সখীদের সাথে চলেছিলেন বনফুলে-ছাওয়া-পথ দিয়ে। আপন মনে সে কেবল বীণা বাজিয়েই চলেছিল,—সে সুর বলছিল—ওগো আবার বসন্ত এসেছে...ফাগুন সমীর সকলের প্রাণে স্বপন-পরশ লাগিয়ে দিলে হায় গো হায় আমার বসন্ত বুঝি এল না...আমার প্রাণের মুকুল বুঝি আর ফুটল না···সহসা নারী কণ্ঠের কলহাস্য শুনে সচমকে ফিরে তাকাতেই দেখ্‌ল কঙ্কাবতী পুষ্পরাণীর মত তনুখানি জড়িয়ে নীলাকাশের মত নীল শাড়ীপরা, কাজল-কেশের রাশি এলান। সেদিন কত কথা হ'ল প্রাণের অর্গল মুক্ত করে।

রাজকুমারীর প্রস্তাব শুনে সে কিছুক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মত থেকে আবার ধীরে বল্‌ল--তা তো হয় না রাজকুমারী, অম্বর রাণার অধীনে আমি একজন সামান্য রাজপুত সর্দ্দার মাত্র, কোশল রাজের সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। আমাকে বিদায় দাও রাজকুমারী—দূরে—বহুদূরে চলে যাই, শুধু এই নিশীথ রাতের স্মৃতিটুকু আমাকে সবল করে রাখবে—অশ্রুভরা আঁখিদুটী তুলে কঙ্কাবতী বল্‌লে—কেন হবে না অরুণকুমার, প্রাণের বিনিময়ে কি পৃথিবীর সম্পদ এতই মূল্যবান? কেন তুমি বাঁধতে পারবে না আমায় চিরকালের—সহসা কঙ্কাবতীর গালে দুটো রক্ত-গোলাপ ফুটে উঠ্‌ল।

কঙ্কাবতীর বিদায় কালের সেই করুণ চাউনি তার মনকে বড় চঞ্চল করে তুল্‌ল—অস্থির পদে যুবক ঘরে পায়চারী করে বেড়াতে লাগল।

* * * *

অম্বর রাজপ্রাসাদে আজ আনন্দের তুফান উঠেছে।

পত্রপুষ্প দিয়ে প্রাসাদ ভবনকে সাজান হয়েছে, অগণিত দীপালোকে প্রাসাদ ঝলমল করছে, অভ্যাগতদের পোষাকের মণি জহরৎ থেকে দ্যুতি ফুটে বেরুচ্ছে। রাশি রাশি পুষ্প-মাল্য নব বস্ত্র বিতরিত হচ্ছে—নাগরিকেরা সকলেই হাসিমুখ। আজ একমাত্র রাজদুহিতা কঙ্কাবতীর শুভ পরিণয়। তাই

পথে পথে আনন্দের স্রোত, উৎসবের সাড়া। নহবৎখানায় সাহানা পূরবীতে তান ধরেছে বড় মর্ম্মস্পর্শীভাবে। সে সুর অন্তঃপুরে কঙ্কাবতীর বুকের অন্তরতম প্রদেশে একটা ব্যথার ঝর্ণা তৈরি করল, তাই আজ সবার অলক্ষ্যে চোখে তার কেবলই জল ঝরছে।

শুভলগ্নে সকলে বিবাহ সভায় উপস্থিত হ'ল।

অন্তঃপুরিকাদের অধর-স্ফুরণে মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠল, হুলুধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হ'ল। স্মিত প্রসন্নমুখে আচার্য্যদেব কোশল রাজকে কন্যা সম্প্রদান করবেন—অকস্মাৎ বিবাহ মণ্ডপে একটা গোলমাল শোনা গেল। নিমেষের মধ্যে এক কাণ্ড ঘটে গেল—রাজকুমারী অপহৃতা! সহস্র দীপ চকিতে নিভ্‌ল...

উদ্‌গত কান্না চাপতে গিয়ে রাণীর বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ল আর রাণা রাগে কাঁপতে কাঁপতে সেনাপতিকে আদেশ দিলেন – যাও রাজকুমারীকে নিয়ে এস আর আর সেই পাপাত্মা দস্যুর তাজা রক্তমাখা মুণ্ড চাই—

* * * *

মাঝি জোরে বাও—জোরে বাও—

মধুমতীর কালো বুকের ওপর ঢেউএর তালে তালে একখানা ছোট নৌকা উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। রজত-শুভ্র জ্যোৎস্নায় মধুমতীকে দুধের নদী বলে মনে হচ্ছে। নৌকায় অরুণকুমার আর কঙ্কাবতী পাশাপাশি বসে চলেছে—কোথায় কে জানে। দূর থেকে একটা আওয়াজ এল—যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অরুণকুমার উদ্বেগের সঙ্গে মাঝিকে বল্‌ল—আরো জোরে।

ক্রমে আওয়াজ স্পষ্ট হ'ল। একদল অশ্বারোহী ছুটে আসছে। কঙ্কাবতীর একখানি পেলব হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে অরুণকুমার বল্‌লে—ওই বুঝি তোমার বাবার সৈন্যরা আমাদের পেছনে আসছে, যদি ধরতে পারে তবেই আমার তপ্ত রক্তে তোমার বাবার মনের আগুন নিভবে, কিন্তু তুমি—তোমার কথা ভাবলেও যে—

তাড়াতাড়ি কঙ্কাবতী বল্‌ল—যদি ভৈরবের ইচ্ছে তাই হয়, তবে মধুমতীর বুকে কি আর আমাদের স্থান হবে না?—বলতে বলতে গলার স্বরটা কেঁপে গেল।

কোত্থেকে একটা কালো পাগলা মেঘ দিগন্তের কোলে দেখা দিলে। মাঝি শক্ত করে হাল ধরল। দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশটাকে নিকষ কালো মেঘদল ছেয়ে ফেল্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ডমরু ধ্বনি - যেন কোন রুদ্র খেয়ালীর তাণ্ডব নৃত্যের প্রস্তাবনা। শান্ত মধুমতীও প্রলয়-সূচনা দেখে ফুলে ফুলে আস্ফালন করতে লাগল। ঝোড়ো হাওয়া ঘূর্ণীপাক দিতে দিতে ছুটে বেড়াতে লাগল।

অরুণকুমার কঙ্কাবতীকে বল্‌ল—কঙ্কাবতী শুভক্ষণে অম্বর বিবাহ মণ্ডপে আমাদের মিলন হ'ল না, আমরা মিলেছি প্রলয়ের কোলে – এই তো আমাদের বাসর রাত্রি—

কঙ্কাবতীর রাঙা কমল-পাপ্‌ড়ির মত অধরে অরুণকুমার মিলনের শেষ চিহ্ন এঁকে দিল।

কঙ্কা—

অরুণ, স্বামী—

বিপুল রোষে একটা মস্ত ঢেউ গর্জ্জে উঠ্‌ল তারপরেই ছোট নৌকাখানিকে মধুমতী আপন বুকের ভেতর টেনে নিল।

ব্যথিত হিয়ার অশ্রান্ত কান্নার মত বারিধারা পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়তে লাগল...

মৌর্য্য ভারতে গুপ্তচর বিভাগ

[শ্রীপ্রমথভূষণ পাল চৌধুরী এম্-এ, বি-এল]

'স্বপরমণ্ডল কার্য্যাকার্য্য বিলোকনে চারাশ্চক্ষুংষি ক্ষিতিপতীনাম্' 'চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ' এ কথাগুলির সার্থকতা ভারতকে কখনও বিশেষ করিয়া শিখাইতে হয় নাই। প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতে 'চর' বা গুপ্তচরের নিয়োগ চলিয়া আসিয়াছে। রাজার কর্ত্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মনু দূত ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন 'দূত সম্প্রেষণঞ্চৈব কার্য্যশেষং তথৈব চ। অন্তঃপুর প্রচারঞ্চ প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্ ॥' 'দূত সম্প্রেষণঞ্চৈব' ইহার ইহার অর্থ যে 'গুপ্তভাবে পররাজ্যে দূত প্রেরণ' তাহা কুল্লুক ভট্ট তাঁহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন. 'দূতানাং সংগুপ্তার্থ-লেখহারিত্বাদিনা পররাষ্ট্র প্রস্থাপনং চিন্তয়েৎ।' মহাভারতে চর নিয়োগের কথা আমরা শান্তিপর্ব্বে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মুখে শুনিতে পাই। রামায়ণেও চর নিয়োগের কথা উল্লেখ আছে।

পরবর্ত্তী মৌর্য্যযুগে গুপ্তচর ব্যবহারের কথা আমরা গ্রীক ঐতিহাসিক অ্যারিয়ন, মেগাস্থিনিস, চাণক্য ও অশোকীয় শিলালিপি হইতে জানিতে পারি। চাণক্য যদিও কোন ইতিহাস লেখেন নাই তবু তাঁহার গ্রন্থ যে সমসাময়িক অবস্থারই বর্ণনা তাহা জার্ম্মাণ পণ্ডিতমণ্ডলী নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন।

এই সময়ের গুপ্তচরদের ব্যবস্থাবদ্ধতার কথা ভাবিলে বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়। রাজ্যের এমন কোন স্থান প্রায় ছিল না যেখানে গুপ্তচরদের অপ্রতিহত গতি না ছিল। প্রাসাদের অন্তঃপুরিকা হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র সকলের উপরই তাহাদের নজর থাকিত। দেশে বিদেশে সমাজে অরণ্যে নানাবেশে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইত। কখনও দস্যু, কখনও সাধু, কখনও রাজদ্রোহী আবার কখনও বা ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিরূপে যে তাহারা দেখা দিত তাহা এক কথায় বলা অসম্ভব। প্রকৃত চরিত্র জানিবার জন্য কোন অমাত্যকে রাণী তাহার প্রতি আসক্তা পর্য্যন্ত বলিয়া বসিত, কাহাকেও বা রাজার বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করিয়া বিদ্রোহী করিতে পারে কি না পরীক্ষা করিত। কোন প্রজাকে ভয় দেখাইয়া, কাহাকেও বা উচ্চ আশায় উদ্দীপিত করিয়া, কাহারও কাছে বা রাজার বংশের নিন্দা করিয়া তাহার যথার্থ মনোভাব জানিয়া লইত। তাহাদের কখনও দেখি বিদেশীয় চর ধরিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে, আবার কখনও বা দেখি ভীষণ অরণ্যে দস্যু সাজিয়া দস্যুর অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

এই গুপ্তচরদিগকে মোটামুটি দুইটী পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায়, 'স্থানীয়' ও ভ্রমণশীল'। স্থানীয় চরেরা গৃহী, উদাসীন, ব্যবসায়ী, কপট ছাত্র, তাপস প্রভৃতি অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরে মিশিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। এই অতি প্রাচীন যুগেও বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের মত গ্রামের ও জেলায় শাসনকর্ত্তাদের দেশের, লোকের অবস্থা, চরিত্র, আয়, ব্যয়, জীবিকার বিবরণ ও প্রত্যেক জমীর প্রকৃতি শ্রেণী প্রভৃতির হিসাব রাখিতে হইত, 'পরিদ্রষ্টাদের' সঙ্গে সঙ্গে এই 'গৃহী ও ব্যবসায়ী' চরদের এই সকল হিসাবের সত্যাসত্য ঠিক করিতে হইত।

'তাপস' চরদের খবর জানা এক কৌতুককর ব্যাপার। অসংখ্য শিষ্য লইয়া তাহারা বাহির হইত। লোকচক্ষুর অন্তরালে উদরপূর্ত্তি করিয়া জনসমাজের মধ্যে তাহারা একরূপ উপবাসেই কাটাইয়া দিত। সকলে ভাবিত, কি তাহাদের নিষ্ঠা! শিষ্যমণ্ডলী গুরুদেবের ঐশী ক্ষমতার কথা চারিদিকে প্রচার করিয়া বেড়াইত! কেহ হাত দেখাইতে আসিলে তাপসেরা শিষ্যদের ইঙ্গিতের সাহায্যে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিত। মন্ত্রীদের কার্য্যাবলীর সম্বন্ধেও তাহারা ভবিষ্যদ্বাণী করিত। মন্ত্রী তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য সেই

কথামত কার্য্য করিতেন। এইরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়া 'তাপসেরা' নিজ কার্য্যসিদ্ধিতে মন দিত।

ভ্রমণশীল চরদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ ছিল। একদল বিজ্ঞান, যাদুবিদ্যা, কাকচরিত্র বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া লোক সমাজে মিশিয়া পড়িত। সহজ ভাষায় ইহাদের 'সংসার বিদ্যা পারদর্শী' বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়াও 'তীক্ষ্ণ' 'রসদ' প্রভৃতি শ্রেণী ছিল। অসমসাহসিক বেপরওয়াদের মধ্য হইতে 'তীক্ষ্ণ' শ্রেণীর গুপ্তচরদল গঠিত হইত। অমাত্য অন্তঃপুরের খবর রাখিবার জন্য নারী-গুপ্তচর নিয়োজিত ছিল। এই সকল চরদের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও শিক্ষিতদের কার্য্য ছিল রাজ্যের ছোট বড় বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারীগণের উপর দৃষ্টি রাখা। রাজকার্য্য নিযুক্ত 'তীক্ষ্ণ' চর এই সকল কর্ম্মচারীদের সাধারণ জীবনে অনুষ্ঠিত কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখিত ও বিভিন্ন পরিচারকবেশী 'রসদ' চর ইহাদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর নজর রাখিত। 'তীক্ষ্ণ' চরদের সংগৃহীত খবরগুলি সংসার বিদ্যা পারদর্শী চরদের নিকট ও 'রসদ' নামে পরিচিত চরশ্রেণীর আহৃত সংবাদ ভিক্ষুণীদের নিকট প্রেরিত হইত। তাহারা আবার সেই খবর গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিষ্ঠানে পাঠাইয়া দিত। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীগণ এই খবরের সত্যাসত্য ঠিক করিবার জন্য নিজেদের চর পাঠাইতে পারিতেন। এই তিন বিভিন্ন দিক হইতে সংগৃহীত সংবাদ একই কথা প্রকাশ করিলে খবর সত্য বলিয়া বিশ্বাস্য হইত। পাছে প্রতিষ্ঠানগুলি এই সকল চরদের সহিত মন্ত্রণাবদ্ধ হয় সেজন্য ব্যবস্থা ছিল যে ভ্রমণশীল চরেরা প্রতিষ্ঠানের অপরিচিত হইবে।

এখনকার মতই সেকালে গুপ্তলিপি ও ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা বলার প্রথা প্রচলিত ছিল।

রাজা যে নিজের রাজ্যের মধ্যেই চর নিয়োগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে। বিভিন্ন রাজ্যে রাজার চর চাষী, ব্যবসায়ী, পরিচারক, সৈনিক প্রভৃতির বেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, কখনও বা সেই সকল দেশে রাজার অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িত। কোন যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিলে এই সকল চর নিজ রাজ্যে শত্রুপক্ষের গুপ্ত খবরগুলি পাঠাইয়া দিত। উপরন্তু তাহারা শত্রুর অন্যান্য শত্রুকে তাহার দুর্ব্বলতার কথা জানাইয়া উৎসাহ দিয়া, শত্রু রাজ্যের রসদ ও ভাণ্ডার নষ্ট করিয়া, চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া, শত্রু সৈন্যভুক্ত হইয়া সৈন্যদের বিদ্রোহী করিয়া নানাপ্রকারে শত্রু রাজ্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিত। অবরোধ কার্য্যেও তাহারা সাহায্য করিত। যুদ্ধের সময় রাজা কখনও কখনও পরামর্শ করিয়া নিজের বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতেন, তাহারা বিদ্রোহীর ভাণ করিয়া শত্রুর আশ্রয়ে গিয়া তাহাদের কুমন্ত্রণা দিত ও শত্রু-রাজ্যে অশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিত। শত্রুর ধ্বংস সাধনও এইরূপে অনায়াসলভ্য হইয়া পড়িত।

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে স্বতঃই বোঝা যায় রাজ্য শাসনের বিষয়ে গুপ্তচর কত প্রয়োজনীয় ছিল। চন্দ্রগুপ্ত প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে চরদের দ্বারা আহৃত খবর গ্রহণ করিতেন। বিন্দুসারও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। মহারাজ অশোক কিন্তু পিতামহ ও পিতার এই প্রথা ত্যাগ করিয়া প্রচার করেন যে তিনি সংবাদ গ্রহণের জন্য কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করিবেন না। সকল সময়েই তাঁহার নিকট সংবাদ দাতাদের অবারিত দ্বার ছিল। অশোকীয় প্রস্তর লিপিতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সকল সংবাদ দাতা ('পত্রিবেদকা') যে গুপ্তচর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা 'ষ্ট্র্যাবো'র উদ্ধৃত 'মেগাস্থিনিসে'র লেখা হইতেই বুঝা যায়। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের গুপ্তচর বিভাগের এই উন্নত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা দেখিয়া কে না বিস্মিত হয়?

মাদ্রাজী প্রেম

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি,এ]

কাবেরী প্রপাত—মহীশূরের গহন বনে মেঘচুম্বী পর্ব্বত শীর্ষ হইতে স্রোতস্বিনী কাবেরীর অজস্র ধারা। ক্ষয়িত প্রস্তর প্রান্ত গিরি উপত্যকার ধূসর-কৃষ্ণ উপলখণ্ডে জল-স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতের প্রতিধ্বনি সৈকতভূমির বনান্তরাল হইতে সহস্রবার শারদ সন্ধ্যার শান্ত প্রকৃতিকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। বামে, দক্ষিণে, পশ্চাতে, সম্মুখে, দিগন্ত বিলীন কানন ভূমির অনন্ত সৌন্দর্য্য। কখনো দূরে, বহুদূরে অস্পষ্ট শ্বাপদ গর্জ্জন, কখনো সন্নিহিত নদী পুলিনে বন বিহঙ্গের প্রস্ফুট কলরব।

পর্ব্বত মালার সর্ব্বোচ্চ শিখরে নির্ঝরের উপকণ্ঠে শতদল-শুভ্র প্রাসাদোপম এক অট্টালিকা। পশ্চিমের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া এক যুবতী নিঃশব্দ অথচ বিরাট সমারোহপূর্ণ সূর্য্যাস্ত দৃশ্যের চিরসুন্দর অভিনয় উপভোগ করিতেছিল। ধীরে সূর্য্য ডুবিয়া গেল, ধীরে ধীরে নিম্নে বৃক্ষরাজির অগাধ সমুদ্রে অন্ধকারের কৃষ্ণচ্ছায়া প্রসারিত হইল। রমণী ধীর পদবিক্ষেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

মাদ্রাজের সমুদ্র তীর।

বেলাভূমে একজন যুবক নতমস্তকে পাদচারণা করিতেছে। বালু সৈকতে, কতদিকে কত লোক বসিয়া আছে। কত কথা, কত হাসি, কত গান। নীল সমুদ্রের বুক হইতে প্রতিপদের চন্দ্রোদয় হইতেছিল। ধীরে, ধীরে, দিগ্বলয়ের কোলে সুধামণ্ডিত হিমাংশুর রজত ধবল মুখচ্ছবির আবির্ভাব হইতেছিল। হরিৎ জ্যোৎস্না নীল সাগরে প্রতিবিম্ব ফেলিয়া তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে লাগিল, গগন পবন অনুপম লাবণ্যে ভরিয়া উঠিল। যুবক চাহিয়া দেখিল, কিন্তু প্রফুল্ল হইল না, দীর্ঘশ্বাস ফেলিল;

কেন?

কেন? যদি শুনিতে চাও, তাহা হইতে অনেকদিন আগেকার অনেক কথাই আজ বলিতে হয়।

সেবার ট্রিপ্লিকেনের পার্থ সারথির মন্দিরে বিপুল সমারোহ সহকারে 'ব্রহ্মোৎসব' আরম্ভ হইয়াছে। আটদিন ধরিয়া উৎসব চলিবে। দেশ বিদেশ হইতে কোটি কোটি নরনারী উৎসবে যোগ দিতে আসিতেছে। জনস্রোতের বিরাম নাই, সমস্ত দিন ধরিয়া অনবরত লোক আসিতেছে। মন্দির লোকে লোকারণ্য।

সন্ধ্যাবেলা দেবতার আরতি হইতেছিল। পার্থ সারথির কৃষ্ণ প্রস্তরমূর্ত্তি অমূল্য হীরক ও স্বর্ণালঙ্কারে অপরূপ গৌরবে ঝকমক্ করিতেছিল, বামে রুক্মিণীর সুবর্ণমণ্ডিত শ্রীঅঙ্গ বল্লরী। সম্মুখে অভিষেকের স্বর্ণ সিংহাসন।

নির্ণিমেষ কোটি আঁখি দেবতার মুখপঙ্কজ খুঁজিয়া ফিরিতেছে, ভক্তিপ্লাবিত কোটি হৃদয় শ্রীভগবানকে আত্ম নিবেদন করিতে চাহিতেছে। শতবার দেখিয়া আকাঙ্খা মিটিতেছে না, শতবার প্রণিপাত করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না।

কিন্তু ঐ বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে শুধু একজন যুবক দেবতাকে নমস্কার করিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্র সুন্দরীদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। রবিবর্ম্মার ছবির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ রূপসীদের রূপলাবণ্য দেখিয়া দেখিয়া যাহার আশ মিটিতেছিল না, তাহার নাম ধনকোটি মুদেলিয়র।

ধনকোটি দরিদ্রের সন্তান, নিজেও দরিদ্র। মাদ্রাজে চায়না বাজারে একখানি ছোট দোকান খুলিয়া সে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পিতা নাই, মাতা নাই, সংসারে তাহার আপনার বলিবার কেহ নাই। সম্প্রতি একটি কিশোরীকে অঙ্কশায়িনী করিয়া সংসারের শ্রী বর্দ্ধন করিবার বাসনা তাহার মনে অত্যন্ত জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজ তাই সহস্র রমণীর মাঝখানে সে আপনার মনোমত রমণীকে বাছিয়া লইতে আসিয়াছে।

মন্দিরে প্রবেশ করিতেই একখানি মুখ তাহার বুকের

মাঝখানে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, সেই মুখখানি অনেক দূর হইতে দেখিয়া দেখিয়া ধনকোটি তাহারই অনুসরণ করিতেছিল।

রমণীর সঙ্গে একজন বর্ষিয়সী বিধবা ছিল, তাহার হাত ধরিয়া সে পার্থ সারথির বড় মন্দিরের দিকে চলিল। ধনকোটিও চলিল।

সুড়ঙ্গের মতন দালান মন্দির দ্বার অবধি গিয়াছে, উপরে, নীচে, দক্ষিণে, বামে কোথাও আলোক প্রবেশের বিন্দুমাত্র পথ নাই। সেই গভীর অন্ধকারে হাজার হাজার লোক অনবরত প্রবেশ করিতেছে। ভীড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে রমণী চলিল, ধনকোটি পাশ হইতে অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিতে লাগিল।

মন্দিরের মধ্যে দেবতার বিরাট মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। বাংলার কুসুম কোমল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে—দাক্ষিণাত্যের বজ্রকঠোর পার্থ সারথির কোন সাদৃশ্য নাই। কিন্তু এই পার্থ সারথির মূর্ত্তি না কি ভারী জাগ্রত, মাদ্রাজীরা তাঁহাকে যারপরনাই ভক্তি করে। একদিকে লোহার শিকলে লোহার একটা পাত্র ঝুলিতেছে, তাহাতে ঘিএর প্রদীপ জ্বলিতেছে। মাদ্রাজী পাণ্ডারা বিদেশী যাত্রীদের বুঝাইয়া দিতেছে - দিস্ ইস্ পার্থ-সারথ্, হোয়াট মিনস্ লর্ড কৃষ্ণ।

প্রদীপের আলোকে ধনকোটি দেখিল, রমণীর সঙ্গিনী জোড়হাতে দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে রমণী দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতেছে। সুযোগ বুঝিয়া ধনকোটি গিয়া তাহার হাত ধরিল, সে আপত্তি করিবারও অবকাশ পাইল না। ভিড়ের মধ্য হইতে তাহাকে কোনরকমে টানিয়া ধনকোটি মন্দিরের বাহিরে চলিয়া আসিল। চারিদিকে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেই আলোতে রমণী যুবকের মুখের দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল। ধনকোটি অস্ফুটকণ্ঠে তামিলে বলিল—শীঘ্র রাস্তায় চল, সেখানে সব কথা বলিব। রমণী দ্বিরুক্তি করিল না।

বাহিরে তখনো দিনের আলো রহিয়াছে। একখানা রিক্শ ডাকিয়া রমণীকে তাহাতে উঠাইয়া দিয়া ধনকোটি উঠিয়া বসিল। চালককে বলিয়া দিল—সমুদ্র তীরে চল।

মাউণ্ট রোডের পিচ্-ঢালা রাস্তা দিয়া রিক্শ ছুটিল। খানিক দূর গিয়া মোড় ফিরিয়া বীচ্ রোডএ পড়িল। একদিকে ধু ধু সমুদ্র, আর একদিকে রাজপ্রাসাদের মত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা। এক জায়গায় রিক্শ থামাইয়া ধনকোটি রমণীকে লইয়া নামিয়া পড়িল। তারপর বালির উপর দিয়া সাগর সৈকতের দিকে চলিল।

ধনকোটি জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি ?

চলিতে চলিতে রমণী উত্তর করিল—অমুনি।

বেলাভূমে বসিয়া ধীরে ধীরে ধনকোটি যে কয়টি প্রশ্ন করিল, নিঃসঙ্কোচে স্বাভাবিকভাবে রমণী তাহার উত্তর দিল। তাহা হইতে এই জানা গেল, যে অমুনির পিতার অবস্থা তত ভালো নয়। সেই তাঁহার একমাত্র সন্তান। সম্প্রতি, তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাই অমুনি একজন দাসীর সঙ্গে লুকাইয়া পার্থ সারথিকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। ইহার পরে সে সুবিধা ত আর হইবে না এবং শেষ কথা এখনো তাহার বিবাহ হয় নাই।

দূরে আর্কটের নবাবের প্রাসাদ চূড়ার কারুকার্য্যের উপরে দিনমণির শেষ রশ্মি ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ, একোয়ারিয়ম্ সেনেট্ হাউসের মাথায় মাথায় তখনো সূর্য্যালোকের তেমনি বিচিত্র বাহার।

ধনকোটি বলিল—অমুনি, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই করিবে ?

সেই কথা বলিবার জন্যই কি আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছ ?

হাঁ।

কয়দিন পরেই ত আমরা খৃষ্টান হইয়া যাইব, তুমি খৃষ্টান হইতে পারিবে ?

খৃষ্টান হইবার দরকার কি ? তুমি যদি আমার সঙ্গে পলাইয়া যাও, হিন্দু মতেই বিবাহ হইবে।

কেন, তোমার সঙ্গে ক্ষণিকের দেখায় আমি তোমায় এমন কি চিনিলাম, যে আজন্মের পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিব ?, আমি চলিয়া যাই, আমাকে মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়া এসো। তোমার নাম কি ?

ধনকোটি মুদেলিয়র।

ধনকোটি বুঝিল কাজটা তাহার নিতান্ত বাতুলের মত

হইয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তোমার ঝিকে খুঁজিয়া লইতে পারিবে ?

না পারি অন্য ব্যবস্থা করিব, আমায় তুমি মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া যাও।

সূর্য্য তখন ডুবিয়া গেছে। দুজনে উঠিয়া চলিল। দুজনেই মনে করিয়াছিল ঘটনাটা তুচ্ছ, কালই হয়ত ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু অন্তরাল হইতে অন্তর্য্যামী হয়ত হাসিলেন। এই যে জীবনের মহেন্দ্র ক্ষণে দুটি মাত্র কথায় দুজনের পৌরুষ এবং নারীত্বের বীণায় প্রথম ঘা পড়িল, ইহার রেশ কি কালই থামিয়া যাইতে পারে ? অস্ত-শেষ আলোয় দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুজনেরই পরস্পরকে ভালো লাগিল।

অমুনির রঙীন চেলাঞ্চলে সমুদ্রের হাওয়া হিল্লোল তুলিয়া গেল, 'মেরিনা'র দুইধারে শত শত রঙীন ফুলের গাছ হেলিয়া দুলিয়া, বোধ হয় তাহাদেরই দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। অনেক দূরে সাদা পাল তুলিয়া একখানা কাটামারান্ ভাসিয়া চলিয়াছে। বন্দরে একখানা জাহাজ আলো দিয়া সাজাইয়াছে।

অমুনিকে মন্দিরে নামাইয়া দিয়া ধনকোটি গৃহে ফিরিল।

একমাস পরে, একটা রবিবারের সকাল বেলা রয়াপুরমের রোম্যান্ ক্যাথলিক চার্চ্চে উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে কত প্রতিমূর্ত্তি. কত ছবি। পুরোহিত বেদীর সামনে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পড়িতেছে, তাহারই সামনে হলের চারিদিকে ভক্তরা হাঁটু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতেছে। ধূপের গন্ধে সমস্ত ঘরখানি আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। পিতার সঙ্গে আসিয়া অমুনি যীশুর কাছে প্রার্থনা করিয়া গেল।

দিনকতক পরে ধনকোটি শুনিল, একজন বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার—আরেক্ স্বামী আয়েঙ্গারের সঙ্গে অমুনির বিবাহ হইয়া গেছে, কাল তাহারা প্রবাসে কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া যাইবে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা পার্থ সারথির মন্দিরে গিয়া ধনকোটি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিল, জীবনে সে বিবাহ করিবে না।

অমুনি কাবেরী প্রপাতের তীরে স্বামীর কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেল, ধনকোটি চায়না বাজারে ছোট দোকান খানি চালাইতে লাগিল। ধনকোটি ভাবিল অমুনি তাহাকে ভুলিয়া গেছে; অমুনি ভাবিত তাহার কথা ধনকোটির মনে নাই।

কিন্তু সূর্য্যাস্তের সময় দুজনকারই মন বড় খারাপ হইয়া যাইত সেই একটি সন্ধ্যার কথা মনে করিয়া।

অমুনির প্রথম সন্তানের ডাকনাম রাখা হইল 'দোরেকান'। অমুনি স্বামীকে বলিল, না এর নাম থাকুক ধনুকোটি।

আরেক স্বামী ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না, বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, কাবেরীর নির্ঝর স্রোত তৃণশ্যাম উপকূল প্রান্ত অবিশ্রাম চুম্বন করিতেছে, দূরে পর্ব্বতমালার অন্তরালে অস্তশেষ আলোক রশ্মি দিন শেষের গগন প্রান্ত উজ্জ্বল করিয়া আছে।

—

বধূ-বরণ

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ, এম্, আর, এ, এস্]

কলেজের ছাত্র রবীন্দ্র যখন চিত্র পাশ করিয়া বাড়ী আসিল তখন বাঙ্গলায় শরতে মাতৃ-পূজার ধূম লাগিয়া গিয়াছে। এইবার রবীন্দ্রের বাবা ও মা তার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন, রবীন্দ্র কহিল, "বাবা আমার বিবাহে পণ লইতে পারিবেন না, স্বেচ্ছা যৌতুক লইয়া বা বিনা যৌতুকেই বিবাহ করিব।" বাবা ও মা দেখিলেন একটা ভারি দাও ফস্কিয়া যাইতেছে। এদিকে তারা এরূপ পাশের পাত্রের দর ছয় হাজার টাকা হাকিয়াছিলেন তার বেহাইর বিবেচনার উপর ছিল অলঙ্কারের বরাদ্দ।

সেদিন থেকে বাবা ও মা রবীন্দ্রের বিবাহের উদ্জোগে গা ছাড়িয়া দিলেন। পাড়া প্রতিবাসীরা যখন রবীন্দ্রের বিবাহের কথা কহিত তখন তারা উপেক্ষার ভাবে উত্তর করিতেন "আর কি হইবে ছেলের বিবাহ দিয়া।" সুতরাং মেয়ে লইয়া যাহারা উমেদারী করিতে আসিত তারাও নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া যাইত। আর এদিকে যত উৎপাত আসিয়া জুটিল, রবীন্দ্র বিনাপণে বিবাহ করিবে ও ব্রাহ্মণ সমন্বয় করিবে ভাবিয়া দেশের মেয়ের বাপেরা সে গৃহে উমেদারী করিতে লাগিল! রবীন্দ্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণ তার কাছে বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণেরাও মেয়ে লইয়া যত উমেদারী করিতে লাগিলেন।

রবীন্দ্রের ঐ একই কথা। পণ লইব না, যৌতুক যে যা পারে দাও, না দিলেও ক্ষতি নাই। যে দেশে রবীন্দ্রের বাড়ী সেখানে বারেন্দ্র সমাজে পণের জ্বালা বড় বেশী তাই বারেন্দ্ররা একটী মেয়ে নিখরচায় চাপাইবার জন্য রবীন্দ্রের বাবার ভিটায় নিত্য পদধূলি দিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রের বাবার কোন উৎসাহ না দেখিয়া অনেক হাটাহাটি করিয়া তারা রণে ভঙ্গ দিলেন।

রবীন্দ্রের বাবার নাম রমেশবাবু তিনি ভাবিতেছিলেন ছেলের এই রকম এক গুয়ামী ভাব কিছুদিন পরে সারিয়া যাইবে। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল তাতেও কোন ফল দেখা গেল না দেখিয়া অগত্যা এ ঠাই ও ঠাই করিয়া রমেশ-বাবু পুত্র বিবাহের জন্য পাত্রী দেখিতে লাগিলেন।

পাত্রী সুন্দরীও হইল, কুলমর্য্যাদায় ভালই হইল—কিন্তু রবীন্দ্র কহিল "আর এক বৎসর গেলে, এর এ পাশের ফলটা দেখিয়া বিবাহ করিব।" সুতরাং রমেশবাবুকে অগত্যা সেকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেই হইবে।

বাড়ীতে দুর্গা পূজা, শরতকাল, মায়ের আগমনে সকল গৃহই আনন্দময় হইয়াছে কিন্তু রবীন্দ্রের মনে আর আনন্দের ভাব নাই। রবীন্দ্র যখন বাড়ী আসিল তখন তার অষ্টম বর্ষীয়া ভগ্নির একাদশীর উপবাস, সে সেদিন তার অতিতৃষ্ণায় তাকে ডাবের জল খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তার মা ও বাপ সমাজের ভয়ে তাতে রাজী হন নাই। তাহাদিগকে সে বলিয়াছিল "গৌরীদানের ফল উপভোগ করুন, আপনারা কোন্ হৃদয় লইয়া এই দুধের শিশুকে নির্জ্জলা উপবাসী রাখিয়া কেমন করিয়া পেটে অন্ন দিতেছেন!" তাতেও ফল হইল না, শিরোমনী মহাশয় আসিয়া কহিলেন "কি সর্ব্বনাশ, একাদশীর দিনে বিধবার জলগ্রহণ মহাপাপ। ইংরাজী পড়ুয়া ছাত্রদের কথায় আমাদের শাস্ত্র প্রস্তুত হয় নাই।" রমেশ বাবুর যে একটু ইচ্ছা ছিল, তাও নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়াই নিভিয়া গেল।

দ্বাদশীর পারণের দিন রবীন্দ্রের অষ্টম বর্ষীয়া বিধবা ভগ্নি তার শয্যার পাশে বারান্দায় বসিয়া ওপাড়ার তার সমবয়সী মিনুর সঙ্গে তাদের পুতুলের বিবাহ দিতেছিল। পুতুল বিধবা হইয়াছে তার জন্য তারা কাঁদাকাটিও করিতেছিল।

এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া রবীন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে অশ্রুজলে বালিশ ভিজাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে মায়ের নিকট গিয়া কহিল "মা, তোমরা কোন্ সুখে আছ ওই শুন সুমতি কি করিতেছে, সে যে বিধবা হইয়াছে, বিধবা হওয়াটা কি সে তা জানে না সুতরাং তার একটা গতি না

হওয়া পর্য্যন্ত আমি বিবাহ করিব না। কোন্ প্রাণে এই অগ্নিকুণ্ড বুকে জ্বালাইয়া বিবাহ করিব ?"

মা সুমতিকে ডাকিলেন, সে কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোরা কি খেলা করিতেছিস্।" সে কহিল "পুতুলের বিয়ে দিচ্ছি। মিনুর ছেলে আমার মেয়ে, বিবাহের দুইদিন পর বিধবা হইয়াছে আমরা কাঁদিতেছি। যেমন আমি বিধবা হইলে তোমরা করিয়াছিলে।"

রবীন্দ্র অতি দুঃখে সুমতিকে কোলে তুলিয়া লইল। মা কহিলেন "বাবা ভগবানের মার ইহার উপর মানুষের কি হাত আছে, আমরা কি করিব ?" রবীন্দ্র তাকে কোলে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। "মা, তোমরা কি মানুষ না আর কিছু ? এই দুধের শিশুকে তোমরা হাত পা বাঁধিয়া রাখিবে ? শরীরের উপর তোমার অধিকার থাকিতে পারে কিন্তু মনের উপর কি অধিকার আছে ?"

মা কহিলেন "শাস্ত্র ত মানিতেই হইবে। আমি কি আর তাকে সাধ করিয়া এমন করিয়া রাখি ? যখন তার হাতের শাঁখা খুলি তখন তার কাঁদা দেখিয়া সোণার বালা দিয়াছি। থান কাপড় পরিধান করাইলে যখন কাঁদিয়াছিল তখন তাকে কালো পাড়ের ধুতি দিয়াছি।"

রবীন্দ্র কহিল "এতে কি সুখ আছে ? তার দুঃখ শাস্ত্র দিয়া কি বারণ করিতে পারিবে ? বিধবা বিবাহ ত শাস্ত্রে নিষেধ নাই। তবে দেশাচার বলিয়া আমরা করি না, দেখা যাইতেছে আমরা শাস্ত্র মানি না। অতএব সর্ব্বাগ্রে সুমতির বিবাহ দাও তারপর আমার বিবাহের চেষ্টা করিবে। তাহা না হইলে আমার ভাগ্যে আর বিবাহ নাই।"

দ্বিজেন্দ্র রবীন্দ্রের সমপাঠী, তাহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, দ্বিজেন্দ্রকে সে কহিল, "ভাই কেমন করিয়া শোচনীয় দৃশ্য চোখে দেখি। সুমতি আমার বোন বিধবা, এমন শিশুর একটা উপায় কি করি ? সুমতিকে তুমি দেখিয়াছ এমন সোণার প্রতিমা ঘরে রাখি কেমন করিয়া ? তুমি ত বিধবা বিবাহের পক্ষে বক্তৃতা করিয়া বেড়াও, এবার তুমি ইহাকে বিবাহ করিয়া পথ দেখাও।" দ্বিজেন্দ্র কহিল "তোমরা রাঢ়ী তাতে আপত্তি নাই বিশেষতঃ শাস্ত্রে কোন নিষেধ নাই, অতএব আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলাম কিন্তু একটী কথা, আমারও একটী বিধবা বোন আছে তাহার গতিও তোমায় করিতে হইবে।"

উভয়ে সহাস্যমুখে ঘরে আসিয়া যার যার পিতা মাতার নিকট পত্র লিখিল। সদুত্তর পাইয়া উভয়ে বাড়ী গমন করিল ও একটা শুভদিনে বিবাহ হইয়া গেল। রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র পত্নী লইয়া গৃহে গেল। পাল্‌কীর কাছে রবীন্দ্র মাকে ডাকিয়া নিয়া কহিল "মা, তোমার জন্য বউ আনিয়াছি, বরণ করিয়া লও। মা দেখিলেন টুকটুকে মেয়ে যেন তার বাড়ী আলো করিতে আসিয়াছে। পরদিন দ্বিজেন্দ্রও সস্ত্রীক আসিল। সুমতি কহিল "দ্বীজেনদা, কত রঙ্গই না জানো, দ্বীজেনদা সেদিনও দাদার সঙ্গে এসেছিলে এখন কি না কলকাতায় গিয়া তুমি আমার বর হয়েছ, আর একজনও ত আমার বর হইয়াছিল, একদিনের বেশী তাকে দেখি নাই। দ্বীজেনদা, তার থেকে তুমি সুন্দর।"

মা আসিয়া কহিলেন "সুমতি এখন আর দ্বীজেনকে দাদা ডেকো না, সে এখন তোর বর।" "আচ্ছা তবে এখন থেকে দ্বীজেনদাকে বর বলেই ডাকব।" বলিয়া সুমতি পলাইয়া গেল।

কেরাণীর চিঠি

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এল্]

কল্যাণীয়াসু—

এক সপ্তাহের ভিতরে তোমার দুইখানি চিঠি পাইয়াছি। যদি শুধু অভিমান করিয়াই নিরস্ত থাকিতে তাহা হইলে হয়ত বা পত্রোত্তর দিতাম না। কিন্তু খোকার অসুখের কথা শুনিয়া ঠিক থাকিতে পারিলাম না। আমি পাষাণ হইতে পারি—দরিদ্র হইতে পারি—কিন্তু পিতা ত বটে—পিতা নিঃস্ব হইলেও তাহার একটা প্রাণ আছে—স্নেহের উৎস আছে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভগবান দয়াবান বলিয়া দরিদ্রের স্কন্ধে শতেক বোঝার সঙ্গে রোগের বোঝাটাও নির্ব্বিঘ্নে চাপাইয়া দিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি চিকিৎসা করাইবার শক্তিটুকু শুধু দেন নাই। কারণ তাহা হইলে অধিকতর দয়া দেখাইয়া তিনি অন্যের নিকটে পক্ষপাত দোষে অপরাধী হইলেও বা হইতে পারেন। তাঁহার ন্যায় সুবিচারকের পক্ষে এরূপ একটা অক্ষয় কলঙ্ক বরণ করা যে একান্ত অসম্ভব। তবু নির্ব্বোধ চিত্ত থাকিয়া থাকিয়া বলিতে চায়, রোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগ দূর করার শক্তিটুকু দিলে বোধ হয় তিনি নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিতেন না।

খোকার কি অসুখ তাহা লিখ নাই। জানাইয়া কি হইবে, ইহা ভাবিয়াই বোধ হয় চুপ করিয়া গিয়াছ। ভালই করিয়াছ। ধাক্কা খাইতে খাইতে যে পাষাণ হইয়া গিয়াছে সেই পাষাণে পাঁচ কিল দিয়া কি লাভ? উপকার করিবার সব দুরাশা আমার দূর হইয়া গিয়াছে। মনে করিয়া লইও ভদ্রতার খাতিরেই আমি একটুকু অনুরোধ করিতেছি, খোকার যেন চিকিৎসা হয়। আমার সম্পর্কে তুমি যতটা হতাশ হইয়াছ তোমার সম্পর্কে আমি কিন্তু ততটা হতাশ হইতে পারি নাই। তাই আমার ভরসা আছে যে তুমি খোকাকে বিনা চিকিৎসায় মরিতে দিবে না।

তুমি লিখিয়াছ—'পূজার ছুটি যতই নিকটে আসে আমি ততই রুক্ষ হই কেন তাহা তুমি ভাবিয়া ঠিক পাও না।' তুমি সবই ঠিক পাও বটে কেবল লজ্জায় মুখ ফুটিয়া বল না। আমি এত নির্ব্বোধ নই যে এই সত্যটুকু বুঝি না। তবু তুমি যখন আমার মুখ দিয়াই কথাটা জানিতে চাহিয়াছ তখন সকল কথা খুলিয়াই বলিব। না হয় ব্যাপারটা নিতান্তই অপ্রীতিকর হইবে। তাই বলিয়া সত্যটাকে ধামা চাপা দিলে ত চলিবে না। তোমার উপরে আমার কোন অভিমান নাই, আমার নিজের অদৃষ্টের উপরে অভিমান করিয়াই আমি শুধু পূজার ছুটি বলিয়া নয় দিন দিনই অধিকতর রুক্ষ হইয়া পড়িতেছি!

বিবাহিত জীবনের স্বপ্নমধুর তরল দিনগুলির কথা তোমার মনে পড়ে?

সেই হাসি, সেই সুখ, সেই চুমা এখন কেবলই বিদ্রূপ বলিয়া মনে হয় না? পৃথিবী চিরকাল একই ভাবে চলিয়া যাইতেছে কিন্তু মানুষ সে তালের সঙ্গে তাল ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে না বলিয়াই বেচারা এমন বে-চাল হইয়া পড়ে। যখন আমি হিন্দু ধর্ম্মের সার পদার্থ চির পবিত্র চির মধুময় উদ্বাহ বন্ধনে গম্ভীরভাবে আবদ্ধ হই তখন আমি কলেজে বি-এ পড়ি, চোখে চশ্‌মা ধরি, গায়ে আদ্ধির পাঞ্জাবী পরি। তখন আমাকে পায় কে? লক্কা পায়রার মত হাল্‌কা বাতাসে দিনরাত কেবল আমার মনটা ডিগবাজী খাইত। আমি ভাবিতাম, এই অদূর ভবিষ্যতেই আমি একটা 'হোমরা চোমরা' হইব আর তুমি যে একটা বিরাট পুরুষের ঘরণী হওয়ার গৌরব হৃদয়ে পোষণ করিতে না একথা এখন 'হলপ্‌' করিয়া বলিলেও আমি বিশ্বাস করিব না। তুমিই বল, তখন কে ভাবিয়াছিল যে দুষ্ট শনি শুক্রবার হইতেই নিষ্ঠুরের মত আমার পশ্চাতে লাগিয়া আছে? তাই অদৃষ্টের ফেরে

আমি হইলাম সিম্ কোম্পানীর ত্রিশ টাকা মাহিনার নির্জ্জীব কেরাণী আর তুমি হইলে সেই কেরাণীরই ঘুঁটেকুড়ানী ঘরণী। বাড়ীতে আমাকে কখনও নির্জ্জীব থাকিতে দেখ না বলিয়া তুমি হয়ত সন্দেহ করিবে কেরাণী কখন নির্জ্জীব হয় না। ওগো ভুলিয়া যাও কেন, বাড়ীতে আমি কেন—কোন কেরাণীই কেরাণীরূপে যান না। এই কেরাণীই তখন 'প্রমোশন' পাইয়া বড়কর্ত্তা সাজিয়া গৃহে প্রবেশ করেন। আফিসের বড় কর্ত্তার মত বাদ্শাহী চাল ঠিক রাখিতে না পারিলেও বাদ্শাহী মেজাজটা বাড়ীতে ঠিক রাখিতে কখনও ভুল করি নাই ভবিষ্যতেও করিব বলিয়া কোনরূপ সন্দেহ করি না।

বাঙ্গলা দেশের কোন এক প্রতিভাবান্ রসিক লেখক তাঁহার কোন একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তকে ঘোড়ার সাথে কেরাণীর তুলনা করিয়া ঘোড়াকে অপমান ও কেরাণীকে উচ্চাসন প্রদান করিয়া কেরাণীর প্রতি বড়ই দরদ্ দেখাইয়াছিলেন। লেখকের দুঃসাহসিকতা দেখিয়া ও ভবিষ্যৎ সুখ-সূর্য্যের প্রথম স্বর্ণ কিরণ লাভ করিয়া যখন কেরাণীকুল নিজ নিজ কুলায়ে আনন্দে কলরোল করিয়া উঠিল ঠিক সেই সময়ে বেতার যন্ত্রে নিদারুণ দুঃসংবাদ আসিল সাহিত্যের দরবারে এ তুলনা বর্ত্তমানে বাতিল হইয়া গিয়াছে। কেন এরূপ হইয়াছে জানি না তবে শুনিয়াছি যে এরূপ অপমান-জনক তুলনার ফলে ঘোড়ারা না কি রাগে দুঃখে একসঙ্গে সকলে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ঘোড়ার রাগ হওয়ার যথেষ্টই কারণ আছে। সে কোন্ দুঃখে কেরাণীর সঙ্গে একাসনে বসিবে? ঘোড়া আর কেরাণী দুটিতেই মার খায় সত্য কিন্তু ঘোড়ার সান্ত্বনা এই যে সে এক মনিবের হুকুমই তামিল করে আর বেচারা কেরাণীর নিজস্ব বলিয়া কিছু নাই, রামু হইতে চামু খানসামা পর্য্যন্ত সকলেই তার হুজুর। সকলের হুকুমই সে সর্ব্বদা বিনাপত্তিতে তামিল করিয়া আসিতেছে এবং পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে তামিল করিয়াই যাইবে।

ত্রিশ টাকার কেরাণী হইলেও লোকের কাছে আমি ভদ্রলোক। সুতরাং সেই গৌরব বজায় রাখিবার জন্ম ইচ্ছায় হোক্—অনিচ্ছায় হোক্ সর্ব্বদা ভদ্রতার মুখোস পরিয়া থাকিতে হইবে। তুমি শতজীর্ণ অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পর ক্ষতি নাই কিন্তু আমার পোষাক সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা চাই। কারণ আমি ভদ্রলোক। আমার শক্তি থাকুক বা না থাকুক সকলের সঙ্গে আমাকে হাসি-তামাসায় যোগদান করিতে হইবে। যদি না করি সকলে সমস্বরে বিনা বিচারে বলিয়া উঠিবে—লোকটা নিতান্ত অহঙ্কারী অভদ্র! পূজায় ছেলেকে একটা জামা দিতে পারি বা না পারি আফিসের চাপরাশী হইতে মেসের বামুন চাকরকে পূজার পরবী দিতেই হইবে। এইগুলি ভদ্রলোক সাজিবার পুরস্কার স্বরূপ লৌকিকতার কশাঘাত। আমি লৌকিকতাকে আড়াল করিতে চাহিলেও তার নির্ম্মম কশাঘাত আমাকে কখনও আড়াল করিবে না।

নূতন বিবাহের পরে কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঠোঁটে হাজার চুমা খাইয়া, প্রত্যহ পত্র লিখিতে তোমাকে হাজার বার শপথ করাইয়া যখন নিতান্ত অনিচ্ছায় বাড়ী হইতে কলেজ হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিতাম তখন রোজই রঙীন খামে তোমার চিঠি পাওয়ার আশায় ডাকের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। আর এখন তোমার পত্র পাইলেও ভয় হয় না পাইলেও ভয় হয়। না পাইলে ভয় একটা অমঙ্গলের দুশ্চিন্তার আর পাইলে ভয় অধিকতর দুশ্চিন্তায়। যদি তুমি স্বামীর নিকটে সাধ করিয়া কোন জিনিষ চাহিয়া থাক। তুমি ত ভাবিবে না, তোমার স্বামী এমনই অপদার্থ যে স্ত্রীর সামান্য অনুরোধও রক্ষা করিতে অসমর্থ। আমি জানি তুমি বুদ্ধিমতী তাই আজ পর্য্যন্ত আমার নিকটে কিছু চাও নাই। সেই জন্যই ত আমার অধিকতর ভয় তোমাকে আমি প্রথম বিমুখ করিব কি করিয়া? অতীতের আমি বর্ত্তমানেও সেই আমিই আছি কেবল আমার ভিতরকার মানুষটি আমাকে ঘৃণায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এই যা দুঃখ!

বড়লোক বন্ধুরা (?) স্ত্রীর পোষাক, ছেলে মেয়ের পোষাক পছন্দ করিয়া দিতে আমাকে বাজারে লইয়া যায়। কলেজে সৌখিন ছিলাম বলিয়া তাহারা আজও আমাকে ভুলিয়া যায় নাই। একি দয়া না পরিহাস তাহা শুনিতে চাহিও না। আমি বিনা পয়সায় জিনিষ পছন্দ করিয়া দেই তাহারা পয়সা দিয়া জিনিষ কেনে। কোন্ প্রাণে পছন্দ

করি তাহা শুধু আমিই জানি। তাহাদের হাসি-আনন্দ দেখি আর আমি বিহ্বল হইয়া ভাবি—তোমরাও মানুষ, আমিও মানুষ!

পূজার উৎসবে দরিদ্রের কোন অধিকার নাই। এ উৎসব দরিদ্রের প্রাণে নূতন করিয়া অভাবের হাহাকার জাগাইয়া দেয়। গায়ে যার বস্ত্র নাই—মুখে যার অন্ন নাই—রোগে যার ঔষধ নাই তাহার আবার উৎসব কি? উৎসবের নামে এ শুধু দরিদ্রের প্রতি ভগবানের অসহ্য বিদ্রূপ!

তুমি কি আরও জানিতে চাও, পূজার সময়ে আমি এত রুক্ষ হই কেন?—না থাক্ বলিয়া কাজ নাই! ইতি—

তোমার…….. ……

চোখ গেল

[শ্রীমতী বিভাবতী দেবী]

ঘন পল্লবের মাঝে বসি' নিরজনে
'চোখ গেল' 'চোখ গেল' ডাক ক্ষণে ক্ষণে।
কি বেদনা চোখে তব কহ সত্য করি
অশ্রান্ত করুণ সুরে গুমরি' গুমরি'।
ডাকিছ কি হেতু? তব চোখে কি সে ব্যথা—
আঘাত দিয়েছে কেহ না করি' মমতা?
অথবা চোখের পরে তব প্রিয়জনে
হয়েছে নিঠুর ব্যাধ কঠিন পীড়নে।
কিংবা হেরি' জগতের শত অত্যাচার
শত উৎপীড়নে আর আর্ত্ত হাহাকার।
সে দৃশ্য হেরিতে নারি আঁখির উপরে
'চোখ গেল' 'চোখ গেল' ডাকিছ কাতরে

বাঁশী

(গল্প)

[শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এস্‌-সি]

(১)

"তোমার হাতটা একবার আমার বুকে দাও না ?"

প্রকাশ তাহার হাতখানি ধীরে ধীরে মুমূর্ষু স্ত্রীর কঙ্কালসার দ্রুত স্পন্দিত বক্ষের উপর রাখিল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বক্ষ আলোড়িত করিয়া বাহিরের বাতাসে মিলিয়া গেল।

"আঃ বড় শান্তি, বড় তৃপ্তি।"

অতি ধীরে অতিক্লেশে প্রমীলা তাহার চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল-সার হাতখানি তুলিয়া তাহার স্বামীর শুভ্র সুন্দর হাতখানি চাপিয়া ধরিল। "মুখ তোলো, আমার দিকে চাও। একটি কথা রাখবে ? বল রাখবে ? এই বুক ছুঁয়ে শপথ কর।"

"এখন উত্তেজিত হ'ওনা প্রমীলা। তোমার হিক্কা হ'চ্ছে।"

"সেইজন্যই ত যাবার বেলায় ছুটো কথা কয়ে নিচ্ছি, হ'য়ত হিক্কা এখুনি থেমে যাবে, বুকের স্পন্দনও বন্ধ হবে, আর বলতে পারব না। বড় কষ্ট হ'চ্ছে, এ দেহ আর বইতে পাচ্ছি না। কিন্তু যেতেও যে পাচ্ছি না। তোমার চিন্তা যে আমার সকল পথ বন্ধ করে রেখেছে।" দুফোঁটা অশ্রু তাহার জ্যোতিশূন্য চক্ষুদুটি হইতে গড়াইয়া বালিশে পড়িল। প্রকাশ রুমাল দিয়া প্রমীলার চক্ষু মুছিয়া দিল। তারপর ঘাম নিবারণ করিবার জন্য ডাক্তারের দেওয়া পাওডার পাফে করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

থাক আর বাতাস ক'রতে হবে না। এ শেষের ঘাম বাতাসে মুছবার নয়, মিছে কেন কষ্ট করবে। বল কথা রাখবে ?"

"রাখবো।"

"আমার দেহান্তে তুমি একটি সুশীলা সুন্দরী সদ্বংশের মেয়ে দেখে বিয়ে কোরো। চিরদিন আমায় নিয়ে কি কষ্টটাই না ভোগ করলে। বিবাহের পরই আমার ম্যালেরিয়া হ'ল—তারপর টিউবার কিউলিথ্‌স্‌, ক্রমে থাইসিসে দাঁড়াল। কত অর্থব্যয় হ'ল—চিকিৎসা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ, দেশ বিদেশ ঘুরলে। কি কুক্ষণেই জন্মেছিলাম, আজীবন তোমার সেবা নিয়েই চল্লাম। এতটুকু তোমার কাজে নিজেকে লাগাতে পারলাম না। বল বিয়ে করবে ? আমার কথা ঠেলবে না ? উত্তর দাও ?"

"এর যে উত্তর নেই প্রমীলা।"

"কেন নেই।"

"আজ যদি তোমারই মত মৃত্যু আমার শিয়রে ব'সত, আর তোমার হাতখানি আমার বুকে নিয়ে তোমায় এইরূপ অনুরোধ করতাম, তাহলে তুমি কি উত্তর দিতে পারতে প্রমীলা ?"

"আমাদের কথা যে স্বতন্ত্র। তোমরা পুরুষ তোমাদের চোখে চোখে না রাখলে আমাদের নারী জাতির যে তৃপ্তি হয় না। বাইরের কাজে তোমরা উদ্যমশীল কর্ম্মঠ উপযুক্ত হ'তে পার, কিন্তু অন্তঃপুরে তোমরা যে কতদুর অসহায়, তা আমরা যত জানি তাত আর কেউ জানে না।"

"তোমাদের কথা স্বতন্ত্র কেন প্রমীলা ? তোমাদের স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝি অটুট চিরস্থায়ী জন্মজন্মান্তরের, আর আমাদের স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝি বাজারের কেনা কাঁচের বাসনের মত। একটা ভেঙ্গে গেলে আর একটা নিয়ে এলে কাজ চালাই। স্বামী অবর্ত্তমানে বিধবা যে কতখানি অসহায় পুরুষের তুলনায়, তাও কারুর জান্‌তে বাকি নেই প্রমীলা। এ অনুরোধ আমায় করোনা প্রমীলা, এতে আমি বড় ব্যথা পাই।"

প্রকাশ বক্ষস্থল হইতে হাত তুলিয়া লইয়া প্রমীলার মুখে চামচে করিয়া বেদানার রস ঢালিয়া দিল।

"অন্ত একটি কথা রাখবে ?"

"ছি, কেঁদোনা। কি বল ?"

"তোমার সেই পিকলুট নিয়ে এসে বাজাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি অমত ক'রোনা। ছ'মাস হ'ল তুমি আর সে বাঁশী স্পর্শ করোনি, দিবারাত্র যে বাঁশী তোমার সঙ্গে থাকত; আমাকে শুনিয়ে যেন তোমার তৃপ্তি হ'ত না, আর আমার শুনেও আশা মিটত না। বাজাও, তোমার বাঁশীর সুর অনেকদিন শুনি নি। যতক্ষণ আমার শেষ নিশ্বাসটুকু অনন্ত বায়ুতে না মিশে যায় ততক্ষণ তোমার বাঁশী থামিও না। দাঁড়াও তোমার পায়ের ধূলা একটু মাথায় দিই, এরপর হাত যদি আমার কথা আর না শুনে।"

প্রমীলা স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

(২)

অমাবস্যা নিশি। চির শান্তিময় শ্মশান –যার সংস্পর্শে ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না, যেখানে জাতিভেদ রূপ তুলাদণ্ডের বিচার চলে না, যেখানে ধনী দরিদ্রের সমান অধিকার, সেখানে সকল বৈষম্যের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়, যার মধ্যে প্রবেশ করিলে সকল বন্ধন শিথিল হ'য়ে আসে সেইখানে সেই পবিত্র স্থানে মোক্ষকামীর সাধনার পীঠে প্রমীলার মৃতদেহ নীত হইল।

শেষ শয্যা সজ্জিত হইল। প্রকাশ তাহার স্ত্রীর চুড়ি ও হার খুলিয়া শ্মশানবাসিগণের মধ্যে বিলাইতে লাগিল। তাহারই সহযাত্রী তাহার স্ত্রীর শব বাহক প্রকাশের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া বলিল—"আপনি কি ক্ষেপে গেছেন প্রকাশবাবু ? একি করছেন ? আপনি কি লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে যাবেন মনস্থ করেছেন ? প্রথমটা একটু আঘাত লাগে বটে স্বীকার করি, কিন্তু দুদিনে আবার সব ঠিক হ'য়ে যায়। যা দিয়েছেন, তাত গেছেই ; আর দেবেন না। আবার বিয়েও করতে হবে, সংসারীও হ'তে হবে। সকল দিক ভেবে......।"

প্রকাশ তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল। কাল মেঘের বুকে ক্ষণপ্রভার মত তাহার মুখের উপর দিয়া একটু ক্ষীণ হাসি ভাসিয়া গেল। কত নারী আসিয়া প্রমীলার মস্তকে এয়োতির চিহ্ন দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল, বলিল—"বড় ভাগ্যবতী মা আমার, স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরা যে নারীর সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য গো।" অদৃষ্টের একি শুষ্ক পরিহাস !

যথা বিহিত মন্ত্র পাঠের পর প্রকাশ স্ত্রীর মুখাগ্নি করিল। ক্ষুধার্ত্ত অগ্নি উন্মত্ত পেটুকের মত শবাহার করিয়া বাতাসে ভর দিয়া আকাশে লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রঙ্গীন নিশানের মত গর্ব্বভরে উড়িতে লাগিল। প্রকাশ তাহার বাঁশীটি লইয়া সুরধুনী তটে বেদীর উপর গিয়া বসিল। তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল সেইদিকে যেখানে তাহার প্রিয়ার প্রিয় দেহটুকু পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছিল অগ্নির অমল পরশে। বাঁশীতে সুর উঠিল, বাঁশী বাজিল, বাঁশী আকুল হইয়া কাঁদিল। এযে তাহার স্ত্রীর শেষ অনুরোধ। প্রকাশ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিল। এখনও তাহার স্ত্রীর পাণ্ডুর মুখখানি চিরতরে মুছিয়া যায় নাই। প্রকাশের মনে হইল তাহার স্ত্রীর শেষ অনুরোধ উপেক্ষিত হয় নাই বলিয়া তাহার প্রেয়সী হাসিতেছে—ঐ যে মুখখানি হাসি হাসি, রক্তাভ, উজ্জ্বল, ঠোঁটদুটি মৃদু মন্দ কম্পিত হইতেছে। বাঁশীর করুণ মর্ম্মস্পর্শী সুর আকাশের বুকে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। অমানিশার গাঢ় জমাট অন্ধকার স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। প্রচণ্ড বাতাস ছুটিয়া আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। জাহ্নবীর জোয়ারের জল বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া কূলে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। আর শুনিল পুত্রহারা জননী সর্ব্বস্বহারা সদ্য বিধবা, জনক জননীহারা সন্তানগণ—যারা এসেছিল আজ শ্মশানে তাদের প্রাণহীন আত্মীয়দের শেষ কাজটুকু সারতে চোখের জল নিয়ে। তারা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াল প্রকাশের চারি পার্শ্বে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হ'য়ে। চোখের জল তাদের মিলিয়ে গেল, বুকের ব্যথা তাদের মুছে গেল, ভুলে গেল তারা আজ তাদের কি সম্পদ হারিয়েছে। বাঁশীর মোহন সুর তাদের অন্তরের মধ্য দিয়া ফিরিতে লাগিল।

(৩)

"না না এখানে আপনার আজ একা থাকা হবে না, রাত্রি এখনও অনেক রয়েছে। আর যদি নিতান্তই না যান তাহ'লে আমায় এখানে থাকতে অনুমতি করুন।"

"প্রয়োজন নেই ভাই। ভয়ও আমার তত নেই অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে, স্ত্রী তার স্বামীর যে ঘাড় মটকাবে না, এটা শপথ ক'রে বলা যেতে পারে। আপনি বাড়ী যান, এখানে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হবে। শ্মশানে আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে।"

"তাহ'লে যাবেনও না, থাকতেও দেবেন না। কি বলুন?"

"প্রয়োজন হ'বে না ভাই।"

"বড় অন্যায় কল্লেন প্রকাশবাবু। আপনার চাকর টাকর সব কোথায়?"

"তাদের এসেই বিদায় দিয়েছি।"

"বিদায় দিয়েছেন! এই রাত্রে!"

"তাদের পাওনা মিটিয়ে ছুটি দিয়েছি।"

"বেশ করেছেন। আপনার যা খুসী তাই করুন, আমি চল্লুম।"

"আসুন।"

প্রকাশের প্রতিবাসী একটু দুঃখিত হইয়া গৃহে ফিরিল। প্রকাশ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া যেখানে একটি বড় আয়না ছিল দেওয়ালে আঁটা সেখানে দাঁড়াইল যদি তাহার স্ত্রীর মুখখানি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাসিয়া উঠে। কতদিন তাহারা পাশাপাশি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, পরস্পরকে দেখিয়াছে, হাসিয়াছে, মজিয়াছে। কিন্তু আজ শুধু তাহারই শোক জর্জ্জরিত মুখখানি আয়নার বক্ষে ভাসিয়া উঠিল। চোখদুটি তাহার প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জল্ জল্ করিতে লাগিল। প্রকাশ চীৎকার করিয়া উঠিল—"প্রমীলা! প্রমীলা!" তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া গিয়া স্ত্রীর ফটোগ্রাফখানি পাড়িয়া নিমেষহারা হইয়া দেখিল, চুম্বন করিল, বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বক্ষের পেষণে চিত্রের কাচ চূর্ণ হইয়া ভূমিতলে পড়িল। চিত্রের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল—"প্রমীলা, লক্ষ্মীটি কথা কও, সাড়া দাও, তুমি যে এক ডাকে কাছে এসে উত্তর দিতে, তবে আজ কেন নীরব হ'লে। ওঃ তুমি যে আজ……।" প্রকাশ ক্ষিপ্রহস্তে তাহার পাশের ড্রয়ার খুলিয়া তাহার স্ত্রীর মাথা বাঁধিবার সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করিল, অন্বেষণ করিল, যদি তাহার বাঞ্ছিতের একগাছি কেশও চিরুণীতে লাগিয়া থাকে। তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া নিরাশ হইয়া সেগুলি দূরে হাত দিয়া ঠেলিয়া রাখিল। তারপর টলিতে টলিতে উঠিয়া বাক্স, প্যাটরা, আলমারী ও ড্রয়ার খুলিয়া তাহার অভীপ্সিতের সমস্ত দ্রব্যগুলি বারান্দায় টেবিলের উপর আনিয়া রাখিল। তাহারই পার্শ্বে একটি শয়ন কেদারায় শয়ন করিয়া তাহার বাঁশীতে ফু দিল। বাদকের বুকের ব্যথা বাঁশীর মধ্য দিয়া সুর লইয়া বাহির হইল। নিশীথ রাতের শীতল বাতাস সে সুর বুকে লইয়া দিগন্তে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাঁশীর ঝঙ্কার আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতে লাগিল—নেই—নেই—নেই।

* * * *

"প্রকাশবাবু!"

আগন্তুক ডাকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। পরীক্ষা করিয়া জানিল তাহার সম্মুখের মৃত মানবটী তাহার প্রাণবায়ুটুকু বাঁশীর মুখে ঢালিয়া দিয়া রিক্ত হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। গত নিশায় বাঁশীর করুণ মর্ম্মস্পর্শী রাগিনীটুকু তখনও তাহার কাণের পাশ দিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল—নেই—নেই—নেই।

নূতন রামায়ণ
বা
বাঙ্গালীর জীবন-নাট্য

[শ্রীসুধীরকুমার বসু বি, এস্‌-সি]

১

যদিও এটা কলিযুগ—
রাম সীতাও নাই,
তবু কিন্তু ভাবলে পরে
সবি মোরা পাই।

তাই আমি ভেবে ভেবে
এই করেছি মন,
বাল্মীকির মত একটা
লিখ্‌ব রামায়ণ।

লিখ্‌তে বসে পড়ল মনে
ওকি—হ'ল হায়!
রামের মত আদর্শ এ
কোথায় পাওয়া যায়।

সীতার মত কোথা বা পাই,
এমন কলিযুগে,
লিখ্‌তে বসা নয়ত সোজা
বিষম হুজুগে!

যা হোক অনেক ভেবে চিন্তে
দেখ্‌লাম মহাশয়,
বাঙ্গালীদের জীবন-বৃত্ত
রামায়ণ বই নই।

তাই আমি মহানন্দে
কল্লেম লেখা সুরু,
মনে হ'ল—শেষকালটায়
হবই কবিগুরু।

(তবে)—হাত এখন কাঁচা
ভাবও নাহি জোটে
মাঝে মাঝে সামঞ্জস্য
থাক্‌বে নাকো মোটে।

সেটুকু ত্রুটী নিবেন না কেউ
—এই নিবেদন,
সুরু তবে কল্লুম আমি—
লিখা রামায়ণ।

২

রাম প্রভৃতির জন্মগ্রহণ
যেম্‌নি মত হয়,
আমার লেখা রামায়ণে
তেমন কিন্তু নয়।

কলিযুগে ইচ্ছা যদি
কর্ত্তে পুত্রলাভ
কর্ত্তে কারো হয় না অত
যাগ-যজ্ঞ-ভাব।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আর
শত্রুঘ্নেরই মত
বাঙ্গালীর এক ঘরে এসে
জন্মে চারি সুত।

বাড়ে তারা দিনে দিনে
এম্‌নি বড় হয়,
আহ্লাদেতে খেয়ে দেয়ে
পিতৃ-গৃহে রয়।

ভাব্‌বেন না কেউ—এদের পিতা
　　দশরথের মত,
বাঙ্গালী কি না,—বড়লোক
　　নয়কো তাই অত।

তাই স্কুল আর কলেজেতেই
　　রইল বাঁধা সবে,
শিখ্‌ল অনেক খাসা ভাষা
　　"বি-এ, এম্‌-এ"র রবে।

ক্রমে হ'ল উপাধি লাভ
　　"বি-এ," আর "এম্‌-এ"
জীবনের আধেক শক্তি
　　পড়তে গেল ঘেমে।

তার পরেতে এল এদের
　　সময় বিয়ের তরে,
অনেক টাকা 'পণ' লয়ে বাপ
　　তাদের দিলে ছেড়ে।

এখান দিয়ে কিন্তু আমার
　　বঙ্গ-নায়কগণ,
ডিঙ্গিয়ে গেল অনেকখানি
　　পুরাণ রামায়ণ।

একটু ওদিক্ একটু সেদিক্
　　হবেই বটে ইহা
কারণ এটা কলিযুগ—
　　ত্রেতা নহে আহা !!

৩

ইহার কতকদিন পরে
　　পায় ফেলিয়ে মাথার ঘাম
সরকারের এক চাকরী নিয়ে
　　চলে গেলেন আমার "রাম"।

এইটায় হ'ল বনবাস—
　　প্রবাস বা কেউ বলে,
সরকারের আজ্ঞায় ইহা
　　—নয়কো কাহার ছলে।

(কারণ)—কৈকেয়ীর মত দুষ্টা নারী
　　আজকাল কেউ নাই
(আর)　দশরথ সম বোকা-ধার্ম্মিক
　　পিতাও নাহি পাই।

(তবে)　প্রবাস যাত্রা করাই হ'ল
　　বাঙ্গালীদের ধর্ম্ম,
স্ত্রী যদি চায়—তাকে
　　সঙ্গে নেওয়াই কর্ম্ম।

(তাই)　সঙ্গে নেওয়া নিজের সীতা
　　যদিও সবার অমতে,
লক্ষ্মণ ভাই না যাওয়ায়
　　"শালাবাবু"ই যান সাথে।

তবু যদি বলেন কেহ
　　এখনকার কালে,
"সীতার মত সতী নারী
　　আর কোথা মিলে !"

এরূপ বলা হবে না কো ন্যায়
　　—কারণ একটু নিলে খোঁজ,
দেখ্‌বেন অনেক বঙ্গনারী
　　স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছে রোজ।

আজকাল বটে সীতার একটু
　　বেশী প্রাদুর্ভাব,
বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে
　　সীতার মোটে নাই অভাব !

এম্নি করে সকল ছেলে
　　নারী, শালা নিয়ে
চলে গেল দূর প্রবাসে
　　মা বাপ ফেলিয়ে।

ভ্রাতৃস্নেহের কথা বাদ
ত্রেতা যুগ ত নাই,
আমার এ লেখার দিনে
"ভাই ভাই ভিন্ন ঠাঁই।"

একজন এদেশ একজন ওদেশ,
—এমনি ভাবেই ভিন্ন,
জীবনের প্রথমটাতেই
ভ্রাতৃ-বাঁধন ছিন্ন।

আর এখন সরকারের সুশাসন
রাবণ-বংশ-ধ্বংস,
(সীতার) হরণ-তারণ সংশোধন,
বাদ এই অংশ।

একটু ওদিক একটু সেদিক
হবেই বটে ইহা,
কারণ এটা কলিযুগ,—
ত্রেতা নহে আহা !!

৪

পিতামাতা ভিটেয় পড়ে'
রইল গৃহ-পর,
ছেলেরা সব ভুল্‌ল তাদের
নিলে না খরব।

আর কতদিন কোনরূপে
দীর্ণ তনু ধরে,
শেষকালটায় অনাহারে
ভিটেয় পচে মরে।

রামায়ণের দশরথ-রাজ
মরেন পুত্রশোকে,
বাঙ্গালীর মা বাপ মরে
পেটের জ্বালায়, রোগে।

এমনি করে বরষ কাটে
সবার যখন বয়স হয়,
তখন তারা প্রবাস ছেড়ে
বাড়ী এসে আড্‌ডা লয়

কেউবা তখন থাকে সুখে,
দুঃখে কেউ বা রয়,
পেন্সন বা মুষ্টি ভিক্ষার
মাঝে মরণ হয়।

একটু ওদিক্ একটু সেদিক
হবেই বটে ইহা,
কারণ এটা কলিযুগ—
ত্রেতা নহে আহা !!

বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে
এমনি রামায়ণ—
চলছে সদা ঘুরে ফিরে
বিশ্ব-বিমোহন।

ভাব্‌তে যেজন পারবে সেজন
বুঝ্‌তে পারবে এটা,
বুঝ্‌তে পারলে, ঘুচ্‌বে শেষে
বাঙ্গালীদের লেঠা ॥

—"কবি"—

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ

শিল্পী — শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　১৪ই কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩২ ।　　[৪৯শ সপ্তাহ

উপাসনা

উপাসনা (২) (পারস্য)

উপাসনা (৩) (পারস্য)

উপাসনা-(৪) (পারস্য)

কাঙ্গালের ঠাকুর

[শ্রীমতী সরোজিনী দেবী]

(১)

বঙ্গের হিন্দু সমাজ যখন একদিকে সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা, অস্পৃশ্যতা ও ভেদাভেদ জ্ঞানে জর্জ্জরিত, বাংলার ব্রাহ্মণেতর জাতির সমাজগুলি যখন স্মৃতি, তর্ক ও ন্যায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণের যথেচ্ছাচারিতায় প্রপীড়িত—"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" শূদ্রের আবার শিক্ষা কি, দীক্ষা কি? তাহাদের তো ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না। তাহারা ইতর, অস্পৃশ্য, অধঃপতিত, পদদলিত; উহাদিগকে মাথা তুলিতে দিলে সর্ব্বনাশ—এই ভাবটি যখন, তখনকার সমাজ-নেতা প্রবল পরাক্রমশালী ব্রাহ্মণদের হৃদয়ে সদা জাগরুক; ঠিক সেই সময়ে অন্যদিকে মোস্‌লেম্ ধর্ম্ম—প্রচারকগণ ঐ অনুদার কুসংস্কার ও অত্যাচারপূর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আসিবার জন্য মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছে, স্বাধীনতার প্রলোভন দেখাইতেছে—সে আজ কিঞ্চিতাধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এই অবস্থায় পতিত হইয়া সহায়হীন, দুর্ব্বল শূদ্রগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কোন্ কুল রাখে ভাবিয়া আকুল হইতেছে - অনেকে অনিচ্ছাতেও মোস্‌লেম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে, স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ, সমাজ-কঠোরতা তথাপি একটু মাত্রও শিথিল করিতেছেন না; একনিষ্ঠ ধর্ম্মভীরু হিন্দু ভীত হইয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে—সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের এতাদৃশ গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া কাঙ্গালের কাতরতায় ব্যাকুল হইয়া কাঙ্গালের ঠাকুর জন্ম লইলেন, ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান নবদ্বীপে; জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণের ঘরে! নিম্ন শ্রেণীর পতিতদের উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ, নাম হ'ল তাই নিমাই। ব্রাহ্মণের পুত্র, পাণ্ডিত্যেও সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিলেন। কিন্তু চমক ভাঙ্গিল শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীবাস অদ্বৈত্যের হরি সঙ্কীর্ত্তন শুনে। পাণ্ডিত্যের ব্রাহ্মণত্বের সব অভিমান তৎসঙ্গে প্রিয় সুহৃদের মান রক্ষার্থে স্বপ্রণীত ন্যায়ের পাণ্ডুলিপিখানি জাহ্নবীর জলে বিসর্জ্জন দিয়ে ছুটে এলেন কাতরের আকুল আহ্বানে সাড়া দিতে। তখন বাঁধ ভাঙ্গা জল-স্রোতের মত দেশের যত পতিত ও পদদলিত প্রেমিকের পদতলে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল, সে বাঁধ আর ব্রাহ্মণ সমাজ নিজ শক্তি দ্বারা রাজ শক্তির সাহায্য লইয়াও রক্ষা করিতে পারিলেন না। নির্জ্জীব অচেতন প্রায় ঐ অস্পৃশ্য জাতি, চেতনা পাইল শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপালু করস্পর্শে। বিদ্রোহীর দল তখন শেষ চেষ্টা করিল জগাই মাধাই দস্যুদ্বয়কে মহাপ্রভুর প্রাণ বধার্থে নিয়োজিত করিয়া; দস্যুদ্বয় শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিল, রক্তাক্ত করিল। প্রেমিকের কিন্তু ক্ষোভ নাই রোষ নাই; ছুটিলেন পাপীকে পাপ মুক্ত করিতে; অপ্রেমিককে প্রেম দিতে, কোলে ল'য়ে কহিলেন,—

> "মেরেছো কলসীর কাণা,
> তা ব'লে কি প্রেম দিব না?"

তিনি যে কাঙ্গালের ঠাকুর।

(২)

তাহার পর শতাব্দের পর শতাব্দী কালের গর্ভে বিলীন হইল। প্রথমে অভাগিনী বঙ্গমাতা ক্রমে জননী ভারতবর্ষ শ্বেতাঙ্গ বণিকের করে আত্মসমর্পণ করিলেন, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গমাতা ধীরে ধীরে ঘরের সামগ্রী সব পরকে দিয়া পরমুখাপেক্ষিণী হইতে লাগিলেন। হিন্দু সমাজে তখন আর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, নমঃশূদ্রের খোঁজ খবর রাখারাখি ততটা সজোর থাকিল না। সুদূর সাগর পার হইতে সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তখন তাঁহাদের দ্বীপের "দিল্লীকা লাড্‌ডু" নূতন আমদানী করিয়াছেন—সে লাড্‌ডু তখন মন্থিত-সাগর লব্ধ অমৃতের মত বঙ্গের তথা কথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আয়াস লভ্য ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাই ইংরাজি ভাষার বর্ণাক্ষরগুলি উদরস্থাৎ করিয়াই তৎপ্রাপ্তির আশায় দেবতা

দানব সকলেই ছুটাছুটি করিতেছেন। অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া, ওদিকে মিশনারীদের অবাধ প্রবেশ সর্ব্বনাশের মূল ভাবিয়া মহাত্মা রামমোহন রায় তখন গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন,—দিল্লী, ইংলণ্ডে নাই, ভারতেই আছে ; আমিই "লাড্ডু"এনেছি তোমরা খাও ; তখন জনস্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইতে লাগিল ; এদিকে বাহিরের শাস্তি শাসনের সুনিয়মে যত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, খাদ্যাভাব তত উদরের অশান্তি ঘনাইয়া তুলিল। বিলাসের পণ্য তখন আর সহরের সীমাতেই আবদ্ধ থাকিল না—সুদূর পল্লীর প্রাণও চঞ্চল করিয়া তুলিল। রেলবর্ত্মের কল্যাণে পল্লী সহর পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইল ; জলনিকাশ অপরিসর হওয়ায় জরাসুরও পল্লীর বুকে ত্রিশূল গাড়িল। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। দুঃস্থ, দরিদ্র, পতিত, মধ্যবিত্ত তখন সব দিকেই অন্ধকার দেখিতে লাগিল ; ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের পূর্ণাভিনয়, অন্নের অভাব, দেহের অসুস্থতা, মনের অশান্তি অভাগাদিগকে পাগল করিয়া তুলিল ; ঠিক সেই সময়ে ছয় টাকা বেতনের রাণী রাসমণির পূজারী ব্রাহ্মণ পাগল হইয়া দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন, "আয় আয়, আয়রে তোরা আয়"। ক্রমে আসিল, আসিতে লাগিল তথাপি পাগল ডাকেন "আয় আয়" অকস্মাৎ একদিন নব্য ভব্য নব্য শিক্ষিত একটি যুবক এলেন, নাম বলিলেন "নরেন্দ্র", পাগল যেন হারানিধি হাতে পাইলেন।

অজ্ঞাত কুলশীল সুরুচি সম্পন্ন যুবককে বহু পরিচিতের মত আলিঙ্গনে বিস্মিত ও বিরক্ত করিয়া ফেলিলেন, যুবক তখন কাঙ্গালের ঠাকুরকে কিরূপে চিনিবেন বরং পাগলের মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয়ই পাইলেন। পাগলের পূর্ণ পরিচয় তিনি পাইলেন, পাগলের মহাপ্রয়াণের কিছুকাল পরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বাংলার কোমল মাটীর তৈয়ারী মূর্ত্তি দরিদ্র ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বী গৈরীক-বসন-ধারী নবীন সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। যেদিন পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বোন্নত ক্ষেত্র আমেরিকার সেই চিকাগো "ধর্ম্ম মহাসভায়" দাঁড়াইয়া বিদেশীয় ভাষায় বেদান্তের গূঢ় রহস্য উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া সারা জগতের ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে মোহিত, বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইলেন সেদিন তিনি বুঝিলেন পাগল কে, আর তিনি কে? নতুবা সেই অসীম সাহসিকতা অবলম্বন করার অব্যবহিত পরেই তাঁহার অতি বিশাল বক্ষও কম্পিত হইয়াছিল। যে জাতি—যে ধর্ম্মীদের সমক্ষে তিনি সেই সৃষ্টির পর সর্ব্বপ্রথম দিন হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, আর্য্য ধর্ম্মের যে একটা সুভিত্তি আছে তাহা তখন তাঁহাদের নিকট একেবারে অজানা ছিল, তাই ভয় যদি ঐ জড়বাদীদের নিকট তিনি উপহাস্য হ'ন, সনাতন ধর্ম্মের এ অবমাননা যে তাঁহার দ্বারাই প্রাপ্তি হবে।

(৩)

তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা লক্ষগুণে প্রিয় ধর্ম্মকে যখন বিজয় মাল্যে ভূষিত করিয়া সভামণ্ডপ ত্যাগ করিলেন তখনই তাঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল বাংলার এই কাঙালদের জন্য,—পাশ্চাত্যের সে ঐশ্বর্য্য তাঁর আর ভাল লাগিল না—বলিয়া উঠিলেন "ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের—সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি—তাহাদের কোন উপায় নাই—পলাইবার কোন রাস্তা নাই – উঠিবার কোন উপায় নাই—রাক্ষস বা নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে। তাহারা জানে না কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারা যে মানুষ তাও ভুলিয়া গিয়াছে, ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। "আমেরিকায় যে কেহ জন্মিয়াছে সে জানে আমি একজন মানুষ—আর ভারতের যে কেহ জন্মায় সে জানে একজন ক্রীতদাস মাত্র। আমেরিকার সকলের আশা আছে ভরসা আছে, আজ গরীব কাল ধনী হইবে, বিদ্বান হইবে, জগৎমান্য হইবে, আর ওই যে আমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ আছেন তাঁরা এই অধঃপতিত, দরিদ্র পদদলিত, গরীবদের জন্য কি করিতেছেন—শুধু বলছেন "ছুঁও না, আমায় ছুঁও না।" এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি ক'রে ফেলেছি ভারতের অতি নীচ জাতি মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর স্বামিজীর রক্ত ছিল, তাঁহার ভাই ছিল। তাই তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া উচ্চ সমাজকে অভিশাপ দিচ্ছেন—"তোরা হা চাকরী, হা চাকরী ক'রে লোপ পেয়ে যাবি।" ধর্ম্ম মহাসভায় খৃষ্টধর্ম্ম - প্রচারাভিলাষীদিগকে বলেছেন,

"ভারতবাসী—ভাতের—একমুষ্টি অন্নের কাঙাল, ধর্ম্মের কাঙাল নয়—" কাঙ্গালের ঠাকুর তাই, আমেরিকা তাঁর ভাল লাগিল না—মাতৃভূমিতে ছুটিয়া আসিয়া বজ্রনির্ঘোষে সুষুপ্ত ভ্রাতা ভগ্নিকে—মুমূর্ষু নিরন্ন দেশবাসীকে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—প্রাপ্য বরাণ নিবোধত" মন্ত্রে জাগাইয়া তুলিলেন। ঐ মন্ত্রের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া সারা ভারত ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার বিবেকানন্দ তখন সারা ভারতের—ভারতের বাহিরের হইলেন। অন্নের কাঙ্গাল, ধর্ম্মের কাঙ্গাল সকলেই তাঁহার নিকট হাত পাতিল! ধর্ম্মের প্রয়াসীকে বলিলেন--"বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন—সেইজন সেবিছে ঈশ্বর সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ভগবান সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা।" ক্ষুধাতুরকে বলিলেন, "যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে না—সে জাতের আবার বড়াই! ধর্ম্ম কর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হ" "অন্ন, অন্ন" যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে—অনন্ত সুখে রাখিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।" স্বামিজীর চেষ্টায় তখন "রামকৃষ্ণ মিশন" স্থাপিত হইল। দরিদ্র নারায়ণের সেবা প্রতিষ্ঠা হইল, তিনি কিন্তু কি জানি কেন বেশীদিন এ মরজগতে থাকিতে চাহিলেন না। স্বেচ্ছায় শেষ সমাধি গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রাণের হঠাৎ অন্তর্ধানে দেশের বুকে আবার হাহাকার উঠিল—অর্দ্ধ জাগ্রত দেশে আবার যেন অবসাদ আসিল। তবে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালের দুঃখ বিমোচনার্থে মিশনের প্রতিষ্ঠা যাহা করিয়া গেলেন তাহার প্রসার ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, লঙ্কায়, সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিল। ভারতের মধ্যে যে ভাবে যে দুঃখ, যে কষ্টই উপস্থিত হউক না কেন মিশন তাহার দূরীকরণে যেন সদাই প্রস্তুত রহিয়াছে।

বিবেকানন্দের বিবেকবাণী আপামর সাধারণ ঠিক গ্রহণ করিতে না পারিলেও নব্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নৈতিক চরিত্র অনেক উন্নত করিয়া দিয়াছিল—বঙ্গের সুধী-ক্ষেত্রে উর্ব্বরতা আনিয়াছিল।

(৪)

বিবেকানন্দের তিরোধানের পর বেশীদিন গত হয় নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই জীবন সংগ্রামে অবসন্ন বাঙ্গালী হঠাৎ শুনিতে পাইল তাহাদের জননীর অঙ্গচ্ছেদ হইবে; এ কি নিদারুণ নির্ম্মম ব্যবস্থা! অভাগিনীর সর্ব্বস্ব লইয়াও তুষ্টি নাই আবার অঙ্গচ্ছেদ—কলিকাতাতেই তখনও রাজধানী—এ সংবাদ প্রথম প্রচারিত কলিকাতায় হইতে না হইতেই মাতার প্রবীণ ধীর বিজ্ঞ সন্তানেরা রাজ দুয়ারে আপত্তি জানাইল, প্রার্থনা করিল, মাথা কুটিল শুনিল তাহা সেট্‌ল্‌ড্‌ ফ্যাক্ট্‌ অর্থাৎ বিধির কলম আর রদ হইতে পারে না। তখন প্রবীণ নবীন সকলেরই চিন্তা, ভাবনা, যুক্তি কিং কর্ত্তব্যম্‌? ভারত গৌরব দাদা ভাই নৌরজী ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হইয়া প্রথমে স্বরাজের দাবী করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশী ও বয়কট প্রথা বাংলায় আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রাচীন ও নবীন দলে মতবিরোধ ঘটিল—প্রাচীন পন্থী চাইলেন ধীরে চলিতে নবীনগণ তন্ত্রবাদীরা বিবেকানন্দের অমৃত পান করিয়া চাহিল দ্রুত চলিতে। এরূপ অবস্থায় যাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে ঘটিতে লাগিল—অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যও সুসম্পন্ন হইল। নবীন দলেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; মাতৃবক্ষে রক্তধারা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা, নহিতো মেষ—তরুণদল তখন শুধুই জাগে নাই,—উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজার আইন তাহাদিগকে বসাইবার পরে শোয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন, তাহারা টলিল না। ইতিহাস যে বাঙ্গালীকে কাপুরুষ ভীরু বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছে সেই বাঙ্গালীর সুকুমার বালকগণও কামানের মুখে বুক পাতিয়া বলিল, প্রাণ নাও। একি অপ্রত্যাশিত জাগরণ, জাগরণের সাড়া তখন সুদূর মহারাষ্ট্রে পাঞ্জাবে পৌছিল—সকলেই চমৎকৃত আনন্দাপ্লুত হইলেন, বাহু প্রসারিত করিলেন। রাজার আইনও কঠোরতার চরম সীমায় উপনীত হইল।

এই সঙ্কটক্ষণে সুকুমার শিশু নবীনের দল যখন দণ্ডবিধির যুপকাষ্ঠে আবদ্ধ ঠিক সেই সময়ে নামজাদা নেতাদের কি জানি কেন হঠাৎ আচমকা বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিল তাঁহারা একে একে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। কেহ বা সুর বদলাইয়া ফেলিলেন; হায় হায় অভাগাদের ভাগ্যে একি ঘটিল! তাহারা যে বন্দী সারা বাংলা শঙ্কিত ব্যাকুল কে রক্ষা করে।

যখন একে একে নিরপরাধী যুবকগণ যুপকাষ্ঠের বন্ধন মুক্ত হইতে লাগিল তখন দেশ কাঙ্গালের ঠাকুরের পুনরাবির্ভাব অনুমান করিল। তাঁহার স্বর চিনিল ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গলার প্রাদেশিক কনফারেন্সের অভিভাষণে আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি—সেই আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার ক'রে থাকি—আমরা কয়জন?......আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই—আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি ময়মনসিংহে ঐ খৃষ্টাব্দের একটি বক্তৃতায়—"দেশের কায আমার ধর্ম্মের অঙ্গ আমার জীবনের আদর্শ, দেশ ও জাতির সেবা মানুষের সেবা। মানুষের সেবাই ভগবানের আরাধনা" আবার শুনিল সেই ধ্যান "উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরাণ নিবোধত"—সারাবঙ্গে আনন্দের সাড়া পড়িল। তাঁহার ডাক ঐ যে বাঙ্গলার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গলার মাঠে মাঠে আপনার কায ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবাবসানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাঙ্গলার কুটীরে কুটীরে বাঙ্গলার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক শূদ্র হউক চণ্ডাল হউক উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাত নারায়ণ। ডাক, ডাক, সবাইকে ডাকো। প্রাণের ডাক শুনিলে কি কেহ না আসিয়া থাকিতে পারে? তাঁহার এ ডাক ব্যর্থ হয় নাই। দরিদ্রের বন্ধু, দেশের বন্ধু কাঙ্গালের ঠাকুরকে সকলেই সাড়া দিল। তাহাদের ঠাকুরকে প্রথম চিনিল চাঁদপুরে শ্রমিক বিভ্রাটের সময়ে তরঙ্গ ভঙ্গি ভীষণ পদ্মায় সামান্য ভেলার উপরে যখন হাঁসিমুখে পাড়ি দিতে ছিলেন। তাঁহার স্বরূপ দেখিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনের পর দধিচি শিবির দেহদানের মত দাতাকর্ণ—হরিশ্চন্দ্রের মত যে দিন যথা সর্ব্বস্ব তিনি দেশের জন্য ত্যাগ করিয়া কৌপীন ধারী হইলেন সেদিন। আর দেশবাসী থাকিতে পারিল না কাঙ্গালের ঠাকুরকে আনন্দাশ্রুপ্লুত নয়নে শ্রদ্ধা গদগদকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল—

"তুমি বড়ছিলে তাত জানি
কিন্তু এত বড়, এতখানি!
আগে কে জানিত এত বড় তব প্রাণ?
হে সাধক, হে মহান, হে মহীয়ান।"

ঠাকুরের এ লীলায় তাহারা দেশবন্ধু নাম ঘোষণা করিল। তার পরের এ কয়টি বৎসর দেশ ও দেশবন্ধু এক হইয়া একটি বিরাট দেহের বিকাশ হইল।

যে দেহের অমানুষিক শক্তিতে শুধু বাংলা নয়, ভারত নয়, পৃথিবীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঠাকুরের স্বরূপ প্রকাশ পাইল, রাজশক্তি প্রতি পদে পদে পরাজয় স্বীকার করিলেন, জগত স্তম্ভিত ও পুলকিত হইল।

তারপর? তারপর ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন হিমালয়ের সিদ্ধবেদীর সন্ধান পাইয়া ঠাকুর আমাদের সেই স্থানে শেষ সমাধি লাভ করিলেন।

মহাপ্রলয়ের এ সংবাদ যখন বঙ্গবাসী শুনিল তাহাদের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় দেবতারাও অশ্রু ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শেষলীলা তাঁর কেওড়াতলার শ্মশানে; চিতামাঝে তাঁহার পরিত্যক্ত দেহপার্শ্বে যুগাবতার স্বয়ং! আর কি বলিব! হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান্, সাধু, অসাধু—সংযমী, ব্যভিচারী, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের মহাসম্মিলন, সে সম্মিলন যে দেখিয়াছে সে পাগল হইয়াছে। ইতিহাস ঐ সম্মিলনের অমর গাথা বক্ষে ধরিয়া অমর হইয়া থাকিবে।

আর কি লিখিব লেখার আদি নাই—সীমা নাই—আমার কি সাধ্য—ঠাকুরের কথা লিখি। শুধু ভক্তি-প্রীতি চিত্তে এইটুকু জিজ্ঞাসা করি—ঠাকুর আবার কবে আসিবেন?

মধুসূদনের সাহিত্য জীবন

[শ্রীসুধীরচন্দ্র ভাদুড়ী]

মধুসূদনের সাহিত্য জীবনের মূলে তাহার জননী জাহ্নবী দাসী। তিনি অশেষ গুণশালিনী মহিলা ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্য সমূহে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। মধুসূদন শৈশবেই জননীর নিকট অনেক বাঙ্গালা কাব্যের রসাস্বাদন করেন। প্রথমে গ্রাম্য পাঠসালায় অধ্যয়ণ কালে তাহার কবি প্রতিভা সামান্য বিকাশ লাভ করে।

তৎপরে হিন্দু কলেজে থাকিতে তিনি অনেক সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালিক সম্পাদকেরা অতি সমাদরে তাঁহার কবিতা নিজ নিজ পত্রে প্রকাশিত করেন।

কলেজ ত্যাগের পরও মধুসূদনও প্রথমতঃ বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পান নাই। তৎপরে পাইকপাড়ার রাজারা এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক প্রণয়ণ করেন। উহা মহা সমারোহে রাজাদিগের বেলগেছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। শর্ম্মিষ্ঠা রচনার পর হইতেই মধুসূদনের বঙ্গ-ভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইল। অতঃপর তিনি মাতৃভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শর্ম্মিষ্ঠা নাটক ব্যতীত, পদ্মাবতী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, মেঘনাদ বধ কাব্য, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি ব'লে সভ্যতা, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য প্রভৃতি প্রণয়ণ ও প্রকাশিত করেন। এই সময়ে তাঁহার কবি-কীর্ত্তি ও যশোরশ্মি দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সকলে তাঁহাকে তৎকালীন কবিকুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির সিংহাসন প্রদান করেন। বাস্তবিক মাত্র তিন বৎসরের ভিতরে মাতৃভাষার এরূপ গঠন ও পরিবর্ত্তন সাধন অপর কোন জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না। সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষার মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত করেন। একমাত্র ব্রজাঙ্গনা ব্যতীত তাহার সমুদয় কাব্যই ঐ ছন্দে রচিত হইয়াছে। কাব্যের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য রক্ষণোপযোগী অন্য কোন ছন্দই অমিত্রাক্ষরের তুল্য নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্যিকের প্রথম সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন মধুসূদন। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার নিমিত্ত, তাঁহার জোড়াসাকোস্থ ভবনের বিশাল প্রাঙ্গনে এক মহা সভার অনুষ্ঠান করেন। ইহাই বঙ্গীয় সাহিত্যিকের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য সম্বর্দ্ধনা।

মধুসূদন ইংলণ্ড গমন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার 'বঙ্গভূমির প্রতি' নামক অমর কবিতায় 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে,' ইত্যাদি বাক্যে দেশ মাতৃকার নিকট সাশ্রুলোচনে বিদায় গ্রহণ করেন।

তিনি ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ ভারসেলস্ (Virsailles) নগরে অবস্থান কালে ইয়োরোপীয় মহাকবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কার (Francisco Petrach) আদর্শে ও অনুকরণে 'চতুর্দ্দশ পদাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন। সনেট তিনি প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

ফ্রান্সের পারীয়া নগরীতে অবস্থান কালে মধুসূদন অর্থাভাবে এতদূর নিপীড়িত হইয়াছিলেন যে, কোন প্রকারে শিশুদ্বয়ের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই উপবাস করিতেন। তাঁহার প্রতিবেশীগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া শিশু দুইটীর জন্য মিষ্টান্ন, দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে এবং মধুসূদনের জন্য যথেষ্ট আহার্য্য তাঁহার অলক্ষ্যে তাঁহার গৃহে রাখিয়া আসিতেন। কে কোন্ সময় তাঁহার অলক্ষ্যে আহার্য্য প্রদান করেন, তাহা মধুসূদন প্রথমে অবগত হইতে পারেন নাই; পরে ফরাসী জাতির মহান্ হৃদয় ও অযাচিত করুণায়

বিগলিত হইয়া তিনি 'সাংসারিক জ্ঞান' নামক কবিতায় লিখিয়াছিলেন –

"কি কাজ বাজায়ে বীণা কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে মন কাব্যের গগনে
মেঘরূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?
সংসার সাগর জলে, স্নেহ করি মনে,
কোন জন ! দেবে অন্ন অর্দ্ধমাত্র খেয়ে
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে !"

সুদূর ইউরোপে থাকিয়াও তিনি তাঁহার স্বদেশ প্রান্ত বাহিনী কপোতাক্ষ নদকে বিস্মৃত হইতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন—

সতত হে নদ তুমি পড় মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া যন্ত্রধ্বনি তব কলকলে
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে।
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মেটে কাল জলে
দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।

মধুসূদন ফ্রান্সে অবস্থান কালে, ইতালীর কবিগুরু দান্তের ত্রিংশত বাৎসরিক মহোৎসব সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষ্যে বহু কবি কবিতা রচনা করিয়া উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন— মধুসূদন তন্মধ্যে অন্যতম। ইতালী রাজ ভিক্টর ইমানি এল তাঁহার কবিতা পাঠে প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন."আপনার কবিতা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিতবর থিয়োডোর গোল্ডষ্টুকার (Dr. Theodore Gold stuker) মধুসূদনকে লণ্ডন ইউনিভারসিটীর বঙ্গভাষার অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

ব্যারীষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধুসূদন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হ'ন। কিন্তু ব্যবহার শাস্ত্রে তাহার অসাধারণ দক্ষতা থাকিলে কাব্যানুরাগ ও অমিত তেজস্বীতা প্রভৃতি তাঁহার ব্যবসায়ের অন্তরায় হইয়াছিল। অতঃপর তিনি প্রিভি কাউন্সিলের কাগজপত্রের অনুবাদ পরীক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন। তিনি বঙ্গ রঙ্গভূমির জন্য মায়াকানন নাটক, হেক্টর বধ নামক একখানি গদ্যকাব্য ও কতকগুলি নীতিমূলক কবিতামালা রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক অপ্রকাশিত কবিতা আছে।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও দেশবাসীর যত্নে সারকুলার রোডের গোরস্থানে তাঁহার সমাধির উপর শ্বেত মর্ম্মর রচিত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়া উহাতে তাঁহারই স্মৃতি-লিপি উৎকীর্ণ ;—

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন ;
যশোরে সাগর দাড়ী কপোতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে জননী জাহ্নবী।"

সাহিত্যের এই তীর্থক্ষেত্রে এক্ষণে প্রতি বৎসর বহু লোক তাঁহার স্মৃতি পূজা করিতে সমবেত হ'ন।

মাইকেলই রীতিমত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক। শুধু তাহাই নহে, তিনি একাধারে বঙ্গভাষায় মহাকবি—ভাব ও কবিত্বপূর্ণ মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ; সনেট প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে তিনিই বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রকৃত প্রহসনের তিনিই প্রথম রচয়িতা। গীতি কাব্যেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। ধরিতে গেলে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তিনিই ঐশী প্রতিভা বলে প্রাচ্য প্রতিচ্যকে সুরচিত কবিতা গ্রন্থি দ্বারা সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে তিনি বঙ্গ ভাষায় যে যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বৃথা লিখেন নাই—"কাল প্রসন্ন,—ইয়োরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও,—তাহাতে নাম লিখ শ্রীমধুসূদন।

ঊষার আলো

[শ্রীমঞ্জরী দেবী]

(১)

অবনীন্দ্র একজন খ্যাত-নামা ব্যারিষ্টার। বিপুল বিভবের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট মান, যশ অর্জ্জন করেছিলেন। হিরণ তাঁর একমাত্র পুত্র। পিতার কাছে সে সুখ তৃপ্তি সবই পেয়েছিল, পায় নি শুধু তার মা'কে। হিরণ যেদিন পৃথিবীতে এল, সেইদিন তার মা স্নেহ মায়ার বন্ধন কাটিয়ে কোন্ অজানা লোকে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু পিতার স্নেহ ধারায় সে একদিনের তরেও মায়ের অভাব বুঝতে পারে নি।

শৈশবের দিন ক'টা হাসি-খেলার মধ্যে দিয়ে কেটে যাবার পর, সহসা একদিন তার সবুজ বুকে প্রথম যৌবনের শিহরণ লাগ্‌ল—বসন্ত সমীর স্পর্শে পুষ্প-কুঞ্জে যেমন শিহরণ লাগে। হিরণ যেদিন আই, এস্‌-সি পরীক্ষা দিলে, সেদিন অবনীন্দ্র বাবুর কাছে ঘটকেরা এসে ধর্ণা দিয়ে পড়ল। কিন্তু হিরণ তার চিত্তপটে কল্পনার রঙিন্ তুলি দিয়ে যে মানস প্রতিমা খানি এঁকেছিল, সে মনের নিভৃত মন্দিরে সেই মানসীর প্রেমারতি করত।

তারপর শরতের এক আলোকোজ্জ্বল সন্ধ্যায় সে চল্‌ল তার চির-বন্দিতা মানসীকে বরণ করে আনতে। কিন্তু শুভ-দৃষ্টির সময় তার কল্পনার সৌধ গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেল। হিরণ দেখলে—এতো তার কল্প লোকের বাঞ্ছিতা নয়— হায় রে এ যে রূপহীনা!

তার ক্ষুব্ধ অন্তর থেকে একটা গুপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বাসর রাতের আনন্দ উৎসব তার অসহ্য লাগছিল।

এমনি করেই তার পরিণীত জীবনের আরম্ভ হোল—

হিরণের পরিণীতা স্ত্রী মাধুরীর রঙ ছিল, সাধারণতঃ আমরা যাকে বলি কালো। কিন্তু তার নিটোল অঙ্গ এমন একটী স্নিগ্ধ শ্যাম-শ্রীতে মণ্ডিত ছিল, যা সচরাচর চোখে পড়ে না। আর তার হৃদয়টী ছিল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, রজনীগন্ধার মত শুচি-শুভ্র। কিন্তু বাইরের রূপটাই হিরণের চোখ দুটোকে মোহান্ধ করে তুলেছিল, তাই মাধুরীর গোপন অন্তরের পরিচয় সে পেলে না। বুকের মাঝে অতৃপ্তির জ্বালা নিয়ে হিরণ দিন কাটাতে লাগল। মাধুরী যে কালো, সেটা যেন তার একটা অপরাধ। তারপর মাধুরী ছিল স্বল্প-শিক্ষিতা, সলজ্জা কিশোরী; তাই হিরণ তাকে উপেক্ষার চোখে দেখতে লাগল। মাধুরীর সঙ্গ তার অসহ্য ঠেকত। কিন্তু সে জানত না যে মাধুরী কুণ্ঠিতা পূজারিণীর মত প্রেমের প্রসূন দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে তারই দুয়ারে প্রতীক্ষা করছে।

সেদিন হিরণ তার বন্ধু বিজয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিল। দীপালোক শোভিত সভায় যখন আচার্য্য বিজয়ের হাতের সঙ্গে কনের চাঁপার কলির মত সুগোল হাতখানি ফুলের মালার ডোরে বেঁধে দিচ্ছিলেন, সে আর দেখতে পারলে না।

বন্ধুর সৌভাগ্যের কাছে নিজের ভাগ্যটা একটা কঠিন বিদ্রূপের মতই বোধ হ'ল।

(২)

সহরের পথে রূপটাকে পণ্যের মত সাজিয়ে যারা দেহের বেসাতি করে, তাদেরই দ্বারে দ্বারে শেষে হিরণ ঘুরতে সুরু করলে তার রূপের তৃষা মেটাবার আশায়।

একদিন সে একটা জঘন্য পাড়ায় ঘুরছে, ঘুঙুর আর তবলার শব্দে, মাতালদের অট্টহাসিতে ছোট পল্লীটা গুলজার হয়ে উঠেছে, সহসা একটা বাড়ীর বারান্দার উপর থেকে একটী যুবতীর ইঙ্গিতে সে মোহাবিষ্টের মত তার ঘরে ঢুকে পড়ল। যুবতীর নাম হেনা। আগুনের শিখার মত তার রূপ মুগ্ধ করে না, মত্ত করে। হেনার রূপে হিরণ ফোটা ফুলের ধারে লুব্ধ ভ্রমরের মত মাতাল হয়ে পড়ল। সে ভাবত, ওই ভুবনমোহিনী হাসিটুকুর জন্য সে সব দিতে পারে।

তার বিয়ের আট মাস পরেই অবনীন্দ্রবাবু স্বাস্থ্যহীনতার দরুণ ইহলোকের ওপরে চলে গিয়েছিলেন। একমাত্র ছেলের এই অধঃপতন দেখে তিনি প্রাণে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন; তাই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি মাধুরীকে বলে গিয়ে-

ছিলেন—মা, তোর এই ফুলের মত জীবনটা যে অকালে নষ্ট হয়ে গেল—সে জন্ত আমিই দায়ী, কিন্তু একদিন হিরণ্ তোর অন্তরের আসল রূপটী চিনবেই চিনবে —”

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর সেই অগাধ সম্পত্তি হিরণ তার বিলাস লালসার পরিতৃপ্তির জন্ত স্রোতের মত ব্যয় করতে লাগল। রাতের পর রাত ধরে তার এই কদর্য্য প্রেমের অভিনয় চলত, আর ওদিকে অভাগিনী মাধুরী বিনিদ্র চোখে ব্যর্থ নিশি জাগত।

সেদিন সন্ধ্যায় হিরণ বেশভূষা শেষ করে মাধুরীর কাছে গিয়ে ক্যাশবাক্সের চাবি চাইল। মাধুরী জিজ্ঞাসা করল— কেন কোথায় যাচ্ছ ?”

হিরণ রূঢ়ভাবে জবাব দিল—“সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে রাজী নই।”

মাধুরীর মুখখানি ঝরা ফুলের মত ম্লান হয়ে গেল। সে বল্ল—“তোমার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি বল তো ? কেন আমায় এম্‌নি করে বেদনা দিচ্ছ ? বাবা যাবার বেলায় তাঁর এই চাবি আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন—এমনি করে তা' নষ্ট করো না—”

মুহূর্ত্তে হিরনের মেজাজ বারুদের মত জলে উঠল। “কি তোমার হুকুম না কি—চাবি দেবে কি না বল—অত বক্তৃতা শুনতে চাই না—” বলতে বলতে মাধুরীকে সজোরে এক ধাক্কা মেরে, আঁচল থেকে চাবি নিয়ে সে চলে গেল।

একটা অস্ফুট কাতরোক্তি মাধুরীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল—“মাগো…”

(৩)

হেনার ঘরে হিরণ যখন ঢুকল, তখন সুরার গোলাপী নেশায় সে মস্‌গুল। জড়িতস্বরে—“কিগো পিয়ারী—” বলতে বলতে দরজার সামনে আসতেই যে দৃশুটা তার চোখে পড়ল, তাতে নিমেষের মধ্যে তার নেশা ছুটে গেল। অদূরে পালঙ্কের উপর একজন অপরিচিত মাতাল মদের গেলাস হাতে বসে রয়েছে, আর তারই কণ্ঠ আলিঙ্গন করে আছে তারই হেনা! উঃ হেনার মুখে রঙের প্রলেপ ভেদ করে কি হীন ছলনার ছায়া ফুটে বেরুচ্ছে!

হিরণ আজ বুঝতে পারল—কেমন করে বিলাসের মোহে সে নরকের পথে এগিয়ে এসেছে, দেহ তার কুৎসিৎ ব্যাধিতে জর্জ্জরিত। মাধুরী—দেবী সে—তাকে ফেলে সে স্বেচ্ছায় একটা গণিকার কাছে আত্মদান করেছিল। প্রতিদানে পেয়েছে শুধু—প্রতারণা!

লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে মনটা তার সঙ্কুচিত হয়ে গেল। পাগলের মত টল্‌তে টল্‌তে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

* * * *

হিরণের মাথাটী কোলে নিয়ে মাধুরী স্তব্ধভাবে বসেছিল। আস্তে আস্তে চোখ মেলে হিরণ বল্‌লে—“এখনও বসে আছ মাধুরী ?” তারপর ব্যথা-কাতর স্বরে বলতে লাগল— এতদিন অন্ধ ছিলাম, আজ তোমায় চিনেছি! আর আমি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করি না—আমার গর্ব্ব টুটে গেছে, শুধু তোমার একটু সহানুভূতি চাইছি, দিতে পারবে কি মাধুরী - ঘৃণা আসবে না আমার উপর ?”

মাধুরীর চোখের জল আর বারণ মানল না ; দুটী শুভ্র অশ্রুর ধারা তার দুটী গাল বেয়ে নেমে এল। তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে সে বলে উঠল—“ছি, অমন কথা বোলো না—ওতে আমার পাপ হবে!”

ভোরের আকাশে তখন রক্তপদ্মের মত উষার অরুণ আলো ফুটে উঠছে—এই দুটী নবীন জীবনের শুভ সূচনা স্বরূপ।

নাটকের কথা *

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

নাটকের উৎপত্তি

আমাদের দেশে নাট্যাভিনয় কতদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে এখন সে বিষয়ের কথা বলিতেছি। আমরা নাটকের কথা প্রথমতঃ পৌরাণিক যুগে নাটকের উৎপত্তি প্রাপ্ত হই। সে সময়ের বিরচিত কয়েকখানি নাটক, অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহাদের আলোচনা এবং কয়েক খানা সংস্কৃত নাটক হইতেই তাহার ইতিহাস পাই। কিন্তু পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে আমাদের দেশে কোন নাটক এবং নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল কি না এখন তাহার আলোচনা করা যাক্। আমরা মহাভারতের সভা পর্ব্বে "নাটকের" উল্লেখ দেখিতে পাই। নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্রহ্মার সভা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন "ঐ সভা নানারূপ বিশিষ্ট প্রদীপ্ত মণি নিকর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভ সমস্ত উহাকে ধারণ করে নাই। ঐ স্বপ্রকাশিকা স্বর্গপর সভা অপরিমিত প্রভা বিশিষ্ট নানাবিধ প্রদীপ্ত দিব্যভাব সমুহ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিকে অতিক্রম করিয়াছে এবং ভাস্করকে যেন ভর্ৎসনা করিতে দীপ্তি পাইতেছে। * * * ঐ সভায় বহুবিধ নাটক, কাব্য, কথা, আখ্যায়িকা ও কারিকা সমুদয় অবস্থিত করেন।" কিন্তু এই নাটক কথাটী ব্যাপক নহে, ইহা দ্বারা আমরা উহা দৃশ্য কাব্য কি না এবং সে সময়ে উহা অভিনীত হইত কি না তাহার কোন পরিচয় পাই না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মহাভারতের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ উপযুক্ত কৃতিত্বের সহিত কেহই উপস্থাপিত করিতে পারে নাই।

আমরা রামায়ণ রচিত হইবার সময়ে যে চরিত বর্ণনা দ্বারা অভিনয় প্রচলিত ছিল, তাহা জানিতে পারি। রামায়ণের "উত্তর কাণ্ডে" শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব ও কুশকে ছদ্মবেশে রামচন্দ্রের সম্মুখে রামায়ণ গান করিতে দেখিতে পাই। বাল্মীকি অযোধ্যা নগরীতে আগমন করিয়াছেন, রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন, সে সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যভূত কুশী ও লবকে বলিলেন,—"তোমরা ঋষিগণের পবিত্র আশ্রম, ব্রাহ্মণদিগের গৃহ, রাজ ভবন, রথ, রাজমার্গ, রামচন্দ্রের গৃহদ্বার ও কর্ম্মশালায় ধাত্বিকগণের সম্মুখে গমন করতঃ পরমানন্দে সর্ব্বত্র রামায়ণ গান কর। হে বৎস যুগল! তোমরা এই সুমিষ্ট ফল ও মূল পরিত্যাগ করিও না, কারণ এই সকল ভক্ষণ করিলে তোমাদের শ্রম হইবে না।

* • * •

রাঘব বালকযুগল কর্ত্তৃক গীয়মান অপূর্ব্ব ষড়্জাদ স্বর-সমান্বিত নানালঙ্কার সম্বলিত বহু প্রমাণ সম্বন্ধ তন্ত্রীলয় সমন্বিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং কর্ম্মাখ্যানে মহামুনি বাল্মীকি, শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি ও নৈগম, পুরাণ এবং শব্দ শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ দ্বিজাতি, স্বর লক্ষণজ্ঞ সমুৎসুক ব্রাহ্মণ, পাদ অক্ষর ও ছন্দঃ শাস্ত্রে নিজ্ঞাত বিশেষ লক্ষণজ্ঞ গন্ধর্ব্ব, হেতুবাদ কুশল বহুশ্রুত হৈতুক, স্বর গ্রামাভিজ্ঞ ক্রিয়াকল্প নিপুণ কার্য্য বিশারদ ও জ্যোতিবিদ পৌরবর্গ এবং নৃত্যগীত বিশারদ বৃত্তকল্প বেদ পুরান ও ছন্দঃ শাস্ত্রে পারদর্শী দ্বিজবর-গণকে আহ্বান করতঃ গায়ক যুগলকে প্রবেশিত করিলেন। সভ্যগণ সমাসীন হইলে, মুনি বালক কুশ ও লব শ্রোতৃবর্গের হর্ষবর্দ্ধন সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। * * শ্রোতৃবর্গ বারম্বার শ্রবণ করিয়াও তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না।" কিরূপ শ্রোতা এই চরিত-বর্ণনা সঙ্গীত লহরী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা রামায়ণের উদ্ধৃত অংশ হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন। অতএব চরিত বর্ণনা দ্বারা অভিনয়

---

* এই প্রবন্ধ ঢাকা উয়ারি ড্রামাটিক ইউনিয়ানের সভ্যগণের নিকট পঠিত।

যে রামায়ণী যুগে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে আপনারা নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। অভিনেতাবর্গ নাট্য শাস্ত্রে কুশী লব নামে আখ্যাত। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে "অভিনয়কারী কুশী লব নাম, উপলক্ষ্য করিয়া রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়ের নামকরণ হইয়াছিল। মহাভারতের ইক্ষাকু বংশের তালিকায় লবকুশ নাম নাই।"

অনেক পাশ্চাত্য লেখকের মত এই যে গ্রীস্ দেশ হইতেই ভারতীয় নাট্য সাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি। সে কথা আলোচনার পূর্ব্বে আমরা এই কথাটা বেশ অনুধাবন করিতে পারি যে 'মহাভারত' ও 'রামায়ণে' নাটক শব্দ এবং চরিত বর্ণনা দ্বারা অভিনয় প্রথা প্রচলিত থাকিলেও আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে নাটকের উৎপত্তি হয় নাই। আপনারা এ কথাটা স্মরণ রাখিবেন।

গ্রীস দেশের নাটকের প্রামাণিক ইতিহাস খৃঃ খঃ ৫০০ হইতে ৪০০ বৎসরের মধ্যে। সে সময়ে গ্রীক্ কবি এস্কাইলস্, সফোক্লিশ্ এবং ইউরিপাইডিসের আবির্ভাব, কাজেই গ্রীস দেশ হইতে আমাদের দেশে নাটকের উৎপত্তি অনেকে এইরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করেন। আনন্দ পাইবার আকাঙ্খা ও আনন্দ দান করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। আমাদের দেশে যেমন প্রাচীন কালে সনৃত্য অভিনয় ছিল, চরিত বর্ণনা দ্বারা অভিনয় করিতেছিল, গ্রীক্‌দেশের নাটকের উৎপত্তির ইতিহাসও তদ্রূপ। আলেকজাণ্ডার ভারতের পশ্চিম সীমান্তে অভিযান করিতে আসিয়া নাট্যাভিনয়ে মাতিয়াছিলেন এবং আমরা তাহার অনুকরণ করিলাম, এরূপ কল্পনা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

গ্রীক্ নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসটুকু সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে তুলিয়া দিলাম তাহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে নাটক সৃষ্টির মূল সূত্রটুকু ভারতে ও গ্রীকে একই আদর্শে প্রথম যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল। "The Greek drama, though it was perfected, and indeed first assumed a truly dramatic form, at athens, was not strictly an Attic invention. The Greek plays, it must always be recollected, formed part of the religious worship of Greece. Both tragedy and comedy arose art of the worship of Dionysus, as a heave factor of mankind, the giver not merely of wine but of the fruitfulness of trees of all kinds, and of the Joyousness of spring growth and autumn vintages"+

আমাদের দেশে দুই একটী চরিত্র লইয়া যে নৃত্যগীতাদি পূর্ণ অভিনয় হইত—সে নাটক 'ছলিক' নাটক নামে পরিচিত। সেই সময়ে নট, সূত ও মাগধেরা নৃত্য এবং আখ্যায়িকা গান করিত। আমাদের দেশের ভাট বামুনদের ছড়া, রাজপুতনায় চারণদের সঙ্গীত গাঁথা, কবি কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতির কথা স্মরণ করুণ। গ্রীসদেশেও এই রীতির প্রচলন ছিল। পুরাণ কাহিনী বর্ণনা, বসন্ত সঙ্গীত, বীরগাথা এসব গ্রীসদেশেও প্রথম যুগে সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল এবং এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। মিশরের ফেরোয়াদের, বোগদাদের খালিফাদের Story tellerদের কথা ভাবিতে পারেন। আরব্য উপন্যাসের জোবেদীর গল্প বলিবার কথা বোধ হয় আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। মৌর্য্যযুগে অশোক রাজা মহাপুরুষদের চরিত কথা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে প্রচলনের জন্য বৌদ্ধদের মধ্যে চরিত সঙ্গীতের প্রবর্ত্তন করেন। Religions of India নামে A. Barth বিরচিত একখানা গ্রন্থ আছে, তিনি বলেন যে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে তৃতীয় শতাব্দীয় বীরপূজার মত কৃষ্ণের লীলার নাট্যাভিনয় হইত। তখন, অথবা পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শতাব্দীতেও তিনি বিষ্ণুর অবতার হন নাই। কালিদাসের সময়ের পূর্ব্বেও যে সর্ব্বাঙ্গীন দৃশ্যকাব্য রচিত না হইয়া, কেবল দু'একজনের নৃত্যগীতাভিনয়েই নাটক অভিনীত হইত, মালাবিকাগ্নিমিত্রে ছলিক নাটকের কথাতেই তাহা সূচিত হয়।"

কালিদাস প্রতিভার অবতার। কালিদাস স্বকীয় অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়া সমস্ত জগৎকে বিস্মিত করিতে পারিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

+ History of Greece by Sir Milliam Smith D. C. L. L, L. D. page 231.

নৃত্য বহুল দেবলীলার গান ও কবিতা যুদ্ধ হইতে যদ এস্কাইলস্ নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে কালিদাসও ঐরূপ ভাব প্রণোদিত হইয়া নাটক রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন না কেন? জগতে প্রতিভা চিরদিনই নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব প্রতিভাও নূতন সৃষ্টির কথা স্মরণ করিলেই ত একবার সহজ সুন্দর মীমাংসা হয়।

অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় নাট্যশাস্ত্রেরও বিশেষ খ্যাতি আছে। ভরতমুণি নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধ বিদ্যমান আছে। কালিদাস ও ভরত মুনির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভরতমুনি প্রণীত যে নাট্যশাস্ত্র পাওয়া যায় তাহা দেখিলে মনে হয় যে কালিদাসের পূর্ব্বেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দৃশ্যকাব্য বিরচিত হইয়াছিল, এইরূপ বলিবার হেতু এই যে উক্ত গ্রন্থে নাটকের লক্ষণাদি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। ঐতিহাসিক হিসাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইবে এই নাট্যশাস্ত্র অত্যন্ত আধুনিক। ভরতমুনি নৃত্যশাস্ত্রের প্রণেতা নাট্যশাস্ত্রের নহেন, কারণ কাদম্বরী সপ্তম শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল তাহাতে আমরা বহুবার নৃত্যশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের নহে। "নৃত্যাভিনয় হইতেই নাটকের উৎপত্তি বলিয়া, সকল নাটকেই ভরতবাক্য পাওয়া যায় এবং সেইজন্যই পরে ভরতের নামে নাট্য এবং নৃত্যশাস্ত্র একসঙ্গে রচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ একালের নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে যখন অনেকগুলি প্রাকৃতের উল্লেখ আছে, তখন কদাচ ঐ গ্রন্থ অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বের নহে, বরং মনে হয় যে বহুশ্রেণীর নাটক রচিত হইবার পরে ঐ সকল আদর্শ অনুসরণ করিয়া উহা বিরচিত হইয়াছিল। * * এই সকল কারণেই মনে করা যাইতে পারে যে নূতন শ্রেণীর নাটকের পৌরাণিক যুগে কালিদাসই প্রথম রচনা করেন।" এবং ভারতে নাট্য-সাহিত্যের স্রষ্টরূপে যদি কেহ শ্রদ্ধা প্রীতি ও প্রতিভার পুষ্পাঞ্জলি পাইতে পারেন সে আর কেহই নহে ভারতের ও জগতের কালিদাস।

'অগ্নিপুরাণ হইতে আমরা নাটকের প্রকার ভেদ জানিতে পারি, আমাদের দেশে নানাশ্রেণীর নানা রস সমন্বিত নাটক বিরচিত হইত! বিষয় বিভাগ অনুযায়ী সে সমুদয় নাটক, প্রকরণ, ডিম, ঈহামৃগ, সমবকার প্রহসন, ব্যায়োগ, ভান, বীথী, অঙ্ক, ত্রোটক, নাটিকা, সট্টক, শিল্পক, দুর্ম্মিলকা, প্রস্থান, ভণিকা, ভানী, গোষ্ঠি, হল্লিশক, কাব্য, শ্রীলিখিত, নাট্যরাসক, উল্লাপ্যক, প্রেক্ষণ ইত্যাদি সপ্তবিংশতি প্রকার অভিনয় গ্রন্থ রচিত ও অভিনীত হইত। তারপর নাটক অভিনয়ে রস, ভাব, বিভাব, অনুভাব, অভিনয় অঙ্কস্থিতি এই সকলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অভিনয়ে শৃঙ্গার, রৌদ্র, করুণ, বীর, অদ্ভুত, বীভৎস, হাস্য, ভয়ানক, শান্ত প্রভৃতি রসের বিকাশ না করিলে অভিনয় হইতে পারে না। শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস এই চারিটি রস হইতেই অন্যান্য রসের উৎপত্তি। অগ্নি বলিতেছেন—

'লক্ষ্মীরিব বিনা ত্যাগান্ন বাণী ভাতি নীরসা।'

দান ব্যতিরেকে লক্ষ্মী যেমন শোভা পান না, সেইরূপ রস ব্যতিরেকে বাণী ও বিরাজমানা হন না। এখানে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, তাহার বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখন আমাদের দেশে অনেকে আরও অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, কাজেই বিস্তারিত ভাবে এবিষয়ে আমি কিছু বলিলাম না, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম মাত্র।

বাঙ্গালার সাধারণ সম্পত্তি *

[শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী]

(নিরপেক্ষ সমালোচনা)

বাঙ্গালার সাধারণ সম্পত্তি, সাধারণের অর্থের দ্বারা পরিপুষ্ট—প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থ সমূহ কি ভাবে অপব্যয়িত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালার এক একটি তীর্থ স্থানের মোহান্ত ও সেবাইতেরা—আপন কর্ত্তব্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সাধারণের প্রদত্ত অর্থ দিয়া নিজেদের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিতেছেন—রাজার ন্যায় কেহ কেহ বা মোটর জুড়ি হাঁকাইয়া বেড়াইতেছেন। অথচ অশিক্ষায়, ম্যালেরিয়ায়, কালাজ্বরে, দুর্ভিক্ষে, জলাভাবে, অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে বাঙ্গালার কোটি কোটি লোক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে, সেদিকে তাঁহারা বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করিতেছেন না। তারকেশ্বরের গদিচ্যুত মোহান্ত সতীশগিরি কিভাবে দেবতার চরণে উৎসৃষ্ট টাকাকড়ির অপচয় ও অপব্যবহার করিত তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বর্ত্তমানে যে আইন বিদ্যমান আছে, সেই আইনের দ্বারা এই সমস্ত অপচয়ের প্রতীকার করিতে গেলে অভিযোগকারীকে প্রভূত অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিতে হয়। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান মহাশয় Bengal Hindu public trusts bill নামক একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন। এই বিলটির মর্ম্ম এই আটজন নির্ব্বাচিত ও দুইজন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত লোকের দ্বারা একটি Board of Commissioners গঠিত হইবে, এই Board of Commissionersএর নিকট যে কোন সাধারণের সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দশজন লোক উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থাদির অপব্যয় ও অপচয় সম্বন্ধে লিখিত অভিযোগ করিতে পারিবেন। পাছে তাঁহারা কোনরূপ মিথ্যা অভিযোগ করেন তজ্জন্য অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগকারীদিগকে কিছু অর্থ বোর্ডের হস্তে জমা রাখিতে হইবে। বোর্ড অব কমিশনার অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি (Committee of enquiry) নিযুক্ত করিবেন। কমিটিতে সেই সমস্ত লোকই থাকিবেন যাঁহাদের সহিত সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে। যদি তদন্ত কমিটি দেখেন যে অভিযোগ সত্য তাহা হইলে তাঁহারা বোর্ডের নিকট তদনুরূপ রিপোর্ট দিবেন, বোর্ড সেই রিপোর্ট অনুযায়ী স্থানীয় গভর্ণমেণ্টকে অভিযোগের প্রতীকার করিবার জন্য লিখিবেন। বোর্ড যে সিদ্ধান্ত করিবেন তাহার বিরুদ্ধে কাহারও আদালতে নালিশ কিংবা আপীল করিবার অধিকার থাকিবে না। এই ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণ আদালতে অজস্র টাকা না ঢালিয়া অনায়াসে এই সালিশী বোর্ডের দ্বারা সাধারণ সম্পত্তির অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিতে পারিবে। এই বিলটি দেবোত্তর বিল নহে, Public trusts bill. সুতরাং দেবোত্তর ব্যতীত যত কিছু সাধারণ সম্পত্তি আছে তৎসমস্তই এই বিলটি পাশ হইলে তাহার আমলে আসিবে। হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহাকেও এই বোর্ডের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে না, এমন কি গভর্ণমেণ্টও হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহাকেও ইহার সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন না।

যে সমস্ত বাড়ীতে পারিবারিক বিগ্রহ আছেন, যে সমস্ত পরিবার সেই পারিবারিক বিগ্রহের দ্বারা জনসাধারণের নিকট হইতে নিয়মিত "প্রণামী" গ্রহণ করেন না, সেই সমস্ত পারিবারিক বিগ্রহের সম্পত্তি এই আইনের আমলে আসিবে না, বিলটিতে এই কথাই বলা হইয়াছে। আমরা কিন্তু বিলের

* গত ১১ই আশ্বিন কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

এই ধারাটির সহিত একমত হইতে পারি না। মনে করুন কাহারও পিতা পিতামহ বাটীতে একটি শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সেই শ্যামসুন্দরের রাতুল চরণে প্রতিদিন ভক্ত মুমুক্ষুগণ যদি কিছু পুজোপচার দিয়া যায় তাহা হইলেও কি তাহা সাধারণের সম্পত্তি মধ্যে গণ্য হইবে? খৈতান মহাশয় যদি শুধু বড় বড় তীর্থস্থান যেখানে দূর দেশান্তর হইতে তীর্থযাত্রীরা আসিয়া প্রণামী, ভোগ প্রভৃতি দিয়া যায়, শুধু সেই সমস্ত তীর্থস্থানের জন্য এই বিল উপস্থাপিত করিতেন তবে আমরা তাঁহার বিলটির নীতির সমর্থন করিতে পারিতাম। এই বিল পাশ হইলে অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের জীবিকা নষ্ট হইবে—অনেক বিধবা অনশনে অশ্রুপাত করিবেন। তারকেশ্বর তীর্থের মোহান্ত অর্থের অপচয় করিত, কালীঘাট তীর্থের সেবাইতেরা নিজেরা কখনও মায়ের চরণে একটি পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন না। প্রতিনিধিস্বরূপ পুরোহিতদিগকে নিয়োজিত করিয়া মায়ের সেবার্চ্চনা করান এবং মায়ের মন্দিরে প্রাপ্ত অর্থরাশির দ্বারা নিজেদের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করেন। খৈতানের যদি উদ্দেশ্য থাকিত যে শুধু প্রকাশ্য তীর্থস্থান সমূহের অর্থের অপচয় নিবারণ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দেশে শিক্ষার বিস্তার, জলাশয় খনন, কালাজ্বর কেন্দ্র স্থাপন, বৃদ্ধ অসমর্থদের সাহায্য, অনাথ অনাথার প্রতিপালনে ব্যয় করিবেন, তাহা হইলে তিনি পারিবারিক বিগ্রহাদির সম্পত্তি সমূহকে এই বিলের আয়ত্বের মধ্যে না ফেলিয়া শুধু প্রকাশ্য তীর্থস্থান ও সাধারণ সম্পত্তির জন্য এই বিলের খসড়া প্রস্তুত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। এইখানেই তিনি একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন এবং এই ত্রুটির জন্যই তাঁহার বিলের বিরুদ্ধে আজ সমগ্র বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

গভর্ণমেন্টকে বিলে দুইজন সভ্য মনোনীত করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আমরা ইহা আদৌ সমীচিন বলিয়া মনে করি না। গভর্ণমেণ্টের যাঁহারা কর্ণধার তাঁহারা বিদেশী, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারা আমাদের প্রতিমা পূজা পৌত্তলিকতা প্রভৃতির অনুকূল নহেন, এ অবস্থায় তাঁহারা যে সমস্ত লোক মনোনয়ন করিবেন তাঁহারা যে আমাদের হিন্দু প্রতিষ্ঠান সমূহের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন তাহার নিশ্চয়তা কি? আর ব্যবস্থাপক সভা হইতে যে চারিজন সভ্যকে নির্ব্বাচন করিবার কথা হইয়াছে তাহাই বা কিরূপ হইবে? ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য ধনী, বিলাত ফেরত, ধনবলে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের দেশস্থ ভদ্রাসনের অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা অনেকেই দেবসেবা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কাহারও বাটীর দেববিগ্রহ ধূলায় লুটাইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারও বাটীর দেব-মন্দিরে চর্ম্ম চটিকার নিত্য আবাসস্থান হইয়াছে, কাহারও বাটীর নারায়ণ শালগ্রাম শিলা বাক্সে উঠিয়াছে, আবার কেহ বা সে গুলিকে গ্রামের পুরোহিত ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন! কাজেই এই সমস্ত লোকের দ্বারা বাঙ্গালার দেবোত্তর সম্পত্তি সমূহের কিরূপ উদ্ধার সাধন হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। "স্বয়ং অসিদ্ধঃ কথং অন্যং সিদ্ধম্ সাধয়িতুম্ সমর্থঃ।" যে নিজে অসিদ্ধ সে অন্যকে সিদ্ধ করিবে কি প্রকারে? কাজেই ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মধ্য হইতে বোর্ডের কমিশনার নির্ব্বাচনের আমরা পক্ষপাতী নহি। আমাদের মতে জনসাধারণকে একটি বিরাট কন্‌ফারেন্সে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে ভোট লইয়া তবে বোর্ডের কমিশনার নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। আর দুইজন মাড়োয়ারী কমিশনারই বা নির্ব্বাচিত হইবেন কেন? খৈতান বলিতে পারেন বঙ্গদেশে হাঁসপাতাল, পিঞ্জরাপোল, ধর্ম্মশালা প্রভৃতির শতকরা ৫০টি মাড়োয়ারীর প্রতিষ্ঠা, সুতরাং এই বোর্ডে দুইজন মাড়োয়ারী প্রতিনিধিকে নির্ব্বাচন করা কিছু অন্যায় কাজ নহে। আমরা খৈতান মহাশয়ের এই যুক্তিয় আদৌ কোন সারবত্তা দেখিতেছি না। তিনি তীর্থস্থান ও দেবোত্তর সমূহের সঙ্গে এই সব হাসপাতাল প্রভৃতি জড়াইতেছেন কেন? তিনি যদি হাসপাতাল প্রভৃতিকেও Public trusts billএর আমলে আনিতে চেষ্টা না করিয়া একটি বিল হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ফণ্ড প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের জন্য উপস্থিত করিতেন আর একটি বিল প্রকাশ্য তীর্থস্থান যেখানে দেশ দেশান্তর হইতে নানা তীর্থযাত্রী আগমন করে, তাহা হইলে খুব সমীচিন কাজ হইত।

খৈতানের বোর্ড গঠনের নিয়মাবলীর মধ্যে আর একটি অতি আপত্তিজনক কথা আছে। গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত হিন্দুসভা সমিতিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে বলিবেন, শুধু তাঁহারাই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন? এ কোন্ দেশীয় যুক্তি তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অবোধ্য। কোন্ হিন্দুসভা গভর্ণমেণ্টের মন-পূত হইবে এবং কোন্‌টি হইবে না, তাহা গভর্ণমেণ্টই বলিতে পারিবেন। এই ভাবে হিন্দুর চিরন্তন প্রতিষ্ঠান সমূহকে যাচিয়া গভর্ণমেণ্টের হস্তে তুলিয়া দিবার প্রয়োজন কি?

আমরা এই বিলটির নীতি সমর্থন করি, কিন্তু নিয়মগুলি আদৌ পছন্দ করি না—সমর্থন করি না। তারপর মঠ-মন্দির-তীর্থ স্থানের উদ্বৃত্ত টাকা শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রসারতার জন্য ব্যয় করা হইবে বলিয়া বিলে বলা হইয়াছে, এটি খুব উত্তম কথা। আমরা শুধু এই সুবিধাটুকু লাভ করিবার জন্য এই বিলটির নীতি সমর্থন করিতেছি। দেশে এখন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, কালাজ্বর প্রভৃতির চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, বৃদ্ধ অসমর্থদিগকে সাহায্য দান, অনাথ অনাথা পরিবার-বর্গকে সহায়তা, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, পিপাসার্ত্তকে পানীয় দান, শীতে জর্জ্জরিতকে বস্ত্র দান—এই সমস্ত নানা সদনুষ্ঠানে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। বাঙ্গালার সাধারণ সম্পত্তি সমূহের অপব্যয়ের পথ রোধ করিয়া, তীর্থ-স্থানাদির উদ্বৃত্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া যদি এইভাবে দেশের দুর্দ্দশা দূর করা যায়, তবে জাতি গঠনের সুবিধা হইবে, জাতি গঠিত হইলে স্বরাজের পথ সুগম হইবে—তখন কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে স্বরাজের দাবী উঠিবে। দেশ যদি শিক্ষিত হইয়া উঠে তবে কৃষক লাঙ্গলের মুঠি ধরিয়া স্বরাজের দাবী করিবে—ঝাড়ুদার ঝাটা হস্তে রাষ্ট্রীয় মুক্তির দাবী করিবে—পাচক হাতা বেড়ী হাতে লইয়া স্বাধীনতা প্রার্থনা করিবে। ভবিষ্যতের এইটুকু সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা এই বিলটির নীতি সমর্থন করি। বর্ত্তমানের অসুবিধা লইয়া বিচার করিলে কোন মহৎ কাজই সংসারে সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক জাতিকে গড়িতে গেলে বর্ত্তমানের অসুবিধা সহ্য করিয়া লইয়া ভবিষ্যতের সুবিধার জন্য লড়াই করিতে হয়। দু'দশ জন দেবোত্তর ভোগীর অসুবিধা হইবে বলিয়া জাতির সমগ্র স্বার্থকে পদদলিত করিতে নাই। যদি গ্রামের দুইখানি গৃহ ধ্বংস করিলে সমগ্র গ্রামটি সংক্রামক ব্যাধির অথবা লেলিহান বহ্নির হাত হইতে রক্ষা পায় তবে তাহাই কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা মিঃ খৈতানের বিলটি সম্বন্ধে দেশবাসীকে বিশেষ প্রণিধান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বিলের যে যে স্থানে পরিবর্ত্তন করিবার দরকার আছে সেখানে পরিবর্ত্তন করা হোক, কিন্তু তাই বলিয়া এই বিলটিকে যদি একেবারে বাতিল করা হয় তবে আমরা একটা মহা সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইব। দোষে গুণে বিলটি নিতান্ত মন্দ নহে, আর গভর্ণমেণ্টের যখন শুধু "কমিশনার বোর্ড' নির্ব্বাচন করা ভিন্ন অন্য ক্ষমতা নাই, তখন টাকা কড়ি গভর্ণমেণ্ট আত্মসাৎ করিবেন এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ কি? এই বোর্ড আমাদের সালিশী আদালত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

পতিতার কাহিনী

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

ঘৃণায় মু'খানি কুঞ্চিত করি যেয়োনা দূরেতে সরি,
সত্য বটে যে ধর্ম্ম হারায়ে হ'য়েছি পতিতা নারী।
তোমাদের যাহা আছে বোন—তাহা আজ যে আমার নাই,
ঘৃণায় শিহরি মোর পাশ হ'তে যাইছ দূরেতে তাই।

আমার বাতাস বড়ই ঘৃণিত ভগিনী, তোমার কাছে,
হায়, এ জগতে অভাগিনী আর মোর সম কেবা আছে?

আজ আমি এই বিশ্বঘৃণিতা, আশ্রয় মোর কোথা,
অন্নের তরে দ্বারে দ্বারে ঘুরি, নারি প্রকাশিতে ব্যথা।
পতিতা বলিয়া যেয়ো না সরিয়া, শোন,—একদিন আমি
ছিনু পুণ্যবতী, সতী পতিব্রতা, যেমন ভগিনী তুমি।
এই হাতে আমি পূজা আয়োজন করে'ছি তোমারই মত
এই হাতে রেঁধে অতিথি ব্রাহ্মণে আহার দিয়েছি কত।
এই হাতে আমি পতিদেবতার করিয়াছি পদপূজা,
আজ সংসারের রঙ্গমঞ্চে শেষ হয়ে গেছে সাজা।

আজ আমি ওগো পতিত রমণী ভিক্ষা চাহিয়া ফিরি,
চাহিতে ভিক্ষা নয়ন হইতে অশ্রু পড়ে যে ঝরি।
ভগিনী আমার, পুরাতন কথা শুনিতে কি তুমি চাও,
আমার সে গৃহ—কল্পনা চোখে স্বর্গ আঁকিয়া নাও।
সেই গৃহে ছিনু রাজ রাজ্যেশ্বরী, দু'টী ছিল মেয়ে ছেলে,
আজ কোথা তারা—বুক ফেটে যায় কে আমারে দেবে বলে?

স্বামীর সেবায় জীবন কাটাই, ছেলে মেয়ে দুটি বুকে
তুলে নিয়ে কত চুমো যে দিতাম, বুক ভরে যেত সুখে।

কোথা গেল সব, আজ কেহ নাই, সব হয়ে গেছে পর,
সকলি রয়েছে, কোথা আমি,কোথা স্বামী, ছেলে,মেয়ে, ঘর?

কেমন করিয়া বলিব ভগিনী একটী রাতের কথা
সেই কালরাতি বহিয়া আমারে আনিয়া ফেলেছে হেথা।
প্রভাত যখন অরুণ আলোর মালাটি পরিয়া গলে
প্রকাশিল,—আমি দেখিলাম তারা আমারে গিয়াছে ফেলে

পথের ধারেতে, মূর্চ্ছিতা সেথা একাকিনী পড়ে আছি,
কাঁদিলাম—প্রভু সব হারাইয়া রহিলাম কেন বাঁচি?
উঠিবার মোর শকতি ছিল না তবু উঠিলাম ঠেলে,
ঘরে যে পড়িয়া কাঁদিছে আমার হতভাগা মেয়ে ছেলে।
কাছাকাছি যেতে মেয়ে ছেলে মোর উঠিল কাঁদিয়া দেখে,
কাছে আসিবারে ছুটে ভাই বোন,—তাদের ধরিয়া রাখে
পাড়াপ্রতিবাসী আমাদের এক,—দেখিলাম আমি চেয়ে
গ্রামবাসী যত আমার উঠানে, কেহ নাই বু'ঝ গাঁয়ে।

স্বামী মোর মাঝে গম্ভীর মুখে রয়েছেন দাঁড়াইয়া,
হেরিয়া তাঁহারে পুলকে আমার ভরিয়া উঠিল হিয়া।

গ্রামবাসী যবে করিয়া বিচার ফলাফল করে বার
কাঁপিনু শুনিয়া, চরণ স্বামীর জড়াইয়া হাহাকার
করিয়া কাঁদিনু,—কোন ফল তাতে লাভ করি নাই ওগো
অন্ধকে ডাকি মিথ্যা বলিনু—জাগো ওগো, তুমি জাগো।

স্বামী দেবতা যে এমন পাষাণ নাহি জানিতাম আমি,
আজও কেঁদে বলি—হেন অবিচার জেনেও করিলে স্বামী;
চির অধিনী যে দাসী তব নাথ, কখনও ভুলিয়া হায়
করিনি তোমায় ওগো অনাদর, বুক ভেবে ফেটে যায়—
কেমনে ত্যাজিলে, দূর করে দিলে তোমার দুয়ার হতে?
আজও সেই কথা ভাবিয়া অশ্রু নাহি পারি নিবারিতে।
ধর্ষিতা এই রমণীর প্রতি সমাজ করে না দয়া,
স্বামী গেল চলে ছেলে মেয়ে নিয়ে, তখন কে তার জায়া।

ওগো ও ভগিনী বলিব কেমনে, দুটি মোর ছেলে মেয়ে,
মা মা বলে কাঁদে ধূলায় আছাড়ি, কেবা দেখে আহা চেয়ে।

আমরি বাছারে মা ডাক তোদের সাঙ্গ হয়ে কি গেল,
মায়ের স্মৃতি কি ভুলিতে পারিস? ও যে চির দাগ র'ল।
সমাজ আমারে তাড়াইল দূরে, পতিতা নারী যে আমি,
নির্ব্বাকে কাঁদি বলি ওগো সব তুমিই দেখিয়ো স্বামী।

পতি যদি মোর করিতেন দয়া করিতে কি পারে লোকে,
ছেলে মেয়ে দুটি লুটাত না তবে তাদের মায়ের শোকে।
তারা তো ভোলে নি জননীর কথা, তারা তো ভোলে নি সব,
কাঁদিত যে তারা,—অন্তরে মোর বাজিত সে হাহারব।
দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াই ভিক্ষা চাহিয়া হায়,
কত লোকে হাসে, কত কথা বলে শুনে বুক ফেটে যায়।
থাকিতে পারি না, সাঁজের আঁধারে লুকাইয়া তনুখানি,
যাইতাম গাঁয়ে লুকায়ে দেখিতে দুটি নয়নের মণি।
হায় হায় হায়, তাও ফুরাল যে, একদিন সাঁজে গিয়ে
দেখিলাম নাকো দুটি ছেলে মেয়ে, শুনি তারা আছে শুয়ে
নদীর শীতল জলের নিচেতে, পায় নি মায়ের কোল,
স্নিগ্ধ নদীর কোলেতে গিয়াছে, সেখানে পাইছে দোল।
বাছারা আমার,—বুক ভেঙ্গে বুঝি প্রাণ মোর বার হয়,
না না, কাঁদিব না, কাঁদার সময় এখানে—এখন নয়।
দেখিলাম পতি দেবতা আমার পেতেছেন সুখঘর,
পতিব্রতা জায়া পেয়েছেন তিনি ; ওরে অভাগিনী সর ;
তোর ঘরে আজ কে এসেছে দেখ, আজ কোথা তোর স্থান,
নদীর তীরেতে আছাড়ি কাঁদিনু—আছ কিগো ভগবান ?

বাছারা আমার, আছিস কোথায় ডেকে নে মায়েরে কাছে,
ডুবিলাম জলে জানি নাই মোর আরও দুর্দ্দশা আছে।
জীবন আমার ফুরায় নি বোন তাই উঠিলাম বাঁচি,
আবার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া ভিক্ষা এখনও যাচি।
পাগলিনী ভাবি বালক বালিকা দেয় ধূলা মোর গায়ে,
আমি ভাবি—হারা ছেলে মেয়ে মোর এসেছে দেখিতে মায়ে।
তারা হাসে, নাচে, করতালি দেয় আমায় সকলে ঘিরে,
আমি ভাবি মোর আঁখি তারা দুটি আবার এসেছে ফিরে।
পতিতা—পতিতা—পতিতা আমি যে, হারায়েছি আমি সব,
অজ্ঞাতে মোর বরিছি কখন নরকের হাহারব।
ওগো আমাদের প্রাচীন সমাজ, জিজ্ঞাসা করি তবে,
এমনিই করিয়া তোমাদেরই সাজা নারীকে বহিতে হবে ?
তোমরাই যারে পার নি রাখিতে—একদা কোনও রাতে,
জোর করে যদি নিয়ে যায় হরে—তারই পাপ হবে তাতে ?
ওগো সমাজের শাসক পুরুষ, জিজ্ঞাসা তব ঠাঁই,
পত্নীকে তব ত্যজিবে এরূপে, এর প্রতিকার নাই ?
ছি ছি ধিক ধিক হিন্দু সমাজ, ধিক এ পুরুষ সবে—
ইহাদেরই পাপে ইহাদেরই জাতি চির অবনত রবে।

———

গৃহহারা

[কিরণচন্দ্র ঘোষ]

—ক—

গদাধর পণ্ডিতের টোলে যে সমস্ত ছাত্র পড়ার অছিলায় নিছক অন্নধ্বংস করিত নিত্যানন্দ ছিল তাহাদের মধ্যে প্রধান। মা সরস্বতীর সহিত তাহার প্রচ্ছন্ন মনোবিবাদ এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল যে ক্রমাগত দুই বৎসর ধরিয়া নিয়মিত রূপে পাঠাভ্যাস করিয়াও সে ব্যাকরণের সন্ধির কোটাটা শেষ করিতে পারে নাই। কিন্তু সেজন্য তাহার মনে কোন দুঃখ ছিল বলিয়া বোধ হইত না, কারণ তাহার মত হাসিয়া খেলিয়া নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইতে বোধ হয় কোনও সচ্চিদানন্দরূপী পরমহংসকেও ভাবনায় পড়িতে হইত। গেরস্তর বাড়ীর ছেলেমেয়ে ধরিয়া, পাড়ার বৌ-ঝিদের সহিত গল্পগাছা করিয়া, নদীর জলে সাঁতার দিয়া, গ্রামের সকলের সহিতই কারণে অকারণে ঠাট্টা-তামাসা করিয়া কোনরূপে তাহার দিন গুজরান হইত। তাহার মাতা-পিতার কথা তাহার মনেও পড়ে না। এক দূর সম্পর্কীয়া মাসীর বাড়ীতে থাকিয়া সে মানুষ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া এই গ্রামের একটা ছেলের সহিত পালাইয়া আসিয়াছিল। তখন তাহার বয়স এগার বৎসর। গদাধর পণ্ডিত দয়া করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেই অবধি এইখানেই আছে।

তাহার মনটা ছিল অত্যন্ত সাদা, কেহ কখনও তাহাকে কোনও ফরমাইস্ করিয়া বিফল-মনোরথ হয় নাই। প্রকাণ্ড শ্যামবর্ণ দেহ, মাথার উপর তেমনি প্রকাণ্ড টিকি, গলায় একগাছি সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র- পরিষ্কার করিয়া মাজা—শ্রীমান নিত্যানন্দ ঠাকুরকে গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেই ভালবাসিত। পণ্ডিতের বাড়ী ঠাকুরপূজা করাটাই ছিল তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ, তাহার অন্য সমস্ত কাজের কোন বিধিব্যবস্থা ছিল না এমন কি খাওয়া দাওয়ারও না।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়টায় পাড়ার জেলেরা মহা সমারোহে একটা যাত্রার দল গঠনের আয়োজন করিতে-ছিল। আমাদের নিত্যানন্দ হইয়াছিলেন তাহাদের মাষ্টার মশায়, কোথা হইতে যে তিনি এ বিদ্যাটা আয়ত্ত করিয়া-ছিলেন তাহা কেহ জানে না। তিনি বার দুই কলিকাতা সহরে গিয়া থিয়েটার দেখিয়া আসিয়াছিলেন মাত্র। যাই হোক্ জেলেদের এই পরম হিতৈষী বন্ধুটী প্রতি রাত্রিতেই আসিতেন ও হাঁক ডাক করিয়া গ্রামের সমস্ত লোককে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন।

—খ—

রাত্রি বোধ হয় একটা। জেলেদের ওখান হইতে আখ্ড়া শেষ করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ পল্লীপথ ধরিয়া নিত্যানন্দ বাড়ী ফিরিতেছিল। সহসা একটা কান্নার আওয়াজে তাহার আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে একটা বাড়ীর পাঁচিলের ধারে এসে সে দেখিতে পাইল দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়া, একটী আন্দাজ ১৫।১৬ বৎসরের মেয়ে কাঁদিতেছে;

কাঁদছ কেন?

কোন উত্তর নাই। শুধু মেয়েটীর আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, অন্ধকারেও তাহা বুঝা গেল।

বলনা কাঁদছ কেন?

আমাকে এরা তাড়িয়ে দিয়েছে।

এরা কারা?

মেয়েটী কান্না বন্ধ ক'রে জড়িতস্বরে আস্তে আস্তে বলিল—"আমার স্বামী দুই ননদ ও শাশুড়ি।"

পৌষ মাস। উত্তুরে হাওয়া বহিতেছিল তাই শীতের তীক্ষ্ণতা যেন বাইরের চামড়া ভেদ করিয়া ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়েছিল। এই প্রচণ্ড শীত ও রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে যাহারা ঘরের বউকে বাহিরে বার করিয়া দিতে পারে তাদের নিষ্ঠুরতার কথা মনে করিয়া, নিত্যানন্দের সর্ব্ব শরীরের

মাংসপেশীগুলা শক্ত হইয়া উঠিল। তার ইচ্ছা হইল, ছুটে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ভিতরের সুখ নিদ্রাগত দুর্বৃত্ত প্রাণীগুলাকে গলা ধরিয়া হিড়্‌হিড়্‌ করিয়া টানিতে টানিতে বাহির করে এনে সাম্‌নের ঐ পুকুরে চুবাইয়া ধরে। কিন্তু আপাততঃ এই মেয়েটীর সম্বন্ধে কি করিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"আমি কি তোমার কোনও উপকার কর্‌তে পারি ?"

মেয়েটী এতক্ষণে একটুখানি আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে স্থিরস্বরে বলিল—"পারেন। আর আপনি দয়া না করলে এই শীতে অন্ধকারে ভয়ে আমি মারা যাব।"

আমি কি করবো ?

সাম্‌নের এই মাঠ্‌টা পার হলেই আমার বাপের বাড়ী। সেখানে আমার মা ও বৈমাত্রেয় ভাই আছেন। আমি তাঁদের কাছে যেতে চাই। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে বলেই বল্‌ছি নইলে বল্‌তাম না।

নিতাই একটুখানি ভাবিল তারপর বলিল—"কিন্তু এখান থেকে এমনভাবে চলে গেলে আর ফিরবার পথ থাকবে না তা ভেবে দেখেছ কি ?"

মেয়েটী তৎক্ষণাৎ বলিল—"ফিরতে আমি চাইনে।"

এরা কি তোমায় খুব যন্ত্রণা দেয় ?

হাঁ ধরে ধরে মারে পর্য্যন্ত। অন্ধকার না হলে আমার গায়ের দাগগুলো আপনি দেখতে পেতেন।

একটা প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস নিতাইয়ের প্রশস্ত বক্ষের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া এল ; মুখে বলিল আচ্ছা চল, তোমাকে এমন ভাবে একলা এই দানব পুরীর মধ্যে ফেলে রেখে গেলে ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না।

—গ—

এই দুটী অজানা অচেনা পথিক, জীবন পথের কোন শৃঙ্খলই যাহাদের কোনমতে বাঁধিতে পারিত না, তাহারা যখন কাছাকাছি পাশাপাশি হইয়া চলতে লাগিল—তখন রাত্রির অন্ধকারের বুক পর্য্যন্ত যেন শিহরিয়া উঠিল ! এরা যেন ঐ দূর দিগন্তের দুটী পাশাপাশি তারার মত—রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়াছে, দিবসের প্রথম আলো বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে আধকায় হারাইবে। কিন্তু তবু কি প্রবল এই আকর্ষণ যার জোরে এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে ! নিখিল বিশ্বের সেই একান্ত গোপন অথচ একান্ত প্রকাশমান মর্ম্ম কথাটি কবে বিশ্ববাসীর কাছে একান্ত সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিবে ?

পেচকের গুরুগম্ভীর ধ্বনি তাহাদের বুক কাঁপাইতে লাগিল, গাছগুলি ডালপালা নাড়িয়া নীরব ইঙ্গিতে নিষেধ করিল, আকাশে দিক্‌বধূরা কৌতুকভরা সহস্র চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিল, উত্তুরে বাতাস কাণের পাশ দিয়া হায় হায় শব্দে বহিয়া গেল, কিন্তু কেউ তাদের ফিরাইতে পারিল না।

মেয়েটীর বুকফাটা কান্নার ঝঙ্কার তখনও নিতাইয়ের মনে বাজিতেছিলো। এত অসহ্য বেদনার তীব্রতাপে যে সে তাহার পরিচিত জগতের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ চুকাইয়া দিয়া একজন অপরিচিতের সহিত এই অচেনা পথে এমন করিয়া পা দিয়াছে তাহাই সে আন্দাজ করিতে লাগিল।

হা ভগবান ! কত দুঃখ কত ব্যথা যে নিত্যই তোমার বিশ্ববাণীর তারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, তার কি কোন হিসাব আছে !

—ঘ—

মাঠ ভাঙ্গিয়া বারোয়ারী তলার পাশ দিয়া তারা যখন গ্রামের ভিতর গিয়া ঢুকিল তখন আর রাত্রির বড় বেশী বাকি ছিল না। মা ! ওমা ! এই ব্যাকুল আহ্বান একটী গৃহস্থের বাড়ীর দরজার সম্মুখে গিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মানুষ যখন সব হারায়, তখনই বুঝি এমনি করিয়া কাঁদিয়া বলে—মা ! ওমা ! এ যে বিশ্বের একেবারে প্রাণের ভিতরকার ডাক এতো কাহারো একলার সম্পত্তি নয় !

'কে রে ?' বলিয়া দরজা খুলিয়া একটী লোক বাহিরে আসিল। ও বাবাগো, মাগো, হাঁউ মাঁউ করিয়া পরক্ষণেই গিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

দাদা, আমি অরুণা।

অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিচলিতস্বরে সে লোকটী প্রায় কান্নার মত চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ওরে ওঠ, শীগগীর আলো জ্বাল, ডাকাত না ভূত কিছুই বুঝতে পারছি না।

আলো লইয়া অরুণার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তাহার স্ত্রী বাহিরে আসিল। এইবার লোকটী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল ও রক্তচক্ষু পাকাইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল—'তুই এত

রাত্রে মানুষ জ্বালাতন করতে কেন এসেছিস? তোর সঙ্গে ও কে?'

আমাকে তারা তাড়িয়ে দিয়ে বাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল—আমি সেইখানে বসে কাঁদছিলুম এই ভদ্রলোকটী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন।—লোকটী হাতমুখ নাড়িয়া সমস্ত মুখখানা বাঁকা হাসিতে ভরিয়া বাধা দিয়া বলিল—'আর বলতে হবে না, ভদ্রলোক যে তা বুঝতে পেরেছি, সে তোমাকে কষ্ট করে বোঝাতে হবে না। তা আমার এখানে এত রাত্তিরে আমি বোষ্টম বোষ্টমীর জায়গা দিতে পারব না।

ভ্রাতৃবধূ ইহাতে একটুখানি রসান দিয়া অকৃত্রিম ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন—'হতভাগা মাগী গিয়েছে তীর্থ করতে এদিকে একেবারে বস্তাবন্দী পূণ্যি যে তার ঘরের দরজার কাছে হেঁটে এসে উঠেছে তা জানে না। পোড়া কপাল আর কি।

"তবে মা এখানে নেই?" অরুণা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—তাহার সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

এবার নিতাই কথা কহিল।—"মশাই, দয়া করুন। আমি কোনরকম অন্যায়—

কথার মাঝখানেই মুখ খিঁচানির সহিত জবাব আসিল—যাও, যাও গাধা কোথাকার! একটা সোমত্ত মেয়ে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রিকালে দিগ্বিজয়ে বেরুতে নেই—এ কাণ্ডজ্ঞান তোমার আছে!

নিতাই আহত সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিল—"কি বল্লি চামার!"

যাহাকে বলা হইল সে ততক্ষণ দরজা বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এদিকে মৃত্যুবান আহত মুমূর্ষু নারী একেবারে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। আহা জগতে বেঁচে থাকাটা যখন তাহার কাছে একান্তই মিথ্যা হইয়া উঠিয়াছিল তখন সে যে মায়ের কোলে সান্ত্বনা খুঁজিতে আসিয়াছে। কিন্তু জগত তার মাথায় পা দিয়ে তাকে একেবারে ডুবাইয়া দিল, এ ব্যর্থতা যে কি তা যিনি উর্ণনাভের মত এই জগতের জাল বুনিয়া এর মাঝখানটীতে বসিয়া সুখ দুঃখের সকল তরঙ্গ হৃদয়ে গ্রহণ করিতেছেন, তিনিই টের পাইতেন।

"এখানে বসে থেকে ঐ চামারের দয়া ভিক্ষা করে, দয়া জিনিষটাকে আর অপমান করবো না। চল যেখানে হোক্ যাই।" এই বলিয়া নিতাই অরুণার মুখের পানে চাহিল। মাঠের ওধারের ঘন গাছের সারের মাথার ওপর দিয়া কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ উঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এক ঝলক আলো কোন হৃদয় হীন দেবতার নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত অরুণার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সেই আলোতে নিতাই তাহার মুখ দেখিতে পাইল। সে মুখে যেন দুঃখের আভাষ মাত্র ছিল না। অথচ কি যে ছিল তাহা সে না বুঝিতে পারিলেও ভয় পাইয়া গেল। তাহার জীবনে সে এমন মুখ একখানিও দেখে নাই।

—৬—

মাঠের অপর পাশে—একটী খরস্রোতা নদীর ধারে গিলবার্ট সাহেবের নীলকুঠি। প্রায় পনের বৎসর ইহা পরিত্যক্ত আছে। ঐ সাহেবের বেতের চোটে একটী চামার ছেলের ভব-যন্ত্রণা মোচন হইয়াছিল। সেই অবধি ইহার মধ্যে কিংবা এখানকার লোকের মনের মধ্যে ভূতের দৌরাত্ম আরম্ভ হয়। দিনের বেলাতেও কেহ ভয়ে ইহার নিকট দিয়া যাইত না, রাত্রিকালে বসিয়া ইহার কল্পনাও মনের মধ্যে আনিত না।

দিবাভীত রাত্রিচর বন্য জন্তুর মত নিতাই ও অরুণা যখন এই কুঠির ভিতর আসিয়া ঢুকিল তখন উষা দেবীর রক্ত কপোলের বিশ্বব্যাপী লজ্জারাশি পূর্ব্বাকাশটা ঢাকিয়া ফেলিয়া প্রভাতের সূচনা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে আকাশের আলোয়, নদীর জলে, তরুর শিরে, দু'পারের ঘন বন রেখার মাঝখানে একটী গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত পৃথিবী যেন আজ ইহাদের দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছে!

একজন রাখাল মাঠের মধ্য দিয়া প্রভাতী গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল, সহসা নীলকুঠির দরজার সম্মুখে দুটী লোক দেখিয়া খানিকক্ষণ অবাক হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল তারপর ভোঁ দৌড় দিল। নীল তৈরী করা খাদের ভিতর একটা শৃগাল ঢুকিয়াছিল—বেদখল হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যঃ পলায়তি স জীবতি এই পন্থার অনুসরণ করিল। গেট দিয়ে ঢুকেই সাম্নে আগাছায় আগাছায়

পরিপূর্ণ একটী ছোট বাগানের কঙ্কালসার মূর্ত্তি। কেবল খোয়া ফেলা রাস্তার দুই ধারে দুই সার ক্রোটন গাছ নিজেদের স্বভাব-সিদ্ধ সহিষ্ণুতার বলে তখনও পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিল। মাঝখানটায় একটা ভাঙ্গা পাথরের মূর্ত্তি উদ্যান স্বামীর সৌন্দর্য্য বোধ ও গ্রীক স্থাপত্যের জয় ঘোষনা করিতেছিল।

"মাগো, আমার যে আর একটুও বাঁচতে সাধ নেই মা" অত্যন্ত নিরাশার সহিত এই কয়টি কথা বলিয়া অরুণা ধপ্ করিয়া সামনের বারাণ্ডার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। তাহার চোখের দুই কোন বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিয়া বক্ষের বসন আর্দ্র করিয়া তুলিল। নিতাই একদৃষ্টে তাহার দুঃখ ও নৈরাশ্য ভরা সুন্দর অনাবৃত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা সান্ত্বনার কথা বলাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

রাত্রির কালো অন্ধকারের স্নিগ্ধ প্রলেপে যখন তাহার হৃদয়ের ক্ষত ঢাকা পড়িল না, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যখন অপরিসীম লজ্জা ও গ্লানির বোঝা তাহার দুঃখ ভারাক্রান্ত মস্তকের উপর চিরদিনের মত নামিয়া আসিল এবং সেটাকে ঝুঁকাইয়া একেবারে মাটিতে মিশাইয়া দিল, তখন হইতে সে আর মুখের উপর অবগুণ্ঠন টানে নাই। বোধ হয় সে প্রবৃত্তিই হয় নাই।

দূরে মাঠের মধ্যে একটা গোলমাল শুনা গেল। নিতাই ব্যস্ত ও শঙ্কিত হইয়া বলিল—"তুমি ঘরের ভিতর যাও। আমি বেরিয়ে দেখছি কি হ'ল।" অরুণা কম্পিতপদে টলিতে টলিতে কোন গতিকে সেই বহুদিন পরিত্যক্ত নীল কুঠীর একটা দুর্গন্ধময় অন্ধকার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

—৮—

সেই ভীতিসঙ্কুল নির্জ্জন বাড়ীটার ভিতর হইতে খোলা আলোয় মাঠের মধ্যে আসিয়া নিতাই যখন দাঁড়াইল তখন তাহার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। একি বিড়ম্বনার বোঝা তাহার কাঁধের উপর চাপিয়া বসিল। সেতো কাহারও কাছে কোনও অপরাধ করে নাই। বাহিরের লোক বিশ্বাস করিবে না বটে কিন্তু তাহার অন্তর্য্যামি তো জানেন তাহার মনে কোনও পাপ ছিল না। কিন্তু তবু সরল প্রকৃতি সহজ বিশ্বাসী নিরীহ পাড়াগেঁয়ে লোককে তাহা বুঝান কত শক্ত!—বিশেষতঃ যখন উহারা নিজেদের অন্ধকার অন্তরের ভিতর হইতে ভাল মন্দ মাপিবার সনাতন মাপ-কাঠিটী বাহির করিয়া বসিবে। তাহার অতীত জীবন, তা সে সুখেরই হউক বা দুঃখেরই হউক, যেন কোন অতলের মাঝখানে ডুবিয়া মরিয়াছে—একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপর তাহাকে খাড়া করিয়া দিয়া। এ জীবন সে বহন করিবে কি করিয়া? এ যে শুধু বোঝা। সে মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ত আর তাহার সেই পরিচিত জীবনের অভ্যস্ত ধারা-টুকুর মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। নিদারুণ অভিমানে তাহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়া যেন বুকের দেয়ালে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু ঐ নারী—ঐ যে নতমুখী অশ্রুভারাবনতা নারী, বুকভরা বেদনারাশি কোন্ অজানার পারে নিবেদন করিয়া দিতেছে, তাহার কথা সে ভাবিল কই! বিবেকের চাবুক খাইয়া তাহার হৃদয়বৃত্তি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—"আসুক দুঃখ, আসুক লজ্জা, সব সহ্য করব।"

একটী ছোট খাট ছেলের দল কলরব করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছিল। এখন তাহারা নিকটে আসিয়া পৌঁছিল, এবং নিতাইকে দেখিয়া একযোগে হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল—"এই যে নিতাই, বেশ ছেলে তুমি! কি কাণ্ড করেছ বল দেখি?" আর একজন দুঃসাহসী বলিয়া উঠিল—"তোমার বৌটি আমাদের দেখাতে হবে।" নিতাইয়ের চিরশত্রু হলধর টিটকারী দিয়া বলিল—"তোমাদের বরণ করবার জন্যে আমরা ঝাঁটা ও কুলো জোগাড় করেছি।" বলিয়া সকলে সমস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিতাই আর সহ্য করিতে পারিল না। শুদ্ধ মাত্র তাহাকে অপমান করিবার লোভেই যে তাহারা কেমন করিয়া বাতাসের মুখে খবর পাইয়া এত কষ্ট করিয়া দুই ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। ক্রোধে, ক্ষোভে তাহার চোখ মুখ দিয়া যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল। "পাজী, ছুঁচো, রাস্কেল সব—বেরো আমার সামনে থেকে। মড়ার উপর

খাঁড়ার ঘা দিতে এসেছ বেকুবগুলো—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার গতিক দেখিয়া বোধ হয় দয়া পরবশ হইয়াই আর কেহ কিছু বলিল না।"

গদাধর পণ্ডিতের ছেলে রাখাল ছোটবেলা থেকেই তাহার বিশেষ অনুগত ও স্নেহের পাত্র। সে এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এবার বলিল,—"নিতাইদা, বাড়ী চল।"

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল—সে হয়না রে, আমি আর বাড়ী যাব না।

কোথায় থাকবে তুমি?

যেখানে খুসী।

না চল তুমি। তোমাকে ত আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। তোমার ত জাত যায় নি।

ছেলেমানুষের কথা শুনিয়া নিতাই একটু ম্লান হাসি হাসিল। বলিল—তুই যা, জ্বালাতন করিস নে। আমি যেতে পারব না। বলিয়াই সে কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া কুঠির দিকে ফিরিয়া চলিল। সমবয়সীরা সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া একে একে প্রস্থান করিল।

—ছ—

"এখন আমি তোমাকে নিয়ে কি করবো?"—নিতান্ত অন্যমনে যেন তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে এই প্রশ্নটি নিতাইয়ের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। অরুণা চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। সত্যই ত! শুধু সে নয়, বিশ্ব চরাচরের তাবৎ পদার্থই যে আজ অরুণার মুখের উপর এই প্রশ্নই বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছে।

ঐ যে অনতিদূরে প্রবাহিতা নদী কল্ কল্ ছল্ ছল্ রবে বলিয়া গেল "তোমাকে নিয়ে কি করবো?" আকাশের আলো, বাতাস, বিশাল ধরিত্রীর বুক—সকলের মুখে ঐ এক কথা! কাহারও ত আর তাকে দরকার নাই। সে এখন একটি কক্ষ্যচ্যুত তারার মত বিশাল সৌর জগতের ভিতর বাহির যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলিয়া যাইতে পারে—কেবল স্বস্থানে ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া! আজ বৃথাই ধরণীর বক্ষ ভরিয়া রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের স্রোত চলিয়াছে—তাহার ত এসব কিছুই দরকার লাগিবে না। যে শিকড় দিয়া সে এ সমস্ত আকর্ষণ করিবে তাহা যে চিরকালের মত ছিন্ন হইয়াছে। শুধু একজন কেবল এই কথা বলিতে পারিত না সে তাহার মা! তাঁহার সেই স্নেহ শীতল বক্ষের ছায়ায় সে দুঃখ, গ্লানি, লজ্জা সমস্তই ভুলিতে পারিত—কিন্তু তাহা ত হইবার নহে।

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া সে বলিল 'আমিও সেই কথাই ভাবছি।'

হঠাৎ এরূপ একটা কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হওয়াতে নিতাই মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কথাটা যে তাহাকে কতখানি আঘাত করিয়াছে কসাইয়ের ছুরীর মত একেবারে মর্ম্মস্থানে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে—তাহা সে অনুভব করিতে পারিল। কিন্তু সে নিজে নাকি বড় জ্বালায় জ্বলিতেছিল তাই তাহার মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিলনা। বিশেষতঃ বন্ধু বান্ধবের বিদ্রূপের বিষে তাহার সর্ব্বাঙ্গের জ্বালা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। শিকারীর মত একবার যে বান তূণ হইতে বাহির করিয়াছে তাহা আর ফিরাইতে পারিল না। দুশ্চিন্তার ভূত আবার তাহার ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিল। দুই চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া সে সম্মুখে উপবিষ্টা হতবাক ভাগ্যহীনা নারীকে বিদ্ধ করিয়া সহসা অতি নির্লজ্জের ন্যায় বলিয়া বসিল—"কিন্তু তোমাকে খাওয়াব কি করে?" তাহার এই অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ বাস্তব সমস্যার সমাধান যে কি করিয়া ঘটিয়া উঠিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে সত্য সত্যই হিংস্র পশুর মত ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে দহ্যমানা জরাতুরা বসুন্ধরার পানে ক্লান্ত উদাস দৃষ্টি মেলিয়া অরুণা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের অপর পারের তরুশ্রেণীর দিকে চাহিয়াছিল। সে দৃষ্টিতে আশা, ভয়, দুঃখ কিম্বা নিরাশার কোন চিহ্নই ছিল না। অনুতাপে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইল না কিংবা চক্ষে জল আসিল না। নিশ্চল পাথরে গড়া মূর্ত্তির মত সে এই মর্ম্মান্তিক অভিযোগ শ্রবণ করিল। তারপর ধীরে ধীরে এক হাত দিয়া অপর হাতের এক গাছি সোণার বালা খুলিয়া ফেলিল। সেটা ঠক্ করিয়া পাথরের মেজের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইবার সময় নিতাইয়ের দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দিয়া গেল। নিতাই এতক্ষণে যেন অকূলে কূল পাইল এবং

ধ্যানভাবে সেটা কুড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল 'আমি চলুম, তোমার ভয় করবে না ত ?'

অরুণা প্রত্যুত্তরে ঘাড়টা একবার নাড়িল।

—ঙ—

দুইজনের উপযুক্ত আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অবসন্ন পদে ফিরিয়া আসিয়া নিতাই দেখিল কোথাও কেহ নাই। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল সেইখানে সেই হৃদয়হীন পাষাণ প্রাচীরের গায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরে। "অরুণা! অরুণা!"—তাহার আর্ত্ত কণ্ঠের উচ্চ আহ্বান সেই জনহীন বাড়ীটার সমস্ত কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া অবশেষে তাহারই হতাশ্বাস হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিতে লাগিল, যে গিয়াছে সে আর ফিরিবে না, সে তোমাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছে। হায়! একি মুক্তি। এ যে বন্ধনের চেয়ে শত গুণ ভীষণ।

সম্মুখবর্ত্তী পথ তাহাকে ইসারায় ডাকিল, যেন বলিল—"এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পার।" কিন্তু সে ফিরিল না। সে ভাবিতে লাগিল এ অপরাধের বোঝা কিরূপে সমস্ত জীবন ধরিয়া বহন করিব? কিন্তু সে দুষিবে কাহাকে? তাহার নিজেরই যে সব দোষ! নিজের হৃদয়হীণ পাষণ্ডের মত কথাগুলো মনে উঠিয়া অনুশোচনার আগুণে তাহাকে পুড়াইয়া মারিতে লাগিল।

হঠাৎ কি মনে করিয়া সে নদীতীরে ছুটিয়া গেল। সঙ্গের জিনিষপত্র সমস্তই নদী জলে নিক্ষেপ করিল। সে যদি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া এই নদীর জলেই তাহার শেষ আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়া থাকে। হা ভগবান যে চলিয়া গেল সে আর একজনকে কেন এমন ভাবে অপরাধী করিয়া গেল! তাহার দুইচক্ষু ছাপাইয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা বালুকাময় সৈকত ভূমিতে ঝরিয়া পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

তারপর সেখান হইতে ফিরিয়া সে সমস্ত দিনটা অদূরবর্ত্তী শ্মশান মধ্যস্থ একটা বটগাছের তলায় বসিয়া কাটাইয়া দিল। সন্ধ্যা হইলে সেখান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে একদিকে চলিয়া গেল। আর কখনও গ্রামে ফিরিয়া আসিল না।

প্রার্থনা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ

দ্বিতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]   ২১শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩২ ।   [৫০শ সপ্তাহ

বিংশ শতাব্দীর যুক্তরাষ্ট্র

বিংশ শতাব্দীর মহাসমরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে যোগদান করেন নাই। ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের স্বার্থ-সংঘাতে মহাসমর বাধিয়াছিল সুতরাং তাহার সহিত আমেরিকার বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করার পর হইতেই ইউরোপের প্রতি উদাসীন ছিল। ইংরাজজাতীয় হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা তখন ইংরাজের যুদ্ধসমূহে যোগ দিত না। তাঁহারা বলিতেন যে আমেরিকা স্বতন্ত্র মহাদেশ—তাহার স্বার্থ ইউরোপের স্বার্থ হইতে বিভিন্ন। আর ছয়হাজার মাইল দূরে থাকিয়া আমেরিকার পক্ষে ইউরোপে যুদ্ধ করাও সহজসাধ্য ছিল না। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মন্‌রো নামে সুপ্রসিদ্ধ একজন রাজনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ঘোষণা করেন যে আমেরিকা ইউরোপের কোনপ্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহের সহিতই সংশ্রব রাখিবে না—তবে যদি ইউরোপের কোন শক্তি নিজে হইতে আসিয়া আমেরিকায় অধিকার বা প্রভাব বিস্তার করিতে চায়, তাহা হইলে অবশ্যই আমেরিকা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। সেই সময় হইতেই যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের নায়করূপে পরিগণিত হইত।

মহাসমরের সময় নানা কারণে আমেরিকাকে তাহার পূর্ব্বতন নীতি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা সম্বন্ধে দুইটা দল ছিল। একদল ব্রিটিশ প্রভৃতি মিত্রশক্তিদের সহিত যোগ দিয়া জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিবার পক্ষপাতী ছিল—কিন্তু অপর দল আমেরিকার চিরন্তন উদাসীনতা এক্ষেত্রেও রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই শেষোক্ত দলে অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা জাতিতে জার্ম্মাণ। আমেরিকায় প্রথমে ইংরাজগণ আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহার দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল। আর সকল জাতি

সাহসী লোকেরাই নূতন মহাদেশে সৌভাগ্য লাভের আশায় আগমন করিত। সেখানে যে পাঁচ বৎসর কাল বাস করিয়া অধিবাসী শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিত, সেই হইতে পারিত। এইরূপ সেখানে বহু জার্ম্মাণ ও আইরিশ জাতীয় লোক বাস করিত। যাহারা জাতিতে জার্ম্মাণ তাহারা যে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আমেরিকার অভিযান করা পছন্দ করিবে না ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আইরিশ জাতীয়

থিওডর রুসভেল্ট

আমেরিকার অধিবাসীগণ কিন্তু অন্য কারণে যুদ্ধে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ইংলণ্ড যুগে যুগে আয়ারল্যাণ্ডের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীনতার প্রয়াসী হইয়াছিল। মহাযুদ্ধে ইংরাজ যখন বিব্রত থাকিবে, তখন তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিবে ইহাই ছিল আইরিশগণের আকাঙ্খা। আমেরিকা ইংরাজের পক্ষভুক্ত হইলে, ইংলণ্ড আর বিপন্ন রহিবে না, সুতরাং আয়ারল্যাণ্ডের অভীষ্ট লাভের পক্ষে বাধা পড়িবে মনে করিয়া আইরিশগণ আমেরিকাকে যুদ্ধে যোগদান করিতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। অপর দলে যুদ্ধে যোগ দিবার পক্ষে ছিল আমেরিকার রুশপোল বোহেমীয় ও শ্লাভ জাতীয় লোকেরা। এইরূপ মতভেদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে নাই। যখন ইউরোপের প্রায় সমগ্র দেশ যুদ্ধের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছিল, আমেরিকার অধিবাসীগণ তখন শান্তিতে বাস করিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় পূর্ব্বক লাভবান হইতেছিলেন।

এইরূপ সময়ে তৎকালীন সভাপতি রুশোভেল্ট বলিলেন জার্ম্মাণীর এই যে যুদ্ধোদ্যম ইহা কেবল সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য। সমগ্র পৃথিবী জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্যভুক্ত হউক ইহাই তাহার দুরাকাঙ্খা। আর সাম্রাজ্য বর্দ্ধিত হইলে গণতন্ত্রের সমূহ বিপদ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রধান গণতন্ত্র। সুতরাং জার্ম্মাণী জয়লাভ করিলে আমেরিকার গণতন্ত্রের স্বাধীনতাও হ্রাস পাইবে। এই কথা শুনিয়া যুক্তরাষ্ট্রবাসীগণ যুদ্ধে যোগ দিবার পক্ষপাতী হইলেন। এই সময়ে জার্ম্মাণগণ যেরূপ বর্ব্বরতার সহিত বেলজিয়ম ধ্বংস করিতেছিলেন, তাহাতে আমেরিকা সত্যই বড় বিচলিত হইয়াছিল। তারপর যখন জার্ম্মাণী সর্ব্বান্ধ হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের অবাধ গতিকেও সংরুদ্ধ করিল, তখন আমেরিকার আর ক্রোধের সীমা রহিল না। যখন জার্ম্মাণী লুসেটোনিয়া জাহাজ নিমগ্ন করিল, তখন আমেরিকা প্রকাশ্যভাবে মহাসমরে অবতীর্ণ হইলেন। (১৯১৭ খৃষ্টাব্দ)

প্রথমে কিন্তু আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধ চালান সহজ ব্যাপার হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব সৈনিক ছিল মাত্র একলক্ষ। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই তথাকার জনসাধারণ দলে দলে সৈনিক দলে ভর্ত্তি হইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যখন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ইউরোপের সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন, তখন জার্ম্মাণী সমূহ বিপদ গণিতে লাগিল। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় মিত্রশক্তি জার্ম্মাণীকে আরও বেশী হটাইয়া দিতে লাগিলেন। যখন জার্ম্মাণী বুঝিতে পারিল যে তাহার পরাজয় নিশ্চিত, তখন যাহাতে ভাল সর্ত্তে সন্ধি করা যায় তাহার জন্য জার্ম্মাণী যুক্তরাষ্ট্রেরই দ্বারস্থ হইল। যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন সভাপতি উড্রো উইলসন অতি মহান হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেখিলেন এই মহাযুদ্ধের যজ্ঞাহুতিতে শত সহস্র লোকের জীবন প্রত্যহ বিসর্জ্জন দেওয়া হইতেছে। সুতরাং ইহার অবসান যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। তিনি

সকল শক্তিকে আরও বলিলেন যে এইবার হইতে এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে যে, পৃথিবীতে আর কখনও যেন মহাযুদ্ধের আবির্ভাব না হয়। তিনি তখন পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের নায়ক—তারপর তিনি আবার

উড্রো উইলসন।

নিজের দেশের জন্য কোন স্বার্থ খুজিতেছেন না। সুতরাং তাঁহার কথা কোন শক্তিই অগ্রাহ্য করিতেন না। সন্ধি ব্যাপারে তিনি একরূপ মধ্যস্থ হইয়াই যুদ্ধের অবসানে মিটমাট করিয়া দিলেন।

যে মহাত্মার প্রচেষ্টায় প্রধানতঃ যুদ্ধের অবসান হইল, সেই উড্রো উইলসনের জীবনী বড় আশ্চর্য্যজনক। তিনি প্রথমে অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়া তিনি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এতাদৃশ প্রবাবশালী হইয়াছিলেন যে, তথাকার সভাপতিরূপে তিনি নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত দুই একখানি বই আমাদের দেশে বি-এ, ও এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত আছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউজার্সি-ষ্টেটের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হয়েন। যেমন শিক্ষা বিভাগে তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তাহার ফলে পর বৎসর তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নায়কের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মিসেস্ এন্, গাল্ট নাম্নী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি পুনরায় সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভার্সেলিসের সন্ধি ব্যাপারে তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে যুদ্ধকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য তিনি লীগ্ অফ নেশন স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাবে অন্যান্য দেশ রাজী হইল বটে, কিন্তু তাঁহার স্বদেশই ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। তাহাতে উড্রো উইলসন বড়ই অপদস্থ হইলেন। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে তাঁহার দেশের মত লইতে পারেন নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট নামক মহাসভা সন্ধিপত্রে আমেরিকার অসম্মতি জানাইলেন। সম্প্রতি সভাপতি উড্রো উইলসন্ পরলোক গমন করিয়াছেন। আজও আমেরিকা লীগ অফ নেশনে যোগ দেয় নাই।

মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার ধনবল ও সামরিক শক্তি অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকার তুল্য ধনীদেশ এখন আর পৃথিবীতে নাই। যুদ্ধের পর আমেরিকায় বিশ সহস্র কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর অর্দ্ধেক হীরক আমেরিকার কুক্ষিগত। জগতে যত সোণা আছে তাহার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগের অধিকারী আমেরিকা। পেনসেলভেনিয়া নামক রাষ্ট্রে প্রতি কুড়িজন লোক পিছু একখানি করিয়া মোটর গাড়ী আছে। আর নিউইয়র্ক মহানগরীতে ষাট লক্ষ লোকের জন্য এক লক্ষ মোটর গাড়ী আছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ সে দেশ কতদূর সমৃদ্ধ হইয়াছে। ওয়াশিংটন কনফারেন্সের পর আমেরিক জাপান ও ইংলণ্ডের সহিত সমান নৌবল রাখিবার অধিকারী হইয়াছে। ফলতঃ বিগত যুদ্ধে আমেরিকা ও জাপান যেরূপ লাভবান হইয়াছে, এরূপ আর অন্য কোন জাতি হয় নাই।

বিংশ শতাব্দীতে অন্য একটি বিষয়েও আমেরিকার নীতি

পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমেরিকা কখনও সাম্রাজ্য লাভের বা বিস্তারের চেষ্টা করে নাই। কিন্তু এখন ঘটনা-চক্রে বাধ্য হইয়া তাহাকে উহা করিতে হইতেছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি দেশ আমেরিকার করতলগত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল দেশ যাহাতে সত্বর উন্নতি লাভ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনে সমর্থ হয়, তজ্জন্য আমেরিকানগণ চেষ্টা পাইতেছেন। ফিলিপাইনে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য তাঁহারা অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন। সেখানকার শাসন কার্য্য যতদূর সম্ভব সেই দেশের লোকের দ্বারাই নিষ্পন্ন করিতেছেন। কিন্তু রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া আমেরিকার নানা রকম ঝঞ্ঝাট বাড়িয়াছে। ঐ সকল দেশ রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে বহু সৈন্য ও রণতরী রাখিতে হইতেছে। আর বাধ্য হইয়া ইংরাজের সহিত ও ভাব করিয়া চলিতে হইতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে কেন ঐ নামে অভিহিত করা হয় জান? কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশকে একসঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উহার নাম যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমে মাত্র তেরটি রাষ্ট্র একীভূত হইয়া যুক্ত রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। কিন্তু দিন দিন যখন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল যখন সে সমগ্র আমেরিকার নেতৃস্বরূপ হইল, তখন অন্যান্য বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রও তাহার সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিল। এক্ষণে সর্ব্বসমেত ৪৮টি রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ঐ আটচল্লিশটী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেকটিরই অনেক পরিমানে স্বাধীনতা আছে। তাহারা অনেক বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছামত আইন তৈয়ারী করিতে পারে—ইচ্ছামত কর নির্দ্ধারণ করিতে পারে। প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সভা ও শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। যুক্তভাবে সকল আমেরিকার বৈদেশিক সম্বন্ধ চালাইয়া থাকে। সুতরাং কোন প্রদেশ নিজের ইচ্ছামত যুদ্ধবিগ্রহ বা সন্ধি করিতে পারে না। সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্য নৌ ও সৈন্যবল একত্র করিয়া রক্ষা করা হয়। তজ্জন্য প্রত্যেক প্রদেশকে অর্থ দিতে হয়। কিরূপ মুদ্রার প্রচলন হইবে, কিরূপ ওজন দেশে চলিবে, এ সব বিষয়েও সকলে এক হইয়া কাজ করেন।

একত্রে কাজ করিবার জন্য ওয়াশিংটন নামক মহানগরীতে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি বাস করেন! তিনি প্রত্যেক প্রদেশের ভোট লইয়া নির্ব্বাচিত হয়েন। যে ব্যাধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রদেশের ভোট সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনিই সভাপতি পদে বৃত হয়েন। প্রত্যেক সভাপতি চারি বৎসর কাল কার্য্য করেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইলে বা অন্য কোন কারণে তিনি রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে সহকারী সেনাপতি তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আমেরিকার সভাপতির ক্ষমতা অনেক স্বাধীন রাজ্যের নৃপতির শক্তি অপেক্ষা অধিক। তিনি নিজের ইচ্ছামত সেক্রেটারী বা বিভাগীয় কার্য্যাধ্যক্ষকে নিয়োগ করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে যেমন মন্ত্রীসভা হাউস অফ কমন্স নামক ব্যবস্থা পরিষদের অধীন, আমেরিকায় তাহা নহে। মন্ত্রীগণ সম্পূর্ণরূপে সভাপতির অধীন। সভাপতি ইচ্ছা করিলে কোন প্রকার কারণ প্রদর্শন না করিয়া যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার কোন কার্য্যের জন্য ব্যবস্থা পরিষদে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। যদি ব্যবস্থা পরিষদ তাঁহার কোন কার্য্য পছন্দ না করেন তবে তাঁহারা সে কার্য্যের জন্য অর্থ মঞ্জুর না করিতে পারেন। সভাপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতনের ব্যবস্থা আছে! তাঁহার কার্য্য কেহ পছন্দ করুন বা না করুন তিনি সে বেতন পাইবেনই। সুতরাং তিনি অনেক বিষয়ে স্বাধীন। তিনি যদি কোন গর্হিত আচরণ করেন তবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান বিচারালয় তিনি অভিযুক্ত হয়েন। ইংলণ্ডে যেমন শাসন পরিষদ্, ব্যবস্থা-পরিষদ্ ও কতক পরিমাণে বিচার বিভাগ আঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, আমেরিকায় সেরূপ নহে। সেখানে তিনটী বিভাগই স্ব স্ব ভাবে স্বাধীন। সভাপতি যদি ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত কোন আইন অপছন্দ করেন, তবে তাহাকে আইন বলিয়া পাশ করান বড় কঠিন হইয়া পড়ে। দুইটি মহাসভায় দু'তিন অংশ সভ্যের একমত হইলে ঐ আইন সভাপতির আপত্তি সত্ত্বেও মঞ্জুর হইয়া যায়। সভাপতি যদি স্বাধীনচেতা শক্তিশালী ব্যক্তি হয়েন, তবে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনে যথেষ্ট কর্তৃত্ব করিতে পারেন। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষমতাই সভাপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে। তিনি নৌবহর ও

রণক্ষেত্রে সৈন্যগণের গতিবিধি পরিচালিত হয়। মহামতি ব্রাইস বলিয়াছেন যে শান্তির সময়ে সভাপতি যেন একটি বড় সওদাগরী আফিসের প্রধান কেরাণী; কিন্তু যুদ্ধের সময় তিনিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু।

রাজ্যের সভাপতি হওয়াই অনেকের জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা থাকে। এতটা ক্ষমতালাভ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সেই জন্য যখন সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন, তখন নির্ব্বাচনে একজন জয়ী হয়েন, অমনি সমগ্র জাতি তাঁহার অধিকার মাথা পাতিয়া লয়।

ওয়াশিংটনে দুইটী মহাসভা ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করিবার জন্য বর্ত্তমান আছে। প্রথমটীর নাম House of Representative বা প্রতিনিধি সভা। ইহাতে লোক সংখ্যার অনুপাতে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন। ইংলণ্ডে যেমন হাউস অব্ কমন্সের প্রতিনিধি সভাই সর্ব্বেসর্ব্বা
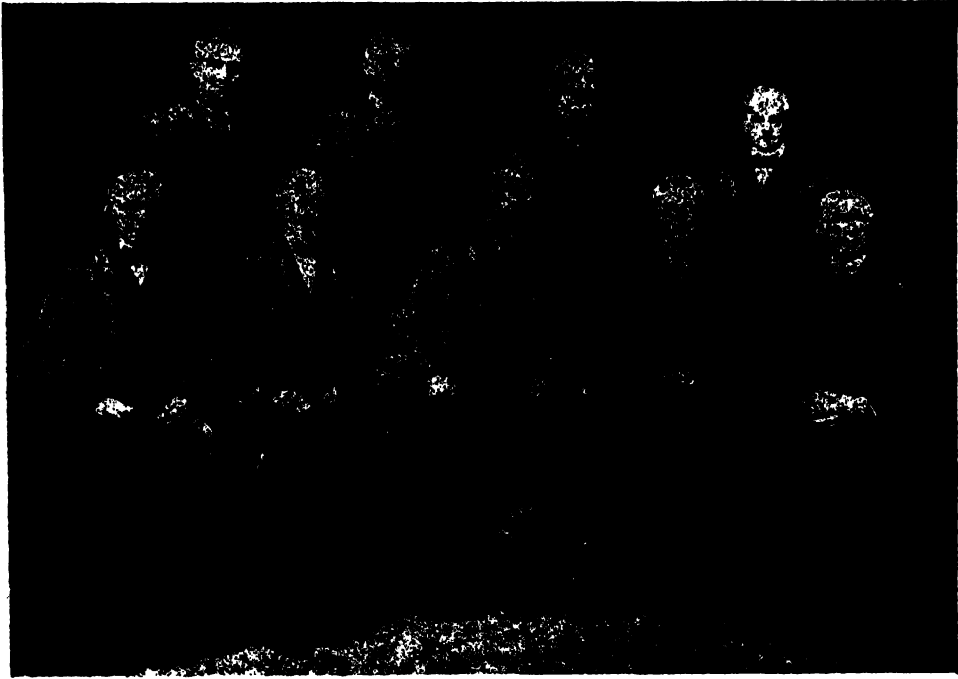
প্রধান বিচারালয়ে নয়জন বিচারপতি! ইঁহাদের ক্ষমতা অসীম। অদ্যাবধি ইঁহাদের পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

চারিমাস কাল ধরিয়া সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক মহা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়! চারিদিকে বক্তৃতা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি হইতে থাকে। অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিতরিত হয়। নির্ব্বাচন প্রার্থীরা শত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। তখন চারিদিকে যেন উৎসবের ঘটা পড়িয়া যায়। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এক প্রার্থী অন্য প্রার্থীর নানারূপ দোষ দেখাইয়া দেন—বহু নিন্দা গ্লানি দেখা যায়। কিন্তু সেই আমেরিকায় তাহা নহে। সম্প্রতি তথাকার সিনেট নামক অপর মহাসভাই অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। সিনেট মহাসভা প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া গঠিত! সিনেট যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করেন। সেখানে অল্পসংখ্যক সভ্য কাজেই সকল বিষয় ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সুবিধা আছে। অনেক বিষয়ে সভাপতিকে সিনেটের পরামর্শ লইয়া কাজ চালাইতে হয়?

আমেরিকার বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিচারকগণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভিভাবক স্বরূপ। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, সভাপতি বা কোন মন্ত্রী তাহার বিরুদ্ধে যাইলে, তিনি বিচারপতিগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতন আছে এবং তাঁহাদিগকে কেহ কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিতে পারেন না।

প্রত্যেক প্রদেশে আবার এই রকম দুইটা করিয়া ব্যবস্থা পরিষদ আছে ও সভাপতি স্বরূপে শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হয়েন। যাঁহারা কোন প্রদেশে শাসন কর্ত্তার কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারাই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি-পদে বৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করা হয়।

আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় দলের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল। বর্ত্তমানে দুইটা দল আছে—ডিমোক্রেটিক্ ও রিপাবলিকান্। এই দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক মতামতের এখন আর বিশেষ পার্থক্য নাই। একজন লেখক বলিয়াছেন যে আমেরিকার দুইটা দল যেন লেবেল আঁটা দুইটা শূন্য বোতল—তাহার মধ্যে যে কোন জিনিষই পুরিয়া দাও লেবেল সমানই থাকে। দুই দলই নিজেদের দলগত স্বার্থ খোঁজে। প্রত্যেক গ্রামে, ও নগরে ও প্রদেশে উভয় দলের শাখা ও কেন্দ্র আছে। প্রধান প্রধান নগরে এক একজন দলপতি বা বস্ থাকেন। তিনিই দলের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার ক্ষমতা অসীম। কোন চাকুরী কে পাইবে, দলের অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হইবে তাহা তিনিই স্থির করিয়া দেন। তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিলে, কেহ আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে পারেন না। এই বস্ সকল প্রকার জালজুয়াচুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া নিজের দলের ক্ষমতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। যদি কোন নগরের মিউনিসিপ্যালিটীতে তাঁহার দলের লোক অধিকসংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন তবে মিউনিসি-প্যালিটীর সমস্ত কণ্ট্রাক্ট ও পদ তাঁহারই হাতে আসে। তাঁহার কাজে অনেক ঘুস লইতে ও দিতে হয়। সে লোকটি মিউনিসিপ্যালিটির আলো জালিয়া বা ড্রেণ পরিষ্কার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে চায়, তাহাকেও বসকে খোসামোদ করিয়া চলিতে হয়। বসেরা যে উচ্চশ্রেণীর জীব নহে তাহা বেশ বুঝা যায়।

এইরূপ লোককে খোসামুদ করিয়া কোন প্রতিভাশীল আত্মসম্মানজ্ঞান বিশিষ্ট—ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসিতে চাহেন না। আমাদের দেশে বা ইংলণ্ডে রাজনৈতিকগণ যেমন সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী আমেরিকার তাহা নহে। সেখানে রাজনৈতিকগণ অতি সাধারণ শ্রেণীর লোক। সেজন্য ও উচ্চতম ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি রাজনীতিতে যোগ দেন না। তদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা বাণিজ্যের এতদূর প্রসার অর্থ ও যশঃ উপার্জ্জন করিবার এত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে যে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতে খুব কম লোকই রাজী হয়েন। সেখানে ব্যবসা করিয়া শত শত লোক কোটিপতি হইয়াছেন।

আমেরিকার প্রদেশগুলিতে বিচার প্রথা বড়ই শিথিল। অনেকে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াও বিনা বিচারে মুক্তিলাভ করে। এটি আমেরিকার গণতন্ত্রের একটি বিশেষ কলঙ্ক।

আমেরিকাতে সাধারণের মত লইয়া যতটা কাজ করা হয় এরূপ আর অন্য কোন দেশে না। সেখানে সংবাদ পত্র একটি প্রধান রাজনৈতিকগণ অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র। গণতন্ত্রের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে এই যুক্তরাষ্ট্রে। হয়তো এখনো তাহার অনেক দোষ ত্রুটী আছে কিন্তু মানবের স্বাধীনতার যে মহান্ আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র দেখাইয়াছে, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ না হইয়া পারি না।

আমেরিকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে অসাধারণ চেষ্টা হইতেছে, তাহার ফলে আমেরিকাবাসী যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছে, এরূপ আর পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লোক হয় নাই। আমাদের দেশে শতকরা মাত্র ৫জন লোক লেখাপড়া জানে আর ওদের দেশে ইহার ঠিক উল্টা—সেখানে শতকরা ৫ জনেরও কম লোক অশিক্ষিত। রাষ্ট্র হইতে বিশ্ববিদ্যালয় গুলির অধিকাংশ খরচ নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তো আছেই, তাহার অপেক্ষা বেশীও কোন কোন প্রদেশে আছে। কিন্তু রাষ্ট্র হইতে টাকা দেওয়া হয় বলিয়া, রাজনৈতিকগণের খেয়ালমত যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় তাহা নহে। বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত কর্ত্তৃত্বতায় অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণের উপর ন্যস্ত। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর জ্ঞাতব্য অধিকাংশ

বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮টী প্রদেশে ১৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ সেথানকার লোকে বিদ্যার প্রতি কি আদর দেখাইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলির মধ্যে জনহপাকিন্স ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করা হইয়া থাকে। আমেরিকায় সেরূপ নহে। সেখানে ধর্ম্ম বিষয়ে রাষ্ট্র উদাসীন। কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য যে কিছু কম তাহা নহে। তথাকার প্রথম অধিবাসীরা ছিলেন পিউরিটান্ অর্থাৎ তাঁহারা ভোগবাসনা পরিত্যাগ

আমেরিকায় মদ খাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি কেনে মদ পাওয়া যায় তবে রাজপুরুষেরা এমনি ভাবে সাধারণ ড্রেণে ফেলিয়া দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ইংলণ্ডে যেমন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হইতে একটি বিশেষ

পূর্ব্বক ঈশ্বরে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ব্যাপারে পুরোহিতের মধ্যস্থতার বা অনুষ্ঠানের বাহুল্যের

প্রয়োজন আছে একথা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু এখন আর আমেরিকার কেহই পিউরিটান মতাবলম্বী নহেন। ভোগৈশ্বর্য্যে আমেরিকা যেন আজ ইন্দ্রের অমরাবতী। সেই বিপুল ভোগায়তনের মধ্যে বাস করিয়াও কেহ কেহ ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। তোমরা সকলেই জান আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আমেরিকার কত নরনারী সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমেরিকায় আজকাল বহুদেশের বহু জাতির লোক যাইয়া বাস করিতেছে—সুতরাং তথায় তাহাদের বহু ধর্ম্মমতও রহিয়াছে। ক্যাথলিক প্রোটেষ্টাণ্ট, গ্রীক চার্চ্চ একসঙ্গে রহিয়াছে—অথচ কেহ কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করে না। আবার নূতন মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ও সেখানে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; অধুনা বঙ্গদেশে মেথডিষ্ট অনেক প্রচারক আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন।

আমেরিকা আজ সকল বিষয়েই উন্নত। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মদ বিক্রয় হয়—এবং মাদক দ্রব্যের আয় হইতে রাজ্য লাভবান হয়। কিন্তু আমেরিকার শিক্ষিত অধিবাসীগণ স্থির করিয়াছেন যে লোককে মদ খাইবার উৎসাহ দিয়া সেই টাকা দিয়া তাহাদের অন্য উপকার করা উচিত নহে। তাই জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সাহসী হইয়া আমেরিকা মদ্য বিক্রয় নিবারণ করিয়া দিয়াছে। ইহার সহিত যে ছবি দেওয়া গেল তাহাতে দেখা যায় কিরূপে রাজকর্ম্মচারীগণ শত সহস্র মুদ্রার মদ্য ফেলিয়া দিতেছেন। এরূপ আদর্শ যদি সকলে অনুসরণ করেন, তবে পৃথিবীতে নিশ্চয়ই দুঃখের ভার অনেক কমিয়া যায়।

আমেরিকার নারীদের মধ্যে অপূর্ব্ব স্বাধীন চিত্তবৃত্তি দেখা দিয়াছে। তাঁহারা অনেকেই পুরুষের কোনরূপ সাহায্য না লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস নারী আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেই, পুরুষের অধীনতা পাশ হইতে তাঁহারা মুক্ত হইতে পারিবেন। আমেরিকাতেই জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে নারীকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

শিক্ষা স্বাস্থ্যে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। নূতন মহাদেশ হইলেও সে আজ প্রাচীন মহাদেশকে শিক্ষা দিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে।

বাক্যবীর

[শ্রীসরোজবালা বসু]

পানিয়াকোলা জায়গাটি মধুপুরের মধ্যে বেশ সুন্দর, দুধারেই বাগান বাড়ী, মাঝখানের লাল কাঁকরের রাস্তা বলাইবাবু রোড নামটি কপালে এঁকে নিয়ে ক্রমেই ঢালু হয়ে নেমেছে, স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, তবে দিনের বেলা পথে মানুষের যাতায়াত আছেই, বাবুরা সহরে যাঁরা হাওয়া খেতে এসেছেন তাঁরা ছাড়া গেঁয়ো লোক চলছেই কিন্তু রাত্রি আটটার পর সে পথে লোক হাঁটে কচিৎ—তারপর যাম ঘোষের দল প্রহর ঘোষণা করবার পর থেকে পথ একেবারে নির্জ্জন হয়ে গিয়ে ভীষণ রকম থম্‌থমে ভাব ধারণ করে—কেতকী একদিন সন্ধ্যার পর তাদের বাঙলার জান্‌লা থেকে রাস্তায় উঁকি দিয়েই দুড়দুড় করে পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে চঞ্চলাকে ঠেলা দিয়ে বলে উঠ্‌ল—সেজ দি, ভূত। চঞ্চলা পানের খিলি মুখে ভরে কৌটা থেকে জর্দ্দা বার করে মুখে দিতে যাচ্ছিল, স্থগিত রেখে জিজ্ঞেস করলো—ভূত কি লো? কেতকী বল্লে—আহা জান না যেন, রাত্তিরে যা দেখা দেয়—

কেতকীর দাদা রসিক তাসের ম্যাজিক করবার জন্যে তাস সাজাচ্ছিল, সে বলে উঠ্‌ল—তোর মুণ্ডু কেতকী—কোন্‌খানে দেখেছিস্। সঞ্জয় কেতকীর চাইতে এক বছরের ছোট হয়েও কেতকীর অপেক্ষা বল, বুদ্ধি, সাহস সবেরই বেশী রকম অধিকারের গর্ব্ব রাখত, সে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—কই কোথায়, দেখাও দেখি।

চঞ্চলা জর্দ্দা টুকু মুখে ভরে সঞ্জয়ের হাত ধরে বললে—তোর জামাই বাবুর মতো ফাঁকা সাহস দেখাতে যাস্‌নি ভাই, রাত্রে বাইরে উঠ্‌তে দরকার হ'লে তখন ঘর শুদ্ধো লোকের ঘুম ভাঙ্গাবি।

সঞ্জয় কলকাতা সহরে রাত্রে একাই দরকার হ'লে উঠ্‌ত, কিন্তু এই বিদেশ বিভূঁয়ে রাত্রে একলা বেরুতে তার কেন বড়দেরও সাহসে কুলুতো না বিশেষ করে এদেশে চোরের ভয় ছিল খুব বেশী, তবে কেতকীর ভয়ের সামনে নিজের সাহসকে প্রচার করবার সুযোগটুকু সে ছাড়তে পারলে না; তাই এক দৌড়ে কেতকীর সঙ্গে ও ঘরে গিয়ে কেতকীর নির্দ্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে দেখেই হেসে বলে উঠ্‌ল, ও সর্ব্বনাশ—ও হচ্ছে গাছের ডাল, জড়াজড়ি করে রয়েছে, রোজ-ভিলা থেকে আলো এসে ওর উপর পড়েচে বলে ঐ রকম দেখাচ্ছে—তারপর সে বিজয়ী বীরের মতো সেজ দিদি প্রভৃতির সম্মুখে এসে তার আবিষ্কার কাহিনী খুব উৎসাহের সহিতই প্রকাশ করলে যদিও শ্রোতারা এদিকে মোটেই মন দিলে না, অগত্যা সে তখন শ্রান্ত হ'য়ে তক্তপোষের এক পাশে বসে শুনতে লাগ্‌ল বোনটি বলচে—তা তুমি যাই বল সেজ দি, চাটুর্য্যে মশাইএর চাইতে আমাদের সাহস ঢের বেশী—মুখে ওর তুব্‌ড়ী চলে বটে কিন্তু ভেতরে সব ভূয়ো—অমন ভীতু দুনিয়ায় আর দুটি নেই। এই সময় মাধুরী মণ্টির বউ দিদি এসে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সে চঞ্চলার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে—তা যা বলেচে ঠাকুর ঝি—মনে আছে সে বারে কলকাতার কথা—আমি তখন কনে বউ—ছুটে ঘোমটা দিয়ে পালিয়ে গেলাম আর ঠাকুর জামাই কোই হায়, কোই হায় করে সে কি চীৎকার—বউদিদির কথা শেষ হতে না হ'তেই কেতকী মণ্টি আর সঞ্জয় খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল—তারপর চঞ্চলা হাসি দমন কোরে ভুরু কুঁচ্‌কে বলে উঠ্‌ল—দ্যাখ্ বউ, তুই আমার চাইতে বয়েসে ছোটো, মান্যে না হয় একটু বড়ই আছিস্—আমার বরের চাইতে তো অনেকই ছোটো—সুতরাং একে বয়োজ্যেষ্ঠর নিন্দা তাও আবার তারই স্ত্রীর সাম্‌নে—এতে তোর মহাপাতক হচ্ছে তা বুঝিস!

মাধুরী খিল খিল করে হেসে উঠেই জোড় হাত করে বললে—দোহাই ঠাকুর ঝি, তুমি যেন তা বলে পতিনিন্দা শুনে এক্ষুণি দেহত্যাগ কোরো না তা হলেই সর্ব্বনাশ।

চঞ্চলা রাগের ভাণ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে দেহত্যাগ না করি গৃহত্যাগ করতে চাই।

মাধুরী কিছু বল্বার আগেই সঞ্জয় চট্ করে বেরুবার দরোজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—সে হবে না সেজ দি, ম্যাজিক না দেখে যেতে পাচ্ছ না, রসিক দা, ম্যাজিক সুরু কর না শিগ্‌গীর।

রসিক বলে উঠ্‌ল—তা কর্‌চি, তবে তার আগে গাঙ্গুলী মশায়ের সেবারের হাসির কথাটা একবার বলে নিই—চঞ্চলা, তুই ভাই গৃহত্যাগ তো কর্‌বিই সেটা দুবার ক'রে না করে একবার করলেই ভালো, আমার এই গল্পটা আগে শুনে নে—সেই যে বারে তোরা সব থিয়েটার দেখ্‌তে চলে গেলি, আমি আর গাঙ্গুলী বাড়ী রইলাম হঠাৎ ঘুমের ঘোরে গাঙ্গুলীর ডাক শুনে উঠে বসে ভয় পেয়ে গেলাম, এক ঘরেই শুয়েছিলাম, গাঙ্গুলী নিজের বিছানায় শুয়ে চাপা গলায় ডাকচে—রসিকবাবু—রসিকবাবু—আমি সাড়া দিলাম কি? জবাব নেই—দুবার কি কি করেও জবাব পাই না, হঠাৎ সেই গভীর রাত্রে রাস্তায় শব্দ হ'লো বল হরি হরিবোল—তখন গাঙ্গুলী ফিস ফিস্ করে বলচে ঐ—ঐ—আমি তো ব্যাপার না বুঝে আবার জিজ্ঞেস কর্‌লি, ঐ—ঐ কি?

গাঙ্গুলী তখন বল্লে আলো জ্বাল না শীগ্‌গীর—তখন আমি আলো জাল্লাম, তারপর বাবু লেপটা গা থেকে সরিয়ে বলচেন কি—ব্যাটারা যেন বাঘের গলায় হাঁক দিচ্ছে—আ—মর্।

তখন আমি বুঝতে পার্‌লাম কর্ত্তা, গভীর রাত্রে অন্ধকার ঘরে শুয়ে বল হরি—হরিবোল ডাক শুনে আঁৎকে উঠ্‌ছেন।

মনে মনে হাসি চেপে রেখে ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছি—উনি অমনি উঠে বসে হাঁক দিচ্ছিল—রসিক বাবু—কোথায় যাও হে, কোথায় যাও। আমিও মজা কোরে বাইরে বেরিয়ে গেলাম, তাঁরও হাঁক ডাক বেজায় রকম বেড়ে উঠল—কি জানি পাছে আবার রাস্তার পাহারাওলা ব্যাপার জান্‌বার জন্তে উতলা হয়ে ঘরে ঢোকে সেই ভয়ে ফিরে এসে বল্লাম কি মশাই, আপনার গলা যে সিংহীর ডাককেও ছাপিয়ে গেল।

রসিকের বলিবার ভঙ্গীতে শ্রোতাদের মধ্যে আবার একটা হাসির হল্লা উঠ্‌ল—রসিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠ্‌ল—এক—দুই—তিন এই সব চুপ্—ম্যাজিক সুরু কর্‌চি—যে ধর্ত্তে পারবে তাকে এক সের রসগোল্লা খাওয়াবো। বউ দি, তুমি কিন্তু চঞ্চলাকে আগে এক পেয়ালা চা দিয়ে ঠাণ্ডা কর—নইলে এক্ষুণি ও গৃহত্যাগ করবে।

রাত্তির সাড়ে আটটার পর লণ্ঠনবাহী দিলুয়ার সঙ্গে সঙ্গে মথুর বাবু যখন বাসায় আস্‌ছিলেন তখন পানিয়াকোলার নিস্তব্ধতা তাঁর ভারী খারাপ লাগ্‌ছিল, তিনি বল্‌ছিলেন—যতো ব্যাটা সন্ধ্যে না হতেই দুয়োরে খিল এঁটে ঘুমুচ্ছে, মুখে আগুন এমন নিষ্কর্ম্মাদের, সাধে কি এদেশের লোকগুলোর হাড়ে লক্ষ্মী নেই! দিলুয়া বেচারী একবার বাবুর মন্তব্য শোন্‌বার পর বল্লে—এ দিকে আর লোক কে আছে বাবু—ইধারে তো বস্তী না আছে. এবং দো কোঠা মেতো হাওয়া খানেওয়ালা বাবুলোক আছে। মথুর বাবু বল্লেন তোর গুষ্টীর পিণ্ডি আছে। গাঁয়ের দিকে যাবার রাস্তা তো এটা বটে, কোনো ব্যাটা কি কাজ কর্ম্মে সহরেও আসে নি?

বাবুর এ প্রশ্নের সমাধান আর দিলুয়া কর্ত্তে পার্লে না, সে চুপ-চাপ আলো নিয়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌ল, বাবু আবার বল্‌তে সুরু করলেন—সন্ধ্যে না হ'তেই যে দেশের লোকগুলো ঘরে ঢুকে নাকে সরষের তেল লাগিয়ে ঘুম দ্যায় সে ব্যাটাদের হাড়ে লক্ষ্মী লাগে না, এ হচ্ছে শাস্ত্রের বচন—ইত্যাদি ইত্যাদি—

দিলুয়া বেচারী না রাম না গঙ্গা বলে বাবুর মন্তব্য শুনে যেতে লাগ্‌ল, মথুর বাবুর কিন্তু এক ঘেয়ে নিজের গলার স্বর শুনে আর নির্জ্জন পথ চলার সাহসে কুলুচ্ছিল না, কাজেই তিনি ধমকে উঠ্‌লেন—কি রে ব্যাটা—রাস্তা চল্‌তে চল্‌তে তোরও ঝিমুনী ধর্‌লো না কি থইনি খেকো ভূত? মুখে বুলি নেই কেন?

জী হুজুর—শুধু সংক্ষেপে দিলুয়া এই উত্তরটুকু দিলে, কেন না বাবুজীর হিজিবিজি কথার কি জবাব দিতে হবে সে জানত না, তা ছাড়া প্রত্যহই রাতে বাবুজী বাড়ী ফেরবার সময় এ রকম আপনার মনে বকে থাকেন যার জবাব দেওয়ার

মতো বিদ্যে বুদ্ধি তার নেই—যাই হোক্ অতঃপর পথ শেষ হ'য়ে এলো, মথুরবাবু নিজের বাসায় ঢোকবার আগে সঞ্জয়দের বাসাতেই ঢুক্‌লেন, কেন না, প্রায় বেশীর ভাগ চঞ্চলা সন্ধ্যের পর এই বাসাতেই থাকৃত, তার পর মথুরবাবু এলে পরে তাঁর সঙ্গে নিজের বাসায় যেতো—আর সে বাসা কিছু দূরে ছিল না—একই খুব প্রশস্ত হাতার মধ্যে দু'খানি বাঙলা বাড়ী, একখানি মথুরবাবু ভাড়া নিয়েছিলেন, আর এক খানি তাঁর শ্যালারা অধিকার করেছিলেন। মথুরবাবু ঘরে ঢুকতেই সবার হাসির হর্‌রা অনেকখানি চাপা পড়ে গেল, তাসের ম্যাজিকও বন্ধ হলো, কেতকী ছুটে অকারণে পালিয়ে যেতে চৌকাটে হোঁচট লেগে বেশ একটু ঠোকর খেলে, মথুরবাবু বলে উঠ্‌লেন—মেয়েছেলে একটু ধীর শান্ত হওয়াই ভালো, এত তাড়াতাড়ি চল্‌বার ফল তো হাতে হাতে পেলে বাপু।

এই সময় সঞ্জয় মুরুব্বিয়ানা স্বরে বলে উঠ্‌ল জামাইবাবু—আজ ছোট দি সামনের মহুয়া গাছে ভূত দেখেছিল—সঞ্জয়ের কথা শেষ হ'বার আগেই মথুরবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন—তা দেখ্‌বে বৈ কি—ঐ দেখবারই তো এখন ওর বয়েস—জান না, সেই গানটা—আমার এই "কাঁচা বয়েস দেখে ওগো নজর দেয় যে ভূতে"—তা যে দিনকাল পড়েচে, এক দল ভূত দেখুক, আর এক দল পেত্নী দেখুক—কি গো, তুমি এখন উঠ্‌বে না আরও বসে আড্ডা দেবে ?

চঞ্চলা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—এখন তোমার আড্ডায় যাওয়াই আমার দরকার, চল যাই, ঠাকুর হয় তো ঘুমিয়েই পড়েচে—তোমার তো আর আসা হয় না।

মথুরবাবু স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় যেতে যেতে আর একবার পথের অন্ধকার আর নির্জ্জনতার দিকে চেয়ে দেখে দিলুয়াকে এতক্ষণ যে সব কথা শুনিয়ে এসেছিলেন তারই খানিকটা আওড়ালেন—চঞ্চলা হাসি চেপে বল্‌লে—তা তোমারি বা এতো রাত পর্য্যন্ত বিশেশ্বর ঠাকুরের দোকানে থাকার কি দরকার, সন্ধ্যে হ'তেই বাড়ী চলে এলে হয় এ দিকে লোকের বস্তি কই যে লোক হাঁটাহাঁটি করবে ?

মথুরবাবু বল্‌লেন—তা বলে আমি কেন সন্ধ্যে না হ'তেই বাড়ী চলে আস্‌ব, দুটো ভাল মন্দ কথা হয়, পাঁচজন এসে বসে দেশের দশের পাঁচ দশটা কথা হয়, সে সব ছেড়ে সন্ধ্যে না হতেই এসে পরিবারের আঁচলের তলায় ঢুকব এমন মেয়ে মুখো তো আমি নই, তোমার ভাইগুলি যেমন সব রাতদিন বাড়ীর মেয়েদের আঁচল আঁকড়ে বসে আছে, ছি, ছি।

মেজাজটা নেহাৎ সরেশ থাক্‌লেও মেয়ের জাত বাপ ভায়ের দিকে খোঁচা দিয়ে কেউ কিছু বল্‌লে তা বরদাস্ত কর্‌তে পারে না, সুতরাং চঞ্চলা এবার ঝাঁজালো স্বরে বল্‌লে—এদেশের কারও সঙ্গে তেমন জানা শোনা নেই, কোথায় কার কাছে গিয়ে ওরা আড্ডা দিবে, সকাল বিকাল হাওয়া খেয়ে বেড়ায়, বাকী সময় বাড়ীতে পাঁচজনা বসে গল্প গুজব করে, এ আবার আঁচল আকড়ে বসে থাকা কি, তোমার বিশেশ্বর ঠাকুরের আড্ডায় গাঁজাখুরী গল্পর চাইতে এ ঢের ভালো। নিজেদের বাসার দরোজায় এসে পৌঁছিলেন বলে মথুর বাবু আর স্ত্রীর কথার জবাব দিলেন না—হাঁক্‌লেন—ঠাকুর অ-ঠাকুর।

ঠাকুরের জবাব পাওয়া গেল না, সন্তুকে কোলে করে ঝি এসে দরজা খুলে দিলে, সকলে ঘরে ঢুক্‌লেন, সন্তু ঝাঁপিয়ে মার কোলে গিয়ে বল্‌লে—দেখ মা, দিদি তোমার বই নিয়ে খালিখালি পড়্‌চে—আর ছবি দেখ্‌চে।

মা ছেলেকে বুকে চেপে চুমু খেয়ে বল্‌লেন—দিদি দুষ্টু, তোমায় বুঝি বই নিয়ে পড়্‌তে দেয় নি খোকা তা স্বীকার করলে—এই সময় খোকার সাত বছরের দিদি এগিয়ে এসে বললে—দেখ মা, এমন দুষ্ট ছেলে ও—যে এখুনি তোমার 'ভারতবর্ষ' খানা ছিড়ে রেখেছিল, আমি তা দিইনি বলে আমার নামে নালিশ কর্‌ছে।

ছেলেমেয়ের নালিশের পালা শেষ করে চঞ্চলা ঠাকুরকে ডাকাডাকি করে তুলিয়ে ধমক দিয়ে বল্‌লে—এই সন্ধ্যে রাতেই তোমার এতো ঘুমের ধূম ? রান্না শেষ হয়েছে কি ?

ঠাকুর বল্‌লে—সবই প্রস্তুত কেবল লুচি ভাজা বাকী আছে বাবু আসেন নি বলে সে অপেক্ষায় ছিল, চঞ্চলা তাকে কাজটুকু শেষ করবার হুকুম দিয়ে যখন ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে তখন দিলুয়া এসে বল্লে মায়ী জী।

তার চাপা স্বরের ডাক শুনে চঞ্চলা বুঝতে পারলে সে কিছু প্রার্থনা নিয়ে এসেছে এবং বাবুর কাছে তা মঞ্জুর হবার

নয়—চঞ্চলা বল্‌লে কি বল্‌চিস্ দিলুয়া কিছু দরকার আছে ?

দিলুয়া হাত কচলাতে কচলাতে বল্‌লে—তার ছেলেটির অসুখ, তাই সে আজ রাতে বাড়ী যাবার ছুটি চায়, ভোর পাঁচটাতেই এসে আবার হাজ্‌রী দেবে, অসুখের সময় রাত্রে ছেলেটা বার বার তার বাপ্পাকে খোজে, চঞ্চলা একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বল্‌লে আচ্ছা যা, ভোরেই আসিস্ কিন্তু—

এতো সহজে ছুটি পাবার আশা দিলুয়ার একেবারেই ছিল না, সুতরাং সে মাঈজীর সম্মতি পাবা মাত্র আর তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করে বড় বড় পা ফেলে তার মোটা লাঠিটা ঘাড়ে করে অদৃশ্য হয়ে গেল, চঞ্চলা তখন ঘরে ঢুকে মেঝেতে পানের বাটা নিয়ে পান সাজতে বসল—মথুর বাবু একমনে তামাক খাচ্ছিলেন, কিছুক্ষণ তামাক টানার পর হুকাটি রেখে দিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—দেখ আজ আমাদের ওখানে বেশ একটা বড় রকম আলোচনা হচ্ছিল, গদাইবাবু লোকটি বেশ শাস্ত্রজ্ঞান আছে তিনি যা বল্‌ছিলেন ঘর দোর সাম্‌লাতে মনোযোগ দিতে পারত—

মথুর বাবু এইবার একটু উৎসাহের সহিতই বলে উঠলেন, তা যা বলেচ মিথ্যে না—আজকালকার মেয়েরা কি রকম বাবু হয়ে উঠেচ তাতো জানই, সাবান, চিরণী, পমেটম আল্‌তা থেকে সেমিজ, সাড়ী, বড়ি, ব্লাউজ, তার উপর দু পাঁচখানা নভেল তো না হ'লেই তাঁদের দিন চলে না, রান্না ঘরের চৌকাঠ ডিঙুতে গেলেই তো হিষ্টিরিয়া হয়, বছরে একবার ক'রে দেশ ভুঁই ছেড়ে পশ্চিমে হাওয়া গায়ে না লাগালে আর রক্ষে নেই, মা বাপ, খুড়ো খুড়ী, এ সবাইএর সঙ্গে স্বামী বেচারা সম্পর্ক যত কাটিয়ে ফেল্‌তে পারে ততোই ভালো, তার ওপর অল্প বয়সের বিধবা যারা--তারা পর্য্যন্ত এমন চালে চলে যা দেখ্‌লেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

কথাটা কোন্‌খানটায় এসে ঠেকেচে তা চঞ্চলা মনে মনে বুঝতে পারলেও প্রকাশ্যে বললে—আমি কিন্তু তোমার গদাই বাবু কথাগুলো একটুও মানতে পারি না।

মথুর বাবু উগ্রকণ্ঠে বললেন - কেন মান্‌তে পার না, এই ধর তোমাদের কেতকী এ তো চোখের ওপরই দেখ্‌তে পাচ্ছ—বছর পনেরো ষোলো বয়েস, বামুনের ঘরের বিধবা মেয়ে--কিরকম চঞ্চল, বিধবার সাজ সজ্জা নেই, আচার বিচার নেই, ওর পরিণাম কি ভয়ানক ভেবে দেখ দেখি ?

চঞ্চলা গম্ভীর কণ্ঠে বললে—কেন ওর পরিণাম সেজ কাকা যেটা স্থির করেছেন শোনো নি ? ঠাকুদ্দা কেতকীকে সাত বছরে গৌরী দান করেছিলেন, আট বছরে ও বিধবা হয়, সেজকাকা গজেনের সঙ্গে আস্‌চে বছর ওর আবার বিয়ে দিবেন ঠিক করেছেন তারপর ওর কপালে যা আছে তাই হবে, আমাদের অতো ভাববার দরকার নেই।

মথুর বাবু চোখ কপালে তুলে বললেন—বল কি, এ যে কাণে আঙুল দেবার কথা উচ্চারণ করলে পাপ, শুন্‌লে পাপ—তোমাদের বংশেও এ পাপ ঢুকলো তা হ'লে—সেজ কাকার মতো বিদ্বান লোকের এ দুর্ম্মতি হলো কি ক'রে—খ্রীষ্টান পাদ্রী কি কালো বেক্ষজ্ঞানী তার মাথায় এ খেয়াল ঢোকায় নি তো—উনি বুঝচেন না এরপর মাথায় হাত দেবেন—আর গজেন ছোক্‌রা, সংস্কৃততে এম এ পাশ করে তার এমন অধঃপতন হলো, কেন রে বাপু—দেশে কি কুমারী কন্যার অভাব—কলি ঘোর কলি—এই পাপেই ভারতবর্ষ আরও রসাতলে গেল ওঠবার আর কোনো আশা নেই, স্মৃতি, সংহিতা, শাস্ত্র, বিধান সব ঘুচ্‌লো—

চঞ্চলা নির্ব্বিকার কণ্ঠে বল্‌লে—তা ঘুচুক—তোমার আমার তার জন্যে এতো দুশ্চিন্তা কিসের—আবার না হয় কোনো নতুন পণ্ডিত নতুন করে স্মৃতি সংহিতা লিখ্‌বে।

মথুর বাবু কপালে চোখ তুলে বল্‌লেন—বল কি—নতুন নতুন পণ্ডিতের নতুন করে স্মৃতি, সংহিতা লিখ্‌বে ? এমন ম্লেচ্ছকথা বোলো না, বোলো না ওরে দিলুয়া—দিলুয়ারে—বেটা কালার ডিম ঘুমুলো না কি ?

চঞ্চলা বল্‌লে—চেঁচাও কেন, কি দরকার, তামাক চাই না কি, ঝিকে ডেকে দিচ্ছি - সেজে দিক্। মথুর বাবু বল্‌লেন—কেন, তোমার হিন্দুস্থানী ভূত গেল কোথায় ?

ঠিক্ এই সময় সদর দরজায় গুম্ গুম্ শব্দ হওয়ায় মথুর বাবু চকিত কণ্ঠে বল্‌লেন—কে ও এই ঠাকুর, এই দিলুয়া—কোই হ্যায় রে।

ক্র

চঞ্চলা বল্‌লে—দিলুয়ার ছেলের অসুখ, ছুটি নিয়ে বাড়ী গেল।

মথুর বাবু সন্ত্রস্তভাবে বলে উঠ্‌লেন—কি সর্ব্বনাশ, একেই বলে স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী—এই চোর ডাকাতের দেশে একমাত্র সেই লোকবল—তাকে তুমি স্বচ্ছন্দে বিদেয় দিলে? আমি স্বামী আমাকে একবার জিজ্ঞেস ও করলে না? সুরেশ বাবু বলছিলেন কালই রাত্রে তাঁর বাসায় চোর এসেছিল—দরজা কে ঠেল্‌লে বল দেখি, খবরদার যেন দরজা না খোলা হয়, ঠাকুর অ ঠাকুর ঝি--অ--ঝি চঞ্চলা উঠে দাঁড়িয়ে বললে এখনও বেশী রাত হয় নি, এখুণি কি চোর আস্‌বে, তার কি ভয় নেই, হয় তো ও বাড়ীর কেউ কিছু দরকারে এসেচে, এই সময় ঠাকুর এসে বললে বাবু কি দরজা খুলতে মানা করলেন? ভয় কি, আলো নিয়ে একবার দেখি না কেন?

এই সময় দরোজায় খুব জোরে জোরে আওয়াজ হ'তেই মথুর বাবু সভয়ে বলে উঠলেন—খবরদার দরোজা কেউ খুলো না এ নিশ্চয় চোর ডাকাত ছাড়া আর কিছু না, ব্যাটারা জানে যে দিলুয়া নেই, হাঁক ডাক করলে কাছেপিঠে লোকজন ও নেই যে সাড়া শব্দ দেবে, তাই নির্ভয়ে দল বেঁধে এসে চড়াও করচে—

মথুর বাবু যে রকম ভাবে কথাগুলো বললেন শুনে খোকা খুকীরা তো এক রকম ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গিয়ে মাকে জাপ্টে ধরলে—কলকাতার ঝি চোখ কপালে তুলে অ্যাঁৎকে উঠে গুড়ি সুঁড়ি মেরে একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে খাটের কোণ ঘেঁসে দাঁড়াল, চঞ্চলা ও ভয়ে কেমন হ'য়ে গেল, তার কণ্ঠে ও সহসা আর কথা জোগাল না, ঠাকুর প্রথমটা ভয় পেলেও তারপর একটু তাজা হয়ে বললে—তা'হলে আমরা এখন কি করব?

কি যে করা উচিৎ মথুর বাবুও সেটা ভুলে গেছলেন—চঞ্চলা এতোক্ষণে কথা কইবার সাহস পেয়ে বললে—যদি চোর ডাকাতই হয় তা হ'লে দরোজা খোলবার অপেক্ষা না রেখে ভেঙ্গেই ওরা ঢুকে পড়বে, তা ছাড়া পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে ও তো আস্‌তে পারে—তার চাইতে দরোজা খুলে একবার দেখলেই ভালো—কাকুতি মিনতি করলে গয়নাগাটি নিয়েই চলে যেতে পারে, কাউকে প্রাণে না মারলেই হলো—দরোজায় আবার শব্দ হ'তে লাগলো—সঙ্গে সঙ্গে চাপার হাসির ক্ষীণ আওয়াজ চঞ্চলার সতর্ক কাণকে এড়াতে পারল না—চঞ্চলা তখন ঠাকুরকে বললে—যা থাকে কপালে ঠাকুর—তুমি গিয়ে দরোজা খুলো—মথুর বাবু দুর্গানাম স্মরণ করে বলে উঠলেন ছি! ছি! একেই বলে নারী বুদ্ধি—সর্ব্বনাশকে আজ নিজে হ'তে ডেকে অ নচ—

তিনি ভয়ে ভয়ে ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়ালেন—ব্যাপারটা প্রথম হ'তেই যাতে ভীষণ ভাবে চোখে না পড়ে—এদিকে ঠাকুর গিয়ে দরোজা খুলতেই লণ্ঠন হাতে সঞ্জয়, রসিক আর কেতকী বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই হেসে উঠল—রসিক বললে—কি সর্ব্বনাশ চঞ্চলা তোরা রাত নটা না বাজতেই একেবারে ঘুমের পুতুল হয়েছিস্—একটু গরম মসলার দরকার তারজন্যে আমরা এসে দুঘণ্টা ধরে দরোজা ঠেঙ্গাচ্চি তা কারু কাণে যাচ্ছে না?

সঞ্জয় বললে—অথচ তোমরা সবাই যে একটা গুলতান করচ তা বাইরে দাঁড়িয়েও বুঝতে পাচ্ছিলাম—

সঞ্জয়ের কথায় বাধা দিয়ে কেতকী এই সময় অর্থ পূর্ণ খিল খিল হাসি হেসে উঠ্‌লো—যা ঘরের ভিতরে ভয় ভীত মথুর বাবুর কাণে অত্যন্ত বেসুরা ঠেক্‌লো—এবং এতোক্ষণে তাঁর ভয় ভাবনা পরিষ্কার রকমে কেটে গিয়ে এই চঞ্চল ছেলে মেয়ে গুলোর উপরে যে ভাব দাঁড়িয়েছিল তা আর ব'লে কাজ নেই।

তিনি এতোক্ষণে গলার জড়তা পরিষ্কার করে জোর গলায় স্ত্রীর উদ্দেশে হাঁকলেন—বলি ওদের সঙ্গে ছ্যাবল্যামো করবে না ছেলেমেয়েদের মুখে কিছু দেবার ব্যবস্থা করবে ক্ষিদেয় যে আমার ও নাড়ীগুলো বাপান্ত করচে—বলি ঠাকুর—গল্প গুজবে তুমি ডুব মারলে নাকি?

রসিক ত্রস্তভাবে বোনের দিকে চেয়ে বললে—না বোন্—গতিক ভালো না, গাঙ্গুলী রেগেচে—তুই শীগ্‌গীর আমাদের যা দেবার দিয়ে বিদেয় করে দে—

ওদিকে আমাদের রাঁধা মাংস ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—কেতকী তুই হাসিস্ না রাক্ষুসী, তোর এই সর্ব্বনেশে হাসি কথার চাইতে বেশী খোঁচা দেয়—

চঞ্চলা গরম মসলা এনে দাদার হাতে দিতেই সজল বললে—কাল সকাল সকাল আমাদের বাসায় চা খেতে যেয়ো দিদি—আজকের গল্পটা কাল সকালে ভালো করে আলোচনা করা যাবে।

চঞ্চলা ভাইর কাণটা আস্তে একটু মলে দিয়ে রাগ ভরে বললে—তুই ভারী ফাজিল হচ্চিস্ দিন দিন—দাদা কিছু শাসন করেন না কি না?

সবাই চলে গেল, ঠাকুর ততোক্ষণে রান্না ঘরে গিয়ে গরম গরম লুচি ভাজতে মন দিয়েচে—মথুর বাবু নিজেই হাতড়ে টিকে তামাক জোগাড় করে এক ছিলিম সেজে নিয়ে মনের উষ্মা আপাততঃ তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গেই ত্যাগ করচেন—চঞ্চলা গিয়ে আস্তে ব্যস্তে আসন পেতে ক্ষুধা শান্তির উপকরণ গুলি একে একে থালায় সাজিয়ে তুলতে লাগল।

পতিতা

[শ্রীঅনিলমোহন ভট্টাচার্য্য]

যখন শীতলের উত্তপ্ত দেহ বসন্তের জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছে, শয্যার একপ্রান্ত হইতে এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সে লুটাইয়া লুটাইয়া করুণ স্বরে জননীকে ডাকিতেছে—কুসুম তখন পাশের ঘরে রূপের বাজার বসাইয়া রূপ বিক্রয় করিতেছে।

শীতল ডাকিল "মা"—কুসুমের খরিদ্দার হাসিল হাঃ হাঃ—হাঃ। বালকের করুণ স্বর ঘর প্লাবিত করিল—পশুর বিকট হাসি সে স্বর মিলাইয়া দিল। বালক মূর্চ্ছিত হইল—মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল—বিছানা বালিস্ লাল হইয়া গেল।

কুসুম এক গ্লাস সুরা মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল—প্রাণে স্ফূর্ত্তি আসিল—প্রার্থনা করিল শীতলের মৃত্যু।

গভীর রাত্রি—বৃষ্টি পড়িতেছে। কুসুম গান ধরিল—

"নিশীথ রাতে বাদল ধারা"

খরিদ্দার বাহবা দিল। শীতলের মুখ দিয়া বাহির হইল, "মা" কুসুম শুনিল—থামিল না, মদের নেশায় সে তখন এক নূতন রাজ্যে।

পরদিন সকালে একবাটী দুধ হাতে কুসুম শীতলের ঘরে প্রবেশ করিল। ডাকিল "শীতল," জানালার কাছে একটা দাঁড়কাক বসিয়াছিল—"কা" "কা" করিয়া উড়িয়া গেল। কুসুম কাঁদিল না—বুঝিল রাত্রের সেই "মা," ডাকের পর শীতলের উত্তপ্ত দেহ শীতল হইয়াছে।

রাত্রে আবার খরিদ্দার আসিল। আবার মদের ফোয়ারা ছুটিল। কুসুম গাহিল—হাসিল—নাচিল। তারপর দুইজনে নিদ্রার কোলে লুটাইয়া পড়িল।

দিন কয়েক কাটিয়া গেল। রাত্রে কুসুম স্বপ্ন দেখিল—শীতলের ভয়ানক অসুখ। সে তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া—সম্মুখে মস্ত একটা পাগড়ী বাঁধা যমদূত দাঁড়াইয়া—শীতলকে লইয়া যাইবে। কুসুম ছাড়িবে না, শেষ পর্য্যন্ত দেখিবে তাহার প্রাণের শীতলকে কেমন করিয়া লইয়া যায়। যমদূত ছাড়িল না—শীতলকে লইয়া গেল। কুসুম "শীতল" বলিয়া ধূলায় উপর লুটাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙিয়া গেল। কুসুম দেখিল উপাধান অশ্রু সিক্ত সে উঠিয়া বসিল—জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভাবিয়া লইল। বুকটা তাহার ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল—দুইহাতে চাপিয়া আবার শুইল। খরিদ্দার চলিয়া গেল, সে উঠিল না। ঝি আসিয়া ডাকিল, সে বলিল, "শরীর খারাপ।"

রাত্রি আসিল—কুসুম খরিদ্দারকে ফিরাইয়া দিল—

বলিল—"একটা দিন বিশ্রাম লইতে দাও, জীবনের পাতা কয়খান একবার পড়িয়া লই।"

কুসুম ঘুমাইল না। গভীর রাত্রে উঠিয়া দ্বার খুলিল—দেখিল ঝি ঘুমাইয়াছে। সে বাহির হইয়া গঙ্গার ধারে চলিল। তীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল সমস্ত প্রকৃতি কাঁদিতেছে। জল কল, কল, শব্দে কাঁদিয়া ডাকিতেছে "শীতল," "শীতল"। বাতাস শোঁ শোঁ শব্দে কাঁদিয়া ডাকিতেছে "শীতল," "শীতল"। অদূরে ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিতেছে—আর সেই চিতানল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে, "শীতল," কুসুম স্তব্ধ হইয়া প্রকৃতির সেই করুণ ক্রন্দন শুনিতে লাগিল।

কুসুমের কানে ডাক আসিয়া পোঁছিল, "মা" সে চমকাইয়া উঠিল—হৃৎপিণ্ডটা ছিড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। এ যে বড় পরিচিত ডাক! সে ছুটিয়া শ্মশানে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিল তাহারই মত একজন, শীতলের মত একটী বালককে কোলে করিয়া শ্মশানে বসিয়া। তাহার মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। সে পাগলের ন্যায় ছুটিয়া গেল—বলিল "ভাই, একবার দে, একবার জন্মের মত তোর মাণিককে কোলে নিতে দে," এক মুহূর্ত্ত দেরী সহিল না—বালককে ছিনিয়া লইয়া কুসুম বক্ষে চাপিয়া ধরিল। কে যেন ডাকিল, "মা"—কুসুম আরও চাপিয়া ধরিল।

বালকের দেহ কোলে করিয়া তাহার প্রাণ যেন ভরিয়া আসিল; হঠাৎ কুসুম তাহাকে জননীর কোলে শুয়াইয়া দিয়া বলিল, "ভাই, তোর মাণিককে আমায় দিয়ে দে।" বালকের মা কাঁদিল—বলিল, "দিদি, খোকাকে তোমায় দিয়েছি—যমের হাত হতে ফিরিয়ে নাও," কুসুমের হৃদয়ে তড়িৎ খেলিয়া গেল। সে ছুটিল।

বাসায় ফিরিয়া কুসুম বাক্সের চাবি খুজিয়া পাইল না—তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা বাক্স টুকরা, টুকরা করিল, রূপ বিক্রয় করিয়া যে টাকা সে সারা জীবন জমাইয়াছে—লইল। তারপর আবার শ্মশানে চলিল।

শ্মশানে আসিয়া ডাকিল, "খোকা," "খোকা" শোঁ, শোঁ করিয়া বাতাস বহিল। একটা অনলের শিখা তাহার দিকে হেলিয়া পড়িয়া জানাইয়া দিল, "খোকা এখানে," কুসুম সব দেখিল, ভাবিল—তারপর হাঃ হাঃ হঃ করিয়া বিকট শব্দে হাসিয়া বলিল, "ওরে তোরা সব বাড়ী যা, এ আমার শীতল—একে আমি ছোট্টটী নিয়ে বিদেশে বেড়িয়েছি বাছা আমার কত কষ্ট পেয়েছে। বাছাকে মেরে আম টাকা উপায় করেছি। বাছা "মা" বলে কেঁদেছে—তবু আমি শুনিনি, জল, জল করে বাছার বুকের ছাতি ফেটে গিয়েছে—তবু আমি এক ফোটা জল দিইনি। আয় শীতল, আয় বাপ! তোকে বুকে করে প্রাণটা জুড়াই।" কুসুমের চোখে জল আসিল। টাকা গুলো মুটো, মুটো করে চিতার উপর ছড়িয়ে দিয়ে সে ডাকিল, "শীতল," "শীতল"—প্রতিধ্বনি আসিল, "শীতল." "শীতল।"

বালকের চিতার উপর কুসুমের দেহ লুটাইয়া পড়িল। চণ্ডাল ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বাহির করিল—তখন সে শীতলের কাছে।

সামান্য ভুল

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ এম্-আর এ, এস্]

(গল্প নহে)

ময়মনসিংহের জাঁদরেল সেরেস্তাদার বাবুর সন্তান হয় না, তার স্ত্রী জামালপুরের দয়াময়ী মায়ের মানত করিলেন, "আমার পেটে যদি একটী সুসন্তান হয়, তবে আমরা গিয়া মায়ের পূজা দিয়া তার অন্নারম্ভ দিব।" জামালপুরের দয়ামযী ভারী জাগ্রত দেবী কি না তাই।

দেখিতে দেখিতে তার পত্নীর গর্ভ দেখা গেল। স্বামী, স্ত্রীতে মায়ের উপর খুব ভক্তি ভাব দেখা গেল—মা বুঝি এতদিন পরে কৃপা করিলেন। যথা সময়ে তাদের একটী পুত্রসন্তান দেখা দিল। সেরেস্তাদারবাবু পুত্রের ষষ্ঠিপূজায় তার আফিসের কেরাণীর দল আর বন্ধুবান্ধবকে মিষ্টিমুখ করাইতে কসুর করিলেন না। সবাই খুসী সেরেস্তাদার বাবুর ছেলে হইয়াছে।

ছেলের বয়স যখন ছয় মাস তখন তার অন্নারম্ভের কথা উঠিল। কিন্তু মায়ের বাড়ী না গিয়া তাঁর প্রসাদ ব্যতীত আর কি অন্নারম্ভ দেওয়া যায়? সুতরাং তিনি উপর-ওয়ালাকে অন্ততঃ এক দিনের ছুটীর জন্য অনুরোধ করিলেন। রবিবারে ত্র্যহস্পর্শ সুতরাং সেদিন দিন ভাল থাকিলে বিনা ছুটীতেই পারা যাইত। সাল তামামি, কাজের ভিড় বলিয়া সাহেব ছুটী দিতে রাজী হইলেন না। সুতরাং তিনি ঐ দিনই লোক পাঠাইয়া মায়ের প্রসাদ আনাইয়া বাড়ীতে অন্নারম্ভ দিলেন—নিতান্ত কম খরচায়। ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিলেন না। মায়ের নামে কিছু মানত রাখিয়া কার্য্য সারিলেন।

ছেলের বয়স যখন দুই বৎসর ছাড়াইয়া গিয়াছে তখন তিনি একটা ছুটীর তারিখে মায়ের পূজা দিতে সস্ত্রীক যাত্রা করিবেন বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তারা দু'জনে কপোত, কপোতীর মত, একজনকে ছাড়িয়া অন্যজন একদণ্ডও থাকিতে চায় না। সেই হপ্তাতেই ছেলের ছয় মাসের সময় ঠাকুর চাকর লইয়া গৃহিণী একাকী গিয়া পূজা দিতে রাজী হ'ন নাই। এবার উভয়ের যাত্রার পালা।

একদিন তারা উভয়ে উপবাসী থাকিয়া জামালপুর যাত্রা করিলেন। প্রাতে ছয়টার ট্রেণে উঠিয়া সাড়ে সাতটায় সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন। সেরেস্তাদারবাবু পূজা দিতে আসিতেছেন আগের দিনই তত্ত্ব গিয়াছিল। পরদিন তাহারা যাইতেই মায়ের বাড়ীর সকলে ও রাজ কাছারীর ও মায়ের কাছারীর ম্যানেজার, নায়েব, আমলারা সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

যথারীতি পূজা সমাপন হইলে মায়ের প্রসাদ ছেলেকে দিয়া সকলে তাহা গ্রহণ করিলেন। বেলা তিনটার সময় যে গাড়ী ময়মনসিংহ ফিরিয়া যায় সেইটাতে তাঁরা ফিরিবেন। অনেক আগেই তাঁরা ষ্টেশনে আসিলেন। মায়ের বাড়ী হইতে ষ্টেশন এক মাইল। ষ্টেশনে আসিয়া তাঁরা ছেলে লইয়া খুব আমোদ, আহ্লাদ করিলেন। ছেলে হাঁটিতে পারে, আধ আধ করিয়া সব কথাই কহিতে পারে। ছেলে ছিল তার বাবার কোলে।

তারা যখন চারিটার সময় ময়মনসিংহ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তখন সেরেস্তাদারবাবু মেয়ে গাড়ীতে গিয়া দেখেন ছেলে নাই। তখন গৃহিণী সশব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ষ্টেশনে ভারী ভিড়, মস্ত গোলমাল। তখন ষ্টেশন মাষ্টার একখানি তার হাতে করিয়া আসিয়া কহিলেন "এই যে তার, ব্যস্ত হবেন না, ছেলে জামালপুর ষ্টেশনে আছে।"

গভীর জলে যেন তাঁরা তৃণখণ্ড পাইলেন। তখন একখানা গাড়ী তৈয়ার ছিল, সেটা জামালপুরের দিকে যাইবে। তিনি স্বয়ং তাড়াতাড়ি যাইবেন বলিয়া সে গাড়ীতে গিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। তার স্ত্রীও আর কথা শুনিলেন না, সেই গাড়ীতে

উঠিয়া পড়িলেন। মায়ের প্রাণ কি না, তাই তিনি কারো নিষেধ বিধি শুনিলেন না।

এদিকে জামালপুর ষ্টেশনটা ছেলে মাথায় করিয়া তুলিয়াছে। তার বাবা, মা কাকেও দেখে না তারই বা অপরাধ কি? ষ্টেশন মাষ্টার ছেলেকে তার গৃহে, তার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। মাষ্টার গৃহিণীও ছেলেকে শান্ত না করিতে পারায় সন্দেশ মিঠাই আর খেলনা কিনিয়া দিয়া তাকে অনেকটা আশ্বস্ত করিলেন।

যখন তাঁরা স্বামী, স্ত্রীতে কাঁদিতে কাঁদিতে জামালপুর ষ্টেশনে নামিলেন তখন ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহাদিগকে আশ্বাস, ভরসা, অভয় দিলেন। মায়ের প্রাণ কি না, তিনি আরো কাঁদিয়া উঠিলেন, বিশেষতঃ এ যে সবে ধন নীলমণি। জামালপুর ষ্টেশনের অপর নাম সিংজানী। আর একটা জামালপুর আছে তাই এই নাম পরিবর্ত্তন।

ষ্টেশন মাষ্টার সযত্নে সেরেস্তাদার গৃহিণীকে তার স্বগৃহিণীর হাওলা করিয়া দিতে লইয়া গেলেন। ছেলে কোলে লইয়া মা শান্তিলাভ করিলেন।

এদিকে ষ্টেশন মাষ্টার তাহাদের পুনরাবর্ত্তনের জন্য ভারী এক জলযোগের আয়োজন করিলেন। বিশেষতঃ ময়মনসিংহ যাত্রী গাড়ীর এখনো অনেক বিলম্ব।

ছেলে লইয়া তাহারা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে আসিয়া পড়িলেন। ছেলে বাপ মাকে দেখিয়া শান্ত হইল। এ সংবাদ মায়ের বাড়ীর ও রাজ কর্ম্মচারীরা জানিতে পারিয়া তাহারাও ষ্টেশনে আসিলেন, ষ্টেশনে মস্ত ভীড়।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় যাত্রী গাড়ী জামালপুর ষ্টেশনে আসিল। ষ্টেশনের সকলে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল। রাত্রি নয়টার সময় তাদের গাড়ী ময়মনসিংহ আসিল, ষ্টেশনে আসিয়া তাঁরা দেখেন তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও তাঁবেদারেরা ষ্টেশনে আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছেন। তখন ছেলে খুব শান্ত, শিষ্ট ভাব ধারণ করিয়াছে। ফলে কিন্তু দয়াময়ী মায়ের আবার আর একটা পূজা পাওয়ার দাবি দাওয়া হইয়া রহিল! আরবার ময়মনসিংহে আসিয়া ছেলে না পাইয়া অক্ষত শরীরে ছেলে পাইলে মায়ের পূজা দিবেন বলিয়া মাকে ভরসা দিয়া রাখিয়াছিলেন। মায়েরই বা কি খেয়া, মায়ের অতি লোভ কি ভাল হইয়াছে? মা কিন্তু আবার পূজা পাওয়ার পূরা দস্তুর দাবি করিয়া রহিলেন।

পরদিন কাছারীর সময় বন্ধুবান্ধব ও তাঁবেদারেরা সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে সেরেস্তাদার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, কাল কি হইয়াছিল? সেরেস্তাদারবাবু গম্ভীর হইয়া তাচ্ছিল্য ভাবে উত্তর করিলেন "ওরকম সামান্য ভুল সকলেরই হয়ে থাকে।"

অভিশাপ

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত]

ধনীর বিশাল অট্টালিকা, গাড়ী ঘোড়া, লোকজন, পাইক পেয়াদার হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে সব সময়ই গমগম্। আহারে, বিহারে, গল্পগুজবে ধনীকে ঘিরে তার বন্ধুর দলের কত অনুনয়, বিনয়, কত মিষ্টি কথা, কত আন্তরিকতা। ধনীর একটু সর্দ্দি হয়েছে, মাথা ভার ভার, বাড়ী শুদ্ধ; পাড়া শুদ্ধ সাড়া পড়ে গেল—এই চুপ্—রাজা মশায়ের অসুখ—। বাড়ীর পাশে মস্ত টিনের কারখানা—সাতদিন তার কাজ বন্ধ রইল।

সকাল হ'লে ধনী নীচে নেমে আসেন—বৈঠকখানা ঘরটিতে। ধনীর মুখের একটি কথা শোনবার জন্য বন্ধুদের কত উৎকণ্ঠা, কত আকুলি ব্যাকুলি। ঠিক ন'টা বাজতেই ধনী ওপরে উঠে যায় আর চারপাশ থেকে সেলাম ও স্তুতি-বাদের গুঞ্জন গুন্‌গুনিয়া উঠতে থাকে।

কমলা দেবীর এতদিনের পাতা আসন কেন জানি না নড়ে উঠল। সকলের অলক্ষ্যে তিনি একদিন ধনীর ঘর থেকে বিদায় নিলেন। ধনীর অবস্থা ঘুরে গেল—অদৃষ্টের লিখন অখণ্ডনীয়! একদিন শোনা গেল ব্যাঙ্ক ফেল, জাহাজ ডুবল, ধনীর ব্যবসা উঠল—বাজারের মহাজনদেরই কাছে লাখের বেশী দেনা। জমীজমা সমেত বাড়ীখানা নিলামে গেল। মহাজনদের দেনা তবু শোধ হ'ল না।—নিরুপায় হয়ে ধনী তার চারপাশে তাকালে—দেখলে কেউ নেই—ঘরভরা লোক লস্কর, বন্ধুবান্ধব কে কোথায় পাড়ি দিলে।—যাবার সময় মহাজনরা গম্ভীর আওয়াজে বলে গেল—দলিলে লেখা ছিল শুদ দেবার। দিতে পারলে না। মনে করলে জেলে দিতে পারি—যাও, দয়া করলাম।

ধনী বললে—দয়া!—না, না, তা কেন করতে যাবে—তোমাদের ক্ষমতা যা আছে আমার ওপর তার শেষ চূড়ান্ত হয়ে যাক্। কিছু বাকী রেখে, মিছিমিছি মনে ক্ষোভ পুষো না।—আমাকে জেলেই দাও—শুধু ঐ কথাটি বলো না যে 'দয়া করলে।'

কাল যে ছিল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে শয়ান—আজ সে পথ দিয়ে চলেছে নিতান্ত অসহায় দুঃখীর মত।—কি বলে, কেমন করে চাইতে হয় ধনীর তো তা জানা নেই। তিনদিন শুধু পথে পথে ঘুরলই—কিছু পেল না।—সেদিন অলি গলি ছেড়ে, অনেক দ্বিধার পর, ভোর থেকেই আপিস যাবার রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইল—চুপ্‌চাপ।—সকাল দুপুরে পরিণত হ'ল—উপায় কিছুই হ'ল না। অবসন্ন দেহ মন নিয়া কোনরকমে একটা গাছতলে গিয়ে শুয়ে পড়ল।—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ধনী স্বপ্ন দেখলে—ধীরে ধীরে তার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল এক শ্বেতমূর্ত্তি—আপাদমস্তক আবৃত। আভরণের ভেতর থেকে মূর্ত্তি বললে—পরকে দান করবার সুযোগটুকু তুমিও যেমন করে একদিন অর্জ্জন করেছিলে, আজ পরকেও সে সুযোগটুকু ছেড়ে দাও। পরের মনে দয়া জাগাবার চেষ্টা কর। শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না—মানুষের চলার সামনে সোজা হাত বাড়িয়ে ডাকতে থাক—দয়া হোক—কিছু দাও বাবা।

গাছের ফাঁক দিয়ে অনেকখানি রোদ সহসা মুখে এসে পড়তেই ধনীর ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখে রাস্তার দু' ধারে আফিস ফেরতা বাবুর দলের ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে—হাত পেতে সোজা দাঁড়িয়ে, সকল সঙ্কোচ ভেঙে, ধনী থেমে থেমে বলতে লাগল—

দয়া কর বাবা, একটা পয়সা।...

প্রথম কয়েকবার বলতে গিয়ে ধনীর গলা বেধে বেধে আসছিল। কিন্তু বার পাঁচেক বলার পর ক্রমশঃই তার গলা সহজ হয়ে এল। ডাক শুনে কয়েকজন দিয়ে গেল।

পয়সা ক'টি কপালে ঠেকিয়ে—উপর দিক চেয়ে ধনী বললে—দেব, পৃথিবীর মানুষকে চেনবার খুবই তো সুযোগ দিলে? যথেষ্ট হয়েছে—এখন এ খেলা সাঙ্গ করে তোমার ডাক পাঠাও প্রাণের দেবতা আমার—আর যে পারি না!—উঃ—কী এ ব্যথা।...

ধনীর চোখের পাতা ভিজে উঠল—ঝাপ্‌সা দৃষ্টি মেলে পথের পাশে বসে রইল—শেষ ডাকের অপেক্ষায়।*

* [বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

মিলন *

[শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

(১)

এর্‌না গরীবের মেয়ে। জগতে আপনার বলবার ছিল একমাত্র তার আপনার বড় বোন জ্যান্‌সী।

জ্যান্‌সী বার্লিনের একটা বড় জামার দোকানে কাটারের কাজ করত। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে কখন তার যৌবন ফাঁকি দিয়ে চলে গ্যাছে তা সে টেরই পায় নি। তাই আজিও সে অনূঢ়া। যৌবনের রঙীন নেশা কেটে গেছে—এখন সে প্রিয়তমা ভগ্নিকে সুখী করে, নিজের বিগত যৌবনের বিফলতাটুকু পূরণ কর্ত্তে ব্যস্ত।

এর্‌নাকে ভগবান দারিদ্র্যের সঙ্গে দিয়েছিলেন—একরাশ রূপ আর অটুট স্বাস্থ্য। শিল্পীর আদর্শ সুন্দরী সে, কোন খুঁত ছিল না তার। বার্লিনের বড় বড় চিত্র শিল্পী ও ভাস্করের "মডেলের" কাজ করত সে—বার্লিনে এমন কোন নামজাদা ষ্টুডিও ছিল না যেখানে এর্‌না Pose দেয় নি আর এমন কোন বড় আর্টিষ্ট ছিল না যার নোট বইএ এই সতের বছরের মেয়েটির নাম বড় বড় করে লেখা ছিল না।

(২)

যুবক অটো নবীন শিল্পী, কিন্তু তবুও তার প্রতিভা অনেক বিখ্যাত শিল্পীর ঈর্ষার কারণ হয়ে পড়েছিল। দারিদ্র্য রাক্ষসী তার প্রবল শত্রু হলেও সে একদিন তাকে জয় করবার আশা পোষণ করত।

এর্‌না ছিল অটোর বিশেষ বন্ধু—উভয়ের আলাপ ক্রমশঃ বন্ধুত্বে ও অবশেষে গভীর ভালবাসায় পরিণত হয়েছিল। এর্‌না অটোর পত্নী হতে রাজী—উভয়ে কেবল অপেক্ষা করছিল ভাগ্যলক্ষ্মীর একটু মুখ তুলে চাওয়া। তাই এর্‌না এখন জ্যান্‌সীকেও এ কথা বলতে সাহস করে নি।

(৩)

এরিক বড়লোকের ছেলে—তার অর্থেরও অভাব নেই, সমাজে সম্মানেরও অভাব নেই। সে সখের চিত্রকর। এর্‌না তার কাছে Pose দিতে আসত—কিন্তু এরিকের চিত্রের দিকে যতটা মনোযোগ ছিল তার চেয়ে ঢের বেশী মনোযোগ ছিল মডেলের উপর। জ্যান্‌সীরও ইচ্ছা ছিল—বোনটি এমনি কোন ধনী যুবকের মনোহরণ করে তার দারিদ্র্যকে ফাঁকি দিয়ে জীবন সফল (?) করে।

এর্‌না জগতের যত আর্টিষ্টের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে Pose দিয়ে অর্থোপার্জ্জন করবে অটোর মনের মধ্যে এটা কাঁটার মত বিঁধত—সব চেয়ে অসহ্য বোধ হ'ত তার ঐ এরিকের সঙ্গে এর্‌নার অবাধ মেলামেশা। কিন্তু তাকে বাধা দেবার মত সামর্থ বা দাবী তার তখনও হয় নি। তবুও এ বিষয় নিয়ে প্রায়ই এর্‌নার সঙ্গে তার বচসা হ'ত। ফুল সম্পূর্ণ ফোটবার আগেই যেন তাতে একটা কীট প্রবেশ করল।

(৪)

সেদিন ছবি আঁকার পর, এরিক এর্‌নাকে নিজের মোটারে করে পৌছে দিতে যাচ্ছিল। সন্ধ্যার তারাগুলি তখন আকাশের গায়ে দু' একটা করে ফুটে উঠেছিল। পথে Hirschgarten পার্কে নেমে একটু বেড়াতে এর্‌নার আপত্তি হ'ল না। বেশ নির্জ্জন একটা কোণারে একটা বেঞ্চের উপর দুজনে বসে গল্প করছিল—এরিক একমনে দুনিয়ার যত কথা বলে যাচ্ছিল। সন্ধ্যা পার হয়ে গেল এর্‌নার আর ভাল লাগছিল না—উঠবার জন্য তার মনটা ছট্‌ফট্‌ করছিল, এরিকের সব কথাগুলো তার কাণে যাচ্ছিল না। হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গল যেই তার হাত দু'খানি

* গত ১১ই অক্টোবর তারিখের "ফরোয়ার্ডে" প্রকাশিত সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

জোরে চেপে ধরে এরিক বলে উঠল "এবুনা তোমায় আমি ভালবাসি—বল তুমি আমার পত্নী হবে—"

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে এবুনা বল্লে "চলুন এখন আমরা যাই—আমার বড় ভয় করছে। আর আমার বিবাহের কথা ভাববার অবসর এখনও আমি পাই নি।"

পার্কের ভিতর দিয়ে দুজনে অগ্রসর হচ্ছিল হঠাৎ "দড়াম" করে একটা পিস্তলের আওয়াজ হ'ল আর এবুনার প্রাণহীন দেহ শিশির সিক্ত ঘাসের উপর এরিকের পদপ্রান্তে লুটয়ে পড়ল। চারিদিক থেকে লোক ছুটে এলো, যেমন হয়ে থাকে তেমনি হ'ল—কিন্তু কে যে এই প্রাণহীন নির্মম কাজ করে গেল তার কোন খোঁজই কেউ পেলে না।

(৫)

রুক্ষ শুষ্ক পাগলীর মত জ্যানসী ঝড়ের মত পুলিশ হেড কোয়ার্টারে এসে সংবাদ দিলে—"আমি শপথ করে বলতে পারি—অটো ক্লেবসই আমার এবুনাকে হত্যা করেছে—নিশ্চয় নিশ্চয়!—তোমরা এর প্রতিকার করবে কি না জানতে চাই" আত্মবিস্মৃতা পাগলিনীর যা কিছু বলবার আছে সবই লিপিবদ্ধ করে নিয়ে পুলিশ তাকে বাড়ী পৌছে দেওয়া সঙ্গত মনে করলে কিন্তু যেমনি ঝড়ের মত এসেছিল সে তেমনি ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। একরাশ ফুল নিয়ে তাকে এবুনার সমাধির দিকে যেতে দেখেছিল অনেকে।

অটো ক্লেবসের ষ্টুডিওর দ্বারে 'নক' করেও যখন কোন মতেই দরজা খোলা গেল না পুলিস প্রহরী তখন দরজা ভেঙ্গে ভেতরে গিয়ে দেখলে—এবুনার সুচিত্রত 'জীবন্ত' চিত্রের পদতলে অটোর প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে—মুষ্টি মধ্যে একটা পিস্তল দৃঢ়ভাবে ধরা আছে! এবুনার চিত্রের কোণে নীল পেনসিলে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে—

"এ জীবনে আমাদের মিলনের বাধা অনেক—তাই মরণের পরপারে গিয়ে যদি উভয়ে মিলিতে পারি!"

এ কোন্ উর্ব্বশী

[স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]

ধ্বনিত হতেছে আজিকে চিত্তে
এ কার আনন্দ বাণী,
সে ধ্বনি শুনিয়া উঠেছে জাগিয়া
সমগ্র জগত খানি।

কোন তারে হেন কে দিল ঝঙ্কার
হিল্লোলি উঠে সে সুরের পাথার
যেন কোথা নাহি বাধা—
এক সুরে বাঁধা, বিচিত্র এ বিশ্বখানি!

তালে তালে তালে বাজিত নুপুর
সকলি সুন্দর সকলি মধুর
এ কোন্ উর্ব্বশী সভামাঝে পশি
নাচে সকল শোভার রাণী।

কবি ও চরকা

[দিঙ্‌নাগাচার্য্য]

শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রাজনীতি কিম্বা রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কিছুর সঙ্গে যোগ রাখতে নারাজ। স্বদেশীয় যুগের পর থেকে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নি। স্বদেশী যুগের অনেক বৎসর বাদে মহাত্মা গান্ধী যখন তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন কবি তখন ভারতবর্ষের বাইরে ছিলেন, সুদূর আমেরিকায় ভারতবর্ষের নবজীবনের স্পন্দন প্রথমে কবিকে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই আশান্বিত করে তুলেছিলো (তাঁর তখনকার চিঠি হইতে) তারপরেই কিন্তু তিনি এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখা প্রয়োজন মনে করেন কেননা তাঁর মতে এই আন্দোলনে কোন কিছু গ্রহণের চেয়ে সব কিছু বর্জ্জনের চেহারাটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি জনসভায় আপনার মত ব্যক্ত করেন এবং আপনাকে এই আন্দোলন থেকে খুব দূরে রাখবার চেষ্টা বরাবরই করে আসছেন।

এই নিরপেক্ষ উদাসীন ভাব এযাবৎ প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিলো যদি না আচার্য্য রায় মহাশয় অপবাদ বর্ষণে তাঁকে উদ্দীপিত করে আবার মল্লভূমিতে টেনে আনতেন। ভাদ্রের সবুজ পত্রে রবীন্দ্রনাথ চরকা হস্তে দেখা দিয়েছেন। তাঁর লেখার যে পালিশ থাকা দরকার ও যা একমাত্র তাঁর লেখাতেই সম্ভব সেটা এ লেখাতে প্রচুর ভাবেই আছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে চরকা হাতে চালানো যেমন কবির অসাধ্য কাজ মনের সামনে চরকা চালিয়ে তার সমগ্র রূপ দর্শন করাও কবির পক্ষে তেমনি অসম্ভব।

বাস্তব জগৎএর অতি বাস্তব এই ক্ষুদ্র চরকা বস্তুটি কবির অসামান্য কল্পনা লোকের উত্তাপ সহ্য করে উঠতে পারে নি, চরকা বেশীভাগ জায়গায় বাষ্প হোয়ে উবে গেছে অনেক কিছু যা চরকা প্রসঙ্গে একটুও দরকার ছিলো না তা দেখা দিয়েছে। দেশে যখন জলকষ্ট দেখা দেয় তখন তার সম্বন্ধে কাল্পনিক ছায়াচিত্র যদি রচনা করা হয় তাহ'লে তার দ্বারা জলাভাব দূর হয় না। কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন, খুব শক্ত কাজ হোতে পারে কিন্তু অভাব মোচন করবার ব্রত যিনি নেবেন তাঁকে অন্তর শাসনাধীন থাকতেই হবে নইলে সাহিত্য সৃষ্টি হবে হয়তো কিন্তু ভোগবতীর সন্ধান মিলবে না। চরকার উপর প্রবন্ধ পড়ে সেই কথাটাই বারে বারে মনে হচ্ছিলো যে সমগ্র রূপের কোথায় যেন অভাব ঘটেছে, কোথাও স্ফীত করে, কোথাও সঙ্কুচিত করে তাকে ইচ্ছামত একটা রূপ দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছামত রূপ দেওয়ার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা থাকে সে দুর্ব্বলতা নানাভাবে মহাত্মাজীকে শ্লেষ করার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছে। প্রবন্ধটি পড়ে প্রণিধান যোগ্য যে কটি কথা পেয়েছি তা একে একে বিচার করে দেখি। কবি লিখছেন মানুষের প্রকৃতি এক নয় অর্থাৎ সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মত একই নমুনার চাক বাঁধবে বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজ-বিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছে করেন। চরকা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটা দাঁড়ায় যে যখন মহাত্মাজী সমস্ত দেশবাসীকে চরকা চালাতে অনুরোধ করেছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত ধৃষ্টতা করেছিলেন। কারণ প্রথমতঃ সমস্ত দেশের লোক তা গ্রহণ করবে না আর দ্বিতীয়তঃ স্বরাজ লাভ তার দ্বারা সম্ভব নয়।

অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই প্রথম অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণ করবে। সত্যই সমস্ত দেশের লোক চরকা গ্রহণ করে নি কিন্তু গ্রহণ তো সমস্ত দেশের লোক কখনো কোন মহাপুরুষের বাণীকে করে নি। বুদ্ধদেবের বাণীকে সমস্ত দেশ গ্রহণ করে নি, খৃষ্টের বাণী সমস্ত দেশ গ্রহণ করে নি এমন কি কবির নিজের বাণীকেও দেশ উপেক্ষা করতে ত্রুটি করে নি। এই রকম

শত সহস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যার দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে কোন মহৎ বাণীর মূল্য সেই যুগের জনসাধারণে কতদূর গ্রহণ করলো তার উপর নির্ভর করে না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ছয়শত বৎসর পরে তাঁর বাণী ভারতবর্ষকে আলোড়িত করতে পেরেছিলো। কেউ যেন না মনে করেন যে আমি বুদ্ধদেবের বাণীর সঙ্গে চরকার বাণীর কোনরকম তুলনা করছি। আমি শুধু বলতে চাই যে জন-গণ-মন তুলা দণ্ডে বিহৎ কিছুর বিচার সম্ভব নয়। কবি এই কারণেই মহাত্মাজীকে তিরস্কার করতে ছাড়েন নি। যথাস্থানে তার আলোচনা কোরবো। দ্বিতীয় কথা হোল এর দ্বারা স্বরাজ লাভ সম্ভব নয়। স্বরাজ বলতে মডারেটরা বোঝেন যেমন আছি তেমনি থাকাই ভালো, আর একদল বোঝেন আর দুটো বেশী চাকরী, কেউ বোঝেন হোমরুল, কেউ ভাবেন পূর্ণ স্বাধীনতা। কবি কি ভাবেন তা জানি না। মহাত্মাজীর স্বরাজের আদর্শ হচ্ছে সাম্রাজ্যের অংশ থেকে আভ্যন্তরিক সমস্ত বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ যেমন অষ্ট্রেলিয়া, কেনেডা ইত্যাদি পেয়েছে। ইংরাজ জাতির উপর মহাত্মাজীর মজ্জাগত বিশ্বাস থাকায় এর বেশী তিনি ভাবতে পারেন নি। ভাবলে যে তিনি বলতে ত্রুটি করতেন না তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই স্বরাজ লাভের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা। সেই পরমুখাপেক্ষিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে ছেয়ে আছে। কবি বলছেন যে যখন মোগল পাঠানের ধাক্কা আমাদের দেশে লাগলো তখন হিন্দু রাজত্বের ছোটো ছোটো আলগা পাটকেলের কাঁচা ইমারত চারদিক খান খান হোয়ে ভেঙে পড়ল। দেশে তখন সুতোর অভাব ছিলো না কিন্তু সেই সুতো দিয়ে জড়িয়ে ভাঙন বন্ধ করা যায় নি।

খুবই সত্যি কথা যে সেদিনের আক্রমণ থেকে আমরা রক্ষা পাই নি এবং দেশে সুতোও তখন হয়তো খুবই প্রচুর ছিলো কিন্তু তুলনা জিনিসটার কি কোন আইন কানুন মেনে চলবার প্রয়োজন নাই? মোগল পাঠানের রাজত্বের সময় দেশের যে অবস্থা ছিলো তার সঙ্গে আজকের দেশের অবস্থার কি খুবই সাদৃশ্য আছে? এর উত্তরে হয়তো বলা হবে যে দুর্দশার মূলগত কারণ সেদিনও যা ছিলো আজও তাই আছে। তর্কের খাতিরে তাও যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলেও এটা কোন যুক্তির কথা যে রাজনীতি ক্ষেত্রে একই উপায়ে যুগযুগান্তর ধরে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। আজকের দিনের সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ইকনমিক্ সমস্যা। আমাদের দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর যাঁরা তাঁরা যদি নিজেদের দেশের অন্নবস্ত্রের উপর নির্ভর করে থাকতেন তাহলে ফকিরি করা ছাড়া উপায় থাকতো না। সাম্রাজ্য গঠনের কেন্দ্রের কথা হচ্ছে অভাব আর ক্ষুধার তাড়না। এই অভাব আর ক্ষুধার তাড়না তাঁদের সারা পৃথিবীময় ছুটিয়ে বেড়িয়েছে। সেই তাড়নায় তাঁরা আমাদের দেশে এলেন ও আপনাদের ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় ভাবে পত্তন করলেন। আমাদের দেশে অন্নসমস্যা দিন দিন বেড়ে চললো কারণ অন্নবৃক্ষের আধুনিক কালে কালো আদমীর মুখের চেয়ে সাদা আদমীর মুখের মধ্যে প্রবেশ করবার ঝোঁক বেশী দেখা যাচ্ছে। Economic Interpretation of History পড়ে এই কথাটা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করা যায় যে Economic উৎসগুলির মুখ যারা অন্যের দিক থেকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিতে পেরেছেন তাঁরা দুটি মহৎকার্য্য সাধন করতে পেরেছেন অন্যদের মেরেছেন আর নিজেরা বেঁচেছেন। শুনতে পাই আদিমযুগে দেবতারা অসুরদের কাছ থেকে কলে বলে কৌশলে অমৃত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তার ফলে দেবতারা হোলেন অমর আর অসুর হতভাগারা দলে দলে মাত্র মরলো। আজ ভারতবর্ষ সেই মরণ পথযাত্রী। তাকে বাঁচাতে গেলে Economic সমস্যার সমাধান করা ছাড়া কোন উপায় নাই। মোগল পাঠানের রাজত্বকালে একথা হয়তো একেবারেই প্রযুজ্য হোত না কিন্তু সেদিন থেকে আজ ছয় সাত শত বৎসর গত হয়েছে অনেক পুরোণো জটিলতার গ্রন্থি খুলে গেছে নব নব সমস্যার সৃষ্টিও কম হয়নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যাঁরা কামনা করেন তাঁদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থিক স্বাধীনতার যে কত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তা উপলব্ধি করতে একটুও বেগ পেতে হয়নি। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁরা দেখেছেন যে সব সহস্রধারায় অর্থ আমাদের দেশ থেকে বিদেশে প্রেরিত হচ্ছে বস্ত্রাভাব তাদের মধ্যে সব চেয়ে বৃহৎ ধারাটির সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ যুক্তদিন

থাকিবে ততদিন কোন দেশই খাদ্যবস্ত্রের সমস্যা অন্যদেশের উপর ন্যস্ত করে থাকতে পরে না। যে দেশ করে তাকে হয় ইংরাজদের মত সাম্রাজ্য স্থাপন করতে হয় নয় ভারতবর্ষের মত অধীনতা স্বীকার করতে হবে।

এই বস্ত্র সমস্যা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যা লিখেছেন তার থেকে কিছু চয়ন করে দেওয়া যাচ্চে।

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে তিনি লিখেছেন—

India can not live unless her homes become self-supporting. They can not become so, unless they have a supplementary occupation. It will therefore not avail if all our cloth was manufactured in our mills. If hand spinning became universal every home would get a share of the crores without any complicated machinery being necessary.

This is the Economic aspect of hand spinning.

It will as it must do away with begging as a means of livelihood.

It will remove our enforced idleness.

১০ই ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে লিখেছেন—

Without a cottage industry the Indian peasant is doomed. He cannot maintain himself from the produce of the land. He needs a supplementary industry. Spinning is the easiest, the cheapest, the best. I know this means a revolution in our mental outlook. And it is because it is a revolution that I claim that the way to Swaraj is through Swadeshi.

১৯শে জানুয়ারী ১৯২১ সালে লিখেছেন—

India can not be free so long as India voluntarily encourages or tolerates the economic drain which has been going on for the past century and a half foreign cloth constitutes the largest drain permitted by us.

9th Feb লিখেছেন—

The use of khaddar represents nothing more than a most practical recognition of the greatest Economic Necessity of the country.

3rd Nov 1921 লিখেছেন—

An English friend sends me a news paper cutting showing the progress of machinery in China. He has eirdently imagined that in advocating hand spinning I am propagating my ideal against machinary I am doing nothing of the kind. I would favour the use of the most elaborate machinary if thereby India's panperiom and resulting idleness be avoided. I have suggested hand spinning as the only readymeans of driving away penury and making famine work of wealth impossible. The spinning wheel itself is a piece of valuable machinery etc.

যতটা উদ্ধৃত করেছি তার থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্চে যে চরকার Economic দিকটার উপরই মহাত্মাজী ঝোঁক দিয়েছেন এবং সমস্ত Economic জিনিষের যে spiritual দিক আছে তার নির্দেশ করেছেন।

বলা হয়েছে যে প্রত্যেক লোককে কাটতেই হবে এ জবরদস্তি কেন? মানুষ কি মৌমাছি যে সব এক নমুনার চাক গড়বে? এ যে কথা এটা মানুষের অন্তরের সৃষ্টির সম্বন্ধে খুবই সত্য কথা। ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্য সাধনার ফলে রূপ ও রস সৃষ্টি ঘটবে ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেটা Economic fact তার সম্বন্ধে সৌন্দর্য্য সাধনার নিয়ম খাটে কি? চাষীরা যদি বলে বসে যে আমরা সবাই বৎসরের পর বৎসর ধরে যে কেবল ধান উৎপন্ন করে চলেছি এ অত্যন্ত একঘেঁয়ে ব্যাপার এ আর করবো না তাহ'লে আমাদের অবস্থাটা যে কি হয় তা ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে।

Economic জগৎএ সৃষ্টির আনন্দ আছে সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করে মানুষের অভাব মোচনের আনন্দ, সে আনন্দ মৌলিক সৃষ্টির আনন্দ না হলেও তার দিক থেকে মোটেই কম নয়। প্রাচীন রোমে মহাপণ্ডিতেরাও কৃষিকর্ম্ম করতেন। আমাদের দেশেও এ আদর্শ নতুন নয়। আজকের দিনে কৃষিকার্য্য সকলের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। যাঁরা সহরে বাস করেন ভূমির অভাবে কৃষিকার্য্য তাঁদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় আর দ্বিতীয়তঃ যাঁরা অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের পক্ষেও কৃষিকার্য্য সম্ভব নয়। কৃষি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। চরকাই একমাত্র বস্তু যা অল্প শ্রম-সাধ্য, যা কৃষির মতই নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন করে আর কি নগরবাসী কি গ্রামবাসী উভয়েই অতি সহজে ব্যবহার করিতে পারে। Economic যোগ সূত্রের দ্বারা দেশের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করবার মত আর কোন সত্য উপায় নেই। চরকা সেই প্রচেষ্টারই প্রতীক স্বরূপ। মহাত্মাজী যখন চরকা দিয়ে স্বরাজ আনবার কথা বলেছিলেন তখন তিনি এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সোজা সরল কথাটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকে অনেক ব্যাখ্যান দিয়েছেন কিন্তু ব্যাখ্যা করবার মত এত জটিল সেটা মোটেই নয়।

দ্বিতীয় তর্ক কবি তুলেছেন যে চরকা cult আমাদের দেশের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত আর এর দ্বারা কুসংস্কার বেড়ে যাওয়া ছাড়া কমবে না। এ তর্কের শেষ কোনদিন হয় নি কোনদিন হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ অজ্ঞানতা, কুসংস্কার কথা দুটো ভারী elastic, যা আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্গে মেলে না তাকেই আমরা অজ্ঞানতা প্রসূত কুসংস্কার বলতে ত্রুটি করি নে। খুব নিরপেক্ষ হোয়ে বিচার করতে পারা খুব শক্ত কাজ। আর সে কাজ তাঁদের দ্বারাই সম্ভব যাঁরা সত্যকে ব্যক্তিগত মতামতের অনেক উর্দ্ধে স্থান দেন, যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে দেন শুধু বাচনিক আন্তরিকতার সঙ্গে নয়।

কোন কিছুকে কুসংস্কারের পরিচায়ক আমরা তখনই বলি যখন সেটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়! পুরীতে এখনো জলের কল বসতে পারলো না যেহেতু স্থানীয় লোকেরা জলের কলকে অশুচি মনে করে। এই অশুচি মনে করবার জন্যে যে গণীয় মনোভাব দায়ী তার কোন একটি থেকে যদি চরকার কল্পনা প্রসূত হোত তাহ'লে তাকে অজ্ঞানের উপর কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলতে দোষ দেওয়া যেতো না। তবে যদি কেউ বলেন যে machinerya বিরুদ্ধে এই অভিযান যুগ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কবি তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গীতে চক্রস্তুতি গান করে machinerya স্তব করেছেন। কিন্তু তা হলেও তাঁর কথাটা এ সম্বন্ধে শেষ কথা কিম্বা প্রায় শেষ কথা বলে মেনে নিতে পারছি নে। machinerya পরীক্ষার দিন এখনো আসে নি। যা লক্ষণ পৃথিবী জুড়ে দেখা দিয়েছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যাই হোক্ এ কথা আশা করি কেউ অস্বীকার করবেন না যে আমাদের অভাব মোচন করতে পারে সে সংখ্যক মিল আমাদের দেশে নাই এবং অদূর ভবিষ্যৎএ তত সংখ্যক মিল স্থাপনের কোন সম্ভাবনা দেখছি না আর হলেও যে সেটা খুব বাঞ্ছনীয় হবে তা মনে হয় না মত কারণ অন্য অন্য দেশের মিলের অভিজ্ঞতা দেয় না। স্বদেশীর যুগের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানি যে যখন বাঙলা দেশে বস্ত্রাভাবে লোকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করেছে তখন বম্বের পিশাচ মিলওয়ালারা কাপড়ের মূল্য অযথা রকম বাড়িয়ে দিয়ে দু'শো পারসেন্ট ডিভিডেন্ট দিয়েছেন। এ হোল খুব মোটা রকমের অঙ্ক এর মধ্যে কোন রকম কল্পনার খেলা নেই। ধনীরা সব দেশেই সমান। স্বার্থপর স্বদেশদ্রোহী বলে তারা চিরকাল বিখ্যাত। আমাদের দেশের